বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : অষ্টম খন্ড

গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবশিশার্স বাড়ী # ৭, সড়ক # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabad.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	জুন, ১৯৮৪ আষাঢ়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মো: আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-8

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail: info@paramabad.com
On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh
Copyright : Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packing
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka-1216.
First Published: June, 1984
Reprint : December, 2003
Reprint: June 2009

ISBN: 984-433-091-2(set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : অষ্টম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)'' পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয়-সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলি সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলি প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে এম মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলি থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলি ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলি পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
এয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

পাঁচ

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা য়ায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সংযোজন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রুপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খন্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরুপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলির সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খন্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খন্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খন্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলি দলিলখন্ডের মধ্যে গুণগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খন্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা

২৫শে মার্চের রাতে আকস্মিকভাবে ঢাকায় বেসামরিক জনসাধারণের ওপর পাক হানাদার বাহিনীর সামরিক হামলার পর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাদের আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা সারা বাংলাদেশে নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের যে ব্যাপক ক্রিয়াকলাপ চালায় সে সম্পর্কিত দলিলপত্র এই খন্ডে গ্রন্থিত হয়েছে। দলিলাদির প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলো কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমে রয়েছে হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী এবং নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগের শিকার ব্যক্তিগণকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনে প্রেরিত কয়েকটি আবেদনপত্রের অপুলিপি (পৃষ্ঠাঃ ১-১১)।

এর পরে রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাতৎকার (পৃষ্ঠাঃ ১২-৩২৪)। বাংলাদেশের ৪টি আঞ্চলিক বিভাগের প্রতিটি জেলার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছ থেকে নেয়া সাক্ষাৎকার হতে প্রতিনিধিত্বমূলক ২৬২টি এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে আকস্মিকবাবে বেঁচে যাওয়া, তাদের বর্বর নির্যাতনের সাক্ষী ও ধর্ষিত নারীসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের এসব বিবৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে হানাদার বাহিনরি হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের ধরণ ও পদ্ধতির একটি সামগ্রিক চিত্র এই অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

এই একই চিত্র আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি আরেকটি মাধ্যম থেকে। সেটি হল বাংলাদেশের সৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী (পৃষ্ঠাঃ ৩২৫-৫২০)। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৫শে মার্চের পর ঢাকা এবং দখলদার বাহিনী কবলিত বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার পত্র-পত্রিকাসমূহ গণহত্যা ও নির্যাতনের কোন খর প্রকাশ করতে পারেনি। দখলদার কবলিত বাংলাদেশে গণহত্যার নয় মাসের ঘটনাবলী পত্র-পত্রিকায় উন্মোচিত হতে শুরু করে কেবলমাত্র বিজযের পর। সে কারণেই তৎপরবর্তী কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত গণহত্যার তথ্য ও সংবাদ নিবন্ধ নিয়েই নির্মিত হয়েছে এই অধ্যায়। 'বাংলার বাণী' ওই সময়ে গণহত্যার ওপর বের করে একটি বিশেষ সংখ্যা। সেখান থেকে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ এখানে সংকলিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকা তেকে নেয়ার সময় বিষয়বস্তুর দিকেই মূলত লক্ষ্য রাখা হয়েছে-পত্রিকাবিশেষ নয়। কোন কোন বিষয় একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণকেই প্রাধান্য দিয়ে তার যে কোন একটি হতে নেয়া হয়েছ। ২৫ শে মার্চের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী এবং সারা দেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, সরকারী, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্য এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোকদের ওপর পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা পরিচালিত হত্যা ও নির্যাতনের বিচিত্র বিবরণ এই অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর আল-বদরদের দ্বারা নিহত বুদ্ধিজীবীদের শেষ দিন, শেষ কথা শীর্ষক প্রতিবেদনটি নেয়া হয়েছে 'বিচিত্রা' (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৩) থেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে সেটি পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫৭৪)। আরেকটি পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে '৭১ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ' গ্রন্থে মুদ্রিত সারা দেশের শহীদ শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী তথা বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের তালিকা (পৃষ্ঠা ৫৭৬)।

একাত্তরে বাংলাদেশে পাক বাহিনীর গণহত্যা বিশ্বের পত্র-পত্রিকা ও বেতার মাধ্যমগুলোতেও ব্যাপকভাবে এসেছে। এই গণহত্যার ঘটনাবলী তারা কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছে, নমুনাস্বরূপ তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে ''বিদেশী পত্র-পত্রিকা'' অংশে (পৃষ্ঠা ৫২১-৫৩৯)। উল্লেখ্য যে, 'বিশ্ব জনমত' (চতুর্দশ) খন্ডেও গণহত্যা ও বাংলাদেশের প্রসঙ্গে প্রচুর দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে।

বার

হানাদার বাহিনীর হত্যা ও নির্যাতনের ভীত হয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী ভারতে শরণার্থী হয়েছিল। তাদের দেশত্যাগ, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান, খাদ্য, চিকিৎসা ও ত্রাণের জন্য শিবিরে দিন যাপন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে আরেকটি অধ্যায়-'বাংলাদেশের শরণার্থী'। এই প্রসঙ্গে 'ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' শিরোনামে কিছু সংবাদ নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছৈ এই খন্ডের শেষাংশে (পৃষ্ঠা ৫৪১)। এছাড়া ভারতে বাঙ্গালী শরণার্থী শিবিরসমূহের একটি তালিকা এবং শরণার্থী সংখ্যার একটি হিসাবও মুদ্রিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫৫৯)।

বাংলাদেশের গণহত্যার পূর্ণ চিত্র একটি দলিল খন্ডে সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। এখানে সারা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সর্বশ্রেণীর মানুষের উপর পাক বাহিনীর হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিনিধিত্বমূলক বিবরণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসব বিবরণের মধ্যে সংখার হিসাবগুলো সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক নাও হতে পারে। তবে এগুলোর দ্বারা এই গণহত্যার প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা ও এর গভীরতা সম্যকভাবেই ধরা পড়ে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Par II September 1, 1977, Page 503
Ministry of Information & Broadcasting.

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথা/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

Government of The People's Republic of Bangladesh

Ministry of Information & Broadcasting

N. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members :

1. Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department
3. Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangaldesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum
5. Dr. K M Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6. Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt of Political Science, Dacca
7. Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8. Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. Bengali, Chittagong University
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be the terms of reference of the Committee :

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali

Section Officer.

GOVERNMENT OG THE PEOPLE'S OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

N. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1978

RESOLUTION

In Partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231. dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members :

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University.	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department	Member
3.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangaldesh Studies, Rajshahi.	Member
4.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum	Member
5.	Dr. K M Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
6.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt of Political Science, Dacca	Member
7.	Dr. Ahmed Sharif Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.	Member
8.	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. Bengali, Chittagong University	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project.	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of documents required for the committee.

M. A. Salam Khan
Section Officer.

পরিশিষ্ট

[তিন]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

ঢাকা

নং-তম/২/৮০/ইতিহাস(অংশ)১২২৮৬ তাং ১১-৯-৮৩ইং

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক ডঃ কে এম মোহসীনকে তাঁহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ''বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের'' প্রকল্প পরিচালক পদে জনস্বার্থে ৬-৯-১৯৮৩ (পূর্বাহ্ন) তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৮৪ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে নিয়োগ করা হইল।

... ...

স্বাক্ষর-

মোঃ শফিকুর রহমান

উপ-সচিব।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশে পাক বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত কতিপয় ব্যক্তি চিঠি	১
২।	গণহত্যা ও নির্যাতণের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকারঃ	১২-
	ঢাকা বিভাগ	৩২৪
	রাজশাহী বিভাগ	১২
	খুলনা বিভাগ	৬৭
	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৮৩
৩।	ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযানের ওপর একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	২৭০
৪।	পাক বাহিনীর ‘ইকবাল হল’ আক্রমণের ওপর দু’টি প্রতিবেদন	৩২৫
৫।	জগন্নাথ হলে পাকবাহিনরি গণহত্যার ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন	৩৩১
৬।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক বাহিনীর হত্যাভিযান	৩৩৫
৭।	গণহত্যার কিছু দলিল	৩৪৯
৮।	পাক-সোনদের হাতে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বিয়োগান্ত পরিণতির বিবরণ	৩৫৩
৯।	ঢাকা প্রেসক্লাবের ওপর ট্যাংকের বোমাবর্ষণঃ একটি প্রতিবেদন	৩৫৬
১০।	ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে পাক-বাহিনরি হত্যাযজ্ঞের ওপর দুটি প্রতিবেদন	৩৫৯
১১।	নারায়ণগঞ্জে দু’জন ছাত্রের হত্যা কাহিনী	৩৬৬
১২।	‘অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নরপশুরা’	৩৭৩
১৩।	পাক বাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণ	৩৭৪
১৪।	‘জল্লাদেরা স্বামীর লাশটাও একবার আমাকে দেখতে দিল না’	৩৭৬
১৫।	মেজর জিয়ার পরিবারের ওপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বিবরণ	৩৭৯
১৬।	‘বর্বরতার রেকর্ড’	৩৮১
১৭।	রমনা পর্কের বধ্যভূমি	৩৮৫
১৮।	সাভারের কয়েকটি হত্যা কাহিনী	৩৮৭
১৯।	রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমি	৩৮৮
২০।	‘আমার ভাইকে তোমরা হত্যা কোরো না’	৩৯০
২১।	কংকালের মিছিল এখানে	৩৯২
২২।	সিরাজগঞ্জ যমুনা পারের কিছু হত্যা কাহিনী	৩৯৩
২৩।	আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়া	৩৯৫
২৪।	গ্রামে গামে পথে পথে বধ্যভূমি	৩৯৬
২৫।	রাজশাহীর গর্তে আরো নরকঙ্কাল	৩৯৭
২৬।	ধামরাই আজ শ্মশান	৩৯৯
২৭।	হাজিগঞ্জে খান সেনাদের হত্যাযজ্ঞের স্বাক্ষর	৪০০
		৪০২

আঠার

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮।	কিশোরগঞ্জের হত্যাকান্ড	৪০৩
২৯।	স্বাধীনতা এলো, দানবীর আর পি সাহা আজও এলেন না	৪০৫
৩০।	কুমিল্লা ও রাজশাহীতে (বিশ্ববিদ্যালয়) গণহত্যার স্বরূপ	৪০৭
৩১।	নাটোরের ছাতনীতে পাক বাহিনীর বর্বরতা	৪০৯
৩২।	খানসেনারা ওকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়েছিল	৪১১
৩৩।	হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী	৪০৩
৩৪।	চাঁদপুরে আট মাসের বিভীষিকা	৪১৫
৩৫।	রাজমাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর হত্যা, লুট ও নির্যাতন	৪১৭
৩৬।	নৃশংসতার আর এক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস	৪১
৩৭।	দিনাজপুরে হত্যা ও লুণ্ঠন	৪২০
৩৮।	‘অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে’	৪২২
৩৯।	কে ক’টা হত্যা করলো তার ওপর নির্ভর করতো খানসেনাদের পদোন্নতি	৪২৪
৪০।	বগুড়ায় পাক বাহিনীর হত্যাকান্ডের ওপর দুটি প্রতিবেদন	৪২৬
৪১।	খুলনায় নরমেধযজ্ঞ	৪৩০
৪২।	চট্টগ্রামে বধ্যভূমির সন্ধান	৪৩২
৪৩।	চাঁদপুরে পাক বাহিনরি হত্যালীলার আরো কাহিনী	৪৩৩
৪৪।	সৈয়দপুরে বাঙ্গালী নিধন অভিযানের একটি পত্যক্ষ বিবরণ	৪৩৫
৪৫।	‘জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে’	৪৩৭
৪৬।	খুলনায় পাক বাহিনরি নরমেধযজ্ঞ	৪৩৯
৪৭।	নওগাঁর পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের আরেক অধ্যায়	৪৪১
৪৮।	‘অমানুষিক নির্যাতনেও তাঁর মনের বলিষ্ঠতা কমেনি’	৪৪৩
৪৯।	মানিকগঞ্জের একটি বধ্যভূমি সাটুরিয়া হাট	৪৪৪
৫০।	মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা কলোনী	৪৪৫
৫১।	পটুয়াখালীর জেলখানায় বধ্যভূমি	৪৪৭
৫২।	ময়মনসিংহে খান সেনাদের বর্বরতা	৪৪৮
৫৩।	অগ্নিদগ্ধ, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী	৪৪৯
৫৪।	ভৈরবের হত্যাকান্ড	৪৫১
৫৫।	ফেনীতে পাক বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী	৪৫২
৫৬।	বগুড়ার ‘মান্নান ভাই’ এবং আরো কয়েকজন তরুণের হত্যার বিবরণ	৪৫৩
৫৭।	মনুব্রীজে প্রকাশ্য গণহত্যা	৪৫৪
৫৮।	মৌলবীবাজারে আরো বধ্যভূমির সন্ধান	৪৫৫
৫৯।	গোপালপুর সুগার মিলে গণহত্যা	৪৫৬
৬০।	স্বাধীনতার বেদীমূলে পিতা-পুত্র	৪৫৮
৬১।	কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি	৪৫৯
৬২।	পীর-দরবেশরাও রেহাই পায়নি	৪৬১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৩।	নারকীয় তান্ডবের আর এক লীলাভূমি	৪৬২
৬৪।	একটি হালকা মেশিনগানের জন্য বত্রিশটি জীবনের পরিসমাপ্তি	৪৬৩
৬৫।	আর এক শহীদ গণ-পরিষদ সদস্য নজমুল হক সরকার	৪৬৪
৬৬।	দাবনীর নূতন চন্দ্র সিংহ বাঁচতে পারেননি	৪৬৫
৬৭।	রংপুরের দুটি গণসমাধি	৪৬৬
৬৮।	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান দেবদাস হয়ে বেঁচে আছেন	৪৬৭
৬৯।	গাজীপুর অস্ত্র কারখানায় কয়েকজন কর্মচারীর হত্যাকান্ড	৪৭০
৭০।	নির্মম অত্যাচারে নিহত ও সি	৪৭২
৭১।	রাজশাহীতে পাক বাহিনীর বর্বরতার প্রাথমিক জরীপ	৪৭৪
৭২।	রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ক'জন শহীদ	৪৭৫
৭৩।	পাক হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে কয়েকিট ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন	৪৭৭
৭৪।	'ওরা ডাক্তার মেরেছে'	৪৭৯
৭৫।	'ওরা সাংবাদিক মেরেছে'	৪৮২
৭৬।	যোগেশ বাবুর হত্যা কাহিনী	৪৮৩
৭৭।	'ইত্তেফাক'-এর সাংবাদিকের লেকায় ২৫শে মার্চের রাতের সামরিক হামলার প্রত্যক্ষ বিবরণ	৪৮৫
৭৮।	ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পাক বাহিনীর হামলার বিবরণ	৪৮৯
৭৯।	একাত্তরে রংপুরের আলমনগর	৪৯২
৮০।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের মধুদা	৪৯৫
৮১।	লেঃ কর্ণেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	৪৯৭
৮২।	ডাঃ আয়েশার হত্যাকান্ড	৪৯৯
৮৩।	হানাদার বাহিনীর সহযোগী আল-বদরদের হত্যার শিকার কয়েকজন	৫০০
৮৪।	বেগম মুজিব কিভাবে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো	১৩
৮৫।	শহীদ শামসুল হক ও নুরুল হক	৫১৭
৮৬।	শহীদ চার ভাই	৫১৯
৮৭।	গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বিদেশী পত্র-পত্রিকা	৫২১
৮৮।	বাংলাদেশের শরণার্থী, গণহত্যা ও নির্যাতন প্রসঙ্গে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায়	৫৪১
৮৯।	প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	
৯০।	শরণার্থীদের ওপর আই, আর, সি-র একটি রিপোর্ট	৫৫৩
৯১।	শরনার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য	৫৫৯
	পরিশিষ্ট-১ : পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের	৫৭৩
৯২।	শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের নামের একটি তালিকা	
৯৩।	পরিশিষ্ট-২ : শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের আকেরটি তালিকা	৫৭৫
	নির্ঘণ্ট	৫৭৯

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশে পাক বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত কতিপয় ব্যক্তি চিঠি	১
২।	গণহত্যা ও নির্যাতণের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকারঃ	১২-
	ঢাকা বিভাগ	৩২৪
	রাজশাহী বিভাগ	১২
	খুলনা বিভাগ	৬৭
	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৮৩
৩।	ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযানের ওপর একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	২৭০
৪।	পাক বাহিনীর ‘ইকবাল হল’ আক্রমণের ওপর দু’টি প্রতিবেদন	৩২৫
৫।	জগন্নাথ হলে পাকবাহিনরি গণহত্যার ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন	৩৩১
৬।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক বাহিনীর হত্যাভিযান	৩৩৫
৭।	গণহত্যার কিছু দলিল	৩৪৯
৮।	পাক-সোনদের হাতে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বিয়োগান্ত পরিণতির বিবরণ	৩৫৩
৯।	ঢাকা প্রেসক্লাবের ওপর ট্যাংকের বোমাবর্ষণঃ একটি প্রতিবেদন	৩৫৬
১০।	ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে পাক-বাহিনরি হত্যাযজ্ঞের ওপর দুটি প্রতিবেদন	৩৫৯
১১।	নারায়ণগঞ্জে দু’জন ছাত্রের হত্যা কাহিনী	৩৬৬
১২।	‘অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নরপশুরা’	৩৭৩
১৩।	পাক বাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণ	৩৭৪
১৪।	‘জল্লাদেরা স্বামীর লাশটাও একবার আমাকে দেখতে দিল না’	৩৭৬
১৫।	মেজর জিয়ার পরিবারের ওপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বিবরণ	৩৭৯
১৬।	‘বর্বরতার রেকর্ড’	৩৮১
১৭।	রমনা পর্কের বধ্যভূমি	৩৮৫
১৮।	সাভারের কয়েকটি হত্যা কাহিনী	৩৮৭
১৯।	রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমি	৩৮৮
২০।	‘আমার ভাইকে তোমরা হত্যা কোরো না’	৩৯০
২১।	কংকালের মিছিল এখানে	৩৯২
২২।	সিরাজগঞ্জ যমুনা পারের কিছু হত্যা কাহিনী	৩৯৩
২৩।	আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়া	৩৯৫
২৪।	গ্রামে গামে পথে পথে বধ্যভূমি	৩৯৬
২৫।	রাজশাহীর গর্তে আরো নরকঙ্কাল	৩৯৭
২৬।	ধামরাই আজ শ্মশান	৩৯৯
২৭।	হাজিগঞ্জে খান সেনাদের হত্যাযজ্ঞের স্বাক্ষর	৪০০
		৪০২

আঠার

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮।	কিশোরগঞ্জের হত্যাকান্ড	৪০৩
২৯।	স্বাধীনতা এলো, দানবীর আর পি সাহা আজও এলেন না	৪০৫
৩০।	কুমিল্লা ও রাজশাহীতে (বিশ্ববিদ্যালয়) গণহত্যার স্বরূপ	৪০৭
৩১।	নাটোরের ছাতনীতে পাক বাহিনীর বর্বরতা	৪০৯
৩২।	খানসেনারা ওকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়েছিল	৪১১
৩৩।	হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী	৪০৩
৩৪।	চাঁদপুরে আট মাসের বিভীষিকা	৪১৫
৩৫।	রাজমাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর হত্যা, লুট ও নির্যাতন	৪১৭
৩৬।	নৃশংসতার আর এক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস	৪১
৩৭।	দিনাজপুরে হত্যা ও লুণ্ঠন	৪২০
৩৮।	‘অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে’	৪২২
৩৯।	কে ক’টা হত্যা করলো তার ওপর নির্ভর করতো খানসেনাদের পদোন্নতি	৪২৪
৪০।	বগুড়ায় পাক বাহিনীর হত্যাকান্ডের ওপর দুটি প্রতিবেদন	৪২৬
৪১।	খুলনায় নরমেধযজ্ঞ	৪৩০
৪২।	চট্টগ্রামে বধ্যভূমির সন্ধান	৪৩২
৪৩।	চাঁদপুরে পাক বাহিনরি হত্যালীলার আরো কাহিনী	৪৩৩
৪৪।	সৈয়দপুরে বাঙ্গালী নিধন অভিযানের একটি পত্যক্ষ বিবরণ	৪৩৫
৪৫।	‘জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে’	৪৩৭
৪৬।	খুলনায় পাক বাহিনরি নরমেধযজ্ঞ	৪৩৯
৪৭।	নওগাঁর পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের আরেক অধ্যায়	৪৪১
৪৮।	‘অমানুষিক নির্যাতনেও তাঁর মনের বলিষ্ঠতা কমেনি’	৪৪৩
৪৯।	মানিকগঞ্জের একটি বধ্যভূমি সাটুরিয়া হাট	৪৪৪
৫০।	মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা কলোনী	৪৪৫
৫১।	পটুয়াখালীর জেলখানায় বধ্যভূমি	৪৪৭
৫২।	ময়মনসিংহে খান সেনাদের বর্বরতা	৪৪৮
৫৩।	অগ্নিদগ্ধ, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী	৪৪৯
৫৪।	ভৈরবের হত্যাকান্ড	৪৫১
৫৫।	ফেনীতে পাক বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী	৪৫২
৫৬।	বগুড়ার ‘মান্নান ভাই’ এবং আরো কয়েকজন তরুণের হত্যার বিবরণ	৪৫৩
৫৭।	মনুব্রীজে প্রকাশ্য গণহত্যা	৪৫৪
৫৮।	মৌলবীবাজারে আরো বধ্যভূমির সন্ধান	৪৫৫
৫৯।	গোপালপুর সুগার মিলে গণহত্যা	৪৫৬
৬০।	স্বাধীনতার বেদীমূলে পিতা-পুত্র	৪৫৮
৬১।	কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি	৪৫৯
৬২।	পীর-দরবেশরাও রেহাই পায়নি	৪৬১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৩।	নারকীয় তান্ডবের আর এক লীলাভূমি	৪৬২
৬৪।	একটি হালকা মেশিনগানের জন্য বত্রিশটি জীবনের পরিসমাপ্তি	৪৬৩
৬৫।	আর এক শহীদ গণ-পরিষদ সদস্য নজমুল হক সরকার	৪৬৪
৬৬।	দাবনীর নূতন চন্দ্র সিংহ বাঁচতে পারেননি	৪৬৫
৬৭।	রংপুরের দুটি গণসমাধি	৪৬৬
৬৮।	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান দেবদাস হয়ে বেঁচে আছেন	৪৬৭
৬৯।	গাজীপুর অস্ত্র কারখানায় কয়েকজন কর্মচারীর হত্যাকান্ড	৪৭০
৭০।	নির্মম অত্যাচারে নিহত ও সি	৪৭২
৭১।	রাজশাহীতে পাক বাহিনীর বর্বরতার প্রাথমিক জরীপ	৪৭৪
৭২।	রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ক'জন শহীদ	৪৭৫
৭৩।	পাক হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে কয়েকিট ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন	৪৭৭
৭৪।	'ওরা ডাক্তার মেরেছে'	৪৭৯
৭৫।	'ওরা সাংবাদিক মেরেছে'	৪৮২
৭৬।	যোগেশ বাবুর হত্যা কাহিনী	৪৮৩
৭৭।	'ইত্তেফাক'-এর সাংবাদিকের লেকায় ২৫শে মার্চের রাতের সামরিক হামলার প্রত্যক্ষ বিবরণ	৪৮৫
৭৮।	ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পাক বাহিনীর হামলার বিবরণ	৪৮৯
৭৯।	একাত্তরে রংপুরের আলমনগর	৪৯২
৮০।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের মধুদা	৪৯৫
৮১।	লেঃ কর্ণেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	৪৯৭
৮২।	ডাঃ আয়েশার হত্যাকান্ড	৪৯৯
৮৩।	হানাদার বাহিনীর সহযোগী আল-বদরদের হত্যার শিকার কয়েকজন	৫০০
৮৪।	বেগম মুজিব কিভাবে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো	১৩
৮৫।	শহীদ শামসুল হক ও নুরুল হক	৫১৭
৮৬।	শহীদ চার ভাই	৫১৯
৮৭।	গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বিদেশী পত্র-পত্রিকা	৫২১
৮৮।	বাংলাদেশের শরণার্থী, গণহত্যা ও নির্যাতন প্রসঙ্গে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায়	৫৪১
৮৯।	প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	
৯০।	শরণার্থীদের ওপর আই, আর, সি-র একটি রিপোর্ট	৫৫৩
৯১।	শরনার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য	৫৫৯
	পরিশিষ্ট-১ : পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের	৫৭৩
৯২।	শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের নামের একটি তালিকা	
৯৩।	পরিশিষ্ট-২ : শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের আকেরটি তালিকা	৫৭৫
	নির্ঘণ্ট	৫৭৯

প্রথম অধ্যায়
দলিলপত্রঃ মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রেরিত পত্রাবলী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১। জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশে পাক-বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত কতিপয় ব্যক্তির চিঠি	বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর	জুন-আগস্ট, ১৯৭১

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva,
Switzerland.

Sir,

My name is Abdul Karim, S/o. Reazul Karim, age 27, Malibagh, Dacca. On26th March at approximately 10 P.M.4 Pakistani troops entered our house and asked whether we were Bengali. My father, an oldman, said in affirmative, he was shot at once. Then they turned to my brother and asked him whether he was Bengali and his answer was also in affirmative and they shot him also. Then I was asked whether I was a Bengali. I replied in Urdu saying that I was only a guest. Then they asked me whether I was a Hindu, I said again in Urdu that I was a Muslim guest in the house and came from West Pakistan. The spared me and left the house.

Sd/-
Abdul Karim
8-6-71

(An English Translation of the original.
The original in Bengali sent to the addressee.)

\ ২ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I beg to relate below some of the facts for your information and action.

I was a permanent resident of Daudkandi in the district of Comilla within Bangladesh formerly known as East Pakistan. But since by no means I could save myself there I escaped to Agartala in India and I am writing this letter from here.

The barbarous and cruel West Pakistani Troops left behind sufficient and tolling evidence of their atrocities at Dacca, Narayanganj, Munsiganj, Taltala, Sirajdhiga and Gazaria Police Stations in which places the Pak troops killed innumerable innocent residents in the darkness of the night. At Gazaria the said Pak troops mist inhumanely killed in all 8 hundred men, women and children by Machinegun fire and looted all the cash, gold ornaments and other valuables found in their houses.

In broad day light the said Pak troops took into custody women & girls of the ages ranging From 12 to 30, blind folded them, took them to the Military Cantonment and ultimately dispatched them to West Pakistan.

I myself saw the dead bodies of hundreds of young men, their hands and feet tied and killed inside the premises of Burma Eastern Company and Esso Company at Godnail in Narayanganj. Those deal bodies were thrown into the river. Women of the ages from youth to sixty were not spared in this area. They were raped, killed and thrown away. The atrocities are beyond description and rare in human history. Similar atrocities and killings were carried out at Narayanganj Terminal Jetty and Phatulla P. N. O. (Pakistan National Oil) Company area.

Barbarous Yaya Government issued circulars directing all people of the ages between 12 & 30 to obtain Identity Cards from Military Cantonment but unfortunately none of those who Went there returned. Their fate can easily be guessed.

Following the attack by the Liberation Forces the Pak troops are not content only by killing innocent villagers indiscriminately, they are not sparing old women and children. They are burning villages after villages and looting the properties.

In accordance with directives of Banga Bandhu Sheikh Mujib the people of Bangladesh stopped payment of rents. As a result the West Pakistan Raiders were not only carrying on cruel oppression, they were threatening the people with confiscation of all their properties and trail in Military courts unless rents were paid within the 15th of May.

At the instance of notorious Tikka Khan few Mirjafars (Traitors) are looting the houses of the innocent Bengalis, setting fire to the same, abducting and kidnapping women and girls & with the help of the tractors Beharis carrying on most barbarous and inhuman killings of innocent Bengalis.

What is strange is that young; men are caught, their hands and feet are tied and entire quantity of blood is drawn out of their bodies and the dead bodies are consigned into water.

Yours faithfully
Sd.-
Chowdhury A.B.M. Kaiser Ahmed
Daudkandi, Comilla,
Bangladesh

Dt. 10.6.71

N.B. I post this letter after escaping to Agartala in India.

\ ৩ \

To
Chairman
Human Rights Commission,
Geneva,
Switzerland,
Europe.

Sir,

I was the Head Master of Bijoypur High School under Police Station Kotwali, District Comilla in Bangladesh. My permanent address is Village & Post Office – Dariadauat, P.S. Bacharampur, Comilla.

In the last week of April, 1971 the Pakistan Troops broke all the doors and the windows of Bagmara High School and Quaid-e-Azam High School at Bijoypur and destroyed all the laboratory materials, furniture's and office records. The same process was repeated later and Miarbazar High School which was set on fire by them destroying the office and laboratory completely. The Pak troops caught and took away two students from village Alekdia under Kotwali P.S. and they did not return.

In the last week of May last, I saw two teen-aged girls of Barura P.S. having been carried in an Army Jeep via Lalmai towards Comilla. Near village Dharmapur they raped one of those two girls on the public road. At Lalmai where the Pak troops have a fair

concentration, they brought people whom so ever they liked and most capriciously put most of them to death. I learnt this from the few persons who manage to escape from this centre.

Unfortunately persons who were killed at the centre or elsewhere by Pak Troops were thrown into the big ditch at the back of the C & B Duk-Banglow inside the Lalmai Hill. The Pak troops have separate tents to detain the kidnapped and abducted girls and Women for satisfying their lust. One person who succeeded in escaping from the detention camp related how he was asked to carry and throwaway the dead body of a girl who had died in consequence of repeated brutal rape and torture. That man, however, when left alone with the dead body fled away. .

These are just few of the similar innumerable gruesome stories of which I bear testimony since I had been passing through different areas in my flight from my country to the neighboring country to seek shelter from the cruel Pakistani Armed killers.

I relate these stories in the hope that world conscience may, however late, be roused.

Yours sincerely,
A F M Fazlul Haque
Dt. 11-6-71

P.S. At present I am residing with Professor Khurshed Alam M N A at Agartala.

\ ৪ \

To
The Chairman
Human Rights Commission
Geneva,
Switzerland
Europe.

Sir,

I was a third year University Student of Dacca University residing at the Salimullah Hall. Following the launching of ruthless attach by the Pakistani troops with all sorts of lethal weapons, the said Troops killed the students found in the Salimullah Muslim Hall most inhumanly. About a week back the Pakistani Troops caught Iqbal Ahamed, the Cultural Secretary of DUCSU and his younger brother. They have not been heard of any more.

The Pak Troops carried on large scale killing of un-armed innocent people of Gazaria and other neighboring areas most wantonly.

May not the student community of Bangladesh expect some positive action ? we earnestly pray for the same in the name of humanity.

Yours faithfully,
Sd/-
Mian Tajul Islam
Dt. 17.6.71

Permanent Address
Village-0Ichakhali,
P.O. Baganbari,
P.S. Matlab,
Dist. Comilla, Bangladesh.

P.S. To avoid censor I am trying to get this posted from India. It is very likely that I will have to leave the country very soon just to save myself from the hands of Pak Troops.

\ ৫ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I was a permanent resident of Flat No. F-2/3 T & T Colony, Moghbazar Wireless, Dacca. Following the full scale Military operation in the city of Dacca driving out the Bengalees from their residences the non-Bengalees flant into the cities from outlined districts and have been occupied all the Hindu houses deserted by the occupants on allotment by the Army authority vis. Brig. Formannar. The non-Bengali policemen constantly harassing the Bengalees and whenever a grenade explodes anywhere the Pak troops surrounds the area. In this way the troops surrounded Jatra Bari and Gopi Bag area at night, arrested all young men found there, and took them away never to return. The Pak troops in civil dress but quite well armed raided Razarbag area, entered in to private houses and raped women. This happened in the last week. The Pak troops carried on the same process in the Norshingdhi area in the same week. The non-Bengalee i.e. West Pakistani policemen round about New Market and teased Bengali girls if any other found and more often than not take them away forcibly.

Sd/-
M. Nurul Amin
22-6-71

\ ৬ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva
Switzerland, Europe.

I am a 21 years old M A Students of the Dacca University. My father's name is Mvi. Sabje Ali. We are permanent resident of Chalna under P.O. Charshindur, Ploice Statin-Kaligonj in the district of Dacca within Bangladesh.

On 25.3.71 night I was at Malibagh. At about 12.00 at night Rajarbag Police Line were attacked by the Pakistani troops in full force armed with all modern heavy and light weapons. Next morning we passed by Rajarbagh and saw innumerable dead bodies. Some mutilated lying scattered and the Tin shed accommodating Police men burnt and destroyed. On 26-3-71 I Went to and visited Iqbal Hall, S.M. Hall, Jagannath Hall and Rokeya Hall. I saw the Iqbal Hall partly destroyed. The students killed by the Pakistani troops were left on the street and their books were scattered in the field. The entire office of the S. M. Hall were burnt. The Jagannath Hall suffered Worst destruction Large number of students were killed in that Hall. Fire were set to the ground floor of Rokeya Hall. The Pakistani troops destroyed all the Sahid Minars and constructed a Mosque at the side of the Central Shahid Minar.

Last month the Pak troops destroyed the entire Narshingdi Bazar by shelling and setting fire. With the help of local miscreants the Pakistani troops annihilated all the Hindus and destroyed all their properties and also destroyed the Shahid Miniar, Schools and Colleges there.

The Pakistani troops visit the neighboring villages in search of student, catch them if found, kill them and take away the girls they find and rape them. The Pakistani troops established camps at Narsingdi, Palash, Ghorasal. They go out and catch people and kill them. After they catch the young men they draw out blood from their body till their death. All the Hindu and Muslim housed of villages Purulia, Zinardi and Kashwalla have been burnt and 400/500 persons Hindus, Muslims, men and women have been killed by the Pak troops. The High school at Raipura has been burnt and the Shahid Minar there has been demolished.

The Students, the Hindus, the Awami League people and the women are the worst victim. The Biharis, they utterly defeated Muslim League people, Jamat-e-Islam boys lead by Prof. Yousuf Ali of Jamat and Mahtabuddin of Muslim League have been receiving rifle training and they roam about looting properties and extracting money from the innocent people. These people in this way avenge their miserable defeat in the last

election and the Pakistani troops are using them to suit their purpose. The Pakistani troops methodically eliminating the intelligentsia.

May we hope that your Organisation in the name of humanity and human values your lofty ideas rise to the occasion.

Yours faithfully,
Abdul Kader
21-6-71

We fully corroborate the above statement since we had witnessed the gruesome incidents.

Abu Mohammad Shadullah
Final Year Examinee
Civil Engineering

Md. Ibrahim Mia
2nd Year
Dacca College, Dacca.
23-6-71

\ ৭ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva
Switzerland,
Europe.

Sir,

I was a court Sub-Inspector of Police at Sadar Noakhali, Maijdee having residence at Govt. Flat No. 9/B. Owing to the atrocities committed by the Pakistani troops at Maijdee we took shelter in my daughter's house at Bartali, within P. S. Lakshipur in the district of Noakhali.

On 7-5-71 the Pakistani troops came and burnt the house of my daughter. Those Pak forces burnt the Hindu houses including that of Dhirendra Nath Dutt.

The Pak forces fired indiscriminately on paddy fields killing both Hindu and Muslim cultivations. On 7-5-71 the Pak troops burnt 21 houses of both communities and killed 30/32 Hindus and Muslims. On 9-5-71, the Pak troops burnt one washerman's house and shot dead three persons there. On the same day, the house of Niranjgan Banarjee of Mandari Bazar and that of Advocate M. Ahmed Ullah were burnt and one Barek Majhi was killed. On the same day the Pak troops killed sweeper when on physical examination he was found to have been a Hindu.

On 7-5-71, the Pak troops entered into Battali village and raped four Muslim women.

Sd/- Ranendra Chandra Dey
3.6.71

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I was a permanent resident of village Ulwon, P. S. Tejgaon, Dacca in Bangladesh formerly known as East Pakistan.

On 11-5-71 three armed soldiers of Pakistan Army entered into the house of my neighbor Mr. Kader and two of them forcibly dragged away his young daughter. On hearing the cries of his daughter Mr. Kader rushed to her rescue and grappled with the other armed soldier. But he was also forcibly taken out and the Pakistan troops assaulted him mercilessly and wounded him by Bayonets. They assaulted the daughter and left her.

One Peace Committee member Mr. Golam Azam in vain complained to the Military Authorities.

The Pak troops entered into shops, lifted goods but did not pay except for occasional small payments.

One Awal who is lamed and the Union Committee Chairman invited the Pakistani troops to village Baira P.S. Tejgaon alleging presence of Mukti Fouj there. The Pakistani Troops came and killed about 500 to 600 persons all Namasudras (Scheduled Cast) and the other collaborators of the Pakistani troops caught hold of passers by, took away all their money and assaulted them.

These are for your information and action.

YOurs Sincerely,
Sd/-
Supal Chandra Das
10-6-71

N.B. To save my life I escaped to Agartala in India and I am posting this letter.

\ ৯ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva
Switzerland,
EUROPE.

Sir,

I am a 19-year-old B.Sc Examinee from Tularam College Narayanganj, Dacca. On 27-3-71, the Pakistani soldiers launched attack on Narayanganj with heavy weapons destroying whatever fell on their path. Like others, I also left my permanent residence at Nayamati, in Narayanganj Town and came to Gopchar. As a result of indiscriminate firing from heavy weapons two young girls were lying dead on Gopchar field. I crossed Dhaleswari river and saw fleeing people including many injured. At last I could find my family members. After three days I went back to Narayanganj undertaking very risk and found our house completely tooted even my books not excluded. I saw the Awami League Office at Narayanganj severely damaged and many houses burnt to ashes. I saw a good number of dead bodies lying-at the Railway crossing. I also saw all the houses of Palpara and Debagram burnt and destroyed. I saw dead bodies which like the other ones but the result of indiscriminate shooting by the Pakistani soldiers at Baburail. At Sreenagar Police Station through which I retreated I saw all the Hindu houses burnt and all the Hindus available there' killed by the Pakistani soldiers.

The Pakistani soldiers oppressed and killed whomsoever they consider Awami League supporter.

The Pak troops looted the houses of Jogesh doctor at Singpara and got the adjacent houses by the local miscreants. The Pak soldiers also looted the Dispensary of Dr. Jogesh.

I solicit prompt action to stop the unprecedented genocide.

Yours sincerely,
Sree Gopal Krishna Guha
22-6-71
S/o. Monorangaj Guha,
Nayamati, Narayanganj Town
Dacca.

\ ১০ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I used to live with my husband Amal Kanti Sarkar at No. 4/B-L, Dacca, Sahajahanpur Rly. Colony, Dacca.

Two days back I crossed into tripura border. After 25-3-71 we continued to stay at our Dacca residence. In the very early part of April at about 8/9 A.M. my husband went out and I went to my neighbour Mr. Idris Ali's house. The Pakistani troops looted our house. It was then 10 A.M. my husband did not return. My host Mr. Idris Ali arranged to send me to the Indian border. In June last the Pak troops came in jeeps raided demra area set fire to the houses, killed people by gun fire and took away women and girls of both communities. The people did no more reutrn. The Pak troops drew out blood from young men who were killed in the process. The Pak troops collected girls and kept them confined in a building in Demra. The Pak troops killed 7 persons and burnt houses in Sadarghat area.

Sd/- Dipali Rani Sarker
24-7-71

\ ১১ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I was a permanent resident of P.O. & village Narsingdi, Dacca. After the bombing of Narsingdi on 28the March, 1971 from Air I crossed into Agartala in India and have been residing in the care of Gouranga Chandra Saha of Nazirpukurpar, Agartala. Entire Narsingdi Bazar have burnt in course of bombing on 28-3-71 and 29th Mrch, 1971 as a result at least 100 people were killed. Following these actions by the Pak Armed forces we moved 5 miles away but had to leave the place for fear of the anti-social elements who were engaged by the Pak troops to perpetrate all sorts of crimes. In course of time we reached Bazidpur from where we had to move again for the same reason. We reached Halajia where also the Pak troops came and killed 5 persons and looted the houses. We hided ourselves in the Jute filed. 35 girls were taken away by the Pakistani troops from

Bazidpur. Those unfortunate girls did no more return. The same story was to be witnessed almost everywhere.

I may mention that I was a student of Narsingdi College. I am 223 year old. These are for your information and action.

Sd/-
Swapan Kumar Saha
18-6-71

\ ১২ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

My name is Kalimuddin Mia S/o. Salim Ali, age 35 Village Jinjira, Distt. Dacca.

Our house was on the other side of Buriganga near the river. On April 2, at night, all on a sudden Pakistan troops stared shelling our village from the city side of the river. Some of them crossed the river and by that time many of us stated fleeing. I had my old mother and my wife and children to look after. By the time the army arrived I could not manage to get everybody out. Six army men entered our house, shot to death without saying anything my children and my mother and took away my wife Amina Bibi. When they entered the house I was just outside packing up some belongings to take with us when we decided to leave. This all happened in 2/3 minutes. When I looked through the window I saw the army men were taking away my wife.

Sd/- Kalimuddin Mia
4-8-71

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকার
॥ ঢাকা বিভাগ ॥

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ	বাংলা একাডেমী দলিলপত্র	১৯৭২-৭৪

\ ১ \

শ্রীমতী বাসন্তী রাণী গুহঠাকুরতা
স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান গার্লস হাইস্কুল,
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-৪

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ সেই কালরাতে আমরা স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিনের মত খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই রাত নয়টার সময় রেডিও খুলে বসে ছিলাম। ঢাকা রেডিও থেকে আমরা সে রাতে দুর্যোগের কোন পূর্বাভাস পাই নাই। ভয়েস অব আমেরিকা-এর সংবাদ শুনে আমার স্বামী ড. জ্যেতির্ময় গুহঠাকুরতা মেয়ে 'মেঘনার' ঘরে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম, এ, প্রিলিমিনারী এবং অনার্স পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখতে বসলেন। অকস্মাৎ জনতার দুপদাপ শব্দ শুনে আমার স্বামী এবং আমি দেওয়ালের বাইরে গিয়ে দেখলাম, জনতা রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় গাছ, পানির ট্যাঙ্ক ও ইট-পাটকেল দিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করছে। আমার স্বামী বিপদ বুঝতে পেরে আমাদের ফ্ল্যাটের প্রবেশপথ তালাবদ্ধ করেন। আমার স্বামী রাস্তার দিকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে ভারাক্রান্ত মনে ''বিপদ আরম্ভ হয়ে গেল'' বলে আবার মেয়ের কক্ষে গিয়ে খাতা দেখতে বসে গেলেন। আমি আজেবাজে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত বারটার দিকে অদূরে বোমার আওয়াজ শুনে জেগে উঠে দেখলাম, ইকবাল হল এবং রোকেয়া হলের দিক থেকে বোমার আওয়াজ ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে অসংখ্য লাইট বোমা আকাশকে আলোকিত করে দিচ্ছে, আলোর ফুলকিতে দেখলাম বোমা ও গুলি বর্ষিত হচ্ছে। আমরা দু'জন গুলি ও বোমার কানফাটা আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে খাটের তলায় বেড কভার বিছিয়ে নিরাপদে শুয়ে থেকে বর্বর পাক সেনাদের বীভৎসতার তাণ্ডব শুনছিলাম। পাশের কামরা থেকে আমাদের ঝিকে ডাকতে গেলে সে আসে না-আমরা সবাই গুলির অবিরাম গর্জনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ফ্ল্যাটটি কাঁপছিল-চারিদিকে দেখলাম লাইট বোমের আলোর ঝলকানি। হিস্ হিস্ শব্দ শুনে আমার গায়ের লোম শিউরে উঠলো-আমি উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম-আমার ফ্ল্যাটের প্রবেশপথের সামনে পাক সেনা-ভারী অস্ত্রবাহী সশস্ত্র আর্মি ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে-অল্পক্ষণ পরেই এক পাঞ্জাবী মেজর আমার গেটের লোহার জিঞ্জির হাত দিয়ে সজোরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে আমার মেয়ে মেঘনা'র কক্ষের জানালার মসকুইটো নেট বেয়নেট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে মাথা ঢুকিয়ে আমাকে দেখে এক দৌড় দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের দরজা ভেঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে। আমি আমার স্বামীকে বললাম, পাক সেনারা আমাদের ফ্ল্যাট ঘেরাও

করেছে-আমরা বিপদগ্রস্থ, বিপন্ন। আমার স্বামী আমার মেয়েকে অন্য কামরায় গিয়ে শুয়ে থাকতে বললেন, পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাদের কামরার দরজায় বুটের লাথি মারছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে আমার স্বামীকে বললাম, পাক সেনারা এসে গেছে, হয়তো তোমাকে গ্রেফতার করবে, তুমি তৈরি হয়ে নাও, বলে একটি পাঞ্জাবী তার হাতে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে ঘরে এসে দেখলাম-রান্নাঘরের পাশে বারান্দার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আমার 'আয়াকে' কনুইয়ের আঘাতে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো ''প্রফেসার সাহাব হায়?'' আমি নিরুপায় হয়ে সত্য কথা বললাম, ''হায়''। পাঞ্জাবী মেজর আবার বললো, উনকো লে যায়েগা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''কাহা লে যায়েগা?'' আমার কথার কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়ে অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বললো, ''লে যায়েগা''। আমার সাথে সাথে মেজর চলতে চলতে বলতে লাগলো, ''ফ্লাটমে আওর কই জোয়ান আদমী হায়?'' আমি বললাম-''নাহি, ত হামারা একহী লাড়কি হায়।'' একথা শুনে মেজর বললো, ''ঠিক হায়, লাড়কি কা ডার নাহি হায়''-আমার সাথে আমার স্বামী যে কামরায় ছিলেন সেই কামরায় প্রবেশ করে আমার স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুঠাকুরতাকে বাম হাতে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, ''আপ প্রফেসর সাহাব হায়?'' আমার স্বামী উত্তরে ইংরেজীতে বললেন, ''ইয়েস''। পাঞ্জাবী মেজর বললো, ''আপকো লে যায়েগা''। আমার স্বামী মোটা গলায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, ''হোয়াই'' মেজর তার প্রশ্নের কোন জওয়াব না দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে গেল-তাদের আমি পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়ে তাদেরকে আর দেখতে না পেয়ে কামরায় ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে দেখলাম সবকিছু বিকল অচল হয়ে আছে। আমি এ সময় সবই বুঝতে পারলাম-আমরা বিপদগ্রস্ত, বিপন্ন। ফিরে দেখলাম-উপর তলার সিড়ির শেষ মাথায় মিসেস মনিরুজ্জামানকে পাঞ্জাবী জোয়ানরা ''যাও, যাও, হাঁটো'' বলে তাড়া দিচ্ছে। ইতিপূর্বেই পাকসেনারা ড. মনিরুজ্জামান, তার ছেলে, তার ভাগনে এবং প্রতেবশী যুকবকে টানাটানি করে ঠেলে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসার জন্য জোরাজুরি করছিল। মিসেস জামান সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে আমাকে বললেন, পাকসেনারা ওদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম নিয়ে যেতে দিন ওদেরকে বাধা দিয়ে লাভ নাই-ওরা আমাদের ভাষা বুঝে না-জোরাজুরি করলে মেরে ফেলতে পারে। এ কথা বলতে বলতে বাইরে আমি দুটি গুলির আওয়াজ শুনে দৌড়ে বালিশ হাতে অদুরে দাঁড়ানো মেয়েকে ধরতে গিয়ে পরপর আটটি গুলির শব্দ শুনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম-সিঁরি নিচে চারজনের দেহ গুলিবিদ্ধ হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে-। গুলিবর্ষণ করার পরক্ষণেই পাকসেনারা সবাইকে কার্ফু জারীর কথা ঘোষণা করে, দ্রুত ট্রাকগুলি নিয়ে চলে গেল-। মিসেস মনিরুজ্জামান তেতলা থেকে পানি নিয়ে এসে গুলিবিদ্ধ সবাইকে খাওয়ালেন-তিনি দৌড়ে এসে বললেন ''দিদি আপনার সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন, আমার সাথে কথা বলছেন, তিনি বাঁচবেন। একথা শুনে আমি এবং আমার মেয়ে ''মেঘনা'' দৌড়ে আমার স্বামীর গুলিবিদ্ধ দেহের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখলাম-আমার স্বামীর দেহ গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছ। তিনি বলছিলেন, ''ওরা আমাকে গুলি করেছে, আমার শরীর প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে যাও।'' আমি কান্নার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম শুধু হায় হায় শব্দ করছিলাম। দোতলায় যে ফ্ল্যাটে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এবং অধ্যাপক আনিস সাহেব থাকতেন তাদের ব্লকের প্রবেশপথে অটোমেটিক তালা ঝুলতে থাকায় পাকসেনারা সেখানে প্রবেশ করে নাই। পাকসেনারা চলে যাওয়ার চলে যাওয়ার পরও ওরা কেউ আমাদের অসহায় চিৎকার শুনেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নাই। আমরা কোন রকমে আমার স্বামীর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ ধরাধরি করে আমাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে বারান্দার খাটে এলিয়ে দিলাম-আমার স্বামী জ্ঞান হারান নাই তখনও। আমার মেয়ে ''মেঘনা'' মনিরুজ্জামান সাহেবের ভাগনের পানি পানি বলে অসহায় আর্তনাদ শুনে আমাকে নিয়ে তার মুখে শেষ পানি দিয়ে আসলো। পরক্ষণেই ছেলেটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দূরে-অদূরে বৃষ্টির মত অবিরাম গুলি বর্ষণ করছিল পাকসেনারা। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম পাকসেনারা জগন্নাথ হলের পূর্বদিকে ছাত্রদের কেন্টিনে আগুন লাগিয়ে দেয়-মাঝে মাঝে পাকসেনাদের সামরিক ট্রাকগুলি টহল দিচ্ছিল। চারিদিকে শ্মশানের হাহাকার। পরের দিন ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ এবং ২৭ শে মার্চ সকাল

পর্যন্ত আমার স্বামীর ক্ষত বেয়ে রক্ত ঝরছিল-বাইরে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পারি নাই।

১৯৭১ সনের ২৭ শে মার্চ সকালে কতিপয় লোকের সাহায্যে আমার স্বামীকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করি। হাসপাতালে কোন লোকজন ও ডাক্তার ছিল না। দায়িত্বরত নার্সরা সাধ্যমত আমার স্বামীর সেবাযত্ন করেছে। ১৯৭১ সনের ৩০ শে মার্চ বিনা চিকিৎসায় আমার স্বামী মৃত্যবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি তার মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে আনার অনুমতি পাই নাই-তার পবিত্র মৃতদেহের সৎকার করতে পারি নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই পাকসেনারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে-আমি স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে আসার কোন উপায় না দেখে ডাক্তারদের উপদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ড. মালেকের বড় ভাই আব্দুল বারি সাহেবের স্ত্রীর সাথে তাদের গাড়ীতে আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী ড. এম এ, ওয়াহিদ সাহেবের ২০ নং ধানমণ্ডিস্থ বাসায় আশ্রয় লাভ করি। আমার স্বামীর লাশ চার দিন হাসপাতালে পড়েছিল-আমাদের ড্রাইভার ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত হাসপাতালের ওয়ার্ডের বারান্দায় আমার স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুঠাকুরতার মৃতদেহ দেখে এসেছে।

স্বাক্ষর
বাসন্তী গুঠাকুরতা
২০-৫-৭৪

\২\

ডঃ মোহাম্মদ আজহার আলী
সহকারী অধ্যাপক
প্রাইমারী শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারের ১৪/এইচ ফ্লাটে সপরিবারে অবস্থান করছিলাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাবে অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপকদের সাথে বসেছিলাম। রাত নয়টার সময় প্রতিদিনের মত স্বাভাবিকভাবে আমরা ক্লাব ছেড়ে যার যার ফ্লাটে চলে গিয়েছিলাম। খাও দাওয়া করে আমরা সবাই শুয়ে পড়েছিলাম। রাত আনুমানিক বারটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও স্টাফ কোয়ার্টারের চারিদিক থেকে অকস্মাৎ বৃষ্টির মত অবিরাম গুলিবর্ষণের শব্দ শুনে জেগে উঠি। চার তলার অপর পাশে ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের অফিস সেক্রেটারী মিঃ মনসুর আহমেদ সাহেব সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। আমি, আমার স্ত্রী, আমার আড়াই বছরের ছেলেটি এবং আমার ভাতিজা, কাজের ছেলে সবাই আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের বিভীষিকাময় শব্দে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বসেছিলাম। সারারাত আমরা গুলিবর্ষণের আওয়া শুনেছি। সারারাত আমরা দরজা-জানালা বন্ধ করে বসেছিলাম-১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ সকাল ছয়টায় গুলিবর্ষণের গতি কমে গিয়েছিল। কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখলাম-সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের এলাকার প্রবেশ পথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। পাঞ্জাবী সেনারা ১১ এবং ১২ নম্বর ফ্লাটে প্রবেশ করে এলাপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এসময় আমার ফ্লাটের নীচে অবস্থানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিকেল অফিসার ডাঃ মুর্তজা স্টেথোস্কোপ গলায় রেখে বাইরে পায়চারী করছিলেন। পাঞ্জাবী সেনারা ডাঃ মুর্তজা এবং অন্যান্য আরও তিনজনকে ১২ নং ফ্লাট থেকে লাশ তুলে বাহিরে নিয়ে রাখার নির্দেশ দান করে। ডাঃ মুর্তজাকে ও অন্যান্য লোকজনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোকতাদির সাহেবের লাশ বের করতে দেখলাম। ইহার পর পাক সেনারা ১১ নং ফ্লাটে প্রবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেবরেটরী স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেককে হত্যা করে। সাদেক সাহেবের লাশ পাক সেনারা ফেলে রেখে যায়। বিকাল চারটার সময় সাদেক সাহেবের পরিবার আমাদের ফ্লাটে চলে আসে। ২৬শে মার্চ সারাদিন সারারাত আমরা যার যার ফ্লাটে আটকা পড়েছিলাম। ২৭ শে মার্চ সকালে কার্ফু উঠিয়ে নিলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে সবাই নিরাপদ স্থানে যেতে থাকে। ১১ নং ফ্লাটের নীচ তলায় সাদেক সাহেবের লাশ পড়েছিল। বিভিন্ন ফ্লাট থেকে ফ্রিজের পানি এনে লাশের উপর দেওয়া হয়। সাদেক সাহেবের স্ত্রী, শ্যালক, ভাই, চার ছেলেমেয়ে লাশের চারদিকে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছিল। আমি আমার এবং সাদেক সাহেবের পরিবার অন্যত্র সরিয়ে রেখে ১১ নং ফ্লাটের দক্ষিণ পার্শ্বে সাদেক সাহেবের লাশ সমাহিত করি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আজহার আলী
৮-৬-৭৪

\ ৩ \

ইব্রাহিম ভূইয়া
লাইব্রেরীয়ান, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি গ্রামের বাড়ী যাওয়ার জন্য ঢাকা সদরঘাটের দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। সদর ঘাট টার্মিনালের প্রবেশ পথে পাঞ্জাবী সেনাদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক মুন্সিগঞ্জ যাওয়ার জন্য টার্মিনালে আসলেন। সঙ্গে তার নবপরিণিতা পুত্রবধূ এবং যুবতী মেয়ে ছিল। পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের সবাইকে তল্লাশি করতে বললো ''ইয়ে দো আওরাত নাহি যায়েগী''। বৃদ্ধ নিরুপায় হয়ে কান্নাকাটি করে সামনে যাকে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, ''আপনারা আমার মেয়ে ও পুত্রবধুকে বাঁচান।'' কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেই অসহায় যুবতী মেয়ে দু'জনকে রক্ষা করার জন্য কোন কথা বলতে পারি নাই, কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের সকলের চোখের সামনে পাঞ্জাবী সেনারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যুবতী মেয়ে দু'টিকে টেনে হিঁচড়িয়ে ওদের আর্মি ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। মেয়ে দু'টি এ সময় করুণ আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়েছিল। দু'ঘণ্টা পর আবার যুবতী মেয়ে দু'টিকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম, মেয়ে দুটির চলার কোন শক্তি নাই, এলোমেলো চুল, অশ্রুভরা মুখমণ্ডল। আমরা লঞ্চে রওয়ানা হয়ে গেলাম। 'পাগলার' এম, এম ওয়েল পার্ক আর্মি ঘাঁটিতে আমাদের লঞ্চ আটকিয়ে তল্লাশী চালানো হয়-পাক সেনারা যাত্রীদের মুল্যবান মালমাল লুট করে নিয়ে যায়। লঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম-ওদের কামরার জানালার সম্মুখে চারটি বাঙ্গালী যুবতী মেয়ে এলোমেলো চুলে করুণ ও অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়ে তাদের দেহের যুতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হলো তাদেরকে বিবস্ত্র করে রাখা হয়েছে। বুড়ীগঙ্গা নদীতে ১৫-২০ জন করে এক সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা বাঙ্গালী যুবকদের বহু লাশ ভাসতে দেখলাম।

১৯৭১ সনের অক্টোবর মাসের এক দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমি বাগড়া বাজারে গিয়েছিলাম বাজার করতে। বহু লোকের সমাগম ছিল। বাজারের দক্ষিণ দিকে পদ্মা নদী। পূর্বের দিন সন্ধ্যায় পাক সেনাদের নোঙ্গর করা স্টিমারটি পদ্মার ঘাট ছেড়ে চলে যাচ্ছিল-স্টিমারের চারিদিকে সশস্ত্র পাক সেনারা প্রহরায় মোতায়েন ছিল। অকস্মাৎ দেখলাম পাক সেনারা স্টিমার থেকে সজোরে টেনে একটি লাশ ফেলে দিচ্ছে-স্টিমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর আমরা নৌকা নিয়ে গিয়ে দেখলাম এক ক্ষত বিক্ষত যুবতীর বীভৎস উলঙ্গ লাশ। এছাড়া কাশবনের পাড়ে পড়ে আছে ফোলা বীভৎস লালের গালে ও দেহের অন্যান্য স্থানে ক্ষত চিহ্ন দেখলাম। তাঁর ডান দিকের স্থনের বোটা তুলে নেওয়া হয়েছে।

স্বাক্ষর /-
ইব্রাহিম ভূইয়া
৮/৬/৭৪

শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক, বি, এ,
পিতা মৃত শ্রী বীর চন্দ্র বসাক
১৮, তাঁতী বাজার লেন, ঢাকা-১

আমি ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে আমার ১৮, তাঁতীবাজারস্থিত বাসায় ছিলাম। রাত বারটায় উত্তর দিক থেকে অকস্মাৎ কামানের আকাশফাটা গর্জন শুনে আমি তেতলার ছাদের উপর দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাসসমূহে আগুনের ফুলকি ও লক্ষ লক্ষ গুলির আগুনের ফুলকি আকাশ ভরে গেছে। অনবরত কামানের ভয়াল ও ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছে। উত্তর দিকে আকাশে দেখলাম, একটা ঘোলাটে বেলুনের মত আগুনের বিরাট পিণ্ড পশ্চিম দিক থেকে আস্তে আস্তে উঠে পূর্বদিক দিয়ে গভর্নর হাউসের কাছে এসে নেমে পড়লো। এই সময় দেখলাম-চারিদিকে জনপদ, বস্তি এলাকায় আগুন আর আগুন জ্বলছে, বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ হচ্ছে কামানের কানফাটা গর্জন ভেসে আসছে। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম- গুলির আওয়াজ ক্রমে ক্রমে গুলিস্তান থেকে নওয়াবপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই সদরঘাট খৃষ্টানদের গীর্জার সম্মুখে সামরিক গাড়ী ও ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর আওয়াজ শুনলাম। এসময় শতকণ্ঠের ''মাগো, বাবাগো, বাঁচাও বাঁচাও,'' আর্তনাদ শুনলাম। শাঁখারী বাজারের সকল হিন্দু জনতা যার যার ছাদে দাঁড়িয়ে এ বীভৎস কাণ্ড দেখছিল। কিছুক্ষণ পর সদরঘাট টার্মিনালে ভীষণ গুলিবর্ষনের শব্দ শুনলাম। রাত দু'টার সময় মাইকে ঘোষণা করা হলো- রাজধানী ঢাকায় ২৬শে মার্চ ভোর পর্যন্ত কার্ফু জারী করা হয়েছে, যার যার বাড়ীতে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীন বাংলার পতাকা আছে তা' অবিলম্বে নামিয়ে ফেলে সে স্থানে পাকিস্তানের পতাকা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। রাত দু'টার পর রাজধানীর পূর্বদিক থেকে আর একটি জ্বলন্ত বেলুনের মত ঝলমলে গ্লোব পূর্ব আকাশ থেকে উঠে আস্তে আস্তে সোজা পশ্চিমে ভেসে গিয়ে মিশে যেতে দেখলাম। ইহার পর আর একটি গুলির আওয়াজও কানে আসে নাই। চারিদিকে নীরব, নিস্তব্ধ, শ্মশানের হাহাকার, আগুন আর আগুন জ্বলছে, জ্বলছে দেখলাম রাজধানী ঢাকার চারিদিকে জনপদ ও বস্তি এলাকা জ্বলছে।

২৭শে মার্চ সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়ার পর শুনলাম শাঁখারী বাজারের কোর্টের প্রবেশ পথের একটি বাড়ীতে দশজন হিন্দুকে এই ঘরে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং ডঃ শৈলেন সেনকে গ্রেফতার করে জগন্নাথ কলেজের পাক সেনাদের ছাউনিতে আটক করা হয়েছে। ইংলিশ রোড দিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখলাম ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোডের দুই পাশের কোটি কোটি টাকার কাঠের কারখান ও মেশিনপত্র ভস্ম হয়ে পাক সেনাদের বীভৎসতার স্বাক্ষর হয়ে পড়ে আছে- দুই পার্শ্বের বাণিজ্য এলাকার সকল দোকান ও বাণিজ্য কেন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে। রাস্তাঘাট শূন্য, কোথাও কোন মানুষ নেই আমি কাজী আলাউদ্দিন রোড হয়ে বাবুপুরা ফাঁড়িতে দেখলাম আটজন পুলিশী পোষাক পরা লাশ গুলিতে ঝাঁঝড়া হয়ে ফাঁড়ির বারান্দায় ও রাস্তায় বিকৃতভাবে পড়ে আচে। রেল লাইনের দুই পাশের বস্তি এলাকা ভস্ম ছাই হয়ে পড়ে আচে, দেখলাম চারদিক জনমানবশূন্য। আমি দ্রুত আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জি, কে, নাথ, সংস্কৃতের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রী পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের খোঁজে জগন্নাথ হলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম জগন্নাথ হলের চারিদিকের দেওয়াল লক্ষ লক্ষ গুলির আঘাতে ঝাঁঝড়া হয়ে আছে। হলের কাঁচের জানালাসমূহ ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। হলের পুকুর পাড় দিয়ে আমি অগ্রসর হওয়ার সময় দেখলাম হঠাৎ পুকুরের মধ্য হতে একজন মানুষের মাথা উপরের দিকে উঠার চেষ্টা করছে, ভীতসন্ত্রস্ত, দিশাহারা উন্মাদের মত হয়ে পানি থেকে মাথা তুলে ক্রন্দন ও বুকে চপেটাঘাত করতে করতে বলতে লাগলেন, ''দাদা ওদিকে যাবেন না, ওরা আমাদের সব মেরে ফেলেছে।'' আমি লোকটিকে উন্মাদ মনে করে তার কথায় কান দেই

নাই। আমি আরও অগ্রসর হয়ে হলের কেন্টিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি প্রাণিও নাই- নীরব, নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য। কেন্টিনের মধ্য দিয়ে হলের নর্থ হাউসে প্রবেশ করে সিঁড়ির নিকটে দেখলাম- একজন হিন্দু যুবকের লাশ পড়ে আছে- মাথার চুল আগুনে পোড়া, সারা দেহ গুলিতে ঝাঁঝড়া, আমি দোতলায় না উঠে সোজা রাস্তায় নেমে পড়ে হলের শহীদ মিনারের সামনে এসে দেখলাম- শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। শহীদ মিনারের পিছনেই সদ্য মাটি তোলা একশত ফুট লম্বা এক বিরাট গর্ত দেখলাম- গর্তটি কিছুক্ষণ পূর্বেই মাটি দিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে। গর্তের উপর মাটি ভেদ করে কারো কারো হাতের পাঞ্জা, পায়ের আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে। আমি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে হলের শেষ মাথায় লোহার গেটে পৌছলে পিছন থেকে একটি দিশাহারা কর্কশ নারীকণ্ঠ চিৎকার করে বললেন, ''আপ কাহাপর যাতে?'' আমি সেই কণ্ঠের দিকে নজর না দিয়ে শামসুন্নাহার হলের দিকে অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ হলের হাউস টিউটর মিঃ জি, কে, নাথ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, এবং পরেশ মণ্ডলের কোয়ার্টারের প্রবেশপথে গিয়ে দেখলাম- কোয়ার্টারের দরজা জানালা সব খোলা, জনমানবশূন্য, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখলাম- দোতালা থেকে পচা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, সিঁড়ির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত রক্তের চিহ্ন জমাট হয়ে আছে। আমি এ পচা-দুর্গন্ধ ও জমাট রক্ত দেখে আর উপরে উঠতে পারি নাই। বন্ধুদের খোঁজ করতে গিয়ে এখানেই আমি প্রথম ভয় পেলাম এবং ভড়কে গেলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে। আমার উপর উঠতে সাহস হল না আমি নিচে নেমে আসলাম এবং ভীত সন্ত্রস্তভাবে যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ দিয়ে দ্রুত ফিরে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তা ধরে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথে জগন্নাথ হলের একজন চাপরাশীর সাক্ষাৎ পেলাম। সে বললো আমাদের হলের প্রভোষ্ট ডঃ জোতির্ময় গুহঠাকুরতা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালের দোতলায় ৯নং কক্ষে আছেন, তিনি জীবিত আছেন। আপনি তার সাথে সাক্ষাৎ করুন। আমি হাসপাতালের দোতলার ৯নং কামরায় প্রবেশ করতেই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আহত হলের একজন যুবক ছাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করতে করতে বলতে থাকলেন দাদা আমি কি বেঁচে আছি? দেখেন আমাকে ওরা গুলি করেছে। ঐ যে দেখুন জোতির্ময় বাবু- তাকেও পশুরা গুলি করেছে। আমি তাকে উন্মাদের মত মনে করলাম, তার অসংলগ্ন কথাবর্তায় বুঝতে পারলাম সে প্রকৃতিস্থ নয়। আমি আরও অগ্রসর হয়ে দেখলাম জোতির্ময় বাবু শুয়ে আছেন জ্ঞানহারা, মাঝে মাঝে দীর্ঘ চাপা নিশ্বাস ফেলছেন এবং মাঝে মাঝে তিনি চক্ষু খুলে বন্ধ করে ফেলছেন। আমি অনেকক্ষণ তার শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে তার করুণ অবস্থা দেখলাম। তিনি একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''কে''? আমি বললাম ''আমি বসাক, আমি পূর্ণ বাবু''। তিনি উত্তরে বললেন ''ও''। একটুপরেই বিড় বিড় করে বললে, ''ডঃ গবিন্দবাবু, ডঃ গোবিন্দ বাবু ইজ প্রসিডিং ওয়েল।'' একথা বলেই তিনি জ্ঞানহারা হয়ে গেলেন, সংগা হারিয়ে ফেললেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার এই অন্তিম দৃশ্য দেখছিলাম। একটু পরেই বারান্দা হতে তার স্ত্রী বাসন্তী দেবী ক্রন্দনরতা অবস্থায় কাতরকণ্ঠে বললেন, ''দাদা, আপনি এসেছেন, আমাকে একটু সাহায্য করুন। কাল থেকে এ হাসপাতলে কিছুই নাই, আমাকে একটি এক্সরে প্লেট যোগাড় করে দিন।'' আমি উত্তরে বললাম ''দাস কোম্পানীর দোকান খোলা পেলে এখনি এনে দিচ্ছি''- বলে তাকে প্রবোধ দিলাম। আমি তাকে ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সমস্ত ঘটনা বললেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম গুলি কোথায় কোথায় লেগেছে? উত্তরে বললে, ঘাড়ে একটি গুলবিদ্ধ হয়ে ঘাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। পেটে নাভির কাছে ব্যথার যন্ত্রণার কথা বলেছেন। বোধয় পেটের ভিতরও গুলি লেগেছে। আমি তাকে সন্ত্বনা দিয়ে চলে আসলাম। প্রবেশ পথে আসলে হলের সেই আহত গুলিবিদ্ধ ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলাম ''তুমি কি করে বাঁচলে?'' সে বলতে লাগলো, খান সেনারা ভারী অস্ত্র দিয়ে রাত বারটার দিকে আমাদের হলের গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কামরা ও কক্ষে ব্যাপক তল্লাশী চালায়- হল বন্ধ থাকলেও কতিপয় অনার্স পরীক্ষার্থী ও এম, এ, পরীক্ষার্তী প্রতিভাবান বিশ-পঁচিশ জন ছাত্র হলে অবস্থান করছিল। প্রত্যেক কক্ষে প্রবেশ করে যাকে যেখানে পেয়েছে তাকে সেখানেই গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছে, আমি সে সময় হলের বাথরুমে পালিয়েছিলাম। তারা আমাকে বাথরুমেই ধরে ফেলে, আমাকে ওরা ধরে বললো, ''তোমকো কুচ নেহি বলেগা,'' এবং দোতারা থেকে আরও তিনজন ছাত্রকে নামিয়ে নিয়ে এসে আবার বললো, ''ইয়ে দেখ তোমলোগ কো কুচ

নাহি করেগা। উপর যেতনা লাশ হায়, নীচে লে আও।'' আমরা চারজন তাদের নির্দেশ মত উপর থেকে সদস্য গুলিবিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত শহীদদের লাশ নীচে নিয়ে আসলাম। বীর শহীদদের সব লাশ আমরা শহীদ মিনারের গর্তের সামনে নিয়ে এসে দেখলাম - পাক সেনারা সশস্ত্রভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। লাশগুলি ওরা গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিল। হত্যাযজ্ঞ শেষে আরেকদল সৈন্য উপরে গিয়ে আবার তল্লাশি চালিয়ে ফিরে আসলো-আমাদের চারজনকে লাইন করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল- আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম লাইন করে, এরপর আমাদের উপর ওরা গলিবর্ষণ করতে লাগলো। আমাদের উপর গুলির শব্দ হওয়া মাত্র আমি মৃত ভান করে পড়ে গেলাম। বীর শহীদদের এই লাশের মধ্যে পড়ে থেকে দেখলাম- পাক সৈন্যরা আর্মি ট্রাক নিয়ে সদলবলে চলে গেল। চারদিকে চেয়ে দেখে যখন নিশ্চিন্ত হলাম তারা আর নাই- তখন সেই লাশের মধ্য হতে উঠে এক দৌড়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে এসেছি।

আমি বাড়ীতে এসে দেখলাম শাঁখারী বাজারে থমথমে ভাব- শাঁখারী বাজারের হিন্দু অধিবাসীগণ মনে করেছিল আর কোন হত্যাকাণ্ড হবে না। পাক পশুরা সাধারণ নাগরিকদের উপর পাইকারীভাবে হাত্যাকাণ্ড চালাবে না। আমরা আমাদের এলাকায় ২৭শে ও ২৮শে মার্চ দিনের বেলায় রাস্তায় কোন পাক সেনা দেখি নাই। কিন্তু কার্ফু আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে পাক সেনারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে। আমরা কয়েকদিন ছাদের উপর বসে থেকে ঢাকার চারদিকে শুধু গুলিবর্ষণের শব্দ শুনেছি এবং অগ্নিসংযোগ দেখেছি। চারদিকে শুধু আগুনের লেলিহান শিখা এবং গুলিবর্ষনের শব্দ শুনেছি। ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ গুজব ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিহারী জনতা হিন্দু মহল্লা হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র আমরা তাঁতীবাজার থেকে সকল হিন্দু পরিবার দলে দলে একযোগে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পল্লী এলাকায় চলে যাই। আমরা কেউ কারও সাথে কোন জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারি নাই- সবাই শূন্য হাতে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছি। কিশোর , শিশু, যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, সবাই শূন্য হাতে পালিয়েছে। নদীর অপর পার থেকে আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, ঢাকার জিন্দাবাহার মালিটোলা, বাবুবাজার এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ আরম্ভ হয়েছে। মূল্যবান জিনিসপত্র, সোনাদানা, তামা-কাঁসা, পিতল, কাপড়-চোপড়, খান, চকি, দরজা, জানালা সব কিছু তারা লুট করে নিয়ে গেছে। লুট হওয়ার পরক্ষণেই সশস্ত্র বিহারীরা একযোগে এস শাঁকারীবাজার, তাঁতীবাজার, সুতারনগর, গোপালনগরের সমস্ত হিন্দু বাড়ী দখল করে বসেছে। আমরা নয় মাস নদীর অপর পাড়ে বাঘৈর গ্রামে নিদারুণ দুরাবস্থায় অর্ধাহার অনাহারে কাটিয়েছি।

স্বাক্ষর/-
শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক
২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৮

\ ৫ \

আবদুল কুদ্দুস মিয়া
রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
বি, আর পি, হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগ, ঢাকা

১৯৭১ সনের ১৫ই মে থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশের জমায়েত করা হয়। পাঞ্জবী পুলিশ লাইনে এসেই আমাদের সাথে যথেচ্ছা ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়; কথায় কথায় পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশরা আমাদের বুটের লাথি ও বন্দুকের বাট দিয়ে পিটাতে থাকে, চোখ রাঙ্গিয়ে বলতে থাকে 'শুয়ারকা বাচ্চা, হিন্দুকা লাড়কা, বেইমান শালা লোগ, হামলোগ আদমী নাহি মাংতা, জামিন মাংতা''। আমাদেরকে হেডকোয়ার্টারের সকল কক্ষ থেকে কুকুর বিড়ালের মতো তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশদের জায়গা দেওযা হয়, আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, কাপড় আসবাবপত্র সব বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, আমরা অসহায়ের মত আমাদের আসবাব পত্র তুলে নিয়ে আসতাবলের সামনে, ব্যারাকের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করি। পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ রাজারবাগ আসার পরই বাঙ্গালীদের উপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসে। প্রতিদিন ''ইয়ে শালা লোগ মুক্তি হায়'' বলে বহু নিরীহ বাঙ্গালী যুবককে চোখ বেঁধে মিলিটারী ট্রাক ও জীপ থেকে আমাদের চোখের সামনে নামিয়ে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের উপর তলায় নিয়ে রাখা হয়। সারাদিন এভাবে চোখ বেঁধে বাঙ্গালী যুবকদের রাজারবাগ এনে জমায়েত করা হয় এবং সন্ধ্যার পর এ সব অসংখ্য বাঙ্গালী যুবককে মিলিটারী ট্রাকে করে ঢাকা সেনা নিবাসে নিয়ে হত্যা করা হয়। হেডকোয়ার্টারের তেতলা ও চারতলায় বহু যুবতী মেয়েকে উলঙ্গ করে রাখা হয়-পাঞ্জাবী সেনা ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এসব ধরে আনা বালিকা ও মহিলাদের উপর অবিরাম ধর্ষণ চালায়। লাইনে পুলিশের কলরবের জন্য আমারা অত্যাচারিত মেয়েদের ক্রন্দন রোল শুনতে পেতাম না- লাইনের দূরে গিয়ে দাঁড়ালেই ধর্ষিতা মেয়েদের আর্তনাদ ও আহজারি শুনতে পেতাম-রাতে ধর্ষিতা মেয়েদের বুকফাটা চিৎকারে আমরা কোয়ার্টারে ঘুমাতে পারতামনা- সারারাত পরিবার পরিজন নিয়ে জেগে থাকতাম। হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতা মেয়েদের আর্তনাদে আমরা বাঙ্গালী মেয়েদের দুর্দশা দেখে দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমরা ঐ সকল অসহায় মেয়েদের উদ্ধার করার জন্য কিছুই করি নাই, করতে পারি নাই, কারণ ওদেরকে উদ্ধার করার জন্য, ওদের অত্যাচারের সহানুভূতি ও দরদ দেখানোর কোন সুযোগ আমাদের ছিল না। হেডকোয়ার্টারের তেতলা ও চারতলায় যেখানে বাঙ্গালী মেয়েদের উলঙ্গ অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখে ধর্ষণ করা হতো সেখানে সব সময় পাঞ্জাবী সৈন্যরা প্রহরায় মোতায়েন থাকতো। সেখানে আমাদের প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। মিঃ বোস্তান খাঁ নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এ সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইনের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর ছিলেন। এই ভদ্রলোক আমাদের লাইনের দায়িত্বভার গ্রহন করার পর আমাদের উপর সর্বদিক দিয়ে অত্যাচার ও দমন নীতি আরম্ভ হয়ে যায়। পুলিশ লাইনে কখন আমাদের উপর মৃত্যুর করাল গ্রাস নেমে আসে, আমরা এ ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতাম। ১৯৭১ সনের ৪ঠা এপ্রিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে তৎকালীন ষ্টোর-ইন-চার্জ পুলিশ সার্জেন্ট মিঃ মুর্তজা হোসেন এবং সুবেদার আবুল হোসেন খান এবং সুবেদার মোস্তফাকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পাঞ্জাবী সেনারা এই তিনজন বাঙ্গালী পুলিশকে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার চালায়-পঞ্জাবী সেনারা এই তিনজন বাঙ্গালী পুলিশকে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার চালায়-পাঞ্জাবী সেনারা লাইন হয়ে ওদেরকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে ফুটবলের মত বুট দিয়ে লাথি মেরে খেলতে থাকে। ওদের তিন জনের দেহ লাঠি, বেত, বুট ও বেয়নেট দিয়ে গরুর মত পিটিয়ে চুরমার করে দেওয়া হয়, সারা দেহ চাক চাক করে কেটে দেওয়া হয়। ওদের দেহ রক্তাক্ত হয়ে একেবারে অবশ ও অচল হয়ে গেলে তাদের তিনজনকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওদের ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে যাকে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ

দেওয়া হয়েছিল, সেই পাঠান তাদেরকে ছেড়ে দেন। পদস্থ পাঞ্জাবী অফিসারদের তাদের হত্যা করার জন্য তিনটি ফাকা গুলির শব্দ শুনিয়ে দেয় এবং বন্দীদের বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকার জন্য বলা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি উপরোক্ত তিন সহকর্মীর নিটক উক্ত ঘটনা বিস্তারিত জানতে পেরেছি।

১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে ঢাকা রাজধানীতে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত অভিযানের মুখে আমরা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও পাঞ্জাবী সেনাদের বেসামাল অবস্থায় দেখতে পাই। বাংলাদেশ মুক্ত হলে মিত্রবাহিনী ও মুক্তি বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও পাঞ্জাবী সেনাদের বন্দী করে নিয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
আবদুল কুদ্দুস
২৬-৩-৭৪
রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ,
বি, আর, পি,
রাজারবাগ, ঢাকা।

\ ৬ \

সুবেদার খলিলুর রহমান
আর্মস এস আই, বি, আর পি,
রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ সকাল দশটায় আমরা মিল ব্যারাক পুলিম লাইনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রিয় পুলিশ সুপার মিঃ ই, এ, চৌধুরী, পুলিশ কমাণ্ডেন্ট মিঃ হাবিবুর রহমান, ডি, এস, পি, লোদী সাহেব, রেঞ্জ রিজার্ভ ইন্সপেক্টর মিঃ সৈয়দ বজলুল হক, ডি, এস, পি, আব্দুস সালাম, রিজাভ ইন্সপেক্টর মিঃ মতিয়ুর রহমান সবাইকে উপস্থিত দেখলাম। মিঃ ই, এ, চৌধুরী সাহেব ক্ষুধার্ত, আহত, ক্ষতবিক্ষত সিপাহীদের দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। লাইনে মুহূর্তে কান্নার রোল পড়ে গেল। তিনি লাইনের মধ্যে প্রবেশ করে প্রতিটি সিপাহীর আহত, ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখলেন, তার দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিল। তিনি অবিলম্বে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কোন অসুবিধা নাই, তোমরা নীরবে তোমাদের কাজ করে যাও।'' আমি তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবো।

আমার সাথে আমার আরও তিনজন সুবেদার, সুবেদার সফিকুর রহমানের সহকর্মীর সাথে আটজন হাবিলদার- মোঃ ফজলুল হক, আঃ ওয়াদুদ, আব্দুল কুদ্দুস ও অন্যান্য বিশজন পুলিশ কনেষ্টবল দিয়ে ঢাকা কোতোয়ালী থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমরা থানায় প্রবেশ করে দেওয়ালে, মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেলাম, দেখলাম থানার দেওয়াল গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া হয়ে আছে, বুড়ীঙ্গার পাড়ে অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ পেলাম, আমাদের পি, এর, এফ, এর কনেষ্টবল আবু তাহেরের (নং ৭৯৮) পোশাকপরা লাশ ভাসছে, আরও বহু সিপাহীর ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখতে পেলাম। আমার চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছিল, আমি দিশাহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার প্রিয় সিপাহী তাহেরের লাশ ধরতে গেলে পিছন থেকে এক পাঞ্জাবী সেনা গর্জ্জন করে কর্কশ ভাবে বলতে থাকে ''শূয়র কা বাচ্চা, তোমকো ভি পাকড়াতা হায়, কুত্তাকা বাচ্চা, তোম কো ভি সাত মে 'গুলি করেগা'' আমি আর্ম সাব ইন্সপেক্টর হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ পাক সেনা আমার সাথে কুকুরের মত ব্যবহার করলো। দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় আমি যেন অবশ হয়ে পড়লাম। প্রতিবাদ করতে চাইলাম সর্বশক্তি দিয়ে কিন্তু পারলামনা। প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিল না। তাই ওদের অসহ্য আপত্তিকর কার্যকলাপের প্রতিবাদ করি নাই, সবকিছু নীরবে সহ্য করেছি ওদের যথেচ্ছ কার্যকলাপের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছি।

কোতোয়ালী থানার বরাবর সোজাসুজি গিয়ে বুড়ীগঙ্গার লঞ্চঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বুড়ীগঙ্গার পাড়ে লাশ, বিকৃত, ক্ষত-বিক্ষত, অসংখ্য মানুষের লাশ ভাসছে পুলিশের পোশাকপরা বীভৎস লাশ। দেখলাম বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ, বৃদ্ধা-যুবা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশুর অসংখ্য লাশ। যতদূর আমার দৃষ্টি যায় দেখলাম বাদামতীল ঘাট থেকে শ্যামবাজার ঘাট পর্যন্ত নদীর পাড়ে অসংখ্য মানুষের বীভৎস পচা ও বিকৃত লাশ, অনেক উলঙ্গ যুবতীর লাশ দেখলাম, এই পূত-পবিত্র বীরাঙ্গনাদের ক্ষত বিক্ষত যোনিপথ দেখে মনে হলো, পাঞ্জবী সেনারা কুকুরের মত ওদের পবিত্র দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদেরকে যথেচ্ছভাবে ধর্ষণ করে গুলিতে ঝাঁঝড়া করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। অনেক শিশুর ও ছোট ছোট বালক-বালিকাদের থেঁতলে যাওয়া লাশ দেখলাম। ওদেরকে পা ধরে মাটিতে আছড়িয়ে মারা হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুভরা চোখে আমি লাশ দেখলাম- লাশ আর লাশ-অসংখ্যা নিরীহ বাঙ্গালীর লাশ- প্রতিটি লাশে বেয়নেট ও বেটনের আঘাত দেখলাম, দেখলাম কারও মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আছে, পাকস্থলি সমেত হৃৎপিণ্ড বের করা হয়েছে, পায়ের গিট হাতের কব্জা ভাঙ্গা, ঝুলছে পানিতে। সদরঘাট টার্মিনালের শেডের মধ্যে প্রবেশ করে শুধু রক্ত আর রক্ত দেখলাম- দেখলাম

মানুষের তাজা রক্ত এই বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড়ে। এই টার্মিনাল শেড ছিল ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে ওদের জল্লাদখানা। ওরা বহু মানুষকে ধরে এনে ঐ টার্মিনালে জবাইকরে বেটন ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে টেনে হেঁচড়ে পানিতে ফেলে দিয়েছে। অসংখ্য মানুষকে এভাবে নদীতে ফেলে দেওয়ার পরিষ্কার ছাপ দেখতে পেলাম সেই রক্তের স্রোতের মধ্যে। শেডের বাইরের প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলাম অসংখ্য কাক ও শকুন মানুষের সেই রক্তের লোভে ভীড় করেছে। সদরঘাট টার্মিনাল থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বের হয়ে পূর্বদিকে পাক সেনাদের সদর আউট পোষ্টের দিকে দেখলাম নদীর পাড়ের সমস্ত বাড়িঘর ভস্ম হয়ে ওদের নৃশংসতা ও ভীবৎসতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম রাস্তার পার্শ্বে মিউনিসিপালিটির কয়েকটি ময়লা পরিষ্কার করার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, সুইপাররা হাত পা ধরে টেনে হেঁচড়ে ট্রাকে লাশ উঠাচ্ছে, প্রতিটি ঘর থেকে আমাদের চোখের সামনে বহু নারী-পুরষ, বালক-বালিক, কিশোর-শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার লাশ সুইপাররা টেনে টেনে ট্রাকে উঠাচ্ছিল। পাঞ্জাবী সেনারা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের মত নির্মমভাবে প্রহরা দিচ্ছিল। ভয়ে সন্ত্রাসে আমি আর এগুতে পারলাম না। পূর্বদিকে রাস্তা দিয়ে আমি সদরঘাটের কাপড়ের বাজারের নীরব নিথর রাস্তা ধরে সদরঘাট বেপটিষ্ট মিশনের চৌরাস্তার সম্মুখ দিয়ে নওয়াবপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের কারো শরীরে পুলিশের পোশাক ছিল না- আমি এবং আমার সাথে আরও দু'জন সিপাহী সাধারণ পোশাক পরে দায়িত্ব পালন করছিলাম। কাপড়রের বাজারের চারদিকে রূপমহল সিনেমা হলের সম্মুখে সর্বত্র বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মানুষের ইতস্ততঃ ছড়ানো বীভৎস লাশ দেখলাম, বহু যুবতি মেয়ের ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখলাম।

খৃষ্টান মিশনারী অফিসের সম্মুখে, সদরঘাট বাস ষ্টপেজের চারদিকে, কলেজিয়েট হাইস্কুল জগন্নাথ কলেজ, পগোজ হাইস্কুল, ঢাকা জজকোর্ট, পুরাতন ষ্টেট ব্যাংক বিল্ডিং, সদরঘাট গির্জা, নওয়াবপুর রোডের সর্বত্র, ক্যাথলিক মিশনের বাইরে এবং ভিতরে আদালত প্রাঙ্গণে বহু মানুষের মৃতদেহ দেখলাম। রাস্তায় রাস্তায় দেখলাম পুলিশের পোশাক পরা বহু মৃতদেহ, রায় সাহেব বাজার ব্রিজ পার হয়ে নওয়াবপুর রোডে পা দিয়েই দেখলাম বিহারীদের উল্লাশ ও উন্মত্ত লাফালাফি, ওরা পশুর মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অসংখ্য বাঙ্গালীর লাশ পাড়িয়ে জয়ধ্বনি করে মিছিল করে নওয়াবপুরের রাস্তায় বের হয়ে পড়ছিল। পাঞ্জাবী সেনা কতৃক নির্বিচারে বাঙ্গালী হত্যার খুশীতে দেখলাম বিহারীরা রাস্তায় পড়ে থাকা নিরীহ বাঙ্গালীদের লাশের উপর লাথি মারছে, কেউ প্রস্রাব করে দিচ্ছে, হাসতে হাসতে, রাস্তায় রাস্তায় বিহারী এলাকায় দেখলাম সরু বাঁশের মাথায় বাঙ্গালী বালক ও শিশুর লাশ বিদ্ধ করে খাড়া করে রাখ হয়েছে। দেখলাম উন্মত্ত বিহারী জনতা রাস্তায় পড়ে থাকা লাশগুলিকে দা দিয়ে কুপিয়ে কুচি কুচি করে কেটে আনন্দ করছে, উশৃঙ্খল বিহারী ছেলেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে উল্লাশ করছে, রাস্তার দুই পার্শ্বে সর্বত্র আগুন আর আগুন দেখলাম। বিহারী জনতা রাস্তার পার্শ্বের প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে আগুন লগিয়ে দিয়েছিল, জ্বলছিল বাঙ্গালীদের ঘর বাড়ি, আসবাবপত্র পন্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ মূল্যবান জিনিসপত্র। ঠাটারী বাজারের ট্রাফিক ক্রসিংয়ে এস দেখলাম একটি যুবক ছেলের বীভৎস লাশের উপর পেট চিড়ে বাঁশের লাঠি খাড় করে, লাঠি মাথায় স্বাধীন বাংলার একটি মলিন পতাকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। লাশের উপর জয় বাংলার পতাকা ঝুলিয়ে রেখে বিহারী জনতা চারদিকে দাঁড়িয়ে থেকে হাসছে, উল্লাস করছে। দেখলাম লাশের গুহ্যদ্বার দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। বিজয় নগরের রাস্তা ধরে আমি শান্তিবাগে আমার কোয়ার্টারের আসছিলাম- দেখলাম তখনও রাস্তার চারিপার্শ্বের ঘরবাড়ি জ্বলছে।

আমি কোতোয়ালী থানায় দায়িত্ব পালন করতাম, ৩০শে মার্চ কোতোয়ালী থানর মধ্যে আমরা কামরায় কামরায় প্রবেশ করে দেওয়ালের সর্বত্র চাপ চাপ রক্ত দেখলাম, দেখলাম থানার পায়খান, প্রশ্রাবখানা ও অন্যান্য দেওয়াল গুলির আঘাতে ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের পর কোতোয়ালী থানার কোন বাঙ্গালী পুলিশকে বাইরে কোন টহলে পাঠানো হতো না, থানায় বসিয়ে রাখা হতো। এক পাঞ্জাবী মেজর আমাদেরকে তদারক করে যেতেন মাঝে মাঝে এসে। ৫ই এপ্রিল আমাদের সবাইকে কোতোয়ালী থানা থেকে রাজারবাগ

পুলিশ লাইনে আনা হয়। পুলিশ লাইনে এসে আমাদের ব্যারাক কেন্টিন, আসবাবপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছুর ভস্ম ছাই দেখলাম। তিন নম্বর ব্যারাকে প্রবেশ করে আমার দু'জন প্রিয় সিপাহীর অগ্নিদগ্ধ লাশ দেখলাম-লাশের পায়ে শুধুমাত্র বুট ছিল, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সারা দেহ জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রিয় সিপাহী জাহাঙ্গীর ও আবদুস সালামের বীভৎস লাশ দেখে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। লাশের দিকে মাথ নত করে আমার দু'জন বীর সিপাহীকে সালাম জানালাম, অশ্রুসিক্ত নয়নে। পুলিশ লাইনের উত্তর পূর্বদিকের পুকুরের উত্তর পাড়ে শহীদ সিপাহীদের যথার্থ মর্যাদার সাথে সমাহিত করলাম।

পুলিশ লাইন থেকে পাঞ্জাবীরা চলে গেলেও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে চরম ভয় ভীতি, সন্ত্রাস ও হতাশা বিরাজ করছিল। আমরা সব সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত থাকতাম। ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট বিশেষ পুলিশ ফোর্সের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর ছিলেন এ সময় বোস্তান খাঁ নামে এক চরম বাঙ্গালী বিদ্বেষী পাঠান ভদ্রলোক। এ ভদ্রলোক পুলিশ লাইনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি ৬ই এপ্রিল লাইনে বসেই বাঙ্গালী পুলিশের সাথে কুকুরের মত যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করে দেন। লাইনে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যবান, শক্তি সমর্থ কনষ্টেবলদের ধরে, হাড়ের গিরায় গিরায় বেদম ভাবে পিটুনি দেন। খুঁজে খুঁজে তার পছন্দ ও ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা তাকেই ধরে মুক্তিবাহিনী বলে ঢাকা সেনানিবাসে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তারা আর কোনদিন লাইনে ফিরে আসেনাই। সাথে সাথে ঢাকা সেনানিবাস থেকে মিলিটারী ট্রাকে করে পাঞ্জাবী সেনারা হঠাৎ পুলিশ লাইনে উপস্থিত হয়ে বাঙ্গালী পুলিশদের তদারক আরম্ভ করে দিত। পাইকারীভাবে নাম ও নাম্বার জিজ্ঞাসা করতে করতে অকস্মাৎ অনেককে ''তোম মালা মুক্তি বাহিনী হায়, চলো'' বলে গরুর মত বুটের লাথি মারতে মারতে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আমি তখন পি, আর, এফ-এর ফোর্স সুবেদার ছিলাম। মিলিটারী ট্রাক লাইনে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমি যে কোন অজুহাতে লাইনের বাইরে চলে যেতাম। পঞ্জাবী সেনারা লাইনে প্রবেশ করলে লাইনের সর্বত্র যেন সবার মুখে মৃত্যুর কালোছায়া নেমে আসতো। বাঙ্গালী পুলিশ যার যার মত ব্যারাকে প্রবেশ করে ওদের দৃষ্টির আড়ালে থাকার চেষ্টা করতো। কারণ ওদের দৃষ্টিতে পড়ে গেলেই ওরা যে কোন অজুহাতে বাঙ্গালী পুলিশদের বিপন্ন করতো, বিপদগ্রস্ত করে তুলতো।

১৯৭১ সনের মে মাসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবী পুলিশ এসে গেলে পাঠান রিজার্ভ ইন্সপেক্টর কুকুরের মত অট্টহাসীতে ফেটে পড়ে বলতে থাকে ''যাও শালা লোক শোয়ার কা বাচ্চা হামারা ব্যারাক ছোড়ো, হামারা আদমী আগিয়া, শালা লোগ, ভাগো''। একথা বলার সাথে সাথে বিহারী, পাঞ্জাবী, পাঠান পুলিশ ও পশ্চিম পাকিস্তানী পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাপত্র সবকিছু ব্যারাকের বাইরে ফেলে দিয়ে আমাদের ঘাড়ে ধরে বের করে দেয়। আমরা বাঙ্গালী পুলিশরা অসহায় এতিমের মত আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ কুড়িয়ে নিয়ে লাইনের আস্তাবলে বারান্দায় গাছের নিচে উন্মুক্ত প্রঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করি। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যোগদান করার পর আমরা দেখেছি পাঞ্জাবী সেনারা মিলিটারী ট্রাকে ও জীপে করে প্রতিদিন স্কুলে, কলেজে, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের, ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বালিকা, যুবতী মেয়ে ও সুন্দরী রমণীদের ধরে আনতে থাকে। অধিকাংশ বালিকা, যুবতী মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখেছি। প্রতিটি মেয়ের মুখমণ্ডল বিষন্ন, বিমর্ষ ও বিষময় দেখেছি। মিলিটারী জীপে ও ট্রাকে যখন এভাবে যুবতী মেয়েদের রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আনা হতো তখন পুলিশ লাইনে হৈচৈ পড়ে যেত, পাঞ্জাবী, বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ জীভ চাটতে চাটতে ট্রাকের সম্মুখে এসে মেয়েদের টেনে হেচড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দেহের পোশাক পরিচ্ছদ কাপড় চোপড় খুলে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ করে আমাদের চোখের সামনেই মাটিতে ফেলে কুকুরের মত ধর্ষণ করতো। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ও অঞ্চল থেকে ধরে এ সকল যুবতী মেয়েদের সারাদিন নির্বিচারে ধর্ষণ করার পর বৈকালে আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং এর উপর তাদেরকে উলঙ্গ করে চুলের সাথে লম্বা লোহার রডের সাথে বেঁধে রাখা হতো। রাতের বেলায় এসব নিরীহ বাঙ্গালী নারীদের উপর অবিরাম ধর্ষণ চালানো হতো। আমরা গভীর রাতে

আমাদের কোয়ার্টারে বসে মেয়েদের আর্ত চিৎকার শুনে অকস্মাৎ সবাই ঘুম থেকে ছেলেমেয়ে সহ জেগে উঠতাম। সেই ভয়াল ও ভয়ঙ্কর চিৎকারে কান্নার রোল ভেসে আসতো ''বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁচাও, পানি দাও, এক ফোটা পানি দাও, পানি, পানি।''

মিলিটারী ট্রাক ও ভ্যানে প্রতিদিন পাঞ্জাবী সেনারা রাজধানীর বিভিন্ন জনপদ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে নিরীহ বাঙ্গালী যুবক ছেলেদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে অফিসের কক্ষে কক্ষেজমায়েত করে অকথ্য অত্যাচার চালাতো। হেড কোয়ার্টার অফিসের উপর তালায় আমাদের প্রবেশ করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। দিনের বেলায় পুলিশ লাইনে প্যারেডের আওয়াজের জন্য উপরতলা থেকে নির্যাতিত বন্দীদের কোন আর্তনাদ আমরা শুনতে পেতাম না। সন্ধ্যার পর আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কোয়ার্টার থেকে তাদের আর্তনাদ শুনতে পেতাম। সন্ধ্যার পর পাক সেনারা বিভিন্ন প্রকারের বন্দীদের উপর অত্যাচার চারিয়ে যেত। আর লোহার রডের উপর ঝুলন্ত বালিকা, যুবতী নারী ও রূপসী রমণীদের উপর চলতো অবিরাম ধর্ষণ, নির্মম অত্যাচার। বন্দীদের হাহাকারে আমরা অনেক সময় একবারে দিশাহারা হয়ে পড়তাম, অনেক সময় প্রতিবাদ করতে চাইতাম। কিন্তু ওদের শক্তির মোকাবিলায় আমাদের কিছুই করার ছিল না, আমরা কিছুই করি নাই, করতে পারি নাই। এভাবে প্রতিদিন 'মুক্তি হায়' বলে যে সব নিরীহ বাঙ্গালী ছেলেদের চোখ বেঁধে পুলিশ লাইনে এনে হেড কোয়ার্টার অফিসে জমায়েত করা হত রাতের শেষে পরের দিন সকালে আর এ সকল বন্দীদের দেখা যেত না এবং সে স্থানে নতুন বন্দীদের এনে রাখা হতো।

স্বাক্ষর/-
খলিলুর রহমান
২-৬-১৯৭৪

\ ৭ \

মতিউর রহমান

সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
রমনা থানা, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ আমি সারাদিন থানা সংলগ্ন পুলিশের সি, আই, অফিসের কাজ করছিলাম। রাত দশটা পনের মিনিট। আমার টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটি বেজে উঠল। কমলাপুর পুলিশের জি, আর, পি, থেকে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু টেলিফোনে আমাকে জানালো যে, ঢাকা সেনানিবাস থেকে ভারী অস্ত্র ও কামান সেট করা সত্তরটি আর্মি ট্রাক ভর্তি সশস্ত্র পাক হানাদার এয়াপোর্ট রোড ধরে ঢাকা শহরে প্রবেশ করছে। রাত প্রায় এগারোটার সময় পাক হানাদাররা আমাদের থানার উপর আক্রমণ করে। ওরা এসেই ভারী মেশিনগানের সাহায্যে বৃষ্টির মত আমাদের থানায় গুলি বর্ষণ করতে থাকে। থানার সামনে নিয়োজিত আমাদের সশস্ত্র প্রহরী ও কতিপয় পুলিশ অফিসার পশুদের অবিরাম গুলিবর্ষণে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে নাই। পাক সেনারা থানায় ঢুকেই তাদের সবাইকে বন্দী করে। এরপর বহু পাক সেনা আমাদের দিকে গুলিবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা গুলিবর্ষণ শুরু করি এবং প্রাণপণে পশুদের প্রতিরোধ করতে থাকি। এভাবে আমরা সারারাত শত্রুসেনাদের প্রতিরোধ করতে থাকি। সকালে সাড়ে পাঁচটায় ওরা থানার কলোনী সশস্ত্রভাবে ঘেরাও করে ব্যাপক তল্লাশী আরম্ভ করে এবং আমাদের সবাইকে বন্দী করে। আমরা থানায় পুলিশের সাধারণ সিপাহী, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারসহ মোট ৪৫ জন ওদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। আমাদের সাথে বাইরের আরও ৫০ জন পুলিশ বন্দীকে রাখা হয়েছিল। আমাদের সবাইকে থানার সম্মুখে পশ্চিম দিকের মাঠে বেদম প্রহার করতে করতে, বুটদ্বারা লাথি মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে ''নজর নিচে দেকার মিটেট মে শো যাও'' বলে আমাদেরকে উপড় করে লাথি মেরে শুইয়ে দেয়। সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত তিন ঘন্টা আমাদেরকে বেগম পিটানো হয়। হাতের বেত, বন্দুকের নল এবং যার হাতে যা ছিল তাই দিয়ে আমাদের উপর এলোপাতাড়ি পিটুনি চলতে থাকে। ''শালা মালাউন, শোয়ার কা বাচ্চা আভী জয় বাংলা বলতা নাই, শালা কাফের, হিন্দুকা লাড়কা, তোমহারা মুজিবর বাবা আভি কাহা হায়?'' বলে অকথ্য গালাগালি করতে থাকে আর অবিরামভাবে প্রহার করতে থাকে। আমার ঘরে নৌকার সুন্দর আর্ট করা গ্রাম বাংলার একটি দেওয়াল চিত্র দেখে আমাকে আরও বেশী প্রহার করতে থাকে। আমাদের সি, আই, মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লজ্জায় এবং অপমানে বিমূঢ় হয়ে সারাদিন হাউমাউ করে পাগলের মত কাঁদতে থাকেন। তার দু'ছেলেও তার সাথে বন্দী হয়ে চরম অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। তিন ঘন্টা থানার সামনের মাঠে বেদম পিটুনী দেওয়ার ফলে আমাদের বহু সহকর্মী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। কারো মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, কারো কারো হত পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরপর আমাদের প্রায় ৪০ জন কে এলোপাতাড়ি পিটাতে পিটাতে থানার একটি আট ফুট প্রশস্ত ও দশ ফুট চওড়া ছোট কামরায় ঠাসাঠাসি করে চাউলের বস্তার মত গুদামজাত করে রাখা হয়। আমরা বেগমভাবে প্রহৃত হওয়ার পর থানার সম্মুখে প্রাঙ্গণে মানুষের তাজা রক্তে ভরপুর দেখেছি। আমাদের থানা হাজতে একজন আসামী ছিল তাকেও গুলি করা হয়। কিন্তু সে মরে নাই, আধমরা ভাবে ভীষণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। আমরা ছোট কামরায় প্রবেশ করার সময় দেখলাম আমাদের দু'জন শহীদ সিপাহীর লাশ থানার পিছনের মাটিতে পোত হচ্ছে। সারারাত আমরা সকল সিপাহী বন্দী দাঁড়িয়ে থেকে যন্ত্রনায় কেঁদেছি, সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। ওরা মেশিনগান নিয়ে সর্বক্ষণ প্রহরায় ছিল। পরের দিন ২৭শে মার্চ সকাল দশটার সময় সকল বন্দীকে বের করে গরুর মত পিটাতে পিটাতে থানার পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে ছোট হাউজের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে, ''যাও শালা লোগ পিয়ো''। ঐ পানিতে পশুরা নেমে সকাল থেকে গোসল কারায় পানি দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বন্দীদের মধ্যে কতক সেই পচা পানি দিয়েই হাত মুখ ধুয়ে নিল, তৃষ্ণায় একেবারে দিশাহারা হয়ে অনেকে পানি খেয়ে নিল, অনেকেই সে পানি স্পর্শ করতে পারলো না। আমরা পানির হাউজের সামনে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম পূর্বের দিন যেখানে আমাদের দু'জন শহীদ সিপাহীদের লাশ পোতা হয়েছিল সেখানে তাদের

লাশ নেই, সামনেই দেখলাম সেই দু'জন শহীদ সিপাহীর রক্ত মাখা পোশাক এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে। পানি খাওয়ার পর আমাদেরকে পুনরায় সেই ছোট কামরায় গাদাগাদি করে রাখা হয়। কিছুই খেতে দেওয়া হয় নাই দু'দিন। আমাদের কেউ কেউ ক্ষুধায় একেবারে কাতর হয়ে খেতে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালে ওরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলতো, ''তোমহারা মুজিবর বাবা খানা ডেজেগো।'' ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ সকাল থেকেই ওরা তিন চার জন করে কামরা থেকে নিয়ে পাশের কামরায় বেদম পিটুনি আরম্ভ করলো। এভাবে আমাদের সকল বন্দীদের উপর অসহ্য মার পিট চললো। আমি সেই কামরায় প্রবেশ করার পর পরই দেখলাম দশ বার জন জল্লাদ পশু। ওদের হাতের ছোট ছোট লাঠি। বন্দুকের বাট, বুট, যার হাতে যা ছিল তাই দিয়ে নির্মম ভাবে পিটাতে থাকে। আমি ওদের মারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এরপর আমাকে পাশের কামরায় নিয়ে পুলিশের কোথায় কি আছে, কত পুলিশ অফিসার থানায় আছে, পুলিশ কি মিটিং করেছিল ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু অসহ্য পিটুনি সহ্য করার পরও আমি কোন ব্যাপারেই সঠিক তথ্য ওদেরকে সরবরাহ করি নাই। ১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ আমরা সকল বন্দীরা যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। বিকাল তিনটার সময় টুকরীতে করে সামান্য ভাত এনে আমাদের জানালার সামনে ধরে রেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলতে থাকে, ''শালা লোগ চাউল খায়েগা, চাউল।'' সে ভাত আমাদেরকে খাওয়াবার জন্য আনা হতো না, বরং আমাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করার জন্যই আমাদের জানালার সামনে ধরে রাখা হতো। ওরা জানালার সামনে সামান্য কিছু ভাত ধরে ঠাট্টা তামাশা করতে থাকলেও আমাদের কোন ক্ষুধার্ত বন্দীই ওদের বিদ্রুপের সামনে কোন কথাই বলে নাই। ওরা ভাত নিয়ে এমন উলঙ্গভাবে আমাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করে চলে যাওয়ার পর বন্দীখানায় কান্নার রোল পড়ে যায়। আমরা সবাই কাঁদতে থাকি হাউমাউ করে। ওরা সেই ভাতগুলি আমাদেরকে দেখিয়ে বন্দীখানার সামনের গাছের নিচে ফেলে দেয়। সারারাত আমরা সকল বন্দী কাঁদতে কাঁদতে পার করে । পশুরা মেশিনগান নিয়ে সব সময় আমাদেরকে পাহাড়া দিচ্ছিল। পরের দিন ২৮শে মার্চ আমরা জানালা দিয়ে দেখতে পাই পশুরা থানার অস্ত্রাগার ও মালখানার সকল অস্ত্র ও মালামাল সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওদের মটর ট্রাকে করে। হাজতে রাখা আমাদের পূর্ববর্তী আহত বন্দীকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় আমরা জানতে পারি নাই। ২৯শে মার্চ পর্যন্ত আমাদেরকে সারাদিন বন্দীখানায় এভাবেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। একফোটা পানিও দেওয়া হয় নাই কোন বন্দীকে, কোন খাদ্যও দেওয়া হয় নাই। ২৯শে মার্চ বিকাল ৪টায় তৎকালীন ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার ইমাদ আহমেদ চৌধুরী রমনা থানায় আসেন এবং আমাদেরকে তার সম্মুখে হাজির করা হয়। এমন সময় আমাদের এক বৃদ্ধ সিপাহী ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় একেবারে জ্ঞান হারা হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ইমাদ আহমেদ চৌধুরী তখন অশ্রুভরা চোখে বন্দীদের দেখছিলেন। আমার সামনে এসে আমার ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে তিনি আমাকে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন। পশুদের বুটের লাথি, বেয়নেটের আঘাত ও লাঠি এবং বেতের এলোপাতাড়ি আঘাতে আমার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিল। আমাদের পুলিশ সুপার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমাদেরকে বললেন যাদের নিকটবর্তী বাসা আছে তারা বাসায় চলে যান, আরা যাদের কোন বাসা নাই তারা থানার সামনে দাঁড়ানো ট্রাকে চড়ে মিল ব্যারাকে চলে যান।'' আমি থানার বাসায় গিয়ে দেখলাম, সব লুট হয়ে গেছে, পাক পশুরা সব নিয়ে গেছে। খাওয়ার কিছুই ছিল না, না খেয়ে আহত ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ নিয়ে খোদাকে আমার অত্যাচারের সাক্ষী রেখে শূন্য খাটে এলিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে আমি রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতলের দিকে রওয়ানা হই অনেক কষ্টে। পথে দেখলাম তখনও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশের ব্যারাক দাউ দাউ করে জ্বলছে, জ্বলছে পুলিশের পোশাক-পরিচ্ছদ আসবাবপত্র। ব্যারাকের পিছনেই পাকা জায়গায় দেখলাম চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে। ব্যারাকের মাঝখানে দেখতে পেলাম পায়ে বুট দেওয়া দু'টি পুলিশের লাশ তখনও জ্বলছে। পশুদের ভয়ে আর সামনে এগোতে সাহস পেলাম না। অন্য রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি হাসপাতলে দিকে পা' বাড়ালাম।

স্বাক্ষর/-
মতিউর রহমান
২২-৩-১৯৭৪

\ ৮ \

মোহাম্মদ হোসেন
পুলিশের সিপাহী
রমনা থানা, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রমনা থানার একজন সাধারণ সিপাহী হিসেবে থানার সম্মুখের প্রাঙ্গণে প্রহরারত ছিলাম। রাত দশটায় আমার কর্তব্য শেষ করে আমি ব্যারাকে চলে যাই। কিছুক্ষণ পরই আমি থানার চারদিকে ভীষণ হৈচৈ, দৌড়াদৌড়ি ও গোলমালের আওয়াজ শুনে থানার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি ইট, পাথর ও গাছ দিয়ে জনতা রাস্তার উপর বেরিকেড তৈরী করছে। এ সময় আমাদের থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কাজী মহিউদ্দিন সাহেব থানার অস্ত্রাগার থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজনমত অস্ত্র দিয়ে দেন। আমরা যার যা প্রয়োজন সে মত অস্ত্র নিয়ে পাক হানাদারদের হামলা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য থানার চারদিকে পজিশন নেই। আমরা সেদিন সবাই এই শপথ গ্রহণ করেছিলাম যার হাতে যা আছে তা-ই দিয়ে পাক-পশুদের মোকাবিলা করব, প্রাণ দিব কিন্তু পিছু হটবো না। থানার চার দিকে আমরা সকল পুলিশ সিপাহী ও পুলিশের সকল অফিসার সশস্ত্রভাবে পাক-পশুদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। অল্পক্ষণ পরে পাক পশুরা চারদিক থেকে বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ করতে করতে থানায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে। আমাদের হাতে সামান্য রাইফেল দিয়ে ওদের প্রাণপ্রণ প্রতিরোধ করতে থাকি। এভাবে পাক-পশুদের অজস্র গুলবর্ষণের মুখে আমরা সারারাত ওদের প্রতিরোধ করেছি কিন্তু আত্ম-সমর্পণ করি নাই। আর প্রতিরোধ করার সময় সহস্র গুলিবর্ষণের মুখেও আমাদের কোন সিপাহী বা অফিসার আত্মসমর্পণ করার জন্য কোন দুর্বলতাও প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা এই দৃঢ়তা দেখিয়েছি, ''প্রাণপণ পশুদের প্রতিহত করবো, কিন্তু পিছু হটবো না।'' অতি প্রত্যুষে পশুরা থানার পিছনে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা ওদের প্রতিরোধ করেছিলাম সেখানে প্রতিটি ঘরে ঘরে ব্যাপক তল্লাশী আরম্ভ করে দেয় এবং প্রত্যেক ঘর থেকে আমাদের থানার সশস্ত্র সিপাহীদের বন্দী করে গরুর মত এলোপাতাড়ি পিটাতে পিটাতে থানার পিছরের পুলিশ ব্যারাকে সামনে এনে জড়ো করে বন্দীদের অবিরামভাবে পিটাতে থাকে। ওরা আমাদেরকে উন্মত্তভাবে পিটাচ্ছিল আর বলছিল ''শালা মালাউনকা বাচ্চা, হিন্দুকা লাড়কা, শোয়ারকা বাচ্চা শালা তোমহারা মুজিব বাবা আভি কাহা হায়, শালা হারামী, আভি শাপলা জয় বাংলা বোলতা না-ই।'' ওদের এলাপাতাড়ি পিটুনিতে আমাদের সিপাহীরা অনেকে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান, অনেকের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত ছিল, কারো হাত পা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল, আমাদের অধিকাংশ বন্দীর শরীরে কোন কাপড় ছিল না। ওদের নির্মম মারের চোটে কখন যে পরনের বস্ত্র কোথায় পড়ে গিয়েছিল বলতে পারবো না কেউ। আমাদের সকলকে আবার পিটাতে পিটাতে বুটের লাথি মারতে মারতে আমাদের থানার সি, আই, সাহেবের কামরায় জুড়ে বসা পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনের সামনে আমাদের প্রায় উলঙ্গভাবে দাঁড় করানো হয়। ক্যাপ্টেন তখন কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে বলছিল, ''সব শালাকো এক গুলিতে খতম কার দেও'' এমন সময় জনৈক পাঞ্জাবী মেজর সেখানে উপস্থিত হয়ে জানান যে, ''জি. ও. সি সাহেব বোলা হায় ইন লোগকে রাখ দাও, গোলি মাত করো, বাদমে দেখা যায়েগা।'' আমাদেরকে তখন গুলি করা হয় না, বুটের লাথি মারতে মারতে আমাদেরকে থানার সামনে দশ ফুট চওড়া ও আট ফুট লম্বা একটি ছোট কামরায় গরু ছাগলের মত গাদাগাদি করে এনে রাখা হয়। এ ছোট কামরায় আমরা পুলিশ ও পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার সহ মোট ৪৭ সাতচল্লিশ জন ছিলাম। আমাদের কামরার চারদিকে পশুরা মেশিনগান নিয়ে প্রহরায় মোতায়েন ছিল সবসময়। বেদম পিটুনি খাওয়ার পর বন্দীরা সবাই কান্নাকাটি করছিল, আমাদের সি, আই মোয়াজ্জেম হোসেন খান, অপমানে এবং বেদমভাবে নির্যাতিত হওয়ায় হাউমাউ করে কাঁদছিলেন। তার দুই ছেলেও নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়ে রক্তাক্ত আহত শরীর নিয়ে উলঙ্গভাবে দাঁড়িয়েছিল। আমরা থানার সেই ছোট কামরায় গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থেকে সব সময় ভীতসন্ত্রস্তভাবে মৃত্যুর

প্রহর গুনেছি। এভাবে ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে মার্চ চলে যায়। আমাদেরকে তৃষ্ণা মিটানোর জন্য এক ফোঁটা পনি দেওয়া হয় নাই, আর কোন খাদ্যও দেওয়া হয় নাই। আর ২৯শে মার্চ বিকালে আমাদের তৎকালীন জেলা পুলিশ সুপার ই, এ, চৌধুরী সাহেব রমনা থানায় এসে আমাদের নাম তালিকাভূক্ত করলেন এবং আমাদের জন্য কিছু টাকা দিলেন নিজ পকেট থেকে। কিন্তু তখন বাহিরে কার্ফু থাকায় আমরা বেরুতে পারি নাই। পরের দিন ৩০শে মার্চ আমি আমার তেজগাঁওস্থিত বাড়িতে চলে যাই। এরপর আমি বাংলার মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করার একমাত্র আকাঙ্খায় এবং আমার পরিবারের নিরাপত্ত ও অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে আমি পুনরায় থানায় যোগাযোগ করি। আমাদের থানা তখন বিহারী রাজাকার ও পাক সেনাদের দখলে ছিল। ওরাই থানার সর্বময় প্রভু ছিল। আমাদের হাতে কোন রাইফেল দেওয়া হতো না, শুধু লাঠি দেওয়া হতো মাত্র। আমরা দেখেছি, প্রতিদিন অসংখ্য বাঙ্গালী যুবক, বৃদ্ধকে, অসহায় মানুষকে মুক্তিবাহিনীর মিথ্যা অজুহাতে ধরে থানায় আনা হতো, প্রতিদিন বিহারীরা এই নিরিহ বন্দীদের উপর অত্যাচার চালাতো। অনেক বন্দীকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হতো। যে সকল বন্দীকে থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হতো ওদের অধিকাংশই ফিরে আসতো না। ওদেরকে মেরে ফেলা হতো। পাক সেনা বিহারি ও বেইমান বাঙ্গালী রাজাকাররা এভাবে ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত অত্যাচার চালাতে থাকে। ডিসেম্বরে মুক্তি বাহিনী ও মিত্রশক্তির সম্মিলিত আগমনের মুখে পাক পশুরা রাজারবাগের দিকে পালিয়ে যায়। আমরা এ থানায় কর্তব্যরত থাকাকালে মুক্তি বাহিনীকে নিয়মিত সংবাদ দিয়েছি, বন্দীদের সাহায্য করেছি- এ ভাবে আমরা বাংলার মুক্তি সংগ্রামকে মনে-প্রাণে কার্যকলাপে সবদিক দিয়ে সর্বতোভাবে যাথাসাধ্য সাহায্য করেছি।

স্বাক্ষর/-
মোহাম্মদ হোসেন
২১-১-৭৪

\ ৯ \

মোঃ সাহেব আলী
সুইপার ইন্সপেক্টর
ঢাকা পৌরসভা, ঢাকা

আমি ১৯৭১ সন থেকে ঢাকা পৌরসভার অধীনে সুইপার ইন্সপেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ আমি আমার সুইপারের দল নিয়ে দায়িত্ব পালন করে সন্ধ্যায় ৪৫/১, প্রসন্ন পোদ্দার লেনস্থিত আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। রাত নয়টার দিকে আমি ঢাকা ইংলিশ রোডের দিকে বের হয়ে দেখলাম রাস্তাঘাট চারিদিকে থমথমে, সকল প্রকার যানবাহন দ্রুত গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে দেখলাম। ছাত্র জনতাকে রাস্তায় বেরিকেড তৈরী করতে দেখলাম। প্রতিরোধ তৈরীতে ব্যস্ত ছাত্র জনতার নিকট জানতে পারলাম ঢাকা সেনা নিবাস থেকে পাক সেনারা রাজধানী ঢাকার দিকে সামরিক ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসছে। পাক পশুদের প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্র জনতার এ প্রচেষ্টা ও প্রয়াস। আমি সবকিছু দেখে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বাসায় চলে গেলাম। রাত সাড়ে এগারটার দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পুলিশ অফিস ও মালিবাগ, গোয়েন্দা অফিসের দিকে আকাশ ফাটা গোলাগুলির শব্দ শোনার সময় ঢাকা শাঁখারীবাজার প্রবেশ পথে বাবুবাজর ফাঁড়িতে ভীষণ শেলিংয়ের গর্জ্জন শুনলাম। আমি নিকটবর্তী নয়াবাজার সুইপার কলোনীর দোতলায় দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে গোলাগুলির ভীষণ গর্জ্জন শুনলাম।

২৬শে মার্চ অতি প্রত্যুষে আমি সুইপার কলোনীর দোতলা থেকে দৌড়ে নেমে বাবুবাজার ফাঁড়িতে গিয়ে দেখলাম ফাঁড়ির প্রবেশ পথ, ভিতরে, চেয়ারে বসে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দশজন পুলিশের ইউনিফরম পরা গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। আমি ফাঁড়ির ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম ফাঁড়ির চারিদিকে দেওয়াল হাজারো গুলির আঘাতে ঝাঁঝড়া হয়ে আছে। দেওয়ালের চারিদিকে মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত, তাজা রক্ত জমাট হয়ে আছে, দেখলাম কেউ জিভ বের করে পড়ে আছে, কেউ হাত পা টানা দিয়ে আছে, প্রতিটি লাশের পবিত্র দেহে অসংখ্য গুলির আঘাত। মানবতার অবমাননা ও লাঞ্চনার বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি একটি ঠেলাগাড়ীতে করে সকল লাশ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে লাশ ঘরে রেখে আবার ঠেলাগাড়ী নিয়ে শাঁখারী বাজারে প্রবেশ করে একবারে পূর্বদিকে ঢাকা জজকোর্টের কোণে হোটেলের সংলগ্ন রাস্তায় দশটি ফকির মিসকিন ও রিকসার মেরামতকারী মিস্ত্রির উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ লাশ উঠালাম। কোন হিন্দুর লাশ আমি রাস্তায় পাই নাই। সবকয়টি লাশ মুসলমানের ছিল। রাস্তায় পড়ে থাকা গুলিতে ঝাঁজড়া দশটি লাশ ঠেলাগাড়ীতে তুলে আমি মিটফোর্ড নিয়ে গিয়েছি। মুসলমানের লাশ এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেওয়া যায়না। তাই আমরা স্থানীয় জনতা সবাই মিলে লাশ গুলি তুলে মিটফোর্ডে জমা করেছি। রাজধানী ঢাকার সর্বত্র কার্ফু থাকা সত্ত্বেও গণহত্যার সেই বীভৎস দৃশ্য দেখার জন্য ছাত্র জনতা রাস্তায় রাস্তায় বের হয়ে পড়লে পাকসেনারা ঘোষণা করে ঢাকায় কার্ফু বলবৎ রয়েছে কেউ রাস্তায় বের হলে গুলি করা হবে। পাকসেনাদের এ ঘোষণার পর আমরা সরে পড়লাম। দিনের শেষে বেলা পাঁচটার সময় তাঁতিবাজার, শাঁখারী বাজার এবং কোর্ট হাউস ষ্ট্রিট এলাকায় পাক সেনারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সাথে সাথে চলতে থাকে বৃষ্টির মত অবিরাম গুলি বর্ষণ। সারারাত পাক সেনারা তাঁতিবাজার, শাখারীবাজার ও গোয়াল নগর এলাকায় অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ বেলা একটার সময় পাক সেনারা নওয়াবপুর থেকে ইংলিশ রোডের বাণিজ্য এলাকার রাস্তার দুদিকের সকল দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেলা তিনটা পর্যন্ত ইংলিশ রোডের রাস্তার দুদিকে আগুন জ্বলতে থাকে। আগুনের সেই লেলিহান শিখায় পার্শ্ববর্তী এলাকার জনতা আশ্রয়ের জন্য পালাতে থাকে। পালাতে গিয়ে

পাকসেনাদের গুলির আঘাতে অনেকে প্রাণ হারায়। বেলা তিনটায় পাক সেনারা তাঁতিবজারের বাহির পথ ও মালিবাগের পুলের পশ্চিম পার্শ্বে হিন্দু মন্দিরের উপর শেলিং করে মন্দিরটি ধ্বংশ করে দেয়। ইংলিশ রোডের আগুন বাসাবো এলাকে অতিক্রম করে সুইপার কলোনীর দিকে ধেয়ে আসতে থাকলে আমি সুইপারদের কলোনীর পানি রিজার্ভ করে রাখার নির্দেশ দেই। পাক সেনাদের ডিঙ্গিয়ে সকল সুইপার মিলে সুইপার কলোনীটি রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলে আমরা পাক সেনাদের গুলির মুখে চলে আসি। ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ সকালে রেডিও মারফত সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে এ নির্দেশ পেয়ে পরদিন আমি সকাল দশটার সময় ঢাকা পৌরসভায় ডিউটি রিপোর্ট করলে ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন কনসারভেন্সি অফিসার মিঃ ইদ্রিস আমাকে ডোম নিয়ে অবিলম্বে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা লাশ তুলে ফেলতে বলেন। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলতে থাকেন সাহেব আলি বের হয়ে পড়, যদি বাচঁতে চাও তবে ঢাকার রাজপথ ও বিভিন্ন এলাকা থেকে লাশ তোলার জন্য বের হয়ে পড়। কেউ বাঁচবে না কাউকে রাখা হবে না, সবাইকে পাক সেনাদের গুলিবর্ষনে মরতেহবে, সবাইকে কুকুরের মত হত্যা করা হবে। পৌসভার তৎকালী চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলী খান শুর আমাদের সাথে কুকুরের মত উত্তেজিত হয়ে, অত্যন্ত কর্কশস্বরে ক্রুদ্ধভাবে বকাবকি করতে থাকেন। সেখানে আমি, সুইপার ইন্সপেক্টর আলাউদ্দিন, সুইপার ইন্সপেক্টর কালিচরণ, সুইপার সুপারভাইজার পাঞ্চাম, সুইপার ইন্সপেক্টর আওলাদ হোসেন আমরা পাঁচজন উপস্থিত ছিলাম। আমাকে পরদেশী ডোম, মন্টু ডোম, লেমু ডোম, ডোম গোলাপ চান, দুঘিলা ও মধু ডোমকে নিয়ে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লাশ তুলে স্বামীবাগ আউটকলে ফেলতে বলা হয়। ১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ আমার দল ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশ ঘর থেকে দুট্রাক লাশ তুলেছে। আমার দল যে সকল লাশ তুলেছে আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি। অধিকাংশই ছিল সরকারী কর্মচারী, পুলিশ, আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাকী পোশাক পরা বিকৃত লাশ। লাশ তুলতে তুলতে পরদেশী নামে আমার জনৈক ডোমের হাতে এক ষোড়শী রূপসীর উলঙ্গ ক্ষবিক্ষত লাশ দেখলাম, দেখলাম সেই যুবতীর পবিত্র দেহে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন, তার বুক থেকে স্তন সজোরে তুলে নেওয়া হয়েছে, লজ্জাস্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, পিছনের মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। হরিণের মত মায়াভরা মধুময় বড় বড় চোখ ঘুমিয়ে আছে, সারাদেহে সৃষ্টিকর্তা যেন দুধের সর দিয়ে আবৃত করে দিয়েছে, মাথায় কালো কালো চুল তার কোমর পর্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছিল, তার দুই গালে আঘাতের চিহ্ন দেখলাম। পরক্ষণেই দেখলাম দশ বছরের এক কিশোরীর উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত লাশ। অপরূপা রূপসী ফলের মত টক টকে চেহারা, সারাদেহে বুলেটের আঘাত। ১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল থেকে ভারপ্রাপ্ত পাক সেনাদের মেজর পৌরসভায় টেলিফোনে সংবাদ দেন রোকেয়া হলের চারিদিকে মানুষের লাশের পচা গন্ধে সেখানে বসা যাচ্ছে না, অবিলম্বে ডোম পাঠিয়ে লাশ তুলে ফেলা হোক। আমি ছয়জন ডোম নিয়ে রোকেয়া হলে প্রবেশ করে রোকেয়া হলের সমস্ত কক্ষে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোন লাশ না পেয়ে চারতলা ছাদের উপর গিয়ে আঠার বছরের জনৈক রূপসী ছাত্রীর উলঙ্গ লাশ দেখতে পেলাম। আমার সাথে দায়িত্বরত জনৈক পাক সেনাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ ছাত্রীর দেহে গুলির কোন আঘাত নাই, দেহের কোন স্থানে কোন ক্ষত চিহ্ন নাই অথচ মরে চিত হয়ে পড়ে আছে কেন? সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো আমরা সকল পাকসেনা মিলে ওকে ধর্ষণ করতে করতে মেরেছি। পচা-ফুলা সেই রূপসীর উলঙ্গ দেহ পড়ে আছে দেখলাম। ডাগর ডাগর চোখ ফুলে বের হয়ে আছে, মাথার চুল নিকটেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, লজ্জাস্থান তার পেট থেকে ফুলে অনেক উপরে উঠে আছে, যোনিপথ রক্তাক্ত। তার দুদিকে গালে পশুদের কামড়ের চিহ্ন দেখলাম, বক্ষের স্তনে মানুষের দাঁতের দংশনের চিহ্ন দেখলাম। আমি একটি চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসি্ রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ভিতরে প্রবেশ করে পাঁচজন মালীদের স্ত্রী পরিজনদের পাঁচটি লাশ এবং আটটা পুরুষের লাশ (মালী) পেয়েছি। লাশ দেখে মনে হলো মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সবাই শুয়ে ছিল। আমি ট্রাক নিয়ে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিব্বাড়ীর তেতলা থেকে জনৈক হিন্দু অধ্যাপক, তার স্ত্রী ও দুই ছেলের লাশ তুলেছি। স্থানীয় জনতার মুখে জানতে পারলাম তার দুই মেয়ে বুলেটবিদ্ধ হয়ে হাসপাতে আছেন। সংগৃহীত লাশ স্বামীবাগ আউটকলে ফেলে দিয়ে আমরা ট্রাক নিয়ে ঢাকা

বুড়ীগঙ্গা নদীতে ভাসমান হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। আমরা ৩০শে মার্চ ঢাকা বুড়ীগঙ্গা নদী থেকে তিন-ট্রাক লাশ তুলে স্বামীবাগে ফেলেছি। পাকসেনারা কুলি দিয়ে পূর্বেই সেখানে বিরাট বিরাট গর্ত করে রেখেছিল। পরের দিন আমরা মোহাম্মদপুর এলাকার জয়েন্ট কলোনীর নিকট থেকে সাতটি পচা-ফুলা লাশ তুলেছি। ইকবাল হলে আমরা কোন লাশ পাই নাই। পাক সেনারা পূর্বেই ইকবাল হলের লাশ পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। বস্তি এলাকা থেকে জগন্নাথ হলে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসা দশ জন নর-নারীর ক্ষত বিক্ষত লাশ তুলেছি। ফেরার পথে আমরা ঢাকা হলের ভিতর থেকে চারজন ছাত্রের উলঙ্গ লাশ তুলেছি। ১৯৭১ সনের ১লা এপ্রিল আমরা কচুক্ষেত, ড্রাম ফ্যাক্টরী, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, দ্বিতীয় রাজধানী এলাকাস্থ ঢাকা বিমান বন্দরের অভ্যন্তর, ঢাকা ষ্টেডিয়ামের মসজিদের পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে কয়েকজন ছাত্রের পচা লাশ তুলেছি। এর পর থেকে প্রতিদিন আমরা বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড় থেকে হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। রায়ের বাজার ইটখোলায় আমরা কয়েক হাজার বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি। মিরপুর এক নম্বর সেকশনের রাস্তা পার্শ্বে ছড়ানো, ছিটানো, বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজের হল থেকে দশজন ছাত্রের ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলেছি। রায়ের বাজার রাস্তা, পিলখানা, গনকটুলি, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান, এয়ারপোর্ট রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকা, তেজগাঁও মাদ্রাসা থেকে অসংখ্য মানুষের পচা-ফুলা লাশ তুলেছি। অনেক লাশের হাত-পা পেয়েছি মাথা পাই নাই। মেয়েদের লাশ সবই উলঙ্গ ও ক্ষত বিক্ষত দেখেছি। কিছুদিন পর আমি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত কারখানায় গিয়ে সাধনা ঔষধালয়ের মালিক প্রফেসর যোগেশচন্দ্র বাবুর বেয়নেটের আঘাতে ক্ষত-ক্ষিত রক্তাক্ত তাজা লাশ তুলে স্বামীবাগ ফেলেছি। পাক পশুরা যোগেশ বাবুর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে তার নিজস্ব কামড়ায় বক্ষে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে রেখে যায়। পরে তার পবিত্র ক্ষত-বিক্ষত লাশ নীচে নামিয়ে এনে খাটের উপর রেখে দিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম প্রফেসর যোগেশ বাবুর লাশ জীভ বের করে হা করে আছে। গায়ে ছিল ধুতি আর গেঞ্জি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সাহেব আলী
১৯-৫-৭৪

\ ১০ \

মোহাম্মদ সালেহুজ্জামান
সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
রমনা থানা, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৫মে মার্চ সন্ধ্যায় আমি এক প্লাটুন ফোর্সসহ মীরপুর এক নম্বর সেকশনে টহলে ছিলাম। সন্ধ্যার পরপরই আমি মিরপুরের সর্বত্র থমথমে ভাব লক্ষ করেছি। রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার সময় আমার ওয়ারলেস সেটটি অকস্মাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওয়্যারলেস সেটে এক বাঙ্গালী পুলিশ কণ্ঠ অজানা স্টেশন থেকে বলছিল, ''ঢাকা সেনানিবাস থেকে ট্যাঙ্ক ও কামানবাহী সশস্ত্র পাকসেনাদের ট্রাক সারিবদ্ধভাবে রাজধানীতে সদর্পে প্রবেশ করছে, বাঙ্গালী পুলিশ তোমরা সাবধান হও।'' ইহার পর আমার ওয়্যারলেস সেটের মারফত ঢাকা পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে মেসেজ দেওয়া হয়, ''পুলিশ ডিউটি উইথড্রন''। ওয়্যারলেস মারফত এসব মেসেজ আসার পরপরই আমি ঢাকা রাজধানীর আকাশে সর্বত্র আগুনের ফুলকি উঠতে দেখলাম। অকস্মাৎ রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইকবাল হল, ই,পি, আর হেডকোয়ার্টারে ভীষণ কামান ও ট্যাঙ্ক হামলার আকাশফাটা শব্দ শুনতে পাই। এ পরিস্থিতিতে আমি আমার টহলরত পুলিশ ফোর্সকে মিরপুরের পশ্চিম দিকে গ্রামের দিকে চলে গিয়ে প্রাণপণ প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়ে আমি আমার রাইফেল ও গুলি নিয়ে থানার বাসায় চলে যাই। থানায় ফিরে এসে আমি তৎকালীন মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ আবুল হাসেম এবং অন্যান্য সাব ইন্সপেক্টর, এ, এস, আই ও বাঙ্গালী পুলিশদের অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিমূঢ় দেখতে পাই। থানায় বসে আমরা ওয়ারলেসে বাঙ্গালী কণ্ঠের বহু বীভৎস আর্তনাদ শুনতে পাই রাত সাড়ে চারটার দিকে পাক পশুরা পুলিশ কন্ট্রোল রুম দখল করে সেখানকার ওয়ারলেসে বাইরে টহলে নিযুক্ত বাঙ্গালী পুলিশদের কর্কশ কণ্ঠে বলছিল ''বাঙ্গালী শালালোগ, আভী আ-কার দেখো, তোমারা কেতনা মা বাহেন হামারা পাস হায়,.....।'' একথা শুনে আমাদের বাঙ্গালী পুলিশদের গা শিউরে ওঠে। আমি তৎক্ষণাৎ ওয়্যারলেস সেট বন্ধ করে দেই। সকাল হওয়ার পূর্বেই আমি থানা ও থানার বাসা ছেড়ে দিয়ে মিরপুরে অন্য এক বাসায় আত্মগোপন করে থাকি। সকালে আমি দেখলাম বাঙ্গালী ই, পি, আরদের মিরপুর ই, পি, আর ক্যাম্প থেকে বন্দী করে আমাদের থানার সম্মুখে এনে পাক-পশুরা নিরস্ত্র করে থানায় বন্দী করছে। আমি আরও দেখলাম মিরপুরের সকল বাঙ্গালী বাড়ীতে বিহারীরা কপালে সাদা কাপড় বেঁধে দানবের মত উল্লাসে ফেটে পড়ে আগুন লাগাচ্ছে, লুট পাট করছে। বাড়ী বাড়ী থেকে বাঙ্গালী শিশু যুবতী বৃদ্ধাদের টেনে এন রাস্তায় রাস্তায় ফেলে ছোরা দিয়ে জবাই করছে, বাঙ্গালী রমণীদের ধরে এন রাস্তায় উলঙ্গ করে ফেলে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে তৎক্ষণাৎ ধারালো ছুরি দিয়ে স্তন ও পাছার মাংস ছলাৎ করে কেটে ফেলে নৃশংসভাবে হত্যা করছে। কাউকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলছে, কারও যোনিতে লোহার রড ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কারও গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হাজারো মানুষ তখন প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। যে সকল নিরীহ মানুষ পালাতে পারছিল না তাদেরকে বিহারীরা নির্মমভাবে জবাই করছিল। পাক সেনারা এ ব্যাপক বাঙ্গালী হত্যায় বিহারীদের পিছনে থেকে সাহায্য করছিল। ২৭শে মার্চ সকালে কিছুক্ষণের জন্য কার্ফু তুলে নিলে আমি আমার পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মিরপুরের বাইরে যাত্রা করি। মিরপুর গরুর হাট অতিক্রম করার সময় আমি দেখলাম পাক সেনাদের টহল ভেদ করে একটি ট্রাকে মহিলা ও শিশু মিরপুর ব্রীজের দিকে যাচ্ছিল- পাক সেনারা ঐ ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর দু'টি যুবতী মেয়েকে তাদের জীপে উঠিয়ে নিয়ে যায়। মেয়ে দু'টি পাক পশুদের হাতে পড়ে প্রানফাটা চিৎকারে আর্তনাদ করছিল। আমরা দূর থেকে গরুর হাট বরাবর বোরো ধানের ক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বহু দুর্দশা ও লাঞ্চনা ভোগ করে আমি আট দিন পায়ে হেঁটে ও নৌকাযোগে দেশের বাড়ীতে পৌঁছি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সালেহুজ্জামান
৭-২-৭৪

\ ১১ \

রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) ডোম
সুইপার কলোনী
নারিন্দা শাহ সাহেব লেন
থানা-সুত্রাপুর, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ সকাল দশটার সময় ঢাকা পৌরসভার হেলত অফিসার আনোয়ার সাহেব ঢাকা পিলখানার চোদ্দটুলি সুইপার কলোনী থেকে আমাদের সুইপার ইন্সপেক্টর পাঞ্চা, ডোম সবুজজী, দরবারী, মহাবীর ও মুসু ডোমকে নিয়ে আমাদের এই সুইপার কলোনীর দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ''গনেশ, লাল, বদনেস, রণজিত, কানাই, ''বলে চিৎকার করে ডাকতে থাকলে আমরা সবাই যার যার ঘর থেকে বের হয়ে এসে দেখতে পেলাম ঢাকা পৌরসভার একটি জীপে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান মিঃ সালামত আলী খান শুর, প্রশাসনিক অধিকর্তা মিঃ ইদ্রিস চিৎকার করে বলছেন, ঢাকার রাজপথে, বিভিন্ন জায়গায় বহু লাশ পড়ে আছে, তোমরা বের হয়ে আস, সে সব লাশ অবিলম্বে তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলে দাও। আমি, পরদেশী, গনেশ, চুন্নু, আমরা সবাই মিটফোর্ড লাশ ঘর থেকে ২৮শে মার্চ সকলে দু'ট্রাক লাশ তুলে দলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। অধিকাংশ লাশ পচে, ফুলে বিকৃত ও বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। ২৯শে মার্চ আমরা প্রথম মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে দু'ট্রাক লাশ তুলেছি। এরপর আমাদের দুদিনের ছুটি দেওয়া হয়। তিনদিন পর আমরা রমনা কালিবাড়ী থেকে পাঁচটি পচা লাশ তুলে ট্রাকে কার্জন হলের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পাক সেনারা আমাদের ট্রাক আটক করে আমাদের ট্রাক ড্রাইভার চান মিয়া ও সুইপার ইন্সপেক্টর পঞ্চমকে ধরে নিয়ে মারধর করে। সুপারভাইজারকে চপোটাঘাত করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে কুকুরের মত চিৎকার করে বলতে থাকে ''লাশ খোলা কিউ লে যাতা হায়, শূয়র কা বাচ্চা, বাহেন চোত, শালা হারামী, শালা তেরপল লাগা লো।'' পরের দিন আমি, ছাখিল, পরদেশী, চুন্নু সবাই মিলে শাঁখারী বাজারে কোর্টের প্রবেশপথে অগ্রসর হতে চাইলে আমাদের সেখানে জ্বলন্ত আগুনের অদূরে প্রহরারত পাক সেনারা বাবুবাজার ফাঁড়ি দিয়ে শাঁখারী বাজারে প্রবেশ করতে বলে কর্কশভাবে। এ সময়ে আমরা দেখলাম সারা শাঁখারীবাজারে লেলিহান আগুনের শিখা জ্বলছে, সারা শাঁখারীবাজার জ্বলছে, জ্বলছে দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, মূল্যবান আসবাবপত্র জ্বলছে। আমরা ট্রাক নিয়ে মন্দিরের ভিতর দুজন যুবকের পচাগলা লাশ তুলেছি। লাশ পচে পোক হয়ে গিয়েছিল। গলিত লাশ দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়েছিলাম। কোন লোকজন ছিল না, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, শ্মশানের হাহাকার দেখলাম। প্রতিটি ঘর থেকে আমরা শিশু কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা, যুবক-যবতীর পচা, গলিত লাশ তুলেছি। আমাদের সাথে আরও দুই দল ডোম ঢাকা পৌরসভার দু'টি ট্রাকে লাশ তুলে ধলপুর ময়লার ডিপোতে ফেলেছি। এরপর আমরা সদরঘাট বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড়, শ্যামবাজার ঘাট, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলেছি। আমরা নদীর ঘাট থেকে যে সকল পচা, ফুলা, গলিত লাশ তুলেছি তার অধিকাংশ ছিল চোখ ও হাত-পা বাঁধা যুবকের লাশ। এরপর লালকুঠির ভিতর থেকে লুঙ্গি পরা দু'জন যুবকের পচা ও গলিত লাশ পেয়েছি, বাংলাবাজার, প্যারীদাস রোডের কয়েকটি বাড়ী থেকে আমরা লাশ তুলেছি। এরপর আমরা বনগ্রাম এলাকার রাস্তা থেকে কয়েকটি পচা লাশ তুলেছি। কমলাপুর থেকে আমরা ট্রেনযাত্রীদের লাশ তুলেছি, আমরা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে শ্রমিকদের বহু লাশ তুলেছি।

টিপসহি
রঞ্জিত
৮-৫-৭৪

\ ১২ \

বদলু ডোম
ওয়ারী, সুইপার কলোনী
ঢাকা

আমি ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ আমাদের সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চমের দলে মিটফোর্ড হাসপাতলের লাশ ঘর থেকে লাশ তুলেছি। কয়েক দিন পর আমি সুপারভাইজার সাহেব আলীর দলে মিলব্যারাক পুলিশ লাইনের নদীর পাড় থেকে পনের জন যুবক, একজন সাধু ও বৃদ্ধার ক্ষতবিক্ষত, ফুলা, পচা লাশ তুলেছি। প্রতিটি লাশ চোখ ও হাত-পা বাঁধা ছিল। এরপর আমরা বাবুবাজার পুলের উপর থেকে এক অন্ধ ফকিরের লাশ পেয়েছি। আমরা সেইদিন সদরঘাট নদীর পাড় থেকে পানিতে ভাসতে থাকা হাত-পা বাঁধা ফুলা লাশ তুলেছি। সদরঘাট, শ্যামবাজার. ওয়াইজঘাট, বাদামতলী এলাকায় আমরা নদীর পাড় ও পানি থেকে বৃদ্ধ, যুবা ও শিশুর লাশ তুলেছি। কয়েকদিন পর আমরা মন্দিরের সামনে থেকে দুধওয়ালা সাধুর লাশ তুলেছি, শাঁখারীবাজারে প্রবেশ করে মন্দিরের সামনের বাড়ীর ভিতর থেকে শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা, যুবক-যুবতীর দশটি পোকায় খাওয়া গলিত লাশ নিয়ে এসেছি। কয়েকদিন পর আমি রমনা কালীবাড়ী থেকে-মন্দিরের ভিতর থেকে পাঁচটি এবং কালীবাড়ীর প্রবেশপথে দুটি চোখ ও হাত পা বাঁধা পচা লাশ তুলেছি। গোয়ালঘরে তিনটি গরু গুলিতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। এপর পাক সেনারা আমাদের নির্মমভাবে মারপিট করায় আমরা আর লাশ তুলতে যাই নাই।

স্বাক্ষর
বদলু ডোম
১১-৫-৭৪

\ ১৩ \

চুন্নু ডোম
ঢাকা পৌরসভা
রেলওয়ে সুইপার কলোনী
২২৩ নং ব্লক, ৩নং রেল গেট
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ আমাদের সুইপার ইনসপেক্টর ইদ্রিস সাহেব আমাকে লাশ উঠাবার জন্য ডেকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমাকে, বদলু ডোম, রঞ্জিত লাল বাহাদুর, গণেশ ডোম ও কানাইকে একটি ট্রাকে করে প্রথম শাঁখারীবাজারে কোর্টের প্রবেশপথের সম্মুখে নামিয়ে দেয়। আমরা উক্ত পাঁচজন দেখলাম ঢাকা জজ কোর্টের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের যে রাজপথ শাঁখারীবাজারের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু'ধারে ড্রেনের পাশে যুবক-যুবতীর, নারী-পুরুষের, কিশোর-শিশুর বহু পচা লাশ। দেখতে পেলাম, বহু লাশ পচে ফুলে বীভৎস হয়ে আছে, দেখলাম শাঁখারীবাজারের দুদিকের ঘরবড়ীতে আগুন জ্বলছে, অনেক লোকের অর্ধপোড়া লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম, দুই পার্শ্বে অদূরে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম। প্রতিটি ঘরে দেখলাম মানুষ, আসবাবপত্র জ্বলছে। একটি ঘরে প্রবেশ করে একজন মেয়ে, একজন শিশুসহ বার জন যুবকের দগ্ধ লাশ উঠিয়েছি। শাঁখারীবাজারের প্রতিটি ঘর থেকে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশু ও বৃদ্ধের লাশ তুলেছি। পাঞ্জাবীরা প্রহরায় থাকাকালে সেই মানুষের অসংখ্য লাশের উপর বিহারীদের উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে ফেটে পড়ে লুট করতে দেখলাম। প্রতিটি ঘর থেকে বিহারী জনতাকে মূল্যবান সামগ্রী, দরজা, জানালা, সোনাদানা সবকিছু লুটে নিয়ে যেতে দেখলাম। লাশ উঠাতে উঠাতে এক ঘরে প্রবেশ করে এক অসহায়া বৃদ্ধাকে দেখলাম-বৃদ্ধা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পানি পানি বলে চীৎকার করছিল, তাকে আমি পানি দিতে পারি নাই ভয়ে, বৃদ্ধাকে দেখে আমি আরও ভীত হয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি পানি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের পিছনে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনা প্রহরায় থাকায় আমি সেই বৃদ্ধাকে পানি দিয়ে সাহায্য করতে পারি নাই। আমরা ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ শাঁখারীবাজার থেকে প্রতিবারে একশত লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাকে বোঝাই করে তিন শত লাশ ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ সকাল থেকে আমরা মিটফোর্ড হাসপাতলের লাশঘর ও প্রবেশপথের দুপার্শ্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিব্বাড়ী, রমনা কালীবাড়ী, রোকেয়া হল, মুসলিম হল, ঢাকা হল থেকে লাশ উঠিয়েছি। ২৯শে মার্চ আমাদের ট্রাক প্রথম ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতলের প্রবেশপথে যায়। আমরা উক্ত পাঁচজন ডোম হাসপাতালের প্রবেশপথে নেমে একটি বাঙ্গালী যুবকের পচা, ফুলা, বিকৃত লাশ দেখতে পেলাম। লাশ গলে যাওয়ায় লোহার কাঁটার সাথে গেঁথে লাশ ট্রাকে তুলেছি। আমাদের ইনসপেক্টর পঞ্চম আমাদের সাথে ছিলেন। এর পর আমরা লাশঘরে প্রবেশ করে বহু যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-কিশোর ও শিশুর স্তুপীকৃত লাশ দেখলাম। আমি এবং বদলু ডোম লাশ ঘর থেকে লাশের পা ধরে টেনে ট্রাকের সামনে জমা করেছি, আর গণেশ, রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) এবং কানাই লোহার কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে পচা, গলিত লাশ ট্রাকে তুলেছে। প্রতিটি লাশ গুলিতে ঝাঁঝরা দেখেছি, মেয়েদের লাশের কারো স্তন পাই নাই, যোনিপথ ক্ষতবিক্ষত এবং পিছনের মাংস কাটা দেখেছি। মেয়েদের লাশ দেখে মনে হয়েছে, তাদের হত্যা করার পূর্বে তাদের স্তন সজোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, যোনিপথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবতী মেয়েদের যোনিপথের এবং পিছনের মাংস যেন ধারাল চাকু দিয়ে কেটে এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি যুবতী মেয়ের মাথায় খোঁপা খোঁপা চুল দেখলাম। মিটফোর্ড থেকে আমরা প্রতিবারে একশত লাশ নিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ আমাদের উক্ত পাঁচজনের সাথে দক্ষিণা ডোমকে সাহায্য করতে দেওয়া হয়। আমাদের ট্রাক সেদিন সাত মসজিদে যায় আমি সাত মসজিদের সম্মুখ থেকে যখন বাঙ্গালী লাশ উঠাচ্ছিলাম তখন অসংখ্য বিহারী জনতা আমাদের চারদিকে দাঁড়িয়ে হাসছিল, বাঙ্গালীদের পরিণতি দেখে উপহাস করছিল। আমরা সাত মসজিদের সম্মুখ থেকে আটটি বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি, কতিপয় লাশ দেখলাম উপর হয়ে পড়ে আছে। সবার পিঠ গুলির অসংখ্য আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে আছ। পচা, ফুলা লাশ তুলতে যেয়ে দেখলাম কারও লুঙ্গি পরা, কারও পাজামা পরা। আবার কারও দেহে হাওয়াই শার্ট এবং টেট্টনের দামী প্যান্ট। পানি থেকে বারটি লাশ তুলেছি; প্রতিটি লাশের চোখ এবং হাত পিছনে দিকে বাঁধা ছিল। নদীর পাড় থেকে বারটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা দেখেছি। লাশ দেখে মনে হলো, ভদ্র ঘরের অভিজাত বাঙ্গালী যুবকদের লাশ। সাত মসজিদের সকল লাশ তুলে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ফিরে এসে ট্রাক নিয়ে আমরা মিন্টু রোডে লাশ তুলতে গিয়েছি। মিন্টু রোডের রাস্তার পাশ থেকে প্যান্ট পরা দু'টি পচা ফুলা লাশ তুলেছি। ধলপুর যাওয়ার পথে ঢাকা ষ্টেডিয়ামের মসজিদের সম্মুখ থেকে এক বৃদ্ধ ফকিরের সদ্য গুলিবিদ্ধ লাশ তুলেছি, দেখলাম লাশের পাশেই ভিক্ষার ঝুলি, টিনের ডিবা ও লাঠি পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিব্বাড়ীর সম্মুখ থেকে দুজন রূপসী যুবতী মেয়ে এবং তিনজন যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলে একটি অর্ধদগ্ধ যুবতীর লাশ তুলেছি, মুসলিম হলে প্রবেশ করে একটি পচা লাশ পেয়েছি, ঢাকা হলের ভিতর থেকে চারজন ছাত্রের লাশ তুলেছি। পরের দিন ৩১শে মার্চ বাসাবো খাল থেকে তিনটি পচা লাশ তুলেছি। সেদিন অসুস্থ থাকায় আমি আর লাশ তুলতে যেতে পারি নাই।

টিপসহি
চুন্নু ডোম
৭-৪-৭৪

\ ১৪ \

ছোটন ডোম
রেলওয়ে সুইপার কলোনী
২২৩ নং ব্লক, ৩নং রেল গেট
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ সকাল আটটায় ঢাকা পৌরসভার সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চম আমাদের নিতে আসেন। পাকসেনারা রাজধানী ঢাকার বহু লোককে নির্বিচারে হত্য করার ফলে বিভিন্ন এলাকায় যে সকল লাশ পচে ফুলে রাস্তায় পড়ে আছে তা তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলার জন্য রেলওয়ে কলোনী থেকে আমাকে ও দুখী লালকে ডেকে নিয়ে যায়। আমরা ঢাকা পৌরসভায় গিয়ে সেখানে আমার ভাতিজা ডোম গাংওয়া, আমার মেয়ে জামাই হরি ডোম, সন্টু, ফেকু ডোম, দরবারী, গণেশ, লেমু, লালবাহাদুর, খুবী, পরদেশী অর্জুন সবাইকে হাজির দেখেছি। আমার দলে আমরা-আমি, দরবারী, মহেশ, কানাই, হরি ফেকওয়া এই ছয়জন ছিলাম। সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চ আমাদের সাথ ছিলেন। আমাদের ট্রাক ইংলিশ রোডের মুখে রায়সাহেব বাজারের প্রবেশ পথ দিয়ে গোয়ালনগরের স্কুল ও মন্দিরের সম্মুখে যেয়ে থামানো হয়। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে হাফ শার্ট ও হাফ প্যান্ট পরা এক চৌদ্দ বছরের সুন্দর ফুটফুটে ছেলের সদ্য মৃত লাশ দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম-ছেলেটিকে রাস্তা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পিছন দিক থেকে হাত বেঁধে মাথার পিছন দিক থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মাথার পিছন দিক দিয়ে অঝোরে তাজা রক্ত ঝরতে দেখলাম- সদ্য মৃত তাজা লাশ, হাত দিয়ে বড় আদরের সাথে ট্রাকে তুলে দিলাম। কচি ছেলের তুলতুলে লাশ তুলতে গিয়ে আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠলো, হাহাকার করে উঠলো। হায়, না জানি কোন মায়ের আদরের দুলাল, চোখের মণিকে পশুরা তাড়িয়ে এন এভাবে হত্যা করে গেছে। লাশের ডাগর ডাগর চোখের দিকে তাকাতেই আমার চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগলো অঝোরে, আমি কিছুতেই আমার চোখের পানি আটকে রাখতে পারলাম না। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে রাস্তার উপর আরও একটি যুবকের তাজা লাশ দেখলাম- উভয়ই মুসলমান যুবকের লাশ। গোয়ালনগরের দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়ে দুর্গা মায়ের মন্দিরের নিকটবর্তী বাড়ীর অভ্যন্তরে রান্নাঘরে প্রবেশ করে সেখানে এক ঘরেই এগারটি পচা ফুলা লাশ দেখলাম- তিনজন বাইরে- অবশিষ্টগুল পাল-এর নীচে। একজন অর্ধ বয়সের রূপসী মহিলা মাথায় কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, হরিণের মত মায়ময় চোখ, লাবণ্যময় দেহ, সারা দেহের উপর যেন ভগবান দুধের সর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। প্রবেশপথে দুটি যুবক ও একজন কিশোরের লাশ দেখলাম-ঘরের ভিতরে পালং এর নীচে থেকে আরও ছয়জন যুবক ছেলের লাশ তুলে আনলাম। পাশের ঘরে প্রবেশ করে দু'জন যুবক ছেলে ও একজন মধ্যবয়সী লোকের পঁচা লাশ তুলেছি। উপরোক্ত সমস্ত লাশ আমি ধলপুর ময়লার ডিপোতে গিয়ে দেখলাম- বড় বড় গর্ত করে কুলিরা বসে আছে- ট্রাক থামিয়ে আমরা সব লাশ গর্তে ঢেলে দিলে কুলিরা মাটি ফেলে গর্ত বন্ধ করে দিল। লাশ উঠাবার জন্য আমাদের প্রত্যককে মাত্র তিন টাকা করে দিলে আমি সারাদিন না খেয়ে লাশ তুলতে অস্বীকার করে চলে আসি। সারাদিন লাশ তুলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। পরেরদিন থেকে আমি আর লাশ তুলতে যাই নাই।

টিপসহি
ছোটন ডোম
৭-৪-৭৪

\ ১৫ \

পঞ্চম
সুইপার সুপারভাইজার
ঢাকা পৌরসভা
সুইপার কলোনী, গণকটুলী
নবাবগঞ্জ, ঢাকা

আমি ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ কালরাতে গণকটুলী পৌরসভার সুইপার কলোনীতে ছিলাম। এখানে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আমার সাথে অবস্থান করছিল। সেইদিন রাত থেকে আমাদের কলোনীর চারিদিকে সান্ধ্য আইন জারী করে বর্বর পাক সেনারা ই,পি, আর, হেড কোয়ার্টারে বাঙ্গালী জোয়ানদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। আমরা কলোনীতে সকল সুইপার দরজা-জানালা বন্ধ করে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলাম। বাইরে চলছিল চারিদিকে বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ। ২৭শে মার্চ সকাল নয়টায় পাক সেনারা সান্ধ্য আইন কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়ে নিলে সবাই সপরিবারে ঢাকার বাংলাদেশ মাঠ (পাকিস্তান মাঠ- আগা সাদেক রোড) সংলগ্ন সুইপার বস্তিতে আশ্রয় গ্রহন করি। গণকটুলীর আমাদের সুইপার কলোনীর একজন পুরুষ সুইপার মুখ ধোয়ার সময় এবং কাউসিলা দেবী নামে একজন হিন্দু সুইপারকে পাক সেনারা গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। ''পৌরসভার সকল কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে''- রেডিও মারফত আমি এ ঘোষণা শুনে চাকুরীর স্বার্থে পৌরসভায় এসে রিপোর্ট করি। অফিসে এসে দেখলাম, পৌরসভার তৎকালীন কনসারভেন্সি অফিসার ইদ্রিস সাহেব ক্রোধান্ধ হয়ে ডোমদের ডাকছেন। তার নির্দেশে আমি, সুইপার ইন্সপেক্টর রামদীন, ডোম পরদেশী, লেমু, গণেশ এবং লাল বাহাদুর -আমরা সবাই প্রথমে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশ তুলতে যাই। আমরা সেদিন মিটফোর্ড থেকে দু'ট্রাক লাশ তুলেছি- সকল লাশ আমরা ওয়ারী আউটকলে ফেলেছি। সেখানে পূর্বেই শ্রমিকদের দ্বারা বিরাট বিরাট লম্বা লম্বা গর্ত করে রাখা হয়েছিল। আমরা লাশ নিয়ে সেই সব গর্তে ফেলেছি। পরের দিন আমার দল আবার মিটফোর্ডে লাশ তুলতে যায়। আমরা ২৯শে মার্চ মিটফোর্ড লাশ ঘর থেকে দু'ট্রাক লাশ তুলেছি। পরদেশী এবং তার ভাই চুন্নু নীচে দাঁড়িয়ে পচা, ফুলা, গুলিতে ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলে ট্রাকের সম্মুখে এনেছে- রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) ও গণেশ দু'জন ট্রাকের উপরে ছিল। অধিকাংশ লাশ খাকী শার্ট পরা-পুলিশের ছিল। আমরা সকল লাশ ওয়ারী আউটকলে ফেলেছি। পরের দিন আমার দল বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড় ও শ্যামবাজার থেকে লাশ তুলেছি। তিনদিন পর আমার দল রমনা কালীবাড়ীতে লাশ তুলেছে। ডোম রঞ্জিত, গণেশ ও বদলু ছয়টি গন্ধ পোড়া লাশ তুলেছে। রমনা কালী বাড়ী পুকুরের পাড় থেকে রশি দিয়ে হাত, পা ও চোখ শক্ত করে বাঁধা দুজন যুবকের লাশ তুলেছে। ইহা ছাড়া আমার দল রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা থেকে বহু লাশ তুলেছে। বুড়ীগঙ্গা নদী থেকে আমার দল আমার উপস্থিতে যেসব বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছে তার প্রায় সবই চোখ হাত-পা বাঁধা ছিল। আমার দল বেশ কয়েকদিন পরে ঢাকা হলের ভিতর থেকে তিন জন যুবকের পচা লাশ তুলেছে।

স্বাক্ষর/-
পঞ্চম
১১-৫-৭৪

\ ১৬ \

পরদেশী
সুইপার সরকারী পশু হাসপাতাল
ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ সকালে রাজধানী ঢাকায় পাকসেনাদের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলি খান শূরের প্রশাসনিক অফিসার মিঃ ইদ্রিস পৌরসভার আরও কয়েকজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে একটি মিউনিসিপ্যাল ট্রাকে পশু হাসপাতালের গেটে এসে বাঘের মত ''পরদেশী পরদেশী'' বলে গর্জন করতে থাকলে আমি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আমার কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসি। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কর্কশ স্বরে বলতে থাকেন, ''তোমরা সব সুইপার ডোম বের হও, যদি বাঁচতে চাও অবিলম্বে সবাই মিলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্তূপীকৃত লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলে দাও। নইলে কাউকে বাঁচানো হবে না, কেউ বাঁচতে পারবে না।'' পৌরসভার সেই ট্রাকে নিম্নবর্ণিত সুইপাররা বসা ছিলঃ ১। ভারত ২। লাডু ৩। কিষণ।

আমি তার নির্দেশ অমান্য করার কোন উপায় না দেখে ট্রাকে উঠে বসলাম। সেই ট্রাকে করে ঢাকা পৌরসভা অফিসে আমাদের প্রায় আঠারজন সুইপার ও ডোমকে একত্রিত করে প্রতি ছয়জনের সাথে দুইজন করে সুইপার ইন্সপেক্টর আমাদের সুপারভাইজার নিয়োজিত করে তিন ট্রাকে তিনদলকে বাংলাবাজার, মিটফোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রেরণ করা হয়। আমি মিটফোর্ডের ট্রাকে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমাদের ট্রাক মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলে আমরা ট্রাক থেকে নেমে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বুকে এবং পিঠে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করা প্রায় একশত যুবক বাঙ্গালীর বিভৎস লাশ দেখলাম। আমি আমার সুপারভাইজারের নির্দেশে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিটি লাশর পায়ে ধরে টেনে বের করে বাইরে দাঁড়ানো অন্যান্য সুইপারের হাতে তুলে দিয়েছি ট্রাকে উঠাবার জন্য। আমি দেখেছি প্রতিটি লাশের বুক ও পিঠ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা। সব লাশ তুলে দিয়ে একপাশে একটা লম্বা টেবিলের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া একটি লাশের উপর থেকে চাদর টেনে উঠিয়ে দেখলাম একটি রুপসী ষোড়শী যুবতীর উলঙ্গ লাশ-লাশের বক্ষ, যোনিপথ ক্ষতবিক্ষত, কোমরের পিছনের মাংস কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে, বুকের স্তন থেতলে গেছে, কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো চুল, হরিণের মত মায়ময় চোখ দেখে আমার চোখ বেয়ে পানি পড়তে থাকলো, আমি কিছুতেই চোখের পানি রাখতে পারলাম না। আমি আমার সুপারভাইজারের ভয়াল এবং ভয়ঙ্কর কর্কশ গর্জনের মুখে সেই সুন্দরীর পবিত্র দেহ অত্যন্ত যত্ন সম্ভ্রমের সাথে ট্রাকে উঠিয়ে দিলাম। মিটফোর্ডের লাশঘরের সকল লাশ ট্রাকে উঠিয়ে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে নিয়ে গিয়ে বিরাট গর্তের মধ্যে ঢেলে দিলাম। দেখলাম বিরাট গর্তের মধ্যে সুইপার ও ডোমেরা রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা লাশ ট্রাক থেকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আমি অধিকাংশ লাশের দেহে কোন কাপড় দেখি নাই, যে সমস্ত যুবতী মেয়ে ও রমণীদের লাশ গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো তার কোন লাশের দেহইে আমি কোন আবরণ দেখি নাই। তাদের পবিত্র দেহ দেখেছি ক্ষতবিক্ষত, তাদের যোনিপথ পিছন দকিসহ আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে। দুপুর প্রায় দু'টার সময় আমরা রমনা কালীবাড়ীতে চলে আসি পৌসভার ট্রাক নিয়ে। লাশ উঠাবার জন্য ট্রাক রমনা কালীবাড়ীর দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজন ট্রাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা চারজন কালিবাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখি সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে আছে। কালীবাড়ীর ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ছাড়ানো ছিটানো ৪১টি পোড়া লাশ আমি ট্রাকে তুলেছি। কালীবাড়ীর এ সকল লাশ আমরা ধলপুরের ময়লার ডিপোতে গর্তের মধ্যে ফেলেছি। লাশ তুলে তুলে মানুষের পচা চর্বির গন্ধে আমার পকস্থলী বের হতে চাচ্ছিল। পরের দিন আমি আর লাশ তুলতে যাই

নাই, যেতে পারি নাই, সারাদিন ভাত খেতে পারি নাই, ঘৃণায় কোনকিছু স্পর্শ করতে পানি নাই। পরের দিন ২৯শে মার্চ সকালে আমি আবার ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সাথে ঢাকা শাঁখারীবাজারে যেতে বলা হয়। জজ কোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাক সেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাঁখারীবাজারে প্রবেশ করতে পারি নাই। পাটুয়াটুলি ঘুরে আমরা শাখারীবাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাঁখারীবাজরের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাঁখারীবাজরের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করলাম- দেখলাম মানুষের লাশ নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশুর বীভৎস পচা লাশ, চারদিকে ইমারতসমূহ ভেঙ্গে পড়ে আছে, মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম, দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবী সেনারা পাষণ্ডের মত লাফাতে লাফাতে গুলবর্ষণ করছিল, বিহারী জনতা শাঁখারীবাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনা দানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলা জন্য সেদিন আর শাঁখারীবাজরে প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০শে মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা দেখলাম, প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে দশ জন পনের জনের লাশ বের করলাম, সব যুবক ছেলে ও স্বাস্থ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম। প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমণ্ডল কালো দেখলাম এসিডে জ্বলে বিকৃত ও বিকট হয়ে আছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষদের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোন দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেয়নেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারো মাথা চূর্নবিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, কারো কাটা হৃৎপিণ্ড বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে ছয়জন রূপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ লাশ দেখলাম। চোখ বাঁধা, হাত, পা, শক্ত করে বাঁধা প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝর, মুখমণ্ডল, বৃক্ষ ও যোনিপথ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যামবাজার, বাদমতীল ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদীর ঘাট থেকে পচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালীবাড়ী লাশ তুলেছি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে ষ্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিম দিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে আমি লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের ষ্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি মেয়ে, পুরুষ ও শিশু সমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিঁড়ির সামনে লেপের ভিতর পেঁচানো জনৈক অধ্যাকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।

স্বাক্ষর/-
পরদেশী
২১-৩-৭৪

\ ১৭ \

মিসেস রাবেয়া খাতুন
সুইপার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার পাঞ্জাবী সেনারা যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় তখন আমি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এস, এফ, কেন্টিনে ছিলাম। আসন্ন হামলার ভয়ে আমি সারাদিন পুলিশ লাইনের ব্যারাক ঝাড়ু দিয়ে রাতে ব্যারাকেই ছিলাম। কামান, গোলা, লাইটবোম আর ট্যাঙ্কের অবিরাম কানফাটা গর্জনে আমি ভয়ে ব্যারাকের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে থেকে থরথরিয়ে কাঁপছিলাম। ২৬শে মার্চ সকালে ওদের কামানের সম্মুখে আমাদের বীর বাঙ্গালী পুলিশ বাহিনী বীরের মত প্রতিরোধ করতে করতে আর টিকে থাকতে পারি নাই। সকালে ওরা পুলিশ লাইনের এস, এফ, ব্যারাকের চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করে বাঙ্গালী পুলিশদের নাকে, মুখে, সারা দেহে বেয়নেট ও বেটন চার্জ করতে করতে ও বুটের লাথি মারতে মারতে বের করে নিয়ে আসছিল। ক্যান্টিনের কামরা থেকে বন্দুকের নলের মুখে আমাকেও বের করে আনা হয়, আমাকে লাথি মেরে, মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় এবং আমার উপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিল আর কুকুরের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল আমার উপর উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করতে করতে যখন আমাকে একেবারে মেরে ফেলে দেওয়ার উপক্রম হয় তখন আমার বাঁচবার আর কোন উপায় না দেখে আমি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওদের নিকট কাতর মিনতি জানাচ্ছিলাম। আমি হাউমাউ করে কাঁদছিলাম, আর বলছিলাম আমাকে মেরোনা, আমি সুইপার, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পায়খান ও নর্দমা পরিষ্কার করার আর কেউ থাকবে না, তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমাকে মেরো না, মেরো না, মেরো না, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পুলিশ লাইন রক্ত ও লাশের পচা গন্ধে মানুষের বাস করার অযোগ্য হয়ে পড়বে। তখনও আমার উপর এক পাঞ্জাবী কুকুর, কুকুরের মতই আমার কোমরের উপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করছিল। আমাকে এভাবে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলে দিলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পরিষ্কার করার জন্য আর কেউ থাকবে না একথা ভেবে ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে এক পাঞ্জাবী ধমক দিয়ে বলতে থাকে, 'ঠিক হায়, তোমকো ছোড় দিয়া যায়েগা জারা বাদ, তোম বাহার নাহি নেকলেগা, হারওয়াকত লাই পার হাজির রাহেগা।' একথা বলে আমাকে ছেড়ে দেয়।

পাঞ্জাবী সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এবং অভিজাত জনপদ থেকে বহু বাঙ্গালী যুবতী মেয়ে, রূপসী মহিলা এবং সুন্দরী বালিকাদের জীপে, মিলিটারী ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। আমি কেন্টিনের ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম দেখলাম আমার সম্মুখ দিয়ে জীপ থেকে আর্মী ট্রাক থেকে লাইন করে বহু বালিকা যুবতী ও মহিলাকে এস, এফ কেন্টিনের মধ্য দিয়ে ব্যারাকে রাখা হল। বহু মেয়েকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এ উপর তালায় রুমে নিয়ে যাওয়া হল, আর অবশিষ্ট মেয়ে যাদেরকে ব্যারাকের ভিতর জায়গা দেওয়া গেলা না তাদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হল। অধিকাংশ মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখলাম, অনেক রূপসী যুবতীর দেহে অলঙ্কার দেখলাম, তাদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়ের চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিল। এরপরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙ্গালী রানীদের উপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবী সেনারা কুকুরের মত জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উম্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে প্রবেশ করতে লাগলো। ওরা ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই নিরীহ বালিকাদের উপর ধর্ষণে লেগে গেল, আমি ব্যারাকে ড্রেন পরিষ্কার করার অভিনয় করছিলাম আর ওদের বীভৎস পৈশাচিকতা দেখছিলাম। ওদের উম্মত্ত উল্লাসের সামনে কোন মেয়ে কোন শব্দ পর্যন্তও করে নাই, করতে পারে নাই। উন্মত্ত পাঞ্জাবী সেনারা এই নিরীহ বাঙ্গালী মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ

করেই ছেড়ে দেয় নাই- আমি দেখলাম পাক সেনারা সেই মেয়েদের উপর পাগলের মত উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারাল দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রাক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্ধত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রাক্তাক্ত হয়ে গেল। যে সকল বাঙ্গালী যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করলো দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবী সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছোঁ মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজন দু পা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম, পাঞ্জাবীরা শ্মশানের লাশ যে কোন কুকুরের মত মদ খেয়ে সব সময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিল। শুধু সাধারণ পাঞ্জাবী সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নাই, সকল উচ্চপদস্থ পাঞ্জাবী সামরিক অফিসারই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মত হয়ে দুই হাত বাঘের মত নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙ্গালী মহিলাদের উপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ কাজে লিপ্ত থাকতো। কোন মেয়ে, মহিলা যুবককে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয় নাই, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এ সকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সম্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুটি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এ সকল মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্যান্য মেয়েরা আরও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতো। যে সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা চারিতার্থ করার জন্য 'সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের হাসি তামাশায় দেহদান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয় নাই। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের উপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এরপর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মত লাথি মারতে মারতে পশুর মত পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চার তলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবী সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামরার ভিতর ঢুকিয়ে তালবদ্ধ করে চলে যেত। ইহার পর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দার মোটা লোহর তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রতিদিন পাঞ্জাবীরা সেখানে যাতায়াত করতো সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস বেট দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকতো, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে যেত, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ করতো, কেউ উচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্তবক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারাল দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করতো। কোন মেয়ে এসব অত্যাচারে কোন প্রকার চিৎকার করার চেষ্ট করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো। প্রতিটি মেয়ের হাত বাঁধা ছিল পিছনের দিকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবী সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলাপাতাড়ি বেদম প্রহার করে যেত। প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারো মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দু'দিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙ্গুল, হাতের তালু ভেঙ্গে, থেঁতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত মহিলা ও মেয়েদের প্রস্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হতো না এক মুহূর্তের জন্য। হেডকোয়ার্টারের উপর তলার বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করত- আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার

করতাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙ্গালী যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবী সেনাদেরকে নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলাও সেখানে সেই সকল বন্দী মহিলাদের পূতগন্ধ, প্রস্রাব-পায়খান পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসের উপর তলা হতে বহু ধর্ষিতা মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরাম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙ্গালী যুবতীদের সারাক্ষণ সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনারা প্রহরা দিত। কোন বাঙ্গালীকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোনা সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না।

মেয়েদের হাজারো কাতর আহাজারিতেও আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী মেয়েদের বাঁচবার জন্য কোন ভূমিকা পালন করতে পারি নাই। এপ্রিল মাসের দিকে আমি অন্ধকার পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে খুব ভোরে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় সারারাত ঝুলন্ত মেয়েদের মলমূত্র পরিষ্কার করছিলাম। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরীর ১৩৯ নং বাসার রানু নামে এক কলেজের ছাত্রীর কাতর প্রার্থনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ি এবং মেথরের কাপড় পরিয়ে কলেজ ছাত্রী রানুকে মুক্ত করে পুলিশ লাইনের বাইরে নিরাপদে দিয়ে আসি। স্বাধীন হওয়ার পর সেই মেয়েকে আর দেখি নাই। ১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাবী সেনারা এসকল নিরীহ বাঙ্গালী মহিলা, যুবতী ও বালিকাদের উপর এভাবে নির্মম-পাশবিক অত্যাচার ও বীভৎসভাবে ধর্ষণ করে যাচ্ছিল। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে মিত্রবাহিনী ঢাকায় বোমাবর্ষণের সাথে সাথে পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের চোখের সামনে মেয়েদের নির্মমভাবে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাজারবাগ ডেহকোয়ার্টার অফিসের উপর তলায়, সমস্ত কক্ষে, বারান্দায় এই নিরীহ মহিলা ও বালিকাদের তাজা রক্ত জমাট হয়েছিল। ডিসেম্বরের মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী রাজধানীতে বীর বিক্রমে প্রবেশ করলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পাঞ্জাবী সেনা আত্মসমর্পণ করে।

টিপসহি
রাবেয়া খাতুন
১৮-২-৭৪

\ ৪৮ \

মোহাম্মদ আবু নূর
শিক্ষক, সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুল
ঢাকা

আমি সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক। একদিন ভারতে যাবার ব্যাপারে স্কুল থেকে কিছু পাওনা টাকা তুলতে গেছি। এমন সময় পাঞ্জাবী পুলিশের একটি দল আমাকে এবং আমার বন্ধু সহকর্মী নজমুল হোসেনকে ধরে নিয়ে রাজারবাগ চলে যায়। সেখানে আমাদের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তারপর তারা আমাদের টাকা-পয়সা, ঘড়ি ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়। হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে ওপরে নিয়ে গিয়ে মাটিতে বসিয়ে রাখে এবং মাঝে মাঝে চড়থাপ্পড় দিতে থাকে। সেখান থেকে আমাদেরকে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রমনা থানায় লকআপে থাকবার সময় সেখানে আরো অনেক ছেলেকে অত্যাচার-জর্জরিত অবস্থায় দেখতে পাই। ঘন্টাখানেক পর আমাদেরকে লকআপ থেকে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে প্রথমে আমার সহকর্মীর ওপর দৈহিক পীড়ন শুরু করা হয়। তাঁকে বেতের মোটা লঠি দিয়ে অমানুষিকভাবে প্রহার করা হয়। তার পা মুচড়ে ফেলা হয়। কিন্তু তিনি এরপরও কোন গুপ্ত খবর দিতে অস্বীকার করেন। তারপর শুরু হয় আমার পালা। আমাকে তারা নিদারুন লাঠিপেটা করে এবং আমার পা-ও তারা মুচড়ে ফেলে। কিন্তু আমিও কোন গোপন কথা বলতে সম্মত হইনি।

ঘন্টাখানেক পর একজন ডি,এস,পি এসে আমাদেরকে আবার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নিয়ে যায়। সেখানে অন্যান্য আরো অনেকের সঙ্গে আমাকে ২৪ দিনের জন্য বন্দী করে রাখা হয়। প্রথম দিন রাতে তারা কোন এক পিতা ও তাঁর পুত্রকে একই সঙ্গে উলঙ্গ করে ঐ অবস্থায় সবার সামনে সরারাত দাঁড় করিয়ে রাখে এবং মারধর করে। আমাকে এবং অন্যান্য সবাইকে তারা সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায় নিয়মমাফিক মারধর করত ও জোর করে জবানবন্দী আদায় করে নিত। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সবাই সত্যকে গোপন করে যেতাম। পাঞ্জাবী পুলিশেরা ছাড়াও পাক সেনা বা ই,পি,সি,এ,এফ যারাই আসত তারাই একবার করে এসে আমাদের ধোলাই করে যেত। অনেকেই প্রহারের ফলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। মাঝে মাঝে মধ্যরাতে এসে ঘুম থেকে উঠিয়ে তারা নির্যাতন চালাত। ওরা নিয়মিত আমাদেরকে কিছু খেতে দিত না। তবে মাঝে মাঝে তাদের উচ্ছিষ্ট তারা আমাদের খেতে দিত। বিশেষ করে মারধর করবার সময় পানি চাইলে তারা পানি খেতে দিত না। উল্লেখ করা যেতে পারে মাঝে মাঝে ভিখিরি ছেলেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবার ভিক্ষে করে আমাদের দিয়ে যেত।

একদিন ওরা আমার দুই হাত বেঁধে ওপরের দিকে ঐ অবস্থায় একনাগাড়ে ৪৮ ঘন্ট দাঁড় করিয়ে রাখে। বাঁধন খুলে দেবার পরপরই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার পা ভীষণ রকম ফুলে যায় এবং সাধারণভবে চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি।

একদিন কোন এক বন্দীকে তারা পিটিয়ে মেরে ফেলে। তারপর মৃতদেহ বস্তায় পুরে তারা নিয়ে যায়। ওখানে একটা ছেলেকে পিঠমোড়া করে সারাদিন বেঁধে রাখে ফলে তার পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়। ঐ অবস্থার পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। একদিন সকালে পাঞ্জাবী পুলিশ এসে আমাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিটাতে শুরু করে, তখন আমার পরনে শুধু একটা জাংগিয়া ছিল এবং হাত উপরের দিকে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সে অবস্থায় একজন মিলিটারী অফিসার, ডি,এস,পি,আর,আই এবং কয়েকজন পুলিশ এসে আমাকে ঘিরে ফেলে, তারা প্রত্যেকেই আমার উপর কিল, ঘুষি, চপেটাঘাত, লাথি এবং থাপ্পড় চালাতে থাকে। আমার বুকের উপর একজন একটা রিভলবার ধরে তাদের ইচ্ছামত স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি কোন গোপন তথ্য প্রকাশ না করলে তারা আরো কিছুক্ষণ মারধর করে চলে যায়।

একদিন সকাল বেলায় পাঞ্জাব পুলিশের একজন ডি,এস,পি (অল্পবয়স্ক) আমাকে দেখতে আসে। তার সাথে দু-এক মিনিট কথা বলার জন্য অনুমতি চাই এবং সে এতে রাজী হয়। তাকে আমি প্রথমে বলি, ‘‘শিক্ষার দিক থেকে তুমি আমার চাইতে বেশী নও, কিন্তু কি অবস্থায় আমাদেরকে রেখেছ, তোমরা মানুষ না অন্যকিছু, আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তা তুমি তদন্ত কর এবং আদালতে বিচার দাও। তা না হলে এভাবে আমাদেরকে রাখার কোন অধিকার তোমাদের নেই।’’ আমার কথা শুনে ভীষণ রেগে যায় এবং চিৎকার করতে থাকে। সে আমাকে একটা ছেলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। আমি বললাম যে ছেলেটার নাম আমি শুনেছি তবে চিনি না। এরপর সে চলে যায়, ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় আমাকে বেদমভাবে প্রহার করা হয়, যে ঘরে আমাদের উপর অত্যাচার চালানো হত সেখান থেকে পরে আমাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। এখানে দুইজন পাঞ্জাবী পুলিশ মাঝে মাঝে আমাদেরকে খাবার দিয়ে যেত। সিগ্রেটও কিনে এনে দিত, তারা আমাদের মারধর করত না। এদের সাহায্যেই আমি হাবিব ব্যাংকে (শান্তিনগর শাখা) এক বন্ধুর কাছে ঝাড়ুদারের মারফত একটা চিঠি পাঠাতে সক্ষম হই। আমার বন্ধু ঐ ঝাড়ুদারের কাছে আমার জন্য দশটি টাকা পাঠিয়ে দেয় এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে আমার খবর পৌছে দেয়। ছাড়া পাবার ৭/৮ দিন আগে থেকে আমাকে বলা হয় যে টাকা দিলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আমার চেক বইটি (তল্লাশী করে তারা নিয়েছিল) আমার কাছে নিয়ে আসে এবং দু’হাজার টাকার চেক সই করে দিতে বলে। আমি তাদের শ পাঁচেক টাকা দিতে রাজী হই। শেষ পর্যন্ত তরা ৬০০ টাকার একখানা চেক সই করিয়ে নেয়, আমাদেরই একজন বন্দীকে নিয়ে টাকা উঠিয়ে নিয়ে আসে। সেইদিনই বিকালে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং আরো আটশ টাকা দিতে বলে। আমি পালিয়ে যাব এ ভয়ে একজন পুলিশকে আমার পিছনে লাগিয়ে দেয়। পরের দিন আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদেরকে দিয়ে আসি।

দীর্ঘদিনে বন্দী শিবিরের অত্যাচার ও নির্যাতনের চিহ্ন বহন করে অবশেষে বাড়ী ফিরে যাই। এখনও আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠিনি এবং অস্বাভাবিক জীবনযাপন করছি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবু নূর
৪-৪-৭৩

\ ১৮ \

মোহাম্মদ আলী নূর চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক, ঘোড়াশাল হাই স্কুল

১লা ডিসেম্বর ১৯৭১ সকাল ৫টায় রেলগাড়ীতে করে প্রায় ৫০/৬০ জন সৈনিক সাথে একজন মেজরসহ ন্যাশনাল জুট মিল (ইজব নগর, ঘোড়াশাল, ঢাকা) ঘিরে ফেলে। তখন অনেকেই নিদ্রায় মগ্ন। মিল ছিল রমজান উপলক্ষে ছুটি। বিশেষ করে মিলের স্টাফের লোকজনই সেখানে তখন ছিলেন। ঘোড়াশাল সেতুর পশ্চিম পাশে গাড়ী থামিয়ে মিছিল সহকারে প্রথমত গুলি করতে করতে পাক বাহিনী মিলে প্রবেশ করে। গুলির শব্দ শুনে মিলের আশেপাশের লোজন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কিন্তু পাক বাহিনী ওদিকে কোন দৃষ্টিপাত করেনি। রাস্তার পাশে যে সব বাড়ীঘর ছিল সেগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে মাত্র। গোলাগুলির শব্দ শুনে মিলের প্রত্যেকে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। মিলের সহকারী ম্যানেজার শহীদ আবু তালেব পাক বাহিনীর সাথে একত্র হয়ে মিলের সবাইকে সান্ত্বনা সহকারে কাছে ডেকে আনেন। অনুমান স্টাফে দেড়শত লোক ছিল এবং তাদের পরিবার পরিজনসহ ৫০০ লোক। মেজর সবাইকে ডেকে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পাড়ে নিয়ে যায়। চক্ষু লাল করে ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এখানে মুক্তিবাহিনী আছে কিনা? এবং স্টাফের সবাইকে মুক্তিবাহিনী বলে মেজর আখ্যায়িত করে। সহকারী ম্যানেজার সাহেব মেজরকে নানাভাবে তাঁর স্টাফ যে মুক্তিবাহিনী নয়, তা বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং তার প্রমান দেন। ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এসব কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত মেজর ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হন। সহকারী ম্যানেজার সাহেবকে তাদের স্ব-স্ব কাজে লিপ্ত হতে আদেশ দেন। স্টাফের সবাই নিজ নিজ কাজে চলে যায়। মেজর ও তার অন্যান্য সৈন্যরা মিল প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিবাহিনী অনুসন্ধান করা। অবশেষে আবার তারা গাড়ীর দিকে রওনা হয়। যখন তারা গাড়ীর দিকে ধাবমান ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা হতে কে যেন একে একে দুটি গুলি করে। গুলির শব্দ শুনে মেজর ও অন্যান্য সৈনিকরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং পুনরায় মিলের দিকে রওনা হয়। আর কালবিলম্ব না করে অফিসার স্টাফের প্রত্যেকের বাসায় উঠে যাকে যেভাবে দেখেছে সেভাবেই নৃশংসভাবে হত্যা করে। উল্লেখ্য যে, মিলের গেটকিপারসহ অফিসার ও স্টাফের দু'একজন ছাড়া সবাইকে পাক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঠিক সন্ধ্যা ৬টায় তারা ট্রেনে উঠে ঢাকা অভিমুখে চলে যায়।

স্বাক্ষর/-
আলী নূর চৌধুরী
৪-১২-৭৩

\ ১৯ \

মিসেস আবু তালেব
স্বামীঃ শহীদ আবু তালেব, এম, এ
সহকারী ম্যানেজার, ন্যাশনাল জুট মিলস
ঘোড়াশাল, ঢাকা

১৯৭১ সালের ১লা ডিসেম্বর একদল খানসেনা অতর্কিতভাবে ঘোড়াশাল ন্যাশনাল জুট মিলস ঘিরে ফেলে এবং মিলের ১০৪ জন বিভিন্ন পদের নিরীহ নিরস্ত্র কর্মচারীকে নির্মমভাবে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে এল, এম, জি'র ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। শহীদ আবু তালেব তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি দিনাজপুরে ঠাকুরগাঁ মহকুমার ধাকদনপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং জনাব আহমদ উদ্দীন আহমদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র এবং ন্যাশনাল জুট মিলের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা দান করেন এবং বহু জনহিতকর কাজ সম্পাদন করেন। তিনি দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানার নওখৈর গ্রামে ''নবোদয়'' নামে একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া তাঁর বড় পরিচয় তিনি ন্যাশনাল জুট মিল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং একজন জনপ্রিয় ও দক্ষ পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে বর্বর পাক সেনাদের হাতে তাঁর প্রাণ হারাতে হয়। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে যান। মৃত্যুর পূর্বমহূর্তে তিনি বারবার পাক সেনাদের কাছে আবেদন জানান- ''মারতে যদি হয় আমাকে মার, আমার কর্মচারীদেরকে মের না।'' যেহেতু তিনি মিলটিকে গড়ে তোলেন সেহেতু তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পরে যেন তাঁকে সেখানেই কবরস্থ করা হয়। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

স্বাক্ষর/-
মিসেস আবু তালেব
২০-১১-৭৩

\ ২০ \

মোহাম্মদ মাহমুদুল আশরাফ
গ্রাম ও পোঃ ঘোড়াশাল
কালীগঞ্জ, ঢাকা

নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখ ঘোড়াশাল ষ্টেশনে মিলিটারী ক্যাম্প থেকে ৫০/৫৫ জনের একটি দল ভোর ৬টায় ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকের দু'তিনটা পথ দিয়ে খিলপাড়া ও আটিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। আমি ঘাড়াশাল থেকে তার একদিন পূর্বে বৈয়ম গ্রামে চলে যাই। পাক বাহিনী প্রথমে খিলপাড়া গ্রামে প্রবেশ করে। খিলপাড়া গ্রামের জনৈক দোকানদার ইসলামের সাথে পাক বাহিনী সাক্ষাৎ করে। বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, পাক বাহিনী পূর্বেই ইসলামকে দোকানদার হিসেবে চিনত। পাক বাহিনী ইসলামকে সাহায্য করতে বলে। উপায়ন্তর না দেখে ইসলাম বাধ্য হ'ল পাক বাহিনীর সাহায্য করতে। এরপর শুরু হয় পাক বাহিনীর ধ্বংসলীলা। একের পর এক বাড়ী ধ্বংস করতে থাকে এবং লোকজনকের এক এক করে গুলি করে হত্যা করে। প্রকাশ, ইসলাম একজন ধর্মভীরু লোক। তিনি কোরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। হয়ত বা অনেক লোক পাক বাহিনীর ভয়ে পালাচ্ছে। সেই মুহূর্তে পাক বাহিনী গুলি কের ওখানেই তাদেরকে শেষ করেছে। এমনকি শিশু, নারী-পুরুষ কেউই তাদের নৃশংস হত্যা হতে নিস্তার পায়নি। হত্যার সাথে সাথে অগ্নিসংযোগ চালিয়ে যায়। এত মর্মান্তিক ধ্বংসলীলাকে তৈমুরের ধ্বংসলীলার সাতে তুলনা করা যায়।

এমনিভাবে দু'গ্রামের প্রায় ২০০ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। অনেক লোক রাস্তায়, কেউ ঘরে আবার কেউ সেতুর নীচে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। পাক বাহিনীর এ অভিযান প্রায় ৮ ঘন্টা পর্যন্ত চলে। পাক বাহিনীর সাহায্যকারী ইসলাম তাদের এ অপকার্যে সাহায্য করেছিল। যখন পাক বাহিনী দেখল তাদের সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই তখন পাক দস্যুরা ইসলামকেও হত্য করে। প্রায় ২০০ মৃতদেহের মধ্যে জনগণ ২ জনের মৃতদেহকে সমাহিত করেছিল।

ঘোড়াশালের রেল ষ্টেশনের পাক বাহিনীর একটা ক্যাম্প ছিল। দৈনন্দিন খাওয়ার যাবতীয় জিনিসপত্র গ্রামের নিরীহ লোকদের নিকট হ'তে জোর করে নিয়ে যেত। পাক পশুরা তাদেও পশুত্ব চরিতার্থ করার জন্য গ্রামের যুবতী মেয়েদের উপর মাঝে মাঝে পাশবিক অত্যাচার চালাত। সত্যি কথা বলতে কি পাক বাহিনী সমগ্র ঘোড়াশালে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। ঘোড়াশাল বাজার বন্ধ হয়ে যায়, স্কুলে কোন ছাত্র আসত না। গ্রাম পায়ই জনশূন্য ছিল। যদি দু'একজন বাংগালী দেখত তাদের ধরে নিয়ে যেত কাজ করার জন্য। তখন মনে হতো আমার জীবনের মূল্য ১ পায়সাও নয়। হঠাৎ একদিন পাক বাহিনী আমাকে এবং আরও অনেক লোককে ধরে ফেলে। মুসলমান ছিলাম বলে বেঁচে যাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মাহমুদুল আশরাফ

\ ২১ \

শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
ডি, সি, টাঙ্গাইল

গোয়ালন্দের এস, ডি, ও, থাকাকালে পাকবাহিনী আমাকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখে। তারপর আমাকে ৩রা জুন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজার বাড়ীতে বন্দী রাখে। এই সময় নানা প্রকার শারীরিক অত্যাচারও করা হয়। জুনের ৪ তারিখে আবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে একদিনের জন্য রাখে। সেই রাতে আমার উপর অনেক অত্যাচার করা হয়। পরদিন আমাকে সেকেণ্ড ক্যাপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ২১ শে সেপ্টেম্বর অবধি বন্দী রাখা হয়। এই সময় আমাকে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার এবং প্রশ্নোত্তর করা হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত চার্জশিট দেওয়া হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান হয়। কারাগারের বাঙ্গালী কর্মচারীরা সকল প্রকার আমাকে সাহায্য করে এবং যথাসাধ্য আরাম আয়াসে রাখার চেষ্টা করে। আমার সাথে অনেক সরকারী কর্মচারীর মধ্যে ফরিদপুরের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক (বর্তমানে রেজিস্ট্রার, কো-অপারেটিভ সোসাইটি) জনাব আ, ন, ম, ইউসুফ, মাদরীপুরের মহকুমা প্রশাসক সৈয়দ রেজাউল হায়াত (বর্তমানে ঢাকার ডি সি) বন্দী ছিলেন। আমরা সবাই বিচারাধীন আসামী ছিলাম। ১৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে আমরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসি। গোয়ালন্দে আমার হুকুমে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে কুষ্টিয়া ৩০-৩১শে মার্চ ১৯৭১ আছমত ও কুদ্দুস নামে গোয়ালন্দ মহকুমার দু'জন আনছার শহীদ হয়। গেয়ালন্দ ঘাটে ২১শে এপ্রিল পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে ফকির মহীউদ্দিন নামে আর একজন আনছার শহীদ হয়। এছাড়াও তিনজন আনছার কুষ্টিয়ার যুদ্ধে আহত হয়। তাদের নাম আতিউর, রব ও জিয়াউদ্দিন। গোয়ালন্দ মহকুমার আর একজন আনছার নূরুল ইসলাম আমার সাথে বন্দী এবং দীর্ঘ যন্ত্রণাভোগের পর ১৭ই ডিসেম্বর মুক্তি পায়। আমি গ্রেফতার হবার পূর্ব পর্যন্ত গোয়ালন্দ মহকুমার দলমত নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের এবং সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিল।

স্বাক্ষর/-
শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
২৫-৭-৭৩

\ ২২ \

শরীফ উদ্দিন আহমদ
গ্রামঃ তারটিয়া
ডাকঘরঃ তারটিয়া ভাতকুড়া
টাঙ্গাইল

১৯৭১ সনের ১০ই জুন তারিখ বিকাল ৪টায় টাঙ্গাইল শহরের সদর রাস্তা হতে ১০ জন রাজাকার ও ৫ জন কুখ্যাত পাক বাহিনীর লোকেরা আমাকে ধরে টাঙ্গাইল জেলা সদরে তাদের আড্ডায় নিয়ে যায়। আমাকে রাস্তায় কোন দিকে তাকাতে দেয় না। আমাকে প্রথমে প্রশ্ন করে ভোট কোথায় দিয়েছ। আমি বলি নৌকায়। এই কথা বলার পর দুজন রাজাকার ও দুইজন পাক সৈনিক আমার উপর হান্টার ও চাবুক দ্বারা প্রহার আরম্ভ করে। তিনটা হান্টার ভাঙ্গার পর অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে একটা পচা গন্ধভরা কামরায় রেখে চলে যায়। তিন দিন আমাকে কিছু খেতে দেয় নাই। দৈনিক তিনবার করে আমাকে প্রহার করতো। এইভাবে ৫ দিন প্রহর করার পর আমার শরীর ফুলে পচে যায়। এরপর ৬ষ্ঠ দিনে তারা আমকে কারেন্ট মারে। ঐ কারেন্টের ধাক্কা লেগে দুইবার আমি ছিটকে পড়ে যাই। তারপর কি হয়েছে আমি জানি না। সারাদিন পর অজ্ঞান অবস্থা থেকে জেগে উঠে দেখি আমার সর্বাংগ রক্তাক্ত মেঝে রক্তে ভেসে গেছে। এপর অত্যচারের মাত্রা কমে যায়-দৈনিক একবার করে ১৯ তারিখ পর্যন্ত অত্যাচার চলে। ১৯ তারিখের পর আমি প্রায়ই অজ্ঞান অবস্থায় থেকেছি। এর মধ্যে আমি নিজ চক্ষে প্রতিদিন একদল করে লোক রাত্রি বারটার পর আড্ডার উত্তর দিকে নিয়ে যেতে দেখেছি। তাদেও আর ফিরতে দেখি নাই। নিয়ে যাওয়ার পর দূর থেকে শুধু প্রতি মুহূর্তে বিকট একটি করে আওয়াজ শুনেছি। এই অবস্থায় ১৭ দিন আমাকে রাখার পর ২৭ তারিখে মৃত মনে করে ফেলে দেয়। আমার একজন পরিচিত লোক মৃতদেহের ভান করে আমাকে রিক্সা করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়।

স্বাক্ষর/-
শরীফ উদ্দীন আহমদ

\ ২৩ \

কামিনী কুমার দাস
সার্কেল অফিসার (ডেভেলপমেন্ট)
রায়পুরা, ঢাকা

আমরা রায়পুরা থানায় তখন ২২টি ইউনিয়ন ছিল। বর্তমানে এখানে ২৮টি ইউনিয়ন। এখানে ৪ লাখ লোকের বাস। রায়পুরা থানায় ২২টি ইউনিয়নের মধ্যে মেঘনা নদীর দ্বীপ চরে ৫টি ইউনিয়ন(বর্তমানে ৬টি অবস্থিত)। এলাকা ১৫৪ বর্গমাইল। অত্র থানার পরিধির মধ্যে ৫টি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। আমার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাক বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল। তখন হেডকোয়ার্টর হতে হানাদারদের পৈশাচিক কার্যকলাপ পরিচালনা করত। চর এলাকার দু'টি ইউনিয়ন ও বাকি ইউনিয়নের মধ্যে ১৫টি ইউনিয়নে প্রজ্বলন কার্য চালায় হানাদাররা। যেহেতু রায়পুরা থানার মধ্যে ভাগ দিয়ে রেল রাস্তা অবস্থিত। ফলে রেল রাস্তার উভয় দিকের গ্রাম ও অভ্যন্তরেও পাক হানাদাররা বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয় ও নৃশংসভাবে জনসাধারণকে হত্যা করে। অত্র থানায় বেলাব ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত পাক বাহিনীর প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। ইহা ব্যতীত মীর্জানগর ইউনিয়নের হাঁটুভাঙ্গা ও মোছাপুর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে কয়েকবার পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের খণ্ড যুদ্ধ হয়। পাক বাহিনীকে ঘায়েল করা হয় এবং কয়েকজন পাকবাহিনী নিরস্ত্র জনতার হাতে মোছাপুর ইউনিয়ন ও মীর্জানগর ইউনিয়নে ধরা পড়ে। তাদের পরে হত্যা করা হয়। থানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাক বাহিনীরা ছাউনী খুলে থানাব্যাপী জনসাধারণের মাঝে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কবরস্থ করে। গণকবর এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কয়েকজন জোরপূর্বক ধর্মান্তর করে। ধর্মান্তরিত লোককেও বেদম প্রহার করে অত্যাচার করে এবং একজনকে হত্যা করে। থানার প্রত্যেকটি বাজার ওরা লুট করে। এ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে ঢুকে হানাদাররা রাজাকারদের সহায়তায় লুটতরাজ করেছে। থানা পুলিশ ষ্টেশনও হানাদারদের প্রজ্বলন থেকে বাদ পড়েনি।

স্বাক্ষর/-
কামিনী কুমার দাস
৬/১১/৭৩

\ ২৪ \

মোঃ আবদুল হাই
সাং-শাটিয়াচড়া
ডাকঘর-জামুকী
থানা-মির্জাপুর
জেলা-টাংগাইল

আমাদের গ্রামে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শহীদ হয়েছে:-

১। মোঃ জোমারত আলী দেওয়ান।
২। মোঃ নূর বকস
৩। মোঃ শাহ আলম
৪। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
৫। মোঃ হাবিবুর রহমান
৬। মোঃ দুলাল মিয়া
৭। মোঃ আব্দুল হাকিম
৮। বেগম আকতারুজ্জামান
৯। মোঃ লেবু মিয়া
১০। বেগম এখলাস উদ্দিন
১১। মোঃ ইব্রাহিম
১২। আব্দুল হক
১৩। বেগম মাজেম আলী
১৪। মোঃ মোতালেব হোসেন
১৫। মোঃ দুদু মিয়া

গুড়ান গ্রামের শহীদদের নাম:-

১। মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
২। মোঃ চেনু মিয়া
৩। মোঃ আবুল কাশেম
৪। মোঃ নূর উদ্দিন
৫। মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া
৬। মোঃ আবুল মাষ্টার
৭। মোঃ মজিবর রহমান
৮। মোঃ সামছুল হক
৯। বেগম নূরু ইসলাম
১০। আজমত আলী
১১। পান্না মিয়া
১২। বেগম আব্দুল বাকী মিয়া

৩রা এপ্রিল পাকবাহিনী ১৫০ খানা বাড়ীঘর সম্পূর্ন ধ্বংস করে দেয়। পাক বাহিনীর দালাল আমাদের গ্রামের দুইজন মহিলাকে ধরে পাক শিবিরে নিয়ে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

\ ২৫ \

আবুল কালাম আজাদ
নাগরপুর
টাংগাইল

১৬ই এপ্রিল টাঙ্গাইলে ডি,সি, জালাল আহমদ সাহেব এবং এ, পি, নূরুজ্জামান সাহেব আসেন লুঙ্গী পরা অবস্থায়। সব ঘটনা বলেন এবং ২/৩ দিন থাকেন আমার ওখানে গোপনে। ওঁদের বন্ধু ছিলেন টাঙ্গাইলের জনাব আযম খান। ওঁর সাথে আলাপ করে ঠিক করা হয় কাজে যোগ দেয়ার। আযম খান গাড়ী নিয়ে এসে নিয়ে গেলেন। এই খবর পাক গোয়েন্দা বিভাগ জেনে ফেলে আযম খানের বাড়ী ঘিরে ফেলে। ওঁদের তিন জনকে ব্যাপক মারধর করে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়। ঢাকাতে কয়েকদিন অত্যাচার করে জবানবন্দী নিয়ে তিন জনের জবানবন্দী এক হওয়ায় তাঁরা ছাড়া পান। প্রতিটি ষ্টেটমেন্টে আমার কথা ছিল। এমনকি আযম খানকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম সেটিও পাক কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়েছিলো। আমি সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। শেষ পর্যন্ত ওঁরা মুক্তি পেয়েছেন শুনে শান্তি পেলাম। ডি,সি ও এস,পি ৩০শে এপ্রিলের দিকে কাজে যোগ দেন।

১০ই মে ডি,সি'র ওখানে সভাতে পাক ক্যাপ্টেনের কথাগুলি বললেন। সভা শেষে ডি,সি, সাহেব গোপনে আমাকে ডেকে বললেন সাবধানে থেকো আর হিন্দুদেরকে বলো সাবধানে থাকতে, পূজাগুলো এখন বন্ধ রাখতে বলো- বাঁচলে অনেক কিছু করতে পারবে। আমি সে মোতাবেক রাত ১০টায় পৌছে সবাইকে ডেকে এ খবর দেই; তারা সেইমত সাবধানতা অবলম্বন করে।

ভোর রাতে প্রচুর গুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাড়ীতে সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। দেখলাম পাক সেনারা তিন দিক থেকে নাগরপুর আক্রমন করেছে-অত্যাচার চালাচ্ছে। আমরা গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে, ক্যাপ্টেন বললো তুমিই সেই ম্যাজিষ্ট্রেট যে জামুর্কীতে আমার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়েছিলে। তুমিই তো গতকাল হিন্দুদেরকে পালিয়ে যেতে বলেছ। আমি চুপ থাকলাম। ক্যাপ্টেন আমাকে খুব গালাগালি করলো, সেই কিছু কিছু হিন্দু ধরে এনে বেয়োনেট চার্জ করতে লাগলো। আমার খবর শুনে রাতেই অধিকাংশ হিন্দু পালিয়ে গিয়েছিলো। ফলে বহু লোক সেদিন বেঁচে যায়।

ক্যাপ্টেন আমাকে ১ ঘন্টা সময় দেয় যে এর মধ্যে ১০০ হিন্দু এনে দিতে হবে। নইলে একটি বুলেট তোমার জন্য বলেই এক চড় মারে। আমি এ্যাডামেন্ট হয়ে বেশ কথা কাটাকাটি করলে ক্যাপ্টেন নরম হয়ে আমাকে গাড়ী করে নিয়ে যায়। থানায় গিয়ে দেখলাম ৮/১০ জন নিরীহ লোককে হত্যা করার জন্য রেখেছে। আমি ওরা ঝাড়ুদার বলে ওদেরকে বাঁচাই। ডাঃ কাশেম (ডেন্টিষ্ট) এবং ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার আমার বিরুদ্ধে টিক্কা খাঁর কাছে দরখাস্ত করেছিলো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কাজ করায়।

ঐ দিন পাক সেনারা সামনে যাদেরকে পেয়েছে তাকেই গুলি করে হত্যা করেছে। থানায় যেতে গিয়ে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। বার ঘাট, বাড়ী-ঘর সব ওরা লুট করে নেয়।

আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে ক্যাপ্টেন চলে যায়। আধ ঘন্টা পরে ডেকে পাঠায়। যাওয়ার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন আমার বুকে রিভলবার ধরে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে মারধর শুরু করে। সেখানে ২০/২৫ জন হিন্দু লোককে শুইয়ে রেখেছে দেখলাম। চারদিকে সিপাইরা বেয়োনেট উচিয়ে ঘিরে ধরলো। আমার বিরুদ্ধে চার্জ দিলো আমার বাড়ী থেকে নাকি ৬ রাউণ্ড গুলি ছুড়েছে পাক সেনাদের উপর। অনেক কাকুতি করে ১ মিনিট

বলবার সুযোগ পাই। বেশ কিছুক্ষণ পাকস্তানের পক্ষে মিথ্যা-সত্য বলে ক্যাপ্টেনকে কনভিন্স করি। ক্যাপ্টেন সব শুনে দেখ আমার সাথে হ্যাণ্ডশেক করে বলে তোমার বাঙ্গালীরাই তোমার শত্রুআমরা কি করবো। তারাই তোমার বিরুদ্ধে বলেছে। থানাতে গেলে ২৫/৩০ জনকে গুলি করার আদেশ দেয়। আমি বললাম এরা সবাই কৃষক এদের মেরে কি করিবে? ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু মার দিয়ে দুইজন বাদে সাবইকে ছেড়ে দেয়। আমার বাড়ীর সবাই বেঁচে যায়। পাক সেনারা চলে গেলে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কয়েক ঘন্টা পর আমার জ্ঞান ফেরে। নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে সেবার বেঁচে গেলাম।

২৮শে মে মুক্তি বাহিনী নাগরপুর আক্রমন করে। আমার ওখানে ওয়্যারলেস সেট ছিল সেটি নিয়ে যায়। কাশেম ডাক্তারকে (দালাল) ধরে হত্যা করে। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার পালিয়ে যায়। আমি পালিয়ে টাঙ্গাইল চলে যাই পাক সেনাদের ভয়ে।

নারী ধর্ষণ, প্রজ্বলন ধ্বংস পাক সেনারা করেছে।

স্বাক্ষর/-
আবুল কালাম আজাদ
১৬/৮/৭৩

\ ২৭ \

মোঃ কাজেম উদ্দিন
গ্রাম-ফুলদহের পাড়া
ডাকঘর-পিংনা
থানা-সরিষাবাড়ী
জেলা-ময়মনসিংহ

হানাদার বাহিনী আমাদের গ্রামের ১৪ জন যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং ৯ জন মুক্তিফৌজকে হত্যা করে। গ্রামবাসী অনেকেই পার্শ্ববর্তী গ্রামে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধের শেষে গ্রামে এসে দেখি রোজ কিয়ামত আর কি? দাফন কাফন করার মানুষ পাওয়া যায় না।

আমাদের গ্রামে যে কয়েকজন শহীদ হয়েছেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করলাম:-

মোঃ নূরুল ইসলাম, বি,এ; মোঃ আমিনুল ইসলাম; মোঃ মাতিয়ার রহমান; মোঃ কাংগালীয়া; মোঃ আবদুল হালিম; মোঃ জামাত আলী; মোঃ আনোয়ার হোসেন; মোঃ ছেকান্দর আলী; মোঃ আছমত আলী; মোঃ মোনছের আলী; মোঃ মুসলিম উদ্দিন; মোঃ বাবুল হোসেন; মোঃ আবদুস সামাদ; দুদু মিয়া।

স্বাক্ষর/-
মোঃ কাজেম উদ্দিন

\ ২৮ \

খাজা কামরুল হক
গ্রাম-নওয়া
পোঃ-কিশোরগঞ্জ
ময়মনসিংহ

সর্বপ্রথম ১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী কিশোরগঞ্জ মহকুমার সদর এরলাকায় প্রবেশ করে। ভৈরব হতে ট্রেনযোগে প্রায় দুই শতাধিক হানাদর সৈন্য ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঐদিন বিকেল ৪ ঘটিকায় কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত লোক তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। মুক্তি সংগ্রামীরাও তাদের হালকা অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পাক সৈন্যরা শহরের মধ্যে প্রবেশ করে পলায়নপর লোকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। তাদের প্রথম বলি হয় জনৈক রিক্সাওয়ালা এবং একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। সন্ধ্যার সময় তারা মাইকযোগে স্থানীয় সকল লোককে নিজ নিজ বাসভবনে ফিরে আসার জন্য আহবান জানায়; কিন্তু এত কেউ কর্ণপাত করেনা। এ সময় জনৈক ধর্মান্ধ দালালের ইশারায় তারা এখানকার পতিতালয়টি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেয়।এরপর তারা বহু বাড়ীঘর বিশেষ করে হিন্দুদের বাড়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে জ্বালিয়ে দেয়। পরদিন পাক সৈন্যরা মাইকযোগে পুনরায় লোকজনকে ফিরে আসার আহবান জানায়। যে সমস্ত দোকানপাট হিন্দুদের ছিল সেগুলির তালা ভেঙ্গে লুট করার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করতে থাকে। ভীতসন্ত্রস্ত জনগণ লুটের মাল মাথায় নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় পাক সেনারা সে অবস্থায় তাদের কিছুসংখ্যকের ফটো তুলে নেয় এবং তারপর সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে।

মে মাসের প্রথম দিকে ভৈরব থেকে আরও কিছু সংখ্যক সৈন্য আসার পর তারা স্থানীয় ডাক-বাংলোয় ঘাঁটি স্থাপন করে এবং পি,ডি,পি জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামের লোকজনকে নিয়ে এক শান্তি কমিটি গঠন করে।

এরপর হানাদার সৈন্যরা স্থানীয় দালালদের সহায়তায় রাজাকার ও আল-বদর বাহিনী গঠন করে। এদের সহযোগে তারা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বিচারে ও কোথাও কোথাও বেছে বেছে লোককে হত্যা করতে থাকে।

১৮ই এপ্রিল থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই আট মাসে পাক হানাদাররা কিশোরগঞ্জ সদর এলাকায় ৩০০ থেকে ৪০০ লোককে হত্যা করেছে এবং ১ কোটি টাকার মত সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করেছে। গাঙ্গাকিয়া গ্রামের বিশিষ্ট পরোপকারী জমিদার ভূপতি বাবুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জুন-জুলাই মাসের দিকে একদিন পাক সেনারা ভূপতি বাবুর বাড়ী ঘেরাও করে তাঁকে ধরে ফেলে। স্থানীয় জনগণকে তাঁর বাড়ী লুট করাতে বাধ্য করে। ভূপতি বাবুর অন্তিম ইচ্ছা কি পাক ক্যাপ্টেন তা জানতে চাইলে তিনি প্রথমে প্রাণের বিনিময়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেবার কথা জানান; কিন্তু পাক ক্যাপ্টেন তা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দেয়। তখন ভূপতি বাবু জীবনের শেষবারের মত একটা গান গাইতে চান। উল্লেখযোগ্য তিনি একজন গুনী সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন। তার আরজি মঞ্জুর হলে তিনি যে গানটি গান তাতে উপস্থিত জনগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পাকহানাদাররাও সঙ্গীতের মূর্ছনায় বিগলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভূপতি বাবু রক্ষা পান নাই। পরে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের ছাত্র চিস্তিসহ কয়েকজন ছাত্রকে পাক ফৌজরা হত্যা করেছে।

কিশোরগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবতী মেয়েদেরকে তারা ধরে এনে ধর্ষণ করতো। প্রায় শতাধিক জনের উপর তারা নির্যাতন চালিয়েছে।

স্বাক্ষর/-
খাজা কামরুল হক
৫/৪/৭৩

\ ২৯\

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ পোদ্দার
গ্রাম-জামুর্কী
থানা- মির্জপুর
জেলা- টাংগাইল

১৯৭১ সালের ১০ই নভেম্বর পাক বাহিনী আমাদের গ্রামে আসে। আমি পালাতে চেষ্টা করছি। এমন সময় একজন পাক দস্যু আমাকে ডাকিয়ে তার সামনে হাজির করলো। আমাকে বলল, ''চল বেটা আমাদের শিবিরে''। পাক শিবিরেনিয়ে পাকবাহিনীর গাড়ীতে করে আমাকে অন্য এক শিবিরে পাঠিয়ে দিল। শিবিরে নিয়ে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলো। আমাকে বলে, ''তোদের গ্রামে কোন মুক্তি বাহিনী হ্যায়?'' তখন উত্তর দেই, আমাদের গ্রামে কোন মুক্তি বাহিনী নেই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লাঠি দিয়ে বেদমভাবে প্রহার করলো। তারপর অন্য একজন রাজাকার এসে আমাকে বলে বেটা মালাউন হ্যায়। বেটাকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়া দেখাচ্ছি। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করলো। আমি তখন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রইলাম। তারপর আমার যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমাকে একটি নদীর ধারে নিয়ে গেল, আমি মনে করলাম আমার জীবনের শেষ লীলা এখানে বুঝি শেষ হবে। আমাকে প্রথমে মাটির উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখল। কিছু পর একজন পাক দস্যু এসে আমাকে ভীষণভাবে লাথি মারল এবং বেয়নেট দিয়ে আমাকে পেটের উপর আঘাত করলো। এই আঘাতে আমার জীবন শেষ হয়ে যায় যায়। তখন আমি কোন রকমে জল টেনে মাটির উপর ভর করে থাকি। কোন রকমে আমি সাঁতার কেটে নদীর ওপাড়ে যেয়ে আমার আঘাত স্থানে গেঞ্জি দিয়ে বেঁধে বহু কষ্ট করে নদীর জল হতে উঠে কোন রকমে আমার বাড়ীতে চলে আসি।

বাড়ীতে ডাক্তার এসে ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো।

আজ পর্যন্ত আমার ক্ষতস্থানে তার চিহ্ন রয়েছে।

স্বাক্ষর/-
শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ পোদ্দার

\ ৩০ \

মাজিবর রহমান
গ্রাম-জামুর্কী
থানা- মির্জপুর
জেলা-টাংগাইল

১৯৭১ সালের ৭ই আগষ্ট পাক বাহিনী আমাদের গ্রামে আসে। আমি ঐ সময় আমাদের গ্রামে দক্ষিণ পার্শ্বে বসে ধান কাটছিলাম। এমন সময় দুইজন পাক বাহিনী এসে আমাকে ধরে নিয়ে বলল, ''তোদের গ্রাম থেকে আমাকে হাঁস-মুরগী ধরে দিতে হবে।'' আমি তখন বাধ্য হয়ে হাঁস-মুরগী ধরে পাক বাহিনীর হাতে দিলাম। তারপর আমাকে বলল তোদের গ্রাম থেকে ছাগলও দিতে হবে। ছাগল এনে হাতে দিলাম। তখন আমাকে বলল, ''ছাগল নিয়ে তোকে আমাদের ক্যাম্পে যেতে হবে।'' তখন আমি নিরুপায় হয়ে পাক শিবিরে চললাম।

পাক শিবিরে নিয়ে আমাকে ওদের রান্না করতে বলল। আমি তখন বললাম, ''না হুজুর আমি পাক করতে জানিনা।'' তখন আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে পনিতে ফেলে দিল। আমাকে আর পানি হতে উঠতে দেয় না। আমি জোর করে পানি হতে উঠলে আমাকে পাদুকা দিয়ে লাথি মারল এবং বেতের লাঠি দিয়ে প্রহার করতে থাকে। বেতের লাঠি দিয়ে প্রহার করলে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তখন আমাকে রেখে পাক দস্যুর দল চলে যায়। তখন আমি কোন মতে বাড়ীর পথে রওয়ানা হই। আমি বাড়ীতে এলে আমার ছেলে রেজাউল ইসলাম ডাক্তার ডেকে এনে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

এই চিকিৎসা বাবদ মোট ৩০০ টাকা খরচ হয়।

টিপ সহি
মজিবর রহমান

\ ৩১ \

মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন
গ্রাম-সরিষাবাড়ী
ডাকঘর- সরিষাবাড়ী
ময়মনসিংহ

আমার বাস হতে সরিষাবাড়ী থানার পাক বাহিনীর শ্রেষ্ঠ কসাইখানা আরামনগর মাদ্রাসা মাত্র কয়েকশ গজ দূরে অবস্থিত। আমি ছোটবেলা থেকেই অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সৃষ্টি হতেই তার সমর্থক। ২৫শে মার্চের কালো রাতের বিভীষিকার পর থেকেই আমি সংগ্রামে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হই। আমার ধানটা মহল্লায় গোবিন্দনগর নিবাসী অফিল উদ্দিন খান নামক একজন বাঙালী প্রাক্তন সৈনিকের দ্বারা ২৫ জন যুবকে রাইফেল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করি। কিন্তু হঠাৎ টাঙ্গাইল, মধুপুর ও জামালপুর পাক বাহিনীর দখলে যাওয়ায় আমরা প্রকাশ্যে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করি। সরিষাবাড়ীতে রাজাকার আল-বদরদের প্রাধান্য বাড়ে। পাক বাহিনীও যাতায়াত করতে থাকে। ২রা জুলাই ১৯৭১ইং রোজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর থেকে বাসায় বসে আছি। বসেছিলাম একদম নিরিবিলি। বেতারের খবর শুনতেও মন বসছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল। চোখে ঘুম নেমে এলো। রাত ১০-১১ টার পূর্বে কোনদিনই নিদ্রামগ্ন হইনি। কিন্তু সেদিন রাত আটটা বাজার আগেই ঘুমিয়েছিলাম।

রাত গোটা নয়েকের সময় বেশ কয়েকজনের পদচারণায় এবং আনাগোনায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। আগন্তুকেরা পাক বাহিনীর লোক কিন্তু তারা এসেছিল মুক্তি ফৌজের বেশ ধরে। তারা আমাকে চাপা গলায় ডাকতে শুরু করল। আমি তাদেরকে অবিশ্বাস্ত করতে পারিনি। তাই দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারা আমার সাথে চুপিসারে কথা বলতে থাকল। আমার নিকট মুক্তিফৌজের জন্য কিছু চাঁদার আবদার জানালো। আমার নিকট তখন মাত্র ১৫ টাকা ছিল তাই তাদের হাতে দিলাম। এরপর তারা আমাকে বাউসার রেল সেতুটা কোন পথে গিয়ে চুরমার করা যাবে তাই দেখিয়ে দিতে বলল এবং এক প্রকার জোর করেই আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল রেল লাইনের দিকে। আমি কোন কিছু ভাব্বার ফুরসত পেলাম না। আমার পরনে ছিল তখন একখানা লুঙ্গি, গায়ে ছিল গেঞ্জি, পায়ে ছিল জুতা। গায়ে জামা দেবার অবকাশ ওরা আমাকে দেয়নি। রেল লাইনে গিয়েই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওরা মুক্তিফৌজ নয়। ক্যাপ্টেন শামশাদের বাহিনী। স্থানীয় আলবদর বাহিনীর ক্যাপ্টেন মাওলানা আনছার আলী, আবু, মুসলিম লীগ দালাল আঃ হক ফেরদৌসি ও নূরুল ইসলাম খান ও আরো অনেকে। সবাই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, হঠাৎ আমার পার্শ্বেই একটা ফাঁকা গুলি হল। আমি রীতিমত হকচকিয়ে গেলাম। সাথে সাথে আমার হাতে পিঠমোড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল ওরা। আর বারবার আমার কানের কাছে জয় বাঙলা বলে উপহাস করতে লাগলো। জীবনের আশা নেই নিশ্চিত হয়ে পড়লাম। অদূরে আমার বাসা হতে পরিবার পরিজনের করুন কান্না ভেসে আসছিল। ক্যাপ্টেন শামশাদের হুকুমে ওরা আমাকে নিয়ে আরামনগর মাদ্রাসায় আলবদর ক্যাম্পে রওনা দিল। আমার পায়ের তলা হতে যেন প্রতি পলে পলে মাটি সরে যেতে লাগল। কিভাবে মাদ্রাসা ক্যাম্পে পৌছেছিলাম তা মনে নেই। ওরা আমাকে মাদ্রাসা ক্যাম্পে পাহারায় রেখে চলে গেল সাতপোয়া গ্রামের আঃ মজিদ চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীতে। অল্পক্ষণের মধ্যে তাকে না পেয়ে ফিরে এলো ক্যাম্পে। এরপর আমার হাতের বাঁধন ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। আবার যাত্রা শুরু হলো রেল লাইন ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে। এই পথে চলার সময় ওরা আমার সাথে যে ব্যবহার করেছিল তা মনে করলে আজও আমার চোখ ফেটে কান্না আসে, আমি যেন একটা বদ্ধ পাগল। কেউ পিছন থেকে দেয় ধাক্কা কেউ দেয় রাইফেলের বাঁট দিয়ে পায়ে গুঁতো। কেউ পা দিয়ে পায়ে আঘাত করে ফেলে দিতে

চায়। তাছাড়া উপহাস যা করছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছে ওরা। সেখানে নাকি জয় বাংলা জয়গান শুনা যাবে ইত্যাদি। মনটা তিতিয়ে উঠলো ওদের ব্যাবহারে কিন্তু করবার আমার কি আছে? ক্যাপ্টেন শামশাদের ৭৫ জন পাক বাহিনীর একটা দল সাতে স্থানীয় আল বদর বাহিনী ও তাদের তাঁবেদার দালালবৃন্দ। এই নরপিশাচদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া একটা বন্দী মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব কি না তা আপানারাই বিবেচনা করুন। কোন মুহূর্তে অবস্থার কি পরিবর্তন আসবে আমি তা ঠাওর করতে পারলাম না। ক্রমে ওরা আমাকে নিয়ে চলে চান্দ দিঘির রেল সেতুর উপর এসে পৌছল। ওরা আবার এক দফা আমার হস্তের বন্ধন পরীক্ষা করে নিল। মানুষ সাগরে ডুবতে গিয়েও তৃণখণ্ডকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেষ্টা করে একথা পুথি পুস্তকে পড়েছিলাম। ষোল আনা বিশ্বাস করতে পারিনি। পুলের উপর এসেই আমার কেন যেন মনে হলো পুলের নীচে ঐ অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচবার চেষ্টা করা যায় নাকি। কি করব মনস্থিও করতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন শামশাদ আমার পার্শ্বে চলছে, পুল পার হয়ে গেলাম, পশ্চিম পার্শ্বেই মোজাম্মেল হোসেন তালুকদার সাহেবের বাড়ী। ওরা দুই ভাগে হলো, হঠাৎ পণ্ডিত বাড়ীতে একটা ফাঁকা গুলি হলো। তাদের অগ্রগামী দলটি ঐ বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। পিছনের দলটি মাটিতে শুয়ে পড়ল রেল লাইনে। আমাকেও শুইয়ে দিল মাটিতে। কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এলো তালুকদার বাড়ী হতে। মোজাম্মেল হোসেন তালুকদারকে ওরা ধরতে পারেনি। আমি নিজের অসহায় অবস্থার মধ্যেও কিছুটা তৃপ্তি পেলাম, যেহেতু তালুকদার সাহেব আমার অবস্থায় নিপতিত হননি।

আবার যাত্রা হলো শুরু দক্ষিণ দিকে। বেশী দূর নয়; পুটিয়ার পাড় গ্রামে এসে ওরা থেমে পড়ল। আবার শুয়ে পাড়ল মাটিতে। আমাকে শুইয়ে দিল মাটিতে। কয়েকজন গেল মতিলাল রায়ের বাড়ীতে। ওদের লোক মতিলাল বাবুর বাড়ী থেকে ফিরে এসে কি যেন জানাল। রেল লাইনে কয়েকজন মেশিনগান ফিট করে পাহারায় রাইল। বাদবাকি সবাই চলল মতি বাবুর বাড়ী। ক্যাপ্টেন শামশাদ আমাকে নিয়ে গেল তার সাথে, মাতি বাবুর বাড়ীর সামনে এসে সবাই আবার শুয়ে পড়ল মাটিতে, আমাকে শুইয়ে দিল। কয়েকজন চলে এলো এদিকে এবং মতিবাবুর বাড়ীর মধ্যে। মাতিবাবুর বাড়ীতে কাউকে ওরা পেল না। পাশের বাড়ী হতে ধরে নিয়ে এলো একটি যুবককে। ওকে আমি চিনতাম, ওর নাম রাধা। রাধাকে যখন নিয়ে এলো তখন ওর গলা লেপটে ধরে ছিল ওর একমাত্র মাতৃহারা শিশুকন্যাটি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই ও মেয়েটিকে মাতৃস্নেহে পালন করছিল। রাধার ঠাকুর মা বুড়ীর এই মর্মান্তিক ঘটনা অবলোকন করার জন্য বেঁচেছিল, বুড়ী রাধার সাথে মতিবাবুর বাহিরাঙ্গিনায় এসে হাজির হলো। ক্যাপ্টেন শামশাদ তখন রাধার নিকট গিয়ে বুকে জড়ানো শিশুটিকে রাধার ঠাকুর মাকে দিতে বলল।

রাধা প্রাণপণ চেষ্টা করেও শিশুটিকে তার ঠাকুরমার কোলে দিতে পারলো না। মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত শিশুটি কিছুতেই পিতৃস্নেহ হতে যেন বঞ্চিত হতে চায় না। তাই সে কোমর বেষ্ট করে পিতার বুকে মিশিয়ে পিতৃস্নেহের অসীম ধারা যেন উজাড় করে নিচ্ছিল। কিন্তু সে মাত্র ক্ষণিকের জন্য। তারপর যে চিত্রের অবতারণা হলো তা মনে করলে আজও আমার সংজ্ঞা লোপ পেতে চায়। তখন আমি পাথরে পরিণত হয়ে যাই। আমার মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে যায়। তবু আমাকে বলতেই হচ্ছে। দুরাচার ক্যাপটেনের ইঙ্গিতে একজন হানাদার সৈনিক রাধার শিশুটির বুকের ফাঁক দিয়ে একটা রাইফেল ঢুকিয়ে এমনভাবে ঝটকা দিল যে শিশু ৭/৮ হাত দূরে ছিটকে পড়ে পা আছড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার মনে হলো আদিমাতা বিবি হাওয়া যেমতে ছিটকে পড়ছিলেন, বুড়ীটাও হাউমাউ করে কেঁদে উঠে রাধার শরীর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন, ক্যাপ্টেন শামশাদ পিছন ফিরে তার বুকের উপর সজোরে লাথি মেরে চিৎপটাং করে ফেলে দিল। তারপর ওখানে কোন পরিবেশের সৃষ্টি হলো তা অবলোকন করার ভাগ্য আমার হয়নি। ওরা রাধাসহ আরও কয়েকজনকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে রেল লাইনে এলা, আমাকেও নিয়ে এলো। লাইনে এসে পুনরায় আমার হাতের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল। আমি এরপর হাত দুটি একটু জোরে অথচ ওরা যেন দেখতে না পায় এমনভাবে ঘসা দিলাম, তাতেই মনে হলো হস্তের বন্ধন

শিথিল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম হাত খসে গেছে; তবু তা বাঁধা আছে এমন ভাবেই রেখে দিলাম। ইতিমধ্যেই ওরা ধরে আনা লোকদের মধ্যে হতে ৪ জনকে লাইন করে বসিয়ে মেশিনগান দিয়ে দু-তিনটি গুলি করল। নিরপরাধ চাটি মানুষ হুমড়ী খেয়ে পড়ে গেল মাটির বুকে।

আমি মাত্র ৭/৮ হাত দূরে থেকে এ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করলাম। তখন আমি প্রকৃতস্থ ছিলাম কিনা মনে নেই। শুধু এই মনে আছে আমার মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন সবাই যেন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই যেন আমাকে বিদায় দিতে এসেছে আমি যেন মহাশূন্যের অভিযাত্রী। ওরা গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে আর আমি তার আওয়াজ শুনে উঠতে থাকলাম শূন্যে। এমনিভাবে কতক্ষণ গিয়েছিলাম মনে নেই পা তুলতে থাকলাম ক্রমাগত কিন্তু পায়ের নীচে মাটি আছে কিনা অনুভব করতে পারলাম না। ওরা আমাকে নিয়ে ফিরে চলল উত্তর দিকে। আমার সাথে আর একজন বাঁধা অবস্থায় এলো। ওকেও আমি চিনতাম। তার নাম কালু। আমরা উভয়ে বন্দী অবস্থায় এগুতে লাগলাম পুনরায় চান্দ দীঘির পুলের দিকে যেহেতু আমরা পূর্বপরিচিত তাই আমাদের মধ্যে পথের মাঝে কোন কথাবার্তা প্রকাশ্যে হয়নি। মনে মনে ভাবলাম মরতে তো হবেই তবু বাঁচবার একটু চেষ্টা করে দেখি না কেন? তাতে ধরা পড়ি যদি তাইে বা ক্ষতি কি? এদের হাতে গেলে জীবন যে ফিরে পাওয়া যায় না তাতে নিশ্চিত ছিলাম তাই ভিতরে ভিতরে বাঁচবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। সামনেই চান্দদীঘির পুল। আমার জীবন রক্ষার সোপান।

পুলের উপর পা বাড়ালাম। হানাদারেরা আমাকে মধ্যে রেখে দুপাশ দিয়ে লাইন করে অগ্রসর হতে লাগল। আমি মিছিমিছিই টলতে লাগলাম। একবার এদিকে একবার ওদিকে পড়ে যাই যেন এমনিভাবে দেখাতে লাগলাম। পুলের দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেল। আমার ইচ্ছার প্রতিফলন করতে পারলাম কই? ঘেমে উঠল সারা গা নিরাশার অমানিশায়। এমন সময় হঠাৎ পুলের পূর্ব পাশ দিয়ে চলার ফুরসত পেলাম। এক পা, দুই পা, তিন পা, আর নয়, সিঁড়িতে পা না দিয়ে শূন্যস্থানে পা দিয়ে শরীর ছেড়ে দিলাম। পড়ে গেলাম পুলের নীচে। যার হাতে আমার হাত বাঁধা রশি ছিল সে আমাকে ধরে রাখতে পারল না। ওরা উপরে কি করছিল তা আমার খেয়াল নেই। আমি ততক্ষণে পুলের নীচে পাকা খাম্বার সাথে দেহটাকে মিলিয়ে আছি। সে মাত্র ক্ষণিকের জন্য পরেই ডুব। এক ডুব, দুই ডুব, তিন ডুব দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গিয়ে মাথা ভাসিয়ে দেখি ওরা টর্চলাইট দিয়ে আমাকে খুঁজছে। টর্চের আলোটা তীক্ষ্ণ ছিলনা তাই রক্ষা। ওরাপ পুল পার হয়ে গেল। আমি প্রাণপণে সাঁতরাতে শুরু করলাম। কিন্তু বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। আমার হাত বাঁধা রশিটা এক হাতে বাঁধাই ছিল। সাঁতরাবার সময় সেটা যে বিপর্যয় আনতে পারে তা আদৌ মনে হয়নি। এক্ষণে তা ক্রমাগত আমার উরু বেষ্টন করে সন্তরণ বন্ধ করে দিতে লাগল, এক পা এবং এক হাত বন্ধ হয়ে গেল। ওটা ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করে আরও পেরেশান হয়ে পড়লাম। তখন আমি চান্দ দিঘীর মাছখানে অতল জলে। স্রোত নেই; বাঁধা পানি গাও এলিয়ে দিলে শরীর ডুবে যায়। এক হাতে আর এক পায়ে সাঁতরে চলেছি। ওরা দেখতে পেলে যে কোন মুহূর্তে গুলি করে এই চিন্তায় আরও অস্থির হয়ে পড়লাম। পাক বাহিনীর হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে এখন বুঝি সলিল সামাধি রচিত হয়। মনে হতে লাগল, মৃত্যু অবধারিত। পাক বাহিনীর গুলি হতে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম সত্য কিন্তু ওদের রশি থেকে বুঝি মুক্তি নেই। খোলা হাত দুটি আস্তে আস্তে নাড়াতে লাগলাম। খোদার নাম জপতে থাকলাম, নিরুপায় সেই অন্তিম মুহূর্তে। এখনি হয়ত ডুবে যাব চান্দদীঘির কাজল জলে। হঠাৎ একটা কচুরীপানার চাকা হাতে লাগল। ওরই উপর একটু ভর দিলাম। আমাকে আশ্রয় দিল না ডুবে গেল। আবার পেলাম আর একটা চাকা সেখানে ঐ অবস্থাই ঘটল। তবুও কিছু নিঃশ্বাস কাটার অবকাশ পেলাম। এমনইভাবে ক্রমাগত কচুরী পানার উপর ভর রেখে চান্দ দীঘির পশ্চিমে গিয়ে অবশের মত পড়ে রইলাম। কিন্তু আমাকে পড়ে থাকলে চলবে কেন? আমি বাঁচতে চাই। ওরা যদি আমাকে খালের ধার দিয়ে খুঁজতে আসে। আমি পাশের পাট ক্ষেতের মধ্যে গড়িয়ে পড়লাম। আমার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। দু তিনবার চেষ্টা করে দেখলাম দাঁড়াতে পারিনে।

শরীর অবশ প্রায় হয়ে গেছে। দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যাই। ওরা যে কোন মুহূর্তে আমাকে ধরতে পারে এই ভয়ে আমি আরও অস্থির হয়ে পড়লাম। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলাম ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে। রাস্তা বা ক্ষেতের আইল বাদ দিয়ে শুধু পাট ক্ষেতগুলির মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলাম। দু-চার গজ করে যাই আর থেমে শুনি কোথাও কেউ আসছে নাকি। ভেকের ডাকে চমকে উঠি। জীবনের মায়া আর মৃত্যুভয় কতখানি সেদিন তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম। হামাগুড়ি দিয়ে পাটক্ষেতেগুলি মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে পৌছলাম গিয়ে মূলবাড়ী গ্রামে আলহাজ মৌলভী শাহেদ আলী সাহেবের বাড়ীতে। মৌলভী সাহেব আমার ছেলেমেয়েদেরকে ডেকে এনে আমার প্রাণ রক্ষা করলেন। তারপর মৌলভী সাহেব আমাকে মুক্ত এলাকায় পাঠিয়ে দেন। এইভাবে আমি পাক সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন

\ ৩২ \

শ্রী মনোরঞ্জন দত্ত
গ্রাম-সরিষাবাড়ী
ডাকঘর- সরিষাবাড়ী
থানা- সরিষাবাড়ী
ময়মনসিংহ

বর্বর পাক ফৌজের অত্যাচারের কাহিনী বাংলার জনসাধারণ চিরদিন ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করবে। মানুষ ক্ষমতা এবং স্বার্থের মোহে কেমন ব্যবহার করতে পারে সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে- শোষিত, অত্যাচারিত, ভদ্র বাঙ্গালী উদার নৈতিক মনুষ্যত্বের পথকে খুঁজে নেবার সুযোগ পাবে এবং তারা স্বাধীনতার সুবর্ণ স্বাদকে সুমধুর করে উপভোগ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। আমার মনে পড়ে শহীদ আবদুল হামিদ মোক্তার, শহীদ হাসান খান, শহীদ সুরেন দত্ত, শহীদ ধীরেন বাবু এবং সমাজসেবক ওয়াছিম উদ্দিন সাহেব এবং সাব-রেজিস্ট্রার আবদুল হাই সাহেব ও আমার নিজের অমানুষিক নিপীড়নের ইতিহাস। তখনও থানা পর্যায়ে পশ্চিমা অত্যাচারের কসাইখান খোলেনি। একদিন আমাদেও থানার দারোগা আমাকে এ্যারেষ্ট করে জামালপুর হাজতে চালান দিল। অপরাধ আমরা হিন্দু তার উপর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের সহায়তা করছে- গুরুতর অপরাধ সুতরাং শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হাজত থেকে আমাকে মিলিটারী ক্যাম্পে চালান দেয়। আমি ভাঙ্গা উর্দু বলতে পারি। পশ্চিমা জল্লাদরা তাই আমাকে মেরে ফেলার আগে আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবার ফন্দি আঁটল। আমার আয়ু বাড়িয়ে দিল কয়েকদিন। ওরা আমাকে দোস্ত বলে। আমি কোন ভরসা পাই না- আমার আত্মারাম তো খাঁচা ছাড়া। আমাকে বলে শুধু আল্লাহকে ডাক, ইত্যাদি আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করে এবং দোভাষীর কাজ আদায় করে। যে সমস্ত স্বাধীনতকামী বাঙ্গালীদের তারা একদিক থেকে হত্যা করার জন্যে ফন্দী করছিল তাদের জবানবন্দীকে কোন রকমে উর্দু করে বুঝিয়ে দিতে হত আমাকে। দাসত্বের এতটুক স্বাধীনতার কিছু কিছু ভালো আচার ব্যবহার পেতাম আমি। এই করে আমি সুষ্ঠভাবে ভাবনাচিন্তায় সহজ মানসিকতা খুঁজে পাই। কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং এই মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সে কথা মনে মনে সারাক্ষণ ভাবি।

দিন যেতে থাকে। আমি দিনের পর দিন অত্যাচার ও অবিচারের অমানুষিকতা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সে কি মার, সে কি অত্যাচার- ভাষা দিয়ে সে বর্বরতা প্রকাশ সম্ভব নয়। চড়, ঘুষি, বুটের লাথি, গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দেয়া, উপরে পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বেদম প্রহার.. সে ইতিহাস নাকে, মুখে রক্ত ঝরার ইতিহাস, বর্বরতার ইতিহাস তার বর্ণনা হয় না। এই অবস্থা দেখে আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

অবশেষে একদিন আমাকে ও আরও কয়েকজনকে বলল যে, তোমাদের ময়মনিসিংহ পাঠানো হবে। আমাদেরকে ট্রাকে উঠতে বলল। ট্রাক চলতে থাকে কিন্তু আমি তখন দেখলাম ট্রাক ময়মনসিংহের পথে না যেয়ে উপস্থিত হলো শ্মশানঘাটে। তখন আমার আত্মা উড়ে গেল। স্মৃতির পটে পৃথিবীর আলো, মা, বাবা, জন্মভূমি ভিটে, স্ত্রী, সন্তানের মুখ ছায়ার মত কাঁপতে কাঁপতে ভেসে উঠল, তারপর দুঃখের যবনিকায় হাবুডুবু খেলো সব। সবাইকে লাইনবন্দী করে দাঁড় করানো হলো- সামনে ধীরেন বাবু, তাঁর পিছনে আমি নিজে, আমার পিছনে আরও বেশ কয়েকজন। ঠিক ভরা ব্রহ্মপুত্রের তীর বেয়ে লাইনটি। ধীরেন বাবুর বুকের সাথে সংলগ্ন মেশিনগানের নাল। মেশিনগানধারী একজন পাক সৈনিক। প্রভুভক্ত মানুষ নামধারী হিসংস্র জানোয়ার। অর্ধমৃত

মানুষগুলো কিছুতেই লাইন সোজা করছে না।বারবার লাইনটি শেষ নিঃশ্বাসের মত এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। তখন আমি হঠাৎ করে দুঃসাহসিক চিন্তা করলাম। একটা মতলব করলাম ঝাঁপ দিয়ে কি করে নদীতে পড়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঁচি কি মরি মেশিনগানের নাল ধরে ধাক্কা দিয়ে বন্দুকধারীকে উল্টিয়ে ফেলে আমি নদীতে ঝাঁপ দিলাম-বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলির শব্দের পর আমি তখন স্রোতের টানে অনেক দূরে চলে গেলাম- আর শব্দ শুনতে পেলাম না। নান্দিনার কাছে এক গ্রামে যেয়ে উঠলাম আমি। দিনে বাড়ীওয়ালার সহায়তায় রাখালের বেশ ধরে জামালপুর-টাঙ্গাইল রোড পার হয়ে সরিষাবাড়ীর দিকে পাড়ি জমালাম আমি। তারপর সরিষাবাড়ী থেকে মেয়ের বেশ ধরে কালীবাড়ী এবং তারপর ভারত সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এই ছিল আমার জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী।

স্বাক্ষর/-
শ্রী মনোরঞ্জন দত্ত

\ ৩৩ \

এম, এ, রশিদ
সার্কেল অফিসার, ভৈরব থানা
ভৈরব, ময়মনসিংহ

পাক বাহিনী ভৈরবে যে নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তা এক কথায় অবর্ণনীয়। তারা প্রায় দু'হাজার বাড়ী ও দোকানপাট সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে। ভৈরব বাজারের লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে বহু ব্যবসায়ীকে সর্বস্বান্ত করে। তারা ভৈরব থানার নিরীহ সর্বমোট ২৩৭ ব্যক্তিকে হত্যা করে ও ১০৭ ব্যাক্তকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তন্মধ্যে স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসার জনাব কাজী আব্দুস সামাদকেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। উক্ত অফিসার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর পরিবারের খোঁজে অফিস থেকে বের হয়ে যাবার পথে পাক বাহিনীর সামনে পড়ে। সে সময় তাঁর কাছে তাঁর একটা ব্যক্তিগত টেপ রেকর্ডার ছিল। দস্যু সৈন্যরা ওটাকে একটা ওয়ারলেস সেট মনে করে অফিস সংলগ্ন বিলের পাড়ের একটা খোলা মাঠে কোন কথা জিজ্ঞেস না করে গুলি করে হত্যা করে। এমনি ধরনের আরও অজস্র বিবরণ নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যায়ও পাওয়া যায়। স্থানীয় পৌরসভার প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মসলন্দ আলীকে তৎকালীন সার্কেল অফিসার (ডেভ) জনাব আমিনুল হক সাহেবের মাধ্যমে লিখিত নির্ভয়ের আশ্বাস প্রেরণ করে পাক বাহিনী সম্ভবতঃ হত্যা করে। আজ পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ নাই।

একই সঙ্গে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী যথা- জনাব হাফিজ উদ্দিন মিয়া, জনাব মতিউর রহমান, জনাব রইস মিয়া ও আরও অনেককে হত্যা করে। এই ধরনের পৈশাচিক হত্যায় ভৈরবের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের কেউ কেউ রাজনৈতিক ভিন্ন মত পোষণ করত: পাক অফিসারদের নির্দেশে বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পাক বাহিনীর ধ্বংসমুখী ক্রিয়াকলাপে সহযোগিতা করেছে। রাজাকার নিয়োগ করার ব্যাপারেও তাদে ভূমিকা ছিল অগ্রণী। তবে এস লোকদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। বর্তমানে তাদের অনেকেই বেঁচে নেই। মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদের অনেককেই প্রাণ হারাতে হয়েছে। বাকীরা কেউ কেউ হারাতে আছে ও কেউ বা সম্পূর্ণ মনোভাব পালটিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের করুণায় টিকে আছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পাক বাহিনীর ভৈরবে স্থিতিকালে স্থানীয় থানা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রস্থিত সরকারী অফিসসমূহের বহু রেকর্ড ও আসবাবপত্র নষ্ট করে এবং পৌরসভার ক্যাশ রুমের লোহার সিন্দুকটি ভেঙ্গে ১১০০০ টাকার উপরে লুট করে। ঐ সঙ্গে পৌরসভার বহু আসবাবপত্রও নষ্ট করে। ভৈরব থানার কালিকাপ্রসাদ ও শিমুলকান্দি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, বীজাগার ও সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালায় সম্পূর্নরূপে ধ্বংস করে।

স্বাক্ষর/-
এম, এ রশিদ
৬/১১/৭৩

হত্যা, ধ্বংস ও নির্যাতনের বিবরণ
॥ রাজশহী বিভাগ ॥

\ ৩৪ \

মোঃ আরশাদুজ্জামান (আশু)
দি ইউনিভারসাল রেডিও হাউস
ঘোড়ামারা, রাজশাহী

২৫শে মার্চ শহরে যখন মিলিটারীদের তৎপরতা বেড়ে যায় তখন আমি ভাঙপাড়া গ্রামে কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নেই। পাকিস্তানী বেতার থেকে ঘোষণা করা হলো যে, মালিকবিহীন দোকান পেলে তারা অন্য জনকে দিয়ে দেবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২১শে মে আমি রাজশাহীতে চলে আসি এবং ঘোড়ামারায় চাচাতো ভাইয়ের বাসায় উঠি। জুমআর নামাজ পড়ে আসার সময় একজন বাঙ্গালী পশ্চিমাদের দালাল আমাকে দেখে। দেখার পর জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে যে, আমি বাংলদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলাম। এপর অকস্মাৎ দুজন বর্বর সৈন্য গাড়ীসহ দালালের বাড়ীতে যায়। ইতিপূর্বে সে ফোনে মিলিটারীদের সাথে আলাপ করেছিল। তারপরে আমার ভাইয়ের বাসায় মিলিটারীরা ঢোকে। ঢোকার পরে আমাকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একজন অধ্যাপক সাহেবের রান্নাঘরে নিয়ে যায়। সেখানে অন্য একজন কাষ্টম অফিসের আবদুল ওয়াহেদ নাম একজন লোককে দেখতে পাই নামাজ পড়া অবস্থায়। তাকে (ওয়াহেদ সাহেবকে) নানা জিজ্ঞাসাবাদ করায় বাইরে পাহারারত একজন মিলিটারী এসে আমাকে নির্মমভাবে বুটের লাথি মারে এবং জনৈক সৈন্য বলে, ''আপছমে কৈ বাত কারনে নেহী হোগা''।

তারপরে বেলা তিনটের সময় নওয়াবগঞ্জ কলেজের সহ-অধ্যক্ষ জনাব মোনামুল হক সাহেবকে মোটা শিকল দ্বারা দু'হাত বেঁধে নিয়ে আসে। তার কিছুক্ষণ পর কানে বালিওয়ালা লম্বা পাতলা মত একজন মিলিটারী আসে। হাতে কাঠের রোলার দরজা বন্ধ করে উর্দ্দুতে বলে যে, ''তুম নবাবগঞ্জ কলেজ কা ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হ্যায়?'' বলে প্রহার আরম্ভ করে। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি নাকি বিহারীগণকে হত্যা করেছি, নারীর ইজ্জত নষ্ট করেছি, সেই জন্য তারা দুই হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে। তারপর কাঠের রোলার দিয়ে প্রহার করে, লাথি মারে।

রাত আটটার পরে কাষ্টম অফিসের জনাব ওয়াহেদ সাহেবকে বের করে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরে আমাকে ঐ একই ঘরে রাখে এবং জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় ভোট কাকে দিয়েছিলাম। উত্তরে আমি বলেছিলাম যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলাম। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ক্যাপ্টেন জাফর। তারপরে হিংস্র পশুর মত আমাকে প্রহার করে। প্রহারের দরুন মাটিতে পড়ে যাই। তারপরে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলাম কিনা। আমি সম্মতি জানাই। তারপরে উক্ত ঘরে নিয়ে রাখা হয়।

পরের দিন সকালে মাটিতে একটি রুটি ও এক কাপ চা তিনজনকে খেতে দেয়া হয় শরীরে অসুস্থতার জন্য দু'জন চা পান করছিল না বলে বর্বর সৈন্যরা দুজনকে লাথি মারে বেপরোয়াভাবে।

৯টার দিকে আমাকে দিয়ে সৈন্যদের ব্যবহৃত ড্রেন, থালা বাসন, উঠান পরিষ্কার করে নেয়। বেলা তিনটার দিকে আমাকে ও ওয়াহেদ সাহেবের পিছনে হাত বেঁধে খাড়া অবস্থায় প্রায় এক ঘন্টা সময় রাখা হয়। তার পরে ক্যাপ্টেন জাফর উপর থেকে নীচে নেমে আসে। নাম ধরে বলে ''তুমহারা নাম আশু হ্যায়, তুম রেডিও কা কাম

জানতা হ্যায়?'' উত্তরে আমি সম্মতি প্রকাশ করি। জাফর পরে হাতে খুলে দেয় এবং পরে নিয়ে যায় এবং তার একটি রেডিওগ্রাম দেখতে বলে। দেখার পর আমি বলি উক্ত রেডিওর কোন যন্ত্রপাতি না হ'লে দেখা সম্ভব নয়। পরে আমাকে নীচে নামিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরে আমাকে জিপে উঠান হয়। পরে জোহা হলের দিকে নিয়ে যায়। গাড়ী থেকে নামিয়ে হলের গেটেই সোজা করে দাঁড় করানো হয়। দাঁড় করানোর পর আমি অনিবার্য মৃত্যু জেনে ওয়াহেদ সাহেবের সাথে শেষ আলাপ করতে প্রয়াসী হই এবং প্রাণভরে বাংলাদেশকে দেখে নেই । ক্যাপ্টেন ইলিয়াসকে জাফর পরিচয় করিয়ে দেয় যে ওয়াহেদ সাহেবের মেয়ে জয় বাংলার গান গেয়েছে এবং আমি বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছি। তখন ইলিয়াস ক্যাপ্টেন জাফরের সঙ্গে দূরে আলাপে বলে যে, বাংলাদেশের পতাকা, বাংলাদেশের সর্বত্রই উড়ানো হয়েছিল। তারপর ক্যাপ্টেন ইলিয়াস আমাকে ছেড়ে দেয় এবং ওয়াহেদ সাহেবকে উপরের তলায় নিয়ে যায়।

১৫ই আগস্ট (১৯৭১) পর্যন্ত আমি স্বগৃহে অবস্থান করি। রাত দু'টায় একটি পুলিশ জীপ এবং সঙ্গে ডি, এস, পি, নাছিম সাহেব দরজায় ধাক্কা মারে। পুলিশদেরকে নির্দেশ দেয় বাড়ীটিকে ঘেরাও করার জন্য। তারপরে দরজার কাছে আমি আসি। আমার নাম জিজ্ঞেস করে। নাম জিজ্ঞেস করায় কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর ডাক নাম জিজ্ঞেস করে। উত্তরে জানাই যে, ডাক নাম ''আশু''। অতঃপর আমাকে গাড়ীতে কিছুক্ষণ রাখার পর আরও দুজন, যথাক্রমে আব্দুর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে গ্রেফতার করে জীপে তুলে দেয়।

থানায় কিছুক্ষণ গাড়ীতেই রাখার পর গাড়ী জোহা হলে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তিন তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রায় অপরাপর ত্রিশজন বন্দীকে দেখতে পাই।

ভোরবেলা তিনজনকে নিয়ে ৩৪০ নং কোঠায় নিয়ে রাখা হয়। সেখানে ইউনুছ মিয়াকে দেখতে পাই। তিনি প্রায় সেখানে অর্ধপাগল অবস্থায় ছিলেন। আমাকে চেনার পর ইউনুছ সাহেব আমাকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলেছিলেন যে, সৈন্যরাতো জীবনে শেষই করবে, আপনি যদি ছাড়া পান তবে টাকাগুলি গরীবদের দিয়ে দেবেন।

পরে বেলা ৯টার দিকে মেজর সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, আমাদের পেশা ও নাম কি? পরে ৩৪০ নং কোঠায় নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার সময় ঘর খুলে দেখানো হয়। ঐ ঘরগুলির মধ্যে ছাত্র গোছের কতকগুলি যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় উলঙ্গ করে রাখা হয়েছিল। আশেপাশে ভাঙা হকিস্টিক, বাঁশের লাঠি ইত্যাদি ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল। আমাদেরকে বলা হয়েছিল সত্য কথা না বললে আমাদের পরিণতিও ঐ একইরূপ হবে।

এক থালাতে চারজনকে এমনকি সময় সময় মেঝেতে পচা, দুর্গন্ধময়, ভাত খেতে দিত। তাও প্রায় ২৪ ঘন্টা পরে।

৩৪০ নং কোঠায় পার্শ্বে একটি সেন্ট্রী রুম ছিল। সেখানে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত যার কিছু কিছু মাঝে মাঝে শোনা যেত।

একদিন আমাকে জোর করে বিভিন্ন রুমে বন্দীদের নাম ইংরেজীতে লেখার জন্য নিয়ে যায়। ৩৪০-এর কয়েকটি রুমের পরে একটি রুমের মাঝে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বিকৃত অবস্থায় দেখতে পাই। তাদের গায়ের চামরা ছিল না, মাঝে মাঝে কাটা দাগ ছিল।

২৭ শে আগষ্ট হল থেকে আমাদের থানায় পাঠানো হয়। থানায় পাঁচদিন থাকার পর ইনকোয়ারী হয়। পরে আমাকে মুক্তি দেয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আরশাদুজ্জামান (আশু)
১৯/০৮/৭২

\ ৩৫ \

মোঃ আব্দুস সামাদ
গ্রাম- নওহাটা
থানা-পবা
জেলা- রাজশাহী

১৯৭১ সালে ২৬শে মে তারিখ পাকবাহিনী নওহাটা হয়ে নওগাঁ যাওয়ার পথে অপারেশন করে যায়। নওহাটা তারা তিনজন লোককে হত্যা করে অগ্নিসংযোগ করে দেয়। এই খান সেনারা নওহাটা বাজারের সমস্ত দোকান লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ করে দেয়। তারপর যে সমস্ত স্থানীয় লোককে ধরে ছিল তাদের কে দিয়ে নদী পার হয়ে যাওয়ার জন্য নৌকা গোছিয়ে নেয় এবং যাতে গাড়ী পার করে নিয়ে যেতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা করে নেয়।

এরপর প্রায় দিনই তারা রাজশাহী টাউন থেকে হঠাৎ হঠাৎ এসে বাজারে যে সমস্ত লোক পেত তাদেরকে মারপিট করে টাক-পয়সা কেড়ে নিত এবং তা দিতে অস্বীকার করলে হত্যা করত সেই সংগে নারীদেরও গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এসে তাদের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করে কাউকে ছেড়ে যেত এবং যে সমস্ত নারী তাদের বেশী ভাল লাগতো তাদেরকে ক্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে যেত।

বিভিন্ন পথযাত্রীদের কাছ থেকে তাদের নগদ টাক-পয়সা কেড়ে নিয়ে মারপিট করে পরে ছেড়ে দিত। স্থানীয় লোকেরা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হলে সকলে যুক্তি করে খান সেনাদের অল্পসংখ্যক আসলে তাদের একজন ধরে মেরে মাথা ফটিয়ে দে। ইহার পর কিছদিন নওহাটা বাজারের লুটপাট বন্ধ থাকে। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে আবার আর এক খান সেনার দল এসে উক্ত ব্যক্তিকে এবং তার সংগে আরো কয়েকজনকে ধরে একত্রি করে বেঁধে বেদম প্রহার করার পর গুলি করে হত্যা করে।

উক্ত ঘটনারা পর লুটপাট বন্ধ থাকে কিন্তু তাদের অন্যান্য অত্যাচার বেড়ে যায়। তারা প্রায়ই মাঝে মাঝে রাতে আসতো এবং স্থানীয় লোক ধরে নিয়ে তাদের মাথায় গুলির বাক্স ও বিভিন্ন মালামাল বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করত। রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন গ্রাম ঘেরাও করে নিরীহ জনগণকে হত্যা করতে, তাদেরকে মারপিট করত এবং তাদের মালামাল লুটপাট করত।

এইভাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ২০০ লোককে হত্যা করে তাদের রাজত্বকে কায়েম রেখেছিল।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আব্দুস সামাদ

\ ৩৬ \

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়
রাণীবাজার, ঘোড়ামারা
জেলা- রাজশাহী

জুন মাসের ১৩ তারিখে পাক দালালরা ষড়যন্ত্রমূলক আমার শ্বশুরবাড়ীর একস্থানে গুলিসহ চাইনিজ রাইফেল রেখে ঐ রাতে তারা আমাদের সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রাইফেল তোলে। তখন আমাকে আমার দুই ছেলে, আমার সম্বন্ধী ক্ষীতিশচন্দ্র রায় ও নিরোদ কুমারকে থানাতে নিয়ে যায়। ওদের ধারণা ছিল আমাদের কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা সোনা আছে। বন্দী করে সেগুলি আদায় করার পরে হত্যা করবে। রাত ১/১-৩০ দিকে আমাদের থানাতে নিয়ে যায় ৫ জনকে ষ্টেটমেন্ট নেবে বলে। আমাদের পাঁচজনকে চালাকি করে হাজতখানায় বন্দী করে। সারারাত কিছু খেতে দেয়নি। তার পরদিনও না। বিকালে আমার বাড়ী থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। ঐদিন শেষ রাতের দিকে আমার স্ত্রী দারোগাকে বহু অনুরোধ উপরোধ করে গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিয়ে নগদ কয়েকশত টাকা দিয়ে বলল গেন সামরিক আইনে তার ভাই, স্বামী ছেলেকে না দেয়। দারোগাকে টাকা ঘুষ দিলে আমাদের সবাইকে হাজত থেকে বাইরে এনে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। হঠাৎ করে একদিন আবার হাজতে পুরতে বলে। আমার দুই ছেলে আমার সাথে কান কথা না বলে পাশের নদীতে ঝাঁপ দেয় বাঁচবার জন্য। পিছু পিছু পুলিশ ছুটে। ওদের চিৎকারে গ্রামের লোকজন ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। থানায় নিয়ে এসে অকথ্য অত্যাচার চালায় আমার দুই ছেলের উপর। একজন কৃষক সে আমার ছেলেদের ধরেনি বলে পুলিশ তাকে থানায় ধরে এনে ভীষণভাবে মারধর করে। এখনই ছেলেদেরকে হত্যা করবে কিন্তু টাকার বিনিময়ে নিরস্ত হয়। চার্জশীটের মধ্যেও পালানোর কথা উল্লেখ করেনি।

১৫ই জুন আমাদের সবাইকে নাটোর চালান দেয়। হাশেম দারোগা চাইনিজ রাইফেলসহ চললো। টাকা পয়সা নেওয়া সত্ত্বেও আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। পথে পাক বাহিনীর সাথে দেখা হলেই সালাম আলায়কুম জানিয়ে বলে দেখিয়ে কেয়া চীজ লেআয়া হ্যায়। দারোগা বার বার আমাদের দেখিয়ে দেয় মুক্তিফৌজ হিসাবে। থানায় ও,সি, হাশেমকে নিষেধ করেছিলো অস্ত্র ঐভাবে খোলা নিয়ে যেতে কিন্তু হাশেম এ, এস, আই, তা শোনেনি।

নাটোর কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় ইনসপেক্টর (পুলিশ) জাফর সাহেবের সাথে আমাদের দেখা। জাফর সাহেব আমার ছেলের এবং শালার বিশেষ বন্ধু ছিল। সে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে হাশেমকে। সামরিক কোর্টে নিয়ে যেতে বলে উনি জামাকাপড় পরে তাড়াতাড়ি কোর্টে আসেন। সামরিক কোর্টে সামনে মাঠে আমাদের বসিয়ে রাখে। পাকসেনারা আসে নাম শোনে আর সবাইকে লাথি চড় মেরে চলে যায়। সামরিক কোর্টে ক্যাপ্টেন ও মেজর আসেন। আমরা ২৫ গজ মত দূরে বসে চাইনিজ রাইফেলের কথা শোনার সাথে ক্যাপ্টেন খতম করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টর অনুরোধ করে একটি ইনকোয়ারী করার জন্য কারণ ওরা ভালোমানুষ। মেজর বলেন, কেমন করে চিনলে ওদের। ঐ থানাতে আমি থানা ইনচার্জ ছিলাম বহুদিন। ইনসপেক্টর বলেন, মেজর আমাদের ডাকেন আমাদের বক্তব্য আমরা বলি। মেজর সব শুনে কোর্টে পাঠাতে বলে ইনকোয়ারীর ভার দিলেন।

এস, ডি, ও জেলহাজতে পাঠিয়ে দিলেন। সামান্য একটু ঘরে আমাদের রাখলো। আমরা ৩০/৩৫ জন ছিলাম, শোয়াতো চিন্তা করা যায় না ভালো করে বসারও উপায় ছিল না। জেল ওয়ার্ডার মোজাফফর খাঁ (বিহারী) বাঁশের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে বাইরে এম,পি, (মিলিটারী পুলিশ) ছিল সেও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতে লাগলো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন কয়েদী ছিল যারা স্বাধীনতার প্রথম ক্ষণে জেল ভেঙ্গে পালিয়েছিল। তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। চিৎ করে শুইয়ে দুই হাতে লাঠি তুলে শরীরে যত শক্তি

আছে তা দিয়ে ঘন ঘন আঘাত করতে থাকে। লোকজন পরে শুধু আল্লাহর নাম করতে থাকে। তারপর দিনও ঐভাবে সাবইকে মারতে থাকে।

সরারাত শুনলাম মানুষের অসহ্য যন্ত্রনার চিৎকার। আমার মত এমনি বহু অধ্যাপক, ছাত্র, এ্যাডভোকেট ইত্যাদিকে সারারাত ধরে নির্যতন চালায়। কান্না চিৎকারে জেল প্রকম্পিত হচ্ছিল। পাক সেনারা মারতো আর হাসতো। লোকজনের উপর অত্যাচারের জন্য একটি স্কোয়াড থাকত যাদের কালো ব্যাজ থাকতো। জেল ওয়ার্ডার হরমুজ আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। ১৬/১৭ই জুন আমাদের ১৬ জনকে একসাথ রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

রাজশাহী জেলে বহু রকমের লোকদের দেখলাম। যাদের আনতো তাদের অধিকাংশ কারো চোখ নাই, কারো হাত-পা ভাঙা। বিশেষ করে পাক সেনারা যা পাঠাতো তারা প্রায় মৃত বা অর্ধমৃত হয়ে আসতো। জেলে যাদেরকে দেখেছি বেশীর ভাগ শান্তি কমিটির লোকেরাই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। একজন কৃষক কয়েদীর সাথে আলাপ করলাম। সে এসেছিল শহরে জমি বিক্রী করতে। মহুরীর সাথে বাজারে বেরিয়েছে এমন সময় কিছু লোক কৃষকটিকে জোর করে এক বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে তোর ছেলে মুক্তিফৌজ, সে বলে আমার বড় ছেলেই নেই। তারপর মারধর করে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

আমাদের কেস ইনকোয়ারীর জন্য ইনসপেক্টর গ্রামে যান এবং আমাদের পক্ষে রিপোর্ট দেন। বর্তমান বরিশাল এস,পি, গোলাম মোর্শেদ তখন রাজশাহী এস,পি, ছিলেন। তিনি আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য এ, এস, আই, হাশেমকে প্রমোশন দিয়ে থানার ও, সি, করে দেন। নাটোর শান্তি কমিটি জাফর ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে পাক সেনাদের কাছে অভিযোগ করে। জাফর (ইন্সপেক্টর) সাহেবের চাকরী যাবার মত। আমার ছেলে আইনুদ্দিনকে (এম, এন, এ, মুসলীম লীগ) বহু টাকার বিনিমিয়ে তার তদ্বীরে আমাদের জামিন হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর। পরে ইনসপেক্টর আবার ইনকোয়ারী করে নভেম্বর মাসে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না পেয়ে মুক্তি দেয়। আমরা আবার গ্রামে চলে যাই (গালিমপুর)। আমাদের বাড়ী জামাতে ইসলামীর সভাপতি দখল করে নেয়, সমস্ত কিছু লুট করে রাজাকারের ক্যাম্প করে। আর একটি কক্ষে জামাতে ইসলামের সভাপতি থাকতো। আমরা আবার গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাক সেনারা আমাদের গ্রামে আবার হামলা চালায়। সমস্ত গ্রাম লুট করে বহু জনকে ভীষণভাবে মারধর করে, কিছু লোকজনকে হত্যা করে। আমাদের সব লুট করে নেয়।

তারপর দেশ মুক্ত হয়। মালঞ্চ এবং নদীর অপর পাড়ে সকল গ্রামে তখন কোন বাড়ী ছিল না যে বাড়ীর মেয়ে ধর্ষিত না হয়েছে। পাক সেনাদের চাইতে রাজাকার, আল বদর এরাই বেশী অত্যাচার চালিয়েছে। দালালরা এবং তাদের সহযোগীরা গ্রামকে লুট করেছে, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

ডিসেম্বরে যুদ্ধ বাঁধলে আমরা সবাই উল্লাসিত হয়ে উঠি। একদিন গেলাগুলির শব্দ না পেলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যেত।

১৬ই ডিসেম্বর যখন শুনলাম পাক বর্বর বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে তখন সেই রাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সারা গ্রাম হেঁকে বেড়াই পাক সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। মানুষজন গ্রামকে মাতিয়ে তোলে। স্বাধীনতার আনন্দে সবাই ‘‘জয় বাংলা’’ ধ্বনিতে গ্রামকে মুখরিত করে তোলে।

স্বাক্ষর/-
বীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়
৩০/০৮/৭৩

\ ৩৭ \

সালু মিয়া
থানা-সদর
জেলা- রাজশাহী

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে সাহেব বাজারের নিজস্ব দোকান থেকে জনৈক বিহারীর ইঙ্গিতে আমাকে গ্রেফতার করে বোয়ালিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন বিকাল পর্যন্ত থানাতেই বন্দী ছিলাম। তারপর ডিএসপি নাছিম সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ করেন যে আপনি বিহারী কয়টা মেরেছেন; ভোট কাকে দিয়েছেন। তারপর রাত্রিতে মিলিটারী গাড়ী করে জোহা হলে নিয়ে যায়। ৭ দিন সেখানে বন্দী থাকাকালে আমাকে দিয়ে কয়েকদিন মাটি কাটিয়ে নিয়েছে এবং ত্রিপলাদি শুকিয়ে নিয়েছে। সেখানে ৭-৮ জনকে একই থালায় বসিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত অপর্যাপ্ত ভাত দেওয়া হতো। ডাল হিসাবে শুধু পানি, লবণ, হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে দেওয়া হতো। আর কোন তরকারি থাকতো না।

৭-৮ দিন পরে আবার আমাকে থানায় নিয়ে আসে। সেখানে আমাকে ১৯ দিন রাখা হয়। প্রথমে ক্ষমা ঘোষণার পর থানার বন্দী সকলেই ছাড়া পেলেও আমি এবং আর একজন অধ্যাপক ছাড়া পাননি। একদিন সিকিউরিটি অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং বলেন তোমাকে ইণ্ডিয়ায় দেখেছি। না উত্তর দেওয়ায় প্রহার শুরু করে। অতঃপর ডিএসপি নাছিম সাহেব এসে সিকিউরিটি অফিসারকে জানান যে আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দেয়।

এর ১৬-১৭ দিন পর এক রবিবার দিন রাত দুটার সময় আমাকে বাড়ী থেকে ধরে জোহা হলে বন্দী করে রাখে। সকালের মধ্যেই রাজশাহী ন্যাপ প্রধান আতাউর রহমানসহ বহু জনকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের সবাইকে দিয়ে ঘাস কাটিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে রোজা এসে যায়। সময় মতো তাদের কোনো খাবার দেওয়া হতো না। কোন কোন দিন সেহেরীও দেওয়া হতো না।

পহেলা রমজান রাত ১১টায় আমার রুম থেকে দুজন, ন্যাপ প্রধানের রুম থেকে একজন, পাশের রুম থেকে তিনজনকে, আর এক রুম থেকে সাহেব বাজারের কেতু মিয়াকে হাত ও কালো কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যায়। পরদিন সকালে ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে জনৈক সেন্ট্রিকে জিজ্ঞাসা করি যে রাতে ছেড়ে দিলে তারা কোথায় গেছে। তখন উত্তর দেয় যে তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি হাত, পা কেটে কষ্ট দিয়ে না মেরে গুলি করে কেন মার না। উত্তরে জানায়, গুলি করে মারা হয় না, রাম দা দিয়ে জবাই করে মারা হয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি রাতে যারাই বেরুবেন তাদেরই কি মারা হবে? উত্তর পাই রাত ১১টার পর যারা বেরুবে তাদের সবাইকেই বাংলাদেশে পাঠানো হয়। এর চার-পাঁচ দিন পর থেকে প্রায় প্রত্যহ রাতে ৭-৮ জন করে লোক উধাও হয়ে যেতো।

২৬-২৭ দিন পর একদিন বেলা দেড়টার সময় আমাকে ছেড়ে দেয়। আসার আগে আমি আমার কাছের দশটি টাকা অন্যান্য বন্দিদের ইফতারি কেনার জন্য দিয়ে আসি। কারণ সেখানে কোন ইফতারি দেওয়া হতো না।

ছেড়ে দেয়ার দুই দিন পর পুলিশ আবার আমাকে খোঁজাখুঁজি করে এবং গ্রেফতার করে জোহা হলে মেজরের নিকট নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে মেজর আমাকে বলেন উপার যায়েগা না ঘার যায়েগা। শেষ অবধি আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জোহা হলে বন্দী থাকা অবস্থায় সারাদিন প্রশ্রাব করতে দেওয়া হতো না। তাই বাধ্য হয়ে আমি নিজের জুতার মধ্যে প্রশ্রাব করে তিন তালা থেকে ফেলতাম। পৌর এলাকার ১ নং ওয়ার্ডের ৯৮ জন ধৃত ব্যক্তির মধ্যে আমিই শুধু বেঁচে আছি।

স্বাক্ষর/-
সালু মিয়া

\ ৩৮ \

মোঃ আবুল ওয়াহেদ
গ্রাম-সুলতানাবাদ (বেলদার পাড়া)
ঘোড়মারা,রাজশাহী

২৫শে মার্চের পরে রাজশাহী শহরকে পাক বাহিনী তাদের আয়ত্তে আনে। বাংলাদেশের স্বপক্ষের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কর্মী বৃন্দকে খুঁজতে থাকে এবং ধরে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। এপ্রিলের প্রথম দিকে বেলদার পাড়ার দুজন যুবক যথাক্রমে বাদল ও অন্যজনকে প্রকাশের দিবালোকে রাস্তার উপরে গুলি করে হত্যা করে।

বর্বর সৈন্যদের এলোপাতাড়ি গোলাগুলির আওয়াজে গ্রামবাসী প্রাণের ভয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আমি এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে মা সহ ভারতে আশ্রয় নেই। এবং জুন মাসে ১লা তারিখে স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদেরকে নেবার জন্য বেলদার পাড়ায় আসি। ৩ দিন পরে পাক বাহিনী রাত ৯টার সময় বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে গ্রেফতার করে। অবশ্য শান্তি কমিটির দালালদের কুপ্ররোচনায়। গ্রেফতার করার সময় বাড়ীর চারিদিকে এবং ছাদের ওপর থেকে গোলাগুলি করে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। গ্রেফতার করার পর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পরে গুলি করার জন্য আমাকে লাইনে দাঁড় করায়। কয়েকজন সৈন্যের উদারতার জন্য গুলি করতে বিরত হয় কিন্তু শারীরিক নির্যাতন চালায়। অতঃপর আমাকে জিপে করে হাত বাঁধা অবস্থায় স্থানীয় সার্কিট হাউজে নিয়ে যায়। সেখানে অন্ধকারময় বন্ধ ঘরে পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় দেয়লের দিকে মুখ করিয়ে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখে। এবং যাতে বসতে না পারি তার জন্য সামরিক বাহিনীর লোকেরা কড়া পাহারা দিতে থাকে। সকালের দিকে এক কাপ চা ও একখান রুটি খেতে দেয়। ঐ সার্কিট হাউজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রকে বন্দী অবস্থায় দেখতে পাই। তাদের উপরে বর্ণনাতীত শারীরিক নির্যাতন চালায়।

নির্যাতনের এক পর্যায়ে জনৈক পদস্থ কর্মচারী ছাত্রদ্বয়কে চাকু লাগাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু কিমাকার বিশাল বপু বিশিষ্ট একজন সৈন্য অফিসারের নির্দেশের মর্মানুযায়ী তাদের পেটে কুকুরের মতো কামড়িয়ে মাংস ধরে টানাটানি করতে থাকে। ছাত্রদ্বয় আর্তচিৎকার করতে থাকে। তিনজনই পূর্ব পরিচিত হলেও কেউ কাউকে পরিচয় দেবো না বলে একমত হই।

পরের দিন আমিসহ দুজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টাফ কোয়ার্টার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে যাবার পর ক্যাম্পের খোলা আঙ্গিনায় আমাদের গায়ের জামা খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। জামা খোলা হলে ১০/১২ জন বর্বর সৈন্য বেত, চাবুক দ্বারা এলোপাতাড়িভাবে প্রহার শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় যতক্ষণ না তারা অজ্ঞান হয় ততক্ষণ ঐ অবস্থা চালাতে থাকে। অতঃপর পা ধরে টেনে পার্শ্বের একটি ছোট কোঠায় পাশাপাশি রেখে দেয়। কিছুক্ষণ পর ছাত্রদের মধ্যের একজনকে যিনি বেশ স্বাস্থ্যবান ছিলেন তাকে পুনরায় টেনে আঙ্গিনায় নিয়ে যায় এবং পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টোভাবে রডের সাথে টাঙ্গিয়ে দেয়। ‘তুমলোক লিডার হ্যায়’ বলে চাবুক দিয়ে মারতে শুরু করে। তার শরীর দিয়ে দর বিগলিত ধারায় রক্ত গড়াতে থাকে। অত্যাচারের এক পর্যায়ে হঠাৎ ছেলেটির পায়ের দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায়। তখন তারা সাময়িকভাবে অত্যাচার বন্ধ করে দেয়। অজ্ঞান অবস্থাতেই পূর্বোক্ত ঘরে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে রেখে দেয়া হয়।

সারাদিন ও রাত অভুক্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়। পরদিন সকালে শুধু এক কাপ চা পান করতে দেয়। তারপর এক এক করে পাশের ঘরে সিকিউরিটি অফিসার সেলিমের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি প্রথমবারের মতো বিবৃতি নিলেন। বিবৃতি নেবার মাঝে মাঝে অফিসারটি নিজেই হাতে গ্লোভস পরে এলোপাতাড়ি ঘুষি

মারতে থাকে। এর ফলে মাটিতে পড়ে গেলে বুট দিয়ে শরীরে চড়ে নির্যাতন করতে থাকে। এবং জ্বলন্ত সিগারেট শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঠেসে ধরে। বলাবাহুল্য অত্যাচার করে তারা পাশবিক আনন্দ উপভোগ করে। এবং নিজেদের খুশিমতো বিবৃতি তৈরী করে। বিবৃতি নেবার পর পূর্বোক্ত ঘরে আবার বন্দী করে রাখে এবং দুপুরে কোন রকম তরকাররি ও প্লেট ছাড়াই মাটিতে লবন দিয়ে কিছু ভাত দেয়া হয় এবং বলা হয় 'তুমলোক বাঙ্গালী হ্যায়, চাউল খাও।'

পরের দিন সকাল আটটায় জিপে করে উক্তসিকিউরিটি অফিসারের তত্ত্বাবধানে তিন জনকেই জুবেরী হাউসের দোতলায় একটি কক্ষে রাখা হয় । এবং সেখানে কড়া সামরিক পাহারা ছিল । সেখানে পার্শ্বের কক্ষে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন দারোগাসহ ১০/১২ জন পুলিশের লোক ইউনিফরমসহ বন্দী ছিলেন। এদের অনেকেই আমার পরিচিত ছিলেন। আমাদের কক্ষে একজন ইউসি চেয়ারম্যানসহ আরো ৬/৭ জন সাধারণ মানুষ ছিলেন সেখানে তিনদিন থাকা কালে কোন রকম শারীরিক নির্যাতন করা না হলেও অপমানজনক অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে। যেমনঃ-'তুমলোক গাদ্দার হ্যায়, তুমলোক বেইমান হ্যায়, তুমলোক হিন্দু হ্যায়।'

ঐ তিন দিনের এক রাতে আমাকেসহ আরো দুজনের (উপরোক্ত ছাত্রদ্বয় নন) নাম ডেকে দোতালা থেকে নামিয়ে আনে এবং সাহসে ভর করে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে ছিলাম, ''হাম লোগকো কাঁহা লেয়ে যায়েংগে?'' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''তুমলোক কালমা পড়নে পড়নে চলো, তুমলোগকো খতম করেগা।''

নীচে আসার পর সাথী দুজনের নাম ধাম জিজ্ঞাসাবাদের পর দুজনকে নিরুদ্ধেশের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সম্ভবত তাদেরকে হত্যা করা হয়। পুনরায় বিবৃতি নেওয়টা হবে এই উক্তির প্রেক্ষিতে আমাকে ফিরিয়ে আনা হয়। পরের দিন বেলা তিনটায় দুজন ছাত্রসহ আমাকে এক সঙ্গে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় মিলিটারী ট্রাকে নাটোরের পথে বুট দিয়ে আমাদের উপরে সীমাহীন অত্যাচার করে। জেল গেটের খাতায় ''ফাইট এগেইনেস্ট গভর্নমেন্ট'' লিখে নেয়। জেল গেটের আঙ্গিনায় তখনই তিনজনের উপরে বেয়নেট, লাঠি, বেত বুট ইত্যাদি দ্বারা নির্যাতন করতে থাকে।

নির্যাতনের পর বিকাল পাঁচটায় আমাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে একটি কুঠুরীতে বন্দী করে। সেখানে আরও দুজনকে বন্দী অবস্থায় দেখা যায়। অবশ্য জেল গেটেই তাদের হাতের বাঁধন ও চোখের পট্টি খুলে দেয়।

নাটোর জেলখানায় তিনটি কোঠায় তিনশ জনের মতো কয়েদদী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সালেহ আহমদ, অধ্যাপক মুজিবর রহমানসহ অনেক বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। বলা প্রয়োজন যে ইপিআরদের জন্য তিনটি কোঠার একটি রিজার্ভ ছিল। প্রত্যহ পানি আনা, রাস্তা মেরামত, পুকুর পরিষ্কার, মিলিটারীদের খেলার মাঠ তৈরীসহ বিভিন্ন রকমের কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হতো। এবং সে সময়ে তাদের উপর অত্যাচার করা হতো।

জেলখানায় মাস দুয়েক কাটানোর পরে আমাকে জনৈক এফআইটি অফিসারের নিকট বিবৃতি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেখানে বিবৃতি আদায়ের ফাঁকে ফাঁকে বৈদ্যুতিক চাবুক দ্বারা প্রহার করে। শেষ পর্যন্ত সে বিবৃতিতে তারা সই করিয়ে নেয় তাতে সত্য অপেক্ষা মিথ্যাই ছিল বেশী।

নাটোর জেলখানায় মিলিটারীদের অত্যাচরের সময় জেলখানাতেই জনৈক কয়েদী মারা যান।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবুল ওয়াহেদ
১৬/৮/৭২

\ ৩৯ \

মোঃ আফজাল আলী মণ্ডল
গ্রাম-পারনাথপুর
পোঃ- রাণীনগর
রাজশাহী

ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ মঙ্গলবার ভোর বেলায় গাড়ী থামিয়ে পাক সৈন্যরা চকউজির, বাহাদুরপুর, চক বিলাকী গ্রাম ঘেরাও করে। আমি সেদিন চক বিলাকী গ্রামে আত্মগোপন করেছিলাম। আমাকে এবং আরও দুজনকে ধরে বেঁধে রাখে। উল্লিখিত দুজনের একজনের চাচাকে বাড়ীতে গুলি করে হত্যা করে রেখে তাকে বেঁধে নেয়। নদীর ধারে ঢাকা থেকে আগত কামলা ৯ জন ছিল। এরা তাদেরকেও ধরে ফেলে। আমার স্বাস্থ্য ভাল বিধায় আমাকে মুক্তিবাহিনীর নেতা বলে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং জানতে চায় মুক্তিফৌজ কোথায় এবং রাইফেলাদি কোথায়?

ইতিমধ্যে আরও তিনজনকে ধরে আনে। তাদের প্রহার করে ও আমাকে মুক্তিবাহিনীর নেতা কিনা তা জানতে চায় এরপর সকলকে নদীর ধারে নিয়ে যায় গুলি করার জন্য। সে জায়গা খর স্রোতা নয়, লাশ জলে আটকে থাকবে এ জন্য স্থান পরিবর্তন করে আর এক জায়গায় নেওয়া হয়। সেখানে 'ওয়্যারলেস' মাধ্যমে কথাবার্তা হলো। তারপর আমাদের একটি আম বাগানে নেওয়া হয়। সেখানে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে, যারা মিলিটারীকে দেখতে এসছিল। এদের একজন অত্যাচারের অসহ্যতার জন্য বলে যে আমি আওয়ামী লীগের নেতা। যাহোক জনৈক রাজাকারের সামান্য সুপারিশে আমাকে ও উল্লিখিত দুজনকে ছেড়ে দেয়। কিছু দূর যাবার পরে আমার মনে হলো যে এ ছেড়ে দেওয়া মানে কিছু দূর যাবার পর গুলি করে হত্যা করবে। এসব ভাবতে ভাবতে আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। পরবর্তীকালে জ্ঞান ফিরলে দেখতে পাই যে আমি বাড়ীতে আছি।

পাকবাহিনী ঐ দিন গ্রামগুলি ঘেরাও করে অন্যূন ২৫০/৩০০ জন লোক ধরে এবং তাদের মধ্যে থেকে সাতজনকে গুলি করার জন্য আত্রাই নিয়ে যায়। তাদের সবাই মারা গেলেও ভাগ্যক্রমে আক্কেল আলী নামে জনৈক ছেলে গুরুতর আহত অবস্থায় বেঁচে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আফজাল আলী মণ্ডল

\ ৪০ \

মোঃ হামিদুর রহমান
গ্রাম-কুমাইল, পোঃ- কাশিমপুর
থানা- রাণীনগর, রাজশাহী

রাণীনগর থানার আতাইকুলা গ্রামে অপ্রত্যাশিতভাবে জুন মাসের ২৯ তারিখে প্রায় ৪০ জন পাক সৈন্য প্রবেশ করে। পাক বর্বরদের সাথে বিহারীরাও ছিল। সেদিন বেলা দশটার সময় উল্লেখিত পাক বর্বররা ধ্বংস বিভৎসতা চালানোর জন্য গিয়েছিল। গ্রামে প্রবেশ করার জন্য গিয়েছিল। গ্রামে প্রবেশ করার আগে গ্রামের সংলগ্ন যমুনা নদী পার হয়ে সশস্ত্রভাবে দৌড়ে গিয়ে গ্রামটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অবশ্য গ্রামের পাল পাড়া ধ্বংস করাই উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার মনে হয়। গ্রামের অন্যান্য পাড়ায় গুরুত্ব না দিয়ে উক্ত গ্রামের পাল পাড়াতেই বেশি তৎপরতা চালায়। পাল পাড়ায় সমস্ত জনগণকে একত্রিত হতে পাক হানাদাররা আদেশ করে। আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পাড়ার হিন্দু জনগণ এক জায়গাতে একত্রিত হয়। পরে পাক হানাদাররা তল্লাশি করে ও জোরপূর্বক টাকা-পয়সা, সোনার গহনা, ব্যবহারিক সৌখিন জিনিস লুট করতে থাকে। অন্যূন ৬০ হাজার টাকা উক্ত গ্রাম থেকে লুট করে নিয়েছে। বেলা ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত লুট পর্ব শেষ করে। পরে উল্লিখিত ধৃত ব্যক্তিগণকে এক লাইনে দাঁড় করায়। লাইনে দাঁড় করানোর পরে মেশিন গানের গুলিতে ৪০ জন লোক নিহত হন।

উক্ত হত্যাকাণ্ডের আগে পাক বর্বররা গ্রামের প্রায় ৫০ জন কুলবধূকে অন্য এক জায়গায়বন্দী করে রাখে। কুলবধূগণকে গুলি করে না মারলেও তাদের অধিকাংশের শ্লীলতাহানি করে। বলা প্রয়োজন উক্ত হত্যালীলা ও ধর্ষণ চালানোর পরে উক্ত পাড়াতে ব্যাপকভাবে অগ্নিসংযোগ করে। ফলে উক্ত পাড়ায় শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ী-ঘর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য গ্রামে প্রবেশ করার পূর্বে এবং পরে মাঠের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালালে ইরি ক্ষেতের মাঝে লুক্কায়িত ৬/৭ জন নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে পশ্চিমা বর্বর বাহিনী পুনরায় উক্ত আতাইকুলা গ্রামে পাল পাড়ায় প্রবেশ করে। প্রবেশ করার আগে গ্রামের জনগণ নারী, পুরুষ নির্বিশেষে প্রাণের ভয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। পরে কোন মানুষকে না পেয়ে কয়েকটি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে পাক পশুরা তাদের নির্দিষ্ঠ স্থানে চলে যায়।

আত্রাই থানায় তখন বর্বরদের ধ্বংস ও বীভৎসতা চরম ভাবে চলেছিল। বলা প্রয়োজন আতইকুলাতে দুইবার অভিযান চলার পর পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছুসংখ্যক যুবক ঐ গ্রামে অভিযান হবে না ভেবে রাত্রিতে অবস্থান করতেন। কিন্তু গ্রামে স্বার্থান্বেষী পাকিস্তানী দালালদের প্ররোচনায় তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল। পরে দালালদের আমন্ত্রণে পাক র্ববররা তৃতীয় বার উক্ত আতাইকুলা গ্রামে প্রবেশ করে পাল পাড়াতেই। বলা প্রয়োজন উক্ত পাল পাড়ায় প্রাণের ভয়ে কয়েকজন যুবক আশ্রয় নিয়েছি। তখন কয়েকজন যুবক পাক দস্যুদের তৎপরতায় ধরা পড়ে। পাক বর্বররা উক্ত ধৃত যুবকদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ হামিদুর রহমান

\ ৪১ \

মোঃ ছালামত আলী
গ্রাম-সফিকপুর
ডাকঘর- পালসা
রাণীনগর, রাজশাহী

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে বর্বর নরপশুরা রাজাকারসহ সশস্ত্র অবস্থায় অকস্মাৎ গ্রামে প্রবেশ করার পূর্বেই গ্রামের জনসাধারণ স্ত্রী-পুত্র, কন্যাসহ বিক্ষিপ্তভাবে প্রাণের ভয়ে পলায়ন করতে থাকে। পরে সৈন্যরা এবং রাজাকাররা নৌকা থেকে নেমেই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাতে লাগলো, তাদের ধারণা ছিল হয়তো কোন আওয়ামী লীগার, মুক্তিযোদ্ধা কিংবা কোন স্বেচ্ছাসেবক গ্রামের মাঝে আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুট করা। ঘরের মাঝে যে সমস্ত মূল্যবান আসবাবপত্র ছিল তা নষ্ট করে দেয়, কতকগুলি সৌখিন জিনিস নিয়েও যায়। ট্রাংক, সুটকেস, খুলে খুলে কিংবা উপর থেকে আছাড় মেরে তার ভিতরে যা পায় যেমন দামী কাপড় চোপড়, গহনা পত্র, রেডিও, ঘড়ি সমস্ত লটু করে নিয়ে যায়। পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক মজিবর রহমান নামক এক বৃদ্ধকে বেদম প্রহার করে। সেই প্রহারের ক্ষণকাল পর আমাকে ধরে চোখ বাঁধে। চোখ বাঁধা অবস্থায়ই আমাকে নৌকায় তোলে। অনেক অবাঞ্চিত কথা বলার পর পাক বাহিনীর লোকেরা আমাকে আত্রাই স্টেশনে নিয়ে যায়। আত্রাই স্টেশনে নামিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দেয়। স্টেশন সংলগ্ন একটি কোঠায় আমাকে বন্দী করে রাখে। সেখানে আমি নাম না জানা অপরিচিত বারজন লোককে দেখতে পাই। দুদিনে দুই খানা রুটি খেতে দিয়েছে নরপশুরা। অবশ্য কোন থালা বা প্লেটে দেয়নি। হাতে হাতে দিয়েছে।

যে বার জন লোক উল্লিখিত কুঠুরীতে ছিলেন তাদেরকে নিয়ে কয়েকজন মিলিটারী প্রায় দুইশ গজ দূরে নিয়ে যায়। তখন অন্ধকার রাত ছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সেই অন্ধকারের মাঝে ব্রীজের উপরে বারজন লোককে তুলে নেয়। অবশ্য ব্রীজের নীচে অথৈ পানি ছিল। এক সময় গুলী করে বারজন লোককে হত্যা করে। আমি স্পষ্ট গুলির শব্দ শুনতে পাই। পরে বর্বর সৈন্যরা নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসে।

উল্লেখিত ঘটনার পরে পালা এলো আমাকে হত্যা করার। আমি চাকুরিজীবী বলে পশুরা আমাকে হত্যা করে না। আর পকেটে ছিল পরিচয়পত্র। সেই পরিচয় পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে রাত ৯টার সময় আত্রাই স্টেশন ক্যাম্প থেকে হানাদাররা মুক্তি দেয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ছালামত আলী

\ ৪২ \

আবুল হোসেন
থানা-সদর, জেলা-রাজশাহী

পাকবাহিনী রাজশাহী প্রবেশের পূর্বে বিমান মহড়া শুরু করে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার করে। বিমান থেকে যে দিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বোমাবর্ষণ করা হয় সেদিন আমি প্রাণের ভয়ে সপরিবারে দুর্গাপুর থানার পাঁচুবাড়িয়া স্কুলে গৃহে আশ্রয় নেই। সেখানে প্রায় মাসাধিককাল ছিলাম। ইতিমধ্যে গোটা শহর সামরিক বাহিনীর লোকেরা নিজেদের দখলে নেয়। বাজারের দোকান লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দেয়। জনবসতি এলাকায় বাসা বাড়ী ও লুটপাট করে। এতে আমার বাড়ী ও দোকান লুট হয়।

সামরিক বাহিনীর লোকেরা শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে যখন তৎপরতা শুরু করে তখন আমরা শহরে ফিরে আসি। নিজের বাড়ী বাসোপযোগী না থাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় উঠি (বেলদার পাড়া)। এর দশ বারদিন পর হঠাৎ একদিন রাতে কারফিউ এর মধ্যে রাত দশটার সময় বাসা ঘেরাও করে আমাকে গ্রেফতার করে। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করে। গুলি পেটে লেগে পিছলে বেরিয়ে যায়।

গ্রেফতারের পর প্রথমে এক বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে আকার ইঙ্গিতে কিছু শলাপরামর্শের পর আমাকে স্থানীয় সার্কিট হাউসে নিয়ে যায়। সেখানে পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সারারাত অত্যাচার করে। কেউ ঘুষি মারে, কেউ চড় মারে, কেউ বা লাথি মারে।

পর দিন সকাল ৯টায় সময় জোহা হলে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যায়। একটি অন্ধকার কক্ষে উলঙ্গ করে হাত বাঁধা অবস্থায় রাখে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর হলের আঙ্গিনায় ইলেকট্রিক তার, হান্টার ও লোহার রড দ্বারা বিরামহীনভাবে ৮ ঘন্টা ধরে অত্যাচার করা হয়। এর মধ্যে আমি ৯ বার জ্ঞান হারিয়েছিলাম। পিপাশায় পানিও দেওয়া হয়নি। বিকাল বেলা আমাকে আবার ঘরে নিয়ে আসে। রাতে খিচুড়ি জাতীয় সামান্য কিছু খাবার দেওয়া হয়।

পরের দিনও আমাকে ঐ একইভাবে অত্যাচার করে ও নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিকালের দিকে এক বাঙ্গালী দালাল বাসা থেকে এক হাজার টাকা মুক্তিপণ হিসাবে নেয়। এবং পরের দিন সকালে সৈন্যরা আমাকে তা পূর্বোক্ত বাসায় রেখে যায়। ছেড়ে দেওয়ার সময় বলা হয় তোমার উপর যা ঘটলো তা যদি কাউকে বলো তাহলে তোমার গোটা পরিবারকে শেষ করে দেওয়া হবে।

জোহা হলে বন্দী অবস্থায় আমি বহু সংখ্যক নারী কণ্ঠের চিৎকার, কাকুতি মিনতি এবং করুণ কান্নার শব্দ শুনেছি। যদিও কিছুই দেখতে পারিনি তবে এটা বুঝেছি যে নরপশুদের অমানুষিক অত্যাচার চলছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবুল হোসেন

\ ৪৩ \

হরিদাসী
গ্রাম- রামজীবনপুর
থানা-পুটিয়া
জেলা-রাজশাহী

৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার পাক সৈন্যরা ভোর চারটায় ৮০/৯০ জন সমস্ত রামজীবনপুর ঘিরে ফেলে। এ সময় আমার সেজ ছেলে কানাইলাল হেমন্ত ঘুমিয়ে ছিল। ওদের সাড়া পেয়েই ও চেতন পায়। ইতিমধ্যে পাক সৈন্যরা দরজায় রাইফেলের গুঁতা এবং পায়ের লাথি মারে এবং ঘর থেকে বেরোবার নির্দেশ দেয়। আমার ছেলে যখন দরজা খুলে বেরোয় তখন তাকে এবং তার ছেলে-মেয়েকেও ঘরের বারান্দায় বসায়। আমি এবং আমার স্বামী তখন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে কান্নাকাটি ও তাদের অনুরোধ করতে থাকি। তারা আমাকে ''আন্দর যাও'' বলে শাসাতে থাকে।

অতঃপর আমার ছেলের কাছে রাইফেল, বন্দুক, সোনা, সাইকেল, ঘড়ি, টাকা-পয়সা চাইতে থাকে।

তারপর আমার উক্ত ছেলেকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে রশি দুই দূরে জমির মধ্যে নিয়ে যায়। তারা পাশের বাড়ী থেকে আরও দুজনকেও (পিতা-পুত্র) ধরে নিয়ে যায়। এবং সেখানে তাদের গুলি করে হত্যা করে।

গুলি করে হত্যা করার পর তারা আবার আমার বাড়ী আসে এবং আমার বেটার বৌ-এর কাছে বলে যে তোমার স্বামীকে শেষ করে দিয়েছি। এখন তোমরা বাড়ী থেকে বেরোও। বাধ্য হয়ে আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে তারা বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা আগুন লাগানোর আগে আমার গরুগলি ছেড়ে দেয়। অতঃপর তারা চলে যায়। এদিন সমস্ত পাড়ায় তারা আগুন এবং অন্যূন ৮ জন লোককে হত্যা করে। এর দুই দিন পর আমি ভারতে চলে যাই। আমার চলে যাবার পর আমার বাড়ীর অবশিষ্ট সম্পদ লুণ্ঠিত হয়।

স্বাক্ষর/-
হরিদাসী

\ ৪৪ \

মোঃ আব্দুর রজ্জাক
আনছার কমাণ্ডার
গ্রাম-গৌরশহরপুর
থানা- চরঘাট, রাজশাহী

১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল পাক সৈন্যরা ৬০/৭০ খানা গাড়ীযোগে সারদা আসে। এবং অবশেষে সারদার পতন ঘটে। তারা এসেছে এ খবরে এবং তাদের দেখে সারদা এলাকার লোকজন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাণের ভয়ে আত্মরক্ষার্থে চরে আশ্রয় নেয়। পাক সৈন্যরা পিটিসিতে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দখল করে এবং বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। তারা চরে আশ্রয় নেওয়া লোকদের ধরে একত্রিত করে। তাদের সংখ্যা ছিল অন্যূন ১০০০/১৫০০। এদের মধ্যে আনসার-মুজাহিদ পুলিশ এবং সাধারণ মানুষ ছিল। একত্রিত করা লোকগুলিকে জমা করা হলে তারা সারি করে সকলকে গুলি করে হত্যা করে।

এক একটা দলকে ধরে এন তারা গুলি করে হত্যা করে। ইতিমধ্যে আর একটি দল জমা হয়। তাদেরকে দিয়ে মৃত লাশ গুলি জমা করে। অতঃপর তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। অপর ধৃত লোকগুলি দিয়ে তাদের লাশ জমা করে। শেষাবধি মৃত দেহগুলিকে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত তারা এই কাজ করে। অতঃপর তারা সন্ধ্যার মধ্যই এলাকা ত্যাগ করে চলে যায়। এসময় তারা বিরামহীভাবে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করতে থাকে।

এ সময় আমি আর সকলের সাথে চরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপার বেগতিক দেখে চর থেকে পালিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকি এবং নিজেকে মুক্ত রেখে পাক সৈন্যদের কার্যকলাপ দেখছিলাম।

সন্ধ্যার মধ্যেই এখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে ছেলে-মেয়েসহ অন্য গ্রামে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেই। পরদিন অত্র থানার নন্দনগাছি নিমপাড়া ইউনিয়নে আশ্রয় নেয়। কয়েকদিন সেখানে থাকার পর বুঝতে পারলাম যে সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। পাক মেজর এবং শান্তি কমিটির লোকেরা আমাকে খুঁজছে। তাই সেখান থেকে জামনগর গ্রামে যাই। সেখানে থাকা অবস্থায় নন্দন গাছির কতিপয় লোক খবর দেয় যে চেয়ারম্যান আমাকে ডেকেছে, আমার কোন ভয় নেই। তাদের কথামতো নন্দন গাছি পৌছালে তারা আমাকে বন্দী করে এবং পরদিন সকালে জয়েন সরকারের বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় হাজির করে। সেদিন ছিল ২৯শে মে। সেখান পৌঁছার কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাবিলদার মেজরসহ কতিপয় সামরিক লোক গিয়ে আমাকে বন্দী অবস্থায় ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে আসে। নিয়ে যাবার সময় পিছনে হাত এবং ন্যাকড়া দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে আসে। সেখানে মেজর শফি আহমেদের কুঠিতে বন্দী করে রেখে দেয়।

বিকেলে মেজর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সে জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি গোপালপুরে কতোজন মিলিটারী মেরেছো এবং কতো রাইফেল নিয়ে গিয়েছিলে? উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হতে না পেরে আমার উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু করে। বুটের লাথি, চড়, কিল, ঘুষি মারছিল। এ অবস্থায় অত্যাচার করার পর চোখ আবার বাঁধা হয়। হাত তো আগে থেকেই বাঁধা ছিল। এ অবস্থায় গেস্ট হাউসের উপর তলায় রাখে।

রাত আটার দিকে আবার নতুন করে হাত কষে বাঁধে। পায়ের গিটে বেঁধ হাঁটুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে ঘাড় এবং হাঁটু পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধে। অতঃপর ঐ অবস্থায় আমাকে হৃদয়হীনভাবে প্রহার শুরু করে। হাত, লাঠি, রুলার দ্বারা প্রহার করতে থাকে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে গর্দানে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রহার করে। এই

প্রক্রিয়ায় পালাক্রমে সারা রাত ধরে অত্যাচার চলে। শেষ রাতের দিকে সেই পশুরা যখন অণ্ডকোষ ও বাহ্যদ্বারে লাঠি মারে সে সময় আমি চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

সকাল ৭/৮ টার দিকে যখন আমার জ্ঞান ফিরে তখন আমি ঐ বসা অবস্থায় কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজকে পড়ে থাকতে দেখতে পাই। এবং ঐ অবস্থায় অভুক্তভাবে সারাদিন ঐখানেই পড়ে থাকি।

বিকেল বেলা আমার হাত এবং পায়ের বাঁধন খুলে দেয়। চোখ বাধা অবস্থাতেই গাড়িতে তুলে নিয়ে মেজর আমাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর চোখ ও হাত পা খোলা অবস্থায় কর্নেল রেজভীর সামনে আবার পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে থাকে। আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করি।

রাত ১১টার দিকে আমাকে একটি ঘরে বন্দী করে। সেখানে আমি ১০/১২ জন লোককে বন্দী অবস্থায় দেখতে পাই।

পরদিন সকালে কয়েকজন সেপাই আমাকে দেখে প্রহার শুরু করে। পালাক্রমে তারা এই কাজ করে। তাদের রীতি ছিল যে ঐ ঘরে কোনো লোক গেলে তারা বলতো ‘‘তোম কাঁহাসে আয়া, কব আয়া ?’’ আর তার সাথে প্রহার করতো। দুপুরের দিকে ২টা রুটি এবং কিছু তরকারি দেয়। পায়খানা প্রসাব অথবা গোসলদির কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সেখানে তের দিন বন্দী অবস্থায় ছিলাম। এবং সে সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে সারা দিন ধরে লোক জমা হতো এবং রাতে অস্ত্রশস্ত্র সহকারে একজন হাবিলদার এবং তিনজন সেপাই আসতো। তাদের সাথে মোটা দড়ি থাকতো। কাগজে নাম লিখা থাকতো। নাম ধরে ডাকত এবং বলতো ‘‘তোম খাড়া হো যাও।’’ খাড়া হয়ে গেলে পিছনে ঐ দড়ি দিয়ে কষে হাত বাঁধতো এবং টেনে মাঠের মধ্যে ১০০/১৫০ গজ দূরে নিয়ে যেত। তারপর শোনা যেত গুলির আওয়াজ। যতগুলি লোক ধরে নিয়ে যেত ঠিক ততটি গুলি করতো। প্রত্যেক রাতে ৭/৮/৯/১০টা করে লোক এমনি করে হত্যা করেছে। এ সময় প্রত্যেকদিন আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে।

১৩ দিন পর বিকেলে নাকে লোহার পাত দিয়ে পিছনে হাত বেঁধে (ডবল হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে) জাহাঙ্গীর পরিবহনে (রাজশাহীর একটি বাসের নাম যা এখনো আছে) করে নাটোর এম, পি, এইচ, কিউ ফুল বাগানে পাঠায়। বাসের দরজা জানালা বন্ধ অবস্থায় ছয়জনের গার্ডে নাটোর পোঁছাই। সেখানে প্রায় আধ ঘন্টা ছিলাম। সে সময়ই এমপিরা পালাক্রমে প্রহার করে এবং অকথ্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করে । তারপর নাটোর জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়।

জেলখানায় হাত খোলা অবস্থায় হাজত ঘরে বন্দী করে রাখে। সেখানে আরও ৫০/৬০ জন লোক ছিল। ৫/৭ দিন আমি সেখানে ছিলাম। সেখানে একজন এফআইটি প্রত্যহ আসত এবং পালাক্রমে সকলের জবানবন্দী নিত। জবানবন্দী নেবার আগে এক পশলা প্রহার করে নিতো। সকাল বিকেল ও দুপুরে এই কাজ করতো। জবানবন্দী হয়ে গেলে ঐ সময় আমাকে জেল ঘরে পাঠায়। সেখানে আমরা ৬২ জনের মতো লোক ছিলাম।

জেলখানায় থাকার সময় আমাকে একদিন বের করে মেজের উপর হাঁটুর মধ্যে দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে কান ধরে রাখতে বলে এবং ঐ অবস্থায় ৫০/৬০টি বেত মারে। আমি পড়ে গেলে আমাকে আবার তুলে উপুড় করে শুইয়ে দেয়। এছাড়া কখনো হাত-পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে রাখতো। কখনো বা টান উপর করে বুকডন দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ঘন্টা খানেক করে রাখতো। তাছাড়াও উপুড় করে শুইয়ে রেখে দুজন সিপাই একই সঙ্গে পিঠের উপর খুঁচত। বেত পিটানো তো নিয়মিতই হচ্ছিল। প্রত্যেক দিন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ১৬২ জন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার,

মাস্টারসহ বিভিন্ন ধরনের লোককে অত্যাচার করতো। মাঝে মধ্যে ২০/২৫ জন করে লোককে ধরে ফুল বাগানে নিয়ে গিয়ে পাথর বালি বইয়ে নিত।

এ সময় নামাজ পড়তে চাইলে তারা বলত ''তোম লোগ কাফের হ্যায়, নামাজ কিউ পড়তা হ্যায়?'' তাছাড়া নামাজ পড়তে দেখলে তারা দাঁত বের করে হাসতো।

পরবর্তীকালে এফ, আই, ও রা আবার নাটোর রিক্রিয়েশন ক্লাবে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতো। সে সময় এক ধরনের কালো রাবারের পাইপ দিয়ে প্রহার করতো। ৫ই সেপ্টেম্বরের সপ্তাহখানেক আগে সামরিক আইনের ১৮ ধারা মতে (সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা) চার্জশীট দাখিল করে। বিচার শুরু হবার আগেই ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমায় আমি ছাড়া পাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

\ ৪৫ \

মোঃ ওমর আলী শেখ
গ্রাম-গৌরসহর পুর
থানা-চারঘাট
জেলা-রাজশাহী

১৯৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে খান সেনারা গোলাগুলি করতে করতে বাড়ী ঘর জ্বালাতে জ্বালাতে আসতে লাগলো। পাক সেনাদের ভয়ে আমরা নিরাপদ জায়গায় আত্মগোপন করে তাদের গতি লক্ষ করতে থাকলাম। তারা সারদা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমীতে যায়। প্রাণভয়ে যে সমস্ত লোক পদ্মা নদীর ধারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে ঘেরাও করে ধরে প্রায় আনুমানিক ১২০০/১৩০০ লোককে গুলি করে হত্যা করে এবং পরে সকলকে একত্রিত করে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ইহার দুই ঘন্টার মধ্যেই তারা রাজশাহীতে চলে যায়।

পরের দিন সিএফ পুলিশ নিয়ে এসে এখানে রাখে এই অঞ্চলকে তাদের আয়ত্বে রাখার জন্য। শুধু তাই নয় তাদের সাথে আরো কিছু মিলিশিয়া জমায়েত করে রাখলো।

ইহার ২/৩ দিন পরে ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পুরা ক্যান্টনমেন্ট স্থায়ী করে। তারা বাজার লুট করতে লাগলো, গ্রামে গ্রামে গিয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছে তাদের বাড়িঘর ভাঙ্গতে লাগলো এবং মালামাল লুট করতে থাকে।

খান সেনারা পূর্ণ ক্যান্টনমেন্টে স্থায়ী করার পর শান্তি কমিটির সদস্যরা তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে অক্ষম হলে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে ধরে মিলিটারীর হাতে দিতো। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে সন্দেহজনক লোককে ধরে এনে খান সেনাদের হাতে দিত। তাদেরকে বিভিন্ন দোষে দোষারোপ করে জরিমানা করা হতো, যদি জরিমানা দিতে অক্ষমহতো তাহলে তাকে জবাই করে হত্যা করা হতো। আর যারা জরিমানা দিতে পারতো তাদেরকে তখনকার মতো ছেড়ে দেওয়া হতো।

খান সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করতো। এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কিছু নারী নিয়ে এসে তাদের যৌনক্ষুধা নিবারণ করতো। এইভাবে তারা ৮ মাসে প্রায় ২৬০০/২৭০০ লোককে হত্যা করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ওমর আলী

\ ৪৬ \

মোঃ আনিসুর রহমান
গ্রাম - বাজে গোয়ালকান্দি
ডাকঘর- গোয়ালকান্দি
থানা-বাগমারা
জেলা-রাজশাহী

১৯৭১ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে শান্তি কমিটির সদস্যরা গাঙ্গোপাড়া হিন্দু বর্ধিষ্ণু গ্রামে হানা দেয়। সেখানে গ্রামে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী পন্থীদের সহায়তায় তারা হিন্দুদের বাড়িঘর লুটপাট করে। সমস্ত কাপড়-চোপড়, সোনাদানা, থালাবাসন লুটপাট করে। এমন কি ঘরের মেঝে, পুকুর ঘাটের সিঁড়ি কোদালী, পাশ দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। তাদের ধারণা সেখানে তাদের লুকানো সম্পদ আছে। ঘরের জানালা কপাট খুলে নিয়ে যায়। ধানচাল, গরুবাছুর ইচ্ছামত নিয়ে নেয়। তাদের অনেকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করার আগে পাকশাক করে শেষবারের মতো সকলে মিলে চারটি খেতে চেয়েছিল। কিন্তু শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের সে সুযোগটুকুও দেয়নি। এমন কি অনেকে যখন ভাত থালে বেড়ে নিয়ে খেতে বসেছিল ঠিক সে সময় তাদের থালাতে লাথি মেরে থালা ফেলে দিয়েছে খেতে দেয়নি। বলেছে, ‘‘পাকিস্তানের ভাত তোদের জন্য হারাম, শীঘ্র পালা, প্রাণে মারলাম না, সেটা শুধু আমাদের দয়া।’’

অনুরূপভাবে জিনিসপত্র গরুবাছুরের তালিকা করে হিন্দুদের উচ্ছেদ করা হয় সেন পাড়া, ভবানীগঞ্জ, খাজাপাড়াসহ থানার সমস্ত হিন্দু এলাকা থেকে।

২৩শে এপ্রিল, ৯ই বৈশাখ বিকাল চারটার দিকে শান্তি কমিটির আমন্ত্রণে পাক সৈন্যরা তাহিরপুরে আসে। ঐ দিন ছিল তাহিরপুরের হাটবার। সৈন্যরা হাটে এসে সমগ্র হাটে বিক্ষিপ্তভাবে পজিশন নেয় এবং ১৩ জন লোককে ধরে গুলি করে হত্যা করে। এদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। মিলিটারীরা দাঁড়িয়ে থেকে হাট লুট করার নির্দেশ দেয়। কেউ অস্বীকার করলে বেদম প্রহার করে। ফলে হাট যথেচ্ছভাবে লুট হয়।

যে সকল হিন্দু দেশের মায়া ত্যাগ করতে না পেরে তখনো ছিল তাদের জোরপূর্বক মুসলমান করা হয়।

মুসলমান হবার সময় দেওয়া হয় মাত্র ৪৮ ঘন্টা। এতে নিরূপায় হিন্দুরা গত্যন্তর না দেখে মুসলমান হয়। একদিনেই ৩০০/৩৫০ জন হিন্দু সপরিবারে মুসলমান হয়। একমাত্র গোয়ালকান্দি ও উর্দুপাড়া গ্রামেই ১৩০ জন হিন্দু মুসলমান হয়। ধর্মান্তরিত করার পরেও তাদের মনের ঝাল মিটেনি। হিন্দুদেরই চালডাল, গরু, ছাগল জবাই করে গোয়ালকান্দির মাদ্রাসা মাঠে ঘটা করে মজলিশ করে। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুদের গোমাংশ ভক্ষণ করিয়ে চিরতরে ধর্মচ্যুত করা।

মে মাসে সেনপাড়া গ্রাম থেকে বাঙ্গাল পাড়ার ইয়াছিন আলীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইয়াছিন আলী সেনপাড়ায় তার শ্বশুরবাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। তারপর তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সেই এই থানার প্রথম শহীদ ব্যক্তি। বাংলা মাস আষাঢ় মাস ছিল।

শান্তিকমিটি গঠিত হবার পর পরই শান্তিকমিটির লোকেরা দৃষ্কৃতকারীর তালিকা তৈরি করে। এতে আওয়ামী লীগের নেতা ও প্রথম শ্রেণীর একনিষ্ঠ কর্মীদের নামের তালিকা তৈরী করে। তাতে জনাব সরদার আমজাদ হোসেন এমপি, বাজে গোয়াল কান্দি গ্রামের আনিসুর রহমান, খামার গ্রামের কাজী সাজেদুর রহমান, থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলামসহ প্রায় ২২/২৩ জনের তালিকা তৈরী করা হয়। সরদার আমজাদ হোসেন সাহেবকে জীবন্ত অথবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে ১৫ হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়। এছাড়া আনিসুর রহমানসহ আরও কতিপয়কে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫ হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়।

মে মাসের মধ্যেই রাজাকার তৈরী করা হয়। এতে বহু ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে রাজাকার মোতায়েন করার কথা থাকলেও তাহিরপুর এবং থানা ছাড়া কোথাও মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতায় তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

৩রা আশ্বিন রাতে রায়াপুরা গ্রামে হানা দিয়ে সরদার ওসমান আলী সাহেবের বাড়ী ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লুটপাট করে এবং তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেয়। আগুন লাগিয়ে দিতে থাকাকালে অন্য আর এক রাজাকারের কৃপায় বেঁচে যান। তাঁর পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়। এমনিভাবে থানার বিভিন্ন স্থানে লুটপাট করে। বেউকালীতেও অপারেশন করে লুটপাট করে, বেলসিংহেও লুটপাট চালায়।

পাক মিলিটারীরা থানার বিভিন্ন স্থানে অপারেশন করে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ নরহত্যা ও নারী নির্যাতন করে। মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের খবর পেয়ে মিলিটারীরা ভবানীগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। আগস্ট মাসের পরে কোনো এক সময়ের ঘটনা। সমস্ত ভবানীগঞ্জ বাজার লুটপাট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ভবানীগঞ্জ গ্রামের বেশ কিছুসংখ্যক মহিলার উপর নির্যাতন চালায়। বলা প্রয়োজন উক্ত গ্রাম ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান বসতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে তারা প্রায় সকলেই পাকিস্তানী সমর্থক ছিল। তবুও খান সেনারা তাদের পাশবিক অত্যাচার করে। তারা উত্তর একডালা গ্রামের শাহ মুহম্মদ জাফর উল্লাহ এম. এন. এ-র বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভুত করে দেয়।

খান সেনা ও রাজাকার দল হাজিরকুশলা গ্রামে সরদার আমজাদ হোসেনের বাড়ি অপারেশন করতে যাওয়ার পথে গোয়ালকান্দির নওমুসলিম পাড়া অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়।

বাগমারা থানায় রাজাকার ও আধা মিলিটারীদের ক্যাম্প ছিল তাহিরপুর, বাগমারা থানা এবং বালানগর মাদ্রাসা। উল্লিখিত স্থানে সমানে লোক করা হতো। জবাই করে, গুলি করে এবং বস্তায় পুরে পানিতে ফেলে দিয়ে লোক হত্যা করতো। বহুসংখ্যক লোক উক্ত তিন স্থানে তাদের হাতে পাশবিকভাবে মারা যায়।

স্বাক্ষর/-
মোহাম্মদ আনিসুর রহমান
১৭/০৯/৭২

\ ৪৭ \

দেলজান বিবি
সাং-বাগমারা
জেলা-রাজশাহী

রমজান মাসের রোজা ছিলাম। বহুসংখ্যক পাকিস্তানী বর্বর সৈন্য আসে এবং কোন রকম পালানোর সুযোগ না দিয়েই তারা আমার ঘরে ঢোকে এবং ধরে পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। চিৎকার করবার অথবা সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি শুরু করলে তারা আমাকে হস্তদ্বারা প্রহার করে এবং গুলি করে হত্যা করবে বলে ভয় দেখায়।

টিপসহি/-
দেলজান বিবি
সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

\ ৪৮ \

সোনাভান খাতুন
সাং-বাগমারা
জেলা-রাজশাহী

রমজানের ১২/১৪ দিনের দিনে একদিন দুপুরে দুজন মিলিটারী যখন গ্রামের মধ্যে আসে তখন গ্রামের আর সকলের সাথে আমিও পালাতে চেষ্টা করি। কিন্তু বর্বর পশুরা আমাকে পথের মাঝখান থেকে তাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে আসে এবং আমাকে ধরে। কাঁদলে অথবা চিৎকার করতে চেষ্টা করলে তারা রাইফেল উঁচিয়ে বলে চেঁচালে গুলি করে হত্যা করবো।

আমার উপর দুজন নরপশু অমানুষিক হৃদয়হীনভাবে পাশবিক নির্যাতন করে। আমি মাটির তলে লুকালে তারা সেখান থেকে আমাকে টেনে বের করে।

টিপসহি/-
সোনাভান খাতুন
সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

\ ৪৯ \

এল, পাইনস্
বনপাড়া মিশন
থানা-বড়ইগ্রাম
জেলা-রাজশাহী

২০শে এপ্রিল ১৯৭১ সাল। মিলিটারীরা বনপাড়ার আশেপাশে আসে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চালালে হারোয়াতে চারজন লোক মারা যায়। তারপর থেকে মাঝে মাঝে পাক নরপশুরা অপারেশন চালাতে থাকে। তার প্রতিক্রিয়া বনপাড়া এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অমুসলমানরা পালিয়ে আসে মিশন হাসপাতালে। মিশন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা যত্নসহকারে করতে থাকেন। তখন অবশ্য পাক সৈন্যরা নাটোর ও রাজশাহীতে চলে গিয়েছিল। তখন স্থানীয় দৃষ্কৃতকারীর হিন্দুদের অন্যায় ও ক্ষতিসাধন করে। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর লুট করে। তখন থেকেই ২/১ জন করে অমুসলমান ওপার বাংলায় পালিয়ে যেতে থাকে।

২রা মে রাতে অমুসলমানরা ওপার বাংলায় চলে যাবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দরুন সেদিন যেতে পারেনি।

৩রা মে। বিকাল সাড়ে তিনটার সময় মিশনের ফাদার লক্ষ্য করলেন যে, মিশন হাসপাতালের চারিদিকে মিলিটারীরা ঘিরে নিয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগে বনপাড়া সংলগ্ন অন্যান্য গ্রাম থেকে খৃষ্টান পুরুষদের ধরে নিয়ে এসেছে। সে ধরার অভিযান পরিচালনা করেছিল মেজর শেরওয়ানী। পরে ফাদারের সুপারিশে সমস্ত খৃষ্টনদেরকে নরপশুরা ছেড়ে দেয়।

তারপর নরপশুরা মিশনের অফিস, স্কুলঘর, মহিলা হোস্টেল তল্লাশি করে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও হিন্দুদেরকে খুঁজতে থাকে। খোঁজাখুঁজির পর সর্বমোট ৮৬ জন মানুষকে বের করে এবং বন্দী করে। অবশ্য অল্প বয়সের ছেলেরা ও বৃদ্ধেরা রেহাই পেয়েছিল তাদের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। তারপর বন্দী লোকদেরকে ধরে নিয়ে মোড়ে ট্রাকের অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে থাকে। সত্যি সত্যিই যখন সামরিক ট্রাক এসে হাজির হলো তখন ট্রাকে তুলে ৮৬ জন মানুষকে নিয়ে যায় হত্যা করার জন্য। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধকে রেহাই দিয়ে অন্যান্য বন্দীদেরকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে নিয়ে যায় তাদের নির্দিষ্ট স্থানে। ৮৫ জন লোককে নিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্য অনিল নামক একজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। এ ঘটনা অবশ্য ফাদারের শোনা। দোয়াদপাড়া ব্রীজে নিয়ে হত্যা করা হয়। অনিল ফাদারকে বলে যে, এখান থেকে মাইল দুই নিয়ে যেয়ে রাইফেলের গাদা দিয়ে অমানুষিকভাবে ট্রাকের উপরেই প্রহার শুরু করে। দেয়াদপাড়া ব্রীজের কাছে একটি জলাশয়ে নিয়ে যেয়ে উপরে উল্লিখিত মানুষগুলোকে ২/৩ জন করে ধরে নিয়ে গুলি করতে থাকে। অনিলকে গুলি করে কিন্তু সে আঘাতে মরেনি। নাটোরের হাফিজ আবদুর রহমান অন্যান্য অপারেশনের মত এখানেও উপস্থিত ছিল। সবশেষে আহত লোকদের উপর মেশিনগানের স্প্রে শুরু করে। অনিলের উরুতে মেশিনগানের একটি গুলি লাগে। এতেও সে খুব বেশী আহত হয় না। ফলে রাতে বর্বররা সরে গেলে সে আস্তে আস্তে স্বগ্রামে ফিরে আসে।

পাক বাহিনী যাবার আগে গ্রামবাসী মুসলমানদের ডেকে এনে এই স্তূপীকৃত মানুষগুলির উপর মাটিচাপা দিতে নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী অত্যাচার করতে সুযোগ পায়নি এই কারণে যে

পাক সৈন্যদের সাথে একজন খৃষ্টান মেজর ছিলেন যিনি প্রায়ই আসতেন। গীর্জায় ফাদারের অনুরোধে মেজরের সক্রিয় হস্তক্ষেপ অত্র এলাকার মানুষ যথেষ্ট রক্ষা পেয়েছে। একবার ৬ জনকে এ এলাকা থেকে নাটোরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা আর ফিরে আসেনি। পরবর্তীকালে তিনজনকে ধরে নিয়ে যাবার পর ফাদারের সুপারিশে তারা রেহাই পায়। পরবর্তীকালে আবার পাঁচজনের উপরে গ্রেফতার পরওয়ানা জারী হলে ফাদারের সুপারিশে তারাও মুক্তি পায়।

স্বাক্ষর/-
এল, পাইনস
২৭/৯/৭২

\ ৫০ \

কদভানু বেওয়া
গ্রাম-দুর্গাপুর
থানা-দুর্গাপুর
রাজশাহী

২৪ শে আষাঢ় মঙ্গলবার খুব ভোরে পাক সৈন্যরা গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং সাথে সাথে ফাঁকা গুলি করে এবং লোক দেখেও গুলি করে।

আমার বাড়ির সামনে সামরিক গাড়ি দাঁড় করায় এবং আমার বাড়ি ঢোকে। এবং বন্ধু বন্ধু বলে ডাকে। আমাদের চেতন পাবার আগেই ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে। ইতিমধ্যে আমরা চেতন পেয়ে যাই। আমি সাড়া দিলাম এবং তারা কে জানতে চাইলাম। তারা বলে যে তারা থানার লোক। অতঃপর তারা আমার স্বামীকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে বের করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। দুজন আমার স্বামীকে ধরে রাখে এবং একজন আমার পিছু নেয় এবং সে বার বার আমাকে ঘরের মধ্যে যেতে বলে। আমি পায়খানায় যেতে চাই কিন্তু সে পায়খানায় যেতে হবে না বলে জানায়। কিন্তু সকাল বেলা পায়খানা প্রশ্রাব করতে দেবে না এ কেমনতর কথা বলে রেগে উঠি এবং একটি পানির বদনা নিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ির বাইরে যাই এবং অন্য এক বাড়ির গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেই। আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন ঐ লোকটি ‘‘কাঁহা যাতা হ্যায়’’ বলে পিছে পিছে যেতে থাকে।

বহুক্ষণ এখানে লুকিয়ে থাকার পর যখন বেরিয়ে আসি তখন আমার স্বামীকে চোখ খোলা অবস্থায় পশ্চিম দিকে মাথা পড়ে থাকতে দেখি এবং তখনই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। বলা বাহুল্য আমার স্বামীকে তারা গুলি করে হত্যা করে যায়।

টিপসটি/-
কদভানু বেওয়া

\৫১\

আবদুল মালেক
দুর্গাপুর
রাজশাহী

শান্তিকমিটি এবং রাজাকারদের সরবরাহকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে মিলিটারীরা বিভিন্ন এলাকায় এসে অপারেশন করেছে। তারা লুটপাট করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে এবং মানুষ হত্যা করেছে। তাদের অপারেশন গুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান। তারা মে মাসের মাঝামাঝি যোগীদের পালশায় অপারেশন করে ৪২ জন হিন্দুকে হত্যা করে। সেখানে মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে।

জুন মাসে তারা দুর্গাপুরে অপারেশন করে ৮/৯ জনকে হত্যা করে। এখানেও তারা হৃদয়হীনভাবে নারী নির্যাতন করে। তাদের নির্যাতনের ফলে জনৈক অফিসারের একটি মেয়ে মারা যায় এবং অপর একজন পঙ্গু হয়ে যায়। এখানে তারা লুটপাট করে।

১লা রমজান শুক্রবার পাক সেনারা গগণবাড়িয়ায় অপারেশন করে। এখানে ত্রিমুখী অভিযান চালিয়ে ১০/১১ শত জন লোককে ধরে এনে তাদের দিয়ে গর্ত করিয়ে নিয়ে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে রাখে। এখানে কচি শিশুদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। তাদের অপরাধ তাদের মায়ের উপর যখন পশুরা অত্যাচার করছিল তখন তারা কাঁদছিল। এখানে ১০০ বছরের উপরের বয়স্ক অন্ধ একটি বৃদ্ধকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। গ্রামে আগুন দিলে মেয়েরা যখন প্রাণভয়ে মাঠে পালায় তখন সেখানেও তাদের ধরে শ্লীলতাহানি করে। বাপের সামনে মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে নির্যাতন করেছে।

স্বাক্ষর/-
সরদার আবদুল মালেক

\ ৫২ \

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
নওগাঁ
রাজশাহী

একদিন বিকেল বেলা আমি দৈনন্দিন কাজ সেরে বাসায় ফিরছিলাম। বাসায় ফিরে বিপুলসংখ্যক পাক সৈন্য ও বিহারীদেরকে দেখতে পাই। কয়েকজন বিহারী আমার বাসার গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান উপকরণগুলো খুলে নিচ্ছিল। আমি সরলভাবে প্রতিবাদ জানাই জনৈক পরিচিত বিহারীকে। উক্ত কুখ্যাত বিহারী আমার জীবনের ক্ষতির জন্য হুমকি প্রদান করে এবং ঘরের ভিতর অবস্থানরত কুখ্যাত মেজর বাংলাদেশের পতাকা হাতে রাখে ও আমাকে অভিযুক্ত করে কারণ আমি আওয়ামী লীগের একজন নেতা ছিলাম বলে উক্ত মেজরের ধারণা ছিল। পরে বিহারী ও পাক সৈন্যরা আমার বাসা লুট করে অনেক মালামাল নিয়ে যায়। বলা প্রয়োজন ঐ দিনই আমাকে ধরে ইপিআর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমার অফিসের একজন কর্মচারীর সুপারিশে সেবারের মত মুক্তি পাই। কিন্তু আমাকে কাজে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়।

ঘটনা প্রবাহের অবনতির সাথে সাথে আমি জনগণের ভাগ্যের সাথে ভাগ্য মিলিয়ে আমার অফিসের কাজ করতে থাকি। কিছুদিন পর অত্র শহরের পাঞ্জাবী এসডিও দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হন। উক্ত এসডিওর হত্যার পরে বিহারী ও পাক সৈন্যদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পাক দস্যুরা বিহারীদের যোগসাজশে হত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। হঠাৎ জুলাই মাসের ১৫ তারিখে আমার বাড়ি ঘেরাও করে। ঘেরাও করার পরে কুখ্যাত মিলিটারী ও বিহারীরা তথাকথিত এসডিওর হত্যাকারী বলে বিবেচনা করে। এখানে প্রকাশ করা প্রয়োজন যে জনৈক বিহারী দৃঢ়তার সাথে বলে যে, উক্ত এসডিওকে দুটি ছোরা দিয়ে আমি নিহত করেছি এবং ছোরার সাথে তাজা রক্তের ছাপ ছিল। তার সাক্ষ্যে পরে আমার দুই হাত বেঁধে নিহত এসডিওর বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে একজন কর্নেল, একজন মেজর ও কিছুসংখ্যক সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল। তারা আমাকে বেদম প্রহার করে। রাইফেলের বাঁট, কিল, ঘুষি, লাথি মারতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ প্রহার করার পর আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাই। পরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমাকে নওগাঁর ইপিআর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে যাবার পরে আমি অনেক বিহারী ও মিলিটারীদের দেখতে পাই। পুনরায় পাক কুকুরেরা আমাকে প্রহার করতে থাকে। প্রহার করার পরে আমাকে ক্যাম্পের সংলগ্ন একটি ছোট প্রকোষ্ঠে রেখে দেয়। সেখানে ৪/৫ জন লোক থাকার মত জায়গা ছিল অথচ উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রায় ২৪/২৫ জন বাঙ্গালী নিরীহ মানুষকে আটকিয়ে রেখেছিল। সেখানে আমি আটদিন অবস্থান করেছিলাম। আটদিনের প্রায় প্রতিদিনই বেদমভাবে প্রহার করতো। পাক বর্বররা পরিমিত খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সরবরাহ করতো না। ২/৩ দিন পরে পরে কিছু কিছু করে খাবার দিতো কিন্তু তা খাবার অযোগ্য আহার্য ছিল।

বন্দীখানায় অবস্থান করার পর আমি প্রত্যেক দিনই ফুটো দিয়ে দেখতাম যে ২০/২৫ জন করে নিরীহ লোকজনকে মারধর করার পর হাত উল্টো দিকে বেঁধে ও চোখ বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে বুক চিরে রাস্তায় ফেলে রাখত। পরে মৃতদেহগুলিকে নিকটস্থ নদীতে নিক্ষেপ করত। উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় আটদিনে তারা ২৫০ জন নিরীহ বাঙ্গালীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে বলে আমি অনুমান করি। একমাত্র আমিই অফিসের কর্তৃপক্ষের সুপারিশে মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
এস, ডি, ও, অফিস, নওগাঁ।

\ ৫৩ \

জয় মণ্ডল
নওগাঁ
রাজশাহী

২৫শে মার্চের ঘটনাপ্রবাহ অত্র গ্রামের জনগণের জীবনে হতাশা এসে দিয়েছিল। শান্তাহারে সাম্প্রদায়িক ঘটনার ফলে অত্র গ্রামটিকে পাক বর্বররা ক্ষতি করতে দ্বিধা করেনি। ৯ই বৈশাখ রোজ শুক্রবার শান্তাহার রোড হয়ে চকরামপুর গ্রামে পাক বর্বররা প্রবেশ করে। প্রবেশ করার আগে বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে গোলাগুলি চালাতে থাকে। এতে জনগণের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। ফলে ধন, মাল রেখে পাইকারী হারে অত্র গ্রামের জনসাধারণ অন্যত্র পালাতে থাকে। অতঃপর পাক বর্বররা চকরামপুরের অধিকাংশ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ও লুটতরাজ চালায়। বলা প্রয়োজন, অত্র গ্রামের সংলগ্ন খৃষ্টান মিশনের সাহেবের বাড়িতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। উক্ত ঘাঁটি থেকে পাক বর্বররা অন্য জায়গা হতে সুন্দরী মেয়েদেরকে ধরে এনে মিশনে সাহেবের বাসার উপর তলাতে আটকে রাখত। পাশবিক অত্যাচার ও ধর্ষণ করার পরে গলা কেটে হত্যা করত। হত্যার পরে তাদের রক্ত চৌবাচ্চার নল দিয়ে স্থানীয় তুলসী গঙ্গা নদীতে পড়ত। তা ছাড়া অত্র চকরামপুর গ্রামের প্রায় ৪০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে কয়েক জনকে গলা কেটে হত্যা করেছে। এবং বহুসংখ্যক আহত অবস্থায় এখনও বেঁচে আছে। এক মাস অবস্থানকালে অত্র গ্রাম হতে পাক-বর্বররা গরু, খাসি, হাঁস, মুরগী, যাবতীয় তরিতরকারী লুট করে খেয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে অত্র গ্রামের জনসাধারণ মুক্তিবাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য ও সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে।

স্বাক্ষর/-
জয় মণ্ডল
গ্রাম-চকরামপুর
নওগাঁ, রাজশাহী

\ ৫৪ \

মোঃ মোসলেম উদ্দিন
গ্রাম-দিঘাপতিয়া নতুনপাড়া
পোঃ-দিঘাপাতিয়া, নাটোর
জেলা-রাজশাহী

আমি ছিলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সিপাহী। চার বৎসর আমি পশ্চিম পাকিস্তানে চাকুরী করেছি। পঁচিশে মার্চের কিছুদিন আগে আমি ভলান্টারী সার্ভিসে চিটাগাংয়ে আসি। সেখান থেকে আমি ছুটিতে বাড়িতে আসি। তারপর বঙ্গবন্ধুর আহবানে চাকুরীর চট্টগ্রামে যোগ দেই। ওখান থেকে ষোল শহর, কালিঘাট, ৭নং জেটিতে পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বরদের সাথে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করি এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত করি। পরবর্তীকালে সেখানের পতন ঘটলে এপ্রিল মাসের (৭১) ৫ তারিখে অনেক সঙ্গীসহ ওপার বাংলার আগরতলায় পৌঁছি। সেখান থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডিফেন্স দেই। তারপর পাক সৈন্যরা বিমান আক্রমণ চালালে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে স্বগ্রাম দিঘাপাতিয়ায় পৌঁছি।

২৪শে এপ্রিল আমার বাড়ির জনৈক পাক বাহিনীর সহযোগী একদল পাক সৈন্য এসে ঘরের দরজা ভেঙ্গে আমাকে ধরে লাথি মারতে মারতে স্থানীয় কালীবাড়িতে নিয়ে যায়- বলা প্রয়োজন, এখানে অত্যাচারের কেন্দ্রভূমি ছিল। তারা সেখানে আমার হাত, পা বেঁধে পা উপরের দিকে তুলে লটকিয়ে অত্যাচার করে। সে অত্যাচারের ভিতর ছিল বেত দিয়ে প্রহার, চাকু দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান কাটা- শরীর কেটে তারা আনন্দ পেত। তারা জানতে চাচ্ছিল যে চট্টগ্রামে আমি কতজন পাঞ্জাবীকে হত্যা করেছি, কতটি রাইফেল কোথায়, কিভাবে লুকিয়ে রেখেছি, বাংলাদেশ সম্পর্কীয় কি কি তথ্য আমি জানি।

আমার কাছ থেকে কোন তথ্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হলে তারা আমাকে কালীবাড়ি থেকে নাটোরের ফুল বাগানে অপারেশন ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে বৈদ্যুতিক শক আমার গলায় দেওয়া হয়। হাত-পা বেঁধে ডেকচির মধ্যে করে পানির হাউজে নিক্ষেপ করে। ১০-১২ মিনিট সেখানে রাখার পর অর্ধমৃত অবস্থায় সেখান থেকে তুলে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সেখানেও তারা ব্যর্থ হবার পর আমাকে বেয়োনেট চার্জ করতে নিয়ে যায়। এ সময় ছিল সন্ধ্যার কিছু আগে। তখন আমার হাত পিছনে বাঁধা ছিল। বলা প্রয়োজন, এর কিছু আগে আমার সাক্ষতেই চারজন লোককে গুলি করে হত্যা করে। পরে আমাকে নিয়ে যায়। বেয়োনেটের সামনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম আর কৌশলে হাতের বাঁধন খুলবার চেষ্টা করছিলাম। এক সময় আমি আমার হাতের বাঁধন তাদের অগোচরেই খুলতে সমর্থ হই। ফুলবাগানের মধ্যস্থ পুকুরের চারিদিকে মিলিটারীরা তখন সশস্ত্র পাহারায় ছিল। হাতের বাঁধন খুলেই ঘুরে সঙ্গীন উচানো সিপাইয়ের হাতের রাইফেল কেড়ে পুকুরে ফেলে দেই এবং বক্সিং মেরে তাকে ধরাশয়ী করি। তারপর পুকুরে ঝাঁপ দেই। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট সৈন্যরা পুকুরের চারিদিকে সচেষ্ট হয়ে উঠে এবং আমাকে লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলি চালানো শুরু করে। যখন পুকুরের পাড়ে উঠছিলাম ঠিক সে সময় একটি গুলি এসে আমার ডান কানে লাগে। সাথে সাথে আর একটি গুলিও আমার বাম বাহুর নিচে লাগে। এতে আমি অবশ্য খুব বেশী আহত হই না। তাদের সকলের সব রকমের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বর্বরদের ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে আখের জমির ভিতর দিয়ে ক্রলিং করে নাটোরে পৌঁছাই। শরীর দিয়ে তখন দরবিগলিত ধারায় রক্তপাত হচ্ছিল। উলঙ্গ অবস্থায় যখন নাটোরের সিনেমা হলের মোড়ে পৌঁছাই তখন একদল বিহারী আবার আমাকে ধরে ফেলে। সেখানেও তারা বেদম প্রহার করতে শুরু করে। পূর্বোক্ত

বক্সিং প্রক্রিয়ার বদৌলতে তাদের হাত থেকেও রেহাই পাই। এবং শহরের মাঝখানে মামারবাড়িতে প্রথমে আশ্রয় নেই। কিছুক্ষণ পর আমার শ্বশুর ডাক্তার আঃ লতিফের কাছে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নেই। সেখান থেকে ঐ রাতেই মেয়ের পোষাকে এক গ্রামে আশ্রয় নেই। তারপর পরবর্তী ১০ দিন পর ভারতে আশ্রয় নেই। এবং সেখানে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেই।

ফুলবাগান থেকে উধাও হবার পর পাক পশুরা আমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং আমার বৃদ্ধ বাবা এবং মাকে মারধর করে এবং বলে যে তোমার ছেলেকে বের করে দাও, তাকে চাকুরী দেব এবং তোমার মেয়েকে আমার সাথে (জনৈক সুবেদার) বিয়ে দাও। পরবর্তী সময়ে তারা আমার বাড়ি স্বেচ্ছাচারিতভাবে লুটপাট করে।

আমার মতে, ফুলবাগানে ন'মাসে অন্ততঃ ১৫-১৬ হাজার লোককে পাক পশুরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মোসলেম উদ্দিন
গ্রামঃ দিঘাপতিয়া নতুনপাড়া
পোঃ দিঘাপতিয়া
জেলাঃ রাজশাহী

\ ৫৫ \

ডি, এম, তালেবান নবী
প্রতিনিধি, 'দৈনিক বাংলা'
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

৩রা আগষ্ট রাত্রি প্রায় ১১টায় পাঞ্জাবী পুলিশ স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর প্রধান, শান্তি কমিটির সদস্য, ও ভি ডি পার্টির সভাপতিসহ আমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং প্রবেশ করে আমাকে গ্রেফতার করে। অবশ্য গ্রেফতারের পূর্বে সমস্ত বাড়ি তছনছ করে। গ্রেফতার করে সামরিক ক্যাম্পে নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার পর মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগকারী ওয়্যারলেস ও 'রিভলবার' কোথায় রয়েছে তা জানাতে বলে। সদুত্তর না পেলে আমাকে পা ফাঁক করে বাঁশ দেয়। অতঃপর চাবুক দ্বারা বেদম প্রহার শুরু করে। প্রায় ঘন্টা তিনেক একের পর এক হাত বদল করে এম্নি অত্যাচার চালায়। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। এরপর গভীর রাতে ঐ অবস্থাতেই উঠাবসা করতে নির্দেশ দেয়। হয়তো একশো বার ঐ প্রক্রিয়া চালাতে বললে ৪০ বার করার পর বলে যে পাঁচবার হয়েছে। কিছু সময় এ অবস্থা চালিয়ে অসমর্থ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে আমাকে লাথি মেরে উঁচু বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দেয়। সেখান থেকে আবার তুলে নিয়ে আসে এবং আবার উঠাবসা করায়। আবার পড়ে গেলে আবার লাথি মেরে ফেলে দেয় ও তুলে আনে। এম্নি করে সকাল হয়ে গেলে ক্যাম্পের ভিতরে প্রধান রাস্তায় হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে। সেখান দিয়ে যে সমস্ত সামরিক লোক চলাচল করেছে তারা সকলে আমাকে যথেচ্ছভাবে লাথি মেরে পায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয়। সারাদিন আমি ঐ অবস্থায় ছিলাম এবং খোলা জায়গায় রোদে সমানভাবে অত্যাচারিত হয়েছি। সন্ধ্যার দিকে ঐখানেই জিজ্ঞাসা করে যেম তুমি মুসলমান না হিন্দু। মুসলমান বললে আমাকে কলেমা বলতে বলে। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কলেমা বলা থেকে বিরত থাকি। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এখানের কলেজে কলেমা পড়া হয় কি না। উত্তরে না বললে আমাকে কাপড় খুলতে নির্দেশ দেয় এবং উলঙ্গ করে। উলঙ্গ অবস্থাতেই আমাকে ঘন্টা দুই রাখা হয়। অতঃপর পূর্ব পদ্ধতিতে আবার ওঠাবসা করতে বলে। কিন্তু বসতে পারলেও কিছুতেই উঠতেই পারছিলাম না। কারণ খুব নিস্তেজ হয়ে গেছি। সে অবস্থাতেও আমাকে মারধর করা হয়। তারপর আমাকে টাঙ্গানোর নির্দেশ দেয়। তখন দু'পা উপরের দিকে বেঁধে টাঙ্গিয়ে দেয়। হাত যেনো কোন বাধার সৃষ্টি না করে সে জন্য হাত দুটিও বেধে দেওয়া হয়। এরপর একজন সিপাইকে ডেকে চাবুক মারতে নির্দেশ দেয় এবং সেরূপ চলতে থাকে। একজন ক্লান্ত হলে আর একজন চাবুক মারত। এম্নি করে তিনজন চাবুক মারার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। অত্যাচারের এক পর্যায়ে পানি পান করতে চাইলে মুখে সজোরে লাথি মারে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। রাতের কোন এক সময় জ্ঞান ফিরে পাই। পুনরায় পানি পান করতে চাইলে পাহারারত দুইজন সিপাহীর একজন প্যান্টের বোতাম খুলে। এবং মুখে প্রস্রাব করে দেয়। প্রস্রাব করে দিয়ে সিপাইটি তার নিজের আসনে ফিরে যায়। পরের দিন সকাল পর্যন্ত ঐ টাঙ্গানো অবস্থাতেই থাকি। এর মধ্যে মাঝে মাঝে সামান্য জ্ঞান ফিরে আসে এবং পর মুহূর্তেই আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সকালের দিকে আমাকে নামানো হলে বলে যে তুমি লিখে দাও যে, রিভলবার ও ওয়্যারলেস কোথায় আছে, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। নেতিবাচক উত্তর দিলে তারা আমাকে চড়-থাপ্পড় দেয়। তারপর আমাকে এক ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। সেদিন দিবাগত রাতে একজন মাষ্টারসহ তিনজন মুক্তিফৌজকে ধরে নিয়ে আসে। রাতে তাদেরকে পিটানোর পরে তাদের কাছে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য আমার ঘরে দেয়। রাত দুইটার দিকে জিজ্ঞাসা করলে তারা (মুক্তিযোদ্ধারা) স্বীকার করেনি বলে আমি জানাই। সারা রাত তারা আমার কাছেই থাকেন। পরের দিন রাত ১২টার দিকে সেলে ঢুকে কাপড় ও পায়ের জুতা

মুক্তিযোদ্ধাদের খুলতে বলে এবং খুলে লুঙ্গি পরা অবস্থায় বাইরে ক্যাম্পের পিছনে নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরে বিকট আ.... চিৎকার ভেসে আসলো। এতে অনুমান করা গেল যে, বেয়নেট অথবা ছোরা দিয়ে গুঁতিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

এভাবে পাঁচ দিন প্রায় অভুক্ত অবস্থায় থাকার পর ৭ই আগষ্ট দিবাগত রাত ৯টার সময় আমাকে শর্তসাপেক্ষে ছেড়ে দেয়। শহরের বাইরে কোথায়ও যেতে পারব না এটাই ছিল তাদের প্রধান নির্দেশ।

২৩শে এপ্রিল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে গোমস্তাপুরে পাক মিলিটারীরা অপারেশন করে। থানার পার্শ্বের বাজারপাড়া হিন্দু বস্তিতে গিয়ে ৩১ জন পুরুষকে ধরে নিয়ে আসে। অতঃপর সমস্ত গ্রাম পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ধরে আনা লোকদের থানার পিছন দিকে মহানন্দা নদীর তীরে ১৫ জনে প্রথম দলকে দাঁড় করায় এবং গুলি করে হত্যা করে। অপর দলের ১৬ জনকেও ঐ একইভাবে হত্যা করে। হত্যা করার পর লাশগুলিকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালাবার নির্দেশ দিলে মৃত ৩১ জনের মধ্য থেকে অমিল কর্মকার নামে এক ব্যক্তি পুড়িয়ে দেয়ার ভয়ে লাফিয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে হত্যা করে।

১৯শে অক্টোবর রবিবার দিবাগত রাত্র প্রায় তিনটার দিকে পাঞ্জাব বাহিনীর দুটি ব্যাটেলিয়ান সীমান্তবর্তী গ্রাম বোয়ালিয়া ঘেরাও করে। মেজর ইউনুসের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ান দুটি সকাল হওয়ার অল্প কিছু আগে মোহসীন মুন্সী আজান দেয়ার জন্য মিনারে উঠেছেন এবং আল্লাহু আকবর উচ্চারণ করেছেন ঠিক তখনই তাকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলি চালায়। সাথে সাথে গ্রামের উপর বৃষ্টির মত গুলিবর্ষিত হতে থাকে। এ গ্রামে তিন ঘন্টার প্রায় ৬৫০ জনকে হত্যা করে। এদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক ও নারীও ছিল। ১৬৮০টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে। এরপর বোয়ালিয়া গ্রামসংলগ্ন নরশিরা, শাহপুরা, পলাশবোনা, দরবারপুর, কালোপুর ও ঘাটনগর বঙ্গেশ্বর গ্রামেও হামলা চালায়। এখানেও ১২০০ লোককে হত্যা করে। এ সমস্ত গ্রামও পুড়িয়ে দেয়। পাক বাহিনী হামলা সময় অসংখ্য মহিলার উপর বলাৎকার ও লুটপাট করে।

পরবর্তীকালে নরপশুরা উপরোক্ত হত্যা চালায়। এরপরে বিধ্বস্ত এ গ্রামগুলি পাঞ্জাব বাহিনী ও তার তাঁবেদাররা সংলগ্ন থানার নিরীহ জনসাধারণকে ধরে নিয়ে এসে হত্যামঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেখা যায় যে, সমস্ত গ্রামগুলিই বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি কুয়া নরকঙ্কালে ভর্তি। অপর দিকে গ্রামগুলিতে যে সমস্ত দেওয়াল ঘর ছিল, সেসব ঘরে জনসাধারণকে হত্যা করে দেওয়াল ভেঙ্গে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। এসব গ্রামগুলির এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না কাউকে না কাউকে সে বাড়ি থেকে হত্যা করা হয়নি। এমনও অনেক বাড়ি রয়েছে, যে বাড়ির সকলকেই পাক জল্লাদরা হত্যা করে। এমনি একটি পরিবার সেকান্দার আলী। অপর একটি পরিবার সোলেমান মিয়ার যেখানে শুধুমাত্র ছোট ছেলে বেঁচে রয়েছে। মা-বাবা, ভাইবোন সকলকে হত্যা করা হয়েছে।

স্বাক্ষর/-
ডি, এম তালেবান নবী
প্রতিনিধি, 'দৈনিক বাংলা'
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

\ ৫৬ \

মোহাম্মদ মোছাওয়ার হোসেন
গ্রাম-মাইজপাড়া, ডাকঘর- রাজারামপুর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

'৭১ - এর ৪ঠা আগষ্টের রাত সাড়ে তিনটার সময় অকস্মাৎ শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নির্দেশে প্রায় ৫০ জন শান্তি কমিটির সদস্যসহ পুলিশ বিহারীর বাড়ী ঘেরাও করে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের হাত থেকে রেহাই পেলাম না। ধৃত হওয়ার পরে আমাকে কঠোর পাহারার মাধ্যমে পথে নিয়ে এসেছে এবং থানাতে সোপর্দ করে। সেখানে আমি প্রায় ১৫ জন বন্দীকে দেখতে পাই। অবশ্য তারা অনেক আগেই ধৃত হয়েছিলেন। পরের দিন দিবাগত রাত ৭টায় উপরোক্ত ১৫ জনকে থানায় হাজির করে এবং পাঁচজন করে করে এক একটি ব্যাচ তৈরী করে। পাঁচজনকে একটি ম্যাপ তৈরীর ব্যাপারে অভিযুক্ত করে আলাদা করে রাখে এবং একমাত্র আমাকে অবাঙ্গালী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে এবং যাদে কে হত্যা বকরা হয়েছে তাদের নামের তালিকা চায়। পাঁচজনের ভিতর যে দ'জন বেমী দোষী বলে বিবেচনা করেন তাদেরকে থানার মধ্যেই মেজর শেরওয়ানীর নির্দেশে নির্মমভাবে রোলার দ্বারা, বুকে লাথি মেরে প্রহার শুরু করে। ঐ সময় শেরওয়ানীর নির্দেশে অপর একজন সিপাহী আমাকে প্রহার করে। যতক্ষন পর্যন্ত আমি অজ্ঞান না হয়ে যাই ততক্ষন পর্যন্ত উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় অত্যাচার চালাতে থাকে। জ্ঞান হবার পর পুনরায় হাজতে নিয়ে যায়। তার পরের দিন ম্যাপ তৈরীর অভিযোগে গালাগাল করে। পরের দিন সন্ধায় মেজর শেরওয়ানী ১৫ জনকে জেলখানা থেকে বের করে আনার হুকুম করে। আমার তন্দ্রার ভাব হওয়াতে আমি বের হতে পারলাম না। আমি উদ্বেগের ভিতর সময় কাটাতে থাকি। প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত ১৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে মহানন্দার নদীতে ফেলে দেয়। তারা জলে ভাসতে থাকে।

পরের দিন আমি যেখানে ছিলাম সেখানে প্রায় ১০-১২ জন আসামী এলো। তাদের কাছ থেকে বিবৃতি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর কয়েক দিনের ভিতরেই অন্যান্য সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। এর পরবর্তী ব্যাচে জেলখান তে উকিল, মোক্তার এবং শিক্ষিত ছাত্র সহ প্রায় ৭জন এলো, তারপর উক্ত ৭ জনসহ আমাকে আঘাত হানতে থাকে। কিছুক্ষন পরে বিবৃতি নিয়ে তাদের সবাইকে রাজশাহী জেল তে চালান করা হচ্ছে বলা হয় - অবশ্য এটা ছিল নিছক ভাঁওতা। নবাবগঞ্জস্থ নিউ মার্কেটের একটি আলো-বাতাসহীন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখল। সেখানে আবদ্ধ করার পর রাত ৯টার সময় সবাইকে বাইরে নিয়ে এসে জিপে তুলে অন্যত্র নিয়ে যেতে চায় এবং কঠিনভাবে হাত বন্ধন করে। জিপে তুলে রাস্তায় নিয়ে যাবার পথে জিপ থেকে ১২ জনকে নামিয়ে য়ে এবং বেদম প্রহার করতে থাকে। পরে সারারাত ধরে নিউমার্কেটের উল্লিখিত প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখে। তার আগে জিপের অন্যদেরকে মেজর শেরওয়ানী গুলি করতে নির্দেশ দেয়। তাদেরকে রেহাই ঘরের শ্মশান ঘাটে মেরে ফেলে। পরের দিন সকালে উক্ত নিউমার্কেটের আসামীগুলিকে জেলখানায় নিয়ে আসে। দুইদিন পরে মেজর শেরওয়ানী নিজেই জেলখানায় গিয়ে আমার কাছ থেকে অঙ্গীকারপত্র লিখে ণিয়ে মুক্তি দেয়। ইতিপুর্বে আমার পিতার নিকট থেকেও অনুরূপ অঙ্গীকারপত্র লিখে নেয়া হয়েছিল।

স্বাক্ষর /-
মো:মোছায়ার হোসেন

\ ৫৭ \

মোঃ আল্ এমরান
গ্রাম- আজাইরপুর, পোঃ- রাজারামপুর
নবাবগঞ্জ, রাজশাহী

১৯৭১-এর জুন মাসের ১৬ তারিখে রাত দুটোর সময় আমার বাড়ী ৫০-৬০ জন পাক দস্যু ঘেরাও করে। ঘেরাও করার পর বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রায় ৪০ জন পাক দস্যু ঢুকে পড়েছিল। বাড়ীর সমস্ত ঘর তল্লাশী চালিয়ে আমাকে ধরে ফেলে। ধরে দু'হাত পিছনে বেধেঁ নিয়ে যায়। জেলখানায় আমি ধৃত ৩০ জনকে দেখতে পাই। সেখানে দিনভর রাখার পর থানাতে নিয়ে যায়। সেখানে কুখ্যাত মেজর শেরওয়ানী আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে । বলা প্রয়োজন, সেখানে আরও অনেক মিলিটারী উপস্থিত ছিল।জিজ্ঞাসাবাদ বরার পর মোটা বেতের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে । অনেকের হাত - পা ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল।

আমার পা হতে রক্ত ঝরছিল। পুনরায় সবাইকে জেলখানায় নিয়ে এলো। নিয়ে আসার পর রাত ১২টার পরে গুজর ঘাটের শশ্মনপুরীতে নিয়ে যয়। নিয়ে সবাই লাইন ধরার নির্দেশ দিল। লাইনের ভিতর থেকে ১২ জনকে বেছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে ।বাকী লোকগুলিকে পুনরায় জেলখানায় নিয়ে সকালের দিকে মেজর শেরওয়ানী জেলখানায় আসে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে বদম মারধর আরম্ভ করে জেলে যত লোক ধৃত হয়েছিল সবাইকে। শশ্মানঘাটে সন্ধ্যার সময় গুলি করার জন্য ৭ জনকে নিয়ে যায়। বধ্যভূমিতে ৭ জনকেই গুলি করে হত্যা করে। রাত ১১টার সময় উক্ত জেলথানায় দু'জন যুবতীকে ধরে নিয়ে রাখে। রাত অনুমান ৪টার সময় যে কক্ষের যুবতীদ্বয়ের করুণ কান্নার সুর শোনা যায়; অনুমতি হয় যে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল।

সকাল ৮টার সময় জেলখানা থেকে কয়েকজন বর্বর সৈন্য বেরিয়ে যাবার ঘন্টাখানেক পরে মেজরসহ কয়েকজন মিলিটারী যুবতীদ্বয়কে নিয়ে বাইরে চলে যায়। শেষ পরিণতি জানা যায়নি। সন্ধ্যা ৭টার সময় বাকী সমস্ত বন্দি লোকজনকে শ্মশানঘাটে গুলি করার জন্য নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার পর দু'জন করে লাইন করিয়ে গুলি করতে থাকে। আমাকেসহ অন্য তিনজনকে গুলি করার পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। তখন চারজনকে এক সাথে গুলি করার জন্য দাঁড় করালো। সেই মুহূর্তে একখানা সামরিক গাড়ী এসে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হলো। গাড়ীর কাছে অন্যান্য মিলিটারী যারা গুলি করছিল, তাদের হাজির হওয়ার নির্দেশ দিল। সেখানে কানা-ঘুষা হল। গুলি করা থেকে সাময়িক বিরতি নিল। পরের দিন আনুমানিক ১০টার সময় তিনজনকে ছেড়ে দেয় । আমি তাদের একজন । তিনি দিনে প্রায় ৪০-৫০ জনকে গুলি করে পাক বর্বর বাহিনী হত্যা করেছিল।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আল এমরান

\ ৫৮ \

এলাহী বক্স
ফিরোজা হাউস
শিব্বাটা, বগুড়া

এপ্রিলে পাক বাহিনী রংপুর, শান্তাহার, শেরপুর - এই তিন দিন থেকে বগুড়া শহর আক্রমণ করে । তা ছাড়া বিমান থেকেও পাক বাহিনী বগুড়া শহরের উপর আক্রমণ করে। ঐ সময় শহরের লোকজন জীবনের ভয়ে কোন দিকে দৌড়াতে না পেরে পুর্বদিকে মুক্ত দেখে নদী সাঁতরিয়ে চেলোপাড়ার দিক রওয়ানা হয়। পাক বাহিনী আক্রমণ করার সাথে সাথে সমস্ত শহর ঘোরও করে ফেল্যে। কাজেই জনসাধারণ পালানোর সযোগ পায় না। পাক বাহিনীর গুলির মুখে অসংখ্য লোকজন প্রাণ হারায়। আমি নিজের বাড়ী ছেড়ে চেলোপাড়ার দিকে রওয়ানা হই। চেলোপাড়ায় যাবার সময় আমি যে দৃশ্য দেখেছি ইতিহাসে তার নজির বিরল।চার থেকে পাঁচ শতের মত লোক মৃত অবস্থায় রক্তের মধ্যে ডুবে আছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে। আর কুকুরের তাদের রক্ত পান করছে । পালিয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না আমার। আমার মাথায় একটি টুপি ও হাতে একটি পাকিস্তানী পতাকা ছিল। আরও একজন মৌলভী এবং দুইজন লোক আমার সঙ্গে ছিল। তাদেরও মাথায় টুপি এবং হাতে পাকিস্তানী পতাকা ছিল। হঠাৎ করে একদল পাকসেনা আমাদের দেখে ঘিরে ফেলে। পাক বর্বর বাহিণী জিজ্ঞাসা করে তোমরা কে? অবশ্য উর্দূতে।

জবাবে আমি বলি যে আমরা পাকিস্তানী বাঙ্গালী মুসলমান। তখন পাকসেনা কিছু সময় পর আমাদেরকে ছেড়ে দেয় এবং বলে যে তোমরা আগামিকাল সকাল ৮টার পর আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। কারন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর আটটা পর্যন্ত কার্ফিউ থাকবে। পাকবাহিনীর কার্ফিউ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সকাল ৮টর পর জনসাধারণকে একত্রে একযোগে হত্যা করা। আমি সেটা বুঝতে না পেরে পরের দিন আবার বাসাবাড়ী দেখার জন্য শহরের দিকে রওয়ানা হই। আসার সময় অন্য তিনজন লোক আমার সাথে ছিল। ঐ সময় কয়েকজন পাঞ্জাবী আমাদের ধরে ফেলে। ধরার পরপরই একত্রে লাইন করে রাইফেল দিয়ে গুলি করে। গুলি করার সাথে সাথে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অপর একজন বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার গর্তের ভিতর পড়ে যায়। একজন পাঞ্জাবী এেস বেয়োনেট দিয়ে তার বুকটা চিরে দেয়। আমি সৌভাগ্যবশত গুলি না খেয়ে ঐ রক্তের মধ্যেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। একজন পাঞ্জাবী আমাকে পুনরায় দাঁড় করে পরপর দুই বার গুলি করে। প্রথম গুলিটি ফায়ার না হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার গুলি করে। ভাগ্যবশত গুলিটা আমার বাম পার্শ্বে দিয়ে চলে যায়। পাকসেনা কি যেন মনে করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলে যে তোর হেঁয়াছে ভাগ যাও বাঙ্গালী। তখন আমি নিজের বাসার দিকে রওয়ানা হই। বাসায় আসার সময় আমি দেখতে পাই শুধু মানুষের মৃতদেহ। শহরের সমস্ত রাস্তা যেন রক্তে লাল হয়ে আছে। কুকুর তাদের মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি করছে। আমি দেখতে পেলাম যে প্রথম দিনে খান দস্যুরা যে সমস্ত লোকজন হত্যা করেছিল সেগুলোকে শহরের রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করে ৭-৮ জন করে পুঁতে রেখেছে। তাদের কারো হাত বা মাথা দেখা যাচ্ছে। কুকুরে এক স্থান থেকে টেনে অন্য স্থানে নিয়ে যাচ্ছে এই বীভৎস ও করুণ দৃশ্য দেখে চোখের পানি মুছতে আমার শিব্বাটী বাসভবনে উপস্থিত হই। বাসায় গিয়ে দেখতে পেলাম যে, একজন মেজর ও তিনজন বেলুচি সৈন্য আমার নিজস্ব ক্যাম্প খাটটি পেতে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে তারা রাইফেল নিয়ে দাঁড়ায়। আমি বলি যে, আমি পাকিস্তানী বাঙ্গালী মুসলমান। এটা আমার বাসা এবং বাসাবাড়ী দেখতেই আমি এসেছি। তখন তারা আমাকে বলে যে এটা তোমার বাসা? তোমার খুব সাহস? এই বলে আমাকে বসতে বলে এবং মাংস ও রুটি খেতে দেয়। তা ছাড়া আমাকে বলে যে তোমার কোনই ভয় নাই। রাত্রিতে তুমি তোমার ঘরে শুয়ে থাকবে। আমি কোন রকমে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পাক সেনা শহরে ঢুকেই অবাঙ্গালীদেরকে ৭২ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল; বাঙ্গালীদের

ধন-দৌলত লুট করার জন্য। পরের দিন সকালে খান সেনারা আমাকে সংগে করে শহরে চলে আসে। খানসেনারা আমাকে লুট করার কথা বলে। তখন আমি বলি যে, আমি লুট করব না বা আমার কোন প্রয়োজন নাই। এইভাবে তিন দিন কেটে গেল। খান সেনার চারজনের মধ্যে একজন ছিল মেজর জাকি। ৪র্থ দিনে তারা আমার বাসা ছেড়ে দিয়ে রংপুরে চলে যায়। পুনরায় মেজর শাকিরিয়া আমার বাসায় চলে আসে। এসে আমাকে বলে যে, তুমি এখান থেকে চলে যাও। এই বলে আমাকে সাথে করে সার্কিট হাউসে নিয়ে আসে। সেখানে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম, রাজশাহী ভার্সিটি থেকে ধরে আনা কয়েকজন ছাত্রী। তারা বসে বসে কাঁদছে। পাক হায়েনারা তাদের উপর অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার করে। তাদের সারা দেহে ধর্ষণের চিহ্ন বিদ্যমান। ঐ দৃশ্য দেখে আমি মর্মাহত ও অভিভুত হয়ে পড়ি। দুই ঘন্টা পর মেজর শাকিরি আমাকে নিজের বাসায় ফিরে যাবার অনুমতি দেয়। কোন রকমে আমি নিজের বাসায় ফিরে আসি।এর পরও মাঝে মাঝে খান সেনারা আমার বাসায় এসে তদন্ত চালায় এবং বলে যে, তুমি মুক্তিফৌজকা লিডার বা মুক্তিদের সর্বরকমের সাহায্য কর। আমি সম্পুর্ণ অস্বীকার করলে আমাকে দারুণ নির্যাতন ও প্রহার করে। দিনে-রাতে সব সময় আমার বাসায় এসে খান দস্যুরা অমানুষিক অত্যাচার করত। আমার দুই ছেলে মুক্তিযোদ্ধা ছিল বলে খান সেনারা সব সময় দুই ছেলেকে খুঁজে বেড়াত। এরপর আমার বাসায় একটানা এপ্রিলের ২০ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ পর্যন্ত অতিবাহিত করি। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিজ ছেলে-মেয়ে এবং পরিবার বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এরপর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সহায়তায় বগুড়া শহর মুক্ত হয়ে যায়। বগুড়া শহর ও বাংলাদেশের জয়ের পতাকা উত্তোলিত হয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ এলাহী বক্স

\ ৫৯ \

শ্যামল রায়
মালতী নগর, থানা - সদর
জেলা - বগুড়া

প্রবল গুলি ও গোলাবর্ষনের ভেতর দিয়ে বর্বর পাক বাহিনী ট্যাঙ্ক সহকারে বগুড়ায় প্রবেশ করে। শুরু হলো নরপিশাচদের 'বাঙালী চোষা' বিহারী বেঈমান সহযোগে শহরের বুকে তাণ্ডব নৃত্য। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, খুন, তৎসহ ধর্মীয় স্থান কলুষিত ও বিধ্বস্ত করায় মত্ত হয় তারা।

২৫শে এপ্রিল রবিবার হঠাৎ করেই গ্রামের বাসা হতে গুলি ও ব্রাশফায়ারের শব্দ শুনে বুঝতে দেরী হয়েছিল না যে, পাকবাহিনী বগুড়া হতে বড় রাস্তা ধরে এদিকে এগিয়ে আসছে (সিরাজগঞ্জ ও উল্লাপাড়ার দিকে)। কিছুক্ষণ পর দক্ষিন-পূর্ব কোণ হতে কালো ধোয়ার কুণ্ডলী আকাশে উত্থিত হতে দেখা গেল। অনেকে বললেন কুমারেরা হাঁড়ি পোড়াচ্ছে। কিন্তু সব ধারণার অবসান হল তখনই, যখন শুধু এক জায়গাতে নয়, সমস্ত পশ্চিম দিক হতে ধোঁয়া আর আগুনের লাল আভা দেখা যেতে লাগল। যতই আধাঁর নামছিল আগুনের লেলিহান শিখা ততই প্রকট হয়ে ফুটে উঠছিল চোখের সামনে। আগুনের সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল উল্লাপাড়ার দিক হতে।

পরের দিন শুনলাম চাঁদাইকোনার প্রত্যক্ষদর্শীর এক বিবরণ। তারা লোকজন ডেকে এনে লুট করিয়েছে বাজার এলাকা। অনেকে স্বেচ্ছায় এসেছে লুট করার লোভে। লুট করার সময় তারা ছবি তুলেছে। লুটপাট হয়ে গেলে আগুন ধরানোর পালা। আগুনও দিয়েছে লোকজনের সহায়তায়। আগুন ধরানোর সময় তারা ছবি তুলেছে। আর সব কাজ হাসিল করার পর বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণ করে জনসাধারণকে করা হয়েছে হত্যা। এরকম আরও ঘটনা। খাওয়ানোর নাম করে ডেকে এনে লাইন করে গরীব গ্রামবাসী নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

পরের দিন শুরু হলো সিরাজগঞ্জে ঐ একই দৃশ্যের অবতারণা। ৩-৪ দিন ধরে চলে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, খুন ইত্যাদি। বাসার এত কাছে ঐ সব হচ্ছিল যে, ছাই এসে পড়ছিল বাসার মধ্যে। গ্রামের ও আশেপাশের অনেক লোক শহরে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। এর সংগে সংগে গ্রামে গ্রামে ডাকাতি, লুটতরাজ, রাহাজানি প্রকটভাবে দেখা দেয়। দিনে মিলিটারীর ভয়, রাত্রে ডাকাতের ভয় সবসময় তটস্থ থাকতে হয়েছে। দিনে গ্রামছাড়া আর রাত্রে পাটের ক্ষেত - এভাবে প্রতিটি ক্ষন কেটেছে। দৌড়ানোর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।

একদিন শুনলাম মিলিটারী আসছে। তবুও থাকলাম বাসায়। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, কাছের এক হাট হতে আগুন আর ধোয়া। অনেকে পালিয়ে যেতে লাগল। গ্রামের কিছু দূর দিয়ে উঁচু মাটির রাস্তা। দাঁড়িয়ে ছিলাম মিলিটারীদেরকে দেখবার জন্য। দেখলামও, আমার কাছে ছোট একটা দূরবীন ছিল। তাই স্পষ্ট দেখলাম, একে একে ৭৯ জন সৈন্য পার হয়ে গেল। আমের সময় গাছে কাঁচা আম ছিল। তাই তারা খেতে খেতে চলছে। কি তাদের উল্লাস, এতটুকুও অনুশোচনা নেই মনে তাদের এই ধবংসলীলার জন্য।

অবশেষে নানান কারণে সে গ্রাম আমাদের ছাড়তে হলো ২৬ শে মে বুধবার। নৌকায় চললাম উল্লাপাড়ার অভিমুখে। দুপুর ২টার দিকে বুধগাছা নামক গ্রামে আশ্রয় নিলাম। যে বাড়ীতে ছিলাম সে বাড়ীর এক ছেলে সৈন্য

বিভাগ কাজ করত। শুনলাম সে ছুটি নিয়ে এসেছিল। মার্চের পর পাক বাহিণীর পক্ষ হতে কাজে যোগ দেবার জন্য আবেদন আসে। কিন্তু বর্বর বাহিনীর সঙ্গে সে যোগ দেয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে বাংলা মাকে উদ্ধার করবার জন্য সে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সে যোগ দিয়েছিল। ঐ বাড়ীর ধারেই রাস্তা (বগুড়া- উল্লাপাড়া)। সাহস করে বসলাম এক গাছের ধারে। কিছুক্ষনের মধ্যে মোটরের শব্দ পেলাম।বুঝতে দেরী হলো না মিলিটারীদের গাড়ী আসছে। দেখলাম এক এক করে নয়াখানা গাড়ী পার হয়ে গেল। কোন গাড়ীতে শুধু দু-একটা পেট্রোলের ড্রাম। আবার কোন গাড়ীতে মিলিটারী ও গোলাগুলির বাক্স। হাটের দিন দু'একজন করে পাকা আম, কলা এসব নিয়ে যেত হাটে। ওরা জোর করে কেড়ে নিত, আম কলা ইত্যাদি, পয়সা চাইলে মারার ভয় দেখাত।

পরের দিন ২৭শে মে দুপুরের পর আর এক গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, যুবক ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। ভয় পেলাম শুনে। এ গ্রামে আসার পথে কিছুক্ষণ বড় রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটলাম খুব ভোরের দিকে। দেখলাম জ্বালিয়ে দেওয়া বহু বাড়ী। রাস্তা থেকে নেমে আধ মাইলের মত হেঁটে এসে বর্বরেরা পুড়িয়ে দিয়েছে বহু গ্রাম। রাস্তায় শুনলাম বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার কাহিনী। প্রথমে তারা নাকি কি একটা তরল পদার্থ 'স্প্রে' করত। তারপর একটা সাদা কাঠির মত জিনিসে আগুন ধরিয়ে ফিকে মারত ঘরের মধ্যে। আগুন ধরে যেত সমস্ত ঘরে। খেয়াল-খুশী মত দু-একটা বাড়ীও তারা বাদ দিয়েছে। মনে হয় খেলেছে তারা, আগুন আগুন খেলা।

যে গ্রামে আমরা থাকতাম, তার আশপাশের গ্রাম হতে ছেলেদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। ধরে নিয়ে গিয়ে উল্লাপাড়া বাজারে খালের মধ্যে বুকজলে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হযেছে তাদেরকে। ট্রেনে করে যাতে মিলিটারীরা না আসতে পারে সে জন্য গ্রামের লোকজন লাইন তুলে ফেলেছে। ফলে তাদেরকে হারাতে হয়েছে ঘরবাড়ী।

মুক্তিবাহিনীর লোকেরা মাঝে মধ্যেই রেল লাইন, ব্রীজ উড়িয়ে দিত। একদিন মোহনপুরের কাছে এক গ্রামে, রাত্রিবেলা দুজন দালালকে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা মেরে ফেলে। পরের দিন পাক সৈন্যরা সে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

২৬ মে জুন শনিবার আমি ও একজন লোক বগুড়া বাড়ী দেখবার জন্য রওনা হই। একটা বাস রাজশাহীর ও একটা বাস বগুড়ার ছিল। বাসে একটা পাঠান ব্যক্তি বাসের সমস্ত পয়সা নিত। কণ্ডাক্টরের হাতে লাগান ছিল শান্তি কমিটির লাল ব্যাচ। পথে মিলিটারীর যাতায়াত চোখে পড়ল।

১-৪৫ মিঃ বগুড়ার পুলিশ লাইনে গাড়ী সার্চ করবার জন্য থামান হয়। অনেকের সঙ্গে আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কি করি, কোথায় থাকি ইত্যাদি। দেখলাম, পুলিশেরা রাইফেলের বাঁট (দুইজন) উপর দিকে ও নল নিচের দিকে দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। 'বগুড়া কারিগরি মহাবিদ্যালয়কে তারা ঘাঁটি বানিয়েছিল। শহরে ১৮% জন জনসাধারণ তখন এসেছে। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তার দু পাশের দোকান, বাড়ীঘর পোড়ানো। যারা বাইরে থেকে শহরে আসে, তখনই কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে তারা চলে যায়। বগুড়া জেলা স্কুলও হয়েছিল তাদের ঘাঁটি। ঐ স্কুলের হোষ্টেলে বারান্দায় ব্যাটারী চার্জ দেওয়া হতো। ষ্টেশনে কোন বাঙালীকে যেতে দেওয়া হতো না।

বগুড়া পিটি স্কুলের কাছে নামলাম ২-১০ মিঃ। নেমে হেঁটে বাড়ীর দিকে আসছি। বাড়ীঘর পোড়া। রাস্তা জনমানবশূন্য। প্রায় ১ মাইল রাস্তার মধ্যে মাত্র ৪জন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তা চলতে ভয় ভয় হচ্ছিল। যেখানে একদিন ছিল উৎফুল্ল প্রানের স্পন্দন, আজ সেখানে শুধু পোড়া মাটির স্তূপ। দেখে কান্না এসে যাচ্ছিল।

বাড়ীর কাছে আসলাম, একই অবস্থায় আমাদের বাড়ীর ও তবে সম্পূর্ণ নয়। কেননা জামায়াতে ইসলামীর এক লোক বেদখল করার জন্য বর্বরদের কাছে অনুরোধ জানালে তারা সম্পূর্ণ বাড়ী ধ্বংস করেনি। প্রতিটি মন্দির ধর্মীয় স্থান তারা হয় ধ্বংস, নয় ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমি একটুর জন্য প্রাণে রক্ষা পাই বিহারীদের হাত হতে, এক মুসলমান ভাইয়ের সহায়তায়। প্রাণ নিয়ে ফিরি ঐ গ্রামে।

কিছুদিন পর দালালদের ভয়ে ও নানান কারণে কোন গ্রামেই থাকা সম্ভবপর না হওয়ার জন্য ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ভারত অভিমুখে নৌকায় রওয়ানা হই। মাঝে মধ্যেই সিরাজগঞ্জ, পাবনার দিক হতে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসত।

৩রা সেপ্টেম্বর নৌকা থেকে দেখলাম কাজীপুর এলাকার অগ্নিসংযোগের দৃশ্য। ৪ দিন পর মানকর চরে (আসাম) পৌঁছাই যমুনা পথে।

স্বাক্ষর/-
শ্যামল রায়
১৬.৯.৭৩

\ ৬০ \

বাদশা মিয়া
মালতী নগর
সদর থানা, বগুড়া

পাক বাহিনী চারদিক থেকে অসংখ্য গোলাগুলি বর্ষণ করতে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে। শহরের মধ্যে প্রবেশ করেই অগণিত লোকজন হত্যা করে। অসংখ্য দোকান পাট লুট করে। বগুড়া শহরের মালতীনগর ও চক লোকমান গ্রামে অসংখ্য বাড়ীঘরে অগ্নি সংযোগ করে ভস্মীভুত করে দেয়। আমি আড়াল থেকে সবকিছু স্বচক্ষে দেখেছি। কার্ফিউ উঠিয়ে দেবার পর জন সাধারণ যখন শহরের মধ্যে এসেছিল পাক সেনারা সেই সময় মেশিনগানের গুলিতে ৩/৪ শত লোক হত্যা করে। আমিও শহরে এসেছিলাম ঐ দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। কোন রকমে জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। ১৯৭১ সালের ৩১ শে অক্টোবর রোজ রবিবার বেলা ১১ টার সময় ১৩ জন খান সেনা ও ৫ জন রাজাকার এসে আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। ধরার সময় আমার বাড়ী থেকে হাতঘড়ি ও আমার স্ত্রীর ঝুমকা ও গলার মালা রাজাকারেরা লুট করে নিয়ে যায়। ইহাতে অনুমান করি যে, খান সেনারা আমার তিন হাজার টাকার মত সোনার গহনা ও কাঁসার থালাবাটি লুট করে নিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাক সেনা শহরে প্রবেশ করেই অবাঙ্গালীদের ৭২ ঘন্টা সময় দিয়েছিল। বাঙ্গালীদের ধন সম্পদ লুটতরাজ করার জন্য। প্রথমে আমাকে স্থানীয় সার্কিট হাউজে নিয়ে আসে। খান সেনার ব্রিগেডিয়ার আমাকে উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে যে, ব্যাঙ্ক লুট করেছে কারা, মুক্তি ফেওজ কোথায়, আওয়ামী লীগের লিডার কে কে ইত্যাদি বিষয়। আমি খুব ভাল উর্দু জানতাম। তাছাড়া আমাকে দেখতে অবাঙ্গালীর মত দেখায়। তাই উর্দুতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। তখন ব্রিগেডিয়ার সার্কিট হাউজ থেকে আমাকে জেল খানায় পাঠায়। জেল খানায় আমি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করি। সিগারেটের আগুন, লোহার রড, রাইফেলের বাঁট, বুট জুতার লাথি ইত্যাদির সাহায্যে খান পিশাচেরা নির্মম নির্যাতন চালায় আমার দেহের উপর। জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনের চিহ্ন এখনও শরীরে বিদ্যমান। এইভাবে আমি ১৩ দিন জেল খানায় বন্দী ছিলাম। অনুমিত হয় যে, এক মাত্র ভাল উর্দু জানায় এবং দৃঢ় মনোবলের জন্য খান সেনারা আমাকে হত্যা করেনি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ বাদশা মিয়া

\ ৬১ \

আব্দুস সামাদ
চক সুত্রাপুর, বগুড়া

১৯৭১ - এর আগষ্ট মাসের ২২ তারিখ। আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই দিন আমি যখন শহরে আমার নিজের কাপড়ের দোকান থেকে ফিরছিলাম তখন ষ্টেশনের সন্নিকটে তিন চারজন খান সেনা ঘিরে ফেলে। এসময় আমাকে হিন্দু না মুসলমান জানতে চায়। আমি মুসলমান বললে আমাকে বলে যে তুমি মুক্তিফৌজ। আমি তা অস্বীকার করলে আমার গালে প্রথমবারের মত থাপ্পড় মারে। অতঃপর আমাকে গ্রেফতার করে নেবার জন্য জনৈক সৈন্য নির্দেশ দেয়। তার পর আমাকে ডানা ধরে নিয়ে যেতে থাকে। কিছুদূর নেবার পর আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে। আমি তাদের নির্দেশ পালন করার পর জিজ্ঞাসা শুরু করে তুমি তো মুক্তিফৌজ এবং ধরা যখন পড়েছ তখন স্বীকার কর তোমার আর দলবল কোথায় আছে। তোমার অস্ত্রশস্ত্রই বা কোথায় আছে । স্বাভাবিকভাবে আমি অস্বীকার করি। তখন আমাকে চড় থাপ্পড় লাথি মারতে থাকে। এর সাথে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। কিছুক্ষণ এমনিভাবে মারার পর কয়েক মুহূর্ত মারের বিরতি ঘটায়। এ সময় আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এবং স্বীকার না করলে আমাকে হত্যা করে ফেলা হবে বলে হুমকি দেখায়। যেহেতু আমি কিছুই জানি না, সমস্তই অস্বীকার করি।

অতঃপর আমাকে অনুরূপভাবে আবার মারধোর শুরু করে। এবার রাইফেলের গাদা দিয়েও মারতে থাকে। মারের চোটে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মাটিতে পড়ে যাই। এ সময় আমার পকেট থেকে টাকা মাটিতে পড়ে যায়। তখন আমার কাছে ৫৬৫ টাকা ছিল। উক্ত টাকাগুলো তারা তুলে নেয় এবং আমার পকেট হাতিয়ে যে টাকা পয়সা ছিল তা নিয়ে নেয়। টাকা তাদের হস্তগত হবার পর তারা নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করলো। শেষে আমাকে যেতে বলে মিলিটারীরা হাসিমুখে অন্যদিকে চলে যায়।

স্বাক্ষর/-
আব্দুস সামাদ

\ ৬২ \

আমির আলী খান
গ্রাম-তেঘর, থানা- জয়পুরহাট
জেলা -বগুড়া

তখন ৫ই এপ্রিল কিংবা ১০ই এপ্রিল হবে। চারিদিকে খান সেনারা টহল দিয়ে ঘুরে ফিরছিল আওয়ামী লীগের লোকজনকে ধরার জন্য। আমার বড় ভাই ছিল আওয়ামী লীগের ৩৬ কমিটির একজন সদস্য। আমি কৃষিকাজ করে খাই। আমার ভাই আমার থেকে পৃথক। খান সেনাদের ধরার ভয়ে বাড়ী থাকে না। কোথায় কোথায় থেকে শুধু সংগ্রাম আর সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। একদিন হঠাৎ ২৫/২৬ জন খান সেনা রাত্রিতে এসে আমার বাড়ী ও ভাইয়ের বাড়ী ঘেরাও করে। ভাইকে না পেয়ে তারা আমাকে ধরে এবং বেদম প্রহার করতে শুরু করে আর বলে তোর ভাই কাঁহা উছকো বোলাও। আরো কি কি বলে আমি বুঝতে পারি না। আমি তাদেরকে বললাম ভাইয়ের কথা বলতে পারবো না সে আমার থেকে আলাদা। আমি কৃষক মানুষ সারাদিন মাঠে পড়ে থাকি কিন্তু তারা আমাকে কিছুতে ছেড়ে দিল না। কিছু দূরে তাদের গাড়ী ছিল। ধরে নিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আমাকে যে ঘরে রাখলো তার পার্শ্বে আরো কয়েকটি ঘর ছিল। সেখানেও আমার সমান বয়সী এবং কমবয়সী লোক বিভিন্ন ধরনের লোক সেখানে ছিল। সেখানে তাদের বড় ক্যাপটেন আসলো, আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমার ভাইয়ের কথা কিন্তু তার খুশি মত জবাব না পাওয়ায় সে নিজে খুব মারলো এবং শেষ পর্যন্ত কখন তারা মার বন্ধ করেছে তা বলতে পারবো না। জ্ঞান হলে দেখি আমার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে সমস্ত শরীর কেটে ফেটে গেছে। এইভাবে দুই দিন ধরে পরপর আমাকে মারতো আর ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা আর কিছুই আমার কাছ থেকে জানতে পারলো না তখন একদিন রাতে আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এক রাস্তায় নিয়ে যায়। সেখানে তারা আবার মারতে শুরু করে। তাদের মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান হলে দেখি তাদের ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে এক গর্তের মধ্যে পড়ে আছি। অনেক কষ্টে সেখান থেকে উঠে করিম নামে এক লোকের সাহায্যে বাড়ী পৌঁছি।

স্বাক্ষর/-
আমির আলী খান

\ ৬৩ \

মোঃআব্দুল মালেক মণ্ডল
গ্রাম ও থানা- সারিয়া কান্দি
জেলা- বগুড়া

১৪ ই আগষ্টে পাক বাহিনী সারিয়া কান্দিতে চলে আসে। সারিয়া কান্দিতে কালো পতাকা ও বাংলাদেশের পতাকা দেখে অসংখ্য বাড়ীঘর ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ আরম্ভ করে। অতঃ পর আমারা দোকানে চলে আসে। দোকানে আসার পর আমার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করে। তা ছাড়া মুক্তিবাহিনী কোথায় আছে এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের কথা জিজ্ঞাস করে। উত্তরে আমি অস্বীকার করি। অতঃপর সেখান থেকে চলে গিয়ে থানায় ঘাঁটি করে। ঐ দিন বিকেলের দিক কতিপয় খান সেনা ও রাজাকারেরা পুনরায় আমার দোকানে চলে আসে। তারা সরাসরি দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ে। খান সেনারা দোকানের বাক্সের ভিতর একটি বাংলাদেশের পতাকা পায়। পতাকা দেখে তৎখণাৎ তারা দোকানের সমস্ত মালপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়। আমি ঐ সময় দোকানে উপস্থিত ছিলাম না। তবে অনুমান করি যে, এক মাত্র দোকান থেকে ৭০/৭৫ হাজার টাকার মাল পত্র খান দস্যু ও রাজাকারেরা নিয়ে যায়। অতঃপর দুষ্কৃতকারীদের চক্রান্তে খান পশু ও রাজাকারেরা আমার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। সেখানে গিয়ে তারা বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে দেয়। ১৫ ই আগষ্ট বিকালবেলায় আমার ছেলে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী আবজল হোসেনকে ধরে নেয়। তাদের ক্যাম্পে নেওয়ার পর বুট, লাথি, লোহার রড ও রাইফেলের বাঁটের সাহায্যে তার দেহে ভীষণ আঘাত করে। তাছাড়া সিগারেটের জ্বলন্ত আগুন দিয়ে তার শরীর পুড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, পায়খানার ভিতর অনাহারে তিন দিন যাবৎ তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে দেয়। তিন দিন পর খান সেনারা তাকে ছেড়ে দেয়। খান পশুরা যেভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছিল, ইতিহসে তার নজির নেই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আব্দুল মালেক মণ্ডল
১৯/৯/৭৩

\ ৬৪ \

খোন্দকার ইউনুস আলী
থানা- সারিয়া কান্দি
জেলা -বগুড়া

আগষ্টের ১৯ তারিখে সারিয়াকান্দি থেকে খান সেনারা দ্বিতীয় বার চন্দনবাইশা চলে আসে। গ্রামের জনসাধারণ একত্রে ডেকে হিন্দুর জমির লোভ দেখিয়ে এবং টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে রাজাকারে আসার নির্দেশ দেয়। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় আছে এবং কে কে ইত্যাদি খোঁজখবর জানতে চায়। এরপর খান সেনারা রাজাকারে জোর করে লোক নেবার জন্য ২১ তারিখ মঙ্গলবার দিন ধার্য্য করে আসে। অতঃপর সারিয়াকান্দিতে চলে আসে। আসার পর খান সেনারা বগুড়া থেকে বহুসংখ্যক রাজাকার ও খান সেনা সারিয়া কান্দিতে সংবাদ দিয়ে নেয়ে আসে। ২১ তারিখ মঙ্গলবার ১১টার সময় প্রায় ২শত জন খান সেনা ও ৭৫ জন রাজাকার চন্দনবাইশায় চলে আসে। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে ঘাঁটি করে এবং প্রয়োজনীয় বাঙ্কার তৈরী করে উক্ত স্থানে ঘাঁটি করে। খান সেনারা রাত্রিযোগে জনগণের বাড়ী থেকে হাঁস, মুরগী, গরু, খাসী ইত্যাদি নিয়ে যায়। অযথা যে কোন লোকজনকে ধরে ভীষণ নির্যাতন করত। গ্রামে ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। একদিন উক্ত গ্রামে জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীকে খান সেনারা জোর করে ধরতে যায়। ঐ সময় স্বামী তার স্ত্রীর উপর অত্যাচারের ভাব দেখে সহ্য করতে না পেরে তাকে আঘাত করে। খানসেনা তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং মাটিতে চাপা দেয়। অতঃ পর কয়েক রাউণ্ড এদিক ওদিক ফায়ার করে। খান সেনারা চর চন্দনবাইশার আইনুল হককে নির্মমভাবে হত্যা করে । ঐ সময় কয়েকজন গ্রাম্য লোক আহত হন। এরপর খান সেনারা প্রকাশ্যে নারী নির্যাতন করতে আরম্ভ করে। অকারনে যে কোন লোক জনকে ধরে নিয়ে খান সেনারা খেত। সেই কথা বলতে গিয়ে উক্ত গ্রামের লোক শাহ্ মনসুর আলী খান সেনাদের হাতে ভীষণ নির্যাতন ভোগ করেন। ঐ সংগে তার ছেলেকে খান সেনারা ভীষণভাবে মারপিট করে। খান সেনারা তাদের দুই জনকে লাঠি, রাইফেলের বাঁট, বুট জুতার লাথি ও লোহার রড দিয়ে ভীষণভাবে নির্যাতন করে ছেড়ে দেয়। সংগে সংগে তার বাড়ীতে অগ্নীসংযোগ করে বহু টাকার ধন-সম্পদ ভস্মীভূত করে দেয়। রাজাকারেরা বহু টাকার ধন- সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমার পার্শ্ববর্তী বাড়ীর বাসিন্দা শওকৎ হোসেন মুনসীর মিথ্যা চক্রান্তে আমাকে খান সেনারা ধরে নেয়। ধরার সময় চড় ও রাইফেল দিয়ে ভীষণ আঘাত করে এবং খান সেনারা আমাকে ছেড়ে দেয়। পরের দিন আমার নিজ বাড়ী ও বড় ভাইয়ের বাড়ী খান পশুরা লুট করে যথা সর্বস্ব নিয়ে যায়। খান সেনারা আমাদের দুই ভায়ের ৪০০০ (চার হাজার) টাকার ধনসম্পদ অপহরণ করে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পরে যে, উক্ত এলাকার চতুর্দিকে খান সেনাদের ঘাঁটি থাকায় অসংখ্য বাড়ীঘর লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন চালায়। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সারিয়া কান্দি থানার মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র ট্রেনিং সেন্টার এবং কেন্দ্রস্থল ছিল চন্দনবাইশা গ্রাম।

স্বক্ষর/-
খন্দকার ইউনুছ আলী
২০/৯/৭৩

\ ৬৫ \

মোঃ আজাদুর রহমান মণ্ডল
গ্রাম-হামিদপুর
থানা-গাবতলী
জেলা-বগুড়া

খান সেনারা হঠাৎ একদিন হামিদপুর গ্রামে ঢুকে পড়ে। আমি কোন উপায় না দেখে অতি চতুরতার সাথে শরীরে কাদামাটি মেখে নিজের জমিতে চাষ করতে যাই। সেখান থেকে একজন খান সেনা আমাকে আক্রমণ করে। তখন আমি হাত থেকে গুরু তাড়ানোর লাঠি মাটিতে ফেলে দুহাত তুলে খান সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করি। অতঃপর খান সেনা আমার গ্রামের নাম, মুক্তিবাহিনী এবং নিজে মুক্তি কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করার পর আমি উর্দুতে সমস্ত কথা তাকে বুঝিয়ে দেই। কিন্তু খান সেনা অবিশ্বাস করে এবং আমাকে মুক্তি ধারণা করে গুলি করার প্রস্তুতি নেয়। এরপর আমি মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে ভাল করে পাকিস্তানী জাতীয় সঙ্গীত উর্দুতে ও বাংলাতে বলি। তারপর আমি আল্লাহর নিকট পাকিস্তানের জন্য এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তখন খানসেনারা গুলি না করে আমার বাড়ীর ভিতর নিয়ে আসে। অতঃপর স্ত্রী পুত্র আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। স্ত্রীকে ডেকে আনে। ঐ সময় আমাকে ঘরের ভিতর একজন পাঞ্জাবী সৈন্য ডেকে নেয়। ঠিক ঐ সুযোগে ঐ খানটি আমার স্ত্রীর ৫ ভরী সোনার দুইটি বালা বাক্স খুলে নেয়। এরপর তারা ছেলের নাম জিজ্ঞাসা করে। তখন আমি পিস্তল ও জান্টার পর পর দুই ছেলের নাম বলি। তখন পিস্তলের কথা শুনে তারা পজিশন নেয়। আমি তাহা উর্দুতে বুঝিয়ে দেই। কারণ পিস্তল ও জান্টার আমার ছেলেদ্বয়ের ডাকনাম ছিল। এত বলা সত্ত্বেও খান সেনারা আমাকে ভারতের দালাল বলে বিবেচনা করে। আমি মুসলমান কিনা তা দেখার জন্য আমার লুঙ্গী খুলতে বলে। একজন বেলুচী সৈন্য তা নিষেধ করে। ঐ বেলুচী সৈন্যটি আমাকে বারবার সাহায্য করে আসছে। আমি তখন বলি যে, আপনি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলেন। তবুও আমি নিজের ইজ্জত দেখাব না। আরও বলি যে, আমি যদি প্রকৃতই মুক্তি হয়ে থাকি, তাহলে আপনাদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলুন। তিনিই বিচার করবেন। অতঃপর আমাকে ক্যাম্পে আসে।ক্যাম্পে এসে কিছু সময় পর দেখতে পাই যে হাত বেঁধে একটি ছেলেকে রাস্তার উপর নিয়ে আসছে। ব্রিগেডিয়ারের নির্দেশ মোতাবেক তাকে লাথি মেরে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। পরপর কয়েকবার বুট জুতার লাথি মেরে তাকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলে। এরপর আমাকে গুলি করার নির্দেশ দেয়। তখন আমি বলি খান সাহেব মৃত্যুর আগে আমি কয়েকটি কথা বলব, তখন আমাকে কথা বলার জন্য সময় দেয়। অতঃপর আমি চতুরতার সাথে পাকিস্তানী জাতীয় সংগীত গাই এবং পাকিস্তানী ফৌজ ও পাকিস্তানের দীর্গায়ু কামনা করি। এরপর ব্রিগেডিআর আমার লেখাপড়া কতটুকু জানতে চায়। আমি আরও চতুরতার সহিত বলি যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। ব্রিগেডিয়ার বলে যে, তা হলে তুমি এত ভাল উর্দু কেমন করে শিখলে? জবাবে আমি বলি যে, ভাষা আন্দোলনের সময় উর্দু ভাষার উপর যখন জোর দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় আমি উর্দু ভাষা শিক্ষা করেছি। বার বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর ব্রিগেডিয়ার পুনরায় গুলির হুকুম দেয়। তখন আমি কোন উপায় না দেখে বলি যে, খান সেনা আপনার মত আমরাও একজন পাক ফৌজের ক্যাপ্টেন আছে। যার নাম কুদরতে খোদা (বাবলু)। ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে তিনি কুদরতে খোদা খেতাব পেয়েছেন। এই কথা শুনে তিনি ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করেন। এরপর সেখান থেকে সঠিক খবর নিয়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেওয়ার পর খান সেনাদের সাহায্য করার কথা, পাকিস্তানের হেফাজতের কথা এবং মুক্তিদের খোঁজ খবর দেওয়ার কথা বলে। এরপর আমি বাড়ী চলে যাই। এর কিছু দিন পর খানসেনারা নাড়ুয়া মালা হাটে জনসাধারণ নিয়ে মিটিং এর জন্য নাড়ুয়া মালা হাটে চলে যায়। আমিও ঐ দিন উক্ত হাটে যাই। মিলিটারীর কথা শুনে হাটের লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে চলে যায়। আমি একটি গ্রেনেড নিয়ে জঙ্গলের ভিতর শুয়ে পড়ি খানসেনারা সেখান থেকে আমাকে দ্বিতীয়বার ধরে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কেন জঙ্গলের ভিতর। নিশ্চয়ই তুমি মুক্তিফৌজ এই বলে আমাকে গাড়ীতে তুলে পুনরায় হাটে নিয়ে আসে। হাটের ভিতর

ব্রিগেডিয়ার জনসাধারণরে মধ্যে ভাষণ দিলেন এই বলে যে, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা আমাদের সাহায্য কর, মুক্তিফৌজদের খোঁজ খবর দাও এবং ভারতের দালাল ধরে দাও ইত্যাদি বিষয়। এরপর আমি ব্রিগেডিয়ারের অনুমতি নিয়ে ঐ সমস্ত কথাগুলি পুনরায় বলি। আমি আরও বলি যে, পাক ফৌজ কেন আমাদের মা বোনের ইজ্জত ধবংস করছে? তারা আমাদের হেফাজতের জন্য এসেছে। আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আমাদের উপর গুলি করা আল্লাহপাক বরদ্দাস্ত করবে না। মুসলমানের ধর্ম কি তাই? একজন নিরীহ লোককে হত্যা করা এটা বিধর্মীয় কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাষণ দেই। এই ভাষণ শুনে ব্রিগেডিয়ার আমাকে ডেকে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। ঘরের ভিতর নিয়ে জোর করে ৫০টি টাকা বকশিস দিয়ে কোরান ছুঁয়ে শপথ করায় যে, আগামী কাল আমি যেন তাদের ক্যাম্পে দেখা করি। পরের দিন সেই মোতাবেক তার কথা ও ধর্ম রক্ষার্থে ক্যাম্পে গিয়ে দেখা করি। তখন ব্রিগেডিয়ার বলে যে, তোমাকে ১০০০ (এক হাজার) করে টাকা দিতে ইচ্ছুক এবং সমস্ত বগুড়া জেলার রাজাকারের কমাণ্ডার বানিয়ে দিতে চাই, তুমি কি ইচ্ছুক? তখন আমি বলি যে, স্যার আমি রাজাকার হতে চাই না। এরপর আমাকে অনেকগুলি ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নোট দেখায় এবং বলে যে, তুমি যদি রাজাকারের কমাণ্ডার হও তাহলে তোমাকে বহু টাকা দেওয়া হবে। আমি সমস্ত কিছু অস্বীকার করে কোন রকমে বাড়ী চলে আসি। রমজান মাসে আমি নাড়ুয়া মালা হাট থেকে আসছিলাম। তখন দেখতে পেলাম একজন খানসেনা একটি লোকের নিকট থেকে জোর করে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। লোকটি তখন আমার কাছে ঐ কথা বলে দেয়। তখন আমি প্রতিবাদ করলে আমার পকেটে যত টাকা ছিল খানসেনা তা কেড়ে নেয়। গাবতলী বাজারের ভিতর এসে একখানা চাকু সংগ্রহ করি। অতঃপর বাজারের ভিতর খান সেনাকে রাইফেলসহ জড়িয়ে ধরি। অতঃপর আমি লোকজন ডাকলাম খান সেনাকে চাকু মারতে। কিন্তু কেউই আমাকে সাহায্য করতে আসল না। ১০ মিঃ আমাদের এ লড়াই চলে আমিও সুযোগ পাইনা চাকু মারতে। অতঃপর খান সেনাটি তার টাকা এবং তার সাথে আরও বিশটি (২০) টাকা দেয়। আমি খান সেনাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড় দিয়ে প্রাণ বাঁচাই। এই রকম ভাবে আমি তিনবার খান সেনাদের হাতে নির্যাতিত হই। প্রত্যেক বারই আমি সাহস ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে রেহাই পাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আজাদুর রহমান মণ্ডল
ইং ২৪/৯/৭৩

\ ৬৬ \

মোঃ জজবর রহমান
(ষ্টেশন মাষ্টার)
জয়পুরহাট রেলষ্টেশন, জেলা- বগুড়া

হানাদার বাহিনী ২৪শে এপ্রিল শনিবার রাত্রিতে জয়পুরহাট চলে আসে। আসার সময় রেলষ্টেশনের অনতিদূরে একটি রেল সেতুর কাছে গুলি করে ৩ জন নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। ইতিপূর্বে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে জয়পুরহাট থেকে তিন মাইল দূরে এক গ্রামে রেখে আসি। প্রত্যেক দিন ঐ গ্রাম থেকে সকালে ষ্টেশনে আসতাম এবং সন্ধ্যায় ফিরে যেতাম।

খান সেনাদের আগমনের সাথে সাথে আমি জীবনের ভয়ে কাজ ফেলে দূরে গিয়ে পালাতে বাধ্য হই। আর অফিসে আসিনি। খান সেনারা এখানে এসে স্কুল কলেজ এবং সরকারী বেসরকারী অফিস আদালত খোলার ব্যবস্থা করে। ষ্টেশন মাস্টার সাহেবের খোঁজ করতে থাকে। বহু গুপ্তচরকে আমার পিছনে লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় এক বুকিং ক্লার্ক (অবাঙ্গালী) আমার তল্লাশী চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে ধরতে না পেরে এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠায় যে, যদি আমি নিজ কার্যে যোগদান না করি, তবে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে ধরে এনে হত্যা করা হবে। সত্য সত্যই কয়েকদিন পর সেই অবাঙ্গালী বুকিং ক্লার্ক এবং আরও কয়েকজন অবাঙ্গালী খোলা তলোয়ার হাতে আমার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। উপায় না দেখে আমি ধরা দিতে বাধ্য হই। অতঃপর মহকুমা প্রশাসক কার্যে যোগদান করেছেন কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে তার কাছে যাই। মহকুমা প্রশাসক আমাকে কাযে যোগদান করতে আদেশ দেন। আমি মেজরের সাথে দেখা করি। দেখা করার সময় একজন পাঞ্জাবী আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। মেজর কার্যে যোগদান করার জন্য আদেশ দেন। অতঃপর অফিসে চলে আসি। অফিসে আসার পথে প্লাটফরমে একজন পাক সেনা আমাকে দরে পকেট থেকে টাকা-পয়সা নিতে চেষ্ট করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অফিসের বেশকিছু টাকা খান সেনাদের ভয়ে সরিয়ে ফেলেছিলাম। খান সেনাটি আর কিছু না বলে ছেড়ে দেয়। দিনের পর দিন খান সেনারা অত্যাচার আর গণহত্যা চালাতে থাকে। পূর্ব উল্লেখিত খান সেনার সাথে আমার বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠে। ঐ খান সেনার সহযোগিতায় আমি বহু নিরীহ লোকজনকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করি। অত্র এলাকায় ঘাঁটি করে থাকাকালীন খান পশুরা অসংখ্য লোক জনকে হত্যা করে। খান সেনারা অবাঙ্গালীও ধরে আনে রেল মিস্ত্রীর সাহায্যে। রেললাইন মেরামত করে স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত শান্তাহার থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ করে। এরপর ভারতীয় মিত্র বাহিনীর প্রবল আক্রমণে বাংলাদেশ মুক্ত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জয়পুরহাটও মুক্ত হয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ জজবর রহমান
১১/১০/৭৩

\ ৬৭ \

মোঃ আবুল কাসেম
থানা- গাবতলী
জেলা-বগুড়া

২৫শে মার্চ পাক হানাদার বাহিনী বগুড়া শহরে আক্রমণ করে ব্যর্থ হলে অতঃপর ১৩ই এপ্রিল তারিখে ত্রিমুখী আক্রমণ ও বিমান আক্রমণ করে বগুড়া শহর তাদের আয়ত্তে নিয়ে আসে। অতঃপর কয়েক দিন পর এক দল খান সৈন্য গাবতলী থানায় চলে আসে। গাবতলীর সি, ও, অফিসে তারা ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপর খান সেনারা চারিদিকে টহল দিতে থাকে। হঠাৎ করে একদল খান বর্বর বাহিনী সুখান পুকুর রেলষ্টেশনে এসে উপস্থিত হয়। পর পর বহু দোকান পাট ও বাসাবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। বাজারের অসংখ্য দোকানপাট ও বাসাবড়ীতে লুটপাট আরম্ভ করে দেয়। যাকে যে অবস্থায় যেখানে পায় খান হায়েনারা তাকে সেখানেই বেয়োনেট চার্জ করে অথবা রাইফেলেন গুলি দিয়ে হত্যা করে। এক সংগে ৭২ জন নিরীহ জনগণকে একত্রে দাঁড়া করে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার মেরে হত্যা করে। গাবতলী থানার ভিতর সুখান পুকুরে এত গণহত্যার নজির আর কোথাও পাওয়া যায়নি। বাজারে ঢুকে সর্বপ্রথম কয়েকটি মালজাত গুদাম ঘরে তারা অগ্নিসংযোগ করে বহু টাকার ধান চাউল ভস্মীভূত করে দেয়। তাছাড়া বাজারের বহু দোকানদারকে ধরে ভীষণ নির্যাতন করার পর গুলি করে হত্যা করে। এদিনই পাক সেনারা আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার ঘর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। পর পর খান সেনা ও রাজাকার মিলে আমার বাড়ীতে বহু টাকার ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। খান বর্বর বাহিনী আমার বাড়ী থেকে ৭/৮ হাজার টাকার জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। বহু সংখ্যক হিন্দুর বাড়ী অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে দেয়। গ্রামে ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। বাজারের সমস্ত দোকান পাট ও ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগ করে পাক হায়েনারা আবার গাবতলী সি,ও, অফিসে যায়। গাবতলী থেকে খান পশুরা প্রত্যহ সুখান পুকুরে আসা যাওয়া করতে থাকে। প্রত্যেক বারই তারা দু'চারজনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার ১২/১৩ দিন পূর্বে মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে গাবতলী থানা তথা সুখান পুকুর শেষ বারের মত শত্রুমুক্ত হয়। স্বাধীনতার পতাকা সর্বত্র উড়াতে থাকে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবুল কাসেম
২৫/৯/৭৩

\ ৬৮ \

আরিফুর রহমান (বাদশা)
সন্ধ্যাবাড়ী, থানা- গাবতলী
জেলা - বগুড়া

জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিন রাতে আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে পাক সৈন্যরা আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে অবশ্য আমার বাড়ীর দামী জিনিসপত্র ও সোনাদানা লুটপাট করে। মিলিটারীদের সাথে কতিপয় অবাঙ্গালীও ছিল। তাদের মধ্যে বাঙ্গালীও থাকা সম্ভব।

গ্রেফতার করার পর আমাকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা প্রয়োজন, আমার হাত বাঁধা অবস্থাতেই নেয়া হয়। পথের মধ্যেই কয়েক দফা চড়থাপ্পড় মারা হয়।

সার্কিট হাউসে নেয়ার পর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আমি মুক্তিবাহিনীকে খবর সরবরাহ করি। তারা আমার কাছ থেকে জানতে চায় যে, মুক্তিবাহিনী কোথায় আছে, তাদের সংখ্যা কত এবং তাদেরকে কিভাবে খবর সরবরাহ করি? আমি মুক্তিবাহিনীর লীডার না অন্য কেউ লিডার আছে? তার নাম কি? মুক্তি বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র কোথায় আছে?

আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলে আমার উপর দৈহিক নির্যাতন শুরু করে। কয়েকজন মিলে পর্যায়ক্রমে আমাকে নানানভাবে অত্যাচার করতে থাকে। রুলার দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জোড়ায় বেদম প্রহার করে। শরীরের গিট ছাড়াও বিভিন্ন অংশে হৃদয়হীন ভাবে অত্যাচার করে।

এ ছাড়া খাড়া করে পা টান করে রেখে পিঠ কুঁজো অবস্থায় ঘাড় টান করে হাতের কব্জি দিয়ে ঘাড়ে মারত। শরীর একটু এদিক ওদিক করলে অথবা যন্ত্রণায় কাতরালে আরো বেশী করে অত্যাচার করতে থাকে। মারের সাথে সাথে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এই অবস্থায় এত বেশী করে আমার উপর অত্যাচার করা হয়েছিল যে, আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। এ ছাড়া রাইফেলের বাঁট, গাদা, গুতা আর পিটান দিতে থাকে। এ ছাড়া লাথি তো আছেই।

অত্যাচারের সময় তারা কয়েক পদে অত্যাচার করে। এরা উনিশ পদে অত্যাচার করত। তাদের সুবিধা মত কখনও তারা আমার হাত বেঁধে রাখত আবার কখনও পা খোলা রাখত।

দুই দিন বন্দী থাকার পর শান্তি কমিটির সুপারিশে ছাড়া পাই। অবশ্য এ জন্য আমার আত্মীয়স্বজনকে আড়াই হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে।

স্বাক্ষর/-
আরিফুর রহমান

\ ৬৯ \

ডাক্তার মোঃ হাবিবুর রহমান
সুখানপুকুর ষ্টেশন বাজার
থানা- গাবতলী, জেলা-বগুড়া

প্রথমবারে (২৬শে মার্চ) পাক হানাদার বাহিনী ব্যর্থ হওয়ার পর ১৩ই এপ্রিল ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে বগুড়া শহর পূর্ণ দখলে আনে। কয়েকদিন পর একদল হানাদার বাহিনী গাবতলী সি, ও, অফিসে ক্যাম্প স্থাপন করে। গাবতলী থাকাকালীণ হঠাৎ একদিন খান পশুর অত্র সুখানপুকুরে হানা দেয়। হানা দিয়ে অসংখ্য দোকানপাট ও ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। ৭২ জন নিরীহ জনগণকে একত্র লাইন করে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে হত্যা করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, খান সেনারা বাজারে ঢুকেই সর্বপ্রথম আমার বাসায় অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভুত করে দেয়। আমি অনুমান করি যে, খান সেনারা প্রায় এক লক্ষ টাকার ধন- সম্পদ ভস্মীভূত করে দেয়। রাজাকার ও বিহারীরা বাজারের বিভিন্ন দোকানপাট লুট করে নিঃশেষ করে দেয়। জনসাধারণকে ডেকে খান সেনারা মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের খোঁজ জানতে চায়। জনগণ অস্বীকার করলে তাদেরকে ধরে ভীষণ নির্যাতন করার পর বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে তাদেরকে হত্যা করে। গ্রামে গ্রামে ঢুকে খান কুকুরেরা নিরীহ অবলা বালার প্রতি পাশবিক অত্যাচার শুরু করে । প্রথম দিনের মত খান সেনারা গাবতলিতে পুনরায় ফিরে যায়। এরপর প্রত্যেক দিন গাবতলী থেকে বর্বররা গাড়ীযোগে সুখানপুকুরে টহল দিতে থাকে। প্রত্যহ আসার পথে অথবা যাওয়ার পথে বর্বর দস্যু বাহিনী ২/৪ জনকে হত্যা না করে ফিরে যেত না। খান সেনারা গাবতলী তথা সুখানপুকুরের আশেপাশের সমস্ত জনগণের মনে ত্রাশের সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেকদিন তারা গ্রামাভ্যন্তরে ঢুকে মেয়েদেরকে জোর করে বা তাড়িয়ে ধরে পাশবিক অত্যাচার চালায়। কাউকে ধরে তারা ক্যাম্পে নিয়ে যেত। এদের প্রায়ই মরে যেত।

আবার কেউ কেউ পশুদের হাত থেকে বেঁচে কোন রকমে বাড়ী চলে আসত। দীর্ঘদিন নির্যাতন চলার পর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর আক্রমণে শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পাই।

স্বাক্ষর/-
ডাক্তার মোঃ হাবিবুর রহমান

\ ৭০ \

সুকচান
গ্রাম - সাইন্দ্রা
পোঃ- শান্তাহার
জেলা - বগুড়া

বগুড়া জেলার অর্ন্তগত আদমদিঘী থানার শান্তাহার ইউনিয়নের অধীন সাইন্দ্রা গ্রামটি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও বিহারদের দ্বারা অত্যাচারিত । মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সাইন্দ্রা গ্রামে পাক বর্বররা প্রবেশ করে। উক্ত গ্রামে প্রথমে লুটতরাজ এবং পরে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিসংযোগের ফলে প্রায় ৩শত বাড়ী পোড়া যায়। উক্ত ৩ শত বাড়ীর যাবতীয় মালামাল ভস্মীভূত হয়। এখনও ধবংসের সাক্ষ্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। উল্লিখিত গ্রামে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে।

এই গ্রামে ঢুকে পাক বর্বররা ছাগল, গরু, হাঁস, মুরগী ও তরিতরকারী ইত্যাদি লুট করেছে। কয়েকজন নারী যারা পালাতে সক্ষম হয়নি তাদেরকে ধর্ষণ করে ও ধরে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। ক্যাম্পে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যয়িনি। এই গ্রামের প্রায় ১৫০ জন লোক পাক বর্বরদের হাতে প্রাণ দিয়েছন।

স্বাক্ষর/-
সুকচান

\ ৭১ \

ওমর আলী প্রামাণিক
গ্রাম-নাপুরগাছি, থানা-পাঁচবিবি
জেলা-বগড়া

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমি আমার বাড়ী দেখার জন্য নাপুরগাছি চলে আসি। এবং নিজ বাড়ীতে গিয়ে দেখি পাক হানাদার বাহিনী বাড়ীর আশেপাশে বাঙ্কার করে বাঙ্কারের মধ্যে মেশিনগান বসিয়ে পজিশনে আছে। আমি বাড়ীতে ঢুকে দেখতে পাই আমার বাড়ীতে খাট চৌকি ইত্যাদি সবকিছু পাক হানাদার বাহিনী নিয়ে তাদের কাজে ব্যবহার করেছে। তারপর আমি বাড়ী হতে খিড়া পাথার রওনা হয়ে যাবার সময় পথে এক জঙ্গলের মধ্যে পাক হানাদার বাহিনী ও বিহারীরা আমাকে দেখে ফেলে। এবং আমাকে পাঞ্জাবী একজন সৈন্য ডাকে। আমি তার নিকট গিয়ে দেখতে পাই জঙ্গলের মধ্যে হানাদার বাহিনী দুটি গর্ত করে রেখেছে, তার গভীরতা প্রায় ২০/৩০ হাত এবং দৈর্ঘ প্রায় ৩০/৪০ হাত। আমি সেখানে পৌছালে একজন পাক সেনা বিহারীদেরকে নির্দেশ দেয় আমাকে উক্ত একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে জ্যান্ত কবর দিতে। তারপর বিহারীরা ও একজন পাক সেনা আমাকে উক্ত গর্তের মধ্যে নামতে বলে। আমি গর্তের মধ্যে নামার সাথে সাথে আমাকে চিত হয়ে টান হয়ে শুইতে বলে। আমি ভয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে আল্লার নাম স্বরণ করতে থাকি। তারপর পাক হানাদারদের মধ্যে একজন বিহারীদেরকে নির্দেশ দেয় জ্যান্ত অবস্থায় আমাকে মাটিচাপা দিয়ে রাখতে। দুইজন বিহারী কোদাল হাতে করে একজন মাথার দিকে গিয়ে দাঁড়ায় আর একজন পায়ের দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর তারা কোদালে মাটি তুলে আমার শরীরের উপর মাটিচাপা দিবে। এমন সময় একজন পাক সেনাদের ক্যাপ্টেন ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস দেয় যে, এই লোকটাকে কেন তোমরা জ্যান্ত কবর দিচ্ছ। তারপর ক্যাপ্টেন আমাকে গর্ত হতে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমার বাড়ী কোথায়, কোথায় যাবে তুমি? আমি ভয়ে ভয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিই। তারপর ক্যাপ্টেন তার সিপাইদেরকে ও বিহারীদেরকে বেশ শাসন করে। এবং আরও বলে এ লোক একজন বুড্ডা আদমী, একে তোমরা কেন জ্যান্ত কবর দিচ্ছিলে। এ তো কোন অপরাধ করে নাই। তারপর ক্যাপ্টেন আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কোথায় যাবে। আমি জবাব দেই আমি পূর্বদিকে যাবো। তারপর আমাকে ক্যাপ্টেন পূর্ব দিকে যেতে নির্দেশ দিলে আমি রওনা হয়ে চলে আসি। এবং খিড়া পাথার গিয়ে আমার পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাত করি এবং ঘটনাদি খুলে বলি। তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আমি নিজ বাড়ী চলে আসি।

স্বাক্ষর/-
ওমর আলী প্রামাণিক
৬/১১/৭৩

\ ৭২ \

ফকির মামুদ মণ্ডল
গ্রাম-দানেজপুর
ডাঘর - পাঁচবিবি
থানা- পাঁচবিবি
জেলা-বগুড়া

১৯৭১ সালের বাংলা আষাঢ় মাসের ২০/২৫ তারিখে ৫০/৬০ জন রাজাকার পুলিশ বিহারী ও পাক মিলিটারী মিলে আমার বাসায় যায় এবং বাসা ঘেরাও করে এবং আমাকে বাসা হতে ধরে ফেলে। বাসার বাইরে নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। তোমার চার নাতী মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে যদি তুমি এনে না দাও তাহলে আমরা তোমাকে গুলি করে হত্যা করবো। তার প্রতি উত্তরে আমি জবাব দেই তারা কোথায় গিয়েছে তা আমি বলতে পারবো না, আর আপনারা যদি তাদেরকে কোথাও খঁজে পান তা হলে তাদেরকে আপনারা গুলি করে মেরে ফেলবেন আমার কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু আমার নাতিরা কোথায় গিয়েছে তার জন্য তো আমি দায়ী হতে পারি না। কারণ তারা এখন বড় হয়েছে নিজ নিজ স্বাধীনতা নিয়ে তারা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি আর কি তাদের খোঁজখবর আমার পক্ষে রাখা সম্ভব। তারপর পাক হানাদার বাহিনীরা আমাকে চোখ বেঁধে পাঁচবিবি রেল লাইনের উপর নিয়ে আসে। এনেই স্থানীয় বিহারীদের নেতারা আলাপ- আলোচনা করার পর চোখ বাঁধা অবস্থায় আমাকে রেল লাইনের উপর ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। আমি বাড়ী চলে যাই। ঐ ঘটনা ঘটার ৭/৮দিন পর আয়ুবের নির্দেশে ২০ /২৫ জন রাজাকার বিহারী ও পাক সেনা মিলে আবার আমার গ্রামের বাসায় গিয়ে ঘেরাও করে আমাকে ধরে পাঁচবিবি নিয়ে আসে। এসেই সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আমি আমার জবাবে একই কথা বলি। তারপর সেদিনও পাক হানাদার বাহিনী কুখ্যাত বিহারী নেতার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমার চোখ বেঁধে সি,ও, অফিসের নিকট নিয়ে ছেড়ে দেয়। আমি বাড়ী চলে যাই। তারপর আমি আমার পরিবার পরিজনের সবাইকে নিয়ে ভারত চলে যাই। সেখানে আমার পরিবারের সকলকে রেখে ৮/১০ দিন পর আমি বাংলাদেশে চলে আসি। এর মধ্যে দালাল বিহারী নেতা আমার গদিঘর দখল করে নিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে বসবাস করছিল।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে পাক হানাদার বাহিনী পাঁচবিবি হতে কান্দি যাবার পথে কান্দিয়া ব্রীজে ৪/৫ টা চীনা মাইন ব্রীজ হতে উদ্ধার করে। এবং মাইন কারা পুঁতে রাখে তাদের খোঁজ করতে থাকে। কুখ্যাত আয়ুব পাক হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দেয় যে, উক্ত মাইন পাতার মূলে রয়েছে ছমির উদ্দিন মণ্ডল ও মামুদ মণ্ডল। শ্রাবন মাসের তিন তারিখে ৪০/৫০ জন পাক সেনা রাজাকার ও বিহারী মিলে আমাদের বাসায় যায় এবং বাসা ঘেরাও করে আমাকে এবং আমার ছোট ভাই ছমির উদ্দিন মণ্ডলকে ধরে দুই ভাই- এর হাত একত্র করে বেধেঁ কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে পাঁচবিবি থানায় নিয়ে যায় এবং বলে ব্রীজে তোমার মাইন পুঁতেছিলে, তোমরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। তোমার চার নাতি মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে এনে দাও। নতুবা তোমাদের দুই ভাইকে গুলি করে হত্যা করবো। তারপর আমরা দুই ভাই মেজরকে বলি আমরা মাইন কেমন দেখা যায় চিনি না এবং মাইন পাতা সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবো না। আর আমার নাতীদের খোঁজখবর আমরা কিছুই বলতে পারবো না। তারপর আমাদের দুই ভাইকে মেজর পাঁচবিবি থানায় চালান দিয়ে যায়। পাঁচবিবি থানায় সেই সময় পাঞ্জাবী পুলিশেরা থাকতো এবং বিহারীরা থাকতো। আমাদের দুই ভাইকে থানার হাজতে রাখে। আমরা হাজতের মধ্যে ঢুকে দেখতে পাই মুজাফফর ন্যাপের একজন কর্মী নাম বছির মিয়া (বাড়ী আটুয়া পাঁচবিবি থানা) আধা মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। তাকে একজন পাঞ্জাবী পুলিশ এমন প্রহার করছে যে, প্রহারের দরুণ তার সমস্ত শরীর হতে রক্তপাত হচ্ছে। আমি জেলে ঢুকেই তাকে দেখে বললাম বছির মিয়া তুমি এখানে। বছির আমাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। আমি তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে বলি আল্লাহ আল্লাহ করো।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন গতি নাই। তারপর আমরা দুই ভাই জেলের মধ্যে থেকে যাই। সেই দিন রাত ৮টার পর একটা পাক হানাদার বাহিনীর গাড়ী গিয়ে থানয় উপস্থিত হয় এবং একজন পাঞ্জাবী জেলের দরজায় গিয়ে বছিরকে ডাক দেয়। বছির নড়তে-চড়তে পারে না, দুই তিনজন বিহারী ও একজন পুলিশ বছিরকে হাজত হতে বের করে গাড়ীতে তুলে দেয়, গাড়ী চলে যায়। তার আধ ঘন্টা পরেই আমরা সি, ও, অফিসের সম্মুখে একটা ফায়ারের শব্দ শুনতে পাই। আমরা মনে করলাম বছির হয়তো বাংলাদেশের মাটিতে হানাদার বাহিনীর গুলিতে মিশে গেল। আমরা দুই ভাই আল্লাহর নাম স্বরণ করতে থাকি। এবং মনে মনে বলতে থাকি এরপর মনে হয় আমাদের পালা। কোন মতে রাত্রি কেটে যায়। তার ৫/৭ দিন পর মেজর আবার আমাদের সাথে জেলে দেখা করে এবং বলে শালা বাঙ্গালীকা জাত, বড় হারামীহায়। শালা মাইন পোঁতে হাম লোককে মারতে চায়। এবং আমাকে আরও বলে তোম লোককা দুনিয়াছে নেকাল করদেগা, আজ রাতমে তোম বিদায় নিয়ে গা। তারপর জয়পুরহাট চলে যায়। এর মধ্যে আমি জেলের একজন বাঙ্গালী পুলিশের মারফত শুনতে পাই যে, আমাদের দুই ভাই -এর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছে সি, ও, অফিসের পার্শ্বে। এটা শোনার সাথে সাথে আল্লার নাম স্বরণ করতে থাকি। কিন্তু আয়ুব বিহারীর নির্দেশে জেলের মধ্যে আমার উপর কোন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয় না। মেজর চলে যাওয়ার ৮/১০ দিন পর একজন বেলুচ মেজর পাঁচবিবি আসে। এসেই জেলে গিয়ে আমাদেরকে দেখতে পায়। তারপর কাগজপত্র দেখে ও,সি,কে নির্দেশ দেয় যে, এখনই আমাদেরকে বগুড়া সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুই ভাইকে গাড়ীতে করে বগুড়া সেন্ট্রাল জেলে পঠিয়ে দেয়। আমরা জেলে ঢুকে দেখতে পাই জেলের মধ্যে ৮০/৯০ জন বাঙ্গালী পড়ে আছে। তাদের কারুর শরীরের শত শত লাঠির আঘাতের চিহ্ন। আবার কারুর শরীরে শত শত বেয়োনেটের কোঁচার চিহ্ন। কারুর শরীর হতে অঝোরে রক্ত ঝরছে। দ্রুত সব দৃশ্যাবলী দেখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জেলের দারোয়ান আমাকে বলতে থাকে বুড্ডা তুম আর নেহি বাচেগা। তারপর আমরা জেলের মধ্যে ঢোকার আধ ঘন্টা পর একজন পাঞ্জাবী লাঠি হাতে করে জেলের মধ্যে ঢোকে। সকলেই তাকে দেখে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে সড়ো চুপচাপ হয়ে বসে। তারপর পাঞ্জাবীটা ঘরের মধ্যে ঢুকেই কোন কথা না বলে এক এক করে সবার পিঠে একটা করে লাঠির আঘাত করে। তারপর আমার নিকট গিয়ে থমকে দাঁড়ায় এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবদ করে বুড্ডু তুম কাহাছে আয়া। আমি জবাব দেই আমি পাঁচবিবি হতে এসেছি। আমার কোন দোষ নেই আমাকে বিহারীরা ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর মিনিট পাঁচেক চুপ করে থাকে এবং আমাকে বলে বুড্ডা তোমার কোন ভয় নেহি। তারপর আমার ভাই এর নিকট গেলে আমি বলি আমার ছোট ভাই। তারপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে জেল হতে বেরিয়ে চলে যায়। তারপর সন্ধ্যা নেমে এলে ৪/৫ জন লোককে জেল হতে বের করে কোথায় যেন নিয়ে যায়। তাদেরকে আর জেলে ফিরে নিয়ে আসে না। এই ভাবে প্রতি দিন ৪/৫ জন করে জেল হতে বের করে নিয়ে হত্যা করতো। কয়েকদিন পর বগুড়া শহরে আমার আত্মীয়ের তদ্বীরের দরুন মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর/-
ফকির মামুদ মণ্ডল
৭/১১/৭৩

\ ৭৩ \

মোঃ জালাল উদ্দিন
সারিয়াকান্দি
জেলা-বগুড়া

১৯৭১- এর জুলাই আগষ্ট মাসের দিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অধিক সামরিক শক্তি সরঞ্জাম নিয়ে সারিয়াকান্দিতে তাঁদের ঘাঁটি ফেলে। হানাদার বাহিনী বাঁধে যাওয়ার পথে বেণীপুর চরের তমিজউদ্দিন প্রামাণিকের ভগ্নিপতিকে সা পাড়ার রাস্তায় ধরে এবং রাইফেল দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে। তারা প্রত্যেক দিন সকালে দল বেঁধে বিভিন্ন গ্রামে রুটিন মোতাবেক হামলা করত। নারী নির্যাতন, হত্যা, মারধোর ও লুণ্ঠন করে মূল্যবান জিনিসপত্রাদি নিয়ে বিকালে তাদের ঘাঁটিতে ফিরত। এমনি একদিন গণকপাড়ায় যেয়ে তারা মুক্তি বাহিনীর হাতে আটকা পড়ে। সারাদিন সারারাত দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ হয় কিন্তু মুক্তি বাহিনীর গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানী বাহিনী রক্ষা পায়।

অতর্কিতে হানা দিয়া পাক বাহিনী দেলুয়াবাড়ী গ্রাম হতে মুক্তিযোদ্ধা নজির হোসেন, সাহায্যকারী কোরবান আলী. মন্তেজার রহমান ও বাবু খাঁকে আটক করে। বাঁধের নিকট নিয়ে হাত পাঁ বেঁধে নজির হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে এবং অপর তিনজনকে নিয়ে ঘাঁটিতে আসে। অতি কষ্টে পরে তারা মুক্তি পায়। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর প্রায় সপ্তাহখানেক তাদের দু'জনকেই অজ্ঞান অবস্থায় দেখা গেছে। বাঙ্গালীর পশ্চিম পাড়, রামচন্দ্রপুর গ্রামে অপারেশন চালাতে গিয়ে মুক্তি বাহিনীর গুলিতে ছোট দারোগা নিহত হয় এবং সামরিক বাহিনীর একজন গুরুতররূপে আহত হয়।

মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা রীতিমতো বেড়ে যায়। হানাদার বাহিনী বাইরে যাওয়া কম করে ফেলে। তাদের অত্যাচারে পলাতক বাড়ীওয়ালাদের খাসী, মোরগ কুড়াতে থাকে। একদল হানাদার বাহিনী বগুড়া থেকে আসার পথে ফুলবাড়ী খেয়াঘাটে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। খেউনিরূপী মুক্তিযোদ্ধা খেয়ার নৌকা নদীর মধ্যে আসলে গুলি ছুড়তে থাকে। ঘটনাস্থলেই তিনজন কনষ্টেবল প্রাণ হারায়। তারপর শুরু হয় স্থানীয় দোকানপাট লুণ্ঠন। তবিবর মণ্ডলের দোকানের সম্মুখে ট্রাক রেখে মালপত্র বোঝাই করে সেগুলো রংপুরের গাইবান্ধায় পাচার করে। হাবিবুর প্রামানিকের দোকান লুট করে এবং তাকে পরপর দুই দিন দোকানের মধ্যেই বেদম প্রহার করে। নৌকাতে পাট উঠানোর অভিযোগে দৌলতুজ্জামান তরফদার সাহেবকে ভীষণ মারধোর করে। তখন মুক্তি বাহিনীর আর সহ্য হয় না। এদিকে সোজাসুজিও তারা মিলিটারীদের ঘাঁটিতে হানা দিতে পারে না। কারণ পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্পে হানা দিলে আশেপাশের গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় এবং লোকজন মেরে ছাফ করে ফেলে। তবুও সময় ঠিক করে একদিন মুক্তি বাহিনীর তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানী বাহিনীর এই খবর বগুড়ায় তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে দেয়ার পর সামরিক বাহিনীর লোককে সারিয়াকান্দি পাঠিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। সারিয়াকান্দি বাজারের সমস্ত বাড়ী ও দোকানপাট তল্লাশী চালিয়ে মালেক মণ্ডলের দোকান হতে বাংলাদেশের পতাকা উদ্ধার করে। ফলে তার দোকানের সমস্ত মালপত্র থানাতে উঠাবার আদেশ দেয়। তারপর মন্তেজার রহমান মণ্ডলকে পাকিস্তানী পতাকা না উঠাবার অভিযোগে আটক করে তাদের সামরিক গাড়িতে উঠায়ে নেয়। মফিজ মাষ্টার সাহেবের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তার বাড়ীতে পাহারারত কামলা খটটুর বাবাকে আটক করে এবং গাড়ীতে তুলে নেয়। জামাল ডাক্তারের শ্বশুর ময়েজ ডাক্তার,জামাল ডাক্তার, মালেক মণ্ডলের ছেলে এবং অন্যান্য বেশ কিছু লোককে হানাদার বাহিনীর জোয়ানরা আটক করে। সামরিক বাহিনীর উক্ত দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল লেফটেন্যান্ট আতিক। মালেক মণ্ডলের ছেলেকে থানায় নিয়ে তার বুকে পায়ের শক্ত জুতার দ্বারা বার কয়েক আঘাত করে। ফলে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং তার মুখ হতে রক্ত বের হতে থাকে। সকলকে নিয়ে বাউলে আটা ঘাঁটিতে চলে যায় এবং রাতে তাদের প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। তাদের

ঘাঁটিতে রেখে জামাল ডাক্তারের বাসায় পুনরায় আসে এবং তার স্ত্রীকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। তার স্ত্রীকে না পেয়ে তার শাশুড়ীকে ধরে মোটরে উঠায় ও তার মেয়েকে বের করে দেয়ার জন্য ভয়-ভীতি প্রর্দশন করে। রাত্রিতে মুক্তিবাহিনী অতর্কিতে থানা আক্রমণ করে। তখন সারিয়াকান্দি থানায় মিলিটারী ছিল। থানা আক্রমণের পরপরই ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হয়। দুই পক্ষে ভীষণ গোলাগুলি হয় কিন্তু বৃষ্টির বেগ আরো প্রবল হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তারপর প্রায়ই খবর পাওয়া যেতে লাগল আজ এ দালাল খতম, কাল ও দালাল খতম। পাকিস্তানী বাহিনী তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে থানায় পশ্চিম ও,সি-কে পাঠান হয়েছে। তার চেষ্টায় প্রায় ৭০/৮০ জন রাজাকার সংগ্রহ করা হয়েছে। এল পশ্চিমা পুলিশ। এদের বাবা-মা মানুষ কিনা আমার জানা নেই। তবে এরা আকৃতিতে মানুষ হলেও আসলে ছিল কুকুর। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়া হল। রাজাকাররূপী একজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে তারা টের পেয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে এবং হাত-পা কেটে নদীতে ফেলে দেয়। সারিয়াকান্দি এক্সচেঞ্জ হতে পাকবাহিনীর সংখ্যা এবং তাদের গোলা বারুদের খবর জেনে ভোর পাঁচটায় সারিয়াকান্দি আক্রমণ করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর দুইজন যুবক প্রথমেই নিহত হওয়ায় তারা ফিরে যেতে বাধ্য হন। বগুড়া ও গাবতলী থেকে হানাদার বাহিনীদের ডাক আসে এবং তাদরকে থানা ছেড়ে অতিসত্বর বগুড়া চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রাস্তা বন্ধ হওয়ায় তারা চলে যাবার কোন পথ পেল না। ১৯৭১ সালের ২৬শে নভেম্বর সকাল ঠিক এগারটায় মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে সারিয়াকান্দি থানাতে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীদেরকে আক্রমণ করে। বিকাল তিনটার সময় এক্সচেঞ্জে অবস্থানরত বাহিনীদের পতন ঘটে। সারাদিন এবং সারারাত যুদ্ধের পর ২৭শে নভেম্বর সকালে হানাদার বাহিনীসহ থানার পতন ঘটে। শতাধিক রাজাকার ও পুলিশ মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আটক হয়। আটককৃত পুলিশদেরকে ভারতে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাজাকারদের বিচার করা হয় যমুনা নদীর পাড়ে। বিচারে কিছু রাজাকার রক্ষা পায় এবং অবশিষ্টগুলো যমুনা নদীতে তাদের সলিল সমাদি লাভ করে। থানার পতনের পর শুরু হয় উড়োজাহাজ থেকে বোমা বিস্ফোরণ ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। উক্ত এমনি গুলিতে নিহত হয় পাকুড়িয়া গ্রামের পুকরা মণ্ডলের ছেলে দুদু মণ্ডল। সে মুক্তি বাহিনীদেরকে নিয়ে ভারতে যাচ্ছিল এবং মেশিনগানের গুলিতে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে যায়। বর্বর পাক বাহিনীর রাইফেলের গুলিতে নিহত হয় উক্ত গ্রামের জাফর সরদারের ছেলে জহির উদ্দিন। মেশিনগানের আর একটি গুলিতে সারিয়াকান্দির আছমতের মা নিহত হয়।

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় সারিয়াকান্দি থানা পতনের পূর্ব রাত্রিতে পাকিস্তানী বাহিনীর অধিকাংশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং তার কিছু অংশ রাস্তায় মারা পড়ে। বাকীগুলো সম্বন্ধে কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে অত্র থানার অনেক অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হাতে আসে।

স্বাক্ষর/-
মো: জালালউদ্দিন
২২/০৯/৭৩

\ ৭৪ \

মোঃ ছানোয়ার হোসেন
গ্রাম- বালীস্বর্বা
ডাকঘর- পাঁচবিবি
জেলা - বগুড়া

১৯৭১ সনের ২২শে জুলাই রাজাকারদের হাতে গ্রেফতার হলে পাক বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পর আমাকে গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দেয়। তারপর আরম্ভ হয় দৈহিক নির্যাতন। প্রায় ১৫/২০ জন পাঞ্জাবী "ফুটবল" খেলার মত আমাকে লাথি মারতে থাকে। একজন লাথি মেরে আর একজনের কাছে দেয়, সে আবার আর একজনের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে কিল ঘুষি, রাইফেলের বাঁটের বাড়ি চলতে থাকে। প্রায় ৪০ মিনিট তারা আমার উপর নির্যাতন চালায়। শেষের দিকে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। সারা শরীর ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে।

আমার উপর দৈহিক নির্যাতন চালাবার পর প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় থানাতে পৌছে দেয় এবং হাজতে চোখ, হাত বাঁধা অবস্থায় বন্দী করে রাখে। রাত্রি ৮টার দিকে একজন বাঙ্গালী পুলিশ আমার চোখ ও হাতের বাঁধন খুলে দেয় এবং কিছু ভাত খেতে দেয়। এই সময় আমি দেখতে পাই হাজতের ভিতর আরও ৮ জন বন্দী আছে।

অতঃপর আমাকে ১০ দিন থানা হাজতে বন্দী করে রাখে। প্রত্যেক দিন বহু পাঞ্জাবী সৈন্য ও বিহারীরা আমাকে দেখার জন্য আসতো কেননা তারা নাকি মুক্তিফৌজ কেমন দেখা যায় তা জানে না। তারা এসে নানাভাবে আমাকে গালিগালাজ দিত এবং লাঠি দিয়ে হাজতের ভিতরেই আমাকে খোঁচাতো। অনেকে আবার উপহাস করে আমাকে বন্ধু বলে ডাকতো।

আগষ্ট মাসের ১ তারিখে আমাদেরকে থানা হাজত থেকে বের করে এবং আমার দুই পার্শ্বে দুইজনকে দাঁড় করে আমার দুই হাত দুই জনের হাতের সঙ্গে বেঁধে মাজায় দড়ি বেঁধে টেনে রেল ষ্টেশনে আনা হয়। তারপর গাড়ীতে করে বগুড়া নিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। বগুড়া জেলে দুইটা পাঞ্জাবীকে "জেল" দেয়া হয়েছিল। এই পাঞ্জাবী দুটি জেলের ভিতর যখন তখন আমাদেরকে মারধোর করতো।

৩রা আগষ্ট আমাকে জেল থেকে বের করে বগুড়া কটন মিলের নিকট একটা ছোট ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। এখানে নিয়ে প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এই সময় তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে -

'তুমি কত বিহারী ও পাঞ্জাবী মেরেছো? কোথায় মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং দিয়েছো, তোমাদের লিডার কে, কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছো, ভারতীয় সৈন্য বর্ডারে যুদ্ধ করছে, কিনা, মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কত? পাক বাহিনীর প্রশ্নের জবাবে আমি শুধু এক কথা বলি যে, আমি এ সব কিছু জানি না। আমি ভারত থেকে পলিয়ে আসছিলাম, আমি ট্রেনিং নেই নি।

আমার কাছ থেকে কোন কথা বের করতে না পেরে ৩ জন মিলে এক সঙ্গে আমাকে মারতে আরম্ভ করে। কিল, ঘুষি, লাথি, রাইফেলের বাটের বাড়ি এবং লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে পিটান আরম্ভ করে। প্রায় দেড় ঘন্টা যাবত এই ভাবে মারধোর করার পর আমাকে পায়ের ভিতর হাত দিয়ে কান ধরে রাখতে নির্দেশ দেয়। আমি যখন তাদের কথা মত নিচু হয়ে পায়ের ভিতর হাত দিয়ে কান ধরে থাকি তখন পিছন থেকে চাবুক দিয়ে পিটান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একই প্রশ্ন বার বার করতে থাকে। সময় সময় বাইরে থেকে যারা দেখতে আসে তারাও হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে পিটায়।

প্রায় ৩ ঘন্টা যাবত এইভাবে নির্যাতন চালানোর পর সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমার পায়ে চিকন রশি শূন্যে ঝুলিয়ে দেয়। এই সময় এমন লাগতে থাকে যে জীবন বোধ হয় পা দিয়েই বের হয়ে যাবে। ঝুলে থাকা অবস্থায় মোটা রোলার দিয়ে প্রত্যেক গিরায় গিরায় মারতো এবং মাথার পিছনের দিকে আঘাত করতো। প্রায় ২০ মিনিট রাখার পর আমি বলি যে, আমাকে মাটিতে নামান হলে আমি সব কথা বলবো। তখন তারা আমাকে নিচে নামায় এবং তখনই বলার হুকুম দেয়। কিন্তু আমি একটু জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে আবোল তাবোল বলতে থাকি। আমার চালাকি বুঝতে পেরে বর্বর সৈন্যরা আমাকে লাথির পর লাথী মারতে থাকে। কিছুক্ষণ পিটানোর পর পুনরায় আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং পূর্বের চেয়ে আরও বেশী প্রহার করতে থাকে এবং প্রশ্ন করতে থাকে। আমার ঐ একই উত্তর যে আমি জানি না।

২য় বার আমাকে ঝুলানোর প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর পাশের রুম থেকে পাক বাহিনীর ক্যাপ্টেন বের হয়ে আসে এবং আমাকে বলে 'ছানোয়ার', আমি একজন মুসলমান তুমি বিশ্বাস কর? 'আমি তার জবাবে বলি যে হাঁ আপনি মুসলমান। 'তখন ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে পুনরায় বলে যে 'আমি মুসলমান হয়ে আর এক মুসলমানের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা বলো তবে তোমাকে আর মারা হবে না', এবং আমি চেষ্টা করবো তোমাকে ছেড়ে দিতে। ''তখন আমার তার কথা বিশ্বাস হলো এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে ''আমি সত্য কথা বলবো?'' এই সময় আমাকে মাটিতে নামান হয় এবং বলে যে তুমি ''খাওয়া দাওয়ার পর বলবে না এখনই বলবে?'' আমি বলি যে আপনি যা বলেন সেই হিসাবেই আমি কাজ করবো। তখন আমাকে রুটি ও তরকারি এনে খেতে দেওয়া হয়।

খাওয়ার পর ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে জানায় যে তুমি আজ বিশ্রাম কর কাল তোমার কাছ থেকে সব কথা শোনা হবে। এই বলে আমাকে পুনরায় জেলে নিয়ে একটা সেলের ভিতর বন্দী করে রাখে। এই সময় আমি এত কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে আমি মোটেই নড়াচড়া করতে পারতাম না।

৪ঠা আগষ্ট সকাল ৯টার দিকে আমাকে জেল থেকে বের করে পূর্বের সেই ঘরে ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে প্রশ্ন করে যে, বল তুমি কি করেছো? তার উত্তরে আমি জানাই যে আমি ৭ দিন ট্রেনিং নিয়েছি। তারপর অপারেশনের জন্য আমরা বগুড়া যাবার পথে ''গয়েশপুর'' এসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং আমার দলের লোক আমাকে রেখে বগুড়া চলে যায়। তখন আমি পুনরায় ভরতে চলে যাই এবং কিছু দিন পর যখন ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন তখন আমি দেশে ফিরে আসার সময় রাজাকারদের কাছে ধরা পড়ি। ক্যাপ্টেন আমার কথা লিখে নেয় এবং আরও বহু প্রশ্ন করে, ভয় দেখায়, লোভ দেখায় উত্তর দেবার জন্য। আমি বলি যে যদি আমাকে মারতে মারতে মেরেও ফেলা হয় তবুও আমি এর বেশী আর কিছু বলতে পারবো না।

৭ই আগষ্ট আমাকে বগুড়া জেল থেকে বের করে ''মিলিটারী পুলিশ'' হাত বেঁধে গাড়ীতে করে রেল ষ্টেশনে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের কথা থেকে আমি বুঝতে পারি আমাকে নাটোর সামরিক জেলে পাঠান হচ্ছে। গাড়ী আসার পর মিলিটারী পুলিশ আমাকে অন্য মিলিটারীর হাতে তুলে দেয়।

গাড়ীর ভিতর তুলে আমাকে ও অন্য আরও একটি ছেলেকে ছিটের নীচে বসিয়ে আমাদের ঘাড়ের উপর পা তুলে বর্বর সৈন্যরা বসে থাকতো। এবং প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ী থামলে বিহারী ও অন্য সৈন্যরা এসে আমাদের দুই জনকে ভীষণভাবে মারধোর করতো। প্রত্যেক ষ্টেশনে আমাদের এই ভাবে নির্যাতন চলতে থাকে।

নাটোর রেল ষ্টেশন থেকে আমাদের নাটোর সামরিক জেলের কাছে নিয়ে যায় এবং বলে যে এদেরকে নতুন ''মেহমান'' হিসাবে প্রাথমিকভাবে কিছু ''খেদমত'' করে দেওয়া হোক। এই বলে ভীষণ মারধোর আরম্ভ করে। মারতে মারতে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় আমাকে জেলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়।

প্রত্যেক দিন জেল থেকে বের করে কাজ করানোর জন্য নাটোর ফুল বাগানে নিয়ে যেত। প্রত্যেক দিন ৬ ঘন্টা কাজ করতে হতো। সকাল ৮টা থেকে ১২টা এবং ৩টা থেকে ৫টা এক টানা কাজ করতে হতো এর ভিতর কোন বিশ্রাম নিতে দিতো না। সব সময় ''ডবল'' হিসাবে কাজ করাতো। এরপরও বর্বর সৈন্যরা চাবুক দিয়ে আমাদের প্রহার করতো।

জেলখানার ভিতর যে ঘরে আমাদের রাখা হতো সে ঘরে খুব বেশী হলে ১০/১২ জন থাকতে পারে। সেখানে আমাদের ৬০ জনকে রাখতো। রাত্রিতে শোবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি যে ঘরে ছিলাম সে ঘরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ডঃ কাজী সালেহ আহম্মেদ, লেকচারার মজিবর রহমান, ওয়াপদার ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার এম, ডি, ছারোয়ার হোসেন (রাজশাহী) ছিলেন। আমাদের মত এদের উপরও চলতো সমানভাবে নির্যাতন এবং আমাদের মত এদেরও কাজ করতে হতো। জেলের ভিতর সর্বমোট ১৫০ জন কয়েদী বন্দী ছিল।

মোট ২৮/২৯ দিন আমি নাটোর জেলে ছিলাম। আমাদের খাবার দেবার জন্য জেল থেকে বের করে লাইন ধরাতো। আমরা যখন নিচু হয়ে খাবার নিতাম তখন বর্বর সৈন্যরা চাবুক দিয়ে আমাদের প্রহার করতো। মার ছিল আমাদের একমাত্র সঙ্গী। প্রত্যেক দিন সকালে ছোট একটা পুরি ও একটু চা। দুপুরে দেয় ছটাক ছাউলের ভাত ও পানির মত একটু ডাউল অথবা একটু নিরামিশ তরকারী। বিকালে ২টা ছোট রুটি ও একটু আলুর ঝোল। কোন সময়ই আমাদের খাবার খেয়ে পেট ভরতো না। আমরা সবাই সব সময় ক্ষুধার জ্বালায় ভুগতাম।

প্রত্যেকদিনই দেখতাম জেল থেকে ২/৩ জন লোককে নিয়ে যেত জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। বিকালে তাদের যখন জেলে ফিরিয়ে আনতো তখন তাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় দেখা যেত-সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতো।

এত বিপদের মধ্যেও রাত্রির বেলা জেলখানার ভিতর আমরা গান বাজনা করতাম। কেউ গান গাইত কেউবা তালি বাজাত। এইভাবে আমরা আমাদের দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্ট করতাম।

আমাদের কাছ থেকে 'চুক্তি পত্র' লিখে নেওয়া হয় যে যদি পুনরায় ভারতে চলে যাই তবে আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের উপর নির্যাতন চালানো হবে। জেলে থেকে আমাদের বের করে প্রত্যেককে ৫টা করে টাকা ও একটা করে সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। মুক্তি পাবার পর আমি ৭ই সেপ্টেম্বর পাঁচবিবি হয়ে আমার বাড়ীতে পৌঁছি।

মুক্তি পেয়ে আমি বাড়ী আসার পর প্রায়ই পাক বাহিনী আমাকে চাপ দিত রাজাকারে ভর্তি হবার জন্য অথবা বর্ডার স্পাইং করার জন্য। কিন্তু আমি অসুস্থ বলে বাড়ীতে থাকতাম এবং বলতাম যে আগে ভাল হয়ে নেই।

২৮ শে নভেম্বর বিকাল ৪টার দিকে একজন রাজাকার আমার বাড়ীতে গিয়ে বলে যে, এখনই থানায় যেতে হবে। আমি যদিও বুঝতে পারি যে আমাকে বন্দী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তবুও আমি তার সঙ্গে থানায় রওনা হই কিন্তু রাস্তায় নেমে দেখতে পাই যে পাক বাহিনী গাড়ী নিয়ে আমার বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। রাস্তার ভিতর থেকেই আমাকে তুলে নেয় এবং জয়পুরহাটে নিয়ে যায়।

আমাকে যখন বন্দী করে গাড়ীতে তোলা হয় তখন গাড়ীর ভিতর লেঃ আলতাফ (বিহারী) বসে ছিল। আমাকে জয়পুরহাট বি, আই, ডি, সির শিক্ষানবীশ আবাসিক এলাকায় ২ নং ব্যারাকে পাক বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যায়। এখানে আমাকে ''মেজর আফজালের'' কাছে নিয়ে যায় এবং লেঃ আলতাফ আমার নামে বহু মিথ্যা অভিযোগ মেজর সাহেবের কাছে বলে এবং বলে যে আমি নাকি ২ জন বিহারীকে হত্যা করেছি তা লেঃ আলতাফ দেখেছে। মেজর আমাকে এই সবকথার সত্যতা জিজ্ঞাসা করে। এক কথায় আমি সব অস্বীকার করি। তখন মেজর সাহেবের সঙ্গে আমার কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। এই সময় মেজর সাহেব একজন সৈন্যকে ডাকে এবং আমাকে ধোলাই দেবার জন্য বলে। এই সময় আমাকে এমনভাবে প্রহার করা হয় যে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি।

আমকে বহু সময় মারধর করার পর লেঃ আলতাফ আমাকে মেরে ফেলার জন্য মেজর সাহেবের কাছে এজাজত চায়। মেজর সাহেব লেঃ আলতাফকে এজাজত দেয় আমাকে হত্যা করার জন্য।

এই সময় আমাকে হত্যা করার জন্য লেঃ আলতাফ হোসেন আমাকে গাড়ীতে করে খোঞ্জনপুর রাস্তার উত্তর পারে মাঠের ভিতর পাক বাহিনীর ডিফেন্স- এর কাছে নিয়ে যায়, ৩/৪ জন মিলিটারীর হাতে তুলে দেয় এবং বলে দেয় যে একে চাকু দিয়ে জবাই করে কিম্বা বেয়োনেট দিয়ে হত্যা কর। বর্বর সৈন্যরা আমাকে হত্যা করার জন্য প্রায় ১০০ গজ দূরে নিয়ে যায়। রাস্তাটা ছিল উঁচু, আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তারা আমার চোয়ালে ঘুষি মারতে থাকে। আমি পড়ে যাই, তারা আবার টেনে তোলে।

আমাকে হত্যা করার জন্য যখন সুবেদার সাহেব একটা চাকু বের করে এবং টেনে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় আমি তখন সুবেদার সাহেবের কাছে নামাজ পড়ার জন্য একটু সময় ভিক্ষা চাই। কিন্তু সুবেদার সাহেব আমাকে সময় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আমি তখন জোরে চিৎকার করে সুবেদারকে উদ্দেশ্যে করে বলতে থাকি যে ‘‘যদি আমাকে আল্লাহর এবাদত থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করা হয় তা হলে রোজ হাসরের ময়দানে আল্লাহর সামনে আপনাদের বিচারের জন্য ফরিয়াদ করবো এবং বলবো এরা আমাকে তোমার (আল্লাহ) এবাদত থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করেছে আমি এর বিচার চাই।’’

আমার এই কথা শোনার পর সুবেদার সাহেব কিছুক্ষণ নীরব থাকে এবং পরে নামাজ পড়ার জন্য এজাজত দেয়।

নামাজ পড়ার জন্য আমার এক হাত খুলে দেয় এবং এক জগ পানি এনে দেয়। আমি যখন নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাই তখন পাক সেনারা তিন দিকে এল, এম, জি নিয়ে পজিশন নিয়ে থাকে। তারা আমাকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয় যে পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করে হত্যা করবে।

অতঃপর আমি এক মনে ক্বাজা নামাজসহ এশার নামাজ আদায় করতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লেগে যায়। নামাজের মাঝখানে আমি একবার টেলিফোন বেজে ওঠার শব্দ শুনতে পাই। নামাজ শেষে মোনাজাত করে আমি বর্বর বাহিনীকে বলি যে এই বার আমি প্রস্তুত এখন আমাকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করতে পারো। এই সময় একজন সিপাই আমার কাছে এসে বলে যে খোদা আপনার দোয়া কবুল করেছেন। আপনাকে আর মারা হবে না কেননা এইমাত্র হেড অফিস থেকে ফোন এসেছে, আপনাকে সেখানে এখনই নিয়ে যাবার জন্য হুকুম দিয়েছে।

অতঃপর আমাকে হাত বাঁধা আবস্থায়ই একটা গাড়ীতে করে বি, আই, ডি, সি, অফিসের পাক বাহিনীর হেড অফিসে নিয়ে যায় এবং এক ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে হাজির করে।

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের তদবীরের ফলে ২৮শে নভেম্বর আমি রাত্রিতেই আমি মুক্তি লাভ করি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ছানোয়ার হোসেন
১০/১১/৭৩

\ ৭৫ \

দারাজ উদ্দিন আহমেদ
থানা- জয়পুরহাট, জেলা- বগুড়া

২৬শে এপ্রিল পাক সৈন্য জয়পুরহাট পৌঁছে এবং ২৭শে এপ্রিল তারা ট্রেনযোগে পাঁচবিবি যাবার পথে পুরানোপৈল রেল ষ্টেশনের উত্তরে রেল গুদামটির কাছে ট্রেন দাঁড় করিয়ে রেখে তারা নির্দেশ দেয় গ্রামের লোকদের ''মালাউনকা ঘর জ্বালাদো'' বলে। তারা নিজেরাও একটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামের লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গ্রামের সমস্ত হিন্দু বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। অবশ্য হিন্দুরা ইতিপুর্বেই দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়।

২৮শে এপ্রিল তারিখে পাকসৈন্য মুসলিম লীগারদের খবরে জয়পুরহাট থেকে তিন মাইল পুর্ব উত্তর কোণের হিন্দু প্রধান গ্রাম করোই কাদিপুর ঘেরাও করে অপারেশন করে। এখানকার সমস্ত অধিবাসী হিন্দু এবং তারা কুমার ছিল।

গ্রাম ঘেরাও করে তারা উক্ত গ্রামের ১৮৫ জন্য পুরুষ-মহিলা এবং বাচ্চাকে হত্যা করে। গ্রাম ঘেরাও করার পর গ্রামের লোকজন প্রানভয়ে পালাতে থাকে তখন তাদের উপর বেপরোয়া গোলাগুলি নিক্ষেপ করে উক্ত সংখ্যক লোকজনকে হত্যা করে। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক লোককে তারা ধরে আনে এবং তাদের মধ্যে ৩/৪ জনকে জনৈক মুন্সি জবাই করে হত্যা করে। উক্ত মুন্সিকে পাক সৈন্যরা জবাই করতে বাধ্য করে। পাক সৈন্যরা উক্ত গ্রামের ৬/৭ জন লোক যারা প্রাণভয়ে কচুরীপানার মধ্যে ডুবিয়েছিল তাদেরকে দেখতে পায় এবং সেখানেই গুলি করে তাদের হত্যা করে। হত্যাযজ্ঞ শেষ হবার পর তারা সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

উল্লিখিত তারিখেই বিকাল ৪টায় পুরানোপোল হাটে জনৈক হিন্দু মুচিকে গুলি করে হত্যা করে।

ডিসেম্বরের যুদ্ধকে মানুষ স্বাগতম জানিয়েছে। তারা এই যুদ্ধকে মুক্তির পথ বলে মনে করে।

স্মরণীয় ঘটনা :

২৭শে এপ্রিল আমি বাজার করার জন্য জয়পুরহাট পৌঁছি। রাতে যে মিলিটারী এসেছে তা জানতাম না। বাজারে পৌঁছার পর তিনজন মিলিটারী আমাকে ধরে নিয়ে বাজারে যায় এবং একটি কাপড়ের দোকানের তালা ভেঙ্গে আমাকে লুট করতে বলে। আমি তাতে অস্বীকৃতি জানালে আমাকে তারা চড় মারে। তখন বাধ্য হয়ে একথান কাপড় নেই। অতঃপর আমাকে নিয়ে রেল ক্রসিং- এর পাশ দিয়ে যেতে থাকে। সে সময় জনৈক ভদ্রলোক সাইকেল চড়ে যাচ্ছিলেন। তাকে তারা থামিয়ে দেয় এবং তার হাতের ঘড়িটি চায়। তিনি দর্পভরে বলেন যে ''আমি জীবিত থাকাকালে আমার কোন জিনিস খানরা তোমরা পাবে না।''

অতঃপর তাকে লাথি দিয়ে ফেলে দেয়। তিনি উঠবার চেষ্টা করলে রাইফেল দিয়ে বাড়ী দিতে থাকে শেষ পর্যন্ত তারা তাকে গুলি করে হত্যা করে ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। জনৈক বিহারী ছেলেকে বলে তার সুপারিশে আমি মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর/-
দারাজ উদ্দিন আহমেদ

\ ৭৬ \

মোঃ গোলাম মোস্তফা মণ্ডল
গ্রাম- জয়পুরহাট
জেলা- বগুড়া

পাক সেনা জয়পুরে পৌঁছার পর তাদের অত্যাচারে জনগণ ভীষণভাবে অতিষ্ট হয়ে পড়ে। জানমালের নিরাপত্তা তথা ইজ্জতের ভয়ে জনগণ ভারতে চলে যেতে থাকে।

মে মাসের মাঝামাঝি এমনিভাবে কতিপয় লোককে গাড়োয়ানরা বাংলাদেশের সীমানায় রেখে আসার পথে রাজাকাররা ঐ সমস্ত ১৬/১৭ জন গাড়োয়ানকে গ্রেফতার করে জয়পুরহাট শান্তি কমিটির অফিসে নিয়ে আসে। রাতে সেখানে বন্দী করে রেখে পরদিন ট্রাকে করে শামীম বিহারীর নেতৃত্বে তাদের আক্কেলপুর মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ভালক্যা বাঁশের মোটা গোড়া দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ঐ সমস্ত গাড়োয়ানকে হত্যা করে।

যুগীপাড়ার মিঃ আলেক উদ্দিনকে একদিন ধরে জয়পুরহাট কলেজ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তিনি একজন গোঁড়া আওয়ামী লীগার ছিলেন। তাকে শারীরিকভাবে অমানুষিক অত্যাচার করেছে কিন্তু তিনি কিছুতেই ''পাকিস্তানী'' একথা স্বীকার করেননি। তিনি সর্বদাই বলেছেন যে আমি আওয়ামী লীগার। তাকে বেদম প্রহার করে। কিছুতেই পাকিস্তানের কথা স্বীকার করাতে পারেনি। তখন তার দুই পায়ের পিছনে গোড়ালীর রগে ফুটো করে রশি লাগিয়ে খাশী বকরীর খাল খোলার মত উল্টো করে টাঙ্গিয়ে গায়ের চামড়া খুলে হত্যা করে।

অত্র এলাকার প্রখ্যাত হোমিও ডাক্তার আবুল কাশেম যুদ্ধকালে ৭ মাস পালিয়ে ছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর আওয়ামী লীগার ছিলেন। তিনি একদিন রাতে গরুর গাড়ীতে করে বাড়ী পৌঁছেন। সে রাতেই মিলিটারীরা বাড়ী ঘেরাও করে তাকে গ্রেফতার করে। তাকে জয়পুরহাট ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তার নিম্নাংশ মাটির নীচে পুঁতে তাকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করে। এ ছাড়া তাকে পায়ের গোড়ালীর রগে ছিদ্র করে উল্টো করে রশি বেঁধে টাঙ্গিয়ে রেখে গায়ের চামড়া কেটে লবণ লাগিয়ে দেয়। অতঃপর তাকে হাত পা পুটলি করে বেঁধে ট্রাকে ধপাস করে ফেলে সেখান থেকে আবার নীচে ফেলে দেয়। তারপর তার দুই চোখ উপড়ে ফেলে দেয় এবং সেখানে পেট্রোল মাখানো তুলো ঢুকিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হত্যা করে। এক কথায় যত প্রকার অত্যাচার করার সবই তারই উপর প্রয়োগ করা হয়।

লতিফ টি ষ্টলের মালিক ছিলেন লুৎফর। ২৫ শে মার্চের পর এখানে যে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয় সেখানে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। বলা প্রয়োজন তার ডান হাত সম্পূর্ণ অকেজো ছিল। তবুও তিনি দেশের ডাকে বাম হাতেই রাইফেল চালনা করতেন।

পাক সেনারা এখানে আসলে তিনি দেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে যান। কিন্তু পালানোর অবস্থাতেই মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের চক্রান্তে ও সক্রিয় সহায়তায় তিনি ধরা পড়েন। সে সময় মিলিটারীদের ক্যাম্প ছিল ষ্টেশনে। সেখানে তাকে নিয়ে এসে টাঙ্গিয়ে হৃদয়হীনভাবে নির্যাতন করে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরে। তাছাড়া লোহার রড আগুন দিয়ে পুড়িয়ে লাল শিক চোখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে চোখ গালিয়ে ফেলে। সমস্ত প্রকার নির্যাতন চালানোর পর তার পা বেঁধে কুণ্ডলী পাকিয়ে রেল গাড়ীর ইঞ্জিনের জ্বলন্ত বয়লারে ফেলে দিয়ে জীবন্ত হত্যা করে। তার কোন অস্তিত্বও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ গোলাম মোস্তফা মণ্ডল

\ ৭৭ \

আবু বকর আকন্দ
গ্রাম- কাটাবাড়ী
জেলা-বগুড়া

বৈশাখ মাসের দিকে একদিন ২৫/৩০ জন পাক সৈন্য কাটাবাড়ী এলাকায় আসে এবং আড়িয়া পালপাড়া ঘেরাও করে ৬ জন লোককে হত্যা করে।

আমি এসময় পালিয়ে অন্যত্র ছিলাম। কিছুক্ষণ থেকে ছেলেমেয়ে বাড়ীতে কেমন আছে দেখার জন্য গোপনে বাড়ী আসি। বাড়ী আসার পর একজন পাক সৈন্য বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমি হিন্দু না মুসলমান তা জানতে চায়। আমি মুসলমান বললে উক্ত সৈন্য তৎক্ষনাৎ পালিয়ে যেতে বলে। তাই করছিলাম। কিন্তু আবার একজন সৈন্য বাধ সাধে। আমাকে ধরে নিয়ে একটি ঘরে বন্ধ করে এবং টাকা দাবী করে। টাকা দেবার অস্বীকৃতি জানিয়ে বলি যে, "স্যার আমার টাকা পয়সা নেই।" জোড়-হাত করে উক্ত কথাগুলো বলি। একথা শোনার সাথে সাথে উক্ত সৈন্য ঠাস করে এক চড় কষে দেয়। ৪/৫ টি ঘুষি মেরে আমাকে কাহিল করে ফেলে।

নিরুপায় হয়ে বলি যে আমার টাকা পয়সা বৌ ছেলেমেয়ের কাছে এবং তারা কোথায় পালিয়ে আছে। তখন সৈন্যটি বলে যে চল তোমার বৌয়ের খোঁজে। টাকা দাও।

তারপর আমাকে নিয়ে যেতে থকে। আবার অন্য দিক থেকে আরও দু'জন সৈন্য আসছিল। রাস্তার উপর এক বুড়ো জোব্বাজুব্বি গায়ে দিয়ে বসেছিল। তারা তাকে কয়েকটি ঘুষি হৃদয়হীনভাবে মারে এবং টাকা দাবী করে। লোকটি বলে যে বাড়ীতে আছে। তখন তাকে নিয়ে তার বাড়ী যায়। তার কাছে মসজিদ নির্মানের টাকা গচ্ছিত ছিল, তা এবং গয়নাপাতি নিয়ে নেয়।

অপর দিকে আমার কোন টাকা পাবার সম্ভাবনা না দেখে ছেড়ে দেয়। কিন্তু যেই যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি অমনি রাইফেলের গাদা দিয়ে সজোরে ২/৩ বাড়ি দেয় এবং এতে অজ্ঞান হয়ে যাই। জনৈক মহিলার সেবায় আমি জ্ঞান ফিরে যাই।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথমে মিলিটারী আমার বাড়িতে ঢুকেছিল, তার পূর্বমুহূর্তে দুজন মুসলমান মেয়ে বাড়ীতে ঢুকে। আশ্রয় প্রার্থনা করে। আমি তাদের কচুর আদরের মধ্যে লুকিয়ে রাখি এবং সেখানে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে বলি।

মিলিটারীটি যখন আমাকে হিন্দু না মুসলমান জিজ্ঞাসা করছিল এবং ধমকাচ্ছিল তখন মেয়ে দুটি ভীত হয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। তখন মিলিটারীটি আমাকে ছেড়ে উক্ত মহিলার একজনের হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অত্যাচার করে সৈন্যটি চলে যায়। সৈন্যটি মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে যাবার পূর্বে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

স্বাক্ষর/-
আবু বকর আকন্দ

\ ৭৮ \

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী
একাউন্ট ইনচার্জ, তিস্তা বীমা করর্পোরেশন
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর

আমি ১৯৭১- এর ২৫ শে মার্চের পরপরই রংপুর শহর সেনাবাহিনীর কবলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শহর ত্যাগ করে নিকটবর্তী গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করি। যুদ্ধকালীন সময়ের প্রথম কয়েক মাসে সেনাবাহিনীর রংপুর শহর এবং শহরের আশে পাশে বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞের আমি একজন উৎসাহী পর্যবেক্ষক ছিলাম। বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী কর্তৃক মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং সঠিক তারিখ আমি সযত্নে আমার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেছি। তথ্যগুলোর সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

৮ এপ্রিলঃ রংপুর শহর থেকে আড়াই মাইল পশ্চিমে নাড়িরহাট গ্রামের ৪৭ জন গ্রামবাসীকে বর্বর বাহিনী ধরে এবং উক্ত স্থানে খোলাহাটে তাদের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। আমার পরিচিত জনৈক ব্যক্তি দূর থেকে এ করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন।

১৫ ই এপ্রিলঃ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে দক্ষিন পুর্ব দিকে দেওভোগ গ্রাম থেকে ২২ জন ক্ষেতে কর্মরত কৃষক এবং উক্ত এলাকার মসজিদ থেকে ১৫ জন নামাজরত ব্যক্তিকে খান সেনারা ধরে এবং গুলি করে হত্যা করে। মসজিদ থেকে লোক ধরে নির্মমভাবে হত্যা এলাকার গণমনে গভীর হতাশা এবং ক্রোধের সঞ্চার করে। এই হিংস্র কার্যকলাপের দরুন বহু গ্রামবাসী বাড়ী ঘর ত্যাগ করে ভারতে কিংবা দূর-দূরান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৭ ই এপ্রিলঃ এই সময়ে মাহীগঞ্জের (রংপুর শহর) ২ মাইল উত্তরে সাহেবগঞ্জের নিকট একটি ক্যানেলের উপরে বর্বর সেনা বাহিনী ১৭ ব্যক্তিকে হত্যা করে। এদের মধ্যে বেশ সংখ্যক ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর জোয়ান। পোষাক পরা অবস্থায়ই তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গ্রামবাসীরা লুকিয়ে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং পাকিস্তানী দস্যু সৈন্যরা চলে গেলে তারা (গ্রামবাসী) বেঙ্গল রেজিমেন্টের লাশগুলো নিয়ে আসে এবং দাফন করে। মৃত জওয়ানদের প্রতি গ্রামবাসীদের ছিল অপূর্ব মমত্ববোধ। সবাই তাদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন।

১৯শে এপ্রিলঃ রংপুর ক্যান্টনমেন্টের নিকট ঘাঘট নদীর তীরে ১৫২ জন সাবেক বাঙ্গালী ই, পি, আর, কে খান সেনারা হত্যা করে। পিছনে হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের ব্রাশফায়ারে তাদেরকে হত্যা করা হয়। পরে (মৃত) লাশগুলোর অধিকাংশ বাঁশ দিয়ে গেঁথে ঘাঘট নদীতে ফেলে দেয়া হয়। এদের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিশিষ্ট শিল্পী জনাব শাহ আলী সাহেবের বড় ভাই-র ছেলে (ই,পি,আর) কেবলমাত্র সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান।

২৮শে এপ্রিলঃ দমদমা ব্রীজের নীচে সরকারী কারমাইকেল মহাবিদ্যালয়ের ৪ জন অধ্যাপককে গুলি করে হত্যা করা হয়। জনৈক অধ্যাপকের স্ত্রীকেও এখানে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। রংপুর শহর সাবেক জনতা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর অফিস ১১-৩০ মিনিটের সময় খান সেনারা তছনছ করে দেয়। আওয়ামী লীগের গোপন কাগজপত্র এ অফিসে রাখা হয়েছে সন্দেহে সৈন্যরা হানা দেয়।

২৯শে এপ্রিলঃ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সমস্ত অফিস আদালতের হিসাব নিকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়। রংপুর শহর ক্যান্টনমেন্টের কাছে সৈয়দপুরগামী পাকা রাস্তার পাশে ২১ জন নিরপরাধ বাঙ্গালীকে সেনাবাহিনী ধরে এবং গুলি করে হত্যা করে। তন্মধ্যে একটি অত্যন্ত কম বয়সী ছেলে বর্বর সৈন্যরা হত্যা করে। ছেলেটি হানাদার বাহিনীর সর্বপ্রকার যাতায়াত সংবাদ গোপন গেরিলা ঘাঁটিতে সরবরাহ করতো। পাকিস্তানপন্থী কুচক্রীরা এই ছেলেটিকে সেনাবাহিনীর নিকট ধরিয়ে দিয়ে ছিল।

৬ই মেঃ সামরিক কর্তৃপক্ষ শহরের অভিজাত দোকান পাট গুলো চালু না রাখার অভিযোগে সিল করে দেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা এই সব দোকানপাটের বহু মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। একই তারিখে সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রাম লুট করে।

১১ই মেঃ পাক সৈন্যরা শহরের অদূরে নাড়ীরহাট গ্রামে অতর্কিত হানা দিয়ে ৪৮ ব্যক্তিকে হত্যা করে।

১৬ই মেঃ স্থানীয় কুখ্যাত দালালদের সহযোগিতায় বর্বর সৈন্যরা শহরের রাধাবল্লভ ইউনিয়নে রাত্রি নটা থেকে ১ টা পর্যন্ত তল্লাশী চালায়। তারা নারীদের উপর অত্যাচার করে। জনগণকে অসহায় অবস্থায় ধরে হত্যা করে এবং গৃহস্ত বাড়ী থেকে মূল্যবান আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

এই সময় রংপুর শহরের বিশিষ্ট মারোয়াড়ী ধনী পাট ব্যবসায়ী রামরিক আগরওয়ালার মিলে দালালদের সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী হানা দেয়। হানাদারগণ রামরিক আগরওয়ালার কাছ থেকে নগদ টাকা পয়সা, মিলের মেশিনারী দ্রব্যাদি এবং দালালদের দ্বারা জমাকৃত পাট নিয়ে যায়। হানাদাররা উক্ত মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর উপর দৈহিক নির্যাতন করে।

৩১ শে মেঃ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১২৪ জন বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সাবেক ই, পি, আর, কে সামরিক কর্তৃপক্ষ বেতন দানের প্রলোভন এবং কাজে যোগাদানের নির্দেশ দিয়ে ডেকে নিয়ে আসে। তাদের সবাইকে ঘাঘট নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে মেশিনগানের গুলিতে নির্মমভাবে হত্যা করে। সামরিক পোষাক পরিহিত অবস্থায়ই এদেরকে হত্যা করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে এদের মধ্যে কয়েকজন কোনক্রমে ছুটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

২রা জুনঃ রংপুর সদর থানার বুড়িরহাট নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পরিবার হানাদার সেনাবাহিনীর ভয়ে গরুর গাড়ী করে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাবার সময় ঘাঘট নদীর তীরে সৈন্যদের নিকট ধরা পড়ে। হানাদাররা উক্ত ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। ব্রাহ্মণসহ তার স্ত্রী এবং শিশু কন্যাকে হত্যা করে এবং ঘাঘট নদীর উপর জাফরগঞ্জ ব্রীজের নীচে তাদেরকে ফেলে দিয়ে চলে যায়।

রংপুর শহর সাবেক ইপসিক এর পাশে আর্মি হেড কোয়ার্টারের সংলগ্ন জনৈক মেজরের বাস ভবনে রাত্রি ১১ টার দিকে জলসা বসতো। বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত তরুণীদের দিয়ে জোরপূর্বক নাচ এবং গানের আসর করানো হতো। তখন তরুণীদেরকে যথেচ্ছ ধর্ষণ করা হতো। যখন তারা তাদের চিত্ত বিনোদনে অসমর্থ হতো মেজরের নির্দেশে তাদের হত্যা করা হতো। ধর্ষিতা মেয়েদেরকে শুকনো রুটি এবং রাত্রে সামান্য ভাত দেয়া হত।

রংপুর ক্যান্টনমেন্টের সেনাবাহিনীর মেজর বশীর ছিল নারী ধর্ষনের হোতা। প্রতি রাত্রে তার চিত্ত বিনোদনের জন্য ৩ থেকে ৪ জন বাঙ্গালী তরুণী সরবরাহ করা হতো।

সেনাবাহিনীর অফিসাররা বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত শিক্ষিতা তরুণীদের সাথে নিয়ে ফিরতো। রাজশাহী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষিতা তরুণীকে একদিন কালো বোরখা পরিয়ে জনৈক অফিসার ওরিয়েন্টাল সিনেমায় নিয়ে আসে। অফিসারটি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যায়। পাশের ছিটে আমি বসা ছিলাম। একজন তরুনী সরাসরি আমার সাহায্য চায়। তিনি নিজেকে বাংলা বিভাগের ছাত্রী বলে জানান। ইত্যবসরে অফিসারটি এসে পড়ে। উক্ত হতভাগিনী তরুণীদ্বয়ের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী

\ ৭৯ \

মেঃ আরব আলী মিয়া
চার্চলেন, জুম্মাপাড়া, রংপুর

৩রা জুন (১৯৭১) বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌনে পাঁচটায় বাসা থেকে আমি সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের লোকেরা স্থানীয় লোকের সহায়তায় ধরে রংপুর ক্যান্টমেন্টে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর লোকদের আড্ডা কোথায় এবং তাদের গোলাবারুদ কোথায় রক্ষিত আছে। আমার সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক আছে ও তারা প্রায়ই আমার কাছে আসা-যাওয়া করে। দ্বিতীয়তঃ আমার বাসায় জেলা আওয়ামী লীগের অফিস ছিল। সেখানে তাদের গোপন মিটিং হোত। তাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কাজেই তাদের গোপন দলিলপত্র কোথায় রক্ষিত আছে তা আমি জানি। আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলে আমাকে ভীষণভাবে ধমকি দেয় এবং সেখানে আমাকে রাত ৯টা পর্যন্ত বসিয়ে রাখে। অতঃপর আমার উপর দৈহিক নির্যাতন শুরু হয়।

একটি নির্জন ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে আমার দুজন সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের লোক ইউসুফ খান ও হাবিলদার গোলাম রসুল দাঁড়ায়। একজনের হাতে লোহার রড এবং অপর জনের হাতে শাল কাঠের দরজার খিল (যা দিয়ে দরজা বন্ধ করা হয়) দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে হৃদয়হীনভাবে প্রহার শুরু করে। ঘন্টা দেড়েক আমার উপর সমানে দুজনে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় অত্যাচার চালায়। অত্যাচারের সময়ও আমাকে উল্লিখিত বিষয়গুলি সমন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অত্যাচারের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বিশেষ করে থুতনি থেকে দরবিগলিত ধারায় রক্তপাত হচ্ছিল।

রাত এগারটা সাড়ে এগারটার দিকে এবং তা ছাড়া আরও দুবার দু'দল লোক এসে একই প্রক্রিয়ায় অত্যাচার করে। এসময় আমাকে ''বাইনচোদ, তোমলোগ জয় বাংলা নারায়ে লাগাতা হ্যায়। তুমলোগ লাখো লাখো মুসলমানকো খতম কর লেগা, সময় নেহি আতা হ্যায়। আবি কাঁহা গিয়া তোম লোগ কো জয় বাংলা। তোম লোগ আওয়ামী লীগকো বহুত মদদ দিয়া।'' এছাড়া শ্লীলতাবর্জিত গালিগালাজ করতে থাকে।

রাত দেড়টার দিকে আমার হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং বলে যে ''গুলি কি নিশানা বানগিয়ে। কুচ বাতানে হ্যায় তো বাতাও।'' আধ ঘন্টা খানেকের পর তারা আমার বাঁধন খুলে দেয়। এবং উক্ত ঘরেই দুদিন বন্ধ করে রাখে এবং তৃতীয় দিন থানায় পাঠায়।

থানা থেকে দুদিন ক্যান্টমেন্টে মেজরের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এ সময় আমাকে অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। ৫ দিন বন্ধ করে রাখার পর মঙ্গলবার আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির বিনিময়ে তারা ১৫ হাজার টাকা নেয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আরব আলী মিয়া

\ ৮০ \

আলতাফ হোসেন
নাগেশ্বরী, রংপুর

হানাদার বাহিনী নাগেশ্বরী এসেই প্রথমে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। কিছুদিন পর তারা জনগণকে হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে।

পাক বর্বর বাহিনী একদিন নাগেশ্বরী থানার বাইরে থেকে একজন লোক ঘরে নিয়ে আসে। প্রথমে মারপিট করে, পরে হানাদাররা উক্ত লোকটিকে নির্মমভাবে ভলিবল এবং ফুটবলের ন্যায় কিল-ঘুষি এবং বুট জুতোর লাথি মেরে হত্যা করে।

সাধারণতঃ কিল, ঘুষি, লাথি, রাইফেলের বাঁট প্রভৃতির দ্বারা নির্মমভাবে বর্বর সৈন্যরা নির্দোষ জনগণের উপর নির্যাতন চালিয়েছে।

হানাদার দস্যু বাহিনী নাগেশ্বরী দখলের তিন দিন পর একদিন সকাল ১০টায় নাগেশ্বরী বাজারের উত্তর-পূর্ব দিকের গ্রামে প্রবেশ করে। জনৈক আছমত মিয়ার গৃহে পাক সৈন্যরা ঢুকে আছমত মিয়া ও অন্য পুরুষদের বের করে দিয়ে তার পুত্রবধূর (২০) উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

নাগেশ্বরী থানার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের আনছার হাটে একদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাক সৈন্যদের মারার জন্য মাইন পুঁতে রাখে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জনৈক রাখাল ও তার গরু উক্ত মাইনের শিকার হলে খবর পেয়ে নাগেশ্বরী থেকে কিছু সংখ্যক পাক সৈন্য আনছার হাটে গিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অনেক লোক ধরে। বর্বর সৈন্যরা আনছার হাটের নিকটস্থ বাড়ি থেকে কিছুসংখ্যক মেয়েছেলে ধরে এবং বাছাই করে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কা মেয়েছেলেদের উক্ত হাটের নিকটবর্তী হাবিবর রহমানের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ছেড়ে দেয়। ঐ দিন ঐ এলাকা থেকে মোট ১০ জন পুরুষকে হানাদাররা ধরে নিয়ে এসে নাগেশ্বরী ঈদগাহ মাঠে বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত আরো কতিপয় লোকসহ মোট ৩৬ ব্যাক্তিকে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করেছে।

হানাদার সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে মেয়েদের ধর্ষণ ছাড়াও তাদের শরীর থেকে নানা প্রকার স্বর্ণের অলঙ্কার নিয়ে আসত।

২৭শে মেঃ হানাদার বাহিনী নাগেশ্বরী থানায় প্রবেশের পরপরই ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। হানাদাররা নাগেশ্বরী বাজারে প্রবেশ করে প্রথমেই হিন্দু পট্টিতে দোকান ও বাড়ীঘর অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। অতঃপর হানাদররা ঢাকাইয়া পট্টি অগ্নিসংগোগে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ঐ দিনই বাজারসংলগ্ন সাঞ্জুয়ার ভিটার মুক্তিযোদ্ধা মোসলেমের বাড়ী এবং প্রতিবেশী রমজানের বাড়ী তারা পুড়িয়ে দেয়। উক্ত দিন হানাদার সৈন্যরা নাগেশ্বরী বাজার জামে মসজিদের নিকট পপাটুয়া (টমেটো) নামে একটি পাগলকে গুলি করে হত্যা করে। অপর একটি পাগলিনীকে ঐ দিন দস্যু সেনারা হিন্দু পট্টিসংলগ্ন আজিজার মিয়ার গৃহে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। নাগেশ্বরী বাজারে হিন্দুপট্টি এবং ঢাকাইয়া পট্টিতে অগ্নিসংযোগের ফলে পার্শ্ববর্তী বহু ব্যবসায়ী ও গৃহস্থের বাড়ীঘর ভস্মীভূত হয়েছে।

পাক হানাদর বাহিনী নাগেশ্বরী থানায় পৌঁছেই নাগেশ্বরী ডাকবাংলা এবং হাইস্কুলে ঘাঁটি করে। কিছুদিন পরেই এখান থেকে তারা জনগণকে নির্যাতন শুরু করে। পাক সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে পড়তো এবং লোক

ধরে এনে দৈহিক পীড়ন চালাতো। সাধারণত দৈহিক নির্যাতনের প্রক্রিয়া ছিল কিল, ঘুষি, বুট জুতার লাথি, রাইফেলের বাঁট এবং বেয়নেট দিয়ে আঘাত হেনে তীব্রভাবে অথ্যাচার করে।

মুক্তি ও মিত্রবাহিনী নাগেশ্বরী মুক্ত করার জন্য এগুতে থাকলে নাগেশ্বরী বাজার ও পার্শববর্তী এলাকার জনতা ও তাদের পরিবারবর্গ নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের জন্য চলে যেতে থাকে। পাক বর্বর সৈন্যরা নাগেশ্বরী বাজারের চটাৎ ও জম মাঝিকে একদিন ধরে নিয়ে গিয়ে জবাই করে মেরে ফেলেছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আলতাফ হোসেন (দুলু)

\ ৮১ \

মোঃ আজিজুর রহমান
গ্রাম-বেরুবাড়ী
থানা-নাগেশ্বরী
জেলা-রংপুর

হানাদার বর্বর বাহিনী চর বেরুবাড়ীর দুধকুমোর নদীর পশ্চিম তীরের গ্রামে অগ্নিসংযোগে লিপ্ত হয়। নিরীহ জনসাধারণের প্রায় একশত একুশটি বাড়ী দস্যু বাহিনী জ্বালিয়ে দেয়। এরপর গ্রাম থেকে লোক ধরে হানাদাররা উক্ত বেরুবাড়ী ফ্রি পাইমারী স্কুলের পিছনে নিয়ে আসে এবং লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলি দ্বারা ১৮ ব্যক্তিকে হত্যা করে। তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় রেখে যায়। তন্মধ্যে একজন এক সপ্তাহ পর মারা যায়। অতঃপর বর্বর বাহিনী গ্রাম থেকে প্রায় আড়ই শত যুবক ও বৃদ্ধকে ধরে এনে বেরুবাড়ী বাজারের পূর্বে এক জায়গায় সমবেত করে এবং তাদেরকে নির্মমভাবে ডবল (শাস্তিমূলক দৌড়) করাতে থাকে। পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। সংঘর্ষের পর হানাদার বাহিনীর এরূপ অমানবিক কর্মকাণ্ডে জনসাধারণ যখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে পালাচ্ছিল, তখন এদিকে রাজাকাররা এ সুযোগের ব্যবহার করে। বিভিন্ন পরিত্যক্ত বাড়ীতে ঢুকে তারা লুট করে বিভন্ন মূল্যবান সামগ্রী এবং গবাদিপশু নিয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আজিজুর রহমান
৩/৬/৭৩

\ ৮২ \

মোঃ আজিম উদ্দিন
গ্রাম-গাছিডাঙ্গা
থানা-ভূরুঙ্গামারী, রংপুর

পাক বর্বর বাহিনী ভূরুঙ্গামারী থানা পূর্ণ দখলে নেবার দুই মাস পর গাছিডাঙ্গা গ্রামের দিকে ধাওয়া করে। পাক দস্যুদের সংখ্যা ছিল ৭ জন। তারা উক্ত গ্রাম গাছিডাঙ্গায় ঢুকে স্থানীয় (মৃত) হাজী আবদুস ছাত্তার সাহেবকে ধরে আনে। ধরে এনে তাকে গ্রামের আরও অন্যান্য লোকজনকে তাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য হুকুম করে। তখন হাজী সাহেব জীবনের ভয়ে গাছিডাঙ্গার নিম্নলিখিত জনসাধারণকে খান দস্যুদের সামনে হাজির করতে বাধ্য হন। নিম্নে তাদের নাম দেওয়া হলঃ (১) মোঃ ফরিদ (২) পনির উদ্দিন (৩) মঈন উদ্দিন (৪)আবুল কাশেম (৫) ফটিক (৬) আইন উদ্দিন (৭) আজিম উদ্দিন (৮) নাছের উদ্দিন (৯) নুরুল ইসলাম (১০) নাছু শেখ (১১) ময়েত উল্লাহ প্রমুখ। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, মুমি মুক্তিফৌজ এবং মুক্তিদের সহায়তা কর। অবশ্য এসব কথাগুলি উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে। পরপর সবাইকে এইসব কথা জিজ্ঞাসা করে। তখন আমি ও সঙ্গীরা অস্বীকার করি। তখন খান দস্যুরা রাইফেলের বাঁটের সাহায্যে আমাদের ভীষণভাবে আঘাত করতে থাকে। তাছাড়া কিল, ঘুষি ও বুটের লাথিতে সবাইকে ভীষণভাবে আঘাত করে। পর মুহূর্তে আমাদের সবাইকে লাইনে দাঁড় করে কলেমা পড়তে বলে। তখন আমরা সবাই জীবনের ভয়ে ভুল করে কলেমা পড়তে আরম্ভ করি। তখন খান সেনারা বলে যে, তোমরা মালাউন এবং তোমরা নিজেরা মুক্তিদের লীডার এবং মুক্তিদের সাহায্য কর। এই মনে করে খান দস্যুরা পুনরায় কিল, ঘুষি ও রাইফেলের সাহায্যে আঘাত করে। আমি আমার সঙ্গীরা অচৈনত্য হয়ে পড়ি। পাশে অবস্থানরত মুক্তিরা জানতে পেরে তাদেরকে উদ্দেশ করে ফাঁকা গুলি করতে থাকে। খান দস্যুরা সব বুঝতে পেরে পুনরায় ভূরুঙ্গামারীর দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিছু সময় পর আমাদের জ্ঞান ফিরে। খান দস্যুদের আর আমাদের পাশে দেখতে পাই না। তখন আমরা কোন রকমে আধা মরা অবস্থায় দূর দূরান্তে আত্মগোপন করতে বাধ্য হই। খান দস্যুদের হাতে বেদম মারপিট খেয়েও আমি কোন রকমে বেঁচে আছি।

টিপসহি/-
মোঃ আজিম উদ্দিন

\ ৮৩ \

মোঃ তালেব মুন্সী
গ্রাম-গাছিডাঙ্গা
থানা-ভূরুঙ্গামারী
রংপুর

২৬শে মার্চের পূর্বে আমি আওয়ামী লীগের কর্মী ছিলাম। ২৬শে মার্চের পর অত্র গাছিডাঙ্গা মৌজার সংগ্রাম পরিষদের আমি সদস্য ছিলাম। পাক হানাদার বাহিনী ভুরুঙ্গামারী থানা দখলের প্রায় ২ মাস পর একদিন আমাদের গ্রামে আসে। তারা সংখ্যায় ৫০ জন ছিল। হানাদার সৈন্যরা গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি গ্রামের মেয়েছেলেদের আমার বাড়ীর পিছনে একটি বড় বাঁশঝাড়ের জঙ্গলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি। প্রাণভয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মোঃ আব্দুর রহমান নিকটে একটি বাঁশের ঝোঁপে বাঁশের আগায় উঠে আত্মগোপন করে। হানাদাররা আব্দুর রহমানকে দেখে ফেলে এবং তাকে বাঁশ গাছ থেকে নামিয়ে এনে মারপিট শুরু করে। তাকে রাইফেলের বাঁট, কিল, ঘুষি এবং জুতা দ্বারা আঘাত ও নির্যাতন করে। অতঃপর আমার বাড়ীতে বিভিন্ন ঘর অনুসন্ধান করে মেয়েছেলেদের দেখতে না পেয়ে তারা বাড়ীর পিছনে বাঁশঝাঁড়ে আত্মগোপনকারী মেয়েছেলেদেরকে খোঁজ করতে থাকে। তাদের খোঁজ করে না পেয়ে হানাদাররা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করলে মেয়েছেলেরা চীৎকার করতে থাকে এবং বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে পালাতে থাকলে পাক সৈন্যরা তাদের পিছনে ধাওয়া করে। আমি এ অবস্থায় থাকতে না পেরে পাক সৈন্যদের কাছে ছুটে যাই এবং মেয়েছেলেদের উপর নির্যাতন না করার জন্য কঠোর প্রতিবাদ করি। এসময় হানাদরদের কয়েকজন মেয়েছেলেদের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে এবং অপর কয়েকজন আমার উপর মারপিট শুরু করে। পাক ফৌজ কর্তৃক প্রহৃত হওয়াকালীন আমার দুইজন আত্মীয়া মোছাম্মৎ আছিয়া খাতুন (চাচাতো বোন, বয়স ২৫ বৎসর) এবং মোছাম্মৎ মজিরন নেছা (ভাগনে বউ, বয়স ২৭ বৎসর) আমার দিকে ছুটেআসলে পাক হানাদাররা তাদেরকে ধাওয়া করে আমার বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। আমিও তাদের পিছনে পিছনে বাড়ীতে ঢুকে পড়লে তারা পুনরায় আমার উপর কিল, ঘুষি, রাইফেলের বাঁট এবং জুতার আঘাত প্রভৃতি নির্যাতন করতে থাকে। আমি তখন সরাসরি তাদের সঙ্গে হাতাহাতি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হই। এই সময় আমার চাচাতো বোন এবং ভাগনে বউ পালাতে সক্ষম হয়ে ঘরে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর আমাকে মুমূর্ষূ অবস্থায় রেখে হানাদার দস্যুরা ঘরে ঢুকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অনেক চিকিৎসা করা সত্ত্বেও বর্তমানে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় দিন যাপন করছি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ তালেব আলী মুন্সী
১৯/৪/৭৩

\ ৮৪ \

নারায়ন প্রসাদ
সৈয়দপুর বাজার
জেলা-রংপুর

২৭ শে মার্চ আমার বাবাকে বাড়ী থেকে ধরে কারফিউ চলাকালে সকাল বেলা একটি সামরিক জীপে করে ৪ জন সামরিক লোক এবং ২ জন স্থানীয় অবাঙ্গালী অস্ত্রসহ এসে নক করে। দরজা খুললে তারা বাড়ীতে ঢুকে সিন্দুক খুলে সমস্ত সোনাদানা, টাকা-পয়সা নেয় এবং বাড়ীতে অথবা দোকানে ওয়্যারলেস আছে বলে অভিযোগ করে। তাদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য দোকান খুলেও দেখান হয়। পরিশেষে আমাকে একটি লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আমার বাবাকে জীপে করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

৯ই এপ্রিল বেলা সাড়ে এগারটার দিকে জনৈক অবঙ্গালী এসে আমাকে টেলিগ্রাফ অফিসে সামরিক কর্তৃপক্ষ ডাকছে বলে জানায়। সাথে আমার ছোট ভাইকেও নেবার নির্দেশ দেয়। ধৃত অবস্থায় আমার ছোট ভাই এবং আমাদেরই ভাড়াটে একজন স্বর্ণকারকে উল্লিখিত স্থানে জনৈক মেজরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করার পর মেজর আমাদেরকে বন্দি করার নির্দেশ দেয়। তারপর থানায় নেয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ পর ঐ টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট (টিএণ্ডটি) হাতিম আলী খালিফাকে ধরে আনে। রেলওয়ে ওয়ার্কশপ থেকে শ্রমিক ও চার্জম্যানসহ কিছু লোককে ধরে আনে। সর্বমোট ২৪-২৫ জনকে একত্রে বন্ধ ওয়াগনে করে কড়া সমারিক পাহারায় ক্যান্টনমেন্টে নেয়া হয়। ক্যান্টনমেন্টে নামানোর সাথে সাথে সকলের এক হাত করে বেঁধে দাউন গেঁথে স্থানীয় অবাঙ্গালী ও পাক সৈন্যরা বেদম প্রহার করা শুরু করে। বেল্ট, বেত, লাথি, চড়, কিল, ঘুষি এবং রাইফেলের বাঁট, বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রহার করতে থাকে এবং বলতে থাকে "আচ্ছা চিজ মিলা"। মারের পর্ব শেষ হলে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ছোট ছোট ঘরে ১০-১২ জনকে একই ঘরে ঢুকায়।

তারপর সকলকে আবার বারান্দায় বের করে দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত দেয়ালের সাথে ফাঁক করে রেখে দাঁড় করায় এবং ঐ অবস্থায় ওয়াপদার মোটা বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রহার করতে থাকে। এ অবস্থায় অত্যাচার চলার পর প্রাচীরের সাথে যে বাঁশ টাঙ্গানো ছিল সে বাঁশের সাথে কোমরে দড়ি বেঁধে উল্টো অবস্থায় টাঙ্গিয়ে দেয় এবং পিঠে প্রহার করতে থাকে। প্রহারের ফলে অজ্ঞান হলে অথবা অজ্ঞান হবার উপক্রম হলে ছেড়ে দেয়।

এ সময় টিএণ্ডটি ডিপার্টমেন্টের ঐ ভদ্রলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, এখানে আমার কে কে আছে। আমি আত্মীয়দের সাথে আমার যুবতী মেয়ের কথাও বলি। তখন ঐ পশুরা বলে যে তোমার সেই ১৫-১৬ বছরের মেয়েকে এখনই এখানে নিয়ে আসা হচেছ এবং এদের সামনে তোমাকে তোমার মেয়ের সাথে 'সহবাস' করতে হবে। অস্বীকৃতি জানালে আমার উপর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করে। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে দরবিগলিত ধারায় রক্ত ঝরতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐখানেই সকলে ছিলাম। যে আসত সে-ই মারত এবং কাফের লোক কো খতম করো বলে গাল দিত। এ সময় কয়েকজন দাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা মুসলমান কি না এবং নামাজ পড় কিনা? হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিলে তাদেরকে কলেমা পড়তে বলে। কলেমা পড়তে থাকলে তাদেরকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় এবং বলে যে, 'তোম লোগ কাফের হ্যায়, তুম ঝুটা বলতা হ্যায়।'

সন্ধ্যার পর একটি ঘরে সকলকে বসায় এবং শুকনো রুটি ও ডাল এনে দেয়। খাওয়ার পর মুসলমানেরা নামাজ পড়তে চাইলে তাদেরকে মসজিদে না যেতে দিয়ে সেখানেই নামাজ পড়তে নির্দেশ দেয়। নামাজ পড়া যেই শেষ হয়েছে, অমনি জনৈক কোয়ার্টার মাষ্টার বেত হাতে এসে প্রহার শুরু করে। তোম লোগ নামাজ পড়তা হ্যায়। তোম লোগ বাঙ্গালী মুসলামান, তোম লোগ কাফের হ্যায়।

সেখান থেকে অতঃপর আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেকগুলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক বন্দি অবস্থায় ছিল। সেখানে দরজা খুলে সকলকে ঢুকিয়ে দেয়। সেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের মুখে জানতে পারি যে, তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় ছিলেন। ডিউটি অন্যত্র দেয়া হবে নিয়ে এসে বন্দি করে। তারা সংখ্যায় প্রায় ৫০-৬০ জন ছিলেন। ঘন্টাখানেক পর উল্লিখিত কোয়ার্টার মাষ্টার দরজা খুলে সিভিলিয়ানদের বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দেয় এবং বেরিয়ে আসলে অন্য আর একটি ছোট ঘরে নিয়ে যায়। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিল এবং ঘরের ভিতর কোন আলো ছিল না। কেউ যেন না বসে এমন নির্দেশ দিয়ে সে চলে যায়। তার কিছুক্ষণ পর ঐ একই ব্যক্তি এক এক করে ঘরের বাইরে ডেকে নেয় এবং আমার প্রতি অকথ্য অত্যাচার করতে থাকে। যখন আমার পালা আসে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, শহরের কে কে বাংলাদেশের পতাকা তুলেছিল, কে কে মুজিব ত্রাণ ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছে এবং কে কে নেতা?

পরদিন সকালে আমাদের দিয়ে একটি পুকুরের বাঁশ উঠিয়ে নেয়া হয় এবং মাঠের ঘাস পরিষ্কার করে নেয়া হয়। তারপর অপর একজন এসে আমাদেরকে বন্দি করতে নির্দেশ দেয়। তখন আমার পূর্বে ধৃত আমার বাবার খবর জানতে চাইলে তাদের সকলকে যে ঘরে আমার বাবা এবং স্থানীয় এমসিএ জিকরুল হকসহ ১৫-১৬ জন বন্দি ছিলেন সেখানে বন্দি করে রাখে।

কিছুক্ষণ পরে মেজর জাভেদ এসে সকলকে একদিক থেকে ঐ ঘরেই প্রহার করে। ডাঃ জিকরুল হককে প্রহার করার সময় সে বলে 'ডঃ জিকরুল তোম বলতা হ্যায় মিলিটারী ফাঁকা ফায়ার করতা হ্যায়। তোম হিয়াসে মব লাগাতা হ্যায় ? বানচোত, তোম সবকো গুলি কর দিয়ে গা।' তারপর ক্যাপ্টেন বখতিয়ার লাল আসে এবং একই প্রক্রিয়ায় অত্যাচার করে।

পরদিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন গুল এসে তার মাথার শিরোস্ত্রাণ খুলে তা দিয়ে সকলকে প্রহার করে। মারের চোটে কেউ চীৎকার করতে চাইলে সে বলতে চীৎকার মাৎ কারো। এদিন ডাক্তার সাহেবকে বেশী অত্যাচার করে ও অকথ্য এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে। তাকে লাথি দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় এবং সেখানে তার প্রতি গুল ও অন্যান্য মিলিটারীর হৃদয়হীনভাবে অত্যাচার করে। এতে তার চশমা ভেঙ্গে যায়; মাথা ফেটে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। অতঃপর তার মাথা ব্যাণ্ডেজ করে লাথি মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

ডাক্তার সাহেব ঘরে ঢুকলে সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ডাক্তার সাহেব সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ওরা অত্যাচার করুক না। আর না হয় কাল দিন আসবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে।

১২ তারিখ সকালে সেন্ট্রি এসে জানায় যে, আপনাদের যা খাবার খেয়ে নেবেন, আপনাদের আজ কোথাও যেতে হবে। ১২টার দিকে দরজা খুলে বাইরে বেরোলেই উল্লিখিত কোয়ার্টার মাষ্টার সকলকে একটি দুটি করে লাথি মেরে ট্রাকে উঠতে নির্দেশ দেয়। ট্রাকে উঠলে তিনজন করে একত্রে পেছনে শক্ত করে হাত বেঁধে দেয়। তিনটি ট্রাকে বেঙ্গল রেজিমেন্টর লোকসহ প্রায় ১৫০ জনকে উঠায়। ট্রাক রংপুরের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। যাবার পথে পাহারারত সামরিক লোকেরা বেল্ট দিয়ে, রাইফেলের বাঁটি দিয়ে অথবা বুট দিয়ে খুচিঁয়ে অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষাবধি রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছার পরই সকলের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। তারপর অফিসার এসে নামের তালিকা বের করে সকলের নাম মিলিয়ে নেয়। তারপর রংপুর উপশহরের দিকে অফিসাররা জীপে যাত্রা করে এবং পিছনে পিছনে ট্রাকগুলোও যেতে থাকে। উপশহরের পাশে বালি তোলা খাদের কাছে নিয়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করায় এবং সেখানে প্রথমে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের ৬ জন ৬জন করে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারপর সিভিলিয়ানদের এক একজন করে পাশাপাশি একবারে ছয়জন করে দাঁড় করায়। তাদের সামনে খুব নিকটে ছয়জন বন্দুকধারী সিপাই থাকে এবং পাশে জোড়া লাগানো কালো প্যান্ট-শার্ট পরিহিত একজন সিপাই। দাঁড় করিয়ে দেয়া হলে ঐ কালো কাপড় পরিহিত লোক বলল 'সিঙ্গল ফায়ার' বলে রাইফেল উপরে তুলে গুলি করত আর গুলি কারার সাথে বলত 'স্টার্ট ফায়ার'। সাথে সাথে উল্লিখিতি ছ'জন ছ'জনকে দাঁড় করানো হতো।

আমি ও আমার ছোট ভাই কমলাপ্রসাদ ঐরূপ তৃতীয় গ্রুপে ছিলাম। আমরা নিজেদের কিছু সলাপরামর্শ করে গুলি করার পূর্বমুহূর্তেই ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যাই। ফলে গুলি লক্ষ্যভেদ হয়ে আমার হিপে (উরুর উপরে) এবং আমার ছোট ভাইয়ের হাঁটুর উপরে উরুতে লাগে। আমরা মরার ভান করে পড়ে থাকি এবং সমস্ত লক্ষ্য করতে থাকি।

এ হত্যাযজ্ঞের মাঝামাঝি সময়ে ডাঃ জিকরুল হককে একাই দাঁড় করায় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, 'এ্যাই তোমহারা জিন্দেগী আওর মউত কো স্যোয়াল হ্যায়। হাম জানতা হ্যায় তোমস্যে মুজিবরস্য ফোন মে বাত হোয়া।' তিনি উত্তর দিলেন আমি মরার সময় মিথ্যা কথা বলে গোনাহগার হব না। আর এ কথা বলার সাথে সাথে তাকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়ে যান এবং বলেন 'আল্লাহ তোমার এখানে বিচার নেই, বিচার কর।' এটাই তার শেষ কথা। শেষের দিকে স্থানীয় প্রভাবশালী ডাঃ শামশুল হককেও ঐ একা দাঁড় করিয়ে হত্যা করে।

এ অবস্থায় সকলকে হত্যা করতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে অন্ধকার হয়ে যায়। এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও মেঘ ডাকতে থাকে। হত্যাপর্ব শেষ হলে সকল মৃত ব্যক্তিকে ৫-৭ জনে পা ধরে টেনে উল্লিখিত খাদে ফেলে দেয় এবং আর ১০-১২ জনে উপর থেকে মাটিচাপা দিচ্ছিল। সে সময় অনেকে জীবিত ছিল। তারা গগনবিদারী করুণ চীৎকার করে আর্তনাদ করছিল। কেউ বা শেষবারের মত এক গ্লাস পানি পান করতে চাইছিল। আবার কেউ বা এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আর একটা গুলি ভিক্ষা করছিল।

মাটি চাপা দিতে দিতে ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে তারা আমার শরীরের অর্ধাংশ মাটি চাপা দিয়েই পরবর্তী সময়ে মাটি চাপা দেয়া হবে বলে চলে যায়।

ওরা চলে যাবার পর আমি ঐ গর্ত থেকে একজনকে উঠে দৌড়ে পালাতে দেখি। সে সময় আমার ভাই উক্ত পলায়নরত ব্যাক্তিকে লক্ষ্য করে বলে যে মিঠু আমাকে বাঁচা। আমার কেউ নেই এখানে। কিন্তু ঐ ব্যাক্তি শুনতে না পেয়ে চলে যায়।

এদিকে আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে উঠবার চেষ্টা করছিলাম। আমার নড়াচড়াতে আমার দেহের উপর থেকে বেশ ক'টি লাশ গড়িয়ে পড়ে যায়। সে সময় আমার পাশেই এক বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক জীবিত ছিলেন। তার একটি হাত ছিল না। তিনি আমাকে পালিয়ে যেতে বলেন এবং অপর হাত দিয়ে আমার হাতের বাঁধন খুলে দেয়ার শেষ চেষ্ট করেন; কিন্তু তিনি তা পারেন না। কারণ তার হাত অবশ হয়ে যাওয়ায় তা সামনে আসেনি। আমি নিজে নিজে বহু চেষ্টা করে হাতের বাঁধন খুলে ফেলি এবং আমার ভাইকে সাথে করে নিয়ে গর্তের উপরে উঠতে চেষ্ট করি। উপরে ওঠার পর হঠাৎ পা পিছলে নিচে পড়ে যাই। গর্ত থেকে আমি ভাইকে গ্রামে আশ্রয় নেবার নির্দেশ দেই।

গর্ত থেকে উঠে আমার ভাইকে আর পাই না। অতি কষ্টে কিছু দূরের গ্রাম একটি বাড়ীতে আশ্রয় নেই। সেখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে আরও দূরে এক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেই। উক্ত গ্রামের জনৈক মহিউদ্দিনের আন্তরিক সেবা-যত্নে কিছুটা সুস্থ হই। তারপর সেখান থেকে উক্ত ব্যাক্তির সাহায্যে প্রথমে তার এক আত্মীয়ের বাড়ী এবং পরবর্তীকালে জলঢাকা (নীলফামারী) যাই এবং সেখান থেকে মুক্তিবাহিনীর গাড়িতে করে ভারতের জলপাইগুড়ি পৌঁছি।

অপর পক্ষে আমার ভাই উক্ত ব্যাক্তির অক্লান্ত সেবা-যত্নের ফলে সুস্থ হয়ে ওঠে। রংপুর হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাকেও ভারতে পাঠানো হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত গর্ত থেকে সেদিন মাত্র চার ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

স্বাক্ষর/-
নারায়ণ প্রসাদ

\ ৮৫ \

মোঃ মনোয়ার হোসেন
গ্রাম- মোল্লাপাড়া
পোঃ কুড়িগ্রাম
জেলাঃ রংপুর

পাক হানাদার সৈন্যরা ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ট্রেনযোগে কুড়িগ্রাম নতুন শহরের (খলিলগঞ্জ) ষ্টেশনে পৌঁছে। ষ্টেশনে পৌঁছেই প্রথমে তারা ষ্টেশনের পশ্চিম দিকের জনসাধারণের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলোতে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে। এরপর হানাদার সৈন্যরা খলিলগঞ্জ বন্দরে ঢুকে পড়ে। ঐ সময় খলিলগঞ্জের ছফর উদ্দিন (এ্যালোপ্যাথ) ডাক্তার বাসাই ছিলেন। বন্দরসংলগ্ন তার বাসগৃহ ছিল। পাক সৈন্যরা বন্দরে ঢুকে পড়ায় তিনি নিরাপত্তার জন্য বাসার পেছনে একটি খালে আত্মগোপন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাক সৈন্যরা তাকে দেখে ফেলে এবং গুলি করে হত্যা করে। এ দিন বন্দরের আরো তিনজন লোককে হানাদার সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার পূর্বদিন আমি ঘোষপাড়ার চায়ের দোকানে ছিলাম। পাক সৈন্যরা খলিলগঞ্জ উক্ত চারজন লোককে হত্যা করে সেদিনই ট্রেনযোগে তিস্তা চলে যায়।

হতভাগ্য চারজনকে খান সেনারা বন্দরসংলগ্ন দিঘীর পাড়ে একত্র করে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করে। কয়েক দিন পর হানাদার সৈন্যরা ট্রেনযোগে কুড়িগ্রাম নতুন শহরে প্রবেশ করে এবং জেলখানায় প্রহরারত পাঁচজন পুলিশকে হত্যা করে দ্রুত চলে যায়।

বুড়ির মেলা বাজারের কাছে একটি উঁচু স্থানে খান সেনারা নিরপরাধ বাঙ্গালীদেরকে গুলি করে হত্যা করে এবং তাদেরকে শূন্যে নিক্ষেপ করে বেয়নেট দিয়ে গাঁথে।

কুড়িগ্রাম পুরাতন শহরের রিভারভিউ স্কুলের কাছ দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে ধরলা নদী অতিক্রমের সময় হঠাৎ হানাদার বাহিনীর মর্টারের গুলি পায়ে, হাঁটুতে এবং পিছন দিকে কোমরে লেগে আমি আহত হই। সঙ্গী সশস্ত্র তিনজন বাঙ্গালী ইপিআর আমাকে নদীর তীরে চানমারীতে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ধরলা নদীর খেয়া তখন বন্ধ ছিল। চানমারীর কাছে একটি বাঙ্কারে আমি ঢুকে পড়ি এবং ক্রমেই আমার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। বাঙ্গালী ইপিআর তিনটি আর পুনঃ আমাকে খোঁজ করতে আসেনি।

গুরুতর আহত অবস্থায় আমি উক্ত বাঙ্কারে ১১ দিন অনাহারে ছিলাম। হানাদার বাহিনী সমগ্র কুড়িগ্রাম দখল করে। এই এগার দিন আমি দৃঢ়তার সঙ্গে অতিবাহিত করি। কখনো জ্ঞান হারাইনি। ১২ দিন পর ৩ জন খান সেনা ৩ জন দালালসহ উক্ত স্থান অতিক্রমের সময় আমাকে দেখে ফেলে। খান সেনারা আমাকে কুড়িগ্রাম ডাক বাংলোয় নিয়ে যায়। ডাক বাংলোর দিকে যাবার পথে বর্তমান ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাছে কুড়িগ্রাম রেলওয়ে অফিসের এক বৃদ্ধ দারোয়ানকে বিহারী নেয়ামত কসাই জবাই করছে দেখতে পাই। এ দৃশ্য আমার নিকট ছিল পৈশাচিক।

ডাক বাংলোয় পৌঁছে আমি ডাক বাংলোর কাছে স্যানিটারী অফিসের বারান্দায় ৮ জন লোককে চোখ ও পেছনে হাত বেঁধে কোমরে দড়ি লাগিয়ে বারান্দায় খামে দাঁড়ানো অবস্থায় বেঁধে রাখতে দেখি। ডাক বাংলোয় খান সেনারা অবস্থান করতো। আমি পৌঁছামাত্র আমার চোখ, পেছন দিকে হাত বেঁধে দড়ি লাগিয়ে অপর একটি খামে বাঁধা হয়। বারান্দায় বেঁধে রাখা সবাইকে মেজর গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। পরদিন ভোরে আনুমানিক সকাল আটটার দিকে নেয়ামত কসাই আসে এবং সবাইকে জবাই করবে বলে জানায়। নেয়ামত কসাই এক একটি জবাইয়ের বিনিময়ে ৬০ (ষাট) টাকা পায় বলে জানায়। বেঁধে রাখা ব্যক্তিদেরকে মেজরের নির্দেশে বিকাল পাঁচটার সময় গুলি করে হত্যা করা হবে জানলে নেয়ামত কসাই চলে যায়। বিকাল ৫ টায় ২ জন

খান সেনা সবাইকে চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় ধরলা নদীর তীরে চানমারীর পেছনে আমাকেসহ হতভাগ্য ১১ জনকে নিয়ে আসে। বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে চানমারীর পেছনে যাবার সময় অসংখ্য মৃত লাশ আমার পায়ে লাগছিল। চানমারীর পেছনে সাবইকে লাইন করানো হয় এবং সাবাইকে বুকটান দিয়ে দাঁড়াতে বলা হয়। এক এবং দুই গোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছন দিকে হেলে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয় আমি তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে মৃতবৎ পড়ে থাকি। পাঞ্জাবীরা সবাইকে মৃত ভেবে চলে যায়। আমার তন্দ্রা কেটে গেলে বুঝতে পারি সৌভাগ্যক্রমে গুলিতে আহত হইনি। তবু আমি ভয়ে ৪-৫ ঘন্টা মৃতবৎ পড়ে থাকি। চারদিকে একই সঙ্গে কুকুর এবং শৃগালের তুমুল কোলাহল চলছিল। রাত্র ১২টার দিকে হঠাৎ দড়িতে টান পড়লে আমি জ্ঞন ফিরে পেয়ে উঠে বসি, কে দড়ি টানছে। জিজ্ঞাসা করলে অপর প্রান্ত থেকে একজন জীবন্ত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তার বাড়ী রংপুর জেলার গাইবান্ধা বলে জানায়। তার গায়ে গুলি লাগেনি বলে সে জানায়। অতঃপর উভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হই এবং পরস্পরের হাতে বাঁধন খুলে দিতে সাহায্য করি । উভয়ে মুক্ত হবার পর চোখের বাঁধন খুলি এবং চারদিকে তাকিয়ে কমপক্ষে ৪শত লাশ দেখতে পাই শৃগালগুলো চারপাশে ছোটাছুটি করছিল। উভয়ের নদীর তীরে উপস্থিত হই। গাইবান্ধার লোকটি সাঁতার দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অতঃপর আমি তার হাত ধরে গা ভাসিয়ে দেই। নদীতে কয়েকবার লোকটি আমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কিন্তু অতি কষ্টে পরস্পর পরস্পরকে ধরে রেখে নদী পার হতে সক্ষম হই। তীরে পৌঁছতেই ভোর হয়ে আসে। উভয়েই ভারতে আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার চৌধুরী হাটে প্রবেশ করি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মনোয়ার হোসেন
৩০/০৭/৭৩

\ ৮৬ \

ডাঃ আব্দুল করিম আহমদ
গ্রাম- সাপটানা
লালমনিরহাট, রংপুর

৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১, হানাদার বাহিনীর লালমনিরহাট প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত লালমনিরহাট বাসভবনে ছিলাম। হানাদার বাহিনী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমি পূর্বদরজা গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। কয়েক দিন পর গোপনে আমি আমার পরিত্যক্ত বাসভবন এবং ডিসপেনসারী দেখতে আসি। লালমনিরহাট শহরের পথিমধ্যে আমি অবাঙ্গালীদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দেখতে পাই। আমার বাসভবনে ঢোকার কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানায় যে অবাঙ্গালীদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দেখতে পাই। আমার বাসভবনে ঢোকার কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানায় যে অবাঙ্গালীরা আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। এ খবর পেয়ে আমি পূর্বদিক দিয়ে দ্রুত বের হই। অবাঙ্গালীরা খোঁজ নিয়ে আমার পিছু নিয়েছিল। ৭ই জুলাই আমি যখন আমার পূর্বদরজা গ্রাম বাসভবনে কার্যরত ছিলাম, তখন বহু হানাদার সৈন্য বিভিন্ন দলবদ্ধভাবে তিন দিক থেকে আমার বাসভবন ঘিরে আসছে দেখতে পাই। হানাদার বাহিনী স্থানীয় অবাঙ্গালীদের নিয়ে বাড়ী ঘিরে ফেলে এবং লুটতরাজ শুরু করে। যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী তারা নিয়ে নেয়। ইত্যবসরে অপর একটি দল এসে পড়ে। উক্ত দলে লারমনিরহাট থানার জনৈক জমিদার ছিল। এই জমিদারটি জানায় যে, আমি কেন এখনও গ্রেফতার হইনি এবং আমাকে পাকিস্তানী পতাকা প্রজ্বলন এবং আওয়ামী লীগের একজন লীডার বলে অভিযুক্ত করে। হানাদার সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরে ফেলে এবং কিল, থাপ্পড়, ঘুষি, লাথি প্রভৃতি দ্বারা অবর্ণনীয় দৈহিক পীড়ন শুরু করে। অবাঙ্গলী চরেরা আমাকে গৃহ থেকে দুটি ভারতীয় তৈরী ঔষধ বের করে আনে। সেতুর কাছে অপর একদল সৈন্যের নিকট নিয়ে আসে। এখান থেকে লালমনিরহাটে ফোন করা হয়। কিছুক্ষণ পর দুটি কামরাসহ একটি রেল ইঞ্জিন সেখানে এলে হানাদার বাহিনীর কতিপয় লোক আমাকে লালমনিরহাটে নিয়ে আসে। এখান থেকে আমার চোখ বেঁধে এরোড্রাম ঘাঁটির নিকট হানাদার বাহিনীর ঘাঁটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে শুরু হয় আমার উপর দৈহিক নির্যাতন। এখানে আরো বহু লোককে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ঘাঁটিতে ১৪ দিন বন্দি জীবনযাপন করি। এই সময় আমাকে দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার, মাঠের কাজ, কঠোর পরিশ্রমমূলক কাজ ইত্যাদি করিয়ে নেয়া হতো। তা ছাড়া চড়, কিল, ঘুষি, লাথি প্রভৃতি অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

এরপর আমাকে স্থানীয় রেলওয়ে ট্রেনিং স্কুলে আনা হয়। সেখানে কয়েকটি হাজত কামরায় আরো ধৃত বাঙ্গালীদের দেখতে পাই। এখানেও আমাকে দৈহিক পীড়ন এবং কায়িক পরিশ্রমশীল কার্যে নিয়োগ করা হয়। এখানে অবস্থানকালে আমি দেখতে পাই বিভিন্ন স্থান থেকে নিরপরাধ বাঙ্গালীদের ধরে আনা হতো। বিহারীরা এদের উপর নানা প্রকার অশ্লীল মন্তব্য করতো। কখনো কখনো বিহারীরা ধৃত বাঙ্গালীদের উপর মিথ্যা অভিযোগ আনতো। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীদের ধরে নিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনী হত্যা করতো। এভাবে গণহত্যা ছিল নিত্যদিনের অতি সাধারণ ঘটনা।

স্বাক্ষর/-
ডাঃ আব্দুল করিম আহমদ

\ ৮৭ \

মোঃ লুৎফর রহমান
গ্রাম- মুন্সিপাড়া
থানা ও জেলা- দিনাজপুর

জুলাই মাসের প্রথম দিকে ভারত হতে ফিরে আসার পরে লিলি সিনেমা হলের সামনে রাত্র ৮টার সময় ২ জন অবাঙ্গালী আবার আমাকে আটক করে। তারা বলে যে, তুমি মুক্তিযোদ্ধা, তোমার কাছে বোমা আছে, তুমি কতজন অবাঙ্গালীকে মেরেছ ইত্যাদি। তারা আমাকে মারতে মারতে তদানীন্তন সার্কিট তাউসে নিয়ে যায় এবং খান সেনাদের হাতে তুলে দেয়। খান সেনারা আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি কাজ কর? তার উত্তরে বলি যে আমি 'পটকা' আতসবাজী তৈরী করি। আমার উত্তরে খান সেনারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে যে, পটকা কেয়া চিজ হ্যায়? উত্তরে আমি বলি যে, পটকা বিয়ের অনুষ্ঠানে ফুটানো হয় আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য। কিন্তু খান সেনারা বলে যে তোম জুট বলতা হ্যায়, তোম 'বোম' বানাতা হ্যায়। এই বলে তারা ভীষণ মারধর আরম্ভ করে এবং সিগারেট খেয়ে জ্বলন্ত সিগারেট আমার শরীরে চেপে ধরে। ঐ সময় ছোট চাকুর আমার হাতের তালুর উপর ঢুকিয়ে দেয়। হাত পিছনে বাঁধা অবস্থায় একটা অন্ধকার কক্ষে বন্দি করে রাখে। এ অবস্থায় দুই দিন আটক রাখে। দ্বিতীয় দিনে আমাকে কিছু রুটি খেতে দেয়।

তৃতীয় দিনে আমাকে কোমরে রশি বেঁধে জেলখানায় নিয়ে আসে। আসার সময় তারা কিল, ঘুষি, লাথি, যে, যা পারে মারতে থাকে। জেলখানায় আসার পর আমাকে দুই হাতে রশি বেঁধে একটা ভিমের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়। এই সময় আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখ হয়। ঝুলানো অবস্থায় হান্টার ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রহার করতে থাকে। প্রহার করার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুক্তিযোদ্ধা কাহা হ্যাঁ, হাম লোক তোমাকে বোম দেগা তোম যাকে উলোকো মার ছাকেগা। উত্তরে বলি যে আমি যেতে পারব না। এতে আমার শাস্তি আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। মারধর করার পরে আমাকে জেলখানাতেই বন্দি করে রাখে।

বলা প্রয়োজন যে, এই সময় একজন খান সেনা রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার মুখে আঘাত করে। ফলে আমার সামনের চারটা দাঁত ভেঙ্গে যায়। এই সময় আমার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এই অবস্থায় আমাকে চার মাস জেলে আটক রাখে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি জেল হতে বের হয়ে আসি।

স্বাক্ষর/-
লুৎফর রহমান

\ ৮৮ \

নুর মোহাম্মদ
দিনাজপুর কারাগারের সিপাই

সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগদানের জন্য পাক সরকার যখন নির্দেশ দেয়, তখন আমি দারুন আর্থিক কষ্টের মধ্যে অজো পাড়াগাঁয়ে অবস্থান করেছিলাম। পেটের দায় বড় দায়। কাজেই উপায়ন্তর না দেখে আমি কাজে যোগদানের জন্য শহরে আসি এবং অন্যান্য সহকারীরা যোগদান করেছে কিনা দেখার জন্য জেলখানার সামনের গেট দিয়ে আসবার চেষ্টা করি। কিন্তু সেখানে কারো পোষাক পরিহিত পাঞ্জাবী পশু ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট পদলেহী অবাঙ্গালীরা পাহারা দিচ্ছিল। সাহসে না কুলানোর জন্য আমি পেছনের অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে ঢুকবার চেষ্ট করি। আর সে সময়ই জনৈক অবাঙ্গালী জেল হেড ওয়ার্ডার হানিফ খান আমাকে ধরে ফেলে জেল গেটে নিয়ে এসে হাত বেঁধে অমানুষিকভাবে হৃদয়হীন পদ্ধতিতে প্রহার শুরু করে। কিল, ঘুষি ও বুট দিয়ে লাথি মারে। প্রহারের চোটে আমি যখন অত্যন্ত কাতর হই, তখন আমাকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। যাবার পথে আমাকে সমানে প্রহার করা হয়। রাস্তার মাঝে আমার নাক ও মুখ জুড়ে এমন এক ঘুষি মারে যাতে আমার নাক ফেটে দরবিগলিত ধারায় রক্তপাত শুরু হয়। সে অবস্থায় আমাকে যখন থানায় নেয়া হয় তখন ঐ পশুরা আমি তখনও পান চিবোচ্ছি বলে রহস্য করে এবং প্রহার করতে থাকে। সেখানে ঘন্টা খানেক ঐরূপে বিরতিহীনভাবে মারধর করার পর আমাকে ক্যান্টনমেন্টে খান সেনাদের হাতে সোপর্দ করে।

ক্যান্টনমেন্টে নেবার পর জেলখানর অবাঙ্গালী সিপাই যারা মুক্তিফৌজের হাতে নিহত হয়েছে, তাদের পরিবারে মহিলারা জবানবন্দি দেয় যে "ইয়ে শালা সতরা-আঠারো আওরতকো বেওয়া কিয়া। ইয়ে হামারা শওহরকো মারা, হামারা ভাইকো মারা।"

এ বক্তব্য শোনার পর পাক সৈন্যরা আমার উপর অমানুষিকভাবে প্রহার শুরু করে। আমাকে কেটে লবণ লাগিয়ে আস্তে আস্তে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। তারা আমাকে নিয়ে ফুটবল খেলার মত বেশ কিছুক্ষণ খেলাও করে। এ সময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। অত্যাচারের এ পদ্ধতিতে তারা যখন তুষ্ট হয়ে যায়, তারপর আমাকে মেজর কামরুজ্জামানের নিকট নিয়ে যায়। সে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং বলে যে তুমি কতজন বিহারী মেরেছ? নেতিবাচক উত্তর দিলে আমার বাঁধন খুলে দিতে বলে এবং আমাকে, একজন ডাক্তার ও আর এক ব্যক্তিকে জীপে তুলে নিয়ে মেজর নিজে গাড়ি চালিয়ে জেলখানায় আসে। আমাকে আলাদা রুমে বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেয়। সেখানে দু মাস বন্দি থাকার পর একদিন চা খাবার নাম করে বাইরে এসে পালিয়ে যাই।

স্বাক্ষর/-
নূর মোহাম্মদ

\ ৮৯ \

মঈনুদ্দিন আহমদ
গ্রাম- আবদুলপুর
থানা- চিরিরবন্দর
জেলা-দিনাজপুর

১৪ই আগষ্ট তারিখে আমি যখন দিনাজপুরে গিয়েছিলাম তখন মাহরাজা স্কুলের সামনে খান সেনাদের ক্যাম্পের কাছে রাস্তায় আমাকে গ্রেফতার করে। প্রথমে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করে। সেখানে বেদম প্রহার করে। রাইফেলের নল ও গাদা দিয়ে, বেত দিয়ে অমানুষিকভাবে অত্যাচার করে। অত্যাচারের নির্মমতায় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। উল্লিখিত পদ্ধতিতে আমাকে বহুক্ষণ ধরে অত্যাচার করে। এ সময় শরীরের বিভিন্ন স্থানে রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতাতে থাকে। রাইফেলের বাঁটের আঘাত আমার মুখের ডান দিকের দুটি দাঁত ভেঙ্গে দেয়। অত্যাচারের পর আমাকে ক্যাম্পের অদূরে জঙ্গলে গুলি করে হত্যা করবার জন্য নিয়ে যায়। জনৈক বাঙ্গলী ইপিআর সে সময় সক্রিয় সহযোগিতা করে গুলির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে। ক্যাম্পে সারা দিন সারা রাত অনাহারে রাখার পর আমার সাথের সমস্ত টাকা-পয়সা ও পায়ের জুতা কেড়ে নিয়ে পরদিন কোতায়ালিতে স্থানান্তরিত করে। পরে সেখান থেকে ছেড়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অবঙ্গালীরা মাঝে মাঝে গাড়ি করে বিভিন্ন এলাকায় যেত এবং গাড়ি থামিয়ে লুটপাট করত, মানুষ হত্যা করত, মেয়েদের উপর পাশবিকভাবে নির্যাতন করত এবং তাদের প্রভু খান সেনাদের জন্য উপঢৌকন হিসেবে ধরে নিয়ে যেত। তারা মেয়েদের উপর প্রথমে অত্যাচার করত, তারপর তার গুপ্তঙ্গের ভিতর রাইপেল-বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দিত। এক একটি মেয়ের উপর ৭-৮ জন অত্যাচার করত। অত্যাচারের পর নির্যাতিতা মহিলাদের বহুজন এমনি মারা যেত। তারা প্রকাশ্যেই এ অত্যাচার করত।

রাস্তার পথিকদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যেত এবং সেখানে নির্দয় অত্যাচার করত এবং গুলি করে হত্যা করত। ঝোপ-ঝাড়ে কাকেও দেখলে সেখানেই গুলি করে হত্যা করত। তারা খাসী-মুরগী-হাঁস-গরু ধরে নিয়ে যেত, ভাল ভাল কাপড়-গয়নাগাটি নিয়ে যেত।

স্বাক্ষর/-
মঈনুদ্দিন আহমদ

\ ৯০ \

মো: আছির উদ্দিন মুন্সী
গ্রাম - চিরিরবন্দর মাজাপাড়া
থানা-চিরিবন্দর, জেলা - দিনাজপুর

বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে খান সেনারা চিরিবন্দরে ক্যাম্প করে। এখানে ক্যাম্পকরার পর স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রাণের ভয়ে কতক ভারতে ও কতক গ্রাম থেকে গ্রামঞ্চলে চলে যায়। এই সময়ে আমি স্ত্রী-পুত্রদের সংগে নিয়ে দুই মাইল দূরে আমার শ্বশুরবাড়ী বালুপাড়ায় চলে যাই। আমি একদিন বালুপাড়া সন্নিকটে মরা নদীর ব্রীজের কাছে এক দিকে চিরিরবন্দর হতে অপর দিকে পার্বতীপুর হতে এই দুই দিক হতে দুটি পাক সৈন্য বোঝাই গাড়ি এসে থামে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উক্ত ব্রীজটি এর পূর্বেই ইপিআর বাহিনী ভেংগে দেয়। উক্ত বালুপাড়া গ্রামের ২১- ২২ জন লোক ঐ গাড়ি দুটিতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট আঁছে ভেবে তাদের অভিনন্দন জানানোর জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু নিকটে যাবার সংগে সংগে চারদিকে হতে খান সেনারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে। উক্ত ২০- ২১ জনকে পরে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হত্যা করে এবং লাশগুলি কাঁকড়া নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এই ঘটনার ৩-৪ দিন পরে বালুপাড়া গ্রামটি খান সেনারা তিন দিক হতে ঘিরে ফেলে। খান সেনাদের উপস্থিত সম্পর্কে গ্রামবাসীরা পূর্বেই টের পেয়েছিল। এবং তারা আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। ফলে খান সেনারা সেদিন গ্রাম থেকে কাউকে ও ধরতে পারে না। এদিকে গ্রামবাসীরা তাদের আর উক্তগ্রামে থাকা উচিত নয় ভেবে অন্যএ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং খান সেনারা গ্রাম হতে চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা তাদের পোটলা-পুটলি আনার জন্য রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করে। আমি উক্ত বালুপাড়া গ্রামে হতে আমার নানাশ্বশুরের বাড়ী দুর্গপুর (২ মাইল) যাওয়ার জন্য তৈরী হই। এবং শেষ রাত্রের দিকে রওনা দেই। এদিকে খান সেনারা বালুপাড়া গ্রাম ও দর্গাপুর গ্রামের মাঝখানে ঐ রাত্রের অন্ধকার মিশন স্কুল পজিশন নেয়। আমি ও আমার ভাই গরু বাছুর নিয়ে যখন মিশন স্কুলের নিকটে পৌছাই তখন হঠাৎ করে ১৮ জন খান সেনা ও ৪ জন অবাঙ্গালী রাজাকার আমাদের দুজনকে ঘিরে ফেলে এবং একজন আমাকে লক্ষ্য করে এক রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। কিন্তু খোদা মেহেরবান গুলি আমাদের দুজনের একজনকে ও না লেগে আমাদের সংগে আনা একটি গরুর পায়ে বিদ্ধ হয়।

পূর্ব হতেই আর ও দুজন দাড়িওয়ালা মুরুববী গোছের লোককে উক্ত স্কুলের সামনে বেঁধে রেখেছে। খান একজন আমাকে বলে যে,'' ইয়ে মৌলভী সাব আপ কাঁহা যাতে হেঁ। জবাবে আমি যে গরু বাছুর নিয়ে জমিনে কাজ করতে যাচ্ছি। খান সেনারা পুনরায় বলে যে,' তোম ইণ্ডিয়ামে বাগ যাতে হেঁ'' জবাবে বলি যে, না ভাই আমি ইণ্ডিয়া যাচ্ছি না। আমি জমিনে কাজ করতে যাচ্ছি। খান সেনারা পুনরায় আমাকে প্রশ্ন করে যে,'' ইয়ে মৌলভী সাব আপ ছাচ্ছা বাত বলেগা তো আপকো হাম ছোড় দেগা, আপ বলিয়ে আওয়ামী লীগকা পার্টি কাঁহা, স্কুল কলেজ কাঁহা, ছাত্র কাঁহা, মালাউন কাঁহ।'' উত্তরে আমি বলি যে, যারা আওয়ামী লীগ, ছাত্র এবং মালাউন সাবাই ভারতে পালিয়ে গেছে। যারা এখানে আছে তারা সকলেই খাঁটি পাকিস্তানী। এই সময় খান সেনাদের সাথী অবাঙ্গালী রাজাকাররা আমাকে বাংলায় বলে যে'' আপনি ভয় পাবেন না আমরা ভারতীয় সৈন্য। এখানে বিহারীরা আসবার চেষ্টা করেছে। তাদের বাধা দেওয়ার আমরা এখানে পজিশন নিয়েছি।''

আমি সরলমনে এটা বিশ্বাস করি এবং বলি যে ''ভাই আমি থাকব না আমাকে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।'' উত্তরে রাজাকাররা আমাকে আশ্বাস দেয় এবং বলে যে আপনি কোন চিন্তা করবেন না, সে ব্যবস্থ আমরা করছি

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করি যে, পূর্বেই আনা সেই দুজন মুরুববী লোককে খান সেনারা চতুর্দিক হতে ফুটবলের মত লাথি মারছে। এভাবে মারার পর লোক দুটিকে আমার কাছে নিয়ে আসে। এবং আমার কাছ হতে গরু বান্ধারশি নিয়ে উক্ত মুরুববী দুজনকে মজবুত করে বাঁধে। অত:পর আমাকেসহ ৪জনকে কিছু দূরে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন আর্মি লোকদের কাছ থেকে জানতে চান যে, ধৃত ব্যক্তিরা কারা। জবাবে তারা বাঙ্গালী জানতে পারলে উল্লিখিত দুই বৃদ্ধাকে প্রহারের নির্দেশ দেয় এবং তাদের উপর হৃদয়হীন নির্যাতন চলতে থাকে। নির্যাতন চলা অবস্থায় উক্ত ক্যাপ্টেন তাদের জয় বাংলা বলার নির্দেশ দেয়। তারা তা না বলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বললে তাদের উপর আরও প্রবলভাবে অত্যাচার করে। এই সময় আমাকে জয বাংলা বলতে বলা হয। আমি তা বলি, ক্যাপ্টেন আমাকে বলে ‘‘ঠিক হায় মৌলভী সাব আপকো হাম ইণ্ডিয়া ভি লিয়ে যায়েগো।‘‘

অত:পর ৪জনকেই পূর্ব দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে। এবং একটি খালের কাছে গিয়ে থেমে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এ সময় একটি বেয়নেট দিয়ে উক্ত বৃদ্ধদুটির শরীরের সমস্ত কাপড় কেটে উলঙ্গ করে। এবং তাদের তলপেটে থাপড়িয়ে বলে ‘‘বাঙ্গালী আদমী খাড়া হায়, আওর ভুঢ়িনে তেল লাগাতা হায়।’’

এরপর ঐ দুজনকে গুলি করে। একজন একটু মাথা আছড়াতে থাকলে তার মাথা লক্ষ্য করে আবার গুলি করে। ফলে তার মাথার মগজ ছিটকে চলে যায়। এ সময় দক্ষিণ দিক থেকে দুজন গাড়োয়ানকে গাড়িসহ ধরে আনে এবং আমার কাছ থেকে ‘‘মোলভী সাব হামকো একটা রশি দিজিয়ে আপ’’ বলে রশি চেয়ে নেয় এবং তাদের হাত বাঁধে। অত:পর তাদের একজনকে যে ৩০-৩৫ বছর বয়সের যুবক ছিলেন তাকে মারতে থাকে। মারের চোটে সে জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে তাকে জোর করে তুলে ধরে উলঙ্গ করে এবং তার গুহ্যদ্বারে নড়ি ঢুকিয়ে দেয়। এ পদ্ধতিতে কিছুক্ষণ অত্যাচার চালাবার পর তার হাত বেঁধে গাড়ির পিছনে বেঁধে দেয় এবং অপর ব্যক্তিকে জোরে গাড়ি হাঁকাবার নির্দেশ দেয়। এ সময় তারা আমাকে বলে ‘‘মোলভী সব আপ চালিয়ে ইণ্ডিয়া।’’ রেল লাইনে সকলে আসা শুরু করে। রাস্তার মাঝ থেকে বেশ কয়েকটি খাসী ধরে গাড়িতে তুলে নেয়। মরা নদীর ভাঙ্গা ব্রীজের কাছে এসে জনৈক খান আমাকে তার কাছে ডেকে বসায় এবং জিজ্ঞাসা করে ‘‘মৌলভী সাব, আপ সাচ সাচ বাতলাইয়ে আওয়ামীলীগ পাটিকো লোগ কাঁহা, স্কুল কো ছাত্রা কাঁহা, আওর মালাউন কাঁহা।’’ উত্তরে আমি জানাই যে ‘‘সব ইণ্ডিয়ামে চল গিয়ে, কোই আদমী নেহি হ্যায়।’’ জোভি হ্যায় ওভি পাকিস্তান কো নাগরিক হ্যায়। এতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে। এ সময় আমাকে একটি সিগারেট খেতে দেয় এবং উক্ত প্রশ্ন গুলি আবার জিজ্ঞাসা করে।

অত:পর ইণ্ডিয়ায় পৌছে দেবার নাম করে আমাকে, সঙ্গীত ও গাড়ির দুজনকে এবং গাড়ির গরু দুটিসহ ক্যাম্পের দিকে আসতে থাকে। ক্যাম্পের নিকট ব্রীজের কাছে এসে হুইলের দিলে ৫০-৬০ জন খান সেনা সেখানে যায়। তারপর সকলে ষ্টেশনে আসে। ষ্টেশনে পরিচিত জনৈক অবাঙ্গালীকে দেখে আমি সুপারিশের জন্য খানদের অনুরোধ জানাই।

সেখান থেকে ধৃত সকলকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। গাড়োয়ান দুজনকে একটি আলাদা কুঠুরিতে বন্দিকরে রাখে। এবং আমাদের ব্রীজে যে সিপাই জিজ্ঞাসা করেছিল তার ঘরে বসতে দেয়। এবং চা খেতে দেয়, সিগারেট খেতে দেয়।

কুঠরিতে বন্দি দুজনকে পাশাবিকভাবে মারা শুরু করে। উলঙ্গ অবস্থায় লাঠি, রড, রাইফেলের গাদা দিয়ে পর্যায়ক্রমে হাত বদল করে পিটাতে থাকে এবং পরিশেষে তাদেরকে ফুটবলের মত লাথি মারতে থাকে। বেলা ৪টার দিকে লোক দুটিকে ছেড়ে দেয়।

অত:পর আমাদের দুজনকে ঐ ঘরে ঢুকায়। সেখানে একজন গুলিবিদ্ধ ভীষণভাবে আহত লোক হাত বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। সন্ধ্যার সময় ঐ আহত লোককে ঘর থেকে বের করে পশ্চিম দিকে পুকুরের ধারে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। আমি এ দৃশ্য উক্ত ঘরের জানালা খুলে দেখেছি।

এশার নামাজের জন্য অজু করে আসছিলাম, তখন ক্যাম্প ইনচার্জ আমার পড়ার খবর শুনে কেরাআত পাঠ শুনতে চায়। আমি তিন ঘন্টা ধরে কোরআন পাঠ করে শুনিয়ে সন্তুষ্ট করি এবং পরদিন বিকাল চারটায় আমাকে মুক্তি দেয়।

স্বাক্ষর /-
মো:আছির উদ্দিন মুন্সী

\ ৯১ \

মো: সোলায়মান গণি
গ্রাম - নান্দারাই
থানা - চিরিরবন্দর
জেলা-দিনাজপুর

১৯৭১ সনের ১১ই রজমান রোজ রবিবার বেলা ১১-৩০ মিনিট খান সেনারা ও রাজাকাররা আমাকে গৃহ থেকে গ্রেপতার করে। শান্তি কমিটির সদস্যদের ইচ্ছায় আমার হাতে পিছনে দড়ি বেঁধে রাজাকার, খান সেনাও শান্তি কমিটির সদস্যরা মিছিল সহযোগে থানায় নিয়ে যায়। রাস্তায় মধ্যে রাইফেলের গাদা ও হাত দিয়ে বেদম প্রহর করে। প্রহরের সময় তারা বেয়নেট দেখাচ্ছেল এবং উল্লাস করছিল। ৪মাইল রাস্তা তারা বিরামহীমভাবে উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রহর করছিল। আনার সময় আমার চোখ-মুখে চুন কালি মেখে কিম্ভুতকিমাকার চেহারায় রুপান্তরিত করে এবং শরীরের সমস্ত জায়গায় ছাপ দিতে থাকে।

এখানে বলা প্রয়োজন, ওরা আমাকে গ্রেফতার করা ছাড়া ও আমার বাড়ীঘর সমস্ত লুটপাট করে এবং সবশেষে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সমস্ত বাড়ী ভস্মীভূত করে দেয়। আমার আপরাধ, আমি আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ট কর্মী ছিলাম এবং অসহযোগে আন্দোলনের সময় বিশেষ কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেছিলাম।

থানার নেবার পর পা উপরে দিকে তুলে লটকিয়ে লোহার রড দিয়ে মারতে থাকে। এর সাথে কিল,ঘুষি ও লাথি সামনে চলতে থাকে। এ অবস্থায় ৪-৫ ঘণ্টা টাঙ্গিয়ে রেখে ও উলিখিত পদ্ধতিতে অত্যাচার করতে থাকে। চার রাথি থানার ছিলাম এবং অনুরুপ ভাবে অত্যাচার করে। রোজার দিন হওয়া সত্ত্বেও তারা সেহেরী অথবা এফতারের জন্য কোন খাবার দেয়নি। ঐ ক, দিন না খেয়েই রোজা থাকতে হয়েছে। বহুবার তাদের কাছ থেকে পানি চাওয়া হয়েছিল, তবু ও তারা দেয়নি।

চতুর্থ দিনের দিনে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দেয়।

স্বাক্ষর/-
মো: সোলায়মান

\ ৯২ \

মো: হাবিল উদ্দিন আনছারী
গ্রাম- পালপাড়া
ডাকঘর -বাংলাহিলি
থানা - হাকিমপুর
জেলা- দিনাজপুর

২২শে এপ্রিল পাক বাহিনী হিলি বাজার দখল করে নেয়। হিলি দখল করার পর চারদিকে অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপক হারে গণহত্যা চালিয়ে যায়।

২৩ শে এপ্রিল পাক বাহিনী ও বিহারীর আমাদের পালপাড়া আক্রমণ করে তারা বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে নিরীহ জনসাধারণকে ধরে নির্বিচারে মারধর করতে থাকে। এই সময় তারা ৭ জন লোককে হত্যাকরে। এইসব লোককে প্রথমে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, পরে গুলি করে হত্যা করে। আমি এবং আরও একজন গুরুতররুপে আহত হই।আমার সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। বহু লোককে এই সময় দেখতে পাই পাঞ্জাবীরা কিল, ঘুষি এবং ফুটবলের মত ‘‘কিক’’ করছে এবং নানারুপ অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। এই সময় ৩ জন ছেলে ঘরের ছাদের উপর উঠে আশ্রয় নিয়ে ছিল। তারা ৪ দিন পর্যন্ত ঐ ছাদের উপর বসে থাকে। কোনরুপ নড়াচড়া বা খাবার-দাবার নাই। ৫দিন পর আমাদের এখানে থেকে তাদের ক্যাম্প তুলে নিল তারা মাটিতে নেমে আসে।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাণকৃষ্ণপুর (চার) গ্রাম বাহিনী চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলে সমস্ত পুরুষ লোকদেরকে বেছে এক লাইন করে এবং অকথ্য নির্যাতনের পর ১৪৯ জনকে লাইন করে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করে। তাদের বাড়ীঘর লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। গ্রাম থেকে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় এবং অনেককে সবার সামনেই ধর্ষণ করে।

স্বাক্ষর/-
মো: হাবিল উদ্দিন আনছারী
৮/১১/৭৩

\ ৯৩ \

রফিকুল ইসলাম
গ্রাম - সোনাপুর
থানা - পার্বতীপুর
জেলা- দিনাজপুর

২৫ শে মার্চের পর দিনাজপুর যখন ইপিআর কর্তৃত্বে ছিল সে সময় আমি ইপিআর বাহিনীদের গাড়ি করে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতাম। আর এ অপরাধের জন্য আমাকে এপ্রিলের ৬ তারিখের পাক হানাদাররা দিনাজপুর শহর থেকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানার পাশের জঙ্গলে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য, আমাকে সেখানে হত্যা করা হবে।আমাকে ঐ খানে নিয়ে গেয়েছিল কয়েকজন সামরিক লোকজন কতিপয় অবাঙ্গালী দালাল। সেখানে আমাকে জবাই করার জন্য ছোরা বের করে। ঠিক সে সময় শেষবারের মত পানি পান করার সুযোগ দেয়ার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ জানাই।অনুরোধের তাদের মধ্যের একজন দয়াপরবশ হয়ে আমাকে পানি পান করে আসার অনুমতি দেয়।থানার প্রাচীরের পাশের টিউবওয়েল পানি পান করি এবং বাঁচার শেষ অবলম্বন হিসাবে তাদের বোঝার আগেই প্রাচীর টপকে অপর দিকে চযোই। সেখানেও খান সেনারা ছিল। তারা আমাকে পুনরায গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।সেখানে আমাকে বেদমভাবে হুইপিং করা হয় এবং মুক্তিফৌজ কোথায় , 'সুন্দরবন' গাড়ীটি কোথায়, কতজন বিহারীকে হত্যা করেছ ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিছুক্ষণ হুইপ সহ্য করার পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।জ্ঞান ফেরার পর ঐ দিন বিকালে আমাকে আবার জিজ্ঞসা বাদ শুরু করে। সে সময় কিছুসংখ্যক অবাঙ্গালী মেয়ে থানার এসে জবানবন্দি দেয় যে আমি তার স্বামী, ভাই, অথবা বাবাকে হত্যা করেছি। ফলে পুনরায় আমার উপর প্রহর শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে আমি পানি পান করতে চাই। তখন আমাকে প্রস্রাব খেতে দেওয়া হয়।

রাত বারটায় আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। অত:পর আমাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওসির কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে জনৈক মেজরসহ একজন ক্যাপ্টেন ও ডিএসপি ছিল। সেখানে আমার নামধাম ও আত্মীয়স্বজনের খবরাখবর আদায় করে নেওয়া হয়। সেখানে অবশ্য আরও ছয়জন আসামি ছিলেন। এরপর অফিসাররা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কিছু বলাকহার পর উল্লিখিত ছ'জন কে পেছনে হাত ও চোখ বেঁধে জীপ উঠিয়ে নিরুদ্দেশেল পথে নিয়ে যায়। এরপর আবার আমাকে বন্দিশালার বন্দি করে রাখে। এ অবস্থায় আমাকে থানার আমাকে থানার রেখে দুবেলা জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রহর করত। প্রথম সাত দিন আমাকে কিছুই খেতে দেয়নি। পানি চাইলে প্রসাব দিত। কয়েক দিন পর সামান্য পানি পান করতে দিত। তাও কর্তৃপক্ষের অগোচরে।

তেরদিন পর বেলা দশটায় জনৈক পাঞ্জাবী হাবিলদার এসে আমাকে দিনাজপুর কুঠিবাড়ী ক্যান্টনমেন্টে হাত পিছনে ও চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাবার পর আমার দু'পায়ে এবং দু'হাতে কড়া বেঁধে হাত পা ফাঁক করে টানা দেয়। টানা দেওয়া অবস্থায় সিনার উপর বুট দিয়ে এবং কতজন লোককে মেরেছি ও গাড়ী কোথায় আছে তা জানতে চায়। দু'ঘন্টা এ অবস্থায় রেখে অত্যাচার করেছে। এর ফলে আমার নাকমুখ দিয়ে রক্ত উঠে; আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।

ক্যান্টনমেন্টে নির্যাতন পর্ব শেষ হলে আমাকে পুনর্বার সন্ধ্যার দিকে থানায় পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পাঠায়। সারারাত বন্দী অবস্থায় রেখে পরদিন বেলা এগারটার দিকে অন্য ছ'জনের সাথে আমাকে কোর্টে নিয়ে যায়।র্কোট থেকে আমাকে জেল খানার স্থানান্তরিত করা হয়

দু'দিন পর জেল খানার ভিতর একজন ক্যাপ্টেন কয়েকজন অনুচরসহ যায়। সে সময় খাবার খেতে বসেছিলাম। না খেয়েই আমি এবং অপর একজন তার কাছে চলে যাই। সেখানে আবার একই কথাগলি জিজ্ঞাসা

করে। সন্তোষজনক উওর না পেয়ে আমাকে দ'ঘণ্টা করে গাছে উল্টো দিকে করে লটকাবার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ মোতাবেক আমাকে পা উপরে এবং মাথা নীচে করে লটকিয়ে দেওয়া হয়। ঐ অবস্থায় ওরা খুব পাশবিক উল্লাস করেছে, হাসাহাসি করেছে। শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার গুতো দিয়ে মশকরা করেছে। দু'ঘণ্টা পর অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে নামানো হয়।

পরদিন আবার জনৈক অফিসার এসে ডেকে চেম্বারে নিয়ে যায়। সেখানে এক বন্ধ ঘরে উলঙ্গ অবস্থায় পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং পুরুষাঙ্গে দুটো ইট বেঁধে দেয়। ঐ ইটের উপর আবার পানি ঢালা হয়েছিল। সামান্য নড়াচড়া করলে লাথি ঘুষি ও বেত প্রহার করত। এ প্রক্রিয়ায় আমাকে দেড় থেকে ২ঘণ্টা রাখা হয়। অবস্থায় আরও দু'জনকে এদিন শাস্তি দেয়।

এর দু'দিন পর রাত তিনটার সময় পাঁচজন সামরিক লোক এসে আমাকে সহ ২১ জনকে ডাকে। গেটে আসার পর সকালের হাত বাঁধা হয় এবং কালো কাপড় দিয়ে চোখ কান কষে বাঁধা হয়। অত:পর আমাদেরকে ট্রাকে করে কোথাও নিয়ে গিয়ে নামানো হয়।অবস্থা দৃষ্টে স্থানটিকে নরম মনে হয়েছে। দ'একটি ঘাস অথবা ছোট ঘাস জন্মেছিল। সেখানোনার পর এক একজনকে সারি থেকে খুলে নিয়ে যেতে থাকে। নিয়ে যাবার পর শুধু খাশী গরু জবাই করলে যেমন শব্দ হয় তেমনি করুন ও হৃদয়বিদারী শব্দ শোনা যেত।তারপর হাত-পা আছড়ানোর মত শব্দ কিছুটা কানে ভেসে আসত। এমনি করে ১৯জনকে সারি থেকে যাবার পর আমাকেসহ আর একজনকে জেল খানার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেখানে চোখ ও হাত খুলে দেয় এবং সেখানেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে: দলে কে কে আছে তাদের নাম বল এবং 'সুন্দর বন' গাড়ী কোথায় আছে বল? সন্তোষজনক উওর না পেয়ে মাথার চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে প্রাচীর সাথে আঘাত করতে থাকে এবাং বুট দিয়ে২/৩টি লাথি বুকে মারে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরলে আমি মুখে রক্ত দেখতে পাই। ডাক্তার এসে আমাকে ঔষধাদি খাওয়ানোর পর পুনরায় হাজত খানার পুরে রাখে ।আমার সাথে জনৈক মেকানিক সিরাজ মিয়াকে ধরে অনুরুপভাবে অত্যাচার করে। হাত-পায়ে পেরেক মেরে পাছার মাংস কেটে কুকুরকে দিয়েছে।সে অবশ্য এখনো জীবনমৃত অবস্থায় বেঁচে আছে। জেলখানার ভিতর তিনজন যুবতী মেয়েকে দেখেছি। তাদের করুন কান্না ও চিৎকার ধ্বনি শুনছি।

এ অবস্থায় ৭ মাস তিনদিন থাকার পর ১৬ ই ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় মুক্তি বাহিনীর জোয়ানরা জেলখানার তালা ভেঙ্গে আমাকেসহ সকল বন্দীকে ছেড়ে দেয়। বর্তমানে পঙ্গু অবস্থায় আছি। আমি কোন রকম কাজ করতে পারি না।

স্বাক্ষর /-
রফিকুল ইসলাম

\ ৯৪ \

হাসিনা বেগম
প্রযত্নে: আফছার আলী খান
গ্রাম- সাধুপাড়া, থানা ও জেলা- পাবনা

২৮ শে মার্চ ৭১ আমার স্বামী তখন বাড়ীতে। বেলা ১১/১২টায় একটি পাক সেনাদের গাড়ী এসে থামে, জোর করে তারা বাড়ীতে ঢুকে স্বামীকে যেতে বলে। তখন উনি মটরসাইকেল পরিস্কর করছিলেন। লুঙ্গি পরা অবস্থায় মটরসাইকেল নিয়ে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই খবর পেলাম চাঁচড়ার মোড়ে আমার স্বামীকে গুলিকরে মেরেছে। লাশ আনতে গেলে পায় না, মটরসাইকেল ও তারা নিয়ে যায়। তারপর বাসায় থাকা নিরাপদ মনে করলাম না। আমার দুটি ছেলে নিয়ে পথে নামি। যশোর থানা, ইত্যাদি থানাতে তখন কাজে নামি। কাজ শুরু করি মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে।

আমার আব্বা ডি,এস,পি, ছিলেন। সেই বরাত দিয়ে উপরিউক্ত থানাগুলিতে গেছি। পরিচয় দিয়েছি, থেকেছি এবং সেখানে থেকে থানার বর্তমান ফোর্স কত, অস্ত্র কত ইত্যাদি খবর আমি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পরিবেশন করতাম। তারপর মুক্তিবাহিনী ঐসব থানাগুলিতে অপরেশন চালাতো। এতে করে কাজ এগিয়ে চলছিলো। আমি বিভিন্ন থানা ঘুরে ঘুরে কাজ করতে থাকি, সাফল্য ও বেশ আসে। আমার দটি বাচ্চা নিয়ে ঐভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছিলাম। আমি তখন শৈলকুপা থানাতে আছি এক বাড়ীতে। লোকজন কেউ নেই আমি একাই ছিলাম বাচ্চা দুটি নিয়ে। চারদিকের ঘরবাড়ী সব বিধ্বস্ত শূন্য নি:সঙ্গ ভৌতিক একটি অবস্থা।

ভাদ্র মাস (তারিখ মনে নেই)। তখন বেলা ১০/১১টার দিকে ভাত রান্না করছিলাম। হঠাৎ করে ২জন পাক সেনা এবং ৪জন রাজাকার এসে আমাকে থানাতে যেতে বলে। তারপর জোর করে ছোট বাচ্চাটিসহ থানায় নিয়ে যায়। অপর বাচ্চাটি পাক সেনা দেখে পালিয়ে যায়। থানাতে নিয়ে গিয়ে মারধোর শুরু করে। থানাতে তখন বহু পাক সেনা এবং রাজাকার ভর্তি ছিল। তখন অন্য পাঁচটি ছেলেকে ধরে এনেছিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে না। ডানাতে এবং মাজাতে দড়ি বেঁধে শৈলকূপা ব্রীজের পানিতে ডুবিয়ে রাখে ১৪/১৫ঘণ্টা। এ অবস্থায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। তার পরদিন পানি থেকে তুলে থানার মাঠে ফেলে রাখে। আমার তখন নড়বার মত অবস্থা ছিল না। ঐ ভাবে আছি। একজন রাজাকার এসে ‘এখনো মরেনি’ বলে উপর লাথি মারে। আমার জ্ঞান ছিল না। দারোগার বারবার অনুরোধে আমার প্রাণ ভিক্ষা দেয়। আমার চিকিৎসা করায় ক্রমশ: আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমার সেই পুরাতন বাড়ীতে ফিরে আসি।

সাক্ষর /-
হাসিনা বেগম
২৫/৭/৭৩

\ ৯৫ \

নাজির উদ্দিন মিঞা
গ্রাম - নাজিরপুর
থানা ও জেলা - পাবনা

শান্তি কমিটির লোকদের কুমন্ত্রণা ও সরবরাহকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানী সৈন্যরা উল্লেখিত গ্রামটি অপারেশন করে। প্রায় ২০০/২৫০ পাক সৈন্য ও রাজাকার আল বদর ভোরের দিকে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে আরও দুবার ঐ একই গ্রাম মিলিটারীরা অপারেশন করে।

লোকজন ঘুমিয়ে ছিল। এ জন্য তাদের অধিকাংশ লোকই এই ঘেরাও জানতে পারেনি। তাই পাক সৈন্যরা প্রথমে গ্রামের লোকদের ধরা শুরু করে। তারা লোকজন ধরে তাদের মধ্য থেকে যারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান অর্থাৎ যাদের তারা মুক্তি বাহিনীর লোক বলে সন্দহ করেছে তাদেরকে আলাদা করে। অত:পর তাদের একটি নালার নিকট নিয়ে যায় এবং গলা কেটে উক্ত নালার মধ্যে ফেলে দেয়। এছাড়া বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়েও হত্যা করে। অবশ্য কিছু লোককে গুলি করেও হত্যা করে। এমনি করে তারা সেদিন ৫৭জন লোককে হত্যা করে।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও ছিলাম। কিন্তু আমার চেহারা রোগা হওয়ায় আমাকে বৃদ্ধ ও অপছন্দ লোকদের সারিতে রাখে। আমি পাক সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ নিজের চোখেই সংঘটিত হতে দেখেছি।

পাক সৈন্যরাঅপর একটি দল এই সময বাড়ীঘর লুটপাট করে।প্রায় ৫০০ ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ পোড়া বাড়ীগুলির মধ্যে পূর্বে পোড়া বাড়ীগুলির মধ্যে পূর্বে পোড়া বাড়ীগুলির মধ্যে পূর্বে পোড়া বাড়ীও ছিল। পূর্বের পোড়া বাড়ী যেগুলি মেরামত করেছিল সেগুলিও আবার পুড়িয়ে দেয়।

তারা বহু সংখ্যক মহিলার উপর হৃদয়হীনভাবে নির্যাতন চালায়। এই নির্যাতনের শিকার পরিণত হয় ছেলেমেয়ের মা, সদ্য বিবাহিতা এবং কুমারী মেয়েরা। একাদিক পাক সৈন্য কারো উপর অত্যাচার করেছে বলে শোনা গেছে।

পাক সৈন্যরা ফেরার পথে গ্রাম লুট করে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী ধরে নিয়ে যায়।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরই দেশ স্বাধীন হয়।

স্বাক্ষর /-
নাজির উদ্দিন

\ ৯৬ \

আবদুল হামিদ
গ্রাম - নাজির পুর
থানা ও জেলা- পাবনা

৪ঠা রমজান ভোর রাতে ১২৫ জনের মত পাক সৈন্য ও রাজাকার আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলে। শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের খবর দিয়েছেন যে মুক্তি বাহীনীর লোক ঐ গ্রামে থাকে এবং গ্রামবাসীরা তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। শান্তি কমিটির লোকদের দেখিয়ে দেওয়া বাড়ী ঘর প্রথমে লুটপাট করে। তারপর আগুন লাগিয়ে অন্যূন ৮/৯ টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

এ সময় দজন লোক বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।মিলিটারীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি করে। ফলে তারা দুজনই মারা যায়। গ্রাম থেকে অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে গরু, ছাগল, মুরগী ধরে নেয় তাদের উদর পুর্তির জন্য।

এই অপারেশনে আমি ধৃত হই।তারা আমাকে মুক্তিবাহিনীর লোক সনে হে গ্রেফতার করে। ধরার পর প্রথম পর্যায়ে আমাকে চড়, থাপ্পড়, কিল, ঘুষি এবং লাথি মেরে প্রহর করতে থাকে। তারপর তারা আমার দ'হাত পিছনে বেঁধে তাদের সাথে করে সার্কিট হাউস ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমি মুক্তিবাহিনী কি না? আমি কত জনকে হত্যা করেছি এবং আমার দলে কতজন আছে? আমার সেই সমস্ত সঙ্গীরা কোথায় আছে এবং আমার অস্ত্রশস্ত্র কোথায় আছে তা জানিয়ে চায়। আমি মুক্তিবাহিনীর লোক নই এবং তাদের কোন খবর জানিনা বললে আমার উপর শাররিক নির্যাতন শুরু করে। বেতের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকে।পর্যায়ক্রমে ২/৩ জনে আমকে মারে। এর সাথে চড়, ঘুষি, লাথি তো আছেই।

কিছুক্ষণ পর পর ৩/৪ ঘণ্টা এমনিভাবে আমার উপর অত্যাচার চলে। অত্যাতার চলার সময় আমার হাত পিছন দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। অত্যাচার চালানোর পর আমাকে একটি ঘরে তিন দিন বন্দ করে রাখে। অত্যাচারের এক পর্যায়ে আমি একবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

বন্দী অবস্থায় তারা আমাকে রুটী এবং লাবড়া জাথীয় তরকারী খেতে দিত। প্রসাব পায়খানার সময় তারা আমাকে কড়া পাহারা দিত।

তিনদিন পর আমার আত্মীয় স্বজন টাকার বিনিময়ে শান্তি কমেটির দ্বারা আমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসে।

স্বক্ষর /-
আবদুল হামিদ

\ ৯৭ \

মো: হাসেম আলী তালুকদার
গ্রাম - রামচন্দ্রপুর
থানা ও জেলা - পাবনা

১৯৭১ সালের রমজান মাসের প্রথম দিকে পাবনা শহর থেকে বহু খান সেনারা এসে গ্রাম ঘেরাও করে রাত্রির অন্ধকারে। আমার বাড়ীতে আমি ও আমার রুগ্ন স্ত্রী ছাড়া কেউ ছিল না। খান সেনারা আমাকে গিয়া ডেকে ঘর থেকে বার করে। ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুইজনকে বেদম প্রহর করে আর বলে ''তুই মুক্তিবাহিনীকে খেতে দিস বল তারা কোথায়''। সেই সঙ্গে আরো আমাদের গ্রামের লোককে ঘরে নিয়ে ক্যাম্পে আসে এবং সেখানে কয়েক জনকে হত্যাও করে। স্ত্রীর পরিস্থিতি কি তা আর জানতে পারি নাই। ক্যাম্পে নিয়ে এসে আমকে এবং অন্যান্য জায়গার ৫ জনকে এক ঘরে রাখলো। দৈনিক সকাল দুপুর ও বিকাল এবং ১১/১২ টার দিকে দুই থেকে তিনজন এসে পরপর ঘর থেকে একজন পরে বার করে নিয়ে যেত এবং নানা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের খুশীতে কাউকে মারতে আবার কাউকে না মেরেই ঘরে রেখে যেত।

আমাদের কয়েকজন কড়া পাহারাদার ছিল। রোজ তারা রাখতে দিত না বলতো রোজ আবার কি জিনিস। দৈনিক দুইবার করে আমাদের ৬জনকে একই জায়গায় কাপড়ে অথবা পাকা মেঝের উপর খাবার দিত। পুরাতন রেশন চাউলের ভাত আর খেসারী কলাইয়ের ডাল। গন্ধে আমরা কেউ খেতে পারতাম না। প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ধরে আনতো এবং রাত্রি বেলা তাদের ক্যান্টমেন্ট থেকে কিছু দূরে শব্দ শুনা যেত। অনেক চেনামুখ আর দেখতে পেতাম না। ১৪দিন আমাকে তারা প্রহর করার পর ১৫ দিনের দিন তাদের অফিসার সহ ৫জন এসে ঘর থেকে আমকে বার করে নিয়ে যায় এবং আমাকে মুক্তবাহিনী সম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কোন সন্ধান না পাওয়ার মোটা রশি নিয়ে এসে আমার দুই হাত গাছের দুই ডালের সাথে এবং দুই পায়ে রশি লাগিয়ে মাটিতে খুঁটি পুঁতে ভীষণ প্রহর করে। তাদের প্রহর অজ্ঞান হলে তারা কি করেছে জানি না। তবে যখন আমার জ্ঞান হয় তখন দেখি আমার হাতের ও বাম উরুর চামড়া ছিলিয়ে আছে। ১৭ দিনের দিনগত রাতে আনুমানিক ২টার আমার ঘরের ও পাশ্বের ঘরে হতে ২৪/২৫ জনকে তাদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু দূর নিয়ে যায়। সবাই লাইন করে এক সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার গায়ে গুলি লাগে না তবু ও মরার মত পড়ে যাই। খান সেনারা চলে গেল প্রায ভোরের দিকে কোন রকমে এক লোকের বাড়ী আশ্রয় নেই এবং সেখান থেকে আমার আত্মীয়কে খবর দিই নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। তখন সে মারা গিয়েছিল।

স্বাক্ষর /-
হাসেম আলী তালুকদর

\ ৯৮ \

মোসাম্মৎ মনোয়রা খাতুন
গ্রাম- সলঙ্গ মধ্যপাড়া ভরমহনী
থানা - রায়গঞ্জ
জেলা - পাবনা

১৯৭১ সালের ভাদ্রমাসের (১৫ তারিখ) মুসলীম লীগের অন্যতম দালাল দূরবতী তারাশ থানার ক্যাম্প থেকে একদল পাকিস্তনী খান সেনাদের সলঙ্গা বাজারে ক্যাম্প অপারেশন করার জন্য গোপন চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। ঠিক ঐ তারিখেই আরও ২০/২৫ জন খান কুকুরেরা লাহড়ী মোহনপুর থেকে স্পীড বোট যোগে সলঙ্গা বাজারের দিকে চলে অসে। সলঙ্গা বাজারে এসে তারা বাজারের চর্তুদিকে প্রদক্ষিণ করে। কোন রকম দুষকৃতকারীকে না পেয়ে তারা আপন ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হয়।যাওযার পথে পাক সৈন্য আমাদের বাড়ীতে ঢুকেই আমাকে ও আমার শাশ্বড়ীকে দেখতে পায়। ইতিপূবেই আমার স্বামী জীবনের ভয়ে বাড়ী থেকে সরে পড়ে। ফঅখ সৈন্য আমার শাশুড়ীকে উর্দুতে বলে যে, ''ইয়ে বুড়ীমা, তোম জলদী হেঁয়াছে ভাগ যাও।'' বুড়ী জীবনের ভয়ে বাড়ীর বাইরে চলে যায়। আমি তখন পাক ফৌজের হাতের তল দিয়ে দৌড়ে পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নেই।পাক ফৌজ তখন দৌড় দিয়ে সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। আমি তখন উক্ত বাড়ীওয়ালার যুবতী মেয়েকে জড়িয়ে ধরি।পাক ফৌজ তখন উক্ত যুবতী মেয়েকে যুবতী মেয়েকে না ধরে আমাকে জোর করে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আমি তখন বলি যে বাবা তুমি আমার মান হানি কোরোনা, তোমার পায়ে ধরি মিনতি করি। তখন পাক ফৌজ উর্দুতে বলে যে, তমি আমাকে বাবা বোলোনা, আমি তোমার ভাই আর তুমি আমার মায়ের পেটের বোন।এই কথা কয়টি বলে আমার হাত ধরে জোর করে পরবর্তী বাড়ী হারু কবিরাজ পাকের ঘরে ঢুকে পড়ে। তৎপর আমার উপর পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করে। আমার শরীরের উপর অমানুষিক উপায়ে ধর্ষণ ও মর্দন করতে আরম্ভ করে দেয়। আমি তখন অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকি। খান পিশাচ তার বাসনা তৃপ্তি করে অপরাপর খান সেনাদের তাদের কাম বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হুকুম দেয়।এই সংবাদ শুনে খান কুকুরদের আর ও চারজন আমার কাছে এসে পড়ে। আমাকে তারা আরও বলে যে,তোমার স্বামী কোথায়, সে নাকি মুক্তি ফৌজ, সে নাকি লুট করেছে? অবশ্য সব কথা উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে।

তখন আমি বলি যে, না না, সব মিথ্যা, বাবা আমার স্বামী ওসব কিছুই করে নাই বা সে কোন মুক্তি ফৌজ নয়। তখণখান দস্যুরা আমার ঘরে ঢুকে তল্লাশী চালায়। ঘরে ঢুকে কোন রকম লুটের মালপএ তারা দেখতে পায় না। তারা শুধু তামাক ও তামাকের তৈরীর মসলাদি দেখতে পায়। কারণ আমার স্বমী একজন দরিদ্র তামাক ব্যবসায়ী। খান সেনারা আমাকে জানায় যে, তুমি এখানে থাক, আমরা বাইরে থেকে এখনি আসছি। তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে আমি দূরে একটা বাড়ীর দিকে ছুটে যাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে আরও একদল খানসেনা একটি হিন্দু মেয়েকে জোর করে টানাটানি করছে তাদের কামবাসনা মিটানোর জন্য। ঐ দেখে আমি আরও দূরের বাড়ীতে আশ্রয় নেই। এর পরপরই তারা বাজার ছেড়ে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়।

টিপসহি /-
মনোয়ারা খাতুন

\ ৯৯ \

শ্রীমতি সাবিত্রী দেবী
গ্রাম -সোনাপুর
থানা - পার্বতীপুর
জেলা - দিনাজপুর

চৈত্র মাসে সামরেক তৎপরতা শুরু হলে অএ গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্কার করে। এই সময় একদিন পাক বাহিনী ও অবাঙ্গালীদের দল সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর পথে আমাদের গ্রামের সমস্ত বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেয়। প্রাণ ভয়ে যারা পালিয়ে গিছেছিল তারাই শুধু বেঁচেছে কিন্তু যারা সাহসে ভর করে জরুরী আত্মরক্ষার তাগিদে উল্লিখিত বাঙ্কারগুলির মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল তাদের কেউই বেঁচে নেই। ঐ দিন আমাদের পাড়ায় অন্যূন ৭জন পুরুষ এবং মহিলা মারা যান।

এমনি একটি গর্ত ছিল আমাদের বাড়ীতেও। আমি এবং আমার দুই দেবর ও একজন ভাগিনেয়কে নিয়ে সেই গর্তে আত্মগোপন করি। অতি অল্প দূর থেকে খান সেনারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করে। ঐ গুলিতে ঐগর্তের তিন জন মারা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় আমি বেচেঁ গেছি।

টিপসহি /-
সাবিত্রী দেবী

\ ১০০ \

মো: রজব আলী
গ্রাম- সোনাপুকুর
থানা -পার্বতী পুর
জেলা - দিনাজপুর

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে খান সেনারা আমাদের গ্রাম ঘেরাও করে। আমাকে সহ আরও চার জনকে ধরে। খান সেনারা মুক্তি বাহিনীর খোঁজ বাহিনীর খোঁজে এই গওাম এই ঘেরা ও করে। সামরিক বাহিনী ও অবাঙ্গালীদের যৌথভাবে গঠিত এ দলটি আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যে আওয়ামী লীগ নেতা কে এবং কোথায় আমাদের টাকা দাও। সাথে ৪৫টাকা ছিল তা তারা ছিনিয়ে নেয়।

অত:পর ধৃত পাঁচ জনকে আমাদের আঙ্গিনায় প্যারেড করতে নির্দেশ দেয়। এবং ঐ অবস্থায় সামনে থেকে লাইন গুলি করে। চারজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আমার বুকের উপর এবং বা হাতে গুলি লেগে হই এবং ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই।

পশুরা ঐ দিন মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে। গ্রামের বাড়ীঘর লুটপাট করে সম্পদ অপহরণ করতেও তারা কার্পণ্য করেনি।

স্বাক্ষর
মো: রজব আলী

\ ১০১ \

শ্রীমতি পদ্মমণি
গ্রাম- সোনাপুকুর
থানা - পার্বতীপুর
জেলা - দিনাজপুর

চৈত্র মাসের একটি দিনে আমি ভাতিজা সহ বাড়ীর গর্তে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সামরিক পশুরা যখন আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে লোক খুঁজতে খুঁজতে আসছিল তখন আমাদের দেখতে পেয়েই কোন রকম সময়ক্ষেপণ না করে অথবা কোন বাক্য ব্যয় না করেই গুলি করে। পরপর চারটি গুলি করে গর্তের সকলকে হত্যা করে ভাগ্যক্রমে গর্তের আর সকলে মারা গেলেও গুরুতরভাবে আহত হয়ে বেচেঁ গেছি। পরবর্তী সময় অনেক কষ্ট করে ভারতে আশ্রয় নেই এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

টিপসহি/-
শ্রীমতি পদ্মমণি

\ ১০২ \

আক্কাস আলী
গ্রাম- সাধুপাড়া
থানা- পাবনা
জেলা- পাবনা

২৫শে মার্চ রাতে আমি যখন ঘুমাচ্ছি তখন ঐ এলাকার আপামর মানুষ বড় বড় গাছ কেটে, ইট দিয়ে বেরিকেড তৈরি করে। সারা রাত ধরে তারা এই কাজ করে।

পরদিন শুক্রবার ফজরের নামাজ পড়ার জন্য আমি ঘুম থেকে উঠে মসজিদে ফজরের আজান দেই। আজান শেষে আমি যখন সুন্নত নামাজ পড়ছিলাম ঠিক সে সময় ৭ ট্রাক মিলিটারী আসে। তারা আমাকে নামাজ পাঠরত অবস্থায় গ্রেফতার করে। আমি ফরজ নামাজ পড়ার জন্য সময় প্রার্থনা করলেও পাক বর্বররা আমাকে সে সময় দেয়নি। আমাকে গ্রেফতার করে মারধর শুরু করে। তারপর বাইরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। বেরিকেড কারা তৈরি করেছে এবং কোথায়? আমি জানিনা বলে অস্বীকার করলে সৈন্যরা আমার উপর বেতের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি বেদম প্রহর শুরু করে। শরীরের এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে তাদের প্রহরের আঘাত পৌছেনি। মারের চোটে শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে এবং বাম হাত ভেঙ্গে যায়।

মারের চোটে আমি চিৎকার করে এক সময় বলেছিলাম যে আল্লাহ যেনো এর বিচার করেন এবং তা তিনি করবেন। একথা শুনে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। এই সুযোগে আমি আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে আমি দেখতে পাই যে আমাকে গুলি করার জন্য ২/৩ জন সিপাই রাইফেল নিয়ে প্রস্তত হচ্ছে। সুতারাং আমি বিলম্ব না করে প্রতিবেশী জনৈক মহিলার সাহায্য বাড়ীর পিছনে দিকে দিয়ে পালিয়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নেই। এবং তিন মাস বাইরে থেকে আমি আত্মরক্ষা করি।

স্বাক্ষর/-
আক্কাস আলী

\ ১০৩ \

মোছাম্মৎ এসবাহাতুন
গ্রাম- নতুন ভাঙ্গাবাড়ী
থানা ও ডাকঘর- সিরাজগঞ্জ
জেলা-পাবনা

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাক বাহিনী আমার বাবার বাড়ী নতুন ভাঙ্গাবাড়ীতে প্রায় ৫০/৬০ জন অপারেশনে যায়। আমি আমার বাবার বাড়ীতে পাঁচ মাসের একটি ছেলে নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছি। আমার সাথে আরও ৮/১০ জন মহিলা ঘরের মধ্যে বসে গল্প করছে। এমন সময় আমাদের বাড়ীর মধ্যে দুই জন পাক সেনা ঢুকে পড়ে। তারা ঢুকে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য যে মেয়েরা ছিল তারা মিলিটারী দেখে দৌড়াদৌড়ি করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমার কোলে বাচ্চা থাকার জন্য আমি বেরুতে পারি না। পাক সেনারা দুই-দুইজন আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমার বাবা ও ভাই এসে বাধা দিতে চাইলে একজন পাকসেনা তাদের বুকে রাইফেল ধরে রাখে আরা একজন আমাকে ঘরের মধ্যে ধরে ফেলে আমার নিকট হতে আমার পাঁচ মাসের বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। আমার শিশু সন্তান কাঁদতে থাকে। তারপর সে আমার বাবা ও ভাই-এর বুকে রাইফেল ধরে অন্য জন এসে আবার পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। দুইজন মিলে প্রায় এক ঘন্টা আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তারপর তারা চলে যায়। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। তার আধ ঘন্টা পর আমার জ্ঞান ফিরে পাই।

টিপসহি/-
মোছাম্মৎ এসবাহাতুন

\ ১০৪ \

মোছম্মৎ রহিমা খাতুন
গ্রাম- আউনদাউন
ডাকঘর- বাগবাটি
থানা- সিরাজগঞ্জ
জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে একদিন ভোর রাত্রি প্রায় ৫০/৬০ জন পাক সেনা আমার স্বামীর গ্রামে অর্থাৎ আউনদাউন নামক গ্রামে যায়। আমি ৭ মাসের শিশুসহ ঘুমিয়ে আছি। ভোর রাত্রিতে আমার স্বামী মিলিটারীর শব্দ পেয়ে ঘর হতে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। ৭ জন পাক সেনা আমাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং ঘরের দরজায় লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে এবং আমার শিশু সন্তানকে আমার নিকট থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে মাটির সাথে আছাড় দিয়ে হত্যা করে। তারপর আমাকে এক এক করে ৭ জন পাক সেনা পাশবিক অত্যাচার করে। প্রায় ২/৩ ঘন্টা আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করার পার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার আধঘন্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে শুনতে পাই যে আমার তিনজন জাকে পাক সেনারা জোর করে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আর তাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। একই দিনে ঐ গ্রামের প্রায় ১০/১২ জন মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং প্রায় ৭ জন মহিলাকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বেশ কিছু দিন চিকিৎসা হবার পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি।

টিপসহি/-
মোছাম্মৎ রাহিমা খাতুন
১৭/১০/৭৩

\ ১০৫ \

মোঃ নজরুল ইসলাম বুলবুল
গ্রাম- চরনবীপুর
থানা- শাহাজাদপুর
জেলা-পাবনা

২৬শে এপ্রিল পাক বাহিনী বাঘাবাড়ী ঘাঁটি অতিক্রম করে বগুরার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাঘাবাড়ী থেকে বগুড়া যাওয়ার পথে বিরাট সাঁজোয়া বাহিনীর এই দলটি প্রতিরোধের আশঙ্কায় রাস্তার দু'ধারে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগুতে থাকে। ২৬শে এপ্রিল সকাল ৮টার দিকে পাক বাহিনীর একটি দল করতোয়া নদীর পাড়ে গাড়াদহ খেয়াঘাটে তাবু খাটায়। এবং এখান থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে। এদিকে পাক বাহিনীর অপর একটি অগ্রগামী দল উল্লাপাড় ষ্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেন নিয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে যাত্রা করে। পথে ঘাটিনা ব্রীজের কাছে তারা মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মুক্তিবাহিনী ব্রীজের অপর পাড় থেকে গেরিলা কায়দায় গুলি ছুড়তে থাকে। পাক সেনারা মুক্তিবাহিনীর এই অতর্কিত আক্রমণ বুঝতে পারেনি। ফলে যে ক'জন পাক সেনা ব্রীজ ভাল আছে কিনা দেখার জন্য ট্রেন থেকে নিচে নেমেছিল তারা সবাই নিহত হয়। এখানে নিহতের সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ জনের মত জানা গেছে।

এরপর ট্রেনটি উল্লাপাড়া ষ্টেশনে ফিরে যায় এবং বিরাট একটা দল নিয়ে পুনরায় মুক্তিবাহিনীকে আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী তখন সেখানে ছিল না। ফলে আশেপাশের চার পাঁটটি গ্রাম তারা পুড়িয়ে দেয়।

গাড়াদহ খেয়াঘাট থেকে ঘাটিনা ব্রীজের দূরত্ব প্রায় ৫ মাইল। পাক বাহিনী মুক্তিবাহিনীর মোকবেলায় রকেট শেল ছুড়বার জন্য গাড়াদহে আস্তানা গাড়ে। এবং একদিন সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত একটানা রকেট শেল ছুড়তে থাকে। এদিকে আশেপাশের গ্রামের জনসাধারণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে পালাতে থাকে। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন সরে যাওয়ায় লুটপাট যাতে না হয় সেজন্য চরনবীপুর প্রগতি সংঘের সদস্যবৃন্দ গ্রাম পাহারা দিতে থাকে। এসময় তারা গাড়াদহ বাজার লুট করে এবং বাজারের দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়।এই গ্রামের প্রায় এক ডজন (১২) নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর হিন্দু বাড়ী পাক বাহিনী জ্বালিয়ে দেয়। এবং রাস্তার আশেপাশে যাদেরকে পায় তাদের মারধর করে।

এসময় অগ্রবর্তী দলটি উল্লাপাড়া ষ্টেশনে সি, এণ্ড, বি, এর ডাক বাংলোয় তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এইদিন গাড়াদহ থেকে উল্লাপাড়া যাওয়ার দুর্গানগরের কাছে রাস্তার এক বৃদ্ধকে পাক বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। আমাদের চরনবীপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুস সামাদ তার শ্বশুরবাড়ী চড়িয়াতে ছিল। পাক বাহিনী এই গ্রামে ঢুকে গ্রামের প্রায় ৩০ জন লোককে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। আব্দুস সামাদ নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটি পুকুরের মধ্যে নেমে পড়ে এবং মাথা ডুবিয়ে থাকে। তার ছোট ছেলে বাবার খোঁজে পুকুর পাড়ে যায় এবং আব্বা আব্বা বলে ডাকতে থাকে। ঠিক এই সময় একজন পাক সেনা পুকুরের পাড়ে আসে এবং আব্দুস সামাদকে পুকুর থেকে ডাঙ্গায় তুলে। তাকে মুসলমান কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে সে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় এবং পবিত্র কোরআন শরীফ থকে পড়ে শুনায়। এতেও পাক সেনাদের বিশ্বাস হয় না। পরে তাকে অজু করতে বলে। আব্দুস সামাদ যথারিতি অজু করে এবং তার গায়ে রাখা হাজী রুমালটি দিয়ে মাথা ঢাকে ও কালেমা পড়তে থাকে। কিন্তু এতে করেও পাক বাহিনী তাকে রেহাই দেয়নি। এই গ্রামের অন্য ত্রিশ জনের (৩০) সাথে তাকেও লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে।

সাক্ষর /-
নজরুল ইসলাম বুলবুল
৮/৫/৭৪

\ ১০৬ \

সামছুজ্জোহা আলমাজী
শাহজাদপুর
পাবনা

১৯৭১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ৬/৭ জন রাজাকার আমাকে দিভার রোডে ধরে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এবং আমাকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমার দুই হাত একত্রিত করে বাঁধে। তাপর রাজাকার কমাণ্ডার মজিবর রহমান আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার কাছে কয়টা রাইফেল আছে? কয়টা গ্রেনেড আছে ও কয়টা হাত বোমা আছে এবং তুমি মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করো। এবং তাদের কাছে আমাদের গোপন খবরা খবর পাঠিয়ে দাও। আমি তার জবাবে উত্তর করি আমার কাছে দুইটা বন্দুক আছে তা আমার নিজস্ব এবং তার মধ্যে একটা থানায় জমা দেওয়া হয়েছে আর অন্যটা আমাদের বাসায় আছে। তারপর দুইজন রাজাকার এসে আমাকে কিল চড় ঘুষি মারতে থাকে। বেশ আধা ঘন্টা শারীরিক নির্যাতন চারানোর পর আমাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে দুইজন রাজাকার লাঠি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রহার করে। তারপর সন্ধ্যা হয়ে আসাতে তারা প্রহার করা বাদ দিয়ে উক্ত ঘরের মধ্যে একটা জানালার শিকের সাথে বেঁধে রেখে ঘরে একটা বাতি জ্বেলে রেখে যায়। তার ১০/১৫ মিনিট পর একজন রাজাকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই বাতি নিভিয়ে দিয়ে যায়। তার ৫/৭ মিনিট পর এক এক করে ৪/৫ জন রাজাকার আমার উপর চড়, কিল, ঘুষি, লাথি ও লাঠি দিয়ে প্রহার করার পর তারা চলে যায়। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার আধা ঘন্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে পাই। পরদিন সকাল বেলা পাক সেনাদের দুটি গাড়ী রাজাকার ক্যাম্পে এসে পৌঁছে। এসেই আমাদেরকে হাত বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে পাক সেনারা রাজাকারদের সাথে আমাকে নিয়ে হাসি রহস্য করে। তারপর রাজাকার কমাণ্ডারের সাথে আলাপ-আলোচনা করার পর তাদের গাড়ীতে করে আমাকে ও আরও একজনকে উল্লাপাড়া নিয়ে যাবার সময় রাস্তায় পাক সেনারা কিল, ঘুষি, চড় লাথি মারে। কিন্তু হাবিলদারের আমার প্রতি কঠোর দৃষ্টি থাকার জন্য আমাকে বিশেষ প্রহার করার সুযোগ সুবিধা পায় না। আমাকে উল্লাপাড়া নিয়ে গিয়ে একটা রুমের মধ্যে নিয়ে বন্দী অবস্থায় রেখে দেয়। রাত্রিতে ২/৩ জন পাক সেনা আমার নিকট যায় এবং লাথির পর লাথি দেবার পর আমাকে মেঝেতে শুইয়ে পাক সেনারা বুট পায়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে উঠে পাড়াতে থাকে। এইভাবে ৪/৫ জন পাক সেনা আমার শরীরের উপর উঠলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর কখন যে তারা আমার উপর নির্যাতন করা বাদ দিয়েছে তা আর আমার স্মরণ নেই। রাত্রি দুইটার সময় আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পাই যে কোন লোক রুমের মধ্যে নেই। পর দিন সকালে হাবিলদার আমার সাথে দেখা করে।আমি তাকে আমার নির্যাতনের ঘটনার কথা খুলে বলি। তারপর সে ক্যাম্পেনকে সাথে করে আমার রুমে আসে এবং আমার শরীরে শত শত প্রহারের দাগ দেখে তার সিপাহীদেরকে শাসিয়ে দেয় এবং আমার উপর যেন কোন অত্যাচার বা নির্যাতন না করা হয় তাও বলে দেয়। তারপর ক্যাপ্টেন নির্দেশে একজন ডাক্তার ঔষধ পাতি নিয়ে আমার রুমে ঢোকেন এবং আমার শরীর পরীক্ষা করার পর কয়েকটা এনজেকশান দিয়ে ও কিছু মালিশ দিয়ে যান। তারপর আমি ঐগুলি ব্যবহার করতে থাকি। তারপর হতে আমার উপর শারীরিক কোন নির্যাতন করা হয় না। তিন দিনের দিন একজন হাবিলদার আমার নিকট যায় এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনার নিকট রাইফেল নাই, গ্রেনেড নাই, তার জবাবে আমি না বলাতে সে চলে যায়। তার কিছু দিন পর আমাকে বন্দীশালা হতে বের করে বাইরে নিয়ে যায়। সেই দিন শাহজাদপুর হতে একজন লোককে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন খালেক আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, বাবলু এই লোকটাকে

তুমি চেনো? আমি উত্তর করি না। তারপর আমাকে আমার বন্দী ঘরের মধ্যে নিয়ে রেখে দেয়। আর আমার সাথে যে লোকটা বন্দী ছিল তাকে বের করে বাইরে রাখে।

১৩ই সেপ্টেম্বর কয়েকজন পাক সেনা বন্দী ঘর হতে বের করে নিয়ে যায় এবং আমাকে বলে তোমাকে ক্যাপ্টেন ডাকে। আমি তাদের সাথে যাই। গিয়ে দেখি সেখানে ক্যাপ্টেন, রাজাকার কমাণ্ডার ও হাবিলদার বসে আছে। আমি সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে কেঁদে ফেলি। ক্যাপ্টেন আমাকে ধমক দিয়ে বলে যে তুমি পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদ আযম জিন্দাবাদ ইত্যাদি জোরে জোরে বল। আমি উক্ত কথা বলাতে ক্যাপ্টেন আমাকে মুক্তি দেয়। এবং আমার একটা আংটি তার নিকট ছিল তাও দিয়ে দেয়। আমি বাড়ী চলে আসি। আমাকে ধরার প্রধান কারণ ছিল আমি মুক্তি যোদ্ধাদেরকে গোপনে খেতে দিতাম এবং তাদেরকে জায়গা দিতাম এবং পাক সেনা ও রাজাকারদের গোপন সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছে দিতাম। যার ফলে রাজাকাররা আমাকে বন্দী করে এবং নিজেরা নির্যাতন করার পর পাক সেনাদের হাতে তুলে দেয়।

সাক্ষর/-
শামছুজ্জোহা আলমাজী (বাবলু)
শাহজাদপুর
দ্বারিয়াপুর
পাবনা
৪/১২/৭৩

\ ১০৭ \

গোলজার হোসেন
গ্রাম-পূর্ব মহেষপুর
ডাকঘর- দুর্গানগর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ শুরু হলে আমি,ইয়াকুব ও আবু সামা গেনজির ব্যবসা শুরু করে।

আগষ্ট মাসে আমরা গেনজি বিক্রয় করার জন্য উল্লাপাড়া হাটের উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে রওনা হয়ে যাই। উল্লাপাড়া পেট্রোল পাম্পের নিকট পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প ছিল, তারা আমাদেরকে ধরে ফেলে এবং আমাদের অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে। যেমন (ক) ভোট কাকে দিয়েছ? (খ) নৌকায় কেন ভোট দিলে? (গ) শেখ মুজিবকে কেন ভোট দিলে? ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমাদের তিনজনের টাকা পয়সা মিলে প্রায় ১৫০ টাকা চার্জ করে নেয়। সেখানে ৪/৫ জন বিহারী উপস্থিত ছিল। তারপর আমাদের ছেড়ে দিলে আমরা ক্যাম্প পার হয়ে ৯/১০ গজ অতিক্রম করার সাথে সাথে উক্ত বিহারী কয়জন দৌড়িয়ে আমাদের নিকট যায় এবং আমাদেরকে ডেকে নিয়ে উল্লাপাড়া ষ্টেশন ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে বিশ্রামাগারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে এসে আলাপ আলোচনা করে আমাদেরকে মেরে ফেলবে না বাঁচিয়ে রাখবে। আমরা দরজার নিকট এসে তাদের কথাবর্তা সব শুনতে পাই। তারপর সিদ্ধান্ত নেয় আমাদেরকে হত্যা করবে। আমরা তিনজন চিন্তা ভাবনা করি কি করা যায় এখন। এমন সময় দরজা খুলে আবু সামাকে রুম হতে গলায় দড়ি লাগিয়ে বের করে নেয় এবং আমাদেরকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়। তারপর আবু সামার সমস্ত শরীরে বেয়োনেট চার্জ করে পরে গরু জবাই করার মত গলায় ছুরি দিয়ে জবাই করে তাকে হত্যা করে।

তারপর আবার এসে দরজা খোলে এবং ইয়াকুবকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং আমাকে ২/৩ জন ধরে রাখার চেষ্টা করলে আমি মরণপণ স্বীকার করে জোরপূর্বক ৪/৫ টা লাথি মেরে এক দৌড়ে বালসা বাড়ী এসে পড়ে যাই এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। উক্ত গ্রামের তিনজন ছেলে আমার ক্লাসমেট ছিল। তারা আমাকে দেখে সেবা যত্ন করে জ্ঞান ফিরে পেলে আমাকে আমাদের বাড়ী এনে রেখে যায়। ইয়াকুব তাদের হাত হতে মুক্তি পায়নি। তারা ইয়াকুবকে নিয়ে গিয়ে আবু সামার মত একই পদ্ধতিতে হত্যা করি দুইজনকে একই স্থানে ফেলে রাখে এবং আমাদের তিনজনের প্রায় ১৫০/২০০শত টাকার গেনজি তারা নিয়ে যায়।

আমি বাড়ী আসার পর সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। গ্রাম হতে ৪/৫ জন লোক মিলিটারী ক্যাম্পে যায় উক্ত লাশগুলো এনে কবর দেবার অনুমতির জন্য। তারপর একটা ট্রাকে করে উক্ত লাশ দুটো মহেষপুর লাইনে এনে রেখে যায়। গ্রামবাসী সেখান হতে লাশ দুটো তাদের বাড়ীতে নিয়ে আসে। বাড়ী আনার পর আমরা দেখতে পাই আবু সামার ও ইয়াকুবের সমস্ত শরীরে প্রায় শতাধিক বেয়োনেটের চিহ্ন এবং গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করেছে তার চিহ্ন দেখা যায়। তারপর তাদেরকে গ্রামবাসী কবর দেন। আবু সামার স্ত্রী বর্তমানে ৪/৫ জন ছেলে মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছে। আর ইয়াকুব আই, এ, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। আমি ইনশা আল্লাহ পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের হাত হতে কোন প্রকারে রক্ষা পেয়েছিলাম।

সাক্ষর/-
গোলজার হোসেন
২৪/১১/৭৩

\ ১০৮ \

মৌলভী মোঃ বছির উদ্দিন আহমেদ
গ্রাম-বড় মনোহারা
পোষ্ট- দুর্গানগর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

একদিন (জুলাই মাসে) উল্লাপাড়া রেল ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন রাজাকার ও ৭/৮ জন পাক আর্মি আমাকে ধরে ফেলে এবং বলে যে আমি ভণ্ড ধার্মিক, আমি ''মুক্তিকা স্পাই''। আমাকে প্রথমে উল্লাপাড়া মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যায় সেখানে আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কাকে ভোট দিয়েছ কাকে? তার উত্তরে আমি বলি যে ''নৌকায়''। এই সময় আমাকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলার জন্য বলে কিন্তু উত্তর দেইান। তা বলি না। আমার মুখে একই বুলি ছিল যে ''যা হবার তা হয়ে যাবে আল্লাহ'' যোর করে কয়দিন রাখবে আল্লাহ'' ''নৌকা মার্কায় ভোট দিছি আল্লাহ'' ইত্যাদি।

তখন পাক বর্বর বাহিনী আমার হাত পিছনে বেঁধে দুই পা বেঁধে উল্টো করে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়। এবং চাবুক দ্বারা প্রহার করতে থাকে। কিন্তু আমার মুখে ঐ এক কথা।

দুদিন পর আমাকে সিরাজগঞ্জ নিয় যায়। সেখানে আমার দাড়ি-চুল ছোট করে দেওয়া হয়। আমাকে দিয়ে সিমেন্টের বস্তা টানায়। এই সময় আমাকে নামাজ পড়তে দিন না। তারা নিয়মিত ভাবে প্রহার করত, ফলে অমার পিঠে তিনটা বড় রকমের গর্ত হয়ে যায়। আমি ভীষণ ভাবে কাতর হয়ে পড়ি, তবুও আমাকে রেহাই দেওয়া হত না। আমার মুখে চুন ও কালি মেখে রাজাকাররা শহরের মধ্যে ঘুরতো। আমার কপালের উপর খাপড়া রেখে সূয্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখতো। এই সময় আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতো।

১৫ দিন পর একটা মেজর এসে আমাকে বলে যে আমি আপনাকে বহুদিন আগে থেকেই চিনি। আপনি যে একটা ''দরবেশ'' লোক তাও আমি জানি। কিন্তু এরা আপনাকে না জেনে ধরে এনেছে এবং মারধর করেছে। তার জন্য আমি দুঃখিত। আমরা খাঁটি মুসলমানদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করব না। আমরা শুধু কাফের ও হিন্দুকে মারব। এই বলে আমাকে ছেড়ে দেয় ও সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়।

সাক্ষর/-
বছির উদ্দিন আহমদ

\ ১০৯ \

মোঃ ফজলুল করিম তালুকদার
গ্রাম- চর মোহনপুর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

ভাদ্র মাসের ৩রা তারিখে ভোর ৬টার সময় পাক দালালদের সহযোগিতায় নৌকাযোগে চর মোহনপুর গ্রাম ঘেরাও করে। গ্রামের চারিদিকে ঘেরাও করে মোট ১৭ জনকে ধরে। এর মধ্যে একজন ছিল হিন্দু। ১৭ জনকে ধরে প্রথমে লাহিড়ী মোহনপুর ষ্টেশনের ১টা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখে। তারপর ব্রেক গাড়ীতে উঠায়। তারপর তাদেরকে প্রথম প্রশ্ন করে যে তোমরা ভোট দিয়েছো কাকে। তার জবাবে তারা উত্তর দেন যে আমরা সবাই বাঘে ভোট দিয়েছি। তখন তাহারা বলে যে শালারা সবাই বাঘে ভোট দিয়েছো তবে এই এলাকায় বাঘে ৬ ভোট পেলো কি করে। এই বলেই পাক কুকুরেরা রাইফেলের বাঁট দিয়ে ও মাজার বেল্ট দিয়ে মারতে থাকে। পর্যায়ক্রমে দশ/ বারজন মিলিটারী মারধোর করে।

সারা রাত্রি তাদেরকে গাড়ীর ভিতর আটকে রাখে। সকাল বেলা উল্লাপাড়া ক্যান্টনমেন্টে মেজরের সামনে হাজির করে। সেখানে তাদেরকে বলে যে তোমরা মুক্তিযোদ্ধা। তোমরা বিহারীদেরকে মেরেছো ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তাদেরকে প্রহার করতে থাকে। একদিন পর তাদেরকে নিয়ে যায় পাকশী, সেখানে একটা অন্ধকার কক্ষে তাদের সবাইকে আটকিয়ে রাখে। ২দিন পর ১টা রুটি খেতে দেয়। যেখানে তাখা সেখানেই পায়খানা প্রশ্রাব করতে হত। তাদেরকে দুই পা ফাঁক করে এবং দুই হাত ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে রাখতো ৫/৬ ঘন্টা করে। পাকশীতে তারা ৫ দিন থাকে। এই সময় প্রত্যেক দিন তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হত। তাদেরকে প্রশ্ন করত যে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে কে হত্যা করেছে। কার কার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। কে কে আওয়ামী লীগের লিডার, কে কে হিন্দু ইত্যাদি। কিন্তু তারা সে কথা বলতে অস্বীকার করাতে তাদের উপর চালাতো অকথ্য নির্যাতন। ৫ দিন পর ২ জন বিহারী ও একজন খান তার নাম হান্নান খান তাদের সহায়তায় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ২ জন বিহারী ও খান সাহেব পাকশীতে গিয়ে মেজরের কাছে বলে যে এই সব লোক ভাল। এরা আমাদেরকে রক্ষা করেছে। এরা সৎ লোক। এই লোকগুলোকে যদি মারেন তাহলে অমাদের তিনজন অবাঙ্গালীকে আগে মারেন। এদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ছেড়ে দেয়।

তাদের যখন ছেড়ে দেয় তখন বলে দেয় যে তোমরা শান্তি কমিটির সাথে যোগাযোগ রাখ এবং লোকজনকে বুঝাও। যদি তা না কর তবে তোমাদেরকে পুনরায় ধরব এবং সেবার তোমাদেরকে হত্যা করব। চেয়ারম্যানের কথা মত সব কাজ করবে।

সাক্ষর/-
মোঃ ফজলুল করিম তালুকদার

\ ১১০ \

শ্রী তারপদ কুন্ডু
গ্রাম- আগ মোহনপুর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন ভোর ৬টার সময় আগ মোহনপুর গ্রামে পাক বর্বর বাহিনী ঘেরাও করে। তারা প্রথমে লুটতরাজ ও পরে অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় আগ মোহনপুর গ্রাম হতে ৮/৯ জন লোক পাক বাহিনী আটক করে তার মধ্যে আমি ছিলাম একজন। আমার একমাত্র অপরাধ আমি তাদের কথায় ''মালাউন'' আমাকে প্রথমে লাহিড়ী মোহনপুর দুধের মিলের নিকট আর্মি ক্যাম্প ছিল সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে হাত-পা বেঁধে দুপুরে রোদের ভিতর চিৎ করে শুইয়ে রাখে এবং পরে আমাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করে। আমাকে যখন প্রহার করে তখন আমি মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সবাইর ভিতর হতে একজন বর্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে ম্যায় জ্যান্তাহু তোমহারা বড়া বড়া দো লাড়কি হ্যায়। যদি তুমি তাদের এখানে ডেকে আনতে পারো তবে তোমাকে ছেড়ে দেব।

দুইদিন আমাকে এইভাবে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখে। এই দুই দিন আমাকে কিছুই খেতে দেয় নাই। আমি তাদেরকে অনেক অনুনয় বিনয় করেছি যে আমি বৃদ্ধ মানুষ আমাকে এইভাবে কষ্ট দিলে ভগবান নারাজ হবে। তবুও আমাকে খেতে দেয়নাই। দুইদিন পর আমাকে একটা রুটি খেতে দেয়।

তিনদিন পর আমাকে সিরাজগঞ্জ চালান করে দেয়। সিরাজগঞ্জ যাবার পার আমার উপর পর্যায়ক্রমে অমানুষিক অত্যাচার চলতে থাকে। আমার মত বৃদ্ধ মানুষও ঐ পাক বর্বরদের হাত থেকে রেহাই পায় নাই। সিরাজগঞ্জ জেলে থাকা অবস্থায় আমি অনেক লোককে শুধু পিটিয়ে মেরে ফেলতে দেখেছি। চাকু দিয়ে সারা শরীর ফেঁড়ে লবণ লাগিয়ে দিতেও আমি দেখেছি।

দুই মাস আমি জেলে ছিলাম। এই সময় আমাকে যখন তখন পিটাতো। দুই মাস পরে যখন অমি ধীরে ধীরে পীড়িত হয়ে পড়ি তখন আমাকে ছেড়ে দেয়। আমার সারা শরীর এখনও ক্ষতের চিহ্ন বর্তমান।

স্বাক্ষর/-
শ্রী তারাপদ কুন্ডু

\ ১১১ \

মোঃ হাবিবুর রহমান
গ্রাম- মাছিয়াকন্দি
থানা-উল্লাপাড়া, জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখে সকাল বেলা দূরবর্তী ধারগড়া ক্যাম্প থেকে একদল পাকিস্তানী খানসেনা আমার বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। ধারগড়া ক্যাম্পে নিয়ে যাবার সময় বুটের লাথি, রাইফেলের আঘাত এবং অসংখ্য ঘুষি ও চড় মারে। খান সেনাদের ভীষণ আঘাতের ফলে আমি মাটিতে পড়ে যাই। পুনরায় বুটের লাথিতে জীবনের ভয়ে আধমরা অবস্থায় তাদের সাথে ক্যাম্পে যেতে বাধ্য হই। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পুনরায় লোহার রড ও রাইফেল দিয়ে মারপিট করে। খান কুকুরেরা আমাকে এমনভাবে মেরেছিল যে আমার শরীর মাংস ঝলসে যায়। বুকে রাইফেল দিয়ে জোরে আঘাত করার ফলে আমার বুকের হাড়খানা সম্পূর্ণরূপে ভেংগে যায়। প্রথম দিনে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পর একবারই ভীষনভাবে মারপিট করেছিল। পরে সেদিনের মত খান কুকুরেরা আর মারপিট না করে ক্ষান্ত রাখে। পরের দিন অর্থাৎ ২০ তারিখ সকালে আবার ভীষণভাবে দেহের বাঁশ দিয়ে চাপা দিয়ে শরীরের উপর দুইজন খান সেনা উঠে দঁড়িয়ে থাকে। আমার কাছে মুক্তিদের সন্ধান চাইলে আমি অস্বীকার করার দরুন এইরূপ শাস্তি প্রদান করত। উক্ত ক্যাম্পে আমি দুইরাত ছিলাম। এই দুইদিনের ভিতর আমি অনুমান করি যে, ২৫ থেকে ৩০ জন লোক প্রত্যহ ধরে এনে বেয়নেট এবং রাইফেল দিয়ে সারিবদ্ধ অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। খান সেনারা আমাকে বলে যে, তুমি যদি মুক্তিদের সন্ধান না দিতে পারো তাহলে তোমার অবস্থাও এমনি হবে। ২১ তারিখে সকাল বেলায় আমি মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ হাবিবুর রহমান

\ ১১২ \

খন্দকার জিল্লুর রহমান
গ্রাম- রামেরচর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখে মুসলিম লীগের দালালদের চক্রান্তের ফলে ধারগড়া খান সেনাদের ক্যাম্প থেকে ১৭ জন খান সেনা ও ৭/৮ জন রাজাকার রাত্রি ৩টা ৩০ মিঃ সময় আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আমি স্থানীয় সলঙ্গা বাজারে একটি সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলি, তাছাড়া আমার বাড়ীতেই মুক্তিরা গোপনে আস যাওয়া করত এবং আমি সর্বরকমে তাদেরকে সহায়তা করতাম-এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই দালালরা আমার বাড়ীতে খান কুকুরদের লেলিয়ে দেয়। দুর্ভগ্যবশতঃ আমি ঐ রাত্রে নৌকা থেকে বাড়ীর উপর উঠতেই খান দস্যুরা আমাকে ধরে ফেলে। অতঃপর তারা আমাকে কিছুপথ নৌকায় ও অবশিষ্ট রাস্তা পায়ে হাটিয়ে ধারগড়া ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ধরার সাথে সাথে আমার বাড়ী থেকে ২০/২৫ হাজার টাকার সোনার গহনা খান কুকুরেরা নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নেওয়ার পর আমার চোখ-মুখ তোয়ালে দিয়ে বেঁধে মাথার উপর বালতি ভরে ভরে পানি ঢালা আরম্ভ করে। মুখ বেঁধে মাথার উপর পানি ঢাললে মানুষের কি অবস্থা হতে পারে ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই বুঝতে পারে না।

এমতবস্থায় আমি আর নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলাম না, ঠিক ঐ সময় সাহসের উপর ভরসা করে বা জীবন যায় যাবে এই মত করে আমি তোয়ালে মাথা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলি। অতঃপর খান কুকুরেরা আমাকে মোটা একটি বাঁশ দিয়ে পিঠের উপর ভীষণভাবে আঘাত করতে থাকে। তাছাড়া রাইফেল ও বুটের লাথিতে আমার পিঠের চামড়া ছিঁড়ে যায়। পিঠে রক্ত জমে যায়। খান কুকুররা এমনভাবে বুট দিয়ে লাথি মারে যে, ঐ লাথি খেয়েই উপুর হয়ে পড়ে যাই এবং আমার ডান হাতখানি সম্পূর্ণরূপে ভেংগে যায়। এইভাবে আমাকে ভীষণ প্রহার করত। আমি যখন খান দস্যুদের ভীষণ মারপিটের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়তাম তখন কুকুরেরা মারপিট বন্ধ করে দিত।প্রসংগতঃ বলা যেতে পারে যে, আমার সাথে আমার ছোট ভাই তোতাকেও ধরে নিয়ে যায়। এবং তাকেও রাইফেল, বুট ও লোহার রড দিয়ে ভীষণভাবে মারপিট করে। এমন ভাবে তারা মেরেছিল যে, আমার ছোট ভাইটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তার সারা দেহ যখমের দাগ ছিল। খান দস্যুরা আমার ছোট ভাইকে দিয়ে লোহার রডের সাহয্যে আমাকে পিটাত। যখন সে অস্বাীকার করত তখন তাকেও বেদম মারপিট করত। বধ্য হয়ে সে সম্ভবত বড় ভাইকে মারপিট করত। অতঃপর দুই ভাইয়ের নিকট থেকে মুক্তিদের খোঁজ খবর জানার জন্য খানেরা আমাকে নিয়ে পুনরায় সলঙ্গা বাজারের দিকে চলে আসে। সেখানে গোলবার ডাক্তার নামক এক ব্যাক্তিকে ধরে ভীষনভাবে মারপিট করে ছেড়ে দেয়। পরপরই তারা মাছুয়াকান্দি গ্রামে ঢুকে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য। কোনও রকম মুক্তিযোদ্ধাকে না পেয়ে পুনরায় আমাদেরকে ধানগড়া ক্যাম্পে নিয়ে যায়। নেওয়ার পরেও দু'ভাইকে আবার বুটের লাথি দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে দেয়। প্রায় দুই রাত থাকার পর শান্তি কমিটির সদস্য মৌঃ আব্দুল করিম, মৌঃ গোলাম মাহমুদ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় আমি ও ছোট ভাই কোনরকমে প্রাণে বেঁচে বাড়ী চলে যাই। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উপরোক্ত ব্যক্তিরা যদি সহায়তা না করতেন তা হলে কোন ক্রমেই খান দস্যুদের হাত থেকে আমাদের রেহাই হত না।

স্বাক্ষর/-
খোন্দকার জিল্লুর রহমান

\ ১১৩ \

এস এম আফতাব হোসেন
সাব ইন্সপেক্টর টি, এ্যা-, টি
গ্রাম- চর মোহনপুর
পোষ্ট- লাহিড়ী মোহনপুর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

মে মাসের ১৩ তারিখে বেলা ১০ টার সময় আমি বাড়ীতে বসে ছিলাম। এমন সময় পাক বাহিনী ও অবাঙ্গালী মোট ১০০ জন আমার বাড়ী ঘেরাও করে। আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি ডিউটি থেকে পালিয়ে এসেছো কেন? তার উত্তরে বলি যে সবাই কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে আমিও সেই সঙ্গে পালিয়ে এসেছি। এই কথার পরে আমাকে বাড়ী থেকে নিয়ে যায় এবং রেল গাড়ীতে উঠায়। বলা প্রয়োজন যে অবাঙ্গালী ও পাক বাহিনী ট্রেন যোগে মোহনপুর আসে। ট্রেনে তোলার পর আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। কিল, ঘুষি, লাথি, এবং চাবুক মারতে থাকে। তারা আমাকে বলে যে, তুমি রাইফেল ট্রেনিং নিয়েছ, তুমি কর্নেল ওসমানীর আদেশ মোতাবেক ইশ্বরদী বিমানবন্দরে ১১ জন পাইলটকে গুলি করে মেরেছো এবং আরো চারজন অবাঙ্গালীকে ছুরি দিয়ে হত্যা করেছো। এবং তুমি টেলিফোনের সাহয্যে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছো। এই সব কাজের জন্যই তুমি ভয়ে ডিউটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছো। এই সময় কয়েকজন অবাঙ্গালী এই সব কথার উপর সাক্ষ্য প্রদান করে যারা আমরই অধীনস্থ কর্মচারী ছিল।

এই সময় আমকে দিয়ে এই সমস্ত কথা স্বীকার করায় এবং আমাকে দিয়ে এই কথার উপর একটি লিখিত স্বীকারোক্তি আদায় করে দেয়। আমাকে পাবনাতে তিনদিন রাখে। এই সময় আমাকে একটা অন্ধকার কক্ষে বন্ধ করে রাখে এবং সময় সময় বের করে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গাছের সঙ্গে উল্টোভাবে ঝুলিয়ে চাবুক মারত উল্টোভাবে। এখানে তিনদিন রাখার পর আমাকে নাটোর (রাজশাহী) জেলে স্থানান্তর করে। সেখানে ১৪ দিন রাখে। এই সময় আমাকে একই প্রক্রিয়ায় মারধর করে এবং পাক বাহিনীর বাঙ্কার করিয়ে নেয়। এখানে ১৪ দিন রাখার পর আমার নামে একটা চার্জশিট দিয়ে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে প্রথমে এমুনিশন এরিয়াতে রাখে।

এই সময় আমাকে প্রত্যেক দিন ২ ঘন্টা করে কাজ করাত। এই কাজের মধ্যে ছিল মাটি কাটা, ঘাস কাটা, বাঙ্কার কাটা ইত্যাদি। এ ছাড়া যখন তখন যে সে এসে আমাকে ভীষণ ভাবে প্রহার করত। এক একজন আমকে এক এক রকম প্রশ্ন করত। আমাকে বলতো, "তোম লোক বাঙ্গালী হ্যায়, তোম লোক হিন্দু হ্যায়, তোম লোককা সর্দার মজিব ভি হিন্দু হ্যায়, ও হামারা পাছ হ্যায়, থোরি দের বাদ ঘর মে লাকে কাপড়া খোলকে দেখিয়ে।" এই সব কথা বলতো আর আমাকে মারধর করত। আমি দেখেছি যে এই অবস্থায় যদি কেউ মারা যেত তবুও তাকে মৃত অবস্থায় গড়াতে গড়াতে ওয়ালের পাশে নিয়ে যেত এবং উক্ত মৃত ব্যাক্তির লাশ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিত। এই সময় আমাকে এক বেলা খাবার দিত। পায়খানা প্রস্রাবের কোন জায়গা ছিল না যেখানে থাকা সেখানেই খাওয়া ও পায়খানা প্রস্রাব করতে হতো। সকাল বেলায় তা পরিস্কার করে তাতেই ভাত খেতে হতো।

আমার সম্মুখে সিরাজগঞ্জের এসডিও জনাব শামসুদ্দিন সাহেবকে মেরে ফেলা হয়। তাকে মাগরেবের দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর কুকুরেরা পিটিয়ে হত্যা করে।

আমাদের যে ঘরে রেখেছিল সে ঘরে খুব বেশী হলে ২০০/২৫০জন রাখা যায়-সেই ঘরে ৭০০ লোককে রেখেছিল।

সময় সময় ঢাকা থেকে- ক্যাপিটাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে নিয়ে যেত ইন্টারোগেশন করার জন্য। এখানে নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হত যে তোমার উপর যে কেস আছে তা সত্য কিনা। এই সময় একটা ছোট কক্ষে আমার হাত উপরে একটা রডের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দিত। এবং চোখের ৫/৬ ইঞ্চি দূরে দুই চোখের উপর দুইটা ৬০০ পাওয়ারের ইলেক্ট্রিক ভাল্ব জ্বালিয়ে রাখতো, সেই লাইটের দিকে চেয়ে থাকতে হত। এই অবস্থায় কোন কোন সময় চাবুক মারতো।

এইভাবে ৬ মাস আমাকে আটকে রেখেছিল এবং প্রত্যেক দিনই আমাকে মারধর করত। ৬ মাস পরে একদিন আমাকেসহ আর ৬০ জনকে ছেড়ে দেয়। এই সময় তারা বলে যে তোমাদের সবাইকে মাফ করে দেওয়া হ'ল। পুনরায় যেন তোমরা আর ভুল না কর।

স্বাক্ষর/-
এস এম আফতাব হোসেন

\ ১১৪ \

মোঃ লালচাঁদ খান
গ্রাম- চড়িয়া মধ্যপাড়া
ডাকঘর- সলংগা
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালের ২৫শে এপ্রিল পাকবাহিনী অতর্কিত আমাদের গ্রাম অক্রমণ করে। চড়িয়াসিকা সি,এণ্ড,বি রাস্তায় থেকে পাকবাহিনী রকেট শেলিং আরম্ভ করে। চার দল পায়ে হাঁটিয়া আমাদের গ্রামে চলিয়া আসে। তাদের দেখিয়া আমাদের গ্রামবাসী মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়ে। যখন গ্রামবাসী মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল তখন পাকবাহিনী শিকার করার মত গুলি আরম্ভ করিল। আর একদল গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। অনেক লোক জংগলে পলাইয়াছিল, তাহাদের জংগল হইতে বাহির করিয়া এবং অনেক বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লাইন হইতে বলিল। অনেকে প্রাণের ভয়ে লাইন হইতে না চাহিলে তাহাদের গুলি করিয়া হত্যা করে।

১৯৭১ সালে ২৫শে এপ্রিল রোজ রবিবারের এই দিনটিতে পাকবাহিনী অতর্কিত আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে এবং ৫৬ জনকে লাইন করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করে। এই তারিখে আমাদের গ্রামের ১৫০ খানা বাড়ী জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেয়। কোন মহিলার ইজ্জতহানি করে নাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ লালচাঁদ খান

\ ১১৫ \

আব্দুল মজিদ মিয়া
গ্রাম- কওয়াক
ডাকঘর- উল্লাপাড়া
জেলা পাবনা

চাঁদপুরে যখন পাকবাহিনী আসে আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম। চৈত্র মাসের ২২ তারিখে এই ঘটনা ঘটে। আমাকে প্রথমে পাকবাহিনী ধরে চোখ বাঁধিয়া পিছন থেকে বেতের লাঠি দিয়ে বেদমভাবে প্রহার করে এবং আমাকে সঙ্গে করে আমাদের গ্রামের দিকে চলে আসে। আমাকে প্রথমে আমার বাড়ী নিয়ে আসে এবং আমাকে বলে তোর বাড়ী থেকে আমাদের হাঁস, মুরগী দিতে হবে। তখন বলি আমার হাঁস মুরগী নাই। এই কথা বলার সাথে সাথে আমাকে এমন প্রহার করল যে তখন আমার আর কোন জ্ঞান ছিল না, আমি তখন অজ্ঞান হয়ে আমার বাড়ীর মধ্যে পড়ে রইলাম। পাকবাহিনী আমাকে তাদের পাদুকা দ্বারা সমস্ত শরীর খোঁচাতে আরম্ভ করল। এবং এমনভাবে প্রহার করল যে আমার নাক, মুখ দিয়ে রক্ত বার হয়ে আসল। পরে আমার প্রাণের ভিক্ষা চাইলাম এবং বললাম আমার দুইটা খাসী আছে আপনারা আমার খাসী দুইটা নিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে দেন। তখন পাকদস্যু দল আমার দুইটা খাসী নিয়ে আমার বাড়ী থেকে চলে যায়। পাকদস্যু যাওয়ার পর আমার স্ত্রী এসে আমাকে দেখে চিৎকার আরম্ভ করল, চিৎকার শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে আমাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল। আমাকে পাকদস্যু ধরে চৈত্র মাসের ২২ তারিখে সকাল ১০টার সময়।

এ তারিখে আবার বিকাল ৪টার সময় পাকদস্যুর অন্য একদল আমার বাড়ীতে আসে। পাকদস্যুদের আসার পূর্বে আমার স্ত্রী অন্য জায়গায় চলে যায়। পাক বর্বররা এসে আমাকে আবার বলে তোর স্ত্রী কোথায়। এই কথা শুনে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। আবার জ্ঞান যখন ফিরে পাই থখনও দেখি পাকদস্যু আমার বাড়ীর মধ্যে রয়েছে। আমার স্ত্রীকে না পেয়ে আমাকে বাঁশের ফালটা দিয়ে আঘাত আরম্ভ করল। আমি আহত অবস্থায় বললাম আমার স্ত্রী আপনাদের আসা দেখে পালিয়ে অন্য বাড়ীতে গিয়েছে। তখন আমাকে বলল বল বেটা কোন বাড়ীতে গিয়ে হায়। আমি বললাম এইদিকে চলে গিয়েছে। এই কথা বলার সঙ্গে আমার বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে চলে গেল।

চৈত্র মাসের ২৬ তারিখে পাকবাহিনী আমাদের গ্রামে আসে। রাস্তার পার্শ্বে আমার বাড়ী প্রথমে আমার বাড়ীতে পাকদস্যু এসে উঠে। উক্ত তারিখেও আমাকে সেই কথা তোর স্ত্রী-পুত্র কোথায়? আমি জবাব দেই আমার স্ত্রী-পুত্র কেউ নাই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার বেত দ্বারা প্রহার করল এবং পায়ের পাদুকা দ্বারা লাথি মারল। এই লাথি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে থাকি। এইভাবে পাকদস্যু আমাকে দুইবার শারীরিক অত্যাচার করে।

টিপসহি/-
আব্দুল মজিদ মিয়া

\ ১১৬ \

শ্রী রথিকৃষ্ণ সাহা
গ্রাম- ভেংড়ী
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

আমি বাড়ীর সবাইকে নিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিলাম উল্লাপাড়া থেকে ৩ মাইল দূরে ভেংড়ী গ্রামে আমাদের গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারই প্রায় আশ্রয় নিয়েছিল। হারিয়ে গেল আমাদের বাড়ীঘর আর গড়ে তোলা জনসেবা শিবির। মা-বোনদের পল্লীতে রেখে পালিয়ে পালিয়ে উল্লাপাড়া এসে দেখলাম দস্যুরা বাঙ্গালী ভাইদের ধরে নিয়ে লুট করাচ্ছে ইচ্ছামত আবার গুলি করে বাঙ্গালী ভাইদের মারছে। বিকাল চারটার দিকে দেখতে পেলাম উল্লাপাড়ায় আগুনের লেলিহান, মনে হচ্ছে আগুনও যেন ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সমস্ত পাটের গুদাম, কলেজ, স্কুল, বাড়ীঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে শোন যাচ্ছে মানুষের আর্তনাদ। এই আগুনের লেলিহান ৩/৪ দিন উল্লাপাড়া, ঝিকিড়া, ঘোষগাতী, ঘাটিনা, চরঘটিনা ও অন্যান্য গ্রামকে এক এক করে গ্রাস করেছে, গাছপালাগুলো পুড়ে পুড়ে হা করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন হয়েছে যেন উল্লাপাড়াতে একটা পাখী পর্যন্ত দস্যুদের দেখে ভয়ে সবাই পালিয়ে গেছে। এইভাবে ৭ দিন কাটতে না কাটতেই একদল কুচক্রীর দল দস্যুদের পিছু নিয়েছে। তারাও যেন দস্যু হয়ে গেল। ১ মাসের মধ্যে দেখতে পেলাম দস্যুর দল বেশ ভারী হয়ে দানা বেঁধে উঠেছে। আমার বহু বন্ধুদের ধরে নিয়ে নিয়ে পাক দস্যুদের হাতে দিচ্ছে আর দস্যুদল আমার বন্ধুদের একটু একটু করে তিলে তিলে মেরেছে। বঙ্গালী দস্যুদল ওদের নাম দিয়েছিল শান্তি কমিটি, শান্তির নাম নিয়ে কত মা-বোনকে যে ওদের হাতে তুলে দিয়েছে তার হিসাব নাই। এই শান্তি কমিটির নায়ক ছিল কয়েকজন স্থানীয় অবাঙ্গালী ও কয়েকজন বাঙ্গালী।

এইভাবে আমাদের স্মরণীয় দিনগুলি কাটতে লাগলো। ১ মাস, ২ মাস কেটে গেল। স্বাধীন বাংলার খবর শুনি, বুকে একটু বল পাই। জুনের ২৭ তারিখ ভোর ৫ টার সময় দেখতে পেলাম এ্কদল লোক ছুটে আসছে। ভাইরা মন্তব্য করল পাক মিলিটারী হতে পারে? দেখতে না দেখতে ব্যাপরটা ফাঁস হয়ে গেল। সবাই ছুটে পালাতে লাগলাম কিন্তু হায় দেখি ভেংড়ী গ্রামের চারদিক দস্যুদল ও বাঙ্গালী দস্যুদল (শান্তি কমিটি) ঘিরে ফেলেছে। ছুটে গেলাম ব্যবসাইত পাড়ার ভিতর, ছোট জঙ্গলের ভিতর শুয়ে পড়লাম, কিন্তু দেখি আমাদের সুপরিচিত উল্লাপাড়ার কয়েকজন গুণ্ডা আমাকে দেখেই চিনে ফেলল। বলল শালা মালাউন পালিয়েছিস, বেরিয়ে আয়। নিরুপায় হয়ে এসে দেখলাম আমার বাবাকে ধরেছে, ভাইকে ধরেছে, বন্ধু অরুণকে ধরেছে, বন্ধু জীবনকে ধরেছে ও আর ৪ জনকে ধরেছে। দারুণ মার শুরু করে দিল। আমার বৃদ্ধ পিতাকে মারছে, বৃদ্ধ পিতা মার সহ্য করতে না পেরে আমার কোলে এসে আশ্রয় নিল। তখন আমাকে যে কতক্ষণ কি দিয়ে মেরেছে বলতে পারব না। ঘন্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরলে দেখলাম আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র লুট করে এনে জড়ো করেছে এবং দস্যুদল খাওয়া দাওয়া করেছে। দস্যুদল খাওয়া শেষ করে আমাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ১২ মাইল হঁটিয়ে হাঁটিয়ে সলঙ্গা নামক স্থানে নিয়ে গেল। ওখানে দেখতে পেলাম ৭০/৮০ জন পাকদস্যু ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের পেয়ে মনে হয় জীবিত মানুষগুলোকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু দেখলাম আমাদের ট্রাকে তুলে উল্লাপাড়া ষ্টেশন ক্যাম্পে নিয়ে এলো। হাজার হাজার মিলিটারী দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে একজন পাক ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এলো, বললো তোমাদের নাম লিখে দাও এবং একটি পেন ও ১ পিস কাগজ দিয়ে গেল। লিখে দেওয়ার পর আমাদের চারহাত-বাই চারহাত ঘরে রেখে দিল। একনকি দরজায় পর্যন্ত তারকাটা এঁটে দিল। মনে হলো আর কোনদিন দরজা খুলবে না। সারারাত্রি বসে বসে কাটাতে লাগলাম আর শুনতে পেলাম নারী কণ্ঠের আর্তনাদ, বুকফাটা কান্না, চাবুকের সপাং সপাং শব্দ, মদ্যপানের জড়ান জড়ান কথা, শুনে মন ভয়ে

শিউরে উঠল। শুধু মনে হতে লাগল, এরা বেশী দিন টিকতে পারবে না। নারী ধর্ষণে কোন জাতি টিকতে পারে নাই, পারবেও না। এইভাবে সারা রাত্রি কেটে গেল। সকাল ৮ টার সময় দরজা খুলে বের করল আমাকে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। ক্যাপ্টেন বলল জয়দেব কে? আমি বললাম আমার ছোট ভাই। সে কি করে? বি, এ পড়ে। কোন পার্টি করে? আওয়ামী লীগকে ভালবাসে। সে কোথায়? বলতে পারব না। কেন পারবে না? জানি না। এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাপ্টেনের মুখ দিয়ে আগুন ছুটতে থাকলো। বললো যদি বাঁচতে চাও বল জয়দেব কোথায়। কিন্তু আমার একই উত্তর জানি না। নিজে রাগ সামলাতে না পেরে একজন জোয়ানকে ডাক দিল এবং বলল চাবুকে গায়ের চামড়া তুলে ফেলতে। জোয়ন চাবুক মারতে আরম্ভ করে দিল। ওদিকে আমার বাবা চিৎকার করছে, ওকে আর মের না, আমাকে মার। কখন জ্ঞান হারিয়ে গেছে, জানি না। জ্ঞান ফিরে দেখি উল্লাপড়ার এক পরিচিত ঘরে বিচার হচ্ছে। আমার রক্তাক্ত দেহ দেখে কারও দয়া হোলম, কেউ বলল ভাল, কেউ বলল কিছু খারপ, এতে শাস্তি হলো, আবার ১০ বেত। আমার বাবাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিল। ছোট ভাইকে চাবুক মারল, জীবনকে চাবকাতে চাবকাতে গায়ের চামড়া ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল আর আমার সেই সুপ্রিয় বন্ধু অরুণকে গুলি করে হত্যা করল। এদিকে আবার নতুন রাজাকার তৈরী করছে। বিচারে রায় দিয়েছিল উল্লাপাড়ায় থাকতে হবে নইলে গুলি করে মারবে। নজরবন্দী অবস্থায় থাকতে লাগলাম। এখন মনে হচ্ছে কেনই বা ওদের এত জয়দেবকে দরকার। জয়দের আমার ভাই, আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী, উল্লাপাড়াতে যত বড় আওয়ামী লীগের নেতাই আসুক না কেন, জয়দেবকে সবাই চিনতো এবং ভালোবাসতো। সে একদিন বলেছিল আমি হয়তো থাকবো না কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। এতে কোন দ্বিমত নেই। কুচক্রীর দল সাবধান হয়েই থাকে। কিন্তু হায় জয়দেব আজ আর আমাদের সামনে নেই।

ক্ষতবিক্ষত দেহে বাড়ী ফিরলাম। নজরবন্দী আবস্থায় উল্লাপাড়ায় থাকতে লাগলাম। উল্লাপাড়ার দুঃখ দুর্দশা দেখে ঘরে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতাম।

আমি দেখেছি প্রতিদিন পাক সৈন্যরা কোথা থেকে যুবক ধরে এনে মুক্তিবাহিনীর নাম দিয়ে বহু যুবককে গুলি করে মেরেছে। একদিন দেখতে পেলাম একটি যুবককে ধরে এসে আমার বাড়ী পিছনে গুলি করে চলে গেল কিন্তু যুবকটির পেটের পার্শ্বে গুলি লেগেছে। সে শুধু বলছে আমার হাতটা ছেড়ে দাও, আমি বাঁচব, আমি কোন অপরাধ করিনি। যদি বাঁচতে না দাও আর একটা গুলি করে মেরে ফেল, যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু কোন লোক তার কথায় কান দিল না। অবশেষে সন্ধ্যায় যুবকটি অর্তনাদ করতে শুরু করল- একটু পানি দাও, কেউ একটু পানি দাও। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কারণ দস্যুদের পা-চাটা গোলাম রাজাকারদের পাহারায় রেখেছিল যেন যুবকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার পাহারায় থাকে। সন্ধ্যার পর রাজাকারদের বেয়নেটে তার প্রাণ হারায়, তার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ সেই অন্তিম স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে ‘‘মা পানি জন পথ’’।

স্বাক্ষর/-
শ্রী রথিকৃষ্ণ সাহা
উল্লাপাড়া
পাবনা

\ ১১৭ \

ভাগলু ঘোষ
থানা- ঈশ্বরদী
জেলা- পাবনা

১লা বৈশাখ (রবিবার) প্রথম মিলিটারী এখানে আসে। তারা গাড়ীতে করে টহল দিয়ে এ্যারোড্রামে যায়। বিকেল ৬ টার দিকে মিলিটারীরা স্থানীয় বিহারীদের দিয়ে রেলওয়ে ডিপো থেকে কেরোসিন তেল লুট করায়। তারপর তাদের ঈশ্বরদী বাজার নির্দয়ভাবে লুট করায়। লুটপাট করার পর তারা বাজারের অনেকগুলি ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

অপরদিকে লাইনের পশ্চিম পাশে বিহারীদের ছেলেরা হামলা করে এবং লুটপাট করে ও লোক হত্যা করতে থাকে। আমার মহাজন কৃষন শর্মাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। আমার বাসাও লুটপাট করে।

পরদিন সকালে আমি পালিয়ে যাই। বনবাদাড় দিয়ে যাবার পথে আমি দেখতে পাই ৩০/৩৫ জন বাঙ্গালী ও হিন্দুকে বিহারীরা হত্যা করেছে।

আমি আমার বাড়ী লুট হবার পর যখন পালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখতে পাই যে পশ্চিম টেংরা হিন্দু মন্দির ‘‘শিব মন্দির‘‘ বিহারীরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। ভেঙে ফেলে মন্দিরের ভিতরের সমস্ত বিগ্রহগুলি।

টিপসহী/-
ভাগলু ঘোষ

\ ১১৮ \

জয়েন উদ্দিন
গ্রাম- মাঝদিয়া
থানা- ঈশ্বরদী
জেলা- পাবনা

পাক সৈন্যরা ঈশ্বরদীতে তাদের অবস্থান মজবুত করে নেবার পর আশেপাশের এলাকায় অপারেশন করা শুরু করে। এ সময় উল্লিখিত এলাকায় কোন বাঙ্গালী ছিল না। তারা প্রাণ ভয়ে ভারতে এবং অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল। এ খবর সৈন্যরা বিহারীদের মাধ্যমে জানতে পারে। পাক সৈন্যরা আসার পর তাদের সহায়তায় বিহারীরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারাই বাঙ্গালীদের অবস্থানের কথা পাক সৈন্যদের কাছে বলে এবং তাদের অপারেশনের জন্য প্রচোরিত করে।

বিহারীদের প্ররোচনায় এবং তাদের সহযোগিতায় পাক সৈন্যরা এপ্রিলের শেষের দিকে মাঝ দিয়া গ্রাম অপারেশন করে। পাক সৈন্য ও তাদের সহযোগী বিহারীরা গোটা গ্রাম ঘেরাও করে। গ্রাম এমন ভাবে ঘেরাও করে যে গ্রামের প্রায় কেহই পালাতে পারেনি। গ্রাম ঘেরাও করে গ্রামের সমস্ত লোকজন জমা করে। লোকজন ধরার মাঝখানেই সমস্ত গ্রাম লুটপাট করে। বেশ কিছু বাড়ীঘর জ্বালীয়েও দেয়।

ধৃত ৪০০/৪৫০ লোককে তারা হৃদয়হীনভাবে হত্যা করে। তারা ঐ সমস্ত লোককে অধিকাংশ লোক জবাই করে হত্যা করে। তারা একই জায়গায় এবং একই খাট্যার উপর ১১৫ জনকে জবাই করিয়া হত্যা করে। সমস্ত গ্রাম লাশ, লাশ আর লাশে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। যেদিকে চাওয়া যায় শুধু লাশ আর জমাট রক্তের ঢেলা ছাড়া আর কিছু দেখা যেত না।

এই গ্রাম অপারেশনে বহু সংখ্যক রমণীর শ্লীলতাও তারা হানি করে।

স্বাক্ষর/-
জয়েন উদ্দিন

\ ১১৯ \

আব্দুল্লাহ খান
গ্রাম- পুবপাড়া
থানা- ঈশ্বরদী
জেলা- পাবনা

পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির পদলেহী শান্তি কমিটির সহায়তায় পাক সৈন্যরা ২৮শে জুলাই তারিখে আমাকে ঈশ্বরদী থেকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর আমার দুই হাত পিছনে বেঁধে দেয়। মোটা রশি দিয়ে এমন ভাবে এঁটে বাঁধে যে হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাঁধনের অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে থাকে। কিন্তু তখনও বোঝা যায়নি যে এর চেয়েও ভয়াবহ এবং কষ্টকর শাস্তি অপেক্ষা করছে।

গ্রেফতার করার পর আমার উপর নির্দয়ভাবে প্রহার শুরু করে।চড়, লাথি, কিল, ঘুষি এবং রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটান শুরু করে। এ সময় যে সমস্ত অবাঙ্গালী ও শান্তি কমিটির লোক ঐখানে ছিল তারা এ শাস্তি প্রাণ ভরে দেখছিল এবং তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তারা উক্ত শাস্তি বিধান দেখে তৃপ্তি বোধ করছিল। কিছুক্ষণ এমনিভাবে প্রহার করার পর আমাকে জীপে করে পাবনা জেলখানায় নেওয়া হয়। জেলখানার একটি ছোট্ট আলো বাতাসহীন প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখে। জেলখানার উক্ত ঘরে ঢোকার পর তিনজন সামরিক লোক আমার কাছে আসে। তারা এসে আমাকে দেওয়ালের পাশে নিয়ে যায় এবং আমাকে প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে। তারপর ঐ অবস্থায় আমার মাথাকে মাটিতে ঠেকতে বলে। এ সময় আমার পাছা অসম্ভবভাবে টান হয়ে থাকতে হবে বলে তারা নির্দেশ দেয়।

যাহোক, তাদের নির্দেশ মত আমি ঐভাবে পজিশন নিলে ঐ সমস্ত লোকেরা আমার উপর অত্যাচার শুরু করে। প্রথমে আমার ঐ টান পাছার উপর ধান ভানা চাকা যে ফিতায় টানে ঐ ফিতা (সম্ভবতঃ অথবা ঐ জাতীয় মোটা ফিতা) দিয়ে শটাশট প্রহার করতে থাকে। প্রহারের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলে অথবা শরীরকে সোজা বা মোড়া দিতে লাগলে তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিত ও প্রাণনাশের হুমকি দিত এবং ঐ রূপ না করতে বলত।

এই অবস্থায় প্রহার কিছুক্ষণ চলার পর আমি অবসন্ন হয়ে পড়ি। আমি মাটিতে পড়ে যাই। ইতিমধ্যেও যে সৈন্যটি প্রহার করছিল সম্ভবতঃ সেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন মাটিতে পড়ে যাওয়া অবস্থায় একটি সিপাই রুলার দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন জোড়ায় পেটাতে থাকে।পেটানোর যন্ত্রণার চোটে যখন আমি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মুখোমুখি তখন আমাকে সময়িকভাবে প্রহার বন্ধ করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কতজন মিলিটারী মেরেছি, বিহারী মেরেছি, মুক্তিবাহিনীর লোকেরা কোথায় আছে, অস্ত্রশস্ত্র কোথায় রেখেছি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

স্বাভাবিকভাবে আমি সমস্ত কিছু অস্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ফাঁকে ফাঁকে তারা প্রহার করে। প্রহার ও জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ হলে আমাকে পুনর্বার বন্দী করে রাখে।

অনুরূপভাবে আরো কয়েকদিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রত্যেক দিনই আমার উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। প্রত্যেক বারই আমাকে বলা হয়েছে যে আমার সমস্ত খবরই তারা জানে। সুতুরাং আমি স্বীকার না করলে হত্যা করা হবে।

বলা প্রয়োজন, আমি যে ঘরে থাকতাম এ সময়ের মধ্যে সে ঘর থেকে তিনজনকে সন্ধ্যার পর হাত রশি দিয়ে বেঁধে চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে কোথায় যেন নিয়ে যেত। তারা আর কখনো ফিরে আসেনি। সম্ভবতঃ তাদের হত্যা করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিতে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্বাক্ষর
আব্দুল্লাহ খান

\ ১২০ \

দীপক প্রসাদ গুপ্ত
গ্রাম- পশ্চিম টেংরী
থানা- ঈশ্বরদী
জেলা- পাবনা

পাক মিলিটারী এবং অবাঙ্গালীদের অত্যাচারে অত্র এলাকার নারী-পূরুষ, যুবক-যুবতী, শিশুরা দেশ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ভারতে চলে যায়। ১লা বৈশাখ তারিখে পাক সেনারা এখানে প্রবেশ করে । তারা আসার পরই এলাকায় বাড়ীঘর পুড়িয়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। অবাঙ্গালীরাও এ সময় রীতিমত লুটপাট শুরু করে। অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে জণগণ এলাকা ত্যাগ করেন। পলায়ন লোকদের উপর হানা দিয়ে লুটপাট করে ঘরের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয় এবং অনেককে হত্যা করে।

এক দুমাসের মধ্যে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। তারা মিলিটারীদের সাথে যোগাযোগ করত। তারা উৎসাহ দিয়ে রাজাকার তৈরি করেছিল।

রাজাকাররা গ্রামে লুটপাট করেছে, লোক ধরে মিলিটারীদের দিত। মারধর করত। গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী ধরে নিয়ে যেত।

মুক্তিবাহিনীদের লোকেরা গ্রাম এলাকায় থাকত। জনগণ তাদের থাকতে দিত।

মিলিটারী গ্রামে এবং বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন করত, মানুষ হত্যা করত; মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে।

অবাঙ্গালীরা যে সমস্ত অমুসলিম পরিবার ছিল তাদের জোর করে ভয় দেখিয়ে মুসলমান করেছিল। আমি নিজেও উক্ত শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। এমনি ১২/১৩ ঘরে ৮০/৯০ জনকে মুসলমান করেছিল। বিহারীরা মন্দির ভেঙে ফেলেছিল এবং মন্দিরের ইট দিয়ে রাস্তা করেছিল। মন্দিরের বিগ্রহগুলি হৃদয়হীনভাবে ভেঙে ফেলেছে।

ডিসেম্বরের যুদ্ধকে মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন। এই যুদ্ধ স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবে এই বিশ্বস সকলের মনে ছিল।

স্বাক্ষর/-
দীপক প্রসাদ গুপ্ত

\ খুলনা বিভাগ \

\ ১২১ \
নীলিমা রাণী দাস
সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা

যুদ্ধ বাধলে আমরা সবাই খুলনাতেই আছি। সান্ধ্য আইন চলছে, ঘরের বের হবার উপায় নেই। ৩রা চৈত্র রাত ১০-৩০টায় ৬জন পাক সেনা আমাদের বাড়ী ঢোকে। আমরা তখন আকাশবণীর খবর শুনছি। পাকসেনারা ঢুকে আমার স্বামীকে ডাকে, তারপর ঘরে ঢুকে আমার সকল গহনা খুলে দিতে বলে। আমি সকল গহনা খুলে দিই আর যা টাকা-পয়সা ছিল সব নিয়ে আমার স্বামীকে নিয়ে চলে যায়। রাত ১১-৩০টায় গুলির আওয়াজ পেলাম। পরে শুনলাম আলতাফ গলির মোড়ে ৮জনকে গুলি করে, ৬জন মারা যায়, ২জন বেঁচে যায়-একজন চিত্ত, অপরজন রবি। আমার স্বামী ঐ দিন মারা যায় পাকসেনাদের গুলিতে।

তারপর আমি আমার ৪ মাসের বাচ্চা নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে আমার গ্রামের বাড়ী যাই। ওখান থেকে কয়েকদিন হেঁটে বহু লাঞ্ছনা সয়ে ভারতে যেতে পারি। দেশ স্বাধীন হলে দেশে আসি, আমার কেউ দেখার নেই, বাড়ীঘর নেই।

সম্পূর্ণ অসহায় নিঃসহায়, শুধু ভাবছি এমনি যন্ত্রণা নিয়ে আর ক'দিন বাঁচবো।

স্বাক্ষর/-
নীলিমা রাণী দাস
৭/৭/৭৩

\ ১২২ \

কাজী অব্দুল খালেক
খুলনা সদর
খুলনা

২৮শে মার্চ দুপুর তিনটার সময় আমি ভাত খেতে যাচ্ছিলাম তখন দেখতে পাই যে আমার বাড়ীর চারিদিকে খানসেনা ও বিহারী ঘিরে ফেলেছে এবং দরজায় দমাদম লাথি মারছে। তারা দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে এবং একজন খান সেনা একটা অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল আমার বুকের উপর চেপে ধরে এবং প্রথম প্রশ্ন আমাকে করে যে, 'তোম বাঙ্গালী হ্যায়, না বিহারী হ্যায়, তোম আওয়ামী লীগমে ভোট দিয়া, ৯৯% লোকনে আওয়ামী লীগমে ভোট দিয়া তো হামভী দিয়া, মাগার ম্যাই আওয়ামী লীগের ইলেকটেড মেম্বর নেহি হ্যায়। তখন তারা আমাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসে এবং একটা ট্রাকে তোলে। ঐ ট্রাকের ভিতর আরও ৭/৮ জন লোককে দেখতে পাই। তার মধ্যে খালিসপুর শহরের ডি,এস,পি ও ওয়াপদার একজন অফিসারকে দেখতে পাই। ডি,এস,পির, সারা শরীরে রক্ত এবং কপালের উপর বড় একট গর্তের মত দেখতে পাই আর ওয়াপদার অফিসারটির মুখের এক পাটির দাঁত ভাঙা দেখতে পাই। আমাদেরকে ট্রাকের উপর বসান হয় এবং দুই পাশে দুইটা মেশিনগানধারী শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময় একটা মিলিটারী এম, পি এসে আমাকে পুনরায় প্রশ্ন করে যে তুম বাঙ্গালী হ্যায় না বিহারী হ্যায়। আমি বলি যে আমি পাকিস্তান কা মোহফেজ হ্যায়। তখন এম,পি, বলে তোমহারা আইডিন্টিটি কার্ড হ্যায়। তার উত্তরে আমি আমার অফিসের আইডিন্টিটি কার্ড তাকে দেখাই। তখন সে আমাকে ছেড়ে দেয় কিন্তু আর সবাইকে ধরে নিয়ে যায়। আমি ছাড়া পাবার আরও একটা কারণ আমি নিখুঁতভাবে উর্দু বলতে পারতাম।

৭ই জুলাই দৌলতপুর থানা থেকে কয়েকজন পুলিশ আমাকে হাতে হাতকড়া দিয়ে খুলনাতে এস,ডি, ও কোর্টে নিয়ে যায়। কিন্তু আমি কোর্টে পৌঁছার আগেই কোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমাকে খুলনা জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই সময় দুইদিন আমাকে কিছু খেতে দেয় নাই। আমি যখন জেল হাজতে গিয়ে পৌঁছালাম তখন সেখানে বহু আওয়ামী লীগের নেতা, প্রফেসর এবং পুলিশের অফিসারকে দেখতে পাই। তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই খুব শোচনীয় দেখতে পাই। তাদের কারো গায়ে চুলকানী, পাচড়া হয়ে বোঝাই হয়ে গিয়েছে আবার কেউ বা ভীষণভাবে অসুস্থ। এই সময় আমি সেখানে একজন প্রফেসরকে দেখতে পাই তাকে নাকি যশোর থেকে ধরা হয়েছিল এবং যশোর ক্যান্টনমেন্টে তাকে ভীষণভাবে অত্যাচার করা হয় যার ফলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে ভদ্রলোককে খান সেনারা মুক্তিবাহিনীর স্পাই হিসাবে ধরে। এই ভদ্রলোক এই সময় শুধু শুধু লেকচার দিয়ে চলেছেন।

আমাকে রাত্রিতে যে ঘরে থাকতে হত সে ঘরটা ছিল খুব ছোট। সে ঘরে ভালভাবে বড়জোর ৫০ জন থাকতে পারে। সেখানে ৪ শত জন কয়েদীকে রাত্রিতে থাকতে দিত। প্রত্যেককে 'কাত' হয়ে শুয়ে থাকতে হত। কোনরকম নড়াচড়া করার উপায় এই সময় থাকত না।

আমি জেল হাজতে থাকা অবস্থায় দেখতে পেতাম যে প্রত্যেক দিন রাত্রিতে খান সেনারা জেল হাজত থেকে অনেক কয়েদীকে জোর করে ধরে নিয়ে যেত। তাদের আর কোন খবর আমরা পেতাম না বা আর ফিরে আসতো না।

খান সেনারা প্রত্যেক দিন বা আশেপাশে থেকে যে সব লোককে ধরে আনতো তাদের প্রতমে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে ভীষণভাবে টরচারিং করত এবং যাদের মারা হত তাদেরকে জেল হাজতের মাঠে দিয়ে আসতো এবং নদীর পাড়ে 'জবাই' করা হত। তাদের কাকুতি, মিনতি বা কান্নাকাটি অনেক সময় আমরা শুনতে পেতাম। বাদ বাকীগুলিকে জেল হাজতে নিয়ে আসতো। তাদের কাছে আমরা জানতে পারতাম খান সেনাদের অমানুষিক নির্যাতনের কথা। মানুষ হয়ে মানুষের উপর যে কত বড় নির্দয় হতে পারে তা আমার আগে জানা ছিল না। এই সময় আমাদের দিনে একবার খেতে দিত- ভাত ও ডাল, যা দেখলেই বমি হয়ে যেত, খাবার কথা তো দূরে থাক। তবুও জীবন ধারণের জন্য তাই খেতে হত।

আমরা যে চারশত লোক রাত্রিতে এক রুমে থাকতাম। পায়খানা প্রস্রাব ঐ রুমের ভিতরের এক কোনায় করতে হত, যার ফলে দুর্গন্ধে রুমের ভিতর থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়তো।

৯ই জুলাই আমার আত্মীয়-স্বজনের ধরপাকড়ের ফলে এস, ডি, ও কোর্ট থেকে ৫০০ টাকা সিকিউরিটির বদলে জামিন মঞ্জুর করে । এই সময় কয়েকজন লোক জেল হাজতে আসে এবং আমকে বলে যে তোমার জামিন হয়ে গিয়েছে। তারা আমাকে জেল হাজত থেকে বের করে চলনা লাইটড্রাস-এর অফিসে নিয়ে গিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি কতজন বিহারীকে হত্যা করেছি। আমাকে খালিসপুর ''নোভাল বেস''-এর হাতে হ্যা-ওভার করে। এই নেভাল বেস-এর কমাডিং অফিসার ছিল কর্নেল গুলজারী।

এখানে যাবার পর প্রথম আমাকে কর্নেল গুলজারী প্রশ্ন করে যে, তোম কালপ্রিট হ্যায়, আমি তখন বলি যে আমি এমন কোন কাজ করি নাই যার জন্য আমি কালপ্রিট হতে পারি। তখন সে আমাকে প্রশ্ন করে যে তুমি কত বিহারীকে কেটেছো বা নির্যাতন করেছো। তখন অমি বলি যে আমার জীবনে আমি কোনদিন কোন বিহারীকে মারি নাই বা তাদের উপর অত্যাচার করি নাই। তখন সে আমাকে বলে যে ঠিক হ্যায়। তোম জঙ্গোল সাভ কর। আমি তখন নেভাল বেস এর সম্মুখের সমস্ত জায়গায় জঙ্গল সাফ করতে থাকি। এই সময় কাঁচিতে আমার আঙ্গুল কেটে দুই ভাগ হয়ে যায়। তিন দিন আমাকে এইভাবে কাজ করতে হয়। প্রত্যেক দিন সকাল ৬টা থেকে ১টা পর্যন্ত, তারপর ১টা রুটি খেতে দিত এবং ২টা থেকে আবার ৬টা পর্যন্ত ঘাস কাটতে হত। কারণ তারা নেভাল বেস এর আশেপাশে সমস্ত জায়গা পরিস্কার করছে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে। ২য় দিন আমি যখন ঘাস কাটছিলাম তখন একটা শিয়াল ঘাসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল যার ফলে ঘাস নড়ছিল। তখণ সমস্ত খান সেনারা পজিশনে চলে যায় এবং বলে যে মুক্তিবাহিনী আগিয়া।

৩য় দিনে অমি যখন ঘাস কাটছিলাম তখন সেখান দিয়ে ক্যাপ্টেন সাহাব উদ্দিন যাচ্ছিল। সে আমাকে দেখে সিপাইদেরকে বলে আমাকে তার চেম্বারে পৌঁছে দিতে। তার চেম্বারে গেলে সে আমাকে প্রথমেই রোলার দিয়ে একটা বাম কাঁধে আঘাত করে এবং বলে যে তোম শালা বহুত বহিরীকো খতম কর দিয়া আওর বহুত বিহারীকো আওরাতকে ইজ্জত লিয়া। এই সময় আমাকে সে কোন কথা বলার সুযোগ দেয় না। সে আমাকে রোলার দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। এই সময় সে তার সহযোগীকে বলে আমাকে পায়ে শিকল বেঁধে টাঙ্গিয়ে দিতে। আমাকে নিয়ে পায়ে শিখল বেধেঁ উল্টো দিকে ঝুলিয়ে দেয়। এই সময় ক্যাপ্টেন সাহাব উদ্দিন পুনরায় এসে আমাকে বলে ''শালা তোমকো খতম করে দেগা''-এই বলে সে আমাকে মোটা রোলার দিয়ে আঘাতের পর আঘাত ও অশ্রাব্য গালাগালি দিতে থাকে। কিছুক্ষণ মারার পর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর তারা আমাকে আর মেরেছে কিনা আমি জানি না। আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমি দেখতে পাই যে আমি একটা কম্বলের উপর শুয়ে আছি, আমার সারা শরীরে অসহ্য ব্যাথা। এই সময় কর্নেল গুলজারী সেখানে আসে এবং আমার এই অবস্থা দেখে সে ভীষণভাবে রেগে যায় ক্যাপ্টেন সাহাবের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার চিকিৎসার ব্যাবস্থা করে এবং পরে জানতে পারি যে ২ দিন পর কর্নেল গুলজারী ক্যাপ্টেন সাহাব উদ্দিনকে চিটাগাং নেভাল বেস-এ বদলী করে দেয়। খালিশপুর নেভাল বেসে একজন পাঞ্জাবী

ইমাম ছিল। সে বাঙ্গলীর প্রতি ভাল ব্যাবহার করতো, সে আমাকে খাবার দিত, আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করতো।& এবং আমি যখন সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আসি তখন সে আমার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

৯ দিন পর কর্নেল গুলজারী আমাকে রিলিজ করে দেয়। এই সময় কর্নেল গুলজারী আমাকে বলে দেয় যে তুমি কোন সময়ই বিহারীদের সম্মুখে যাবে না। এবং বিহারীরা যেন তোমাকে কোন জায়গায় না দেখতে পায়। তুমি সব সময় বিহারীদেরকে এড়িয়ে চলবে।

১৯শে জুলাই আমি নেভাল বেস থেকে মুক্ত হই। এই সময় আমার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে অমি চলতে ফিরতে পারতাম না। আমি একটা রিক্সা করে বোনের বাসায় চলে যাই। সেখানে আমার ফ্যামিলির সাক্ষাৎ পাই। দেখতে পাই যে আমার পরিবারে অবস্থা খুব খারাপ। কারণ কোনদিন না খেয়েও তারা কাটিয়েছে। আমার দুই ছেলে তখন রাস্তায় ফেরি করে যা রোজগার করেছে তা-ই দিয়ে কোন মতে খেয়ে না খেয়ে আমাদের দিন চলেছে।

স্বাক্ষর/-
কাজী আব্দুল খালেক
১১/৭/৭৩

\ ১২৩ \

কবির আহমদ
বি, ডি, আর
খুলনা

২৭শে মার্চ অবস্থার অবনতি আরও ঘটে। পাকসেনারা ব্যাপকভাবে সারা শহর ঘুরতে থাকে, আমাদের সঙ্গে ব্যাবহারও তেমন ভাল ছিল না। আমি গোপনে ওখানে মরিচা খনন করি এবং পরবর্তী অবস্থার জন্য প্রস্তুত হই। ২৮শে মার্চ আমাকে টেলিফোনে শাখা হেড কোয়ার্টারে ডেকে আনা হয় অন্য জায়গায় পাঠানো হবে বলে অফিসে চলে আসি। এসে দেখি আধ হাত পরপর পাকসেনা সমগ্র শাখা ঘিরে রয়েছে ভারী ভারী অস্ত্র নিয়ে আমি বুঝতে পারলাম। আমার হাতিয়ার (সামান্য রাইফেল) জমা নিয়ে নেওয়া হলো। পর পর ক্রমশঃ আমাদের ১৩৭ জনকে নিয়ে আসে এবং অস্ত্র জমা নিয়ে নেয়। আমাদের পোষাক খুলে নিল এবং বেসামরিক পোষাক পরতে বলে ভিতরে থাকতে বলে। নামাজ পাড়ারও সময় নির্দিষ্ট করে দিল। ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের সবাইকে এখানে আটকে রাখে। বি, ও, পি, গুলির কি হলো কিছুই জানতে পারলাম না, দুনিয়ার কোন খবর প্রায় পেতাম না। বেশ বুঝলাম যুদ্ধ চলছে পাঞ্জাবীদের সাথে। আমরা বন্দী, মৃত্যু আসন্ন। ৬ই এপ্রিল গাড়িতে করে নিয়ে যায়- কোথায় যাচ্ছি বলে না, পরে দেখলাম জেলখানায় নিয়ে আসলো। ভিতরে সবাইকে ঢুকিয়ে দিল। ১১নং সেলে আমাদের বন্দী করে রাখলো, পাকসেনারা পাহারায় থাকলে।

৭ই এপ্রিল থেকে ৫/৬ জন করে বের করে আর্মিরা চারিদিকে ঘিরে অমানুষিকভাবে প্রহার করতে থাকে। জেলখানার সিপাই লাঠি জোগাড় করে দিত। পাক সেনারা যথেষ্টভাবে মারধর চালিয়েছে।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে খুলনা ই,পি,আর এর উয়িং কমাণ্ডার গিয়ে আমি সহ সাতজনকে চার্জশীট দিয়ে বাকী সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। ঐ মাসেই আমাদের সাহজনকে বাদ দিয়ে সবাইকে শপথ করিয়ে নানা উপদেশ দিয়ে বাইরে বের করে নিয়ে যায়। আমরা (১) নায়েব সুবেদার আব্দুল মান্নান, (২) সৈয়দ আহমদ, (৩) কবীর আহমদ হাবিলদার, (৪) ল্যান্স নায়েক জয়নাল জাবেদীন (৫) নায়েক ক্লার্ক শামছুদ্দীন (৬) সিপাই আব্দুল লতিফ আরমার, (৭) সিপাই আবুল হাশেম অন্য সেলে বন্দী থাকি।

জেল পুলিশ মতিউর রহমানের মারফত বাইরের খবরাখবর সব আমরা পেতাম বিদেশী এবং মুক্তিবাহিনীর সব খবর দিত। ডাঃ আবুল মজিদ আমাদের ভালোভাবে দেখাশোনা করেন এবং সব খবরাখবর দিতেন। অষুধ দেবার নাম করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে খবরাখবর দিতেন।

রোদের ভিতর উপুড় করে খালি গায়ে শুইয়ে ফেলে বুট দিয়ে লাথিয়েছে, রাইফেলের বাট দিয়ে যেখানে সেখানে পিটিয়েছে, মারতে মারতে ড্রেনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে ফেলে লাঠি পিঠের উপর ভেঙেছে। সমস্ত শরীর রক্তে ভরা, অজ্ঞান হওয়ার আগ পর্যন্ত মারতো এবং যথেচ্ছভাবে গালাগালি করতো। বলত 'বল কত বিহারী মেরেছিস।' সেপ্টেম্বর থেকে আমার বিরুদ্ধে চার্জ দিয়ে ইন্টারোগেশন শুরু করে । আমার বিরুদ্ধে চার্জ (১) আমি আক্রমণ করতে গেছি অবাঙ্গালীদের (২) সীমান্তে সিপাই পাঠিয়েছি সবাইকে সবাইকে আসার জন্য (৩) অস্ত্র সরবরাহ চেষ্টা এবং অস্ত্র ধ্বংস করা। (৪) সিপাইদের উস্কানী দিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছি। এক একটি প্রশ্ন করে আর মারতে থাকে। খুব মারধর করার সহ্য করতে না পেরে সব স্বীকার করে তাদের তৈরী রিপোর্ট দস্তখত করি। চার্জশীটে আমি এ্যাক্ট অনুযায়ী আমার মৃত্যু লেখা ছিল।

আমি মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকি আর বাইরের সব খবরাখবর আমি খবরাখবর আমি পেতে থাকলাম। আমি বুঝলাম আমি মরবো তবে দেশ একদিন স্বাধীন হবেই হবে।

নিয়মিত নামাজ রোজা শুরু করি বাংলাদেশের মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য, সেই সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বিজয় কামনা করে দোয়া করতাম খোদার কাছে।

১৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা দেড়টায় খুলনা মুক্ত হলে আমরা জেল গেট ভেঙ্গে মুক্তির নিশ্বাস নেই এবং বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ি।

স্বাক্ষর/-
কবির আহমদ
১৯/৬/৭৩

\ ১২৪ \

বদিউজ্জামান
হাজী মেহের আলী রোড
খুলনা

আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়ী চলে যাই যশোর দখল হবার পর । টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় কিছু না। থাকায় ওখান থেকে ২৭শে এপ্রিল আমি শহরে আসি আমার বাসাতে কাপড়-চোপড় নেবার জন্য। ২৮শে এপ্রিল খুব ভোরে বাসা থেকে আমাকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। লেঃ কঃ তোফায়েলের কাছে হাজির করে। জিজ্ঞাসাবাদ করে এক মেজর আমাকে যশোর সেনানিবাসে নিয়ে যায়। আমাকে এফ, আই, ইউ-র মেজর খোরশেদ ওমরের কাছে দেয়।

একজন সিপাইকে বানাতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শুইয়ে ফেলে লাঠি দিয়ে গরু পিটানো শুরু করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলে পা ধরে বারান্দায় টেনে এনে একজন সুবেদার কিল-চড়-ঘুষি যথেচ্ছা মারা শুরু করলো। আমি চিৎকার করতে থাকি। তারপর যেই আসুক না কেন লাথি কিল মারতে থাকে।

বিকালে আমাকে টানতে টানতে একটি ঘরে রেখে আসলো। এর পর থেকে প্রত্যেহ সকাল বিকাল বের করতো এবং ভীষণভাবে মারতো। আমাকে জিজ্ঞাসা করতো এস, পি, ডি, কি বলেছেন, তুমি কি করেছ? না বললেই মারতো। সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত না ঝরা পর্যন্ত, জ্ঞান হারা না হওয়া পর্যন্ত মারধর করতো।

আমি যেহেতু ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার সেহেতু সব খবর জানি এই কথাই ধরে নিয়েছিল, তাই অত্যাচারের মাত্রা খুব বেশী ছিল। আমি পতাকা তুলে দিয়েছি সব খবর মুক্তিসেনাদের দিয়েছি ইত্যাদি। আমাকে ঐ ক্যাম্পে তিন মাস তিনদিন আটকে রাখে এবং প্রত্যহ মারধর করতে থাকে।

আমাদের ছোট্ট একটি ঘরে অফিসার, দারোগা, অধ্যাপক, মাষ্টার , পুলিশ কৃষক শ্রমিক সবাইকে একত্র রাখতো। সারাদিন কোন খাবার দিত না, সন্ধ্যার আগে অল্প কিছু খাবার দিত। খুব ভোরে পায়খানা প্রস্রাব করাতে বের করতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী হলে ভীষণভাবে মারধর করতো, একসাথে ৩/৪ জনকে পায়খানা প্রস্রাব করাতে বসাতো, দেরী হলে মারধর করতো। সারাদিন রাতে একবার পায়খানা প্রস্রাব করাতো। সকালে আমাদের বের করিয়ে পায়খানা ধোয়াতো, ড্রেন পরিষ্কার, জঙ্গল পরিষ্কার মাল বওয়ানো অভুক্ত অবস্থায় করিয়ে নিতো। প্রস্রাব অনেকে ভিতরেই করে ফেলতো। মারের চোটে সারা শরীর ঘা হয়ে গিয়েছিল, মাছি বসে পুঁজ জমে সারা ঘরে এ্কটি নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মাঝে মাঝে একলোক আসতো। আমরা ভালো করে বসতেও পারতাম না। সন্ধ্যার আগ দিয়ে সামান্য খাইয়ে ঘরে পুরে রাখতো। তিন মাস তিনদিন আমাকে গোছল করতে দেয়নি।

২রা মে ২৯ জনকে হাত, চোখ বেঁধে নিয়ে যায় সন্ধ্যাবেলা, বাকী থাকি অমি, একজন ড্রাইভারও একজন সি, ও। পরে শুনলাম ওদের ট্রেন্স খুড়িয়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। ওর মধ্যে অনেক অধ্যাপকও ছিলেন।

তারপর থেকে প্রত্যহ রাত বারোটার পর ১০/১২ জন করে নিয়ে যেত আর ফিরতো না। প্রত্যেহ নতুন লোক এসে আবার ঘর ভরে যেতো।

জুলাই মাসের শেষের দিক হতে শুনলাম যাদেরকে গাড়ীতে করে নিয়ে যায় রাতে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করতো।

অপারেশন স্পটে যাদেরকে ধরে আনতো তাদেরকে হাত-পা পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলতো। তারপর শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে দিত এবং গুলি করে হত্যা করতো।

আগষ্ট মাসের ২/৩ তারিখে আমাদের ১০/১২ জনকে সেনানিবাসের মডেল প্রাইমারীর এক ঘরে নিয়ে যায়। এখানে নিয়ে আসার পর শুনলাম এর আগে যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের কোন তালিকা বা হিসাব নেই। অসংখ্য মানুষকে তারা হত্যা করেছে ঐ সময়। এপ্রিলে যাদেরকে ধরেছিল একমাত্র আমিই বেঁচে ছিলাম।

এখানে আসার পর খাওয়া দাওয়া একটু ভালো হলো। মারধর কর করতে থাকে।

আগষ্ট মাসের ১২/১৩ তারিখ ইনটারোগেশনের জন্য নিয়ে যেত এবং নানা কথা- যেমন বিহারী হত্যা করেছি, পাকসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, অস্ত্র যুগিয়েছি ইত্যাদির কথা লিখিয়ে আমাদের দিয়ে সই করিয়ে নেয়। চিৎ করে শুইয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতোম, একটু হেললে লাঠি দিয়ে পিটাতো। তিন দিন ঐ ভাবে অত্যাচার চালায় অমানুষিক।

সেপ্টম্বরের শেষ অথবা অক্টোবর মাসের প্রথমে আমার বিরুদ্ধে সামরিক কেসের চার্জ নিয়ে একটি কপি দেয় এবং তার পরপরই জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়। ঢাকা থেকে আরও অতিরিক্ত কেস আমার বিরুদ্ধে আসে। আমার সাথে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সানাউল হক, ইন্সপেক্টর আক্তার চৌধুরী, নূর মোহাম্মদ, ডাঃ আনিসুজ্জামান এম, বি, বি, এস, অনিসুর রহমান ইত্যাদি লোকদের বিরুদ্ধে মামলা ওঠে।

অক্টোবর মাস থেকেই ম্যাজিষ্ট্রেট সানাউল হক সাহেবের কেস ওঠে। দুটো হিয়ারিং হবার পর কেস বন্ধ হয়ে যায়।

২৮শে নভেম্বর চিঠি পেলাম আমি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছি। মুক্তি পাই ২৮শে নভেম্বর।

আমি মুক্তি পেয়ে বাসাতে অসি। আমার দেশের বাড়ী সব পুড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। আমার পরিবার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেরিয়েছে।

আমি শুনতাম দৈনিক বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়েদের ধরে আনতো এবং সেনানিবাসের ২/৩টি স্থানে রেখে বিভিন্ন সময় ইচ্ছানুসারে তাদেরকে ভোগ করতো।

স্বাক্ষর/-
বি, জামান
১৪/৭/৭৩

\ ১২৫ \

শ্রী শক্তিপদ সেন
গ্রাম- কাজদিয়া, ডাকঘর- আলাইপুর
থানা ও জেলা- খুলনা

১৯৭১ সালের ১৯ শে এপ্রিল রোজ বুধবার বেলা ১১টার সময় খুলনা ট্রেজারীতে চাকরীতে কর্মরত অবস্থায় একজন পাক মিলিটারী আমাদের অফিসে আসে এবং আমাকে ডাকে। আমি তার নিকট উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আমার পিছে রাইফেল ধরে সঙ্গে করে তাদের ক্যাম্প সার্কিট হাউজে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। যেমনঃ- (ক) কাকে ভোট দিয়েছ? (খ) কত জন বিহারী মেরেছ? (গ) এম এম দাস কোথায়?

আমাকে নিয়ে যাওয়ার পর আমার দুহাত পিছনে দিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর প্রশ্নবাদ করতে থাকে আর কাঠের রোলার, লোহার রড দিয়ে শরীরের সমস্ত জয়েন্টে প্রহার করতে থাকে। প্রহার করার মাঝে বুট দিয়ে লাথির পর লাথি মারতে থাকে। উক্ত প্রকারে প্রহার করার পর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে আমার সমস্ত শরীর চেপে ধরে পুড়িয়ে দিতে থাকে। একটু এদিক ওদিক ব্যাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলে আবার মার শুরু করে দিত।এইভাবে সন্ধ্যা ৮-৩০ পর্যন্ত অত্যাচার করার পর তিন জন মিলিটারী আমাকে হাত খুলে দিয়ে বলে চল শালা তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। এই বলে আমাকে সামনে রেখে একজন পিছে আর দু'জন দুইপাশে রাইফেল ধরে ১নং ফরেষ্ট গেটে নিয়ে যায়। তার পর সেখানে নিয়ে দু'হাত পিছে দিয়ে পিঠ মোড়া করে বেঁধে ফেলে। আর দুপা একসঙ্গে করে বেঁধে ভৈরব নদীতে পিছন হতে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার পর আমি ভাসতে ভাসতে প্রায় ২০০/৩০০গজ যাবার পর আমার পায়ের রশিটা খুলে যায়। তার পর আমি পায়ের তলায় মাটি পাই। সেখানে আশ্রয় নিয়ে হাতের রশিটি খুলে ফেলি এবং সেখানে আত্মরক্ষার জন্য পানির নিচে সমস্ত শরীর ডুবিয়ে রেখে কোনরকম নাক বাঁচিয়ে প্রায় ৩/৪ ঘন্টা সেখানে কাটাই। তারপর নদী হতে উঠে পালিয়ে খুলনা টাউন মসজিদে ইমাম সাহেবের সাথে মসজিদ প্রাঙ্গণে আমার দেখা হয়। মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তারপর এর মধ্যে দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে আমার নিজ বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নেই এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত আমি বাড়ীতে থেকে যাই।

স্বাক্ষর/-
শক্তিপদ সেন
১৯/৭/৭৩

\ ১২৬ \

রেবা রাণী নাথ
ডাক ও থানা- ডুমুরিয়া
জেলা- খুলনা

জুন মাসের শেষের দিকে আমরা পাথরঘাটা হয়ে ভারতে যাচ্ছিলাম। দলে ছিলাম প্রায় ৮/১০ হাজার লোক, সবাই আমরা ভারতে যাব। রাত থেকে সকালে ৮/৯টার দিকে আমরা যা হোক কিছু রান্নাবান্না করছি এমন সময় ৩/৪ গাড়ী মিলিটরী আসে। সঙ্গে সঙ্গে পাক সেনারা গুলি চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করে। এবং বহু লোককে ধরে গাড়ীতে তোলে। প্রত্যেক গাড়ীতে ১৫/২০ জন করে মেয়েদের তুলে নেয়। ওখানেই অনেকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। পাক ঘাঁটি ঝাউডাঙ্গাতে আমাদের নিয়ে যায়। ছেলেগুলিকে এক যায়গা করে গুলি করে সবাইকে হত্যা করে শুধু আমাদেরকে নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে ৫০/৬০ জন মেয়েকে দেখলাম বিভিন্ন যায়গার, ঝাউডাঙ্গারও অনেক মেয়ে দেখলাম। অনেক কলেজ পড়া বিশ্ববিদ্যালয় পড়া মেয়েকে দেখলাম।

পাকসেনারা আমাদেরকে ৪/৫ দিন রাখে। ওখানে ৩/৪ টি তাবু ছিল। একটি একটি সিটের কাছে ২/৩টি মেয়ে নিয়ে এসে রাখতো। পাক সেনারা জোর করে ধরলে দুটি মেয়ে কিছুতেই তাদের শিকার হতে চায় না। তখন পাকসেনারা ভীষণভাবে দৈহিক পীড়ন করে গুলি করে হত্যা করে। পাকসেনারা একদল সবসময় ঘরে থাকতো, অপর দল আসা পর্যন্ত আমাদের উপর অত্যাচার চালাতো।

আমি যে তাঁবুতে ছিলাম সেখানে ১৫/১৬টি মেয়ে ছিল। সীট ছিল ৮/১০টি। পাকসেনারা যখন তখন অমাদের উপর দৈহিক পীড়ন চালাতো। প্রায় সবসময় বিভিন্ন স্থান থেকে পাক সেনারা আসতো আর আমাদের আমাদের উপর অত্যাচার চালাতো। পাক সেনার বলতো বাংলাদেশ হবে না, তোমাদের আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে, জোর করলে গুলি। আমাদের উপর একই সময় ৫/৭টি করে পাক সেনা অত্যাচার চালাতো। বিভিন্ন ভাবে তারা তাদের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। আমাদের ৪ দিনের মধ্যে ১দিন ভাত দিয়েছিলো। একজনের সাথে অপরজনের কথা বলতে দিত না। আমরা ওখানে হিন্দু মেয়ে বেশী ছিলাম কিন্তু সবাই আমরা মুসলমান বলে পরিচয় দিই। আমাদের গায়ে বস্নাউজ রাখতে দিত না। সবাইকে কেবল শাড়ী পরিয়ে রাখতো।

আমরা থাকতে আরও প্রচুর মেয়েকে ধরে আনে। পাকসেনারা তখন আমাদের রাজাকারদের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যেক রাজাকার এক একজনকে নিয়ে যায়। আমাকে এক রাজাকার তার বাড়ীতে নিয়ে যায়।

৩/৪ দিন রাজাকারটি আমার উপর অত্যাচার চালায়। রাজাকারটির বৌ ও মা নিষেধ করলে গুলি করতে যেতো। এরপর ওখান থেকে রাজাকারের মা এবং বৌয়ের সহায়তায় পালিয়ে ভারতে চলে যাই। সেখানে গোল পুকুর ক্যাম্পে থাকতাম। দেশ স্বাধীন হলে দেশে ফিরে আসতাম। আমি তখন ৭/৮ মাসের অমত্মঃসত্ত্বা ছিলাম।

আমি নারী পুর্নবাসন কেন্দ্রে আবেদন করি সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে। ওরাই আমার চিকিৎসা এবং কাজের ব্যবস্থা করেন।

স্বাক্ষর/-
রেবা রাণী নাথ
২৫/৭/৭৩

\ ১৬৩ \

আখতার হোসেন চৌধুরী
ডি, এস, পি, শিল্প এলাকা
খালিশপুর
জেলা- খুলনা

ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য আমি সবরকম তদবীর শুরু করি এবং তদবীর করতে গিয়েই আমি ২১শে মে সকাল ৯টায় মেজর বাবরের কবলে পড়ে যাই। আর সঙ্গে সঙ্গেই পাকসেনার পাহারাধীনে আমাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে এফ-আই-ইউ (ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিট)-এর একটি ঘরে আমাকে আটক রাখা হয়। সেই ঘরে আমি ছাড়া আরও ৫০/৬০ জন বন্দী। এই এফ-আই-ইউ একটা বিভীকাময় স্থান। সবাই ঘরের মেঝেতে জুতার বালিশ মাথঅয় দিয়ে শুয়ে থাকতাম। ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র একবার সন্ধ্যায় আমাদের খেতে দিতো। পচা ভাত, ডাল, প্রায় অখাদ্য। ওরই মধ্যে আমার মন বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল, ১২ দিন শুধু পানি খেয়েছিলাম। সারাদিন সেখান থেকে যাকে ইচ্ছা বের করে নিয়ে যেয়ে আর এক ঘরে এফ, আই, ইউ এর অফিসাররা ইন্টারোগেশন করতো এবং অমানুষিক অত্যাচার চালাতো। সন্ধ্যা আটটায় একজন জমাদার বা সুবেদার এসে একটা লিষ্ট থেকে নাম ডাকতো। এই লিষ্ট-এ ৩০ থেকে ৩৫ জনের নাম থাকতো। যাদের নাম ডাকতো তারা লাইন ধরে দাঁড়াতো, তারপর তাদের জামাকাপড় ছিলে চোখ আর পেছন দিকে হাত বেঁধে গাড়ী করে নিয়ে মেরে ফেলতো। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন লোকদের আনা হতো। অমনি করে মেরে ফেলা হতো। একদিনের কথা আমি কোনদিন ভলবোনা। এটা ছেলে। মুক্তিবাহিনীর একজন। তাকে যখন মিলিটারী অফিসার ইংলিশে ষ্টেটমেন্ট লিখতে বলেছিল তখন সে বলেছিল-''আমি বাঙ্গালী''। বাংলায় অনার্স পড়ি। বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতেই আজ আমার এই অবস্থা। কাজেই কিছুতেই আমি ইংলিশে লিখবোনা। তাকে যেভাবে মারা হয়েছিল সে কথা আমি লিখতে পারবো না। তারপর এফ, আই, ইউ থেকে এফফ, আই, টি (ফিল্ড ইন্টারোগেশন টিম) এর আণ্ডারে এম পি, ইউনিট-এ আমাকে আটক রাখা হয়। এই এফ, আই , টি ইউনিটে আমাকে নিজ হাতে লিখে দিতে হয় যে আমি খালিশপুর পিপলস জুটমিল ও ক্রিসেন্ট জুটমিলের ৭০০০ হাজার বিহারী হত্যা করেছি। প্রথমে ২ দিন লিখতে চাইনি। তখন আমাকে পা উঁচু আর মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। মাত্র তিন মিনিট সময় দিয়েছিল। পাশের যেখানে লেখা আছে ' প্যানিক চেম্বার' সেখানে ঝুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা আছে। হঠাৎ ঐ ঘরের দিকে নজর পড়তেই দেখি আরও তিনজন সেখানে ঝুলছে। তাদের নাক মুখ দিয়ে লালা ঝরছিল। সেই সময় এক অফিসার এসে বললো ''দেখো ই-লোককো হলত দেখো। মাগর তুম নেই মানগে তুমহারা হালত এ্যাইসা হোগা''।সেই মুহূর্তে আমি ঠিক করলাম ওরা যা বলেছে তাই লিখে দেবো। এখনও মনে আছে আমি 'বিছমিল্লাহ' বলে মিথ্যা লিখে দিলাম। একজন বিহারী ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আমাকে স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়। মার্শাল 'ল কোর্টে আমার বিরুদ্ধে একট কেস দায়ের করা হয়। তখনই আমি বুঝতে পরি কেন আমাকে জীবিত রেখে ছিল। আমার ষ্টেটমেন্ট পড়ে একজন মিলিটারী অফিসার আমাকে ব্যঙ্গ করে বলে- ''তুম বহুত আচ্ছা ষ্টেটমেন্ট দিয়া তোমকো জলদি ছোড় দেগা।'' আমি সাত হাজার বিহারী মারা স্বীকার করেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তি, আমার এই ষ্টেটমেন্ট ডিভিশন হেড কোয়র্টারে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে একজন লেঃ কর্নেল আমাকে দেখতে আসে ও নানা ধরনের প্রশ্ন করে। পরে তারই অর্ডার অনুসারে আমাকে ১লা সেপ্টেম্বর পিপলস জুটমিলে নিয়ে এসে প্রায় আড়াই হাজার বিহারী মিল-শ্রমিকদের সামনে তাদের উৎসাহ দেবার জন্য দাঁড় করানো হয়। মেজর খুরশীদ (এফ, আই, ইউ) মেজর সরহাদ (এফ,আই, টি), মেজর আখতার

হোসেন (ডিভিশন হেডকোয়ার্টার যশোর ক্যান্টমেন্ট) তখন আমার পাশে। বিহারীরা আমাকে দেখে বিচার তাদের হাতে দেবার জন্য চীৎকার করতে থাকে, হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো বিহারী ড্রাইভার ভীড় ঠেলে মিলিটারী অফিসারদের সামনে এসে বলতে থাকে যে, সে প্রথমে আমাকে চিনতে পারেনি। কারণ আমার মাথা ন্যাড়া ছিল এবং মুখে দাঁড়ি ছিল। তবে যাবার সময় বলেছিল, ''একে যদি তোমরা মারো তবে আল্লা বরদাস্ত করবে না।'' তাই বোধহয় আমাকে আবার ক্যান্টমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কেস শুরু হোল। কোর্ট বসে যশোর শহরে। আমাদের নিয়ে যেতে সুবিধার জন্য সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমাকে যশোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখে। এই জেলখানায় এসে আবার পি, আই, টি (পুলিশ ইনভেষ্টিগেশন টিম)-এর নির্মম কবলে পড়তে হয়। জেলখানা থেকে লোকদের নিয়ে যেয়ে ক্যান্টনমেন্টে তাদের ক্যাম্পে ভীষণ অত্যাচার করে নানা ধরনের তথ্য বের করতে চেষ্টা করে। এমনিভাবে জেলখানায় দিন কাটতে থাকে। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না, তবে নতুন যারা আসতো তাদের মুখে কিছু কিছু শুনতে পেতাম। প্রায় সাত মাস বন্দী অবস্থায় ছিলাম, তাই প্রত্যক্ষভাবে আমি দেশের কাজ করতে পারিনি। কিন্তু মনে প্রাণে কামনা করেছি বাংলার স্বাধীনতা, আমি বিশ্বাস করতাম যে এত অত্যাচারের পতন হবেই। হয়তো আমি দেখতে পাবো না কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার নতুন সূর্য একদিন উঠবেই। তাই যখন ৬ই ডিসেম্বর ক্যান্টনমেন্ট ফল করে এবং ৭ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী আমাদের জেল গেট খুলে দিলে আমরা বেরিয়ে পড়ি। জেল থেকে বেরিয়ে মাটিতে প্রথম পদক্ষেপের আগেই আমার চোখ বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু ঝরেছিল।।

স্বাক্ষর/-
আখতার হোসেন চৌধুরী
১১/৭/৭৩

\ ১৬৪ \

তাহমীনা বেগম (দিপালী)
গ্রাম-বৈতপুর
ডাকঘর ও থানা- বাগেরহাট
জেলা- খুলনা

২৪শে এপ্রিল পাকসেনারা কাড়পাড়া হয়ে বাগেরহাট আসে। এসেই কাড়াপাড়া এলাকাতেই ১০০ উপরে লোককে হত্যা করে। নাগের বাজার তেলপট্টি ইত্যাদি এলাকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া শুরু করে এবং বলে দেয় লুট করার জন্য, মুসলমানের অধিকাংশ ঘরবাড়ী সব লুট করা শুরু করে।

মে মাসে এখানে শান্তি কমিটি সেই সঙ্গে রাজাকার বাহিনী গঠন হয় পরবর্তীকালে রজব আলী ফকির শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। সমগ্র বাগেরহাট এলাকাতে পাকসেনার চাইতে রাজাকাররাই অত্যাচার চালিয়েছে বেশী।

শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বাগেরহাট শহর এলাকাতে যত হিন্দু ছিল কিছু হত্যা বাদে সবাইকে মুসলমান ধর্মে দিক্ষীত করে। এরপর গ্রামের দিকে হাত বাড়ায় গ্রামকে গ্রাম ধরে সবাইকে মুসলমান করতে থাকে।

আমি আমার স্বামী,ছেলেমেয়ে, বাবা, মা, কাকা, কাকীমা তাদের ছেলেমেয়ে সবাই ইসলাম ধম্যে দিক্ষা নিই। কিন্তু রাজাকাররা এর পরেও অত্যাচার করতে ছাড়েনি। এরপরও অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে।

২২শে আশ্বিন রাত তিনটার দিকে ৫০/৬০ জন রাজাকার আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। প্রথমে তারা মুক্তিবাহিনী বলে পরিচয় দিয়ে থাকতে চায় রাতের মত। অনেক অনুনয়-বিনয় করে। প্রথমে আমার ভাই প্রদীপ গুহ দেখেই চিনেছিল তারা রাজাকার। তাই সে ছাদ দিয়ে গাছ বেয়ে পিছনে নামবার চেষ্টা করেছে। উপর থেকে নিচে নামলেই রাজাকাররা ধরে ফেলে। ওকে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে বেয়োনেট দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। তারপর বাবা কাকা এবং পাশের বাড়ীর তিনজনকে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে সিরাজ মাষ্টার এবং তার দল গুলি করে মাথা সব উড়িয়ে দেয়। সকালবেলা আমরা সেসব লাশ উদ্ধার করি। হত্যা করে বাড়ীঘর লুট করে সব নিয়ে চলে যায়। আমরা যারা বেঁচে ছিলাম বাগেরহাট শহরে চলে আসি। বাড়ীতে কেবল একজন কৃষাণ এবং আমার ৭০ বছরের বৃদ্ধা দিদিমাকে রেখে আসি।

কার্ত্তিক মাসের ১২/১৩ তারিখ হবে। রাজাকাররা আবার যায় আমাদের গ্রামে। দড়াটানা নদীর ওপার থেকে মুক্তিবাহিনী গোলাগুলি করতো। তাই রজব আলী অর্ডার দেয় সমস্ত এলাকা ঘরবাড়ী ভেঙে ধ্বংস করে গাছপালা পরিষ্কার করে ফেলার জন্য। ঐদিন আমাদের বাড়ীতে ঢোকে এবং দিদিমাকে লেপকাঁথা দিয়ে জড়িয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে। আগুন দিলে দিদিমা আমার কাকার নাম ধরে বার বার চিৎকার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত এলাকা পুড়িয়ে ধ্বংস করে। ভোলা বোসকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। রাধা বলস্নভ গ্রামে মেয়েদের রাজাকাররা ধরে নিয়ে আসে। রাজাকাররা সারারাত পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে দিনের বেলা গুলি করে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে রাখে। বলরাম সাহাকে রাজাকাররা গুলি করে হত্যা করে। তার বিরাট গদির উপরে রজব আলী বসত, চারিদিকে রাজাকার ঘিরে থাকতো। ওখানে একটি ঘরে লোকদের জবাই করতো। প্রত্যেকদিন ১০টি লোক যোগাড় করতেই হতো। আমি একদিন এক লোকের সুপারিশ করতে গিয়ে দেখলাম ঘরের ভিতর চাপ চাপ রক্ত পড়েছে। মদনের মাঠ ওয়াপদা রেষ্ট হাউসে একটি কক্ষে অসংখ্য লোককে জবাই করেছে। খাদ্দার গ্রামে এক বাড়ী থেকে সবাই ধরে এনে হত্যা করে। ডাক বাংলো ঘাটে প্রত্যেহ অসংখ্য লোককে জবাই করেছে বেয়োনেট দিয়ে।

এক বৃদ্ধ রামদা দিয়ে অসংখ্য লোককে কেটেছে। সে পিঠ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। লোক ধরে বলতো 'বাবা নীচু হও তা নইলে কাটতে আমার কষ্ট হয়। তাড়াতড়ি বসে পড়ে তোমাদের কষ্টও কম হবে, আমারও কষ্ট কম হবে।'

ইসহাক মিয়ার বাড়ীতে অনেক মেয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেউ রেহাই পায়নি। সমস্ত এলাকাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো।

গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ব্যাপকভাবে হিন্দু মেয়ে ধরে পাকসেনাদের হাতে তুলে দিতো রাজাকাররা। এছাড়া রাজাকাররা গ্রামে গ্রামে ঢুকে অধিকাংশ মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে।

বাগেরহাট থানার মীর্জাপুর গ্রাম এবং সারাগ্রামে বহু মেয়ে অপমানিতা হয়ে অত্মহত্যা করেছে বিষপানে কেউ বা গলায় দড়ি দিয়ে।

রাজাকার, আল-বদর এদের মানুষ চরমভাবে ঘৃণা করতো। আমার মনে হয় সমস্ত বাংলাদেশে রাজাকাররা এমন ভাবে সন্ত্রাস আর নৃশংস অত্যাচার কোথাও চালায়নি। নদীর ঘাটে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক মাসে ৪/৫ টি লোককে গলা কাটা অবস্থায় পেয়েছি। গলা সম্পূর্ণ কাটতো না অল্প কেটে ছেড়ে দিতো, ছটফট করে শেষ হয়ে যেত। হাড়ি খালীতে (বাগেরহাট থানা) বিষ্ণু মাহশয়কে তার বৌয়ের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আরও পাঁচজনকে ধরে ওর স্ত্রীর সামনে গুলি করে হত্যা করে। অত্যাচার চালায় সারা গ্রামে। বি,এ, পাশ এক মেয়েকে ধরে অত্যাচার চালিয়ে ছুরি দিয়ে হত্যা করে। মদনের মাঠের এক ঘরে ওরা নিয়মিত মানুষ কেটেছে।

স্বাক্ষর
তাহমীনা বেগম (দিপালী)
৩/৮/৭৩

\ ১৬৫ \

মোঃ শহীদুল ইসলাম এ্যাডভোকেট
থানা- কোতোয়ালী, যশোর

এপ্রিলের ২৭ তারিখে বাসার খোঁজ নেবার জন্য শহরে চলে আসি। কিন্তু মায়ের অনুরোধে সেদিন বাসাতে রাত্রি কাটানোর জন্য থেকে যাই। কিন্তু সেই দিন রাত্রি দু'টার সময় পাকসেনারা আমাদের বাসাসহ আরও অনেকগুলো বাসা ঘেরাও করে এবং আমাদের বাসার ভিতরে যেয়ে দরজায় ধাক্কা মারতে থাকে। আমার আব্বা দরজা খুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার আব্বাকে ধরে ফেলে এবং তাঁর চোখ বেঁধে ফেলে। তারপর লাফ দিয়ে একজন আমার নিকট চলে আসে এবং আমাকে ধরে ফেলে এবং আমারও চোখ হাত বেধেঁ ফেলে। তারপর আমাকে এবং আব্বাকে বাসার বাইরে নিয়ে যায়। আমি অনুনয়-বিনয় করে বলতে থাকি আমরা মুসলমান, আমরা মুহাজির। তারপর তারা আমাকে মুখ বন্ধ করতে বলে আমি আর কোন কথা না বলে চুপ করে থাকি। আব্বা ধরা পড়ার সাথে সাথে জোরে জোরে কালেমা পড়তে থাকেন। অব্বার কালেমা পড়ার জন্য তাঁকে জোরে জোরে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারতে থাকে। অব্বার বয়স প্রায় ৮০/৮৫ বছর। তারপর তিনি ধীরে ধীরে কালেমা পড়তে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতে থাকে এবং বলতে থাকে কালেমা মাত কর। অমাদের ঐ অবস্থা দেখে আম্মা কান্নাকটি করতে থাকেন। অম্মার কান্নাকাটি করা দেখে একজন মিলিটারী বাসার মধ্যে চলে যায় এবং আম্মাকেও বন্দুক দিয়ে বাড়ি মারে তার হাতের রিঙ খুলতে চেষ্টা করলে অন্য একজন মিলিটারী গিয়ে তাঁকে বাধা দেয় এবং সেখান হতে তাকে বাসার বাইরে নিয়ে আসে। আমার হাত এবং আব্বার হাত একত্র করে বেঁধে ফেলে। তারপর আমাদেরকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ১০/১২ গজ হাঁটিয়ে নিয়ে এসে এক জায়গায় বসতে বলে। আমরা বসে পড়ি। এর মাঝে আমি পানি চাইলে আবার এসে মারা আরম্ভ করে। তারপর আমরা সেখানে বসে থাকি। তার ৪/৫ মিনিট পর আরও ৮/১০ জন লোককে ধরে মারতে মারতে আমাদের নিকট নিয়ে এসে রাখে। তারপর তারা সবাই একত্রিত হবার পর তাদের মধ্যে থেকে একজন মিলিটারী বলে ওঠে এ তো বুড্ডা একে নিয়ে কি হবে। আমাদের মধ্যে একজন ছোট ছেলে ছিল তাকে এবং আমার অব্বাকে তারা ছেড়ে দেয়।তার প্রায় আধা ঘন্টা পর আমরা গাড়ির শব্দ পাই। একটা গাড়ি এসে আমাদের সম্মুখে থামে এবং মিলিটারীরা নিজেরাই ধরাধরি করে আমাদেরকে গাড়িতে উঠায়।তারপর গাড়ি ছেড়ে বেশ কিছু দূর গিয়ে গাড়ি থেমে পড়ে। আমাদেরকে গাড়ী হতে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে ফেলে। তারপর একটা ঘরের দরজার নিকট নিয়ে গিয়ে আমাদের সবার চোখ খুলে দেয় এবং ঘরের মধ্যে আমাদেরকে ঢুকিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে আমরা ঢুকে সবাই সবাইকে এক নজর দেখে নিলাম। তার পরপরই ভোরের আযানের শব্দ আমার কানে ভেসে আসতে লাগলো। আমরা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পাই প্রায় ২০/২৫ জন লোককে মারতে মারতে পায়খানায় নিয়ে যাচ্ছে আবার মারতে মারতে পায়খানা হতে নিয়ে আসে। তারপর আমাদেরকে পায়খানা করার জন্য বাইরে নিয়ে যায়। পায়খানা করা হলে সবাই অজু করে নেবার পর আবার উক্ত জায়গায় নিয়ে এসে রেখে দেয়। আমরা সবাই নামাজ পড়ে বসে আছি এমন সময় পাশের ঘর হতে মানুষের চিৎকার শুনতে পাই। তাতে আমরা ধারণা করলাম ওখানে মার আরম্ভ করে দিয়েছে। এর মধ্যে একজন মিলিটারী আমাদের রুমে চলে আসে এবং প্রত্যেকের পুরা ঠিকানা ও প্রত্যেকের পেশা একটা কাগজে লিখে নিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। আমরা খাবার পর সবাইকে ঘুমাতে বলে। আমরা কোন মতে রাত্রি কাটালাম। তারপর দিন আমাদের দলের বদরউদ্দিন নামক একজন লোককে ঘর হতে বের করে নিয়ে যায়। তার সাথে কি যেন বলাবলি করার পর আবার আমাদের রুমে তাকে নিয়ে এসে রেখে যায় এবং আমাদের সবাইকে জানিয়ে যায় তোমরা কোন লোক বদরউদ্দিন সাহেবের সাথে কথা বলবে না। যদি কোন লোককে

তার সাথে কথা বলতে দেখি তাকে আমরা গুলি করে মারবো। তারপর দিন রাজু নামক একজন লোককে নিয়ে যায়। কিছু সময় পর আবার তাকে নিয়ে এসে রেখে যায়। তার তিনদিন পর আমাদের রুমে এসে জিজ্ঞাসা করে ফকু কোন হায়? তোতা কোন হায়? তারপর আমরা দুজন উঠে দাঁড়ালাম। তারপর আমাদেরকে বের করে নিয়ে যায়। একটা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে শুতে বললে আমরা দুজন মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ি। তারপর আমাকে এমন জোরে একটা বেতের লাঠি দিয়ে পিঠে আঘাত করে যে আমি সহ্য করতে না পেরে ছুটাছুটি করতে থাকি। আবার আমাকে ডেকে নিয়ে শুতে বলে, আমি মাটিতে শুয়ে পড়ি। তারপর আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।
যেমনঃ-

(1) তোমার রাইফেল কোথায়।
(2) তুমি রাইফেল ধরেছ কিনা।ৎ
(3) তোমার গ্রামে যে ১৫/১৬ জন লোক রাইফেল ধরেছিল তাদের নাম বলো। তাদের নেতা কে ছিল।
(4) তোমাদের গ্রামের কারা ই,পি, আরদের খেতে দিয়েছে।
(5) তুমি ছাত্রলীগ কিম্বা আওয়ামী লীগ করো কিনা।
(6) যশোরে মুজিবের মিটিং-এ তুমি ছিলে কি না।
(7) মিটিং-এ সে কি বলেছিল।
(8) মিছিলে কি কি বলা হয়।
(9) জয় বাংলার মানে কি।
(১০) তোমার ভাই কোথায়।
(১১) তুমি কি কর।
(১২) তোমাদের গ্রামে যে মেজর যেত তাকে তোমরা কেন মেয়ে জোগাতে না।
(১৩) ভারতে কে গিয়েছে।

সুবেদার মেজর শাহজি আমাকে সবগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমি মারের দরুন থাকতে না পেরে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর স্বীকার করি আর যে গুলো বেশী জরুরী সেগুলো স্বীকার করি না। মারের নিয়মগুলো নীচে বর্ণনা করা হলো।

(1) প্রথমে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে দিত। তারপর বেতের লাঠি দিয়ে ঘাড়ে এবং পায়ের তালুতে মারতে থাকে। লাঠি দিয়ে মারা শেষ হলে আবার বুট দিয়ে পিঠের উপর উঠে খচতো বা পাড়াতো।

(২)দ্বিতীয় নিজ কায়দা হলো চুল ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ঠাশ করে ঘাড়ে একটা চড় কশিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিত।

(৩) পা উপরে দিয়ে মাথা নিচে দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে রশির সঙ্গে লটকিয়ে রাখতো।

(৪) বস্তার মধ্যে পুরে দিয়ে বস্তার মুখ বেঁধে পিটিয়ে মেরে ফেলতো।

(৫) প্রত্যেক গিড়ায় গিড়ায় লাঠি দিয়ে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে মারতো।

(৬) আট দশজন করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ব্যায়োনেট চার্জ করে মেরে রেখে আসতো।

(৭) প্রত্যেক হাতের প্রতি আঙ্গুলে সূঁচ ঢুকিয়ে দিত।

(৮) নিল ডাউন করে রাখতো।

(৯) প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার খাবার দিত। আর পায়খানা প্রশ্রাব করাতে নিয়ে যাবার সময় মারতো আর নিয়ে আসার সময় মারতো। আমাদেরকে একমাস বার দিন রাখার পর আমাদের ১৭ জনের একটা দলকে সুবেদার মেজর শাহজি সবাইকে ডেকে লাইন করে তারপর একটা গাড়িতে আমাদেরকে উঠতে বলে। আমরা গাড়িতে উঠে পড়ি। তারপর আমাদের বাড়ীর নিকট গাড়ি থামিয়ে আমাদেরকে নামিয়ে দেয়। আমাকে ধরে ২৭শে এপ্রিল আর ছেড়ে দেয় জুনের ১০ তারিখে।

সাক্ষর/-
মোঃ শাহিদুল ইসলাম এ্যাডভোকেট
১৭/৩/৭৩

\ ১৬৬ \

শ্রী নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শষ্টিতলা, যশোর

আমার বর্তমান বয়স ৯৮ বছর। ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিলে সকাল ৮-৩০ মিনিটে ভারত ও তথাকথিত পাকিস্তানের খবর রেডিওর মাধ্যমে শুনছি এমন সময় দু'জন বিহারী ও তিনজন পাঞ্জাবী আমার বাসায় চলে আসে। বিহারী দুজন আমার পাড়া প্রতিবেশী। তারা আসার সাথে সাথে আমি রেডিও বন্ধ করে দেই। তারা সোজাসুজি আমার নিকট চলে আসে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার টাকা পয়সা কোথায় রেখেছ? আমি জবাব দেই আমার কোন গচ্ছিত টাকা পয়সা নাই। আমি আবার ত্রিশ বাছর চাঁচরা রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলাম। তারা সেই জন্য মনে করতো আমার নিকট প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে। তারপর তাদের মধ্যে থেকে একজন মিলিটারী আমার পাশের ঘর হতে আমার চাকর কালিপদ দাসকে আমার নিকট নিয়ে আসে। তারপর আমাকে এবং তাকে ভয় দেখায় টাকা কোথায় রেখেছ? যদি না বলে দাও তা না হলে তোমাদের দু'জনকেই গুলি করে মারা হবে। আমরা জবাব দিলাম টাকা আমরা কোথায় পাবো। তখন আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করায়। তারপর একজন মিলিটারী কালিপদকে লক্ষ্য করে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুক ভেদ করে গুলি বেরিয়ে যায়। তার পরক্ষণেই সে মারা যায়। তার পর আমাকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় গুলি ছোড়ে, গুলিটি আমার এক হাতে লাগে। গুলি লেগে আমার বাম হাতটা প্রায় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর আবার আরেকটা গুলি আমাকে করে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ করুণায় গুলিটি আমার ডান হাতের এক পাশে লাগে। সাথে সাথে আমাকে অমনি ফেলে রেখে চলে যায়। বাড়ী হতে বের হয়ে যাবার সময় আমার বাসা লুটপাট করে বাসার সমস্ত কিছু নিয়ে যায়। অবশ্য উক্ত জিনিষপত্রগুলো মিলিটারীদের সঙ্গে যে দু'জন বিহারী এসেছিল তারাই লুটপাট করে নিয়ে যায়। আমি ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকি। মিলিটারী ঐ দিনই আমার বাড়ীর পাশে পাশে ১১ জনকে গুলি করে মারে তার মধ্যে আমি শুধু বেঁচে আছি। যাদের গুলি করে মারা হল তারা হল আমার বাড়ীর উত্তরে আমার বিশিষ্ট বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রহমত উল্লাহ মণ্ডল এবং তার দুই শিক্ষিত পুত্র মোছাদ্দেক ও জিন্নাহ এবং তার বাড়ীতে তিনজন ভাড়াটিয়া, একজন প্রফেসর ও দুজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। আমার বাড়ীর উত্তরে ডাক্তার নাছির উদ্দিন খান এবং তার স্ত্রী ও তার বাড়ীতে উপস্থিত আরও তিনজন লোক। আমার বাড়ীর পূর্বে সত্য চরণ মিত্র ইত্যাদি ১২ জনকে গুলি করে তার মধ্যে ১১ জন মারা যায়। তার মধ্যে আমি পঙ্গু এবং অন্ধ অবস্থায় বেঁচে আছি। তারা চলে যাবার পর আমি আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকি। সেইদিন বেলা তিনটার সময় দু'জন বিহারী এসে আমার ঘর হতে কালীপদের মরা লাশ নিয়ে যায়। তারপর ৭ দিন পর্যন্ত শুধু আমি শরীরে ভীষণ জ্বর নিয়ে না খেয়ে মেঝেতে পড়ে থাকি। ৭ দিন পর ঘোপের বদরউদ্দিন সাহেবের বাড়ী হতে মহর আলী নামক একজন লোক আমার জন্য দুধ ও রুটি নিয়ে আসে। তারপর হতে তার সেবা শুশ্রুষায় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমার হাতে পোকা পড়ে গিয়েছিল। তারপর আমি সুস্থ হয়ে উঠি। বর্তমানে আমি অন্ধ এবং আমার বাম হাত পঙ্গু হয়ে গেছে। আমি এখনও খোদার অশেষ কৃপায় বেঁচে আছি আর কি।

টিপ সহি/-
শ্রী নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
১৯-৩-৭৩

\ ১৬৭ \

ডাঃ এস, এম, আহাদ আলী খান
থানা- কোতোয়ালী
যশোর

এপ্রিলে পাকবাহিনী যশোর পুরোপুরি দখল করে নেয়। আমরা পালিয়ে যাই গ্রামে। সেখান থেকে ভারতে যাবার পথ না পেয়ে পুনরায় শহরে ফিরে আসি। জুলাই মাসের সতের তারিখে পাকসৈন্যরা আমার ডাক্তার খানা থেকে ধরে নিয়ে যায়। প্রথমে সার্কিট হাউসে নিয়ে গিয়ে ব্রিগেডিয়ারের সামনে হাজির করে। ব্রিগেডিয়ার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। মেজর আনোয়ারের সামনে হাজির করাবার জন্য বসিয়ে রাখে। সেখানে সুবেদার মেজর আমীল হোসেন এবং একটি হাবিলদার ছিল নাম ইকবাল শাহ এবং আরও অনেকে ছিল। হঠাৎ করে অন্য সিপাই এসে আমাকে মারধর শুরু করে তখন সবাই মার আরম্ভ করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরলে আমি দেখি মেজর আনোয়ার হোসেন সামনে। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন রাজনৈতিক দলে আছ? আমি উত্তর দিই ন্যাপে আছি। তারপর একটি ছোট্ট কামরাতে নিয়ে যায়, রাতে কোন খাবার এমনকি পানিও দেয়নি। প্রশ্রাব করতে চাইলেও মারধর করেছে তারপর দিন সুবেদার ইকবাল শাহ আমাকে বলে, যেহেতু মেজর খুরশীদ আনোয়ারের মেয়েকে এক সময় চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছি সেহেতু আমকে নাকি মেরে ফেলা হবে না। ওকে আমি পানির জন্য অনুরোধ করি কিন্তু পানি দেয়নি। সন্ধ্যাবেলা আউন্স দুই পানি এবং একমুঠি পচা ভাত দেয়। জুলাই মাসের ২০ তারিখে আবার মেজর সাহেবের সামনে নিয়ে যায়। সেখানে আমকে জিজ্ঞাসা করে যখন বাঙ্গালী সৈন্যরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে তখন ওরা কি খেত? আমি উত্তর দেই 'ছোলা', অমনি সবাই মিলে মারধোর শুরু করে। দুধ, ডাব, ভাত পাঠিয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করে। আমি হ্যাঁ বলেছিলাম কারণ তখন আমি দেখলাম পাকসৈন্যরা সব খবরই সংগ্রহ করেছে। জুলাই মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত সিপাইরা দুবেলা মারধর নিয়মিত করতো। পাঁচ মিনিট সময় দিত তার মধ্যে প্রশ্রাব, পায়খানা, হাতমুখ ধোওয়া সব করতে হতো, দেরী হলে বেত মারতো। সারাদিন খাবার দিত না, সন্ধ্যাবেলা কিছু পচা ভাত এবং আউন্স দুই পানি দিত। পানি চাইলে বলতো তোমরা আমাদের পানি বন্ধ করেছিলে। ১লা আগষ্ট আবার মেজর আমাকে এক প্যাকেট বিস্কুট দেয়। কোর্ট থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে সুবেদার মেজর আমীর হোসেন আমাকে ভীষণভাবে মারধর শুরু করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার আর চলবার ক্ষমতা ছিল না। তখন থেকে কিছু কিছু খাবার দিত। সিপাইরা মারধর করতো নিয়মিতভাবে। মফিজ চৌধুরী, নড়াইলের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডাঃ মাহবুবুর রহমান এবং আজিজুর হক, এ, বি, এম, বদরুল আলম এরা সবাই আমার সাথে ছিলো। পুরা আগষ্ট মাস প্রায় আমি অজ্ঞান থাকতাম। আগষ্ট মাসে আমার মেয়ে শান্তি কামিটির চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে অনুরোধ করে আমার মুক্তির জন্য কিন্তু কোন কাজ হয়নি এবং অপমানিতা হয়েছে। উপর থেকে কি অর্ডার আসে জানিনা তারপর আমাকে মুক্তি দেয়। যখন মুক্তি দেয় তখন আমার জ্ঞান ছিল না। রাতে সাড়ে আটটার সময় প্রত্যহ ধৃত লোকদের মুখে কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে বাইরে নিয়ে যেত। শুনতাম অবাঙ্গালীরা ছুরি দিয়ে জবেহ করেছে। ধরে নিয়ে এসে পিটিয়ে হত্যা করেছে। উপরে পা ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে মারতে মারতে মেরে ফেলতো। গুহ্যদ্বারের ভিতর বেয়োনেট ঢুকিয়ে দিত খবরাখবর না দেওয়ার জন্য বরফ ঢুকিয়ে দিত। বাগাছাড়া হাইস্কুলের শারীরিক শিক্ষককে ধরে নিয়ে গিয়ে খবর না দেওয়ার জন্য অত্যাচার শুরু করে। বিছানার উপর শুইয়ে একটি কেমন যন্ত্র দিয়ে চাপ দিত তারপর ইলেকট্রিক শক দিত. উপরে ঝুলিয়ে মারধর করতো।

মেয়েদের ধর্ষণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চা ছেলেকে বসিয়ে বাচ্চাটিকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করে কিন্তু মেয়েটিকে রেখে দেয়। জোর করে পাকিস্তানের পক্ষে ভালো আছি বলে জোর করে জবানবন্দী রেকর্ড করতো টেপ রেকর্ডে। গুলি করে, ছুড়ি দিয়ে হাত পা কেটে, উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে। অনুমান ৮/১০ হাজার লোক মারা যায় এখানে। কর্নেল শামস এবং মেজর বেলায়েৎ আলী মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। হাজার হাজার মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। স্বামীকে মারধর করে জোর করে বেয়োনেট দেখিয়ে স্ত্রীকে তুলে নিয়েছে পাকসেনারা। একই মেয়ের উপর ৫/৭ জন আর্মি ধর্ষণ করেছে।

সাক্ষর/-
ডাঃ এস, এম, আহাদ আলী খান
৯/৩/৭৩

\ ১৬৮ \

সৈয়দ আলী ইমাম
এস, ডি, ও, এম, ই, এস, (আর্মি)
যশোর ক্যান্টনমেন্ট,যশোর

২০শে মে ধরা পড়ার পর আমাকে ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের কাছে অর্পণ করা হয়। সেখানে হাবিলদার মেজর মাসুদ প্রথম লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার শুরু করে। পরে শরীরের সমস্ত জামা কাপড় খুলে চিৎ করে ফেলে পায়ের তলাতে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার শুরু করে। সারাদিন অভুক্ত অবস্থাতেই এই প্রহার চলে। এরপর আমাকে এফ, আই, এর নিকটে একট সেলের মধ্যে পুরে রাখলো। তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। সেখানে তখন প্রায় ৩৪ জন বন্দী অবস্থায় ছিলেন। ২০টা থালাতে এই ৬৪ জন বন্দীকে খেতে হতো। পরিষ্কার না করেই উক্ত থালাতে খেতে হতো।

সারাদিন একবার খাদ্য দিতো। নামাজের সময় অজু করার জন্য ২ মিনিট করে সময় দিতো। যদি বেশী সময় লাগতো তা হলে তার উপর মারপিট শুরু হয়ে যেত। মাঝে মাঝে বন্দীদের দিয়ে গাড়ির চাকা পরিষ্কার করাতো।

খাদ্যের দরুন প্রায় বন্দীদের পেটের অসুখ হয়। তার ফলে তারা প্রায় ঘরের মধ্যে পায়খানা করে ফেলতো। তখন তাদের প্রহার করা হতো বেদমভাবে।

একদিন চার পাঁচজন যুবকদের ধরে নিয়ে আসে তাদের পা এমনভাবে বাঁধা ছিলো যে খাড়া হয়ে তারা চলতে পারতো না। তাদের বিড়ালের মতো হাঁটু ও হাত দিয়ে হেঁটে যেতে হতো। পিছনে পাক সেনারা লাঠি দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে যেতো। মনে হতো যেন গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বন্দীদের হত্যা করার সময় মেজর ওমর খুরশীদ নিজে আসতো এবং যাদের হত্যা করা হবে তাদের নামের লিষ্ট করে নিয়ে যেতো। পরে তাদের হত্যা করা হতো।

কয়েকজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের উপর দিকে পা বেঁধে তাদের লাঠি দিয়ে প্রহার করতো।

একদিন সাধু প্রকৃতির একজন লোককে ধরে নিয়ে আসে। তাকে গুপ্তচর সন্দেহ করতো। দশ বার হাত দূর হতে দৌড়ে এসে উক্ত সাধু প্রকৃতির লোকের বুকে বুট সমেত লাথি মারতো আর বলতো তুমি ভারতীয় বাহিনীর গুপ্তচর। বুটের আঘাতে পড়ে গেলে তার পায়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করতো। পরে তাকে তুলে আবার বুকে বাঁট দিয়ে আঘাত করতো।

এইভাবে প্রায় আড়াই মাস ধরে অত্যাচার করে। প্রায় ৬০ জনকে এই ঘর হতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

৩১শে জুলাই ১৪ জনকে বন্দীশালা হতে ক্যান্টনমেন্টের প্রাইমারী স্কুলে নিয়ে যায়। সেখানে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্কুলে বন্দী করে রাখে।

কয়েকজন মুক্তিফৌজকে ধরে নিয়ে এসে একদিন বেদম প্রহার করে। প্রত্যেকদিন মুক্তিফৌজ নামে কয়েকজন যুবককে দিনের বেলায় বাইরে বের করে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সন্ধ্যার দিকে ঘরে নিয়ে আসতো। এই ভাবে তাদের সারা শরীর ফুলে ও পরে পচে গিয়ে পোকা হয়ে গিয়েছিলো। তাদের জিজ্ঞাসা করতো ভারতের

কোথায় কোথায় ট্রেনিং চলছে। তারা এত অত্যাচারের মুখেও গোপন তথ্য প্রকাশ করতো না। এক মাস পরে তাদের একদিন রাতে নিয়ে যায়। পরে তাদের আর কোন দিন দেখা যায়নি। সন্ধ্যার দিকে যখন বন্দীদের গুনতো তখন চামচ দিয়ে প্রত্যেকের বুকে একটা করে ভীষণ জোরে আঘাত করতো। মনে হতো যেন বুকের হাড় যেন বুঝি ভেঙ্গে গেল। এইখানে বন্দী অবস্থায় একটা ২০০ গজ ট্রেঞ্চে সবার সামনেই প্রত্যেককে পাশাপাশি বসে পায়খানা করতে হতো।

৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে স্কুল হতে যশোর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালী থাকায় জেল খানাতে কোন মারপিট হয়নি।

আমাদের সাথে একজন পাঠান ছিলেন বন্দী। কারণ সেই পাঠান এক গ্রামে আগুন লাগাতে অস্বীকার করায় মেজরের সাথে গোলমাল হয় এবং মেজরকে একটা চড় লাগায়। ফলে তার নয় মাস জেল হয়েছিলো।

সাক্ষর/-
সৈয়দ আলী ইমার এস,ডি,ও
২৪/৩/৭৩

\ ১৬৯ \

শ্রী গণপতি সরকার
কোতোয়ালী. যশোর

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ আমি আধুনিক সেলুনে কাজ করছিলাম। বেলা ১১টার সময় ৪ জন পাক সেনা আধুনিক সেলুনে চলে আসে এবং আমাকে শ্রী অজীৎ ভবেন ও জগদীশকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে ধরে ফেলে এবং সবাইকে কালেক্টরেটে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছাড়া বাকি তিনজনকে রাইফেল, বেতের লাঠি ও বুট দিয়ে গুঁতা, প্রহার আর লাথির পর লাথি মারতে থাকে। তাদের এইভাবে বেলা তিনটা পর্যন্ত মারার পর জিন্নাহ রাস্তার উপর তাদের ফেলে রেখে আমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যায়। তারপর আমার বাড়ী গিয়ে আমার বড় ভাইকে খোঁজ করে কিন্তু তাঁকে বাড়ী না পেয়ে ঘরের মধ্যে শেখ সাহেবের যে ফোটো ছিল তা ভেঙ্গে ফেলে এবং পরে ওতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার বড় ভাই শ্রী পশুপতি সরকার আওয়ামী লীগ করতেন। তারপর আমাকে বাড়ী হতে শহরে নিয়ে আসার সময় একজন বেলুচ মিলিটারী আমাকে মুড়ি ও গুড় কিনে দেয় খাবার জন্য। আমি মুড়ি মুখে দিতেই একজন পাঞ্জাবী মিলিটারী লাথি দিয়ে তা আমার মুখ হতে ফেলে দেয় এবং অকথ্য ভাষায় আমাকে গালাগালি দেয়। তারপর আমাকে কালেক্টরেটে নিয়ে আসে। সেখান হতে তাদের গাড়ীতে করে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।। সেখানে গাড়ী হতে নামিয়ে মর্শাল ল কোর্টে নিয়ে হাজির করে। তারপর কর্ণেল আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার নিকট নাকি ওয়ারলেস পাওয়া গেছে? আমি অস্বীকার করি। তারপর আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যায় এবং সেখানে হাওলাদার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোর ভাই কোথায় আমাদেরকে বলে দিবি আর না হয় স্বীকার করবি যে আমার নিকট ওয়ারলেস পাওয়া গেছে। কিন্তু আমি কোন কথাতেই রাজি না হবার দরুন আমার পাছায় এবং পিঠে ২৫টা বেত মারে এবং আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে আবার জ্ঞান ফিরে পাই। তারপর প্রায় ৪০ জনকে মারতে মারতে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আবার বেতের ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে গাড়ি হতে নামায়। গাড়ি হতে নামিয়ে রৌদ্রের মধ্যে চিত করে শুইয়ে রাখে। তারপর বুকের উপর উঠে বুট দিয়ে খচতে থাকে। এই ভাবে বেলা ১১টা হতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত রৌদ্রের মধ্যে শুইয়ে রাখার পর আবার রাইফেলের গোড়া দিয়ে মারতে থাকে। মারার পর আবার গাড়ীতে করে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে এসে রেখে দেয়। এই ভাবে প্রত্যেকদিন অত্যাচার করার দরুণ দ্বিতীয় দিন বুটের খচনের সঙ্গে সঙ্গে তিন জন আমির, লতিফ ও গৌর নামক তিন ব্যাক্তি মারা যায়। তিন দিন পর পর এক বেলা খাবার দিত। আর পানি চাইলে প্রস্রাব করে নিয়ে এসে দিত। পায়খানা করতে চাইলে মার আরম্ভ করে দিত। এইভাবে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের উপর একই উপায়ে অত্যাচার করার পর ৭ই এপ্রিল মেজর আমাদেরকে ডাকে। আমরা ৩৫ জন মেজরের নিকট হাজির হই। মেজর সবার স্টেটমেন্ট নেবার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করে তা হলে তোমাকে কোন অপরাধে ধরে নিয়ে আসে। আমি প্রতি উত্তরে বলি স্যার আমি একজন বারবার, আমি, ওয়ারলেস চিনি না। আমার বড় ভাই আওয়ামী লীগ করেন। তাকে বাসায় না পেয়ে আমাকে ধরে আনে। তারপর মেজর চারজনকে রেখে ৩১ জনকে ছেড়ে দেয়। যে চারজনকে রেখে দেয় তারা হলো অরুণ, অমলা সোম, কেষ্ট এবং আর একজন নাম না জানা। ওদের চার জনকে কারেন্ট চার্জের জন্য নিয়ে যায়। তারা ফিরে আসে না। তারপর আমি ৭ই এপ্রিল উক্ত ৩১ জনের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট হতে মুক্তি পেয়ে বাড়ী চলে আসি।

সাক্ষর/-
শ্রী গণপতি সরকার
১৬/৩/৭৩

\ ১৭০ \

নূর জাহান
সুইপার, সি,এম,এইচ, মহিলা বিভাগ
যশোর ক্যান্টনমেন্ট

৩০শে মার্চ যখন গোলাগুলি শুরু হয় যশোর ক্যান্টনমেন্টে সেই সময় আমি হাসপাতালে ডিউটিরত ছিলাম। রাত আনুমানিক ১০টার দিকে ৬/৭ জনের এক পাঞ্জাবী দল হসপিটালে আসে এবং বলে তোমরা বন্দী।

৩০ তারিখের পর হতে প্রতি রাতে ৭/৮ বার করে হসপিটাল চেক করতো। তারা বলতো যে কোন পুরুষ মানুষ তোমরা লুকিয়ে রেখেছো। এটা একটা বাহানা ছিলো। ১১ই এপ্রিল তারিখে সামরিক হসপিটালের ষ্টাফ বাদে যে সমস্ত মহিলারা প্রাণ ও ইজ্জতের ভয়ে হসপিটালে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাদের সবাইকে রাত অনুমান ১ টার দিকে নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়ে দেবে বলে নিয়ে যায়। উক্ত মহিলারা সবাই ছিলেন ই, পি, আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের ও বেসামরিক লোকদের স্ত্রী, কন্যা ও শিশু। প্রথমে তাঁদের আর্টিলারীর ঘরে নিয়ে আটকে রাখে।

উক্ত ছয় সাত ঘরে ভদ্রমহিলারা ছিলেন। উক্ত এলাকাতে যারা পাহারা দিত সেই পাকসেনারা দু'জন ঘরের দরজা জোর করে ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে এবং দু'জন ভদ্রমহিলার উপর অত্যাচার করে। একজন ভদ্রমহিলা পেটে যে বাচ্চা ছিলো তা এই অমানুষিক অত্যাচারের ফলে নষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর উক্ত এলাকা হতে ৪ জন অভূক্ত রেখে বন্দী মহিলাদের সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

লেডী ডাক্তার এবং দু'জন সিসটার এবং আয়া ছিলো তিনজন। সবাইকে হসপিটালে বন্দী করে রাখে। দুইমাস হসপিটালে সিসটার জুজুভিনের ঘরে থাকেন বাকী ষ্টাফরা। একটা ঘরে সবাইকে বন্দী করে রাখে। প্রায় প্রতিরাতে পাকসেনারা উক্ত ঘরে এসে তল্লাসী চালাতো। দুই মাস পর সবাই লেডী ডাক্তারের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

একদিন দেখি যে একজন বাঙ্গালী যুবকের দেহ হতে রক্ত বের করে নিয়ে তাকে হত্যা করে। ছেলেটির শেষ কথা ছিলো "মা, স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না।"

ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ১০ নং পুকুরের ধারে দুইজন অজ্ঞাত পরিচিত মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। তাদের লাশ ওখানে পড়ে ছিলো। দুজন শিশুও ছিলো।

টিপসহি
নূর জাহান (সুইপার)
২২/৩/৭৩

\ ১৭১ \

মোঃ মোহসিন উল্লাহ
গ্রাম-চৌগাছা
থানা-ঝিকরগাছা, জেলা-যশোর

১৯৭১ সালের ১৫ই অক্টোবর ২০/২৫ জন পাক মিলিটারী রাত প্রায় ১১টায় আমাদের বাড়ীতে চলে যায়। আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে নাম ধরে ডাকলে আমি ঘর হতে বেরিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে দুজন পাকসেনা আমার দু'হাত ধরে ফেলে এবং গামছা দিয়ে পিঠমুড়া করে দু'হাত বেঁধে ফেলে দেয়। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় এবং একজন চাকর ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিলো তাকেও ধরে ফেলে এবং আমার নিকটে নিয়ে আসে। একজন সুবেদার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। তোমার ভাই মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার? তোমার গ্রামে কয়জন মুক্তিবাহিনী আছে? তুমি মুক্তিবাহিনীকে আমাদের খবরাখবর পৌছে দাও? তাদের সবগুলো কথার জবাব আমি অস্বীকার করি। তারপর আমাকে হুমায়ূন কবির নামে একজন পাঞ্জাবী ফোন অপারেটার ৪/৫ টা ঘুষি মেরে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর অমাকে মোটা একটা কাঠের লাঠি দিয়ে সমস্ত শরীরে আঘাত করে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে সত্যি করে বলো তোমার ভাই মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার নয়। তারপর আরও ৮/৯ জন মিলিটারী আমার নিকটে চলে আসে এবং তারা প্রত্যেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে বুট দিয়ে লাথির পর লাথি মারতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন ছোট ১২/১৪ বছরের বিহারী ছেলে ছিল। সে আমাকে ২/৩ হাত দূর থেকে জাম্প করে এসে আমার বুকে আঘাত করে। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।প্রায় একঘন্টা পর আবার জ্ঞান ফিরে পেলে আমাকে স্কুলের দোতালায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে একটা আকড়ার সাথে দু'হাত ঝুলিয়ে বেতের লাঠি দিয়ে সারা শরীরে বেদম প্রহার করার দরুন সমস্ত শরীর ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। প্রায় ১৫/২০ মিনিট আমাকে মারার পর আমি যে কখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি তা আমি বলতে পারি না। তারপর জ্ঞান ফিরে পেলে আমি দেখতে পাই আমি একটা ঘরের মধ্যে পড়ে অছি। তারপর ৭ দিন আমাকে বিভিন্ন উপায়ে প্রহার করার পর আমি হাঁটতে চলতেও একস্থান হতে অন্যস্থানে সরে যেতে না পারার জন্য আমাকে প্রহার করা বাদ দেয়। আমি আধা মরা অবস্থায় ঘরের একটা কোণে পড়ে থাকি। আমাকে ধরার দুদিন পর আমার চাকরটাকে ছেড়ে দেয়। তারপর মেজর ২৬শে অক্টোবর আমাকে ডাকে। ৪/৫ জন মিলিটারী ধরাধরি করে আমাকে মেজরের সামনে এনে হাজির করে। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে তুমি সত্য করে বলো মুক্তিবাহিনী তোমাদের বাড়ীতে আসি কিনা? তোমার ভাই মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার কি না? তোমাদের গ্রামে কতজন ছেলে মুক্তিবাহিনী হয়েছে। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আমি অস্বীকার করি। তারপর মেজর একজন সুবেদার ডাকে। উক্ত সুবেদার মেজরের নিকট আসলে মেজর তাকে আদেশ করে এই লোক কোন দোষী নয়। একে গাড়িতে করে তার বাড়ীতে রেখে এসো। তারপর আমাকে গাড়িতে করে আমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসে। অর্থাৎ ২৬শে অক্টোবর আমি ছাড়া পাই। তারপর আমি বাড়ী গিয়ে তিন মাস স্থানীয় চৌগাছ বাজারের একজন ডাক্তারের নিকট চিকিৎসায় ভাল হয়ে উঠি। এখন আমি চলে ফিরে খেতে পারি। কিন্তু কাজকর্ম করে খাবার মত কোন সামর্থ্য আমার নেই। এখনও মেঘ বৃষ্টি হলে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা বেদনা করে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।

চৌগাছা সরকারী ডাক বাংলোর পিছনে ২০/২৫ টা কবরে প্রায় ৭০/৮০ জনকে প্রত্যেক দিন প্রায় ৮/১০ জন করে লোককে ব্যায়েনেট দিয়ে খুঁচিয়ে আধা মরা করে ২/৩ জনকে একই ছালার মধ্যে ভরে ছালার মুখ বেঁধে উক্ত কপোতাক্ষ নদীতে ফেলে দিয়েছে। উক্ত নদীর উপর একটা ব্রীজ আছে, সেখানেও নিয়ে গিয়ে ব্যায়োনেট

চার্জ করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। অনেককে উক্ত নদীরে উপর যে ব্রীজ পার হয়ে নদীর পশ্চিম পারে প্রায় ৩০/৪০ টা করে ৮০/৯০ জন লোককে মেরে পুঁতে রেখেছে। যে সমস্ত লোক পাকসেনারা চৌগাছায় মেরেছে এবং তাদের ক্যাম্পের আশপাশে পুতে রেখেছে এর মধ্যে অধিকাংশই শরণার্থী। কারণ তারা কাশিমপুর মাশিলা হিজলী ইত্যাদি বর্ডার দিয়ে ভারতে যাবার সময় পাকসেনারা তাদেরকে ধরে এবং চৌগাছায় তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তারপর নৃশংসভাবে হত্যা করে পুঁতে রাখে। এইভাবে দীর্ঘ নয় মাসে চৌগাছাতে পাকসেনারা ১০০/১৫০ জন লোককে হত্যা করে। তাদের মধ্যে মেয়ে ও পুরুষ উভয়ই ছিল। মেয়েদেরকে ২/৩ দিন রেখে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর ব্যায়োনেট চার্জ করে নদীতে ফেলে দিত। আমি যে এগার দিন ছিলাম ঐ কয়দিনে প্রায় ২০/২৫ জন লোককে ডাক বাংলোর পিছনে রাত আটটার পর প্রতিদিন ৪/৫ জন করে হত্যা করে পুঁতে রাখে।

সাক্ষর/-
মোঃ মহসিন উল্লাহ
১০/৫০৭৩

\ ১৭২ \

লুৎফর রহমান মোল্লা
মিরপুর থানা, জেলা-কুষ্টিয়া

আলমডাঙ্গা থানায় কাজ করছি এমন সময় একখানা পাক মিলিটারী গাড়ি গিয়ে থানা ঘিরে নেয় এবং আমরা থানার স্টাফ ৪ জনসহ মোট ১২ জন ধরা পড়ি। আমাদের প্রত্যেককে গাছের সঙ্গে দুই হাত বেঁধে বেতের লাঠি দিয়ে ভীষন প্রহার করার পর বুট দিয়ে লাথির পর লাথি মারাতে আমার দুটা দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং আমার সারা শরীর ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। তারপর একজন মিলিটারী আমার বুকের উপর উঠে বুট দিয়ে পাড়ানোর চোটে আমার বুকের হাড় ভেঙ্গে যায়। পরে আর একটা মিলিটারী আমার পায়ে ব্যায়োনেট চার্জ করে। তারপর ক্যাপ্টেন মুজাফফর হোসেন নাগভী আদেশ দেয়, ১২ জনকে ৬টা জোড়া করে দুইজন করে সামনা সামনি হাত বেঁধে হাট বোয়ালীয়া একটা নদীর ধারে নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে চোখ বেঁধে হাঁটু পানির ভিতর নামিয়ে গুলি করে দেয়। এইভাবে পাঁচ জোড়া গুলি করার পর সর্বশেষ জোড়ায় ছিলাম আমি ও আলমডাঙ্গা থানার ও, সি সাহেব। যখন আমাদেরকে গুলি করতে নিয়ে যায় সেই সময় ছানাউল্লাহ নামক একজন কনস্টেবল এবং ইব্রাহিম নামক একজন কসাই ও, সি সাহেবের নিকট এসে বলেন যদি ১৫০০০ টাকা দেন আপনার জান বাঁচিয়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে ও, সি সাহেব সম্মতি জানানোর পর ক্যাপ্টেনের নির্দেশে তাঁর হাতের বাঁধন ছেড়ে দেয় এবং তাঁকে ক্যাপ্টেনের গাড়িতে নিয়ে উঠায়। তারপর আমাকে গুলি করার জন্য চোখ বেঁধে হাঁটু পানির মধ্যে নিয়ে দাঁড় করায়। তখন আমি ক্যাপ্টেন সাহেবকে বলি স্যার আমার একটা ফরিয়াদ আছে। আমি কোন দোষ করি নাই, বিহারীরা আমার নামে মিথ্যা বলে আপনার নিকট আমার সম্বন্ধে বলেছে। তখন ক্যাপ্টেন আমার চোখের বাঁধন খুলে দেয় এবং বলে আগামীকাল এর বিচার করা হবে, আজ একে থানায় একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে রেখে দাও। দুইজন মিলিটারী আমাকে নিয়ে এসে একটা ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। ঘরটার দরজা ভাঙ্গা ছিল। তারপর পাকসেনারা ৪/৫ জন মেয়েকে থানায় নিয়ে আসে এবং তাদেরকে নিয়ে তারা আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকে। এদিকে রাত্রিতে মুষলধারে ঝড় আর বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। তখন আমি চিন্তা করি। আমাকে তো আগামীকাল গুলি করে মারবে, তাই শেষ চেষ্টা করলাম অর্থাৎ দরজাটা একটু জোরে প্রেশার দিলে দরজা খুলে যায়। আমি অমনি চোরের মতন ধীরে ধীরে ঘর হতে বেরিয়ে একটা খালের ধার দিয়ে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে সারা রাত্রি চলার পর ভোর হয়ে গেলে একটা বৃদ্ধ লোককে দেখতে পাই। তাকে দেখে আমি জড়িয়ে ধরি এবং বলি বাবা আমাকে কিছু খেতে দেন। লোকটি আমাকে তার বাড়ী নিয়ে যায় এবং আমাকে খেতে দেয়। তারপর আমি ভারতে আশ্রয় নেই।

এরপর যশোর ক্যান্টোনমেন্ট আমাদের দখলে এসে গেলে আমি একদিন রাত্রি বেলা বাড়ীতে যাই। গিয়ে আমার ছেলেকে ডাকি আমার স্ত্রী দরজা খুলে দেয়। তখন আমি দেখতে পাই আমার স্ত্রী বিধবার কাপড় পড়ে আছে এবং তার গায়ের অলঙ্কার বলতে কিছুই নেই। আমাকে দেখে সে কেঁদে ফেলে এবং বলে আমি যেদিন শুনতে পাই তোমাকে পাক বাহিনী মেরে ফেলেছে সেই দিন হতে আমি বিধবার কাপড় পরিধান করেছি। তারপর আমি আমার সমস্ত ঘটনা খুলে বলি।

স্বাক্ষর /-
লুৎফর রহমান মোল্লা

\ ১৭৩ \

শ্রী সংকর প্রসাদ ঘোষ

গ্রাম-আউড়িয়া, পোষ্ট-হাট বাড়ীয়া
থানা-নড়াইল, জেলা-যশোর

যশোরের চৌগাছায় পাকসেনাদের হাতে আমরা ধরা পড়ি। পাকসেনারা চৌগাছার হাইস্কুলে আমাদেরকে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাদের ঘড়ি টাকা পয়সা সব কিছু নিয়ে নেয়। তারপর প্রথমে আমাকে, জামা ও প্যান্ট খুলে, দু'জন পাকসেনা বাঁশের লাঠি দিয়ে সারা শরীরে প্রহার করতে থাকে। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা প্রহার করার পর আমার দুপা বেঁধে একটা আকড়ার সাথে পা উপর দিয়ে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে সমস্ত শরীরে প্রহার করতে থাকে মেজর তখন চেয়ার পেতে বসে আছে। আর একদল আমাকে প্রহার করতে থাকে, আর একদল আমাকে প্রহার করা দেখে হাসতে থাকে, আর বলতে থাকে, বল মাদার চোদ টিক্কা খাঁন জিন্দাবাদ। আমার সমস্ত শরীর হতে রক্ত ঝরতে থাকে তারপর যে কি হয় আমি বলতে পারি না। প্রায় তিন ঘন্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পাই আমার পাশে আমার দু'বন্ধু ইলিয়াছ ও সুনিল কুমার বসু পড়ে আছে। তাদের শরীর হতে আমার শরীরের ন্যায় রক্ত ঝরছে। প্রহারের দরুন তাদের ও আমার শরীর ফুলে যায়। আমরা পানি খেতে চাইলে প্রশ্রাব এনে সামনে দিত। তার গন্ধ পেয়ে আমরা মুখ বন্ধ করতে থাকলে ইট নিয়ে এসে মুখে মারতো। সন্ধ্যার পর আমাদেরকে স্কুলের পিলারের নিকট নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে তিনজনকে তিনটা পিলারে পিঠমুড়া করে জড়িয়ে চেপে বাঁধে। আর মাজার সাথে পিলারে বেস্টন দিয়ে বেঁধে ফেলে আবার প্রহার করতে থাকে। আমরা তৃষ্ণায় পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকি। তখন বৃষ্টি নামে। উক্ত বৃষ্টির পানি আমাদের মাথায় পড়তে থাকে। উহা আমাদের শরীর বেয়ে পড়তে থাকে উক্ত পানি খেয়ে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করি। তারপর দিন, হাত পায়ের রশি খুলে দেয় এবং আবার পিটাতে থাকে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, তোমরা মুক্তিবাহিনী কিনা? এবং ট্রেনিং জানো কি না? তখন আমরা বলি, না, আমরা ট্রেনিং জানিনা ও আমরা মুক্তিবাহিনীও নই। তারপর মারা বাদ দিয়ে পাকসেনারা ৩/৪ জন আমাদেরকে ধরাধরি করে তাদের গাড়িতে তুলে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে নিয়ে আমাদেরকে একটা ঘরে বন্দি করে রাখে। তার ১০/১৫ মিনিট পর একজন হাবিলদার ও ৭/৮ জন মিলিটারী আমাদের নিকট আসে এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, সত্যি করে বল, ভারতে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এ যেতে ছিলে কিনা এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে। তারপর আমরা তাদের কার কোন জবাব দেইনি। তারপর আমাদের হাত আবার পিঠমুরা করে পিলারের সাথে বেঁধে ১০/১৫ মিনিট সময় দিয়ে বলে যে এর মধ্যে যদি সত্যি কথা না বলো তা হলে গুলি করে হত্যা করবো এই বলে আমাদের দিকে বন্দুক ধরে রাখে। আমরা জবাব দেই যে আমরা সত্যি বলছি আমাদের লোক হাড়িয়ে গিয়েছে তাদের খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। আমরা ভারতে যাবার উদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই। তারপর আমাদের তিনজনকে একটা ঘরের মধ্যে ১৫ দিন রেখে দেয়। ঐ কয় দিনের প্রত্যেক দিনই খাবারের সময় এবং পায়খানা প্রশ্রাবের সময় কিল, ঘুষি লাথি, ইত্যাদি খেতে হতো। তারপর সেখান হতে যশোর কোতায়ালী থানায় পাঠিয়ে দেয়। ওখানে এক রাত্রি থাকার পরদিন কোর্টে ৫৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করে যশোর সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে রেখে দেয়। সেখানে বাঙ্গালী চিকিৎসক ছিলেন তারা আমাদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। সেখানে ১২ দিন থাকার পর কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে মুক্তি লাভ করি। তারপর বাড়ী এসে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে উঠি। জুন মাসের ২০ তারিখে আমরা ধরা পড়ি এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে যশোরের প্রথম শ্রেনীর মেজিস্ট্রেট শেখ আবদুল্লা সাহেবের কোর্ট থেকে মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর /-
শ্রী সংকর প্রসাদ ঘোষ
৬-৬-৭৩

\ ১৭৪ \

মোঃ মানিক শিকদার
গ্রাম-চিলগাছা রোগুনাতপুর
ডাকঘর-কমলাপুর
থানা-নড়াইল
জেলা-যশোর

১৯৭১ সালের ৭ই জুন রাত্রি প্রায় ভোর চারটার সময় ২০/২৫ জন রাজাকার ও মিলিটারী আমার বাসায় যায়। এবং বাসা ঘেড়াও করে বাসার মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাকে ধরে ফেলে। আমাকে ধরার সাথে সাথে বাঁশের লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে আমার পায়ের তালুতে, ঘারে, হাতের আঙ্গুলীতে এবং শরীরের বিভিন্ন গিড়ায় গিড়ায় প্রহার করতে থাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে যথাঃ ই, পি, আর কোথায়? তোর রাইফেল কোথায়? তোর ভাই কোথায়? তার জবাবে আমি বলি যে, আমি কিছুই জানিনা। তারপর আমার বাড়ীতে আমাকে ঘণ্টাখানেক প্রহার করার পর নড়াইল নিয়ে আসে এবং সেখানে নিয়ে এসে আবার প্রহার করতে থাকে এবং ঐ একই কথা বার বার বলতে থাকে, আমি অস্বীকার করায় প্রায় দু'ঘণ্টা আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় প্রহার করার দরুন আমার শরীর হতে রক্ত ঝরতে থাকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার আধা ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পাই আমি ডাকবাংলার একটা কক্ষে এবং সেখানে আরও ১২/১৪ জন লোক আধামরা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। তারপর ৭ দিন উক্ত ডাকবাংলায় রাখার পর আমাকে যশোর মিলিটারীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। যশোর পৌছার পর আমাকে সারকিট হাউসে নিয়েই ৪/৫ জন মিলিটারী বুট আর বেতের লাঠি দিয়ে এক এক করে লাথি কিল, ঘুষি, আর প্রহার করতে থাকে। একজন মিলিটারী ৪/৫ হাত দূর হতে জাম করে এসে আমার মুখে লাথি মারে উক্ত লাথিতে আমার তিনটা দাঁত পড়ে যায়। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, তার ঘণ্টাখানেক পর আমার জ্ঞান ফিরে পেলে আবার প্রহার করতে থাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে যথাঃ ই, পি, আর কোথায়? রাইফেল কোথায়? তোর ভাই কোথায়? আমি জবাব দেই আমি কিছুই জানি না। তারপর আবার মারা শুরু করে এই ভাবে সারকিট হাউসে দু'দিন দু'রাত ছিলাম। প্রায় সব সময়ই আমাকে প্রহার করত। উক্ত দু'দিনে আমাকে একটু পানিও পান করতে দেয় নাই। সেখান হতে আমাকে যশোর সদর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে একমাস সাত দিন থাকার পর আমি জামিন নিয়ে বের হয়ে আসি। কিন্তু প্রতিদিন আমাকে কোর্টে হাজির হতে হত। এই ভাবে ৪/৫ তারিখ কোর্টে হাজির হবার পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। আমাকে ধরার প্রধান কারণ আমার বড় ভাই ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। আর আমার ছেলে ছিল মুক্তিবাহিনীতে। এই দুইটা কারণে আমাকে ধরে এবং প্রহার করে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দু'মাস চিকিৎসা করার পর সুস্থ হয়ে উঠি। এখনও শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বালা পোড়া করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মানিক শিকদার
৮/৬/৭৩

\ ১৭৫ \

শ্রী বিনয় কৃষ্ণ দত্ত

মহেশপুর, যশোর

১৯৭১ সালের ১৩শে মে রোজ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় আমি গোসল করার জন্য বাড়ী হতে বের হই। এমন সময় দেখতে পাই দু'খানা খাঁন সেনার গাড়ি এসে আমাদের মহেশপুর টাউন কমিটি ঘরের সম্মুখে থেমে যায়। আমি ঐ গাড়ী দেখার সঙ্গে সঙ্গে গোসল না করে বাড়ী ফিরে যাই। তার ১০/১৫ মিনিট পর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান সোজাসুজি আমার বাড়ী চলে আসে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার পর আমাকে বলে, চলো টাউন কমিটিতে, মেজর তোমাদের পরিচয় পত্র করে দিচ্ছে। তুমি উহা নিয়ে চলে আসবে। আমি সরল মনে তার সঙ্গে টাউন কমিটির সামনে চলে আসি এবং দেখতে পাই টাউন কমিটি হলের দরজা বন্ধ। তখন চেয়ারম্যান আমাকে বলে এখানে ৫ মিনিট অপেক্ষা কর, মেজর কিছুক্ষনের মধ্যে চলে আসছে । পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই দক্ষিণ দিক হতে দুটা পাক সেনার গাড়ি এসে আমাদের সামনে থেমে যায়। আমি গাড়ির দিকে তাকাতেই দেখতে পাই গাড়ির মধ্যে প্রায় ১০/১২ জন হিন্দু ও মুসলমান বসে আছে। তারপর চেয়ারম্যান মেজরকে আমাকে দেখিয়ে বলে, এ এক মালাউন হায়, অমনি একজন খাঁন সেনা গাড়ি হতে লাফ দিয়ে নেমে আমাকে গাড়িতে উঠতে বলে, আমি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট করে মহেশপুর হতে আধা মাইল দূরে ভালায়পুর নামক একটা ব্রীজ আছে, তার পূর্ব দিকে আম কাঁঠালের বাগান আছে, সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আমাদেরকে গাড়ি হতে নামায়। আমি গাড়ি হতে নেমেই দেখতে পাই, ঐ খানে একটা গাছের নীচে ৪/৫টা ছাগল আর একটা কাঠাল গাছে একটা যুবক গাছ হতে ঐ ছাগলগুলোর জন্য পাতা পাড়ছে। মেজর তাকে দেখেই ডাকে। লোকটি অমনি মেজরের ডাকে তার কাছে চলে আসে। তার হাতে ছিল একটা দা। মেজর দা খানা তার হাত হতে নেয় এবং ২-৪ মিনিট চেয়ে দেখার পর তাকে জিজ্ঞেস করে ইয়ে কিয়া হায়? সে বলে দা। তারপর দা খানা তার হাতে দিয়ে বলে, এই দা দিয়ে এই লোকগুলোকে জবাই করতে পারবে? লোকটি অস্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন হতে একজন পাকসেনা রাইফেল নিয়ে দৌড়ে তার কাছে চলে আসে এবং তার ঘাড়ে এবং পিঠে দু'টা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার ২-৪ মিনিট পর সে মাজা বাঁকা করে সেখান হতে চলে যায়। তারপর আমাদের সবাইকে লাইন করে দাঁড় করায়। ৮ জন পাকসেনার মধ্যে তিনজন রাইফেল নিয়ে তিন দিকে আমাদের থেকে প্রায় ২০/২৫ গজ দূরে চলে যায় এবং আমাদের দিকে পজিশন নিয়ে থাকে। আর বাকি ৫ জন পাকসেনা প্রত্যেক একটা মোটা লাঠি হাতে করে আমাদের সবাইকে ঘারে এক বাড়ি আর মাজায় দু'বাড়ি মারার পর শেষে আমাদের সবাইকে পায়ে দড়ি লাগিয়ে হেঁচড়ে টেনে একটা গর্তের ধারে নিয়ে সবাইকে বেয়োনেট চার্জ করে আমাদের সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করে। পরে আমাদেরকে একই গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটিচাপা দিয়ে তারা চলে যায়। পাক সেনারা চলে যাবার প্রায় মিনিট দশেক পর আমি অতিকষ্টে ধীরে ধীরে ঐ গর্তের উপরে উঠি এবং আমার সঙ্গে আরও একজন লোক ধীরে ধীরে উপরে উঠে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়েই ২০/২৫ গজ রাস্তা চলার পর মাটিতে পড়ে যায়। তার কিছু সময় পর সে সেখানে মারা যায়। আমার পেটে একটা বেয়োনেটের খোঁচা লেগে নাড়ি বের হয়ে গিয়েছিল, আমি আমার গামছা দিয়ে পেট বেঁধে ৪০/৫০ গজ পথ চলার পর একটা বাড়ী পাই এবং সেই বাড়ির মালিক আমাকে দেখে এগিয়ে আসে। আমাকে পানি খাওয়াবার পর আমি সেখানে থাকতে চাইলে বাড়িওয়ালা খান সেনাদের ভয়ে আমাকে রাখতে অস্বীকার করে। তারপর তারা আমাকে ধরাধরি করে ভৈরব নদীর পাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পাই একজন লোক নৌকা নিয়ে জাল দিয়ে নদীতে মাছ

ধরছে। লোকটা আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখে নৌকা নিয়ে নদীর তীরে চলে আসে এবং আমার অনুরোধে আমাকে নদী পার করে দেয়। আমি অতিকষ্টে রামচন্দ্রপুর নামক একটা গ্রামে সন্ধ্যা ৭টার সময় একটা বাড়ীতে গিয়ে থাকার জন্য একটু জায়গা চাই কিন্তু ঐ বাড়িওয়ালা খান সেনাদের ভয়ে জায়গা দিতে অস্বিকার করে। আমি বলি আমার আর চলার শক্তি নাই তখন ঐ বাড়ীর ৪ জন লোক একটা তক্তায় করে আমাকে নিয়ে রামচন্দ্রপুর স্কুলে রেখে আসার কথা বলে সুন্দরপুর নদীর ঘাটে ফেলে রেখে আসে। আমি সেখানে আধামরা অবস্থায় পড়ে থাকি। তখন রাত্রি ১০-৩০ মিঃ। সেই সময় কোটচাঁদপুর হাট হতে জালাল নামক একটা লোক সুন্দরপুর নদীর ঘাটে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি করে মহেশপুর চলে এসে খবর দেয়। তৎক্ষণাৎ মহেশপুর হতে জালাল ও আরও চারজন লোক একটা বাঁশের মাচাল নিয়ে সেখানে চলে যায় এবং ঐ মাচালে করে আমাকে মহেশপুর নিয়ে আসে। আমাকে মহেশপুর নিয়ে এসে কোহিনূর বেগমের বাসায় রেখে এবং বজলু নামক একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় ১০/১৫ দিন পর আমি সুস্থ হয়ে উঠলে ডাক্তার একটা গরুর গাড়ী ভাড়া করে আমার পরিবারের সকলকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। তারপর আমি ভারতে গিয়ে সিন্দ্রানী হাসপাতালে প্রায় দু'মাস চিকিৎসা করার পর সুস্থ হয়ে উঠি এবং বাংলাদেশ স্বাধিন হবার পরপরই বাংলাদেশে চলে আসি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আমি জানতে পারি আমার সঙ্গে যাদেরকে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং আমার সঙ্গে যাদেরকে একই গর্তে পুঁতে রাখা হয়েছিল আমি ছাড়া আর সবাই নাকি মারা গেছে।

স্বাক্ষর /-
শ্রী বিনয় কৃষ্ণ দত্ত
২৭/১/৭৩

\ ১৭৬ \

যশোর জেলার মহেশপুর থানার অধীন
মহেশপুর হাসপাতালে পাক সেনাদের কার্যাবলী

মহেশপুর থানা থেকে মহেশপুর হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় কোয়ার্টার মাইল হবে। খালিশপুর হতে একটা সরকারী কাঁচা রাস্তা মহেশপুর থানার পশ্চিম পার্শ্ব নিয়ে মহেশপুর গ্রামের মধ্যে দিয়ে বর্ডার পর্যন্ত গিয়েছে। মহেশপুর হাসপাতালটা পূর্ব পশ্চিম লম্বা। হাসপাতালের সামনে একটা মাঠ, পূর্বে ১০/১২ খানা মুচি বাড়ী, পশ্চিমে মহেশপুর বাজার আর উত্তরে হাসপাতালের সঙ্গেই লাগানো সরকারী রাস্তা। ঐ রাস্তার নীচেই একটা মরা নদী এবং ঐ নদীর উপরে হাসপাতাল থেকে প্রায় ১০০ গজ দুরে উত্তর দক্ষিণ দিক লম্বা একটা ব্রীজ। ১৯৭১ সালের ১৫ই এপ্রিল খান সেনারা যশোর থেকে কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, খালিশপুর হয়ে মহেশপুর চলে আসে। মহেশপুর এসেই তারা মহেশপুর হাসপাতালে ঘাঁটি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে থেকে প্রায় ১৫০ জন মহেশপুর থানায় সব সময়ের জন্য রেখে দেয়। পাঞ্জাবী খান সেনারা মহেশপুর পৌছেই হিন্দু, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের বাড়ী-ঘর লুটপাট করায় এবং মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামের কর্মীদের ছাড়া যাদের সম্মুখে পায় তাদেরকেই গুলি করে মারে। খান সেনাদের মহেশপুর আসার পূর্বেই কিছু লোক ভারতে চলে যায় আর যারা ভারতে যায় নাই এখানেই আশপাশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তাদেরকে ধরে নিয়ে সোজাসুজি হাসপাতালে নিয়ে যেত এবং সেখানে নিয়ে একটা রুমে বন্দি করে রাখত। মেজর আনিছ ছিল প্লাটুন ক্যাপ্টেন। খান সেনারা এইভাবে মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ, খালিশপুর, ইত্যাদী স্থান হতে লোকজনকে ধরে কাউকে সেখানেই গুলি করে মারত আর যাদের মারত না তাদের মহেশপুর হাসপাতালে নিয়ে এসে একটা বদ্ধ ঘরে বন্দি করে রেখে দিত। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ১০/১২ জনকে বের করে নিয়ে হাসপাতালের এরিয়ার মধ্যেই হাসপাতাল থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে ৫০/৬০ টা গর্ত করা আছে সেখানে নিয়ে কাউকে জবাই করত, কাউকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারত, আবার কাউকে লাইন করে গুলি করে মারত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নাকি ২/৩ রাউণ্ড গুলির শব্দ মহেশপুর বাজারের লোকজন পেত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গুলি করে লোক মারার খবর মহেশপুরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে গেল। তখন থেকে খান সেনারা শুধু গর্তের ধারে নিয়ে জবাই করত আর বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারত এবং অনেককে ভালায়পুর ব্রীজের উপর নিয়ে জ্যান্ত অবস্থায় একটা বস্তায় ভর্তি করে বস্তার মুখ বেঁধে ব্রীজের উপর হতে ফেলে দিত। এ ভাবেই তারা জনসাধারণকে মেরেছে। আর বিভিন্ন এলাকা থেকে সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে ৪/৫ দিন পাশবিক অত্যাচার করার পর তাদেরকেও ঐ সব গর্তে মেরে পুঁতে রাখত। এইভাবে প্রায় ৩/৪ শত লোককে একমাত্র হাসপাতালে মারা হয়েছে। কেন না বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই মহেশপুরের স্থানীয় জনসাধারণ সেখানে গিয়ে নাকি দেখতে পায় হাসপাতালের পূর্ব দিকে মানুষের গন্ধে যাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে নাকে কাপড় দিয়ে তারা গিয়ে দেখতে পায়, প্রায় ৬০টির মত গর্ত করা প্রতি গর্তে ৫/৭ টি করে কারও মাথা, কারও ডানা, কারও পা, কারও শরীরের অংশটাই পড়ে আছে। যদিও দীর্ঘ এক বছর পার হয়ে গেছে এবং সেখানে কোন নিদর্শন থাকার কথা নয়। আমি নিজে সেখানে গিয়ে দীর্ঘ একটা বছর পরও একটা মানুষের মাথা, প্রায় ২০/২৫টা গর্ত ও মানুষের অনেক হাড় পাই।

স্বাক্ষর/-
দেবাসীষ দাস।

\ ১৭৭ \

আইনুল হক
গ্রাম-কচুবিল
থানা-মহেশপুর
জেলা-যশোর

মহেশপুর থানার কচুবিল পাক সেনাদের ঘাঁটিতে গণহত্যার বর্ণনা। কচুবিলে পাক মিলিটারীদের ক্যাম্প ছিল। সেখানে প্রায় ১০০ জন লোককে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়। যে ১০০ জন লোককে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়, প্রথমে তাদেরকে দুপা এবং দুহাত রশী দিয়ে বেঁধে একটা আম গাছের ডালে পা উপর দিকে ঝুলিয়ে রেখে লাঠি দিয়ে ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে শুধু শরীরের বিভিন্ন জোড়ায় মারতে থাকে। প্রায় ৩ ঘণ্টা মারার পর তারা অজ্ঞান হয়ে গেলে মাটিতে নামিয়ে ফেলে রেখে দেয়। জ্ঞান ফিরলে আবার তাদের মাটিতে শুইয়ে বুট দিয়ে পিঠের উপর উঠে খছতে থাকে এবং কাউকে ছুরি দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কেটে কেটে লবণ মাখিয়ে দিয়ে ফেলে রাখে। তাদের উপর দৈহিক পীড়ন করার পর একটা গর্তের মধ্যে নিয়ে ফেলে রেখে কিছু বাবলার কাটা তাদের শরীরের উপর দিয়ে জ্যান্ত মাটিচাপা দিয়ে চলে আসতো। এইভাবে প্রতিটি গর্তে প্রায় ৫/৭ জনকে রেখে বিভিন্ন উপায়ে তাদের উপর অত্যাচার করার পর জ্যান্ত অবস্থায় মাটিচাপা দিয়ে রাখতো। এইভাবে প্রায় ১৫/২০টা গর্তে ১০০ জনকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে।

স্বাক্ষর/-
আইনুল হক

\ ১৭৮ \

বনবিহারী সিংহ

নওয়াপাড়া
যশোর

১৯৭১ সালে ২৭শে মার্চে পাক বাহিনীর একটি দল সমস্ত বেরিকেড সরিয়ে চলে আসে নওয়াপাড়াতে। তারা জনসাধারণকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে বেরিকেড উঠানোর কাজে লাগিয়ে দেয়। সেই সময় আমি সংবাদ পাই যে চেংগুটিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবের নিকট হতে পাক বাহিনী নওয়াপাড়ার দিকে যাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে আমি স্থানীয় জনসাধারণদের জানাই। তাঁরা নিরাপত্তার জন্য যে যতটুকু পেরেছে সাবধান হয়েছে। সেই সময় আমার ঘরে ছিলেন রুস্তম আলী সর্দ্দার (গার্ড ২৮ ডাউন এক্সপ্রেস), এস, এম, হক (গার্ড ৬৪ ডাউন প্যাসেঞ্জার), সালে আহম্মদ, নওয়াব আলী (চেকার), আইনুল হক (পোর্টার), ইমান আলী ও আব্দুল ওদুদ (পয়েন্টম্যান) গ্যাংসেট নবুশেখ গ্যাং, খালাসি শামছু। আমরা সবাই ডিউটিরত অবস্থায় ষ্টেশনে ছিলাম। কারণ এছাড়া জীবনের আর কোন নিরাপত্তা ছিলো না। আরা আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন অন্যায় করিনি বলে জানতাম। এরপর হঠাৎ ঐ দিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ বেলা ১১টার সময় একদল পাক সেনা ষ্টেশনের অফিস কামরায় প্রবেশ করে। অফিসে প্রবেশ করে প্রথম চেয়ারে অবস্থানরত জনাব রুস্তম আলী সর্দ্দার সাহেব ও নওয়াব আলী সাহেবকে প্রথম হত্যা করে। আমি তাদের নিকটে ছিলাম। তারা হত্যা করেই ঘর হতে বের হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে বলে যে, কে জীবিত আছো কাছো এসো। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উক্ত দু'জনকে হত্যা করার পর ঘরে অবস্থিত অন্য সবাই বেঞ্চের নিচে আশ্রয় করার ফলে তাদের পাক বাহিনী কর্তৃক ব্রাশফায়ারে কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু পরক্ষণে ঢুকেই যখন তাদের সকলকে দাঁড়াতে বলে তখন আমি একটা আলমারির ও দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে আত্বগোপন করে থাকি। দ্বিতীয়বার ঘরে প্রবেশ করে পাক বাহিনী জনাব সালে আহম্মদ ও জনাব এস, এম, হক সাহেবকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এবং আইনুল হক (পোর্টার) কে বাইরে বের করে গুলি করে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলিটি তার হাতে লাগে, ফলে জীবনে বেঁচে যায়।

প্রায় ২ ঘণ্টা পর আব্দুর রব সাহেব (সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার) আমার অফিস ঘরে এসে ডাক দেন আমার নাম ধরে এবং বলেন যে, পাক বাহিনী চলে গিয়েছে। তখন আমি উক্ত গোপন স্থান হতে আত্মপ্রকাশ এবং বাড়ী ফিরে এই দৃশ্যের কথা স্মরণ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এইভাবে কর্মরত ট্রেনের কর্মচারীবৃন্দকে তারা হত্যা করে। তবে যারা শহীদ হন তারা নওয়াপাড়া রেলওয়ে স্টাফ নন। তারা জড়ানো দুটো ট্রেনের গার্ড সাহেব ও চেকার সাহেব। ওয়াচম্যান জনাব আতর আলী সাহেবও শহীদ হন ঐ দিন।

এই মৃত দেহগুলি প্রায় ৪/৫ দিন পড়ে থাকার দরুন পচে যায় কিন্তু সৎকারের ব্যবস্থা হয়নি এবং সাধারণ মানুষ করতে সাহস করেনি। পরে কয়েকজনকে সাথে করে আমি মৃতদেহগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করি এবং কবরস্থ করি। পরে পাক বাহিনী নিজেদের দোষ চাপা দেবার জন্য বলে যে, ষ্টেশনে কে হত্যা করেছে তাদের ধরিয়ে দাও। তারা মানুষকে ভুল সংবাদ পরিবেশন করার চেষ্টা করে।

এরপর মাঝে মাঝে আমি ষ্টেশনে আসতে থাকি এবং সাথে সাথে ঘরে চলে যাই। জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমি শ্রী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় করি। কিন্তু ১১ই এপ্রিল তারিখে একজন পাক

মেজর নওয়াপাড়া বাজারে আসে এবং স্থানীয় দালালদের ও দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে একটা সভা করে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ী লুট করতে হবে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপর অত্যাচার চালাতে হবে।

এরপর উক্ত **১১ই** এপ্রিল তারিখে নওয়াপাড়ার বিভিন্ন এলাকার ও আশেপাশে লুটতরাজ শুরু করে দেয়। এতে বিহারীরা সবচেয়ে বেশী নৃশংসতার ছাপ রাখে। আমি যে গ্রামে ছিলাম সেই গ্রাম উক্ত দিন লুটতরাজ শুরু হলে ঐ গ্রাম হতে অন্যত্র পালিয়ে যাই।

স্বাক্ষর/-
বনবিহারী সিংহ
২/৫/৭৩

\ ১৭৯ \

অনিল কুমার মণ্ডল
গ্রাম-পাজিয়া
ডাকঘর-পাজিয়া
জেলা-যশোর

১৯৭১ সালের ৩ শে জুন, শনিবার সকাল ৭টার দিকে ৫ জনের একটা পাক সেনার দল আমাকে নিজ বাড়ী হতে ধরে ফেলে। উক্ত দিন প্রায় ৫০/৫২ থানা মিলিটারী গাড়ী পাজিয়া গ্রাম ঘিরে ফেলে। সকালে তারা গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

পাক সেনারা প্রথম ধরে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি হিন্দু না মুসলমান। আমি নিজেকে হিন্দু বলে প্রকাশ করায় আমার উপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। এবং উক্ত গ্রামের শ্রী রবি কুমার বাবু কোথায় আছেন তা জানতে চায় এবং আমাকেও মুক্তিফৌজের সাহয্যকারী বলে চিহ্নিত করে। উক্ত স্থান হতে শ্রী রবি কুমার বাবুর বাড়ীতে অবস্থিত পাক মেজরের নিকট নিয়ে হাজির করে।

পাক মেজর তখন বলে যে, তুমি মুক্তিফৌজ কিনা? তুমি ভারতে যাতায়াত করো কিনা? কিন্তু আমি অস্বীকার করি এবং বলি যে, আমি স্কুলে শিক্ষকতা করি এবং দৈনিক হাজিরা খাতায় উপস্থিত আছে সুতরাং উক্ত অভিযোগ মিথ্যা। একথা বলার পর একটা কাঠের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে আঘাত করে ফলে আমার হাত দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়। তারপর আমাকে ওখানে বসিয়ে রাখে। সেইখানে নারায়ণ প্রসাদ চক্রবর্তীকে বসিয়ে পিঠে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে থাকলে সে বিকট চিৎকার করতে থাকে। তখন এক জন বাঙ্গালী এস মেজরকে সংবাদ দেয় যে এক জন বাঙ্গালী বধুকে পাক সেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করছে। এই সংবাদে মেজর আমাদের বসিয়ে রেখে চলে যায়।

তখন আমাদের ধরে অন্য ঘরে নিয়ে যায়। আমাদের অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করে তৎকালীন পাকিস্তানের ২ জন দালাল। ঐ ঘরে গিয়ে দেখি যে রামচন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন লোককে বেদম প্রহার করে ফেলে রেখেছে। উক্ত লোকের সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে।

আমাকে ও নারায়নকে উক্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে এক সেনার লাঠি, রাইফেলের বাঁট, বুট জুতা ও ঘুষি দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে বেদম প্রহার করলো। এই ভাবে দিন ৮-৩০ হতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিভিন্ন পাক সেনা পর্যায়ক্রমে প্রহার করে। এইভাবে প্রহার করার পর আমাদের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তখন তারা প্রহার বন্ধ করে নির্দেশ দেয় যে, তিন জন বাঙ্গালী একে অপরের বিরুদ্ধে প্রহার শুরু করো। সেই নির্দেশ মতো আমাদের তিনজনের হাতে তিনটি লাঠি দিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই লাঠি দিয়ে যদি একে অন্যকে প্রহার না করো তবে তোমাদের হত্যা করা হবে। তখন নিরুপায় হয়ে জীবন রক্ষার জন্য নিজেরা মারামারিতে প্রস্তুত হই। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা নিজেরা মারামারি করি। তখন পাক সেনারা এই মারামারি উপভোগ করতে থাকে এবং আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। নানাভাবে এই সংঘর্ষকে উৎসাহ দিতে থাকে। এইভাবে নিজেরা মারামারি করে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। পাক সেনারা আমাকে আট স্থানে বেয়নেট চার্জ করে। বাকী দু'জনকেও ঐ একই ভাবে বেয়নেট চার্জ করে। রামের ঘাড়ে বেয়নেট দিয়ে প্রায় দুই ইঞ্চি মতো ক্ষত করে। তখন আমরা মৃতের মতো পড়ে থাকি এবং নড়াচড়া হতে বিরত থাকি। সেই সময় আমাদের শরীর হতে রক্তক্ষরণের ফলে দেহ অসাড় হয়ে আসতে থাকে।

তখন পাক সেনারা মৃত মনে করে আমাদের উপর লেপ তোষক দিয়ে ঢেকে দেয়। লেপের উপর তখন বিভিন্ন ধরনের কাঠ চাপ দেয়। আমরা তখন জীবিত অবস্থায় মৃতের মতো শুয়ে থাকি। আমাদের উপর চাপানো

কাঠের এক প্রকার সাদা পাউডার ছিটিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন স্থান হতে পেট্রোল ও কেরসিনের তেল ছিটিয়ে দেয়। এই সমস্ত করার পর দেশালাইয়ের সাহয্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য আমাদের পুড়িয়ে মারা। তখন প্রায় ৬টা বাজে। মেজরের বাঁশি বাজার পর পাক সেনারা ঘরের দরজা বাহির হতে বন্ধ করে চলে যায়। আমরা যাতে ঘরের বাইরে যেতে না পারি তার ব্যবস্থা করে যায় দরজা বন্ধ করে। যখন পাক সেনারা চলে যায় এবং আগুন জ্বলতে থাকে তখন আমরা অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াই এবং ঘর হতে বাইরে যাবার জন্য দরজায় আঘাত করি কিন্তু বাহির থেকে বন্ধ থাকায় তা কিছুতেই খোলা সম্ভব হয় নাই। পরে নিরুপায় হয়ে ও আগুনের বিভীষিকা দেখে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টাস্বরূপ একটা ছোট দরজা লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলি এবং অতি কষ্টে ঘর হতে বের হয়ে যাই। ঘর হতে বের হয়ে আমরা তিনজন নিকটস্থ একটা বাগানে প্রবেশ করি। বাগান হতে তিন জন তিন দিকে চলে যাই। পাক সেনারা তখন গ্রাম হতে চলে গিয়েছে। আমি মহর আলী নামে এক ব্যাক্তির বাড়ীতে আশ্রয় নেই। সেখান হতে আমার আত্মীয়রা আমাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করায়।

স্বাক্ষর/-
অনিল কুমার মণ্ডল
৪/৪/৭৩

\ ১৮০ \

সুধীর কুমার নাথ
গ্রাম-মদার ডাঙ্গা
ডাকঘর-পাঁজিয়া
থানা-কেশবপুর
জেলা-যশোর

২৬শে জুন, (১৯৭১) রাতে পাক বাহিনী গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে। আমি এই সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যাই এবং একটা ডোবাতে আশ্রয় নিই। পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে থেকে পাক বাহিনীর বর্বরোচিত কিছু ঘটনা অবলোকন করি। সে দিন বৃষ্টি হচ্ছিল। অনুমান সকাল ৯টার দিকে আমি এই ঘটনার সম্মুখীন হই। জনৈক ব্যাক্তির বিধবা স্ত্রীকে এক জন পাক সেনা ধর্ষণ করে ঘরের বাইরে চলে আসে। সেই সময় স্ত্রী লোকটিও ঘর হতে বিবস্ত্র বের হয়ে আসে। তখন আর একজন পাক সেনা তাকে ঘরে নিয়ে যায় এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

এইভাবে তিন জন পাক সেনা পর্যায়ক্রমে তার উপর অত্যাচার চালায়। তিনি তখন এর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাক সেনাদের পা জড়িয়ে ধরেন। কিন্তু বর্বর পাক সেনারা তা শোনে না। তৃতীয় পাক সেনা যখন ঘর হতে বের হয়ে আসে সেই সময় আমি ওখানে হতে চলে আসি। আসার পথে তাকে আমি এক ঘরের পাশে কাঁদতে দেখি এবং সারা কাপড়ে অত্যচারের কাল রক্ত লেগে থাকতে দেখি। মহিলার বয়স অনুমান ২৮ বৎসর। তিনি স্বাস্থবতী ছিলেন বিধায় জ্ঞান হারাননি। আরেক ব্যাক্তির দু'জন অবিবাহিত কন্যার উপর ঐ দিন পাক সেনারা পাশবিক অত্যাচার চালায়। এই গ্রামে প্রায় শতাধিক মহিলার উপর পাক সেনারা পাশবিক অত্যাচার চালায় ঐ একই দিনে।

স্বাক্ষর/-
সুধীর কুমার নাথ
৪/৪/৭৩

\ ১৮১ \

মিঃ মানিক মিঞা (পুলিশ)
থানা-মনিরামপুর
জেলা-যশোর

২৯শে মার্চ আমি যশোর জেলার কোতয়ালী থানার বসন্দিয়া পুলিশ ফাঁড়ি হতে পাক বাহিনীর আক্রমণের খবর পেয়ে সেখান হতে লোহাপাড়া থানার অন্তর্গত কালনা নামক গ্রামে গিয়ে এক মাস অতিবাহিত করি। সেখান হতে পুনরায় লোহাগড়া থানায় চলে আসি। মে মাসের ৯ তারিখে আমি আমার এক আত্মীয়ের খোঁজে যশোর শহরে চলে আসি। যশোর শহরের দড়াটানায় আমাকে এক বিহারী দেখে বন্দি করে। এবং আমাকে ক্যান্টনমেন্টে পাক সেনার নিকট পৌছে দেয়। ক্যান্টনমেন্টে পৌছার পর মিলিটারি সুবেদার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে- মুক্তি বাহিনী কোথায়? তারা কোথায় ট্রেনিং নেয়? আমি তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে অস্বিকার করায় আমাকে বেতের মোটা লাঠি দিয়ে, চীনা রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার পায়ে, হাতে ও পিঠে প্রহার করতে থাকে। এবং প্রহার শেষে হাত, পা, বেঁধে আমাকে রৌদ্রে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখে। এই ভাবে ৩/৪ ঘন্টা রৌদ্রের মধ্যে রাখার পর আবার ঘরে নিয়ে যেত। এবং আমার চারিদিকে প্রহরী রেখে আমাকে কাজ করাত। কাজ করার মাঝে মাঝে লাঠি দেয়ে আথবা বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিঠে আঘাত করতো। দিন রাতের মধ্যে অনুমান দু'ছটাক চাউলের ভাত খেতে দিত। আমার চোখের সামনে ৮/১০ জন লোককে শুধু লাঠি দিয়ে পিটাতে পিটাতে মেরে ফেলে দেয়। অনেক লোককে বিকাল ৬টার পর হতে চোখ বেঁধে, হাত বেঁধে গাড়ীতে উঠিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে নিয়ে যেত। হাজত থেকে কিছু লোক তাঁদের দিয়ে গর্ত খোঁড়াতো এবং যাদের গাড়ীতে করে নিয়ে যেত তাদেরকে লাইন করে গুলি করে হত্যা করতো। এই ভাবে প্রত্যেক দিন রাত্রিতে মিলিটারীরা গণহত্যা করতো। আমি এক মাস ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম। আমি যে কয়দিন ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম ঐ কয়েক দিন তারা অনুমান ৭/৮ শত লোককে বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করেছে। আমার উপর নির্যাতন চালানোর পর আমার গুলির অর্ডার হয়ে যায়। আমি উক্ত খবর আমার স্ত্রী নিকট ক্যান্টনমেন্ট হতে লোক মারফত পাঠিয়ে দেই। তারপর আমার স্ত্রী একজন পাঞ্জাবী হাবিলদারের নিকট এক জন লোক নিয়ে যায়। এবং তাঁকে অনেক অনুরোধ করার পর তিনি মেজরের নিকট গিয়ে আমার জন্য সুপারিশ করে। তারপর মেজর আমাকে ডেকে বলে আমি তোমাকে হাবিলদারের অনুরোধে মুক্তি দিলাম। হাবিলদারটার নাম ছিল কোরবান খাঁন। মুক্তি দেবার সময় আমাকে মেজর বলে দিলেন তুমি এখনই পুলিশ লাইনে গিয়ে হাজির হবে। যদি হাজির না হও, তা হলে তোমাকে গুলি করে মারা হবে। তারপর দুজন রেঞ্জার পুলিশ আমার সঙ্গে দিয়ে আমাকে পুলিশ লাইনে পৌছে দেয়। সেখানে বিহারী সুবেদার আমির হোসেন সাহেবের নিকট আমাকে হাজির করেন। আমি সেখানে হাজির হয়ে ছুটির জন্য দরখাস্ত করি। দরখাস্ত মঞ্জুর না করে আমাকে মনিরামপুর থানায় পোষ্টিং করে। এখানে এসেই আমার অসুখ হয়। তিন মাস অসুখ অবস্থায় কাটাই। তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
মানিক মিঞা
৪/৪/৭৩

\ ১৮২ \

মোঃ শহিদুল ইসলাম
গ্রাম-বেড়ী
ডাকঘর-জাদবপুর
থানা-শারসা
জেলা-যশোর

১৫ই আগষ্ট ভোর রাত চারটায় সময় আমাকে এক জন রাজাকার নাভারণ বাজার হতে ধরে এবং রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়েই আমাকে উক্ত রাজাকার বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণ প্রহার করে। এরপর সেক্রেটারীর নির্দেশে আমার চোখ বেঁধে মটরে তুলে যশোর ক্যান্টনমেন্টে চালান দেয়। সেখানে নিয়ে চোখ খুলে দেয় এবং মেজরের নিকট আমাকে হাজির করে। ৪/৫ জায়গায় ষ্টেটমেন্ট দেবার পর আমাকে ক্যান্টনমেন্টে এফ, আই, ও, তে হাজতে আটকিয়ে রাকে। প্রত্যেক দিন সকাল এবং বিকালে হাজত হতে বের করার সময় এবং হাজতে ঢুকানোর সময় প্রত্যেককে ভীষণ প্রহার করতো। আমাকে হাজত হতে বের করার সময় এবং হাজতে ঢুকানোর সময় প্রত্যেককে ভীষণ প্রহার করতো। আমাকে হাজত হতে বের করে বাহিরে নিয়ে যেত এবং প্রথমে বেতের লাঠি দিয়ে প্রহার করার পর বুট দিয়ে লাথি, চড়, কিল, ঘুষি, বুট দিয়ে শরীরের উপর উঠে খচিত এবং সর্বশেষে পায়ের তলায় রুল দিয়ে প্রহার করার পর সিগারেটের আগুন শরীরের বিভিন্ন স্থানে চেপে ধরতো। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, সত্যি করে বলো, তোমার সাথে কে কে ছিল। তারপর আমার শরীর হতে এক পাউণ্ড রক্ত নিয়ে হাজতের মধ্যে রেখে দেয়। এই ভাবে আড়াই মাস আমাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে রাখার পর নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমাকে সেখান হতে যশোর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেণ্ট্রাল জেলে আসার পরপরই আমার সমস্ত শরীর ফুলে যায় এবং যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকি। ঐ মাসের শেষের দিকে এক জন মেজর কয়েকজন মিলিটারীকে সঙ্গে করে সেণ্ট্রাল জেলে চলে আসে এবং আমাদের ২০/২৫ জনের প্রত্যেকের শরীর হতে এক পাউণ্ড করে রক্ত নেয়। তারপর ডিসেম্বরের ৭ তারিখে যশোর হতে পাঞ্জাবী সৈন্যরা অন্যত্র চলে যায়। ঐ দিন যশোর শত্রুমুক্ত হয়। মুক্তিবাহিনী জেল খানার তালা খুলে দিলে আমরা জেল হতে বের হয়ে আসি। এবং সেই দিনই আমি বাড়ী চলে আসি। আমি প্রায় আড়াই মাস যশোর ক্যান্টনমেন্ট হাজতে ছিলাম। উক্ত হাজতে আমার চোখের সম্মুখে তিনটা লোক প্রহারের দরুন মারা যায়। এবং প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর হাজত হতে ২০/২৫ জন করে লোককে বের করে নিয়ে যেত, তাদেরকে আর ফিরে আনতো না। এই ভাবে বহু লোককে তারা বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করেছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ শহিদুল ইসলাম
২২/৪/৭৩

\ ১৮৩ \

মোঃ মনছোর আলী
গ্রাম-হাকোবা
ডাকঘর-মনিরামপুর
থানা-মনিরামপুর
জেলা-যশোর

১৯৭১ সালের ১৪ই আগষ্ট ৩০/৩৫ জন মিলিটারী হাকোবা হাই স্কুল হতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় হাকোবা গ্রামে যায়। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তারা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পাঁচজনের একটি দল আমার বাড়ীতে চলে যায় এবং আমাকে ধরে ফেলে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে, তুমি হিন্দু না মুসলমান? আমি উত্তর দেই যে, আমি মুসলমান। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এই গ্রামে হিন্দু আছে কি? আমি উত্তরে বলি আছে। আমি হিন্দু পাড়া দেখিয়ে দেই। মিলিটারীরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে হিন্দু পাড়ায় ঢুকে পড়ে। আমার বাড়ী হতে হিন্দু পাড়া যাবার পূর্বে আমার পাশের বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক, ১ সন্তানের মাতা, ভাত রান্না করছিল। মিলিটারীরা তাকে ধরে ফেলে এবং ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। তার উপর প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় পর্যন্ত পাশবিক অত্যাচার করার পর যখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে সেই সময় তাকে ফেলে রেখে মিলিটারীরা হিন্দু পাড়ার দিকে চলে যায়। হিন্দু পাড়ায় গিয়ে উক্ত দল মুরগী খুঁজতে থাকে। বিকাল তিনটার দিকে তারা শ্রী অনিল কুণ্ডের বাড়ীতে ঢোকে। তাঁর বাড়ীতে তিনজন স্ত্রীলোক ছিল। তাঁরা হলেন, অনিল কুণ্ডের স্ত্রী, তাঁর মাতা আর তৃতীয়জন তাঁর বোন। তাঁর স্ত্রী ঘরের মধ্যে কাঁথা সেলাই করছিল। তাঁর মাতা ও বোন বারান্দায় বসে ছিলো। মিলিটারীরা উক্ত বাড়ীর ভিতর ঢুকেই দুজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর একজন সেন্ট্রি দিতে থাকে, আর একজন অনিল কুণ্ডের বোনের হাত ধরে হেঁচড়ে টানতে থাকে। তা দেখে তাঁর মা চিৎকার করতে থাকে। একজন মিলিটারী তাঁর মাতাকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে। কিন্তু অনিল কুণ্ডের বোনকে ঘরের মধ্যে নিতে না পেরে তাকেও ভীষণ প্রহার করে। তাঁর স্ত্রীকে ৩/৪ জন মিলে প্রায় দু'ঘণ্টা পাশবিক অত্যাচার করে। কিন্তু ঐ সময় অনিল কুণ্ডের বড় ভাই সুধীর কুমার কুণ্ড ও একজন বৃদ্ধলোক হরিপদ কুণ্ড বাড়ীতে ছিলেন। কিন্তু মিলিটারীরা তাদের বাড়ীতে ঢুকেই তাদের দুজনকে ধরে ফেলে এবং একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে বন্দি করে রেখে দেয়। তারপর মিলিটারীরা উক্ত পরিবারের উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর আবার হাইস্কুলে চলে আসে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যে অন্যান্য পার্টি গ্রামের ভিতর গিয়েছিল তারা গ্রাম হতে হাঁস মুরগী ইত্যাদী ধরে নিয়ে আসে। তারা কোন মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় নাই। যে দুটা মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় তার মধ্যে একজন মুসলমান আর দ্বিতীয়জন হিন্দু। তাদের উপর পাঁচজন মিলিটারী পাশবিক অত্যাচার করার দরুন তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অনেক ঔষধপত্র খাওয়ানোর পর বর্তমানে তারা সুস্থ হয়ে উঠেছে। উক্ত ঘটনার এক মাস পূর্বে অনিল কুণ্ডকে পাক মিলিটারীরা রাস্তা থেকে ধরে ফেলে এবং তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং তাকে তারা গুলি করে হত্যা করে। তারপরই উক্ত ঘটনা ঘটে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মনছোর আলী
৫/৪/৭৩

\ ১৮৪ \

বিকাশ চন্দ্র মল্লিক
মনিরামপুর
যশোর

আমি, সিদ্দিক, ও ইউনুস এই তিনজন পাক সেনাদের হাতে বন্দি হই। তারা আমাদেরকে ঝিকরগাছা নিয়ে যায়। ঝিকগাছা নিয়ে যাবার পথে আমাদেরকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে ভীষণ প্রহার করতে থাকে। ঝিকরগাছা হতে চোখ বেঁধে গাড়ীতে করে সারসা তাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে একটা ঘরের মধ্যে দু'ফুট পানি ছিল। সেখানে দু'হাত পিছনের দিকে রশি দিয়ে বেঁধে একটা জানালার শিকের সাথে বেঁধে রাখে। রাত শেষে আবার সেখান হতে বাইরে নিয়ে গিয়ে ছড়ি দিয়ে, বেয়নেট দিয়ে, বুট দিয়ে, লাঠি দিয়ে, ভীষণ প্রহার, চড়, ঘুষি, লাথি, দিয়ে ৪/৫ জন মারতে থাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে কোথায় পার্টি আছে? কোন কোন এলাকায় অপারেশন করেছ? কোথায় ট্রেনিং নিয়েছ? কয়জন পাক সেনা মেরেছ? ভারতে কার নেতৃত্বে ট্রেনিং নিয়েছ? তুমি ভারতীয় ক্যাপ্টেন না মেজর ইত্যাদী বলতো আর অকথ্য ভাষায় গালি দিত ও প্রহার করত। জ্ঞান হারিয়ে ফেললে প্রহার করা বাদ দিত। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পেতাম আমার মাথায় পানি। এইভাবে দুদিন দুরাত আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোর পর ১১ই অক্টোবর আমাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে দুদিন থাকার পর মেজর আমার ষ্টেটমেন্ট নেয়। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে তুমি যুদ্ধ করতে এসে অন্যায় করেছ, না ঠিক করেছ? তার জবাবে আমি বলি, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে ও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরলে যদি অপরাধ হয় তা হলে আমি অন্যায় করেছি। ঐ কথা বলার পর মেজর আমার প্রহার করা বন্ধ করে দেয়। পুনরায় আমাকে হাজত ঘরে পাঠিয়ে দেয়। পুনরায় আমাকে হাজত ঘরে পাঠিয়ে দেয়। এর তিন দিন পর এক বিহারী আমাকে গোপনে হাজত হতে বের করে গুলি করতে নিয়ে যায়। গুলি করার আগে মেজর জানতে পেরে আমার নিকট চলে যায় এবং আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে আর বিহারীকে অশ্লিল ভাষায় গালি দেয়। সেই দিন অর্থ্যাৎ ১৭ই অক্টোবর আমাকে ছেড়ে দিবে বলে মেজর দুজন সেন্ট্রিসহ আমাকে যশোর শহরে নিয়ে আসে এবং সেন্ট্রাল জেলে রেখে যায়। তারপর পাক সেনারা আহত হতে থাকে। নভেম্বরের শেষের দিকে জোর পূর্বক আমাদের প্রত্যেক আসামির শরীর হতে এক পাউণ্ড থেকে দু'পাউণ্ড পর্যন্ত রক্ত জোর পূর্বক নিয়েছে। রক্ত না দিলে ভীষন প্রহার করতো। ৭ই ডিসেম্বর আমরা যশোর জেলখানা হতে মুক্তি পাই। মনিরামপুর থানা ৭ই ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়। ৮ই ডিসেম্বর আমি, রতন, আখতার এই তিন জন মনিরামপুর থানায় চলে আসি এবং ও, সি,-এর নিকট হতে রাজাকারদের রেকর্ডপত্র নিয়ে নেই। তারপর আমরা মিনরামপুরে ঘোষনা করে দেই যাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র আছে, তারা ৪/৫ দিনের মধ্যে মুক্তিফৌজ অফিসে জমা দাও। তাদেরকে কিছু বলা হবে না। ঘোষনা করার কয় দিনের মধ্যেই ৩০০/৪০০ রাইফেল আমাদের অফিসে জমা হয়ে যায়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন সফিউল্লা ই,পি,আরদেরকে সঙ্গে করে মনিরামপুর চলে আসেন আমরা তাঁর হাতে আমাদের উদ্ধার করা অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেই। তারপর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকা গিয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তাঁর নিকট জমা দিয়ে আসি।

স্বাক্ষর/-
বিকাশ চন্দ্র মল্লিক
২/৪/৭৩

\ ১৮৫ \

মোঃ আব্দুস সাত্তার
গ্রাম-কবুর হাট
ডাকঘর-জগতী
থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া

১২-৬-৭১ সালে বিকাল তিনটার সময় দু'জন পাক দালাল অস্ত্রশস্ত্রসহ কবুর হাটে আমার দোকানে এসে জিজ্ঞেস করে সিরাজ মিঞা কোথায়। আমি উত্তর করি তা তো বলতে পারবো না। তারপর আমাকে বলে তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। কারণ মেজর সাহেব তোমাকে ডেকেছে। আমি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলে তারা জোর করে আমাকে একটা রিকসায় করে কুষ্টিয়া নিয়ে যাবার সময় চৌহাস ও কুমার গারার ব্রীজ, যেখানে মিলিটারী পাহারা দিত, পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে একজন মিলিটারী আমার নিকট চলে আসে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে, ভোট দিয়েছ কোথায়? আমি উত্তর করি নৌকায় দিয়েছি। অমনি আমার গালের উপর তিন-চারটা চড় কসে মারে। আমি মাটিতে পড়ে যাই। তারপর আমাকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে নিয়ে গেলে একজন মেজর এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার বাড়ীতে কয়টা বন্দুক আছে? আমি বলি আমার বাড়িতে কোন বন্দুক নাই। আমি বন্দুক দিয়ে কি করবো। আমি বন্দুকের কথা অস্বীকার করাতে আমাকে মেজরের নির্দেশে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ঘরে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ১৫/২০ জন মিলিটারী এসে আমাকে ঘরে নিয়ে কেউ ঘুসি, কেউ লাথি, কেউ বুট দিয়ে খচন আবার কেউ বা বেতের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে থাকে এবং পরস্পর হাসতে থাকে। এইভাবে প্রায় ১৫ মিনিট শারীরিক অত্যাচারের পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। প্রায় আধা ঘণ্টা পর আবার জ্ঞান ফিরে পাই। তারপর আমাকে একটা অন্ধকার কোঠায় নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি সেখানে গিয়ে পাই আমার মত তিনটি লোক সেই ঘরের মধ্যে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বিকেল পাঁচটার সময় আবার একজন মিলিটারী এসে আমাকে সেখান হতে বের করে একটা বড় ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং মাটিতে উপুড় করে শোয়ায়ে দেয় তারপর একজন ঘাড়ের উপর এসে চড়ে। দুজন দুহাত পাড়া দিয়ে ধরে। দুজন দুপায়ের উপর চড়ে, আর ৪/৫ জন বুট পায়ে দিয়ে খচতে থাকে তারপর আমী অজ্ঞান হয়ে যাই। ১৫/২০ মিনিট পর জ্ঞান ফিরলে আবার বন্ধ করে রেখে দেয়। এইভাবে ৪/৫ দিন নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন চালানোর পর একজন ক্যাপ্টেন এসে আমাদেরকে বন্ধ ঘরে দেখে যায় এবং একজন মিলিটারীকে জিজ্ঞাসা করে এদেরকে খাবার দেওয়া হয়েছে? মিলিটারীটা উত্তর করে, না। তখন নির্দেশ দেয়, তাড়াতাড়ী এদের জন্য খাবার নিয়ে এসো। এই বলে ক্যাপ্টেন চলে যায়। মিলিটারীটা আমাদের জন্য খাবার আনে। আমার উক্ত খাবার না খেয়ে উহা ফেরত দেই। ঐ মাসের ১৫ তারিখে ক্যাপ্টেন আমাকে থানা হাজতে পাঠায়। এবং ২০ তারিখে, ক্যাপ্টেন কুষ্টিয়া হতে বদলী হয়ে যাবার সময় থানার ও,সি,কে বলে যায়, ছাত্তার নামক লোকটা সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজখবর নেবে। এই লোক যদি দোষী না হয় তাহলে একে মুক্ত করে দেবেন। তারপরও ও,সি,-এর নির্দেশে আমাকে ২১ তারিখে থানায় হাজির করা হয়। ও,সি আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার বাড়ী কোথায়, নাম কি, ইত্যাদী। তারপর ও,সি-এর নির্দেশে আমাকে জেলে নিয়ে রাখা হয়। সেখানে জেলের ভিতর বিহারীরা আমাকে ৩/৪ দিন পরপর মারধর করতো। এই ভাবে জেলের মধ্যে প্রায় পাঁচ মাস থাকার পর আমার গ্রামের জনসাধারণের চেষ্টায় আমাকে জামিন দেয়।

তারপর বাড়ী চলে আসি। মামলা চলতে থাকে। ৪/৫ তারিখ মামলা চলার পর মহকুমা হাকিম আমাকে বেকসুর খালাস দেয়।

স্বাক্ষর/-
আব্দুস সাত্তার (বয়াতী)

\ ১৮৬ \

মোঃ জহুরুল ইসলাম
গ্রাম-কবুরহাট
ডাকঘর-জগতি
থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের ৯ই আগষ্ট আমি সদর হাসপাতালে ঔষদের জন্য যাই। হাসপাতালে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ২০/৩০ জন বিহারী ও জাতীয় মিলিসিয়া এসে আমাকে ঘিরে নিয়ে ধরে ফেলে। তারপর আমার দুহাত একসঙ্গে বেঁধে ভীষন প্রহার শুরু করে এবং জিজ্ঞাসা করে তোম লোক কেতনা মিলিটারী মারা? তোম লোক কেতনা বিহারী মারা? সাচ্চা বলেগা তো ছোড় দেগা। তোম ঝুট বলেগা তো খতম কর দেয়া। আমি তাদের কথা অস্বীকার করি। তখন আমাকে শোয়ায়ে আমার বুকের উপর ৩/৪ জন মিলিটারী উঠে খচতে থাকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। প্রায় আধা ঘণ্টা পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর ৫/৭ জন বিহারী এসে আবার মারতে মারতে হাউজিং অফিসে নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে আমার চোখ বাঁধবে, এমন সময় ও, সি সেখানে চলে আসে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার বাড়ীতে কয়টা বন্দুক আছে এবং তুমি কয়টা মিলিটারী ও কয়টা বিহারী মেরেছ? আমি উত্তর করি আমি কোন বিহারী ও কোন মিলিটারী মারি নাই এবং আমার বাড়ীতে কোন বন্দুক নাই। তখন ও,সি আমাকে তার হাতে যে রুলার ছিল সেই রুলার দিয়ে আমার পিঠে ১০/১২টা বাড়ীও ঘা মারে। থানায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রেখে দেয়। তার পরদিন বেলা চারটার সময় তিনজন মিলিসিয়া ও,সি,-এর অফিসে আমাকে নিয়ে হাজির করে। সে দিনও ও,সি আমাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো। আমি অস্বীকার করাতে সে দিনও ও,সি আমাকে লাঠি দিয়ে ভীষণ প্রহার করে। মারার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি একটু পানি চাইলে ও,সি একটা মিলিসিয়াকে এক গ্লাস পানি এনে দিতে বলে। তারপর মিলিসিয়াটি আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসে। আমি পানিটুকু খাবার পর আবার আমাকে নিয়ে সেই ঘরে রেখে দেয়। আমি তখন জেলা বোর্ডে চাকুরী করতাম। জেলা প্রশাসক আমার ধরা পড়ার খবর পেয়ে আমাকে মুক্ত করার জন্য থানার ও,সি,-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার চেষ্টায় আমাকে ৫ দিন পর রাত্রি ৪টার সময় বদ্ধ ঘর হতে বের করে ও,সি,-এর সামনে হাজির করে। ও,সি, আমার ঠিকানা লিখে নিয়ে আমাকে মুক্তি দেয় আমি সেই দিনই একটি রিকসায় বাড়ী পৌছি। উল্লেখ্য যে থানার ও,সি ছিল বিহারী।

টিপসহি
মোঃ জহুরুল ইসলাম

\ ১৮৭ \

মোঃ আব্দুল রশীদ মণ্ডল
গ্রাম- নওপাড়া
ডাকঘর- মীরপুর
থানা- মীরপুর
জেলা- কুষ্টিয়া

আষাঢ় মাসের ২৫ তারিখে বেলা তিনটার সময় এক ট্রাক মিলিটারী রাজাকার মিলে প্রায় ১০০ জন আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। আমি তখন নওয়াপাড়া স্কুলে বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় কয়েকজন মিলিটারী স্কুলের ভিতর ঢুকে আমাকে ধরে ফেলে এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে ভীষন প্রহার করতে থাকে। তারপর তাদের গাড়ীতে করে মীরপুর থানা শান্তি কমিটিতে নিয়ে যায়। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নাম চুনু চৌধুরী। আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চুনু চৌধুরী আমাকে বললো-যাও, ডাক্তারের ঔষধপত্র ভারতে পাঠাওগে। ডাক্তার সাহেবের ছেলে সুফি ছাত্রলীগ কর্মী ছিল। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নির্দেশ দিলেন আমাকে কেলুগড়া রাস্তার পার্শ্বে গুলি করে মারা হবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন আমকে না মেরে কুষ্টিয়া পাক হানাদারদের ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে। বেত ও লোহার রড দিয়ে ভীষন প্রহার করার পর একটা ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রেখে দেয়। আমি ঘরে ঢুকেই দেখতে পাই ঘরের মধ্যে আরও ছয়জন লোক। পরদিন চারটার সময় আমাদেরকে ঘর হতে বের করে আবার বেত, লোহার রড ও বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার করে, বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তিন ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরে পাই। আমার সমস্ত শরীর মারের চোটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিভিন্ন জায়গা ফেটে রক্ত ঝরছিল। আমি ব্যথার যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। আমি একটু পানি চাইলে আমাকে পানি না দিয়ে প্রশ্রাব এনে দিত। তিন দিন পর আমাকে মেজরের নিকট নিয়ে যায়। মেজর আমাকে দেখে তখনই তার স্টাফকে নির্দেশ দিল এ লোকটাকে এখনই হাসপাতালে ভর্তি কর। তারা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সেখানে দু'মাস চিকিৎসা করার পর আমাকে মেজরের আদেশে কুষ্টিয়া জেলে পাঠিয়ে দেয়। থানার দারোগাকে চার হাজার টাকা দেবার পর দারোগা আমার অনুকূলে রিপোর্ট মেজরের নিকট পাঠায় এবং আমাকে নির্দোষী খালাস করে দেয়।

টিপসহি
মোঃ আব্দুল রশীদ মণ্ডল

\ ১৮৮ \

মোঃ আবুল কাসেম মণ্ডল
গ্রাম- ধর্ম্মদা, ডাকঘর- চর প্রাগপুর
থানা- দৌলতপুর, জেলা- কুষ্টিয়া

আমি সৈয়দপুরে চাকুরী করতাম। ২৭ শে মার্চ পুলিশ লাইন পাক-বাহিনীর অধীনে চলে যায়। সেই সময় পুলিশ লাইন থেকে আমাকেসহ বহু পুলিশকে পুলিশ লাইনেই অবরোধ এবং নজর বন্দী করে রাখা হয়। নজরবন্দী থাকাকালীন আমাকে দিয়ে যখন প্যারেড করিয়ে নিতো। সারা দিন তাদের প্যারেড করতে হতো।

সকালে ২০ হতে ২৫ জন পুলিশকে ধরে নিয়ে গিয়ে সৈয়দপুর এয়ারপোর্ট রানওয়ের জন্য মাটি কাটিয়ে নিত। কোন সময় দড়ি বেঁধে নিয়ে যেত। পরাজিত সৈনিকদের মতো ব্যবহার করা হতো। বিভিন্ন প্রশ্ন করত। কিন্তু আমি সব সময় কিছু জানিনে বলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি এবং প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানতাম না। সামরিক ছাউনিতে আমাদেরকে সাত (৭) দিন রাখে। সেই ৭ দিন খাবার দিতো-প্রত্যেক দিন সকালে ১ খানা করে রুটি। ক্ষিদের কেউ যদি খাবার চেতো তাহলে তার উপর নেমে আসতো দুর্যোগ। তাকে বেত দিয়ে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে, ইলেকট্রিক তার দিয়ে বেদম প্রহার করা হতো এবং বলতো আমাদের দেশে এই ভাবেই খাদ্য দেয়। এই ভয়ে কেউ চেতো না।

সাত দিন পর আমাকে এস,পি কুঠিতে এনে নজরবন্দী করে রাখে। আমার বাড়ী পাক বাহিনী পাহাড়া দিয়ে রাখতো সেখান থেকে ঢাকাতে নিয়ে গিয়ে রাখে। এই সমস্ত পুলিশ দিয়ে এয়ারপোর্ট রাতের ডিউটি দিয়ে নিতো।

কিছুদিন এইভাবে অত্যাচার চালানোর পর এস,পি, জাকারিয়া সাহেব, আর, আই সাহেব এবং সাথে তিনজন পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সামরিক ছাউনিতে। তিনজন পুলিশের মধ্যে এস,পি, সাহেবের দেহরক্ষী হিসেবে সামরিক ছাউনিতে আবদ্ধ করে রাখে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করতো এস,পি সাহেব কোথায়, কোথায় কি করছে বল এবং তুমি কতজনকে হত্যা করেছো? সেই সময় আমার পায়ের তালুতে বেত দিয়ে আঘাত করতো। পায়ের আঙ্গুলে বুটের চাপ দিয়ে এই সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে বলার জন্য বল প্রয়োগ করতো। পিন দিয়ে আঙুলের মাথায় আঘাত করে রক্ত বের করতো। সময় সময় ঘন ঘন পিনের আঘাত দিতো আর জানতে চেতো। সে সময় লোকজনকে মৃত লোকের খোঁজখবরের জন্য পুলিশ অফিসে পাঠিয়ে দিতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন সংবাদই আমরা জানতাম না। মানুষকে কেবল ধোঁকা দেয়ার জন্য এই চেষ্টা চালানো হতো। সামরিক বাহিনীর লোক বলে দিতো যে তোমাদের নিহত, আহত ও নিখোঁজ লোকের সমস্ত খোঁজখবর পুলিশ অফিসে পাবে। যশোর থেকে দশ দিনের ছুটি নিয়ে আমি স্বাধীনতার দেড় মাস পূর্বে সীমান্ত পার হতে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেই। সেখান হতে মাঝে মাঝে গ্রাম্য ওপারেশন পার্টির সাথে তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে বাংলাদেশের জন্য খণ্ড যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি।

স্বাক্ষর
মোঃ আবুল কাসেম মণ্ডল
৭/১/৭১

\ ১৮৯ \

শ্রী চিনিবাস সরকার
গ্রাম- দ্বরিকগ্রাম
শিলাইদহ
কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের আশ্বিন মাস রোজ রবিবার সকাল ৬টার সময় মিলিটারী, রাজাকার, মিলিশিয়া মিলে প্রায় ৫০/৬০জন আমাদের গ্রামে আসে এবং হিন্দু পাড়া ঘিরে নেয়। সকলেই মিলিটারীর কথা শুনে ছুটাছুটি করে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে যে দিক দিয়ে গ্রামের বাইরে যেতে চায় সেই দিকেই মিলিটারী দিয়ে ঘেরা। আমি, কানাই, মোংলা, ভোলা, খালিশা, শ্রী পদ বাড়ী থেকে কোথাও যাইনি। তারপর পাক সেনারা এসে আমাদের কয়জনকে ধরে ফেলে এবং বলে শালা মালাউনকো, মুক্তি বাহিনীকো খানা খেলাও? আমরা তাদের কথা অস্বীকার করি। সাথে সাথে সেখানেই মংলাকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর আমাদের চারজনকে আমাদের চারজনকে দুই হাত বেঁধে পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাদের সবাইকে মাটিতে শোয়ায়। তারপর ১০/১২ জন পাক দালাল আমাদের পিঠের উপর খচতে থাকে। অবশেষে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে পানির ধারে এক এক করে সবাইকে গরু জবাই করার মত জবাই করে নদীতে ফেলে দেয়। এই ভাবে সবাইকে জবাই করার পর আমাকে ঠিক একই উপায়ে গলায় ছুরি চালায় এবং পানির ধারে ফেলে রেখে সবাই চলে যায়। কিন্তু তাদের ছোরাটা আমার শরীর হতে বিচ্ছিন্ন না করেই ফেলে রেখে যায়। ফলে আমি কোন অবস্থাতে আধা মরা অবস্থায় পানির ধারে পড়ে থাকি। তারপর ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখতে পাই রক্ত ঝড়ছে। চারিদিকে চেয়ে দেখি কোথাও কোন লোক নেই। ধীরে ধীরে পানির ধার দিয়ে চলতে থাকি। একটা মাছ ধরার নৌকা নদী দিয়ে যাচ্ছিল। আমি নৌকার মাঝিকে অনুরোধ করে বললাম ভাই, আমাকে নদী পার করে দিবে? মাঝি আমাকে নদীর অপর পারে নামিয়ে দেয়। আমি নৌকা হতে নেমে একজন লোকের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেই এবং একজন ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাই। আমি সেখান হতে শুনতে পাই পাক সেনারা আমাদের হিন্দু পাড়া আগুনে জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং অনেক মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে।

স্বাক্ষর/-
চিনিবাস সরকার

\ ১৯০ \

মোঃ শহীদুল আলম
গ্রাম- তেবাড়িয়া
কুমার খালী
কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের ৮ ই ডিসেম্বও রোজ বৃহস্পতিবার সকালে ৭টার সময় আমি ভারতের খবর শুনছি। এমন সময় ৬ জন বিহারী অত্রশস্ত্রসহ আমাদের বাড়ী গিয়ে আমাকে ডাকে। আমি রেডিও বন্ধ করে তাদের সম্মুখে এসে হাজির হই। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাবা কোথায়? আমি জবাব দিই, ঘুমিয়ে আছেন। আমি আমার বাবাকে ডেকে দিই। বাবা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা বাবাকে বলে তোমার বড় ছেলে কোথায়? আব্বা তার প্রতি উত্তরে বলেন, ছেলে কোথায় তা আমি বলতে পারি না। তারা আব্বা ও আমাকে সাথে করে পাকদালালরা কুমারখালী বাজারে নিয়ে আসে। সেই সময় শান্তি কমিটির দালাল একটা ফাঁকা ফায়ার করে অন্যান্য লোকজনকে সেখান হতে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর আব্বাসহ আমাকে ও অন্য একজনকে শান্তি কমিটির দালালের নির্দেশে গড়াই নদীর ধারে নিয়ে যায়। নদীর ধারে একটা ঘর ছিল সেখানে নিয়ে আমাদেরকে উক্ত ঘরের মধ্যে কিছু সময় রাখে। তারপর আমাকে পানির কিনারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিচিত এক পাক দালাল রাইফেল উঁচু করার সাথে সাথে আমি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সাঁতার কাটতে কাটতে নদীর পর পারের দিকে চলে যাই। আমাকে লক্ষ্য করে উক্ত দালাল বৃষ্টির ন্যায় এলোপাতাড়িভাবে গুলি ছুড়তে থাকে। আমি নদীর অপর পারে গিয়ে উঠি এবং হাঁটতে থাকি। এর মধ্যে একটা গুলি গিয়ে আমার হাতে লাগে। ঐ অবস্থাতেই আমি চলতে থাকি। এমন সময় অন্য একটা গুলি গিয়ে আমার পায়ে লাগে। তখন আমি পড়ে যাই। পড়ে যাবার পরপরই দুটা ফায়ার হয়। আমার আব্বা ও সেই লোকটাকে তারা গুলি করে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। তার কিছুক্ষণ পর একজন রাজাকার নদী সাঁতরিয়ে আমাকে ধরার জন্য রওয়ানা হয়ে যায়। তখন আমি মৃত অবস্থায় বালির মধ্যে পড়ে থাকি। আমাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে নদী পার হয়ে চলে যায়। আনুমানিক ঘন্টা তিনেক পর আমার কয়েকজন প্রতিবেশী আমাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে নদী পার হয়ে চলে যায়। আনুমানিক ঘণ্টা তিনেক পর আমার কয়েকজন প্রতিবেশী আমাকে মৃত জেনে নৌকা নিয়ে আমকে আনার জন্য যায়। কিন্তু আমি বেঁচে আছি জেনে তারা ধরাধরি করে আমাকে নৌকায় তুলে বাড়ী নিয়ে আসে এবং আমার চিকিৎসা করায়। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয় হয়। সেখান হতে কিছুদিন পর আমাকে রাজশাহী হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাজশাহী হাসপাতালে পাঁচ মাস চিকিৎসা করার পর আমি বাড়ী চলে আসি।

স্বাক্ষর
মোঃ শহীদুল আলম

\ ১৯১ \

মোঃ খন্দকার নূরুল ইসলাম
গ্রাম- বাটিয়ামারা
থানা- কুমারখালী,
জেলা- কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে বাটিয়া মারা গ্রামে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা এসে আশ্রয় নেয়। মিলিটারীদের ক্যাম্প ছিল কুমারখালী থানা কাউন্সিলে, আর রাজাকার বিহানী ও মিলিশিয়াদের ক্যাম্প ছিল কুমারখালী রেল ষ্টেশনে। পাক সেনাদের মেজর ও ক্যাপ্টেন থাকতো কুমার খালী থানা ডাক বাংলোয়।

৮ই ডিসেম্বর মুক্তি বাহিনীর দল সকাল ৮/১০টার সময় মন্টুদের ঘরের মধ্যে ভাত খাচ্ছিলো। এমন সময় রাজাকার, মিলিটারী ও মিলিশিয়া মিলে প্রায় ৬০/৭০ জনের বাহিণী বাটিয়া মারা মন্টুদের বাড়ী চতুর্দিক হতে ঘিরে নিয়ে গোলাগুলি শুরু করে এবং মুক্তি বাহিনীর প্রস্তুতি নেবার পূর্বেই পাক হানাদার বাহিনী এসে তাদেরকে হাতিয়ার সমেত ধরে ফেলে ও পরে তাদেরকে প্রহার করতে করতে থানা কাউন্সিলে নিয়ে যায়। থানা কাউন্সিলের পূর্বদিকে একটা আম বাগানে গর্ত করে রাত্রি ৮টার সময় তাদেরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিন গানের গুলিতে হত্যা করে উক্ত গর্তের মধ্যে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে রেখে চলে আসে।

তার পরদিন পাক হানাদার বাহিনী বাটিয়ামারা গ্রামে যায় এবং উক্ত গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ী আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেয়। মেয়েদের উপর চালায় পাশবিক অত্যাচার। আবার তারা থানা কাউন্সিলে ফিরে আসে। আজও বাটিয়া মারার অনেক বাড়ীতেই ঘর ওঠে নাই।

তার ৪/৫ দিন পর পাক বাহিনী কল্যাণপুর গ্রামে অপারেশনে যায় এবং নাম না জানা অনেক মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তার মধ্যে কল্যাণপুরের একটা মেয়ের নাম আছিয়া। মেয়েটি অবিবাহিতা যুবতি ও সুন্দরী। সেই মেয়েটি পাক হানাদার বাহিনীর শিকার হয় এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর দরুন সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পাক হানাদার বাহিনী সেই গ্রাম হতে কুমারখালী চলে আসলে সে জ্ঞান ফিরে পায় এবং তার কলঙ্কিত মুখ সমাজে দেখাবে না বলে রাত্রি কালে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়।

পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন থানা কাউন্সিলের যে ডাক বাংলোয় থাকতো সেই ডাক বাংলোর সম্মুখে একটা কচুরী পানায় বর্ত্তী পুকুর ছিল। সেই পুকুরে প্রায় ২/৪ দিন পর পর ২/৪ টা সুন্দরী মহিলার লাশ শাড়ি পরা অবস্থায় ভাসতে দেখা যেত।

আমাদের অনুমান এই যে গাড়ীতে যে সকল মহিলা চলাফেরা করতো তাদেরকে গাড়ী হতে নামিয়ে ডাক বাংলায় নিয়ে এসে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে পরে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে উক্ত পুকুরে ফেলে রাখতো।

একদিন দু'জন মিলিটারী একটা রাজাকারকে বলছে, আচ্ছা দোস্ত আওরাত মিলিয়ে দাও না। তখন রাজাকারটা তাদেরকে একটা বাড়ীতে নিয়ে যায়। মিলিটারীদের খবর পেয়ে উক্ত বাড়ীর পুরুষ মহিলা সবাই বাড়ী ছেড়ে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। রাজাকার ও মিলিটারী দুটি উক্ত বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আর কোন লোক খুঁজে পায় না। তখন মিলিটারী দুটি উক্ত রাজাকারকে বলে আচ্ছা দোস্ত তোমার ডেরা কোথায়? তখন রাজাকারটা তাদেরকে সাথে নিয়ে নিজ বাড়ী যায় এবং পাক সেনারা তার বাড়ী গিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা দেখতে

পায়, ঘরের মধ্যে উক্ত রাজাকারের মাতা বসে আছে। তারপর একজন পাক সেনা ঘরের বাইরে চলে আসে এবং উক্ত রাজাকারের বুকে রাইফেল ধরে রাখে। আর একজন পাক সেনা তার বৃদ্ধ মাতার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারপর দ্বিতীয় জন গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করে। প্রথম জন এসে রাজাকারকে পাহারা দিতে থাকে। তারপর তাদের কাজ শেষ হলে তারা ক্যাম্পে চলে আসে। পরে উক্ত সংবাদ রাজাকার ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়লে উক্ত রাজাকার আর ক্যাম্পে না গিয়ে কোথায় যে চলে গেল তার আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। উক্ত ঘটনা হতে জানা যায় যে পাক সেনাদের হাত থেকে তাদের আত্মীয় বা বন্ধুদের স্ত্রী, মা, বোন ও মেয়েরা রেহাই পায়নি। এমনকি শান্তি কমিটি জামাতে ইসলামী বা মুসলিম লীগের লোকেরাও নয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ খন্দকার নূরুল ইসলাম

\ ১৯২ \

মোঃ বজলুল করিম
গ্রাম- দুর্গাপুর
থানা- কুমারখালী
জেলা- কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ রোজ মঙ্গলবার আমি বাজারে রেশন তোলার জন্য যাই এবং রেশন তুলে বাড়ী আসি। দুর্গাপুর স্কুলের সামনে মুজাহিদ ক্যাম্প ছিল। দ্বিতীয়বার বাজারে যাবার সময় দুর্গাপুর স্কুলের সম্মুখের মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে কয়েকজন মুজাহিদ আমাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, ''তোমাদের গ্রামে মুক্তিফৌজ আছে?'' আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করলো তোমার ভাই কোথায়? আমাদেরকে বলে দিতে হবে। উত্তরে আমি বললাম আমাদের গ্রামে কোন মুক্তি ফৌজ নাই এবং আমার বড় ভাই কোথায় তা আমি জানি না। তখন তারা আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। তারপর তিনখানা বাঁশের লাঠি নিয়ে এসে আমাকে মারতে থাকে। মারের চোটে তিনখানা লাঠিই ভেঙ্গে যায়। মারের যন্ত্রণায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। আবার যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখন আনুমানিক বেলা চারটা। একজন বিহারী আমার নিকট আসে এবং আমার দুহাত বেঁধে ঘরের ধর্ণার সঙ্গে ঝুলিয়ে আবার বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার করতে থাকে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লে আমাকে নামিয়ে মাটিতে ফেলে রাখে। তারপর আমার জ্ঞান ফিরলে আমি বললাম ভাই আমাকে এক গ্লাস পানি দেবেন? তখন সেই বিহারী উত্তর করলো, পানি হবে না। তখন তৃষ্ণায় আমি অতীষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকি। সে দিনই বিকাল ছটার সময় মিলিটারী, রাজাকার, মুজাহিদ ও বিহারী মিলে প্রায় ৫০-৬০ জন হাশেমপুর অপারেশন করে দু'জন লোককে ধরে নিয়ে দুর্গাপুর মুজাহিদ ক্যাম্পে আসে। তারা এসে আমাকে দেখে বলতে থাকে রানু কোথায় তোমাকে বলতেই হবে। আমি অস্বীকার করি, তখনই তারা কেউ কেউ রাইফেল দিয়ে, কেউ কেউ বেতের লাঠি দিয়ে, আবার কেউ কেউ ছোরা দিয়ে আমাকে মারতে থাকে। তাদের মারের চোটে আমার সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। তারপর হাশেমপুর থেকে যে দুটো লোককে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদেরকে আমার মত মেরে আমার সঙ্গে একই জায়গায় রেখে দেয়। তার পরদিন আবার তারা ঘাসখালী অপারেশনে যায় এবং ১৪ জন লোককে ধরে নিয়ে কুমারখালী থানা কাউন্সিলে রেখে দেয়। তাদের মধ্যে ছিল ৬ জন মুক্তিবাহিনীর, উক্ত ৬ জন অস্ত্র সমেত ধরা পড়ে। এর মধ্যে আমার আব্বা আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট যান। কিন্তু চেয়ারম্যান বলে আগামী কাল যা হয় করা যাবে। তখন রাতে যাওয়া ভাল হয় না। আমার আব্বা ফিরে চলে আসেন। এর মধ্যে রাতে আমরা দেখতে পাই স্কুলের পূর্বে পার্শ্বে দুটি এবং পশ্চিম পার্শ্বে ১টা কবর খোঁড়া হয়েছে। তখন আমরা মরার জন্য দিন গুনছিলাম। আমার পিতা আমার মামাকে আমার জন্য চেষ্টা করতে বললেন। আমার মামার এক বন্ধু যশোর ক্যান্টনমেন্টের মিলিটারী ইনসপেক্টর ছিলেন। মামা তার কাছে টেলিফোন করেন এবং আমার সম্বন্ধে সবকিছু বিস্তারিত বলেন। তখন ইনসপেক্টর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট ফোন করেন এবং একটা লিখিত চিঠি পাঠান আমাকে মুক্তি দেবার জন্য। তারপর বেলা ১২টার সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেজর এসে আমাকে ডাকে। আমি উত্তর করি আমি হেঁটে যেতে পারি না, কারণ আমার সারা শরীর মারের চোটে ফুলে গেছে এবং ব্যথা করছে সর্বাঙ্গ। তখন একজন মিলিটারী আমার নিকট পাঠিয়ে দেয়। আমি তার কাঁধে ভর দিয়ে মেজরের নিকট যাই। তারপর মেজর আমাকে বলে ''তুমি মুক্তি''। তখন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আমাকে বলে ''তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও''। আমার পিতা আমাকে নেবার জন্য একটা রিক্সা ভাড়া করেন। কিন্তু রিক্সায় উঠার মত অবস্থা আমার ছিল না বলে আমি রিক্সাওয়ালাকে ফিরিয়ে দেই এবং আব্বার কাধেঁ ভর দিয়ে বাড়ী আসি। বাড়ীতে আসার পর

শুনতে পেলাম আমার সঙ্গে যে দু'টি লোককে ধরে রেখেছিল তাদেরকে আমি বাড়ি আসার পরপরই জবাই করে পূর্বে উল্লিখিত গর্তে পুঁতে রেখেছে। আর থানা কাউন্সিলে যে ১১ জনকে ধরে এনেছিল তাদেরকে থানা কাউন্সিলের পূর্বে একটা আম বাগানের ভিতর সবাইকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের দিয়েই গর্ত করিয়ে অবশেষে রাত আটটার সময় লাইন করে গুলি করে মেরে ফেলে। এবং পাশাপাশি দু'টি কবরের মধ্যে ১১ জনকে পুঁতে রাখে। আমি বাড়ী এসে দেড় মাস চিকিৎসা হবার পর সুস্থ হই।

স্বাক্ষর/-
বজলুল করিম

\ ১৯৩ \

মোঃ রাজাই সরদার
গ্রাম- মহেন্দ্রপুর
ডাকঘর- বানিয়াকাঁধি
থানা- কুমারখালী,
জেলা- কুষ্টিয়া

১৩৮৮ সাল ২০শে আশ্বিন রোজ বুধবার পাক বাহিনী দালাল মারফত খবর পায় যে চর ভবানী পুরে খবির উদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ীতে মুক্তিবহিনী থাকে। ঐ খবর পেয়ে প্রায় ৪০/৫০ জন মিলিটারী বিহারী ও রাজাকার ঐ তারিখে ঐ গ্রামটা ঘেরাও করে এবং ঐ গ্রাম থেকে ৮ জন যুবক ছেলেকে ধরে। তাদের ধরার পর জিজ্ঞাস করে তোমরা মুক্তিবাহিনী। তোমাদেরকে গুলি করে মারা হবে। কিন্তু যুবক ছেলে কয়টা উত্তর দেয় আমরা জমি চাষ করি। আমরা মুক্তিবাহিনী নই বা মুক্তি বাহিনী কেমন দেখা যায় আমরা তাদের দেখি নাই। ছেলে ৮টাকে তখন মহেন্দ্রপুর নামক একটা গ্রামে নিয়ে যায়। এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদের পর সবগুলিকে লাইন করে বসায়। তারপর বুট দিয়ে বল শট করার মত লাথি, গুতা এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারার দরুন তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান ভেঙ্গে যায় এবং মারের চোটে রক্ত বেরুতে থাকে। পরে একটা আম বাগানের মধ্যে নিয়ে তাদের ৮ জনকে এক এক করে জবাই করে ফেলে রেখে তারা কুমারখালী থানা কাউন্সিলে চলে যায়।

ঐ মাসের ২৭ তারিখে দয়ারামপুরে পাক মিলিটারী যায় এবং সেই গ্রামে গিয়ে দিবুক সরদারকে জিজ্ঞাসা করে গোন্ধের বাড়ী কোন দিকে। দিবুক সরদার উত্তর করে আমি বলতে পারবো না। তখন একটা পাক মিলিটারী- বলে কি? বলতে পারবে না? -এই বলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে তারপর গোন্ধের বাড়ী গিয়ে দেখে কেউ বাড়ীতে নেই। তারপর তার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঐ আগুন ধরিয়ে দেওয়া দেখে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই ছুটাছুটি করতে থাকে। তারপর ৬ জন হিন্দুকে পাক মিলিটারীরা ধরে ফেলে এবং তাদের বলে এ গ্রামের সবগুলি মালাউনের বাড়ী দেখিয়ে দাও তাহলে তোমাদের ছেড়ে দেবো। লোক ছয়জন নিজেদের প্রাণের ভয়ে সবগুলি হিন্দু বাড়ী দেখিয়ে দেয়। অমনি তারা সবগুলো হিন্দু বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। গ্রাম ৫০/৫২ খানা হিন্দু বাড়ী তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরে ঐ গ্রাম থেকে যাবার সময় ঐ ৬ জন লোককে গুলি করে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ রাজাই সরদার
১৯/১২/৭২

\ ১৯৪ \

মোঃ দিয়ানত আলী খান
গ্রমি- মালি গ্রাম
ডাকঘর- জানিপুর
জেলা- কুষ্টিয়া

১৩৮৮ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ৯টার সময় প্রায় ৩০/৪০ জন মিলিটারী, মুজাহিদ, রাজাকার ও বিহারী মিলিয়া আমার বাড়ী ঘেরাও করে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার ছেলে আলাউদ্দিন কোথায়? তার প্রতি উত্তরে আমি বলি কোথায় বলিতে পারিব না। তখন তাহারা আমাকে এবং আমার মেঝ ছেলেকে ধরিয়া রাত্রি সাড়ে বারটার ট্রেনে কুষ্টিয়া নিয়া যায় এবং সেখানে হাজতে রাখিয়া দেয়। তার পরদিন হাজত হইতে বাহির করিয়া মেজরের সামনে হাজির করে। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার ছেলে আলাউদ্দিন কোথায়? তাহাকে যদি আনিয়া দিতে পারেন আপনাকে ছাড়িয়া দিব। আমি মেজরের কথা প্রত্যাখান করি। তখন মেজরের আদেশে আমাদেরকে তাদের ক্যাম্পের দোতালায় নিয়া যায় এবং সেখানে আমাদের সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। তার ঘণ্টা খানেক পর একজন মিলিটারী সেই ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমার ছেলেকে কারেন্টের তারের সঙ্গে দুই পা ঠেকাইয়া দেয় এবং বেতের লাঠি দিয়া ভীষন প্রহার করে। তারপর আমার অনুরোধে তাকে মারা বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে যে আর তিনজন ছিল তাদেরকে মারার পর তাহারা যখন অজ্ঞান হইয়া যায় তখন মারা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সন্ধ্যার পর আমাকে এবং আমার ছেলেকে মেজরের নিকট নিয়া হাজির করে। মেজর সেই একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। তারপর আমাদের থানার হাজতে পাঠাইয়া দিল। সেখানে ৪/৫ দিন থাকার পর আবার জেলে পাঠাইয়া দেয়। এর মধ্যে ডাঃ মালিক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হইয়া ঘোষনা করে যাহাদেরকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে তাহাদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। আমরা কুষ্টিয়া জেলে মোট ১০১ জন আসামী ছিলাম। তাহার মধ্যে মোট ৪৭ জনকে ছাড়িয়া দেয়। আমরাও ঐ ৪৭ জনের সঙ্গে মুক্তি পাই। আমাকে এবং আমার ছেলেকে মোট ১ মাস ২২ দিন জেলে রাখে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ দিয়ানত আলী খান

\ ১৯৫ \\

গৌরাঙ্গ বিশ্বাস
গ্রাম- নারায়াণপুর
ডাকঘর- জানিপুর
থানা- খোকসা
জেলা- কুষ্টিয়া

১৯৭১-এর ২৩শে মে রবিবার পাক-বাহিনীর ভয়ে ভারতের দিকে যাত্রা করি। পাক-বাহিনী রবিবারে জানিপুরে এসে আশ্রয় নেয়। রবিবার পরিবারসহ খোকসা থানার অধীনে বাহরামপুরের মাঠে একটা আম গাছের নীচে রাত্রি কাটাই। সকালে আমি ও অমিয় কুমার সাহা সাইকেল আনার জন্য আবুল মিয়ার বাড়ীতে আসার পথে কমলাপুর খালের মধ্যে পাক-বাহিনীর সাথে দেখা হয়। পাক-বাহিনী রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানসহ গ্রাম অপারেশনে যাচ্ছিল। পাক-বাহিনী আমাদের দু'জনকে আনতে বলে তখন আমরা পালাবার সুযোগ না পেয়ে থেমে যাই। পাকবাহিনী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করে এরা আদাব দিলো কেন। চেয়ারম্যান বলে যে এরা দু'জন মালাউন। অমিয় কুমারের (সি, ও অফিসের কেরানী, খোকসা) খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। মালাউনের কথা শুনে পাক বাহিনী আমাদের বলে যে টাকা পয়সা যা আছে তা দিয়ে দাও। আমরা টাকা পয়সা সোনাদানা দিয়ে জীবন ভিক্ষা চাইলাম। কথা সর্বস্ব দিয়ে দিলাম। তখন পাক-বাহিনী আমাদের হাত বেঁধে ফেললো। কমলাপুরের ব্রীজের পাশে রাস্তার ধারে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং গুলি করে। অমিয় কুমার তার শিশুদের জন্য অসহায়ের মতো তাদের কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হলো। গুলি হলে অমিয় কুমারের বক্ষ ভেদ করে আমার মাথায় লাগে। অমিয় কুমার নিহত হয় আর অমিয় কুমারের চিৎকার ও পাক বাহিনীর বীভৎস হাসি শুনে এবং জীবনের কথা চিন্তা করে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। মাথা দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। দু'দিন ঐ রাস্তার ধারে খালে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকি। দু'দিন পর আফতাব মুন্সির ছেলেরা খাল হতে পাশে পানের বরজে আশ্রয় দেয়। সেখানে আমাকে চিকিৎসা করেন।

ডাক্তারের চিকিৎসার সুযোগ ছিলো না। কারণ পাক-বাহিনী বা দালালের কানে পৌছালে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আফতাব মুন্সির বাড়ীতে বা তার অধীনে দীর্ঘ আড়াই মাস চিকিৎসা হবার পর সুস্থ হলে ভারতে চলে যাই।

স্বাক্ষর/-
শ্রী গৌরঙ্গ বিশ্বাস

\ ১৯৬ \

ভারতী দেবী চক্রবর্তী

বগুড়া রোড, বরিশাল

১৮ই এপ্রিল বরিশালে পাক সেনারা ব্যাপক বোমা ফেলে। আমরা আশ্রয় নিই আলুকদিয়া গ্রামে। ওখানে এক মাস থাকি। আমার স্বামী বরিশালে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। এই সংবাদ প্রচার হয়ে গেলে গৃহস্বামী আমাদের রাখতে অস্বীকৃতি জানায়। শুনলাম হিন্দুরা সব আটঘর কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিচ্ছে। স্থান ছিল দুর্গম, চারিদিকে জল, খানসেনা যেতে পারবে এমন ধারণা কারো ছিল না। আমরা কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিই। ওখানে পর পর ৩৬টি গ্রাম সম্পূর্ণ হিন্দুর বাস। মে মাসে আমি আটঘর কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিই। আমরা অরুণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে থাকি। ওখানে আরও প্রচুর লোক আশ্রয় নেয়।

মে মাসের শেষের দিকে খানসেনারা কুড়িয়ানাতে পৌছে অরুণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ঢুকে মন্দির, ঘর সব ধ্বংস করে ওখানে পাক ছাউনী করে। সমস্ত গ্রাম খান সেনারা পুড়িয়ে দেয়। আমরা ২/৩ হাজার লোক পিয়ারা বাগানে আশ্রয় নিই। খান সেনারা বাগান কাটা শুরু করলো। আমরা বাগানের খালের জলের ভিতর বেলা ১০টায় নামতাম, বেলা ৪/৫ টার দিকে জল থেকে উঠে বাগানের উঁচু জায়গায় বসতাম। সকালে এসেই খান সেনারা গুলি চালাতো। যারা একটু আঘটু মাথা উচু করেছে সাথে সাথে মারা গেছে। ঐ ভাবে দেড় মাস থাকি। দেড় মাসের মধ্যে আমরা ভাত খেতে পারিনি, পেয়ারা এবং আখের রস খেয়ে ছিলাম। বাগান কাটতে থাকে আমরা পিছাতে থাকি। জোয়ারে অসংখ্য মৃতদেহ দেখতাম। মৃতদেহের উপর আমরা বহুবার আশ্রয় নিই।

পাকসেনারা প্রত্যহ মানুষ ধরে ধরে হত্যা করেছে। ঐ বাগানে লাইন দিয়ে দেড় মাসের মধ্যে ২ হাজারের মত লোককে হত্যা করে। ওখানে আমাদের মত যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বেশী মারা গেছে। লাইনে দাঁড় করিয়ে আমাদের সবকিছু খুলে নেয়। পাশবিক অত্যাচার চালায় অসংখ্য নারীর উপর। আমার স্বামীকে ধরে ফেলে পাক সেনারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। গ্রামে, গঞ্জে রাজাকাররা আমাদের উপর চালিয়েছে অকথ্য অত্যাচার। আটঘর কুড়িয়ানা থেকে আমি হেঁটে হেঁটে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে বরিশালে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকি।

স্বাক্ষর/-
ভারতী দেবী চক্রবর্তী
২০/৯/৭৩

\ ১৯৭ \

ইমদাদুল হক মজুমদার
অধ্যক্ষ, ব্রজমোহন কলেজ
বরিশাল

প্রতিরাতে পাক বাহিনী অংসখ্য লোককে হত্যা করেছে। দিনের বেলায় ট্রাক ভর্ত্তি করে লোক ধরে আনতো। প্রথম দিকে গুলি করে হত্যা করতো। পরের দিকে জবাই করেছে। অসংখ্য লাশ নদীতে ভাসতে দেখেছি। বেয়োনেট দিয়ে পেট চিড়ে ফেলে রাখতো। আমরা ধারণা ৭৫০০০ মত লোককে পাক বাহিনীরা হত্যা করেছে সমস্ত বরিশালে।

পাথরহাটা, বাওয়াল (পটুয়াখালী সীমান্তে) নামক স্থানে পাক সেনারা গেলে লোকজন সব দেখতে আসে। লোকজন তখন ভাবতো মুসলমান হলে মারবে না। পাক সেনারা সবাইকে একত্র করে দুর্বল লোকদের ছেড়ে শক্ত সমর্থ লোকদের পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতে বলে। সবাই সাঁতার কাটা শুরু করলে এক এক করে গুলি করে হত্যা করে, তামাশা দেখে।

ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা দেওয়ায় অনেকেই বাইরে বেরোয়। নজরুল, আলমগীর, হাই, শাহাবুদ্দিন (তপন) এরা স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলো। বাইরে বেরোলে পাক সেনারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অসংখ্য মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে এই শহরে। পাক সেনারা খবর পেয়ে রাত্রে গিয়ে মেয়েদের ধরে নিয়ে আসতো এবং অত্যাচার চালাতো। বাড়ী বাড়ী ঢুকে লুট করে সব ধ্বংস করেছে জ্বালিয়েছে অসংখ্য বাড়ী ঘর। বরিশাল মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা এবং তার সাথে আর একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রিকে অস্ত্রসহ পাক বাহিনীরা গৌরনদী অথবা উজিরপুর এলাকার কোন একটি বাংকার থেকে ধরে আনে। বহু অত্যাচার চালায় ওদের উপর তথ্য নেবার জন্য। কিন্তু কোন কথা বের করতে পারেনি। পরে ওদেরকে হত্যা করে। মেয়ে দুজন বলেছে তোমরা হত্যা করো কিন্তু কোন কথা পাবে না। অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে কিন্তু কোন কথা বের করতে পারেনি। বাড়ী বাড়ী থেকে পাক সেনারা ছাগল, ডিম, এসব নিয়ে আসতো জোর করে। আমার কাছে মুক্তি বাহিনীরা আসতো তাদের জামা কাপড়, খাওয়া এবং বিভিন্ন খবর নিয়মিত দিতাম।

স্বাক্ষর/-
ইমদাদুল হক মজুমদার
২৩/৮/৭৩

\ ১৯৮ \

উপেন্দ্রনাথ দত্ত
গ্রাম-রাজার হাট
ডাকঘর ও থানা-পিরোজপুর
জেলা- বরিশাল

৪ঠা মে, পাক বাহিনী পিরোজপুর আসে। খান সেনারা শহরে প্রবেশ করে দালাল শ্রেণীর কতকগুলি লোককে শহর লুট করতে বলে। এই সময় তাদের নির্দেশ দেয় যে তোমরা লুট করো কিন্তু ঘর দুয়ার নষ্ট করো না। পাক বাহিনী রাস্তায় যে সব লোকদের পায় তাদেরই সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। প্রথম অবস্থায় হিন্দু, মুসলমান, কোন কিছু তারা নির্ণয় না করে একাধারে সবাইকে গুলি করে মেরেছে।

একজন দালালের কাছে আমি এই সময় বলি যে ভাই আমার দোকানে প্রায় লাখ টাকার মাল আছে, তুমি এগুলি রক্ষা করো। প্রয়োজন হলে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও। তার উত্তরে সে আমাকে জানায় যে আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনার কোন ক্ষতি আমরা করবো না। আমি আমার সমস্ত কিছু তার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে নদীর অপর পারে চলে গেলাম।

আমি সারাদিন নদীর অপর পারে পালিয়ে বেড়াতাম। বিকালের দিকে যখন খান সেনারা তাদের ব্যারাকে ফিরে যেত তখন আমি নদী পার হয়ে টাউনের ভিতর চলে আসতাম। এবং যতদূর সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে শহরের ভিতর ঘুরে ঘুরে অবস্থা দেখতাম।

পাক বাহিনী আসার পর পাক বাহিনীদের সহযোগী একটা দল সৃষ্টি হয়। পরবর্ত্তী কালে এই দলই বিভিন্ন অত্যাচারের ক্ষেত্রে পাক বাহিনীকে পরিচালনা করেছে। প্রথম দিকে পিরোজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে লুট করেছে, পরবর্তী পর্যায়ে বাড়ী ঘর ভেঙ্গে নিয়ে যায় এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।

মে মাসের শেষের দিকে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ধরে এনে পিরোজপুর জেটি ঘাটে এনে গুলি করে হত্যা করেছে। এমন দিন ছিল না যে ৫০/৬০ জন লোক হত্যা না করেছে। পাক বাহিনী গড়ে প্রত্যেক দিন ১০০ শত করে লোককে হত্যা করেছে। প্রথম দিকে যখনই লোক ধরে আনতো তখনই দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেছে। ২য় পর্যায়ে পাক বাহিনী যে সব লোককে ধরে আনতো তাদেরকে সন্ধ্যার পরে গুলি করে মেরেছে।

প্রথম দিকে যে সব লোক মারা হত তাদের বেশির ভাগ গুলি করেই হত্যা করেছে। শেষের দিকে যে সব লোককে ধরে আনতো তাদের প্রথম ভীষনভাবে মারধর করতো তারপর বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করতো। অনেক সময় আমি নিজ চোখে দেখেছি যে দুইজন দুই দিক থেকে একটা লোককে পা টেনে ধরতে আর একজন কুঠার বা দা দিয়ে কুপিয়ে দুই ভাগ করে ফেলতো।

ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার থেকে দুই চারজন ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার শহরে আসতে শুরু করে। যারা এই সময় শহরে আসতো তাদের প্রত্যেককেই শান্তি কমিটির কাছ থেকে পাকিস্তানী ব্যাজ শরীরে লাগিয়ে নিতে হতো।

শহরে রাজাকার গঠিত হবার পর শহরের পরিস্থিতি কিছুটা ঠাণ্ডা হলেও রাজাকারেরা ব্যাপকভাবে গ্রাম হতে গ্রাম অভিযান চালিয়ে বহু লোককে ধরে আনতো।

পাকসেনা আসার ১ মাস ১০ দিন পর্যন্ত আমি বলেশ্বর নদীর অপর পারে আমার বিরাট ফ্যামিলি নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে কাটিয়েছি। এই সময় অধিকাংশ দিন আমাকে এক বেলা কচুর শাক এবং বিভিন্ন শাকসবজি খেয়ে কাটাতে হয়। পরে অনন্যোপায় হয়ে আমি শান্তি কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে শহরে আসতে বলে।

জুন মাসের ১৫ তারিখে আমি নদী পার হয়ে শহরে আসি এবং একজন লোকের সহায়তায় শান্তি কমিটির অফিসে যাই। শান্তি কমিটির সেক্রেটারী আবদুস সাত্তার মিয়া আমাকে ঘরের পিছনে দিকে এক জায়গায় বসতে দেয়। ঐ দিন শান্তি কমিটির মেম্বারদের একটা অধিবেশন ছিল। ধীরে ধীরে বহু লোক এসে কমিটির অফিসে যোগ দেয়।

শান্তি কমিটির লোকেরা যখন সবাই বসে তখন আমি ঘরের অপর একটা রুমে বসে আছি। দালাল মোসলেম খাঁ এই সময় প্রস্তাব করে যে আমরা এখন পর্যন্ত হিন্দুদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। তার প্রমাণস্বরূপ আমাকে সে দেখিয়ে দেয়। এই সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব তার উত্তরে বলেন, যে আজ এ লোকের গায়ে, গন্ধ হয়েছে তাই না? কিন্তু আপনারা কে অস্বিকার করতে পারেন যে সে আপনাদের কাছ থেকে টাকা পাবে না? তখন সবাই চুপ মেরে যায়।

সাত্তার মোক্তার সাহেব আমাকে তার নিজের বাড়ীতে ঐ দিন রাত্রিতে লুকিয়ে রাখেন। পরের দিন ভোর হবার আগেই আমাকে নদী পার করে দেন এবং বলে দেন যে আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখলেই আপনাকে জানাবো, আপনি তখন আমার বাসায় চলে আসবেন।

৬ দিন পর শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ডাক্তার মিয়া আমাকে আসার জন্য চিঠি দেন। তার চিঠি পেয়ে আমি শহরে চলে আসি এবং সেক্রেটারী সাহেবের তত্ত্বাবধানে থাকি। এই সময় কতোগুলি লোকের কথার উপর ভরসা করে আমি যে লোকের কাছে আমার সমস্ত কিছু গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলাম সেই লোকের কাছে আমি আমার দুরবস্থার কথা খুলে বলি এবং তার কাছে কিছু টাকা চাই। তার উত্তরে তিনি আমাকে ভীষণ গালাগালি করেন এবং পাক বাহিনী দিয়ে আমাকে গুলি করাবেন বলে ভয় দেখান।

২৯শে শ্রাবণ আমি রাত্রে ৮টার সময় শহরের ভিতর একটা হোটেল থেকে কিছু খেয়ে বাসায় ফিরছিলাম এমতাবস্থায় পিরোজপুর জামে মসজিদের কাছে রাজাকাররা আমাকে ধরে পাক বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এই সময় তারা আমার প্রতি নানারকম গালাগালি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতে থাকে।

ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পর খান সেনারা আমাকে বলে যে তুমি মুক্তিবাহিনী হ্যায়। তুমি দুশমন হ্যায়। এই বলে তারা আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। একটা মোটা বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করে, বুট জুতা দিয়ে লাথি মারে এইভাবে আমার সারা শরীর রক্তাক্ত করে ফেলে।

প্রায় দুই ঘণ্টা আমার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর পর আমাকে তাদের হাজত অর্থ্যাৎ সেকেণ্ড অফিসার সাহেবের বাসায় একটা রুমে বন্দী করে রাখে। আমাকে বন্দী করার সময় আমার পকেট থেকে ২৪টা টাকা তারা নিয়ে নেয়।

আমাকে যে ঘরে বন্দী করা হয় ঐ ঘরে আরও ১৮ জন বন্দী ছিল। প্রতি দুই ঘণ্টা পর ডিউটিরত সিপাই চেঞ্জ হয়ে যেত। প্রতিবারেই আমার উপর সিপাইরা লাথি ঘুষি মারতে থাকে আর জিজ্ঞাসা করে মুক্তিবাহিনী কোথায়? এনায়েত মিয়া, ডাঃ আবদুল হাই, ডাঃ ক্ষিতিশ মণ্ডল এই সব আওয়ামী লীগের নেতারা কোথায় আছে। রাইফেল কোথায় আছে? ৩ দিন পর আমার উপর এইভাবে অত্যচার চালায়। এই সময় আর কোন নতুন আসামী তারা ঢুকায় না। তবে ঘরের বাইরে যে লোক ধরে এনে ভীষনভাবে প্রহার করে এটা আমি হাজতের ভিতর থেকে টের পাই।

১০ দিন পর বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও ১৪ জন লোককে ধরে আনে এবং তাদের সঙ্গে আমাকে এসডিও সাহেবের বাসার ভিতর একটা পায়খানার মধ্যে বন্দী করে রাখে। এদের মধ্যে আলী আশরাফ নামে একজন ছেলে। ঢাকা থেকে আসার পথে 'হুলার হাট' লঞ্চ ঘাটে পাক সেনারা তাকে আটক করে। তাকে আটক করার পর ক্যাপ্টেন একটা হোটেলের চুলার ভিতরকার আধাপোড়া কাঠ এনে তার শরীরের বিভিন্ন যায়গায় চেপে ধরে। সারা শরীরের চামড়া ও মাংস পুড়ে দুর্গন্ধ হয়ে ওঠে। এবং ছেলাটার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালান হয়। হাজতে আনার পর নিয়মিতভাবে আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে।

আমাকে হাজির করার পর ক্যাপ্টেন এজাজ আমাকে প্রশ্ন করে যে, তুমি মুক্তিবাহিনী, তোমার কাছে রাইফেল আছে, তোমাদের বাহিনী কোথায় আছে আমার কছে বল। আমি তার উত্তরে উর্দুতে বলি যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করি, কাজেই যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় তবে ব্যবসা সম্পর্কে করুন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়।

অতঃপর ক্যাপ্টেন আমাকে প্রশ্ন করে যে, তুমি এতো উর্দু কথা কেমন করে শিখেছো? তখন আমি কিছুটা ভীতু হয়ে পড়ি। কেননা আমি বৃটিশ আমলে ৭ বছর আর্মিতে চাকুরী করেছি জানতে পারলে আমাকে তখনই গুলি করে হত্যা করবে। আমি তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলতে লাগলাম যে, হুজুর আমি ব্যবসায়ী লোক কাজেই আমি খুলনাতে পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা করি, তারা আমাকে খুব পেয়ার করে এবং প্রতি ৭ দিন অন্তর আমি তাদের কাছে ১ দিন থাকি- এই সব কথা সত্য মিথ্যা বলি। এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পাঞ্জাবী লোকের নাম একাধারে বলে যাই।

আমার কথা ক্যাপ্টেন বিশ্বাস করে এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে যে, তোম মেরা দোস্ত হ্যায়। আরও বলে যে তুমি মুক্ত। আজ শহরে কারফিউ কাজেই সকাল বেলা তুমি তোমার ঘরে ফিরে যেও। এখন আরাম কর। এই বলে আমাকে পুনরায় সেই হাজত রুমে নিয়ে আসে।

হাজত রুমে আসার পর আর যে ১৪ জন ছিল তারা আমার কাছে কাকুতি মিনতি করে নানা কথা বলতে লাগলো যে ভাই তুমি তো সকালে বাড়ী যাবে কাজেই আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তুমি সংবাদ দিবে তারা যেন টাকা পয়সা যা লাগে তাই দিয়ে আমাদের এখান থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায়।

রাত্রি ১১টার সময় একটা প্লেটে করে ৪টা রুটি ও একটু মাংস নিয়ে আসে একটা সিপাই আমার জন্য। তখন আমি জোরে জোরে বলি যে ও রুটি আমি খাব না, তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আজ ১১ দিন হলো শুধু পানি খেয়ে আছি আর আজ শুধু আমার জন্য ৪টা রুটি এনেছো। কিন্তু এই হাজতের মধ্যে তো মোট আমরা ১৫ জন আছি, সবাই না খাওয়া, কাজেই আমি খাব না। সিপাইটি তখন ফিরে যায় এবং ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলে।

রাত্রি ১২টার সময় একটা বড় ঝুড়িতে করে রুটি ও একটা বালতিতে করে আলু ও মাংস নিয়ে আসে এবং আমাকে সবাইকে সঙ্গে করে খেতে বলে।

রাত্রি সাড়ে ১২টার সময় ক্যাপ্টেন আমাকে পুনরায় তার চেম্বারে ডেকে পাঠায়। আমার তখন ভয় হয়ে যায় যে আমি প্রথমে একা রুটি খেতে চাইনি বলে হয়তো তার রাগ হয়েছে। কাজেই আমাকে মেরে ফেলবে। একজন সিপাই আমাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেবের সম্মুখে হাজির করে আমাকে দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করে তুমি খেয়েছো। আমি বলি যে হাঁ আমি এই মাত্র রুটি মাংস খেয়েছি। ক্যাপ্টেন পুনরায় হেঁকে ওঠে যে না আবার তোমাকে আমার সম্মুখে খেতে হবে এই বলে ডাকাডাকি আরম্ভ করে। একজন সিপাই দুইটি পরটা ও একটা আস্ত মুরগীর রোস্ট নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেনের হুকুমে আমি তা খেয়ে ফিলি। পরে আমাকে পুনরায় আরাম করার জন্য হাজত রুমে নিয়ে আসে।

পরের দিন সকালে আমাকে পুনরায় ক্যপ্টেনের রুমে ডেকে নিয়ে আসে এবং আমাকে কিছু খেতে দেয়। এই সময় ক্যাপ্টেন আমাকে বলে যে এখন তুমি বাড়ী যাও এবং ঠিকঠাকমত চলাফেরা করবে। আমি বাড়ীর দিকে চলে আসি এবং বাড়ীতে না গিয়ে রাত্রিতে আর সব বন্দি যে সব কথা বলে দিয়েছে তাদের প্রত্যেকের বাসায় গিয়ে আমি তা বলে আসি। এই সময় যে ছেলেটিকে হুলার হাট থেকে ক্যাপ্টেন ধরে আনে তার খালুর সঙ্গে দেখা করি বলি যে বন্দী আশরাফ আমার কাছে কাকুতি মিনতি করে বলে দিয়েছে যে তাকে যদি গুলি করে হত্যা করা হয় তবে যেন তার আত্মার সৎ গতি করা হয়।

রাত্রিতে আমার ঘুম আসছিল না কাজেই বসে নানা চিন্তা করছি এমনি সময় জেটিঘাটে দশ রাউণ্ড গুলির শব্দ পেলাম।

পরের দিন সকালে উঠে খবর নিয়ে জানতে পারি যে যাদের বন্দী করে রেখেছিল তাদের সবাইকে রাত্রিতে গুলি করে হত্যা করেছে। তখন আমার বন্দী আশরাফের করুণ স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে এবং আমি দৌড়িয়ে জেটি ঘাটে চলে আসি। জেটি ঘাটে বেশ কয়েকটি লাশ দেখতে পাই কিন্তু আশরাফের লাশ দেখতে পাই না। একজন নৌকার মাঝির সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারি যে নদীর ভাটিতে কিছু দূরে দুইটা লাশ ভেসে আসে। আমি জেটি ঘাটে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং নদীর ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে লাশের কাছে আসি এবং নিজ হাতে আলী আশরাফের লাশ তুলে নিয়ে তার বাবা-মার কাছে হাজির করি এবং তার শেষ অনুরোধের কথা জানাই। লাশ দেখে তার বাবা-মা ভয় পেয়ে যান যে মিলিটারী জানতে পারলে তাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। আমি নিজে সারাদিন গোপনে সে লাশ লুকিয়ে রেখে রাত্রিতে কয়েকজন লোক ডেকে লাশ মাটির ব্যবস্থা করি। আমি শহরে বাস করতে থাকি এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে শহরের খবরাখবর আদান প্রদান করতে থাকি।

ক্যাপ্টেন এজাজ ছুটি নিয়ে পাকিস্তানে চলে যায় বিবাহ করতে। তখন ক্যাম্পের চার্জে সুবেদার সেলীম থাকে। এই সুবেদার তখন দালাল নিয়ে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। ব্যাপক হারে মেয়েদের ধরে এনে ক্যান্টনমেন্টে ধর্ষন করতে লাগলো। হিন্দু মুসলমান বলে কোনো বিচার তখন ছিল না- যেখানে যাকে পায় তাকেই ধরে আনতে থাকে। দেখতে দেখতে শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

আশ্বিন মাসের শেষের দিকে আমার বাসার সম্মুখে থেকে দুটি সিপাই আমাকে ডেকে নিয়ে যায় যে তোমাকে সুবেদার সাহেব বোলাতা হ্যায়। আমাকে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে গিয়ে সুবেদার বলে যে আমি তোমার জীবন নেব, তুমি আমাদের বঙ্গে বহুত দুশমনী করছো। এই বলে তারা আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। আমাকে মারতে মারতে সারা শরীর রক্তাক্ত করে ফেলে এবং এসডিও সাহেবের পায়খানার মধ্যে আটকে রাখে। ৬ দিন আমি সেখানে বন্দী থাকি। এই সময় আমি দেখতে পাই যে খান সেনারা প্রত্যেক দিন ক্যাম্পের সম্মুখে বাঙ্গালীদেরকে কয়েকজন মিলে শূন্যে তুলে পাকা রোডের উপর আছড়িয়ে মারতো বা এইভাবে আধা মরা

হয়ে গেলে বস্তাবন্দী করে তারপর বেয়োনেট চার্জ করে নদীর ভিতর ফেলে দিত। অনেককে আবার জীপ গাড়ীর পিছনের দিকে বেধেঁ সারা শহরের মধ্যে টানতো। এর ফলে সমস্ত মাংস শরীর থেকে পড়ে যেত। আমি এ সব ঘটনা নিজ চোখে দেখেছি। প্রত্যেক দিন আমাকে হাজত থেকে বার করে ক্যান্টনমেন্টের সম্মুখে একটা বাদাম গাছের সঙ্গে
কপি কল দিয়ে পা উল্টো দিকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিত এবং ভীসণভাবে প্রহার করতো।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি জেটি ঘাটে ২০০০ হাজার লাশ নিজের চোখে দেখেছি। প্রত্যেক দিন আমি ভোর বেলা ঘাটে গিয়ে যে সব লাশ পড়ে থাকতো তাদের উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতাম এবং চেনা শোন হলে তার বাড়ীতে গিয়ে খবর দিতাম।

আমি নিজের চোখে মানুষকে কুপিয়ে, রাস্তায় টেনে, বস্তাবন্দী করে বেয়োনেট চার্জ করে এবং গুলি করে মারতে দেখেছি।

পাক বাহিনীর চেয়ে রাজাকার, শান্তি কমিটির মেম্বার এরা অত্যাচার বেশী চালিয়েছে। পাক বাহিনী যাদেরকে ছেড়ে দিতো দালালরা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতো। পিরোজপুর জেটি ঘাটে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৩/৪ হাজার লোককে হত্যা করেছে। কত নারীকে যে ধর্ষণ করেছে তার কোনো হিসাব নাই।

স্বাক্ষর/-
উপেন্দ্রনাথ দত্ত
১৮/৮/৭৩

\ ১৯৯ \

আফতাব উদ্দীন আহমদ
থানা- পিরোজপুর
জেলা- বরিশাল

৪ঠা মে পিরোজপুর শহরে পাক বাহিনী প্রবেশ করে। পাক বাহিনী বরিশাল থেকে হুলার হাট হয়ে পিরোজপুর প্রবেশ করে। মিলিটারী তিন দিক থেকে পিরোজ পুর শহর আক্রমণ করে।

৫ই মে পাক বাহিনী আমার বাড়ী ধ্বংস করে। প্রথমে লুটতরাজ চালায়। তারপর অগ্নিসংযোগ বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এই দিনই পাক বাহিনী পিরোজপুর সেকেণ্ড অফিসার, এসডিপিও ট্রেজারী অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে।

পাক বাহিনী যখন ভাণ্ডারিয়া থানায় প্রবেশ করে তখন আমি আমার জীবনের নিরাপত্তার অভাব অনুভব করি। ভাণ্ডারিয়ায় আমার নিজ বাড়ী ছেড়ে আমি আমার শ্বশুরবাড়ী বরগুনা (পটুয়াখালী) চলে যাই। এখানে আমি প্রায় দেড় মাস কাল অতিবাহিত করি। তারপর আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে চিঠি লিখি আমার অসুস্থতার খবর জানিয়ে। আমার অসুস্থতার খবর পেয়ে চেয়ারম্যান সাহেব আমার কাছে চিঠি দেন এবং বলেন যে আমি ক্যাপ্টেন এজাজ সাহেবের সঙ্গে আপনার ব্যাপারে আলাপ করেছি, কাজেই আপনি এখানে আসতে পারেন।

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের চিঠি পাবার পর পিরোজপুর চলে আসি এবং চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে গোপনে থাকতে বলে। তিন দিন পর চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে ডেকে পাঠান এবং ক্যাপ্টেন এজাজের কাছে নিয়ে যান। ক্যাপ্টেন এজাজ সাহেবের কাছে আমি এই সময় একটা দরখাস্ত দেই যে আমার ছেলে ‘‘ক্যাপ্টেন জিয়া’’ আমার বাধ্য নয়, সে আমার অমতে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

আমি শহরে আসার ৭/৮ দিন পর জানলাম পাক বাহিনীর ক্যাপ্টেন এজাজের কাছে আমার নামে বলা হয়েছে যে, তার ছেলে প্রত্যেক দিন রাত্রিতে মুক্তিবাহিনী নিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যায়। এরপর প্রায় ১০০ মিলিটারী নিয়ে আমার বাড়ি আক্রমণ করা হয়। আমার বাড়িতে এসে পাক বাহিনী আমার বুকের উপর, আমার স্ত্রীর বুকের উপর এবং আমার ছেলের বুকের উপর রাইফেল ধরে। এই সময় পাক বাহিনী আমাদের ঘেরাও করে যে তোমার ছেলে ক্যাপ্টেন জিয়া তোমার ঘরে আছে, তুমি তাকে বের করে দাও। আমি তার উত্তরে বলি যে আমার ছেলে বাড়ীতে নাই, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার ঘর সার্চ করে দেখতে পারো। তখন আমার ঘর সার্চ করে তারা চলে যায়।

পাক বাহিনী সব সময়ই নারী ধর্ষণ করেছে। তারা রাজাকার দিয়ে গ্রাম থেকে সুন্দরী যুবতী মেয়েদেরকে ধরে আনতো। অনেক সময় তারা নিজেরাও কোন কোন বাড়ীর উপর চড়াও হতো এবং মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যেত।

পাক বাহিনী বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, মুক্তিবাহিনী ও হিন্দু এদের খোঁজ বেশী করেছে এবং যাদের সন্দেহ হয়েছে তাদেরকেই মেরে ফেলেছে। এমন কোনো রাত ছিল না যে পাক বাহিনী পিরোজপুর জেটি ঘাটে ৫০ থেকে ১০০ জন লোককে হত্যা না করতো। শেষের দিকে নদীর ভিতর শুধু মৃত লাশ ভাসতে দেখা যেত। আমার মনে হয় একমাত্র বলেশ্বর নদীর জেটি ঘাটেই ৪/৫ হাজার লোককে পাক জল্লাদরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পাক ক্যাপ্টেনের একমাত্র কথাই ছিল ‘জেটিমে ভেজ দেও।’

প্রথম অবস্থায় যে সব লোককে ধরেছে তাদেরকে জেটি ঘাটে গুলি করে হত্যা করেছে। কিন্তু শেষের দিকে তাদের বেয়োনেট দিয়ে জবাই করা হতো। যাকেই ধরা হতো তাকেই ভীষণভাবে প্রহার করতো।

আমি নিজের চোখে ৩ জন লোককে জীপ গাড়ির পিছনে বেঁধে রাস্তায় টেনে মেরে ফেলতে দেখেছি। তাদের সেই করুণ চিৎকারের কথা আমার এখন পর্যন্ত কানে বাজে।

শেষের দিকে নারী নির্যাতন ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। শামসুদ্দীন তালুকদার নামে একজনকে দুইজন পাক বাহিনী দিয়ে তার দুই পা দুই দিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই সময় আবদুল গফুর মিয়া বিএ সাহেবকে সে নিজে তার মুখের মধ্যে স্প্রিট ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রথম ৩ মাস আমার ছেলের কোনো খবর পাই না। ৩ মাস পর একজন আমার বাসার মধ্য প্রবেশ করে এবং বলে যে আমাকে তাড়াতাড়ী কোন জায়গায় লুকান, আমি ক্যাপ্টেন জিয়ার কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি। সে আমাদের কাছে ক্যাপ্টেন জিয়ার খবর দেয় এবং বলে যে সে ভাল আছে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। দেশ খুব তাড়াতাড়িই স্বাধীন হবে। এর পর থেকে প্রায়ই সেই ছেলেটি এসে ক্যাপ্টেন জিয়ার খবর আমাদের কাছে দিয়ে যেত।

পাক ক্যাপ্টেন এজাজ একদিন ঘোষনা করে দেয় যে, ক্যাপ্টেন জিয়া মঠবাড়িয়া যুদ্ধে মিলিটারীর হাতে অ্যারেস্ট হয়েছে এবং তাকে বরিশাল পাঠান হয়েছে। এই খবর আবার দালাল দিয়ে আমার কাছে পৌছে দিতো যেন আমি ভেঙ্গে পড়ি। অনেক সময় দালালরা আবার এসে বলতো যে আমরা ক্যাপ্টেন জিয়ার মৃত লাশ বলেশ্বর নদীতে ভাসতে দেখেছি।

স্বাক্ষর/-
আফতাব উদ্দীন আহমদ
১৯/৮/৭৩

\ ২০০ \

খাদিজা বেগম (দুলু)
থানা- পিরোজপুর
জেলা- বরিশাল

পাক বাহিনী ব্যাপক অত্যাচার চালায় সারা শহরে। কালিবাড়ী রোডের দুইধার, মাছিমপুর, পালপাড়া, শিকারপুর, রাজারহাট, কুকারপাড়া, ডুমুরতলা, কদমতলা, নামাজপুর, আলনকাঠি, ঢুলিগাতি, রানীপুর, পারের হাট, চিংড়াখালী ইত্যাদি এলাকা পাক বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে, ঘরবাড়ী লুট করে জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে।

পাক বাহিনীর অসংখ্য মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। রাধারমন ঘোষ নামে এক ব্যাক্তি ও তার ছেলেকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। পাক বাহিনীর লেকেরা তার মেয়েদের চায়। আষাঢ় মাসের এক রাতে তিন জন মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় পাক ছাউনীতে। পর পর তিন দিন তিন রাত অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার চালায়। তিন দিন পর শয্যাশায়ী অবস্থায় গাড়ী করে বাড়ী দিয়ে যায়। দৈহিক অত্যাচারের ফলে মৃত অবস্থায় ছিল, পরে বহু চিকিৎসা করে বাঁচে।

সুন্দরী মেয়েকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। বাবা, ভাই অনেক আকুতি মিনতির পর পাক সেনারা অত্যাচার চালায়। শেষ রাতে দিয়ে যায় তার পরদিন আবার ধরে নিয়ে যায়। পরপর কয়েকদিন রেখে অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার চালিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় তাদের বাড়ী দিয়ে যায়।

পাকসেনারা বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়ে ধরে পিরোজপুর সেনানিবাসে নিয়ে যেতে এবং অকথ্য অত্যাচার চালাতো। ভাগিরথী নামে এক মেয়েকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার অপরাধে গাড়ীর পেছনে ১০/১২ হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে সারা শহর ভীষণ বেগে গাড়ী চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

মন্টু নামে এক ছেলেকে পাকসেনারা ভাণ্ডারিয়া থেকে ধরে এনে উপরে পা ঝুলিয়ে দিনের পর দিন বেত দিয়ে পিটিয়েছে। কোন খাবার দেয়নি। শরীর কেটে কেটে লবণ দিয়েছে। তিন রাত ঐ ভাবে ঝুলিয়ে পিটিয়েছে আর নানা খবর জিজ্ঞাসা করেছে। এত অত্যাচারের পরও কোনো কথা সে স্বীকার করেনি। তিন দিন পর অর্ধমৃত আবস্থায় বেয়োনেট দিয়ে চার্জ করে হত্যা করেছে।

স্বাক্ষর/-
খাদিজা বেগম (দুলু)
২০/৮/৭৩

\ ২০১ \

রেনুবালা বারুই
গ্রাম- বাইনকাঠি
ডাকঘর- নাজিরপুর
জেলা- বরিশাল

পাকসেনা প্রথম আমাদের গ্রামে যায় শ্রাবণ মাসে। আমি তখন গোবর্দ্ধন গ্রামে স্বামির বাড়ী ছিলাম। কাঠালিয়া গ্রাম, বাইনকাঠি, তারাবনে গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। গ্রামকে গ্রাম লুট করে বাড়ীঘর সব ভেঙ্গে নিয়ে গেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে। অসংখ্য হিন্দু লোককে জোর করে মুসলমান করেছে।

অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। বহু মেয়েকে পাকসেনারা ধরে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। প্রায়ই ঘরের মেয়েকে পাকসেনারা ধর্ষণ করেছে। তিনজন মেয়েকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায় তাদের ছাউনী নাজিরপুর থানার পাশে সাত কাছিমা নামক স্থানে মাদ্রাসাতে। ক্রমাগত সাত আট দিন অসংখ্য রাজাকার তাদের উপর অত্যাচার চালায়। দিনের পর দিন দৈহিক অত্যাচার চালায়। রাজাকাররা তাদের ছাউনীতে আরও বহু মেয়ে রাখতো এবং দিনে রাতে ভোগ করতো। দেশ মুক্ত হলে অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি বাহিনীরা মেয়ে তিনটিকে উদ্ধার করে।

আমার স্বামী কৃষক ছিলেন, জমি চাষ করা ফসল ফলানো তার কাজ ছিল। যুদ্ধ বাঁধলে আমার খুড়তুতো শ্বশুর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। আমার স্বামীও উৎসাহ ভরে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখান। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় গেছেন অপারেশনে। ২৭শে আষাঢ় গোবর্ধন স্কুলের পাশে মুক্তিসেনাদের সাথে আমার স্বামীও ছিলেন। দলে প্রায় ৫০০ মত ছিল। ঐ দিন পাকসেনা রাজাকার মিলে ৭০০/৮০০ ছিল। তুমুল যুদ্ধ হয়। মুক্তিসেনারা তাদের ভারী অস্ত্রের সামানে টিকতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে। সেই সময় আমার স্বামী পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। আমার স্বামী সহ আরও ৬ জনকে ধরে। সাত জনের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর রাজাকাররা আমার বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এবং অত্যাচার চালায়। শিকদার বাড়ীর সবাইকে হত্যা করে। তারপর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাই। গ্রামের পর গ্রামে ঘুরে পালিয়ে বেড়িয়েছি। আজ আমি অসহায় নিঃস্ব সর্বহারা। যেখানে গেছি সেখানেই দেখেছি পাক বর্বর আর পশু রাজাকারদের অত্যাচারের বীভৎস রূপ। আজ দেশ স্বাধীন কিন্তু আমি কি নিয়ে বাঁচবো বলতে পারেন?

স্বাক্ষর/-
রেনুবালা বারুই
২০/৮/৭৩

\ ২০২ \

আলী হায়দার খান
পিরোজপুর
বরিশালে

কর্নেল আতিকের নেতৃত্বে পাকসেনারা হুলার হাট আসে। ঢুকেই ঘরবাড়ী জ্বালাতে থাকে। মুসলিম লীগাররা তাদেরকে স্বাগত জানায়। পাক সেনারা বলে হিন্দু বাড়ী কোথায়? এরপর থেকে হিন্দু ঘরবাড়ী জ্বালাতে থাকে। লুটপাট হত্যা অনবরত করতে থাকে। পিরোজপুর মহকুমা প্রশাসক মহিবুল্লাহ শাহ (সিন্ধী, পাকিস্তানের বিশিষ্ট ন্যাপ নেতা বাকের শাহর ভাইপো) আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন দোস্ত তোমরা তো স্বাধীনতা পেয়েই যাচ্ছো, আমরা পেলাম না।

৫ই মে ষড়যন্ত্র করে ওসি ভারপ্রাপ্ত এসডিও আব্দুর রাজ্জাক (২) এসডিপিও ফয়জুর রহমান আহমেদ (৩) ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমানকে ডেকে আনিয়ে মিটিং শেষ করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ীঘর লুট করে।

এরপর অত্যাচার শুরু করে। পিরোজপুরের চৌদ্দআনা ঘর দুয়ার ধ্বংস করেছে, লুটপাট করেছে।

পাক সেনারা হুকুম দেয় প্রতি ইউনিয়ন থেকে ২০ জন করে যুবক দিতে হবে। এই মোতাবেক গ্রাম থেকে ধরে ধরে শত শত লোককে হত্যা করেছে। ৪ হাজারের বেশী লোককে পাক সেনারা হত্যা করেছে। ভাগিরথী নামে স্পাই সন্দেহে ধরে গাড়ীর পিছনে বেঁধে সারা শহর ঘুরিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বিশিষ্ট ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গণপতি হালদারকে (ম্যাট্রিকে প্রথম, আইএসসি-তে প্রথম) নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। দৈনিক হত্যা করেছে।

ঘাটের পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। গাছের সাথে বেঁধে বেয়োনেট চার্জ করেছে। চিৎ করে শুইয়ে বাঁশের গোড়া দিয়ে পিটিয়ে হাড় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেলে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করেছে, পিটিয়ে অনেককে হত্যা করেছে। বেঁধে পায়ে আগুন চেপে ধরেছে, সুঁচ ফুটিয়েছে।

এসডিওর বাংলোতে যেখানে পাক ক্যাম্প ছিল সেখানে অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করেছে। ফুলু রানী বিশ্বাসের (কলেজ ছাত্রী) উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনের ফলে তার মৃত্যু ঘটে। সমস্ত থানাতেই পাক সেনারা ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছে।

স্বাক্ষর/-
আলী হায়দার খান
১৬/৮/৭৩

\ ২০৩ \

ভারতী রাণী বসু

গ্রাম- স্বরূপকাঠি
জেলা- বরিশাল

২৭শে এপ্রিল আমি কাঠালিয়া থানার মহিষকান্দি গ্রামে যাই আত্মরক্ষার জন্য তখন চারদিকে সব বিচ্ছিন্ন অবস্থা। হিন্দু বাড়ী বিভিন্ন স্থানে লুট হচ্ছে, হত্যা চলছে। ওখানে পৌছানোর পরপরই স্থানীয় কিছু লোক হিন্দু বাড়ী লুট শুরু করে দেয়। ২০/২৫ জনের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সকালে, দুপুরে, রাতে, ভোরে যখন তখন বল্লম, দা এবং অন্যান্য ধারাল অস্ত্র নিয়ে হিন্দু বাড়ী আক্রমণ করে সব লুট করে ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। আমি স্বরূপকাঠিতে ফিরে আসি ৫ই মে। সেদিন ছিল হাটবার ঐ দিনই সমস্ত এলাকা লুট করে নেয় দুষ্কৃতকারীরা।

৬ই মে সকালে পাক সেনা প্রথম স্বরূপকাঠিতে যায়। ওখানকার পীর শর্ষিনার বাড়ীতে গিয়ে পাক বাহিনী ওঠে। ওখান থেকে থানায় আসার পথে শর্ষিনার পুল থেকে থানা পর্যন্ত (সাহাপাড়া) সমগ্র হিন্দু বাড়ী প্রথমে লুট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওখান থেকে পাক বাহিনীর একটা দল অলঘারকাঠির দিকে গিয়ে ঘর বাড়ী জ্বালানো ও সেই সাথে মানুষ হত্যাও শুরু করে। আর একটি দল স্বরূপকাঠি এসে শুধু হিন্দু বাড়ী বেছে বেছে সকল হিন্দু বাড়ি লুট করে পুড়িয়ে দেয়। কালী প্রতিমার উপর অসংখ্য গুলি চালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বহুজনকে হত্যা করে। তারপর পাক বাহিনী ফিরে যায়। তারপর থেকে ক্রমাগত সাত দিন পাক বাহিনী স্বরূপকাঠিতে যায়। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে আর লুট করেছে। স্থানীয় কিছু লোক এবং পীরের দল পাক বাহিনীর সাথে থাকতো। লুট করতে বলে তারা যখন লুট করতে আরম্ভ করে তখন পাক সেনারা ছবি তুলতো।

কুড়িয়ানা আটঘর, জলাবাড়ী, সমুদয়কাঠি, জুলুহারা, নান্দিঘর, সোহাগদল, ইন্দ্রিরহাট মণিনাল, বাটনাতলা ইত্যাদি গ্রামসহ ৯টি ইউনিয়নে পাক বাহিনীরা গ্রামের প্রতিটি কোনাতে ঘুরে সব ধ্বংস করেছে লুট করেছে।

কুড়িয়ানা আটঘরে পিয়ারার বাগানে বহুজন আশ্রয় নিয়েছিলো। পাক বাহিনী হঠাৎ করে ঘিরে ফেলে অসংখ্য লোককে হত্যা করে। এক মেয়েকে পিয়ারা বাগান থেকে ধরে এনে সবাই মিলে পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারপর তিনদিন যাবৎ ব্লেড দিয়ে শরীর কেটে কেটে লবণ দিয়েছে। অশেষ যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা দেওয়ার পর মেয়েটিকে গুলি করে হত্যা করে। মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ ছিল। অন্য একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এখানে অধিকাংশ লোককে গুলি এবং বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করেছে। শত শত লোককে এই লোককে এই এলাকাতে হত্যা করেছে।

কাউখালি স্টেশনে আমি নিজে দেখেছি একজনকে মুক্তিবাহিনী সন্দেহে রাজাকাররা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। স্বরূপকাঠিতে টিকতে না পেরে মহিষকান্দিতে যাই। ওখানে গেলে আমাকে সবাই মুক্তিবাহিনীর চর মনে করলো এবং অস্ত্র আছে বললো। আমি ওখান থেকে রাতে পালিয়ে যাই রাজাপুরে।

রাজাপুর থানাতে হামিদ জমাদার সমগ্র থানাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত বাড়ীঘর লুট করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে হত্যা করেছে। হিন্দু কোন বাড়ীঘর ছিল না সব ধ্বংস করেছিল। ওখানে শুক্কুর মৃধা শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ছিল। আমি সহ আরও তিনজন তিন হাজার টাকা দিয়ে কোন রকম সেবারের মতো বাঁচি। আমি তখন কুমারী ছিলাম। সবাইকে মুসলমান হতে হবে এবং মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করতে হবে এমনি একটি পরিস্থিতিতে সুমীল কুমার দাস নামে এক ভদ্রলোককে আমি বিয়ে করি সে সময় দুষ্কৃতকারীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সময়টা ছিল জুন মাসের শেষ অথবা জুলাই প্রথম।

রাজাপুরে আছি স্বামীসহ। ভোরবেলা রাজাকার, পুলিশ মিলে প্রায় ৩০/৪০ জন আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। স্বামীকে লুকিয়ে রাখি। ওরা এসে সব কিছু লুট করে গালাগালি করে চলে যায়। কিছুক্ষন বাদে আবার এসে আর যা ছিল সব নিয়ে অত্যাচার চালায়। পাশের একটি লোককে হত্যা করলো।

নৈকাঠি রাজাপুর থানা গ্রামে শতকরা ৯৮ জনকে হত্যা করে। ওখানকার সব হিন্দু। ৯৮% মহিলা আজ বিধবা। নৈকাঠির প্রায় সব পুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের যথা সর্বস্ব আত্মসাৎ করে হামিদ জমাদার ও তার দল। ঐ বিপদের মাঝে জঙ্গলে জঙ্গলে এ বাড়ী ও বাড়ী করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার সব কিছু লুটে নেয় রাজাকার আর পাক বাহিনী। আমি কোন মতে পালিয়ে বাহিরচরে যাই জুলাই মাসের ১৭ তারিখে। আমি আমার কাজে যোগ দেই। তার পরপরই আমাকে সাসপেণ্ড করে রাখে তিন মাস। বাহিরচরে সমগ্র এলাকা খুন, ডাকাতিতে ভরা। সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

অক্টোবর মাসে কুদ্দুস মোল্লাকে (মুক্তিবাহিনী) চিকিৎসা করার জন্য কর্নেল আমাদের সবাইকে ডেকে লাঞ্ছনা দেয়। যাবার পথে গানবোট থেকে আমাদের হাসপাতালে শেল ফেলে। আমরা দারোয়ান পাহারা রেখে মুক্তিবাহিনীর চিকিৎসা করেছি। আমাদের ডা. শামসুল হক মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গোপনে গিয়েও তাদের চিকিৎসা করেছেন। আমরা সবাই সব কিছু দিয়ে তাদের সাহায্য করতাম।

বাহিরচরে পাক বাহিনীরা মেয়েদের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। বোয়ালিয়া, কাঁদপাশা, রাজগুরু, বাবুগঞ্জ থানা, দুয়ারিকা ইত্যাদি এলাকা থেকে বহু মেয়ে ধরে এনে ভোগ করেছে। আমার জানা এক হিন্দু মহিলাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়। মহিলা খুব সুন্দরী ছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চারদিন ক্রমাগত অকথ্য দৈহিক নির্যাতন চালায়। অসহ্য যন্ত্রনায় মহিলা ছটফট করেছে। তার উপর চালিয়েছে নির্যাতন। চারদিন পর মহিলা ছাড়া পায়। আমরা তার চিকিৎসা করে ভাল করি।

আমি স্বামীসহ বাস করছিলাম। আমার সর্বস্ব যাওয়া সত্ত্বেও স্বামী নিয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার স্বামী স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। আমাকে প্রায় বলতেন ডিসেম্বর মাস যদি বাঁচি জানুয়ারীর মধ্যে নিশ্চয় স্বাধীনতা পেয়ে যাবো।

৯ই ডিসেম্বর গৌরনদী থানার মাহিলারা ব্রিজের উপর দিয়ে আমার স্বামী যাচ্ছিলেন। তখন পাক বাহিনী প্রায় আত্মসমর্পণ করে এমন অবস্থায় ব্রিজে ডিনামাইট স্থাপন করে রেখেছিল। সেই সময় ডিনামাইট ফেটে ব্রিজ ধ্বংস হয়। আমার স্বামী ওখানেই নিহত হন। সব হারিয়ে একমাত্র স্বামী ছিল তাও স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে হারাতে হলো।

আমি বাহিরচর থেকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জন্য খাবার পাঠিয়েছি। রাতে যখন তখন আমার ওখানে তারা এসে থাকতো, যেতো। আমার স্বামী মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে মাঝে মাঝে যেতেন। আমার স্বামীর বড় সাধ ছিল স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাস করা। তার সে সাধ পূর্ণ হলো না।

স্বাক্ষর/-
ভারতী রাণী বসু
১৮/৮/৭৩

\ ২০৪ \

উষা রাণী মল্লিক

গ্রাম- জুলুঘাট, ডাকঘর- মৌশানি
থানা- স্বরূপকাঠি, জেলা- বরিশাল

২২শে বৈশাখ ঝালকাঠি থেকে রাজাকার ও মিলিটারী স্বরুপকাঠি থানাতে আসে। প্রথম দিন স্বরূপকাঠি থানাতে প্রবেশ করে ১৪ জন হিন্দু পুরুষ ছেলেকে পাক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাক বাহিনী আমাদের বাড়ীর পাশেই জুলুঘাট স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে। পাক বাহিনী আসার ৩ দিন পর আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে গ্রাম থেকে পালিয়ে আটঘর কুড়িয়ানা চলে যাই।

প্রায় ২ মাস দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে থেকে শেষে বাধ্য হয়ে আমাদের গ্রামে ফিরে আসি। হিন্দু বলে লোকে আমাদের জায়গা দিতে চাইতো না। ঠিক মত খাবার মিলতো না, লোকের কাছে চেয়ে চেয়ে খেতে হতো। সব জায়গায় ঐ একই কথা, মিলিটারী আসবে পালাও। রাজাকাররা রাত্রের অন্ধকারে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বহু যুবতী সুন্দর সুন্দর নারীকে ধর্ষণ করেছে এবং ধরে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। এই সময় তারা পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে যায় এবং সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। যাকে একবার ধরে নিয়ে যেত সে আর ফিরে আসতো না।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি একদিন পাক বাহিনী ও রাজাকাররা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে। আমার বাড়ীর পিছনে কলাবাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সব কিছু দেখছিলাম। আমার বাড়ীর উপর দিয়ে আমার পাশের বাড়ীতে ঢুকে পাক বাহিনী দুইজন মেয়েছেলেকে ধরে ফেলে এবং ঘরের ভিতর জোর করে নিয়ে যায়। আমরা ঝোঁপের ভিতর থেকে দেখতে থাকি কিন্তু করার কিছুই থাকে না। মেয়ে দুইটাকে যখন ঘরের ভিতর নিয়ে যায় তখন তাদের কোলের ছোট ছেলেকে আছাড় মেরে বাইরে ফেলে দেয়। ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে দুইটার করুণ চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। দুইটা মেয়ের উপর পর পর ৪ জন মিলিটারী ধর্ষণ করে। মিলিটারী চলে যাবার পর আমরা মেয়ে দুইটার কাছে যেয়ে দেখি তারা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের সারা শরীরে ক্ষতের চিহ্ন। পরনের কাপড় দুরে রয়েছে। সে এক করুণ দৃশ্য। তারা ঐ দিন গ্রাম থেকে আরও কয়েকজন মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে।

পাক বাহিনী থাকাকালে তারা প্রায়ই আমাদের গ্রামসহ আগে পাশের গ্রামগুলিতে আসতো। তাদের আসার খবর পেলেই সব লোক যে যেদিকে পারতো পালাতো। রাজাকাররা এই সময় সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে লোকজনকে ধরেছে। পুরুষদের সেখানেই গুলি করে হত্যা করতো আর মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যেত। অনেককে আবার ধর্ষণ করার পর ফেলে রেখে যেত।

শেষের দিকে রাজাকারদের অত্যাচার চরমে ওঠে। তারা প্রত্যেক দিন গ্রামের ভিতর যেতে থাকে এবং যেখানে যাকে পায় তাকেই মারতে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে বাড়ী ছেড়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে থাকি।

দেশ স্বাধীন হবার পর চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। মানুষ সব কষ্ট ভুলে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

স্বাক্ষর/-
উষা রাণী মল্লিক
২০/৮/৭৩

\ ২০৫ \

যতিন্দ্র নাথ মণ্ডল
গ্রাম- শশীদ
ডাকঘর- মৌশানী
থানা- স্বরূপকাঠি
জেলা- বরিশাল

১৭ই বৈশাখ পাক বাহিনী গানবোট নিয়ে ঝালকাঠি দিয়ে কাটাখালী নদী দিয়ে শশীদের হাটে আসে। তারা এসে হাটের পাশে গানবোট রেখে গ্রামের উপর নেমে পড়ে। পাক বাহিনী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নারী-পুরুষ প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে চেষ্টা করে। পাক বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে প্রথমে দামী দামী জিনিসপত্র লুটতরাজ করে এবং পরে ৯খানা বাড়ী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়। ঐ দিন ২ জন লোককে তারা গুলি করে। এদের একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় আর একজন গুরুতর রূপে আহত হয়।

২৬ বৈশাখ পাক বাহিনী ও রাজাকাররা পুনরায় আমাদের গ্রামে আসে। তারা গানবোট ও স্পিড বোট নিয়ে ছোট খাল দিয়ে গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়ে। মতিলাল দেবনাথ (ব্যানার্জী) ও হিরালাল দেবনাথের কাপড়ের দোকান লুট করে স্পিড বোট বোঝাই করে কাপড় নিয়ে যায়। এই সময় মতিলাল দেব নাথ এর কাছ থেকে নগদ ১২০০০ টাকা নেয় এবং তাকে বেয়োনেট চার্জ করে পরে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই দিন আমাদের গ্রামে ১৮ জন লোককে পাক বাহিনী গুলি করে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এর মধ্যে জিতেন নামে একজনকে পাক বর্বর বাহিনী নারিকেল গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে তার পায়ের কাছে খরকুটো দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার সারা শরীর আগুন ধরে গেলে সে ভীষণভাবে চিৎকার করতে থাকে তখন পাক বর্বর বাহিনী গুলি করে তার মাথার অর্ধেক অংশ উড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনা তার স্ত্রীর সম্মুখে হয়। কেননা পাক বাহিনী তার স্ত্রীকে ধরে এনে তার সম্মখে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই সময় ক্ষীরদা সুন্দরী নামে বিধবা মেয়েকে পাক বাহিনী সারা শরীর বেয়োনেট নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ সময় আর এক মহিলা পাশের জঙ্গলের ভিতর পালিয়ে ছিল তার ছোট ১ ছেলে ও ১ মেয়েকে নিয়ে। পাক বাহিনী তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে এক গুলিতে ছেলে, মেয়েসহ তিন জনই মারা যায়।

ঐ দিন আমাদের গ্রামের মোট চারখানা বাড়ী বাদে আর সব বাড়ী অগ্নিসংযোগ করে দেয়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ পাক বাহিনী ঝালকাঠি থেকে গানবোট নিয়ে পুনরায় শশীদ হাটে আসে এবং হাটের উপর ক্যাম্প স্থাপন করে। ঐ দিনই পাক বাহিনী আমাদের গ্রাম থেকে ২ জন লোককে হত্যা করে। তার মধ্যে একজন ছিল স্থানীয় স্কুলের সেক্রেটারী কালী কান্তা মণ্ডল। এই সময় পাক বাহিনী স্কুলের লাইব্রেরী লুট করে এবং ভেঙ্গেচুরে সব তছনছ করে দেয়। এবং লাইব্রেরীর ভিতরে ছাত্রদের দেওয়া রিলিফের গম পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই গরমে আগুন নেভাতে গিয়েই সেক্রেটারী সাহেব গুলি খান।

পাক বাহিনী এই সময় ১০ দিন শশীদ হাটে ক্যাম্প করে থাকে। এই সময় তারা ব্যাপক হারে নারী ধর্ষণ করে। একমাত্র আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েকে পাকবাহিনী ধর্ষণ করে। পাক বাহিনী রাত্রিতে গ্রামের ভিতর ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং কিছু কিছু মেয়েকে তারা ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং এক একজনের উপর পর পর কয়েকজন পাক পশু ধর্ষণ করে। এই সময় ১০ বছরের একটা ছোট মেয়েকে পাকবাহিনী তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং একাধারে তার উপর চলে পাশবিক অত্যাচার। পাক বাহিনী চলে যাবার পর এই মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। ৩ মাস পর্যন্ত এই ছোট মেয়েটি হাঁটতে পারতো না।

৮ মাসের গর্ভবতী একটি মেয়ের উপর পাক বাহিনী এই সময় অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার চালায় যার দরুন সন্তান প্রসব করার পর সে ও সন্তান মারা যায়।

২৫ শে শ্রাবণ পাক বাহিনী দালালের সহযোগিতায় ঝালকাঠি থেকে গান বোট নিয়ে শঙ্কর ধবল গ্রামে আসে এবং আছমত আলী ও রহিনী মিস্ত্রিকে ধরে নিয়ে শশীদ গ্রামে আসে এবং সুনিল সরকার নামে এক ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। এই সময় খুব বৃষ্টি নেমে পড়ে। পাক বাহিনী তখন রহিনী কুমার মণ্ডলের ঘরে আশ্রয় নেয়। এবং হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা নিয়ে খুব গান বাজনা করে এবং কলা খায়। বৃষ্টি শেষে যাবার সময় গৃহকর্তা রহিনী কুমার মণ্ডলকে গুলি করে হত্যা করে যায়। যে দুইজন লোককে তারা বন্দি করে আনে তাদের একজনকে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয় এবং একজনকে শশীদ হাটে বসে গুলি করে হত্যা করে। তাকে হত্যা করার আগে খুব মারপিট করে এবং গালাগালি দেয়। যাকে এই সময় ছেড়ে দেয় তাকে বলে দেয় তোমরা জয়বাংলা বলতে পারবে না। বলবে '' জয় পাকিস্তান ''।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বরূপকাঠি থানার অশ্বত্থকাঠি, জিনহার, মাদ্রা, পূর্বজলা বাড়ী, মৌশানী, জুলুহার, আতা, জামুয়া, জৌসার, গণপতিকাঠি, আরামকাঠি প্রভৃতি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এই সময় বহু লোককে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সময় মাদ্রা গ্রাম থেকে দুইজন লোককে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের অপরাধ ছিল পাক সৈন্য যখন একটা মেয়েকে ধর্ষণ করার জন্য যায় তখন তারা দুইজন বাধা দেয়। এই সময় তারা বহু মেয়েকে ধর্ষণ করে। একমাত্র স্বরূপকাঠি থানাতেই ১ হাজারের বেশী মেয়েকে পাক বাহিনী ধর্ষণ করেছে।

বিভিন্ন সময় আমাদের থানাতে প্রায় ২০০/৩০০ লোককে পাক বাহিনী হত্যা করে। স্বাধীনতার পর আটঘর কুড়িয়ানা স্কুল ঘরের পিছনে একটা পুকুরের ভিতর থেকে ১৫৬ টা মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়।

পাক বাহিনী স্বরূপকাঠি দখল করার পর স্বরূপকাঠি, কুড়িয়ানা, শশীদ, বাউকাঠি জলাবাড়ী এই সব জায়গায় ক্যাম্প স্থাপন করে এবং এখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন চালায়। জলাবাড়ী ক্যাম্প অঞ্চলে ৩৩টা গ্রাম শুধু হিন্দু বসতি ছিল, পাক বাহিনী সব গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

স্বাক্ষর/-
যতিন্দ্র নাথ মণ্ডল

\ ২০৬ \

শ্রী ফনীন্দ্র ভূষণ পাল

ঝালকাঠি, বরিশাল

আমি পশ্চিম ঝালকাঠি গ্রামে গুরুচরণের পরিত্যক্ত বাড়ী হতে রাজাকার এবং পুলিশ দ্বারা ধৃত হই। পরে ঝালকাঠি থানার ওসি সেকান্দার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। উক্ত গ্রাম হতে আজহার নামক অপর এক ব্যাক্তিকে ধরে আনে। তাকে বেদম প্রহার করার ফলে তাঁর গুহ্যদ্বার দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। আমাকে থানায় নিয়ে আসে। সেদিন থানায় প্রায় ৪০ জন বন্দি ছিল। যাদের ধরে আনতো তাদের রাইফেল দিয়ে বেদম প্রহার করতো। এর ফলে আনেকের দাঁত, হাত, পা ভেঙ্গে যেত।

প্রত্যেক দিন ভোর রাতে বন্দীদের থানা হতে কিছু দূর এক বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতো। রাতে গোপনে একটা কমিটি বসতো ধৃত ব্যাক্তিদের সম্পের্কে। যাদের ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করতো তাদের উক্ত রাতে ছেড়ে দিত, বাকীদের বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতো। আমাকে যেদিন ধরে নিয়ে যায় সেদিন আজহার ও তার পুত্র মক্তিফৌজ জনাব রশিদকে ধরে নিয়ে আসে। আজহার তাঁর পুত্রের চিন্তায় খাদ্য পরিত্যাগ করে। আমি তাকে বলি যে তোমার পুত্র দেশের জন্য শহীদ হচ্ছে এবং এটা বীরত্বের কথা, সুতরাং দুঃখ পাবার কিছুই নেই। তখন তার পুত্র রশিদ বলে যে আব্বা মরে তো যাবোই, কিন্তু যাবার পূর্বে তোমার সাথে একত্রে আহার করি। উক্ত পুত্র আমাকেও তার সাথে আহার করতে হলো এবং আমাকে তাঁকে আহার করিয়ে দিতে বলে। তখন আমরা একত্রে আহার করি। তখনকার সেই দৃশ্য সহ্য করার মতো ছিলো না। সে দৃশ্য অত্যন্ত করুণ ছিলো। সে আমাকে তার পিতাকে সাহায্য করার কথা বলে। পরে উক্ত ৪০ জনকে রাতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

এরপর আমি বাড়ী যাই। পরে পাঞ্জাবী বাহিনী এসে পুনরায় শহরে লুটপাট শুরু করে এবং নারী ধর্ষণ বেশী করে। এরা মানুষকে হত্যা করে কবর দিতো। এর পূর্বে মানুষদের হত্যা করে নদীতে ফেলতো। কিন্তু তখন বিভিন্ন মিশন ঝালকাঠিতে আসতে থাকায় তাঁরা অনেক ভাসমান লাশ দেখে এবং পাক বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে সন্দেহ করে। এই জন্য তাদের হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে পাক বাহিনী চেষ্টা করেছে তাদের কৃতকর্মের নজির চাপা দিতে। পাক বাহিনী সেই সময় শহরে অবস্থিত বহু পরিবারের নারীদের জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর তাদের দালাল বাহিনী ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করে।

স্বাক্ষর/-
শ্রী ফনীন্দ্র ভূষণ পাল
১৫/৮/৭৩

\ ২০৭ \

মোঃ মেমবর আলী সরদার
গ্রাম- উত্তর তালগাছিয়া
জেলা- বরিশাল

অসহযোগ আন্দোলনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা দেখিয়েছে। আমরা অফিস আদালত বন্ধ করে আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেই।

আমি গোসল করতে যাবার সময় দেখি যে দুই ব্যক্তিদের তাদের এক সঙ্গে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। তাদের রাস্তায় ফেলে চলে যায়।

বাগেরহাট ডাক বাংলোয় ঘাটে আমি চার/পাঁচজন মানুষকে এক সাথে হত্যা করতে দেখেছি। তার মধ্যে দুই একজন তখনো জীবিত ছিল। তারা রাস্তায় মানুষ দেখলে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতো বাঁচবার আশায়। কিন্তু তাদের সাহায্য করলে পাক বাহিনী সাহায্যকরীকেও হত্যা করতো। মানুষ মুর্মূষু ব্যাক্তিকেও সাহায্য করতে পারতো না এই বর্বর পাক সেনাদের ভয়ে।

একদিন দুজন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করে তারা ডাক বাংলোয় সামনে ঝুলিয়ে রেখে পিঠে কাগজ লাগিয়ে লিখে রেখেছে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় নক্সাল। তাদের পিঠ রাস্তার দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। এইভাবে মৃত ব্যক্তিদের দেখিয়ে অমানুষিক ও বর্বরোচিত কার্য করে মানুষকে ত্রাসের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছে।

একদিন দুজন যুবককে ধরে নিয়ে আসলো। শুনলাম তাঁরা মুক্তিফৌজ। পাক বাহিনীর একটি জাহাজ মাইন দিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে বাগেরহাটে এসে রাত কাটানোর সময় স্থানীয় দালাল দ্বারা ধৃত হয়ে পাক বাহিনীর হাতে পড়ে। তাদের ধরে নিয়ে এসে তাদের উপর অমানষিক নির্যাতন চালায়। বেদম প্রহার করে তাদের নিকট মুক্তিফৌজের বিভিন্ন গোপন সংবাদ জানার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাদের গোপন তথ্য ও সঙ্গীদের নাম শত অত্যাচারেও প্রকাশ করেনি। তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও বলেছে তোমরা আমাদের মেরে ফেলতে পারো কিন্তু আমি আমরা গোপন তথ্য ও সঙ্গিদের নাম বলবো না। পাকিস্তানী সেনারা তাদের পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেও তারা জয়বাংলা বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

ওয়াপদার রেস্ট হাউজ ও ব্যারাকের সমস্ত এলাকা পাক বাহিনী দখল করে সেখানে শক্তিশালী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। আমার নিবাস ছিল উক্ত ক্যাম্পের অতি নিকটে। সুতরাং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় আমি পাক বাহিনীর ধ্বংসাত্মক ও নির্যাতনের বহু দৃশ্য দেখেছি।

রায় সাহেব কিরণ চন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ীতে একটি একদল পাক বাহিনী প্রবেশ করে । তারা রায় সাহেবকে তার বাড়ির গোপন স্থান সমূহ দেখাতে বলে, তিনি তা পালন করেন। পরে তাকে বলে যে ওটা কি? যখন তিনি সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন তখন গুলি করে তাকে হত্যা করা হয় এবং তার বাড়ির সমস্ত মূল্যবান জিনিস লুট করে নিয়ে যায়।

ভোলা বোস নামে এক ব্যাক্তিকে আহারের সময় গুলি করে হত্যা করে। ভোলা বোসের আহার সমাপ্ত করার অনুরোধও উপেক্ষিত হয় এই বর্বরদের কাছে।

পাক সেনারা গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল অপারেশন করে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে আসতো পাক বাহিনীর ক্যাম্পে। তাদের সারারাত ধরে অফিসারগণ উপভোগ করতো। সময় সময় নির্যাতিত মহিলাদের করুণ আর্তনাদ মাঝ রাতে শুনতে পেতাম। পরে তাদের হত্যা করতো বলে মনে হয়।

সাধারণ সৈন্যগণ দিনের বেলায় প্রকাশ্যে শহরের বস্তি এলাকায় গমন করতো এবং বস্তি এলাকার মহিলাদের উপর জোর করে পাশবিক অত্যাচার চালাতো। এই দৃশ্য কখনো যদি কোন পথচারীর দৃষ্টিতে পড়ে যেত তাহলে উক্ত পথচারীকে বেদম প্রহার করতো। এইভাবে তারা মহিলাদের উপর নির্যাতন চালাতো।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মেমবর আলী সরদার
৮/৮/৭৩

\ ২০৮ \

সুধা রাণী বসু
গ্রাম- ছাচলেপুর
ডাকঘর- পিংড়ী
থানা- ঝালকাঠি
জেলা- বরিশাল

১৩৭৮ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঝালকাঠি থানা হতে ১৪ জন বাঙালি পুলিশ স্থানীয় শান্তি কমিটির দালালসহ ছাচলেপুর গ্রাম অপারেশনে যায়। সকাল বেলা পুলিশগণ আমার পিতার বাড়ী আক্রমণ করে এবং তা জ্বালিয়ে দেয়। আমরা সবাই নিকটস্থ জঙ্গলে পালিয়ে যাই। আমি আমার বড় মেয়ে সমবাতী বসুকে নিরাপত্তার জন্য মোতাহার গোমস্তার বাড়ীতে রেখে দেই। পুলিশেরা পরে উক্ত বাড়ীতে গিয়ে মোতাহারের সাহায্য আমার মেয়ে এবং অপর দুজন মেয়ে কমলা রানী দাস (বয়স ১৭) ও কল্পনা রাণী দাসকে (বয়স ১৮) ধরে নিয়ে যায়। পরে মেয়েদের খুঁজতে গিয়ে দেখি যে কমলা ও কল্পনাকে গুলি করে বিষখালি নদীর পারে হত্যা করেছে এবং সমাকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করেছে। এছাড়াও আমার আত্মীয় দুর্গাশংকর দাসকেও গুলি করে হত্যা করে। আমরা পরে উক্ত লাশ দেখতে পাই। উক্ত মেয়েদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এই পুলিশ বাহিনী।

তার পরের দিন পূর্বোল্লিখিত পুলিশগণ পুনরায় উক্ত গ্রামে অপারেশনে যায়। তখন আমার স্বামী নদী পার হয়ে পিংড়ি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখান হতে অন্যত্র চলে যায়। বহু দিন তার কোনো সংবাদ জানতে পারিনি। পুলিশের ভয়ে আমরা জীবিত দুই মেয়ে এবং এক ছেলে নিয়ে চৌকিদার বাড়ীর জঙ্গলে আশ্রয় নেই। আমি আমার ছোট ২ পুত্র এক স্থানে গোপন করে থাকি। অন্যত্র আমার দুই মেয়ে আত্মগোপন করে থাকে। চৌকিদার তখন উক্ত পুলিশদের বলে যে এই হচ্ছে লিডার সঞ্জীবের মা, একে ধরো। তখন পুলিশরা আমাকে ধরে ফেলে এবং ওসি বলে থানায় যেতে হবে।

সেই সময় আমার সঙ্গের মেয়েটি পুলিশকে বলে আমাদের মেরো না, আমার কাছে টাকা আছে নিয়ে যাও। তখন পুলিশ তার নিকট হতে ৩০০০/০০ (তিন হাজার) টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং আমাদের থানায় নিয়ে আসে। আমার অপর দুজন মেয়ে অসহায় হয়ে যায়। তাঁরা আশ্রয়ের জন্য ঘুরতে থাকে কিন্তু ভয়ে কেউ আশ্রয় দিতে স্বীকার হয়নি। একজন তাদের কান্না দেখে সদয় হয়ে তার বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। যাহোক আমাকে থানায় নিয়ে এসে প্রায় দেড় মাস আটকে রাখে। তখন নিম্নে বর্ণিত দৃশ্যগুলি দেখেছি।

থানা হতে পুলিশরা বিভিন্ন গ্রামে অপারেশন চালিয়ে নিরীহ লোকদের ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং রাত তিনটার দিকে তাদের হাত বেধেঁ দলবদ্ধ ভাবে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। ভোর চারটার দিকে সুগন্ধা নদীর তীরে এবং থানা হতে কিছুটা দূরে বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। আমি থানা হতে বহু মানুষের চিৎকার ও করুণ আর্তনাদ শুনেছি। কাউকেউ রক্ষা করেনি।

অনেক মানুষকে থানা হতে ঝালকাঠি মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যেত এবং সেখান হতে যখন উক্ত ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনতো তখন তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে পোড়া ক্ষতের চিহ্ন দেখেছি। পাক বাহিনী লোহার রড গরম করে উক্ত ব্যাক্তিদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতো। পরে তাদের থানাতে এনে রাতে উক্ত বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করত।

একদিন প্রায় ৯৫ (পঁচানববই) জন নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে। প্রত্যেক দিন ধৃত ব্যক্তিদের নাম জিজ্ঞাসা করতো। কিন্তু সেই দিন তাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে লাইন করে হত্যা করেছে। সকালে একজন

পুলিশ এসে তৎকালীন সিআই (পুলিশ) কে জানায় যে ৯৫ (পঁচানববই) জনের মধ্যে একজন জীবিত আছে। তখন উক্ত সি,আই উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়। প্রত্যেক দিন এই ভাবে ভোর রাতে ধৃত ব্যক্তিদের হত্যা করেছে। সিআইএর নির্দেশে এই এক মাসে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) লোককে উক্ত বদ্ধভূমিতে হত্যা করেছে বলে আমার মনে হয়।

আমার নিকট হতে ৩৮ ভরি সোনা এবং ৫০০ টাকার বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি তখন নিজ বাড়ীতে চলে যাই। আমি আসার পর আমার স্বামীর সাথে দেখা হয়নি। আমার পুত্র সঞ্জীব মুক্তিফৌজ হওয়ায় তার খোঁজ পাইনি। বড় ছেলে দীলিপের সংবাদও পাইনি। এইভাবে এক মর্মান্তিক ও করুণ অবস্থায় আমার দিন কেটেছে। স্বাধীনতার পর সবাই একত্রিত হই।

স্বাক্ষর/-
সুধা রাণী বসু
১৩/৮/৭৩

\ ২০৯ \

আজাহার আলী
গ্রাম- গবিন্দ ধবোল, ডাকঘর- কীর্ত্তিপাশা
থানা- ঝালকাঠি, জেলা- বরিশাল

১৯৭১ সালের ২৭শে এপ্রিল পাক বাহিনী ঝালকাঠি শহরে আসে। এসেই তারা ঝালকাঠি শহরে আগুন দিয়ে সমস্ত শহরটা পুড়িয়ে দেয় এবং গণহত্যা শুরু করে। পাক বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আমার ছেলে মোঃ সাত্তার নিজ গ্রামে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে ৭ই আষাঢ় বেশাই খান গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঐ দিন ঝালকাঠি ও স্বরূপকাঠি থানার পাক বাহিনী বেশাই খান গ্রামে গিয়ে উক্ত গ্রামটা সম্পূর্ণ ঘিরে নিয়ে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। তারপর পাক বাহিনী হতে আমার ছেলে সাত্তারসহ মোট ৫৫ জন যুবক ছেলেকে ধরে। এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে রাইফেল কোথায়? শরোজ বাবু কোথায়? এই কথা বলতে থাকে আর কিল, ঘুষি, লাথির পর লাথি, বেতের লাঠি দিয়ে প্রহার আর বন্দুকের বাঁট দিয়ে প্রহার করার পর তাদের মধ্যে হতে ১৩ জনকে একটা খালের পারে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে এক এক করে গুলি করে হত্যা করে খালের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসে। আর ৪২ জনকে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝালকাঠি নিয়ে আসার সময় গান বোটে বসে সবার সামনে সাত্তারের শরীরের বিভিন্ন স্থানে বেয়োনেট দিয়ে ফেঁড়ে ফেঁড়ে নাইট্রোজেন এসিড মাখিয়ে দেয়। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এখনো বলো শরোজ কোথায়, তার পরিবার কোথায় এবং মুক্তিবাহিনী কোথায়? সাত্তারের শরীরের এসিড মাখিয়ে দেয় আমাদের স্থানীয় এলাকার দুইজন কুখ্যাত মুসলিম লীগের দালাল চেয়ারম্যান আজহার কারিগর ও শাহাজউদ্দিন সরদার (সাজি)। তারপর তাদেরকে থানায় নিয়ে এসে হাজত ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। পরদিন সকাল বেলা আমি বাজারে এসে শুনতে পাই যে আমার ছেলে সাত্তারকে স্থানীয় দালালদের নির্দেশে পাক সেনারা তাকে ধরে ঝালকাঠি থানায় নিয়ে গেছে এবং ভীষণ প্রহার করেছে। তারপর আমি থানায় চলে যাই এবং আমার ছেলে সাত্তারের সাথে দেখা করি। সাত্তার তখন আমাকে বলে পাক সেনারা আমাকে গুলি করে না মারলেও দালালরা আমাকে রক্ষা করবে না। তাই আপনি তাদের কাছে আমার জীবন ভিক্ষা চেয়ে দেখেন তারা কি বলে। আমি দালালদের নিকট চলে আসি এবং তাদের পায়ের উপর কেঁদে পড়ে আমার ছেলের জীবন ভিক্ষা চাইলে তারা আমাকে লাথি দিয়ে দূরে ফেলে দেয় এবং বলে আগামীকাল সকাল বেলা এসো। তারপর আমি বাড়ী চলে যাই। ঐ দিন রাত্রিতে আমার ছেলে সাত্তারসহ ২৮ জনকে নদীর ধারে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে লাইন করে গুলি করে হত্যা করে। পরদিন ভোরে আমি তাদের নিকট গেলে তারা আমাকে বলে তুমি গত রাত্রিতে গুলির শব্দ শোন নাই? তোমার ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে আমি অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে যাই। ২০/২৫ মিনিট পর আমার জ্ঞান ফিরলে আমি সাত্তারের লাশের জন্য থানায় অনুমতির জন্য যাই। তখন থানায় পুলিশকে নির্দেশ দেয় আমাকে গুলি করতে। এবং আরও বলে সে যদি এখান হতে চলে না যায় তাকে গুলি করে হত্যা করবে। তারপর আমি সেখান হতে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে যাই। আমার ছেলের মরা লাশ সেখানে পড়ে থাকে। আমি বাংলাদেশের একজন গরীব কৃষক। দু'টা ছেলের মধ্যে মাত্র একজন ছেলে বর্তমানে বেঁচে আছে। মাত্র দুই বিঘা জমি আমার। কিন্তু সংসারে ৭/৮ জন লোক। অতি কষ্টে ছেলেটাকে বি, এ, পর্যন্ত পড়া লিখা শিখিয়েছিলাম। সে ছেলেকেও হারালাম।

স্বাক্ষর/-
আজহার আলী
১৭/৮/৭৩

\ ২১০ \

আজহার আলী মিঞা
গ্রাম- পশ্চিম ঝালকাঠি
জেলা- বরিশাল

রশিদ ও মানিক হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর দালালরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাদের সমস্ত শরীরে আঘাত করে। আঘাত করার দরুন তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। তারপর তাদেরকে ঝাল কাঠি থানায় নিয়ে আসে। থানায় কিল, ঘুষি, লাথি, এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান চাকু দিয়ে কুচা কুচা করে কেটে লবণ দিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হাজত ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখে। আর ঐ দিনই ৩০/৪০ জন পুলিশ রাজাকার, মিলে মুসলীম লীগের দালালের নির্দেশে আমার বাসা ঘেরাও করে ৪/৫ রাউণ্ড গুলি করার পর বাসার মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমাকে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ধরে ফেলে। এবং আমার বাড়ীঘর লুটপাট শুরু করে দেয়। তখন তাদের মধ্য হতে একজন হাবিলদার পুলিশ লুট করা বারণ করলে তারা লুট বন্ধ করে দেয়। তারা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে এ্যারেষ্ট করে। ঝালকাঠি থানায় নিয়ে আসার সময় ঝালকাঠি খেওয়া ঘাটে তাছোনউদ্দিনের চায়ের দোকানে বসে আমার ঘাড়ে, হাঁটুতে, হাতের তালুতে ও পায়ের তালুতে এবং শরীরের প্রতিটি গাইটে রাইফেলের বাঁট দিয়ে, বেতের লাঠি দিয়ে এবং বুট দিয়ে আঘাত করে যার দরুন শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। এবং আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার ২০/২৫ মিনিট পর আবার জ্ঞান ফিরে পেলে একটা রিক্সায় করে আমাকে ঝালকাঠি থানায় নিয়ে আসে। যখন আমাকে প্রহার করতো তখন শুধু আমাকে বার বার বলতো এমন ছেলে জন্ম দিয়েছ যে সে আজ পাকিস্তানের শত্রু আমি থানায় এসে দেখতে পাই যে, আমার ছেলে হাত পা বাঁধা অবস্থায় হাজতের মধ্যে আধমরা অবস্থায় পড়ে আছে। আমাকে থানায় নেবার পর আমার ছেলে রশিদ ক্যাপ্টেন আজমতের সাথে কথা বলতে চায়। একজন পুলিশ রশিদকে ক্যাপ্টেন আজমতের নিকটে নিয়ে যায়। রশিদ ক্যাপ্টেনকে জানায় যে, ‘‘আমি আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি। কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতা তো আর আপনাদের সাথে যুদ্ধ করে নাই। এর জন্য তো আমার পিতা দায়ী নয়। তাকে কেন আপনারা নির্যাতন করেন’’? তারপর ক্যাপ্টেন কিছু সময় চিন্তা করে আমাকে হাজত হতে মুক্তি দেয় এবং আমার ছেলেকে হাজতে নিয়ে রেখে দেয়।

আমাকে মুক্তি দেবার পর আমি আমার ছেলের সাথে দেখা করি। তারপর চোখের জল ফেলতে সেখান হতে বের হয়ে আসি। তার দুই দিন পর অর্থ্যাৎ ১৯ তারিখে রাত্রি দুইটার সময় নদীর ধারে আরো ১২ জন সহ মানিক ও রশিদকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারপর তাদেরকে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে রাখে।

স্বাক্ষর/-
আজহার আলী মিঞা
১১/৮/৭৩

\ ২১১ \

শ্রী রমেন কর্মকার (রঙ্গ)

ঝালকাঠি
জেলা- বরিশাল

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পাক বাহিনী ঝালকাঠি চলে আসে। এসেই তারা ঝালকাঠি শহরে লুটপাট শুরু করে। আগুন জ্বালিয়ে ৯০% দালান ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। পাকবাহিনী ঝালকাঠি আসার একদিন পূর্বে আমরা তারপাশা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেই।

এপ্রিল মাসের ২৫/২৬ তারিখে ঝালকাঠি হতে প্রায় ৭০/৮০ জন পাক সেনা তারপাশা অপারেশনে যায়। পাক সেনারা সংবাদ পেলে আমরা তারপাশার একটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকি। তারা একজন মুসলিম লীগের দালালের সহযোগিতায় উক্ত জঙ্গল ঘেরাও করে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। ফলে আমরা প্রাণ রক্ষার জন্য ছুটাছুটি করে পালাতে চেষ্টা করলে আমাদের ১০ জন ছেলেকে তারা ধরে ফেলে। এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, '' তোম্ মুসলমান হ্যায় ? কালেমা বাতাও''। আমরা উত্তর করি আমরা মুসলমান কিন্তু তারা আমাদেরকে দুই হাত বেঁধে ঝালকাঠি নিয়ে আসে। এবং থানা কাউন্সিলে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। অতঃপর হাত, পা লাইটপোষ্টের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে পা উপর দিকে, মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে প্রত্যেককে বালতি ভর্তি পানির মধ্যে মাথা ডুবিয়ে রাখে ও বেতের লাঠি, লোহার শিক ও বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শরীরে আঘাত করার দরুন আমাদের মধ্যে ৪/৫ জন অজ্ঞান হয়ে যায়। আঘাতের দরুন আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকে। তারপর পুলিশ দিয়ে আমাদেরকে থানায় নিয়ে যায়। পিটানোর সময় আমাদেরকে শুধু বলতে থাকে মুক্তিফৌজ কোথায়? এই বলে, আর প্রহার করে। আমাদেরকে থানায় নিয়ে এসে হাজতের মধ্যে রেখে দেয়। এবং ভোর রাত্রি চারটার সময় দু'জন করে একত্রে বেঁধে মোট ৮ জনকে গুলি করে হত্যা করে। উক্ত দলের মধ্য হতে আমাকেও নিতাইকে হাজতের মধ্যে রেখে দেয়। এই ঘটনা ঘটার দুই দিন পর আমাকে ক্যাপ্টেনের নিকট হাজির করে। এবং ক্যাপ্টেন আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোর কোন বোন আছে? আমি উত্তর করি আমার তিনটা যুবতি বোন আছে। ক্যাপ্টেন আমাকে বলে আমি তোকে ছেড়ে দিব তুই তাদেরকে নিয়ে শহরে আসবি। আমি তোকে ঘরবাড়ী টাকা-পয়সা সব দিব। আমি তার কথায় রাজী হয়ে যাই এবং আমাকে ও আমার চাচাতো ভাই নিতাইকে ছেড়ে দেয়। তারপর আমরা ছাড়া পেয়ে চলে যাই এবং তাদের সাথে আর দেখা না করে পালিয়ে পালিয়ে দিন কাটাতে থাকি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আবার আমি ঝালকাঠি চলে আসি।

স্বাক্ষর/-
রমেন কর্মকার
১৮/৮/৭৩

\ ২১২ \

সন্তষী বালা ঢালী
গ্রাম- সুবিদপুর, ডাকঘর- পাশসাতরিয়া
থানা- কাউখালী, জেলা- বরিশাল

বৈশাখ মাসের শেষের দিকে পাক সেনারা আমাদের গ্রামে গিয়ে (নিলতাগ্রাম) সমগ্র গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমে লুট করে তারপর সমগ্র গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। লোক পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করে হত্যা করেছে। ছোট ছোট বাচ্চা ধরে আগুনে ফেলে হত্যা করেছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ পাক সেনারা আবার আসে। গ্রামের লোকজন মনে করে যেহেতু নিলতাগ্রাম একবার পুড়িয়েছে সেহেতু সেখানে আর পাক সেনা আসবে না। তাই সমস্ত আশেপাশের লোক ঐ গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পাকসেনারা রাজাকার মারফত এ খবর পেয়ে যায়। পাক সেনারা সমস্ত নিলতাগ্রাম ঘিরে ফেলে লুট করার পরে জ্বালিয়ে দেয় একই সাথে ২০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করে ও পাশবিক অত্যাচার চালায়।

ঐ তারিখে আমার স্বামী পালিয়ে এক পুকুরের ভিতর মাথা উঁচু করে ছিল। পাক সেনারা খুঁজতে খুঁজতে জল থেকে উঠিয়ে আনে এবং ঐ পুকুরের পাড়েই ভীষণভাবে মারধোর করে। হিন্দু বলে অকথ্য গালাগালি করে, অত্যাচার চালায়, পরে গুলি করে ওখানেই হত্যা করে। আমার স্বামীকে হত্যা করে পাক সেনারা আমার বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীঘর সব জ্বালিয়ে আমার দু'টো শিশু সন্তানকে হত্যা করতে নিয়ে যায়। আমি পা চেপে কান্নাকাটি করলে টাকা চায়। আমার ২০০.০০ টাকা, ২ জোড়া রিং এবং একটি আংটি ছিলো (সোনার) সেগুলো সব দিলে আমার ছেলেদের ছেড়ে দেয়।

চিড়েপাড়া থেকে পাক সেনারা মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় ভোগের জন্য। নিলতা গ্রামে পাটি তৈরী করে এমন একটি লোকের বাড়ী ঢুকে লুট করে বাড়ী জ্বালিয়ে দেয় তারপর স্বামীকে গুলি করতে গেলে স্ত্রী ছুটে গিয়ে পাক সেনাদের পা জড়িয়ে ধরে বলে আমার বাড়ীঘর সব গেছে এখন স্বামীকে মারবার আগে আমাকে মারো। সাথে সাথে পাক সেনারা মেয়েটির উপর অত্যাচার করে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে পরে স্বামীকেও গুলি করে হত্যা করে। তারা অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। গন্ধর্ব গ্রামে পাক সেনারা গিয়ে গ্রাম জ্বালিয়ে বহুজনকে কুড়াল দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ধর্ষিতা হয়েছে অসংখ্য নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি গ্রামে গ্রামে পালাতে লাগলাম ছেলে দুটিকে নিয়ে। মাইলের পর মাইল না খেয়ে হেটে বহু কষ্টে শিশু সন্তান দুটি নিয়ে ৫ই শ্রাবণ ভারতে যাই। সেখানে বিলাসপুর চক্রবাটা ক্যাম্পে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হলে আমি নিজ গ্রামে ফিরে আসি।

টিপসহি/-
সন্তষী বালা ঢালী

\ ২১৩ \

মোঃ খালেদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
পানি উন্নয়ন, ভোলা, বরিশাল

৫ই মে পাক সেনারা ভোলাতে আসে। পাক সেনারা আমাদের ওয়াপদা কলোনীতে সেনানিবাস তৈরী করে। মেজর থাকতো ওয়াপদা রেষ্ট হাউসে। মে মাসেই শান্তি কমিটি গঠন হয়। জুন মাস থেকে রাজাকারে লোক ভর্তি শুরু হয়। ৬ই মে মেজর ইয়াহিয়া অফিসারদের নিয়ে সভা করে। সবাইকে দেশের জন্য কাজ করতে বলে এবং এও বলে হিন্দু এবং আওয়ামী লীগ এদের সব ধ্বংস করা হবে। ৭/৮ ই মে গাজীপুরের রোডে ৩/৪ জন হিন্দুকে পাক সেনারা গুলি করে হত্যা করে। এর পর পরই পাক সেনারা নিয়মিতভাবে লোক ধরে দুষ্কৃতকারী বলে হত্যা করতো। হত্যার স্থান ছিল ভোলা খেয়াঘাট, ওয়াপদা কলোনী এবং শিবপুর মেঘনায় পাড়।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি আসে ভোলাতে। সকালে উঠে দেখলাম একটি আর্মি নেই কলোনীতে। কোথায় গেছে জানতে পারলাম না। বিশ্ব ব্যাংকের লোক সব খবর নেয়। খাদ্যের অবস্থা, পাক সেনারা কেমন অত্যাচার করেছে ইত্যাদী। তাঁরা আমাদের রেষ্ট হাউসে তিন দিনের মত ছিলেন আবহাওয়া খারাপ ছিল বলে। আমি এক ভদ্রলোককে অবস্থা বুঝিয়ে বলি। শিবপুর মেঘনার পাড়ে যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল, এখনও ২/৪টি মৃতদেহ পড়ে ছিল, তারা তার ছবি তুলে নেয়, এবং অবস্থা মোটামুটি বুঝতে পারে। আমি পাক সেনাদের হত্যা দেখে বিচলিত ছিলাম। আমার পকেটে সব সময় রিবলভার থাকতো। যে কোন অবস্থার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতাম।

পাক সেনারা বিভিন্ন স্থান থেকে লোক ধরে আনতো তারপর এখানে তাদের গুলি করে হত্যা করতো। সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাস থেকে হত্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কারণ ঐ সময় থেকেই বিভিন্ন থানাতে মুক্তি বাহিনীর তৎপরতার শুরু হয়। জুন/জুলাই মাসে কাজের জন্য আমাকে বিভিন্ন থানাতে যেতে হতো। গাড়ী দেখে প্রথমে মানুষ পালাতো কিন্তু পরে আমাকে দেখে কাছে আসতো। অক্টোবর মাসে হত্যার সংখ্যা বেড়ে যায়। সৈন্যরা বাস থামিয়ে লোক নামিয়ে হত্যা করতো। গুজব রটলো মুক্তিবাহিনীর লোক কালো গেঞ্জি পরিধান করে। তারপর দেখা গেল খান সেনারা কালো গেঞ্জিওয়ালা লোক দেখলেই ধরতো, অত্যাচার করতো ও হত্যা করতো।

যাদেরকে ধরে আনতো তাদের খেতে দিত না, পরে হাত, পা বেঁধে গরু পিটানো পিটাতো যতক্ষন জ্ঞান থাকতো। পিটিয়ে অনেককে হত্যা করতো। শেষের দিকে খান সেনারা গুলি খরচ করতো না কলোনীর একটি ঘরে জবাই করতো। স্বাধীনতার পর ঘরটি দেখলাম চাপ চাপ রক্তে ভরা। আমি দেখেছি জবাই করে টানতে টানতে একটি গর্তে মাটিচাপা দিয়ে রাখতো। এই ভাবে আমার ধারণা, ২০০০ লোককে তারা হত্যা করেছে।

পাক সেনারা বহু মেয়ের উপরও পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। অনেক সময় বলতো দুষ্কৃতকারীরা ভারতীয় সিপাইয়ের পাল্লায় পড়ে এরকম কাজ করেছে এদেরকে খতম করবোই। মুক্তি বাহিনী আমাদের শত্রু, ওদেরকে খতম করতে হবে। পাক সেনারা প্রচুর পয়সা নিয়ে অনেক লোক ছেড়ে দিয়েছিল। বোরহানউদ্দিন এবং দৌলতখান থানা দুটিতেই পাক সেনারা অত্যাচার চালিয়েছে ব্যাপক। মুক্তি এবং মিত্র বাহিনীর চাপে ৯ই ডিসেম্বর পাক সেনারা ভোলা থেকে পালিয়ে যায়। শোনা যায় চাঁদপুরের কাছে মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে মেজরসহ সবাই নিহত হয়।

স্বাক্ষর/-
মেঃ খালেদ
১২/৯/৭৩

\ ২১৪ \

মোঃ ফরিকুর রহমান
কালীবাড়ী সড়ক
ভোলা, বরিশাল

পাক সেনারা ভোলায় আসার পরপরই মানুষ খুন করে। মেয়ে ধরে এনেও পাশবিক অত্যাচার করে।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি রাত ২টায় হঠাৎ আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। ১০ জনের মত খান সেনা একজন রাজাকার এবং বাঙ্গালী ড্রাইভার। তারা প্রথমে আমার আব্বার সাথে কথা বলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি উপর থেকে নীচে নেমে আসি। সুবেদার সিদ্দীক আমাকে বন্দী করে গাড়ীতে তোলে। গাড়ীতে ডাঃ ফজলে হোসেন (এম, বি, বি, এস,) কে বন্দি অবস্থায় দেখলাম। গাড়ী মাকছুদুর রহমান এ্যাডভোকেটের বাড়ী যায় তাকে ধরার জন্য কিন্তু তাকে না পেয়ে গাড়ী চলতে থাকে। রাইফেল পড়ে গিয়ে সিদ্দীক সুবেদারের পায়ের নখ উঠে যায় এবং রক্তপাত হতে থাকে। আমি এবং ডাক্তার মিলে তাড়াতাড়ি করে জয়নাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে যত্ন করি। সুবেদার মন একটু নরম হলো বুঝলাম। গাড়ীর ড্রাইভারকে বললো গাড়ী খেয়াঘাট যাবে না, ওয়াপদা নিয়ে চলো। খেয়াঘাট মানেই মৃত্যু ছিল। বুঝলাম, আপাততঃ বেঁচে গেলাম। অতঃপর তারা আমাদের ২ জনকে ওয়াপদা কলোনীতে নিয়ে যায় এবং একটি ঘরে আটকে রাখে। বাইরে পাহারা থাকে। পরদিন চা নাস্তা খাইয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে আমাদেরকে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাবার পর জিজ্ঞেস করে 'মুক্তি বাহিনী কোথায়, বল।' আমরা জানি না বললে ভীষনভাবে মারধোর করে। আমরা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ি তখন জেলে নিয়ে আটকে রাখে। আমি এবং ডাক্তার শহরে মোটামুটি পরিচিত ছিলাম। প্রতিবাদে শহরের সকল দোকান পাট বন্ধ হয়। রিক্সাসহ সমস্ত শহর অচল হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমার আত্মীয়স্বজন আমাদের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। টাকা দিলে তাদের মন কিছুটা নরম হয়। শান্তি কমিটি শহরের এই অবস্থায় অধিবেশন ডাকে এবং আমাদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের যেখানে রেখেছিলো সেখানে অনেক রক্ত এবং রক্তমাখা জামা দেখলাম। ২দিন রাখার পর অত্যাচার করেও কোন কথা যখন বের করতে পারেনি তখন আমাদের ২ জনকে ছেড়ে দেয়। আমি বাড়ি চলে আসি। ১০/১২ দিন পর মিলিটারীর একান্ত সহকারীর মারফত খবর পেলাম আমাকে আবার ধরার ষরযন্ত্র করছে। আয়ুবী আমলে আমি ডি পি আর এর আসামী ছিলাম ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বলে।

আমি গোপনে নৌকা ভারা করে বরিশাল পালিয়ে যাই এরপর আর ভোলাতে আসিনি। ভোলা শত্রুমুক্ত হলে আমি ভোলাতে ফিরে আসি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ফরিকুর রহমান
১৩/৯/৭৩

\ ২১৫ \

শ্রী বিমল কৃষ্ণ দাস
সরকারী স্বাস্থ্য সহকারী
ভোলা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র
ভোলা, বরিশাল

২৮শে মে রাজাকাররা রাত ১২টার দিকে আমাদের গ্রামের বাড়ী ঘিরে ফেলে। লোকজন দেখে ভাবলাম গ্রামে পাহারা দেয় তারাই হয়তো আসছে। দারোগা এসেই আমার নাম জিজ্ঞাসা করে। নাম বলার সাথে সাথে আমাকে আটকাতে বলে। রাজাকারদের মধ্যে একজন আমাদের পরিচিত এবং ২ জন আমার সহপাঠী ছিল। আমাদের বাড়ী ঢুকে সবাইকে গ্রেফতার করে বলে তোমাদের কাছে বন্দুক আছে তোমরা মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছো। আমার দাদা বিজয় ভূষণ দাস (২) আমি (৩) ব্রজমোহন দাস (জ্যাঠা) (৪) হরিপদ দাস (কাকা) (৫) সুনীল কুমার দাস (খুড়তুতো ভাই) (৬) সহদেব হালদার (কৃষাণ বাড়ীর) (৭) যোগেন্দ্র বৈদ্য (৮) শ্যামল কৃষ্ণ দাস (৯) সেয়দ আহম্মদ (১০) রুহুল আমীন (১১) ইনা আলী। দারোগা সবাইকে থানায় নিয়ে যায়। পথে বালক বলে শ্যামল কৃষ্ণ দাস, রুহুল আমীন এবং ইনা আলীকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের ৮ জনকে থানায় নিয়ে আসে। পথে জনৈক রাজাকার বলে তোমার জ্যাঠাতো বোনকে দিলে সবাইকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে। আমি অস্বীকার করলে আমার জ্যাঠাকে বলে। জ্যাঠা মহাশয় বলেন, 'আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও মেয়ের ইজ্জত দিতে পারবো না, টাকা নিতে পারো।' রাজাকাররা ক্ষিপ্ত হয়ে সবাইকে হাজতে আটকে রাখে। ২৯শে মে সকালে রাজাকার আবার এসে আমার বোনকে চায়। আমি অস্বিকার করি। রাজাকার ফিরে যায়। আমার বৃদ্ধ আর এক জ্যাঠা দারোগাকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ করলে সে বলে, ক্যাপ্টেন বরিশাল থেকে ফিরলে তখন দেখা যাবে। ক্যাপ্টেন ছিল কায়ানী। ২৯শে মে ভোলা ডাক বাংলাতে শান্তি কমিটির সভা বসে আমাদের নিয়ে। বরিশাল থেকেও জেলা শান্তি কমিটির লোক আসে আমাদের বিষয়ে। বরিশালে শান্তি কমিটির পুরাতন অনেকেই আমার বড় জ্যাঠাকে চিনতো। তারা এসে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে। আমি একটু আশ্বাস পেলাম হয়তো বাঁচবো।

৩০শে মে সকাল ১০ টার দিকে ক্যাপ্টেন নিজে ১০/১২ জন খান সেনা নিয়ে আমাদের দেখতে যায়। আমার ভাইপো ৭/৮ বছর বয়স, ক্যাপ্টেনের পা ধরে খুব কান্নাকাটি করলে ক্যাপ্টেন বলে আচ্ছা ছেড়ে দেবো। আমাদের শিবপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ইলিয়াস মাষ্টারকে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করতে নিষেধ করে। আমার জ্যাঠা ডাঃ শশী ভূষণ দাস দারোগাকে ৫০০০ টাকা দিতে রাজী হলে সে বলে, 'কালকে আসবেন'।

পাক কর্তৃপক্ষ একটি ব্যাজ দেন (সি, এস)। এই ব্যাজ কমন সারভেন্ট, সাধারণ কৃষক, মুচি, মেথর, নাপিত এদের দেওয়া হতো। আমাদের বাড়ীর কৃষক হিসেবে ব্রজমোহন দাস, হরিপদ কুমার দাস এবং সুনীল কৃষ্ণ দাসের নামে ব্যাজ দেবার জন্য তারা টাকা নেয়। ব্যাজ বুকে থাকলে পাক সেনারা ধরবে না বা গুলি করবে না।

৩০শে মে রাত ৮-১৫ মিঃ ক্যাপ্টেনসহ ১৪/১৫ জন খান সেনা আসে। আমাদের ৫ জন করে হাত বেঁধে ২টি দলে ১০ জনকে গাড়ীতে তোলে। আমাদের ৮ জন ছাড়া আর ২ জন ছিল বাপতা গ্রামের অনিল এবং চরফ্যাশনের আর একজন।

তারা আমাদেরকে বরিশালে নিয়ে যাবার নাম করে ভোলা খেয়াঘাটে নিয়ে যায়। আমাদের ৫ জনকে ট্রাকে বসিয়ে রেখে অপর ৫ জনকে নদীর কূলে নামিয়ে আমাদের সামনে এক এক করে গুলি করে হত্যা করে। ঐ পাঁচ

জনের দলে আমার খুড়তুতো ভাই তখনো মরেনি, 'মা' 'মা' করে কাঁদছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি। ঐ অবস্থায় সারা রাত থেকে পরদিন আমার ভাই মারা যায়। আমাদেরকে তীরে নামিয়ে এক একজনের জন্যে ২ জন করে সেনা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমাদের বললো জ্বলে নামতে। খান সেনারা চায়না অটোমেটিক রাইফেল প্রস্তুত করতে থাকে। আমি বলি, দাদা, সময় যায় ঝাঁপ দে। দড়ি বাঁধা অবস্থায় আমরা ৫ জন নদীতে ঝাঁপ দেই। খান সেনারা গুলি চালায়। আমরা টানাটানি করে হাতের দড়ি খুলে ফেলি। আমি সাঁতার দিয়ে নদীর ওপারে চলে যাই। দাদা আর এক দিকে চলে যায়। গুলি অনবরত চলছে আর খান সেনারা গালাগালি করছে। একটি কারগো লঞ্চ দাঁড় করানো ছিলো তারা তাকে ডাকতে থাকে। আমি তীরে উঠে ক্রলিং করে ধান ক্ষেতের দিকে পালাতে থাকি। সাত মাইল দূরে টুংচর গিয়ে পৌছাই এক আত্মীয়ের বাড়ী। ওখানে ২দিন থাকি। জানাজানি হয়ে গেলে বালিয়া গ্রামে পালিয়ে যাই এক বন্ধুর বাড়ী। ওখানে কওছর হাওলাদারের (প্রাইমারী শিক্ষক) বাড়ীতে ২ মাস থাকি। পরে আমার আহত দাদার খোঁজ পেলাম। জানতে পারলাম আমাদের ৫ জনের মধ্যে ৩ জন বেঁচে গেছি, ২ জন মারা গেছে।

গ্রামে গ্রামে পালিয়ে দিনের পর দিন জলের ভিতর থেকে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতে গিয়ে পৌছাই। তারা আমাদের বাড়ীঘর সব লুট করে নিয়ে যায়। আমাদের গ্রামের রাজাকারদের সহযোগিতায় তারা সমস্ত গ্রামের হিন্দু পরিবারদের ধ্বংস করে। তারপর দেশ মুক্ত হলে আমি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসি।

স্বাক্ষর/-
শ্রী বিমল কৃষ্ণ দাস
১৩/৯/৭৩

\ ২১৬ \

আব্দুল করিম
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
পিরোজপুর কলেজ,
পটুয়াখালী

মে মাসে পাক বাহিনী পাথরঘাটা যায়। ঐ দিনই ৯ জন হিন্দুকে গুলি করে হত্যা করে। সি, ও, (রেভ), পুলিশ জমাদার, এদেরকেও গুলি করে হত্যা করে। কনষ্টেবল পালাবার চেষ্টা করলে তাকেও হত্যা করে। আমি পরিবার নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকি। সমস্ত পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন গ্রামে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পাক সেনাদের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, অধ্যাপক করিমকে ধরে দিতে পারলে নগদ দশ হাজার টাকা এবং একটি রিভলবার পুরস্কার দেওয়া হবে। এ সংবাদ যখন পেলাম তখন আরও ভীত হয়ে পড়ি।

তারপর আমি পিরোজপুর পালিয়ে আসি। পাথরঘাটা থানাতে ১০০-এর বেশী লোককে পাক বাহিনী হত্যা করে। অত্যাচার চালায় ব্যাপকভাবে। চরদুয়ানী, কালিবাড়ী, কাঁঠালতলী, পাথঘাটা ইত্যাদী এলাকা পাক বাহিনী ধ্বংস করে। প্রথমে লুট করে, পরে জ্বালিয়ে দেয়।

বিভিন্ন সময় পাক বাহিনী অপারেশনে গিয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার চালায়। লক্ষণ চন্দ্র দাস নামে এক ব্যবসায়ী ৫ ছেলে ২ মেয়ে নিয়ে পালিয়েছিল। দালালরা সুন্দরবন এলাকা থেকে লক্ষণ দাসসহ পাঁচ ছেলেকে ধরে আনে। অকথ্য অত্যাচার চালাবার পর তাদেরকে বরগুনা মহকুমাতে পাঠায়। সেখানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ছেলে, তারপর লক্ষণ দাস, তারপর ছোট্ট দুটি ছেলেকে লাইন দিয়ে দাঁড় করায়। পরপর তিনটি ছেলেকে গুলি করে মারলে লক্ষণ দাস হার্ট ফেল করে মারা যায়। পাক সেনারা কি মনে করে ছোট দুটি ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখে। তারপর ওদেরকে মুসলমান করে পাথরঘাটাতে পাঠিয়ে দেয়। একটির বয়স ৭/৮ আর একটির ১০/১১ বৎসর হবে। অনেককেই এভাবে পাক সেনারা শেষ করেছে। কনক নামে এক ভদ্রলোককে তার স্ত্রীর কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে তারই সামনে গুলি করে হত্যা করেছে। প্রাইমারী শিক্ষক আব্দুল মালেক ও তার ছেলে শাজাহানকে মুক্তি বাহিনীকে সহযোগিতা এবং স্পাইং করার জন্য পাক সেনারা বাপ-ছেলেকে এক সাথে গুলি করে হত্যা করে।

আমি পালিয়ে এসে পিরোজপুর তৃতীয় হাকিম আব্দুল মান্নান হাওলাদারের সাথে সব কথা বলি এবং বাঁচার উপায় বলতে বলি। পিরোজপুরের চার্জে তখন ক্যাপ্টেন এজাজ। মান্নান সাহেব বললেন, যদি এজাজকে আয়ত্তে আনতে পারো তাহলেই বাঁচা সম্ভব। এজাজের ছিল ক্লাবে যাওয়া অভ্যাস সেই সাথে জুয়ার ও আমি ক্লাবে গিয়ে তাস নিয়ে বসি। এই পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনের বিশ্বাস ছিল যারা তাস খেলে তারা দুষ্কৃতকারী হতে পারে না। এই বিশ্বাসের উপর হিন্দু ডাঃ ইন্দ্রভূষণ বিশ্বাস সহ আমরা অনেকে বেঁচে যাই। আমরা খেলার মারফত ক্যাপ্টেনের বেশ কাছে গিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন বলতো, 'বাংলাদেশ মুক্ত হবেই, আমরা আটকে রাখতে পারবো না।'

১৫ই নভেম্বর পাক সেনারা আমার ভাই (বি,এস,সি, ছাত্র) আব্দুল কাইয়ুমকে ধরে পাথরঘাটা থেকে এবং অকথ্য নির্যাতন চালায়। তার হাত পায়ের কোথাও অক্ষত ছিল না। শেষ পর্যন্ত এগার হাজার টাকা দিয়ে সে প্রাণ ভিক্ষা পায়।

স্বাক্ষর/-
আব্দুল করিম
১৮/৮/৭৩

\ ২১৭ \

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
থানা- বরগুনা
জেলা- পটুয়াখালী

পাক দালালরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তারা সংগ্রামী মানুষদের ধরে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। মুক্তি বাহিনীর ভয়ে সাধারণত তারা গ্রাম অঞ্চলে ডুকতো না। প্রথমে বরগুনাতে শান্তি কমিটি গঠন করে উক্ত দালালরা পাক বাহিনীকে পটুয়াখালী হতে বরগুনায় পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। তাঁদের নির্দেশ মতো পাক বাহিনী গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে অপারেশন চালিয়েছে। দালাল শ্রেণীর লোকেরা সুযোগ পেয়ে লুটপাট করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে শান্তি কমিটির দালালেরা নির্দেশে পাথরঘাটার কনক নামে একজন নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করে হয়। হত্যার সময় কনকের স্ত্রীর কান্না এবং আকুল অবস্থা দেখে বহু মানুষ চোখের জল রাখতে পারেনি। এমনকি বর্বর খান সেনারা কনককে রেহাই দেবার কথা বলেছে কিন্তু নিষ্ঠুর দালালরা তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে কনককে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। বরগুনার শান্তি কমিটি বন্দর এলাকা হতে বহু নিরীহ মানুষদের ধরিয়ে দেয় এবং পাক বাহিনী তাঁদের হত্যা করে। তারা বহু নারীর সর্বনাশ করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
২৭/০৮/৭৩

\ ২১৮ \

শ্রী অমল কান্তি সেন
অধ্যাপক
সাতকানিয়া কলেজ
চট্টগ্রাম

১৯৭১ সালের ২৩শে এপ্রিল পাক বাহিনী দোহাজারীতে ঘাঁটি স্থাপন করে। ২৪শে এপ্রিল পাক বর্বর বাহিনী সাতকানিয়া থানার কাঞ্চনা গ্রামে সর্বপ্রথম অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই সময় তাদের সাথে তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে ছিল অন্যান্যদের মধ্যে সাতকানিয়া এক দুর্বৃত্ত। ১৩ই ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত দখলদার বাহিনী ও রাজাকারদের সাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং সাতকানিয়া থানার বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ও মুসলিম প্রগতিবাদী শ্রেণীর লোকদের নানা ভাবে হয়রানি করেছে। সে কারও কারও কাছ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা আদায় করেছে ঘর বাড়ী করার ওয়াদা দিয়ে বা প্রাণ রক্ষার অঙ্গীকারে।

২৪শে এপ্রিল যে দিন কাঞ্চনা গ্রামটি ভস্মীভূত করা হয়েছে সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ঘরে মূল্যবান যে সকল জিনিস ছিল তা প্রথমে লুট করা হয়েছে। ঘর থেকে পালিয়ে লোকজন যখন এদিক সেদিক যাচ্ছিল তখন তাদের কাছে যা পাওয়া গেছে তাও লুট করে নিয়েছে। এই ভাবে বেশীর ভাগ লোককে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। তখন বৃষ্টির দিন, তখনও পোড়াবাড়ীতে নতুন ভাবে ঘর তৈরী করার অনুমতি দেয়নি শান্তি কমিটির লোক। কাঞ্চনাতে আক্রমণ চালাবার দিন অন্যান্য ১১ জনের মধ্যে চট্টলার সু-সন্তান সাতকানিয়ার গৌরব রায় সাহেব কামিনী কুমার ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয়কে হত্যা করেছে বর্বর পাক বাহিনী ।

আমাদের চেমশা গ্রামে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ২৫শে মে। এইদিন পাক বাহিনী দোহাজারী ঘাঁটি থেকে সকাল ৮টা নাগাদ সাতকানিয়ার ভূতপূর্ব এম, এন, এ, আবু সালেহর বাড়িতে আগুন দেয় এবং দোহাজারী ফেরার পথে যখন চেমশা গ্রামের কাছাকাছি তখন কয়েক জন দুর্বৃত্ত পাক বাহিনীকে চেমশা গ্রামের হিন্দুদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেবার জন্য তাদেরকে অভ্যর্থনা করে। সাথে সাথে পাক বাহিনীর জীপ দিকে পরিবর্তন করে চেমশা গ্রামে ঢুকে পড়ে। পাক বাহিনী গ্রামে ঢুকে দালালদের আগুন জ্বালাবার ভার দিয়ে যায় এবং তাদের সহায়তা করার জন্য সাতকানিয়া থানার কয়েকজন পুলিশ মোতায়েন করে। এই সুযোগ দালালরা গ্রামে প্রথমে লুটতরাজ চালায় এবং পরে গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। আমার প্রতিবেশী হিসাবে একজন গরীব লোক ছিল, সে রিক্সা চালক হিসাবে জীবিকা অর্জন করত। তার বাড়ীও সে দিন রেহাই পায় নাই, কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার প্রতিবেশী সোনা দাসকে তারা ধরে নিয়ে যায়। পরে জানতে পারি তাকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। আজও তার কোন খবর নাই।

আমার এক ভাই বিমল কান্তি সেন সাতকানিয়া কলেজে বি, এ, ক্লাসের ছাত্র ছিল। দেশে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লে সে মুক্তিবাহিনীতে শিক্ষা গ্রহণ ও সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত পার হবার সময় মীরশ্বরাই থানাতে পাক বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে এবং ৮ দিন অকথ্য নির্যাতনের পর ২৩ শে সেপ্টেম্বর তাদের হাতে নিহত হয়।

আমাদের গ্রামের নিহত স্বপন চৌধুরী ও নিহত দীলিপ চৌধুরির কথা এখনও ভুলতে পারছি না এবং কখনও ভুলতে পারব না। তারা দু'জনই আমাকে দাদা বলে ডাকতো এবং তাদের ''অমলদা'' ডাকটি আজও আমার প্রতিনিয়ত খেয়াল হয়। অসহযোগ চলাকালে তাদের ভূমিকা ছিল খাঁটি দেশ প্রেমিকের ভূমিকা।

গ্রামে গ্রামে শান্তি কমিটি গঠন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের গ্রামেও শান্তি কমিটি গঠিত হয়। আমাদের গ্রামে রাজাকাররা কয়েকবার অত্যাচার চালিয়েছে। সাতকানিয়া দেওয়ানী আদালতের প্রবীনতম লব্ধ প্রতিষ্ঠা ব্যবহারজীবী যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী বি, এল, মহাশয়কে পর্যন্ত চরমভাবে অপমান করেছে। ৯ই ডিসেম্বর আমাদের গ্রামে পুনরায় এক ব্যাপক অগ্নিসংযোগ চালায় দোহাজারী ঘাঁটির রাজাকাররা।

স্বাক্ষর/-
শ্রী অমল কান্তি সেন
১৪/৪/৭৩

\ ২১৯ \

মোঃ এমদাদ মিঞা সিকদার
গ্রাম- মনেয়াবাদ
থানা- সাতকানিয়া
জেলা- চট্টগ্রাম

আমি মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। পাক হানাদার বাহিনীর হাতে কিভাবে ধৃত হয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম। জনসাধারণকে বিপদ হইতে রক্ষা করাই ছিল আমার মূলমন্ত্র। তাই ২৫ শে মার্চের কাল রাত্রিতে বিভীষিকার মধ্যে শপথ নিলাম সোনার বাংলাকে দস্যু কবল থেকে মুক্ত করব। এই দুঃসাহসী কাজে নেমে গেলাম, স্ত্রী, পুত্র, ঘর বাড়ী পরিবার পরিজন ত্যাগ করে। নিজ জীবন বিপন্ন করে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সর্বপ্রথম নিজ ছেলে নাজিমউদ্দিনকে মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং-এ যাবার জন্য বিদায় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাজলিয়া পুরানঘর ইউনিয়নের শতাধিক ছেলেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে দেশমাতৃকার সংগ্রামে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠাতে লাগলাম। আমার নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা গ্রহণে এলাকা দালালদের চরম বিপর্যয়ের হাত হতে অনেকটা রক্ষা পেয়েছিল। দেশের এই চরম মুহূর্তে নির্যাতিত লোকজনদের রক্ষা করেই ক্ষান্ত হই নাই। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং সমাপনান্তে দেশে এলে তাদের সর্বাধিক সাহায্য করে দুষ্কৃতকারী দালাল রাজাকার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোকজনদের খতম করা ইত্যাদির ব্যাপারে আমার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। ধোপাদুড়ীস্থ টি, এম, আলীর গ্রুপ, কমলাছড়ীর সুলতান গ্রুপ ও চিংড়িংমানস্থ জাহেদ গ্রুপের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে উক্ত গ্রুপের মুক্তি যোদ্ধাদের রসদপত্র যোগাড় করে তাঁদের সজীব রেখে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় সেখান থেকে বান্দরবন, হিলট্র্যাক্ট ও দোহাজারীস্থ পাক হানাদার দস্যুদেরকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের প্রাণ বধ করি এবং বান্দরবন রাস্তার অনেকাংশে ব্রীজ নষ্ট করে দিয়ে যাতায়াতের বিঘ্ন সৃষ্টি করি। শেষ পর্যন্ত আমার গোপন ষরযন্ত্রে পাক হানাদার দস্যুগণ অতিষ্ঠ হয়ে বান্দরবন ত্যাগ করে দোহাজারী এসে সমবেত হয়। আমার এই কার্যকলাপে দালালগণ অতিষ্ঠ হয়ে আমাকে ধরিয়ে দেবার গোপন চক্রান্ত চালাতে থাকে। আমি এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই ও নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখি নাই এবং দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি নাই। ২৮/৯/৭১ ইং আনুমানিক ১০ টার সময় জাহেদ গ্রুপসহ চরাত ইউনিয়নের রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ফিরবার পথে কুখ্যাত দালালরা ক্যাপ্টেনকে ডেকে এনে আমাকে ধরিয়ে দেয়। বাজালি হাইস্কুলে একদিন একরাত বেঁধে রেখে বাজালিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিদ্দিক আহমদ এম, এ সহ একযোগে নিকটবর্তী দোহাজারী মিলিটারী ক্যাম্পে চালান দেয়। সেখানে আমাকে ৪ দিন অনবরত দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে একেবারে অকেজো করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত আমি যখন শব্দ করতে অক্ষম তখন আমাকে গুলি করার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের অনেক কাকুতি মিনতির পর পাঁচ হাজার টাকা প্রদানে ১/১০/৭১ ইং তারিখে আমাকে ফেরত দেওয়া হয়। খোদাতায়ালার অশেষ করুণায় ও সুষ্ঠ চিকিৎসার ফলে কোন রকমে বেঁচে উঠি। বর্তমানে আমি জীবন্মৃত, চলাফেরা করা কঠিন। আমার সাথে বাজালিয়ার মতিলাল বিশ্বাস ও শিবুরাম সেনও ধরা পড়েন, তাঁদের আমার মত অবস্থা।

স্বাক্ষর/-
মোঃ এমদাদ মিঞা সিকদার
১৪/৮/৭৩

\ ২২০ \

মোঃ গোলাম হোসেন
গ্রম-লোহগাড়া, থানা-সাতকানিয়া
জেলা- চট্টগ্রাম

ইং ৫ জুন, ১৯৭১ রোজ শুক্রবার। তখন ভোর ৬টা। আমি ঘুম থেকে উঠে অজু করে নামাজ শেষ করে আমার বাবার মাজার জিয়ারত করার পর বাড়ীর ভিতর আসি। তখন একদল পাক বাহিনী একটি বাস ও একটি কার নিয়ে আমার বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তারপর তারা নেমে এসে কয়েকজন আমাদের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে ও কয়েকজন বাড়ীর সামনে দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বাড়িটা ঘেরাও করে। ঐ সময় আমার বড় ভাই জালাল উদ্দিনকে ধরে ফেলে। এবং তাকে বাহির বাড়িতে বেঁধে রেখে কয়েকজন বাড়ীর ভিতর ঢুকে। বাড়ীর বাহির হতে দেয় নাই। পাক দস্যু বাহিনী আমাদের বাড়ী হতে পিতলের থালা, গহনা-পত্র সোনা, রূপা, শাড়ীসহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার জিনিসপত্র নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় আমাকে এবং আমার আর এক ভাই মোঃ আব্দুল বারীকেও নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা আমাদের নিকট হতে টাকা দাবী করে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় তারা আমাদের দোহাজারী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর আমাদের তিনজনের কাছে ২০ হাজার টাকা দাবী করে আর বলে যে টাকা দিতে না পারলে তোদেরকে কেটে কেটে হত্যা করব। তখন আমি বললাম অত টাকা কোথায় হতে দেব স্যার? এই কথা বলার সাথে সাথে একজন নরপিশাচ আমাদের তিনজনের উপর বেদম প্রহার আরম্ভ করে। আমরা যখন প্রায়জ্ঞান শূণ্য হয়ে পড়েছি তখন ঔ অবস্থায় আমাদেরকে রেখে নরপিশাচরা চলে যায়।

তার কিছুক্ষন পর আমার আর কয়েক ভাই ঐ সংবাদ পেয়ে আমার মার নিকট হতে ৫ হাজার টাকা নিয়ে দোহাজারী ক্যাম্পে যায়। পাক বাহিনীর দালাল ৫ হাজার টাকা নিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দেবে বলে আমার ভাইদেরকে জানায়। কিন্তু সেই সময় পাক বাহিনীর দালাল ও চেয়ারম্যানের ছেলে এসে আমাদের কাছ হতে ১০ হাজার টাকা দাবী করে। তখন আমার ভাইয়েরা তা-ই স্বীকার করে এবং বলে যে এখন পাঁচ হাজার টাকা নেবেন এবং পরে পাঁচ হাজার টাকা নেবেন। এই চুক্তি করে যখন তারা আমাদের নিকট যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন স্বয়ং তখন আমাদের প্রহারে লিপ্ত। তাদের দেখে ক্যাপ্টেন সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল কি জন্য এসেছ? তখন আমার ভাই রশিদ আহমদআমাদের মুক্তির কথা বলার সাথে সাথে তাকেও প্রহার আরম্ভ করল। পাক বাহিনীর দালাল যখন চুক্তির কথা বলল তখন ক্যাপ্টেনের মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আমাদেরকে মুক্ত করে দিল। তার তিনদিন পর দালাল এসে বাকী পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ গোলাম হোসেন

\ ২২১ \

মোঃ সফিকুর রহমান
গ্রাম- কাঞ্চন নগর
থানা- ফটিকছড়ি
জেলা- চট্টগ্রাম

১৫/১১/৭১ ইং পাক বাহিনী আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে। তারপর নির্যাতন ও লুটপাট আরম্ভ করে। তাঁদের ভয়ে যখন মেয়েরা ধান ক্ষেতের মাঝে লুকিয়ে পড়ে তখন হানাদার বাহিনী সেখানে গিয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালায় এবং মেয়েদের গলার, হাতের সোনার, অলংকারগুলি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। ঐ দিন প্রায় ১৫/২০ জন পাক বাহিনী ছিল।

২১/১১/৭১ ইং প্রায় ২০০ শত জন পাক বাহিনী আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে। তার ভিতর ১০/১৫ জন পাক বাহিনী এসে আমাকেসহ আরো ৪০০ শত লোককে ডেকে জমায়েত করে। প্রথম অবস্থায় তারা আরো কয়েকবার আমাদের এলাকায় আসে তখন তারা আমাদের কাউকে কিছু বলে নাই। সেই জন্য তাদের ডাকে সবাই জমা হয়। তারপর সেখান হতে বেছে বেছে প্রায় ২০০ শত জোয়ান ছেলেকে লাইন করে। তারপর তোমাদের ভিতর কোন মুক্তিবাহিনী বা হিন্দু আছে কি না। এই সময় আমাদের লাইন হতে একটি ছেলেকে লাইন করে। তারপর আমাদেরকে কলেমা পড়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা আমাদেরকে এই কথাই বার বার জিজ্ঞাস করেছে যে তোমাদের ভিতর কোন মুক্তিবাহিনী বা হিন্দু আছে কি না। এই সময় আমাদের লাইন হতে একটি ছেলে হিন্দু বলে স্বীকার করে। তখন তাকে ব্যায়নেট দিয়ে নানা জায়গায় কেটে কেটে হত্যা করা হয়। এমন সময় উত্তর দিক হতে পাকবাহিনী আরো ৯ জনকে ধরে আনেঃ ১। হেদায়তুল হক, ২। নুরুল ইসলাম, ৩। ফকির মুহাম্মদ, ৪। ইদ্রিছ আলম। আরো ৫ জনের নাম জানি না। তাদেরকে আমাদের পাশে ২০ গজ দূরে গুলি করে হত্যা করে। তারপর আমাদের গুলি করার জন্য প্রস্তুত হতে বলে। এমন সময় ৭ নং ইউনিয়নের রাজাকার কমাণ্ডার আবু তাহের মিঞা আমাদের ভুল প্রমান করাতে পাকবাহিনী আমাদের গুলি না করে চলে যায়। ঐ দিন পাক বাহিনী প্রায় ৫০/৬০টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। বাড়ী গুলি জ্বালাবার পূর্বে তারা লুটপাট করে নেয় ।

স্বাক্ষর /-
মোঃ সফিকুর রহমান
২২/৭/৭৩

\ ২২২ \

জোতিন্দ্র মোহন নন্দী
গ্রাম- ফতেয়া বাদ
থানা- হাটহাজারী

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পাকফৌজ এই এলাকায় প্রবেশ করে। এই এলাকায় কোন প্রকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। ৩০শে চৈত্র পাকফৌজ বিকাল ৪টা পরে ফতেয়াবাদ গ্রামে ঢোকে। নগেন্দ্র লালের মেয়েকে গুলি করে হত্যা করে। তার বাড়ী তখনই জ্বালিয়ে দেয়। তারপর আমার বাড়ীতে আসে এবং আমার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে নেয়। আমার ভাতিজা রণজিত লালকে গুলি করে হত্যা করে। এই গ্রামে মোট ৮টি বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। মন্দির ধ্বংস করে, গুলি করে হত্যা করে মোট ৭ জনকে। আগুনে জ্বালায় একটি শিশুকে গ্রামের সব ঘর বাড়ী রাজাকাররা লুটপাট করে এবং রাজাকারদের অত্যাচার এখানে খুব বেশী ছিলো।

স্বাক্ষর
জোতিন্দ্র মোহন নন্দী
১২/৭/৭৩

\ ২২৩ \

শ্রী বণিক চন্দ্র
প্রধান শিক্ষক, পটিয়া হাইস্কুল
পটিয়া, চট্টগ্রাম

১৪ই মে, শুক্রবার ১০টায় পাঞ্জাবীরা পটিয়ায় এসে স্থানীয় প্রাইমারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থায়ী আস্তানা গাড়ে এবং সেইদিন বিকালে পার্শ্ববর্তী দক্ষিণভূর্ষি ও কেলিশহর গ্রামে কিছু কিছু বাড়ী পুড়িয়ে দেয়, তারপর দিনও তারা ঐ সমস্ত গ্রামে অত্যাচার চালায়। ১৫ই মে শনিবার খবর পাই পরদিন রবিবার ওরা পটিয়া সংলগ্ন সুচক্রদন্ডী গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে।

এই খবর পেয়ে ১৬ই মে, রবিবার ভোরে ছেলেটিকে নিয়ে পটিয়া থেকে রিক্সা করে আবার বাড়ীর দিকে রওনা হই। এখানে বলে রাখা ভাল একজন ডাকাত আমার স্ত্রী এবং ভাইয়ের কাছ থেকে ২০০০ টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। বাড়ীতে কিছু ধান ছিল, এ ধান বিক্রি করে তারা ডাকাতদের টাকা দেয়।

অতি ভয়ে ভয়ে ১৬ ও ১৭ই মে গ্রামে কখনো নিজ ঘর কখনো অন্য বাড়ীতে গোপনে কাটাই। ১৮ই মে মঙ্গলবার আমার জীবনের কালো দিন। ঐ দিন স্থানীয় গুণ্ডারা, চেয়ারম্যান ও অন্যান্য দলীয় নেতাসহ পাঞ্জবীরা ছনহরা, চাটরা, ধাউরডেঙ্গা মঠপাড়া ও গুয়াতলী গ্রাম আক্রমণ করে। ছনহরা গ্রামে প্রথমে ঢুকে বাড়ীঘর জ্বালায় এবং পলায়নরত ৩ জনকে গুলি করে হত্যা করে ও কয়েকজনকে আহত করে।

আমি নিজ নিরাপত্তার জন্য একটা চামড়ার ব্যাগে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জামাকাপড় ও শ' তিনেক টাকা নিয়ে গ্রামের পূর্ব দিকে খালের নিকট ঝোপের কাছে আশ্রয় নেই। বাড়ীর স্ত্রী,পুত্র, ছেলে, মেয়ে , যে যেদিকে পেরেছে ছিটকিয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় সকাল আটটায় স্থানীয় ৫/৬ জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আমাকে আক্রমণ করে। আমার সঙ্গে যা ছিলো টাকা পয়সা, জামা, কাপড়, ঘড়ি, কলম ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে যায়। আমাকে হত্যা করার জন্য গ্রামের দক্ষিণ দিকে রাস্তার পার্শ্বে বসিয়ে রাখে। এরা সব আমার পার্শ্ববর্তী জালিয়া পাড়া ও সর্দার পাড়ার লোক, আমাকে হত্যা করবে এই খবর পেয়ে জালিয়া পাড়ার কতিপয় বৃদ্ধ নরনারী দৌড়ে এসে আমাকে এদের কবল দেকে রক্ষা করে। আমি মুক্তি পেয়ে আবার পূর্বোক্ত স্থানে আশ্রয় নেই। ঐ খালের ধারে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় ২০০ শ নরনারী শস্য ক্ষেতে, ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রায় ১ টার সময় দেখি ছনহরা গ্রাম জ্বালিয়ে পাঞ্জাবীরা আমাদের গ্রামে ঢুকে ঘরবাড়ী পোড়ায়, জিনিসপত্র লুট করে। ৪ জন পাঞ্জাবী আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে এসে বিভিন্ন স্থানে লুকায়িতদের তুলে নিয়ে পুকুর পাড়ে জমা করায়। এবার ধারণা হলো হয়তো আমাদেরকে এক জায়গায় এনে গুলি করে মারকে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের বসিয়ে রেখে তারা খালের কূলে কূলে দক্ষিণ দিকে চলে যায় এবং খালের ভিতর লুকায়িত কয়েকনজনকে ছেড়ে দেয় এবং তিনজনকে তুলে নিয়ে সদর রাস্তায় গুলি করে মারে। এদের নাম সারদা চরণ দে, বয়স ৬০, যোগেন্দ্রলাল মল্লিক, বয়স ৬০ ও গৌরাঙ্গ মল্লিক, বয়স ৩০/৩৫। পাঞ্জাবীদের সঙ্গে সবসময় স্থানীয় গুণ্ডারা ছিল। তারা পার্শ্ববর্তী ধাইরডেঙ্গা গ্রামের হিন্দুদের বাড়ীরঘর পুড়িয়ে দিয়ে সেখানেও ২/৩ জনকে হত্যা করে বেলা ২টা সময় পটিয়া ফিরে আসে। মুক্তিপেয়ে বিকালে বাড়ী ফিরে দেখি বাড়ীতে পোড়া ভিটা খাঁ খাঁ করছে। সেই রাত্রিতে গ্রামের অন্য এক বাড়ীতে (যে বাড়ীটিই শুধু পোড়া যায়নি) রাত্রি কাটাই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যারা দিনের বেলায় এদিক-ওদিক ছিল রাত্রে এক জায়গায় ঐ বাড়ীতে আশ্রয় নেই। অবশ্য এটাও সত্য কিছু কিছু স্থানীয় মুসলমান আমাদের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে এসেছিল, তাই বেঁচেছি। এতে প্রমাণ হয় দুনিয়ার সব মানুষ পশু নয়, প্রকৃত মানুষও আছে, নচেৎ ভগবানের সৃষ্টি বিফল হত।

স্বাক্ষর/-
শ্রী বণিক চন্দ্র
৯/৫/৭৩

\ ২২৪ \

মোঃ আবুল কাশেম
গ্রামঃ কচুয়াই
ডাকঘর- চক্রশালা
থানা- পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম

আমার বোন মোছাম্মৎ আছিয়া বেগম বি. এ. তিনি পূর্ব হইতেই একজন আওয়ামী লীগ কর্মী ছিলেন। জুন মাসের ৬ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় তিনজন শান্তি কমিটির লোক ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং ক্যাপ্টেনসহ ১২ জন মিলিটারী আসিয়া আমাকে এবং আমার বোনকে তল্লাশী করে। সেই সময় আমার বোনকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে আবুল কাশেম ও আছিয়া বেগম কোথায়? তখন আমার বোন অন্য ঘরে পলায়ন করে। তাহার পর পাক বাহিনী প্রতিটি ঘরে ঢুকিয়া প্রতি ঘর হইতেই অন্য মেয়েদের অলঙ্কার ছিনাইয়া লয়। পরে নুরুল আলমকে ধরে। তাহাকে বলে যে আছিয়া ও কাশেমকে বাহির করিয়া দাও নইলে তোমাকে গুলি করা হইবে। কিন্তু আমার ভাই আলম আমাদের কথা না বলাতে তাহাকে বন্দুক দিয়া বেদম প্রহার করে। তাহারা আমার চাচা ডাঃ ইব্রাহিমকে ধরিয়া আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করে। আমার চাচা তখন বলিয়াছেন যে ওরা দুইজন আমার মেয়ের বাড়ী বাঁশখালীতে বেড়াইতে গিয়াছে। পাক বাহিনী তাহাকে মারপিট করিতে থাকে এবং বলে যে তাহারা কোথাও যায় নাই। তুই লুকাইয়া রাখিয়াছিস। তাহাকে যখন প্রহার করিতে করিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল তখনো তাহারা তাহাকে মারধর করিতেছিল। এমতাবস্থায় বাড়ীর অন্যান্য সকলে আসিয়া তাহাদেরকে বলিল যে কাশেম ও আছিয়া বেড়াইতে গিয়াছে। তাঁহাকে একা না মারিয়া আমাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বাহির হইয়া আসে এবং বলে যে আমি আছিয়া। তখন সবাইকে ছাড়িয়া দেয় এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে তোমার ভাই কাশেম কোথায়? তিনি বলেন যে আমার ভাই কাশেম শহরের দোকানে থাকে, বাড়ীতে আসে নাই। তারপর তাহারা ও তাহার আব্বাকে কমল মুন্সির হাটে লইয়া আসে। সেখানে তাহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করে। বাজারের সকলেই যখন তাহার কথা ভাল বলে তখন পাক বাহিনী তাহাদের দুইজনকেই ছাড়িয়া দেয়। তারপর রাজাকার বাহিনী পুনরায় আমার বাড়ীতে যাইয়া আমার ভাই নুরুল আলমকে মারপিট করে এবং আমার বাড়ীর সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া প্রায় দুই হাজার টাকা লইয়া যায়। তৃতীয়বার রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটির লোকসহ ১৫/১৬ জন গিয়া বাড়ী ঘেরাও করে। সেদিন তাহারা আমার ফুফুর নিকট হইতে ৫ ভরির অলঙ্কার ও ২৭০টি টাকা এবং আমার নুরুল আলমের নিকট হইতে ২০০টাকা কাড়িয়া লয় ও আমার বোন আছিয়াকে পুনরায় তল্লাশী করে। তারপর তাহারা আমার মামীর নিকট ও ভাবীর নিকট হইতে তিন ভরির অলঙ্কারসহ কিছু টাকা লইয়া যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবুল কাশেম
১৫/৫/৭৩

\ ২২৫ \

শ্রী নীরদ বরণ চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক, আজগর আলী উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম- পশ্চিম শাকপুরা
থানা- বোয়ালখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

আমি একজন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বিগত ২০শে এপিল ১৯৭১ইং আমাদের গ্রামে পাক বাহিনী তাদের স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। ইহাতে আমাদের গ্রামে ৫৪ জন লোক মারা যায়। সেদিন সকালে আমি কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী লইয়া বসিয়া দেশের এই পরিস্থিতি লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় কয়েকজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল যে বড়ুয়া পাড়ায় পাক সৈন্য আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং গুলি করিয়া লোক হত্যা আরম্ভ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি আমার পাড়ার ছেলেমেয়েকে উপদেশ দিলাম যে তোমরা কৃষক সাজিয়া মাঠে নামিয়া পড়। এই ভাবে আমার গ্রামের ছেলেমেয়েরা অন্য গ্রামে যাইতে পারিল। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামের দালালরা পাক বাহিনীকে লইয়া অত্র গ্রামে চলিয়া আসে এবং সমস্ত ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগ করিয়া ভূস্মীভূত করিয়া দেয়। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোক আসিয়া আমাদের গ্রামে বালিকা বিদ্যালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই নিরাশ্রয় নাম না জানা হতভাগ্য নিহতদের উক্ত সংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নাই।

আমি তখন আমাদের বাড়ীর সম্মুখে পূর্বদিকে পুকুর পাড়ে দাঁড়াইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত ছেলেদের উপদেশ দিতেছিলাম। দালালের ছেলেরা আমাদের লক্ষ্য করিয়াছিল যে আমরা কোথায় লুকাইতেছিলাম। আমরা যেখানে লুকাইয়াছিলাম সেই জঙ্গলের পশ্চিম দিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল সকলে এক সংগে এক জায়গায় লুকানো ঠিক হইবে না। তখন আমার কথা মত যে যেখানে পারিল লুকাইয়া পড়িল। আমি ও আমার ভাই চিত্ত আচার্য্য উত্তর দিকে গিয়া ছোট্ট একটি জঙ্গলে আশ্রয় লইলাম। তখন চারিদিকে ভীষণ অগ্নিসংযোগ ও গুলিবর্ষণ করিতেছিল। তখন আমি আমার পরিবারের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারি নাই। পাক বাহিনী অগ্নিসংযোগ করার পূর্বে আমাদের লুণ্ঠন করে। পাক বাহিনী যখন আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন আমরা আবার গ্রামের দিকে চলিয়া আসিলাম। এমন সময় একজন পাক দালাল আসিয়া আবার প্রচার করিল যে পাক বাহিনী আবার এই গ্রামে আসিতেছে। এই কথা শুনিয়া আমরা আবার পালাইতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় দালালের লোকেরা আমাদের বাড়ীর পোড়া টিনগুলি লইয়া গেল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে পাক বাহিনীর কথা বলিয়া আমাদের ধোঁকা দিতেছিল। এই ঘটনার ঠিক চারদিন পর আবার পাক বাহিনী আসিতেছে এই কথা শুনিয়া আমি এবং ভাই চিত্ত আচার্য্য আমার এক মুসলিম ছাত্রের অভিভাবকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম যে এখানে নিরাপদ নয়। ওখান হইতে আবার বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলাম এবং পরবর্তী কি কার্যক্রম হইবে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

২০শে এপ্রিল রাত্রি ১২টা। এমন সময় আমাকে একজন কৃষক লোক আসিয়া খবর দিল আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। সেই কৃষক লোককে লইয়া আমরা রাত্রি ১টার সময় বাহির হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন রাত্রি শেষ হইয়া গেল তখন কৃষক লোকটি আমাদের চরখিজিরপুর গ্রামে এক খামারের মধ্যে রাখিয়া আসিল। ঐ খানে থাকিয়া আবার শুনিতে পাইলাম আমাদের বাড়ী (২১এপ্রিল) আবার আক্রমণ করিয়াছে।

আমার ভাইয়েরা আশ্রয় লইয়াছিল আধ মাইল দূরে অন্য একটি খামারে। আমাদের সংবাদ পাইয়া ২২শে এপ্রিল রাত্রি আটটার সময় আমাদিগকে সেই খামারে লইয়া যায়। সেই খামারের পাশেই কর্ণফুলী নদী। ঐ কর্ণফুলী নদীতে পাক ফৌজ গান বোট লইয়া অনরবরত পাহারা দিতেছিল। ঐ খামারে থাকা নিরাপদ নয় বলিয়া আমরা আবার বাঁশখালী থানার কালিপুর গ্রামে চলিয়া গেলাম। ঐ কালিপুর গ্রামে ৮/১০ দিন ছিলাম। কালিপুর গ্রামে পাক বাহিনীর দালালদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। সেখান হইতে আবার কানুনগো পাড়ায় আশ্রয় নিলাম এবং গোপনে বাড়ীর সবাইকে ওখানে লইয়া আসিলাম।

আমার এক ভাই ইঞ্জিনিয়ার। সে আমেরিকান ফার্মে চাকরি করিত। সেই ফার্মের আমেরিকান সাহেব আমাদেরকে তাহার গাড়িতে করিয়া চট্টগ্রামের জোয়ালগঞ্জ পৌঁছাইয়া দেয়। আমরা ঐ খান দিয়া ভারত সীমান্ত পার হইয়া ত্রিপুরা শরনার্থী শিবিরে গিয়া পৌছাই।

স্বাক্ষর/=
শ্রী নীরদ বরণ চৌধুরী

\ ২২৬ \

মোঃ আমিনুল হক
গ্রাম- পূর্ব গোমদন্তী
থানা- বোয়ালখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

গোমদন্তী রেলেওয়ে ষ্টেশনের উত্তর দিকে আমার বাড়ী। এক রাত্রিতে মুক্তিবাহিনী আসিয়া মাইন পুঁতিয়া গাড়ী উড়াইয়া দেয়। তার পরদিন ভোর বেলায় পাকবাহিনী আসিয়া আমাদের গ্রাম ঘেরাও করে। গ্রাম ঘেরাও করিয়া প্রায় ৭০/৮০ জন লোক গ্রেফতার করে। তার ভিতর আমি ছিলাম। আমার বয়স ৫৫ বৎসর আমি একজন বৃদ্ধ লোক। পাক বাহিনী যে আমার উপর এতটা অত্যাচার করিবে তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না। তাই সকাল ঘুম হইতে উঠিয়া ওজু করিয়া নামাজ পড়িতে বসিয়াছি এমন সময় ১জন রাজাকার আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার সাথে পাক বাহিনীও ছিল। আমাকে ধরার পর আমার বাড়ী হইতে আরো চারজনকে গ্রেফতার করে। তাহারা আমাদিগকে এখান হইতে মারধোর করার পর পটিয়া ক্যাম্পে লইয়া যায়। সেখান নিয়া আমাদিগকে এমনভাবে বন্দুকের বাঁট দিয়া প্রহার করিল যে আর হাঁটিবার বা উঠিবার মত শক্তি ছিল না। তাহারা আমাদিগকে মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের লীডারের কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তবুও আমরা কাহারও নাম বলি নাই। তখন পাক বাহিনী আমাদিগকে সন্ধ্যার পর ছাড়িয়া দেয়। আমরা অতি কষ্টে বাড়ীতে আসি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আমিনুল হক
৩০/৪/৭৩

\ ২২৭ \

মোঃ অলি আহমদ
গ্রাম- পূর্ব গোমদন্ডী
থানা-বোয়ালখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

১৩ই আগষ্ট মুক্তিবাহিনী ও গেরিলারা ১৪ই আগষ্টের পাকিস্তান দিবস বানচাল করার জন্য বালুর ঘাট দোহাজারী রেল লাইনে গোমদন্ডী রেল ষ্টেশনের কালুর ঘাটের নিকট আউট সিগন্যালের কাছে মাইন পাতিয়া রাখে রাত্রি বেলায়। রাত ৫টা সময় পাক ফৌজ পটিয়ার দিকে রেল লইয়া যাইতে ইঞ্জিন উড়িয়া যায় এবং রেল লাইন ধ্বংস হয়। ১৪ই আগষ্ট সকালে পটিয়া এবং কালুর ঘাট হইতে আরো মিলিটারী আসিয়া রাজাকারদেরসহ আমাদের গ্রাম ঘেরাও দেয়। তাহাদের তিনজন লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া হাড়মোড়া করিয়া হাত বাঁধিয়া রাইফেল দিয়া মারিতে মারিতে গাড়ীতে উঠায়। তখন আমি, নুর আহমদ, আব্দুল মজিদসহ মোট ৫৭ জনকে হাত ও কোমর বাঁধা অবস্থায় গাড়ীতে তোলা হইতেছে এবং গাড়ীতে তুলিয়া বেদম মার মারিয়াছে। পটিয়ায় লইয়া যাইয়াও বেদম মার- রাইফেল দিয়া মারায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখি সবাইকে সারিবদ্ধভাবে গুলি করিয়া মারার অবস্থা হইয়াছে। এমন সময় কালুরঘাট হইতে মেজর রশিদ আসিয়া আমার কাছ হইতে মুচলেকা লেখাইয়া লয় যে আমাদের গ্রামের পাশের রেল লাইন আমাদের পাহারা দিতে হইবে। কোন ক্ষতি হইলে আমাদের সবাইকে গুলি মারা হইবে। নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য কাগজে সই দিয়া সন্ধ্যার একটু আগে মুক্ত হইয়া সবাই বাড়ী ফিরি। ৫মাস ভোগার পর সারিয়া উঠি কিন্তু কাজ করিয়া খাইতে পারি না।

স্বাক্ষর/-
মোঃ অলি আহমদ
২৯/৪/৭৩

\ ২২৮ \

সন্তোষ কুমার
গ্রাম- পশ্চিম শাকপুরা
থানা-বোয়ালখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

সেদিন ছিল ২০ শে এপ্রিল। আমাদের পশ্চিম শাকপুরা গ্রামের উপর চলল পাক সেনার রক্ত নিয়ে হোলি খেলা আর নারী নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ। কি বীভৎস ঘটনা। আজ সেদিনের কথা মনে পড়লে আর মুক্ত বাংলার পবিত্র মাটিতে পাক সহযোগীদের এবং দালালদের বিনা বিচারে বিনা সাজায় আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখলে আমাদের গা ছম ছম করে উঠে। যারা আমাদের গ্রামে হত্যা করেছিল, বাড়ী পুড়িয়েছিল, সম্পদ লুন্ঠন করেছিল, নিরপরাধ গ্রামবাসীর গলায় ছুরি চালিয়েছিল, সম্পদ লুন্ঠন করেছিল, নিরপরাধ গ্রামবাসীর গলায় ছুরি চালিয়েছিল তারাই আবার বাংলার পবিত্র মাটিতে বাস করছে।

২০শে এপ্রিল সূর্য ওঠার আগে অন্যান্য দিনের মত কয়েকজনকে পাহারায় দিয়ে আমরা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ সবাই হৈ চৈ করে পালাতে লাগল। শুনতে পারলাম পাঞ্জাবীরা আসছে। তখনই তাড়াতাড়ি যে যেদিকে পারি পালাতে লাগলাম। স্থানীয় মুসলমানদের বাড়ী গেলে তারাও তাদের বাড়ী হতে নামিয়ে দিল। আমরা তখন অন্যদিকে সরে পড়লাম। পাক সেনারা তখন চারদিক দিয়ে আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলল। তারপর সারাদিন চলল আমাদের গ্রামের উপর অত্যাচার। প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিতে লাগল এর সোনা, রূপা, রেড়িও মূল্যবান জিনিস হস্তগত করতে লাগল এবং চলল অকথ্য নির্যাতন, ধর্ষণ হত্যা, লুন্ঠন- সবকিছু। গ্রামের যুবক বৃদ্ধ যাকে পেল তাকেই হত্যা, স্ত্রী সামনে স্বামীকে হত্যা করল, মায়ের সামনে ছেলেকে হত্যা করল। আর করল অগ্নিসংযোগ। চারদিকে শুধু গুলির আওয়াজ আর গুলি করার সাথে সাথে পাক সেনাদের পৈশাচিক হাসি। সারাদিন পর বিকাল সাড়ে চারটার দিকে তারা গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা যারা দৌড়ে পলায়ন করেছিলাম তারা আসলাম গ্রামে, দেখলাম প্রায় বাড়ীতে আগুনে ভস্মীভূত দালান ঘরের টিনগুলো পড়ে গেছে। কয়েকজন সবে মাত্র গুপ্তস্থান হতে বের হয়ে আসলো, কারো মুখে কোন কথা নেই। পথ দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। দেখলাম গুলি খেয়ে রাস্তার আশেপাশে বাড়ীর প্রাঙ্গণে নর্দমায় পড়ে আছে মৃতদেহ। কি এক হত্যাযজ্ঞ! সবাই আমার আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসী। হায় কি দোষ! কোনদিন দেখিনি এভাবে হত্যা। দেখলাম বাপ ছেলে একসাথে এক বুকে গুলি খেয়ে ঘুমিয়ে আছে।

দেখলাম কারো চোখে জল নেই, আজ সবাই পাথর হয়ে গেছে। আরো দেখলাম স্ত্রী চেয়ে রয়েছে স্বামীর দিকে, মা তাকিয়ে আছে মৃত সন্তানের দিকে। স্বামী তার স্ত্রীকে ডেকে বলার সময় পায়নি, মা সন্তানকে জাগিয়ে দেবার সময় পায়নি, বোন ভাইকে ডাক দেবার সময় পায়নি। কি পাশবিক হত্যা, নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার। আমার ভাষা নেই, আমি লেখক নই, প্রকৃত ঘটনার কিছু মাত্র লেখার চেষ্টা করছি। আর এ ঘটনাকে ভাষায় রূপ দেওয়ার ভার আপনাদের ।

তারপর গ্রামের কয়েকজন মৃত দেহের কিছু কিছু সৎকাজ করার নিস্ফল চেষ্টা করতে লাগলাম মাত্র। গ্রামে প্রায় ১৫০ জন লোক মারা গেল। যেই আমরা গর্ত খুঁড়তে লাগলাম আর অমনি প্রতিবেশী গুণ্ডারা লুট করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল আর বলতে লাগল পাক সৈন্য আবার আসছে। পুনরায় আমরা গ্রাম হতে বের হয়ে পড়লাম। এরই মধ্যে আমরা কোন রকমে এক গর্তের ভিতরে থেকে ১০/১২ জনকে মাটিচাপা দিলাম। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল হাতিয়ার ঘূর্ণিঝড়ে উপদ্রুত এলাকার কথা। সেখানে আমরা ওদের দাফনের

কাপড় দিয়ে দাফন করেছিলাম কিন্তু আজ আমাদের গ্রামে এদের হিন্দু ধর্মের রীতি অনুসারে কাপড় দেওয়া দূরে থাকুক আগুন পর্যন্ত দিতে পারছি না।

পাক সেনাদের এই অত্যাচারের পরও আমরা কোন রকমে দু' একটা বাড়ী ছিল সবাই তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম। এভাবে এগুতে লাগলাম। সেই ৪ঠা এপ্রিলের পর থেকে দিনে পাক সেনা আর রাতে মুসলিম লীগ গুণ্ডা ও প্রতিবেশীর তিন দিক থেকে আক্রমণ। রাত্রে চাল ডাল কোন রকমে দু' একটা খেয়ে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে ঝোপে বা পানিতে ডুবে থাকা, কোন রকমে বাঁচার চেষ্টা, কিন্তু দিনের পর দিন চলল লুট ও নারী ধর্ষণ।

তারা ধর্মের নামে আমাদের গ্রামের মন্দির প্রতিমা ইত্যাদি ধ্বংস করে দিল আর যাকে পেল তাকে মুসলমান হতে বাধ্য করল। মুসলমান হলে থাকতে পারবে নতুবা কেটে ফেলব। এভাবে কয়েকজনকে কেটেও ফেলল।

এরপর ২৩শে এপ্রিল আমাদের পশ্চিম গ্রামে আবার শুরু রক্তের খেলা, আর অবশিষ্ট বাড়ীগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। পাকিস্তান কায়েম রাখার জন্য। ২৩শে এপ্রিল শাকপুরা গ্রামটা সম্পূর্ন ধ্বংস করা হয়েছে। সবাই মিলে সেদিন ভারতের দিকে রওনা হলাম।

স্বাক্ষর/-
সন্তোষ কুমার

\ ২২৯ \

মোক্তার মোহাম্মদ
পোষ্ট মাষ্টার
গ্রাম- পুছড়ী
থানা- বাঁশখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

শনিবার ৯ই অক্টোবর ১৯৭১ ইং রাত ১০টা। মুক্তিবাহিনী সহ গ্রাম পাহারায় রত ছিলাম। নাপোড়া হইতে ঘুরিয়া সেখেরখিল হইয়া জালিয়া পাড়ায় রওনা হইতেছি তখন আনুমানিক রাত বারটা। উক্ত পাড়ায় হঠাৎ অসংখ্য গোলাগুলির শব্দ শুনিয়া দ্রুত পিছন দিকে সরিয়া নাপোড়া পুকচালিয়া পাড়ায় চলিয়া আসি এবং এই পাড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া দেখিতে পাইলাম জালিয়া পাড়া দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষ চিৎকার ও কান্নাকাটি করিয়া প্রাণভয়ে পাহাড়ের দিকে পালাইয়া আসিতেছে। তখন সব মুক্তি বাহিনীকে বিদায় দিয়া একা আমি গ্রামে রহিয়া গেলাম এবং ব্যাপার সম্পূর্ণ জানিয়া সকালে তাহাদের ক্যাম্পে জানাইব বলিয়া কথা দিলাম। দেখিতে দেখিতে আগুন আরও বাড়িয়া গেল এবং জনসাধারণকে পালাইয়া বাঁচিবার জন্য ইশারা করিলাম। ১০ তারিখ ভোর পাঁচটা হইতে না হইতে শুনিতে পাইলাম চতুর্দিকে অসংখ্য গোলাগুলির আওয়াজ। তখন আমি নিজে কিভাবে প্রাণ বাঁচাইব চিন্তা করিয়া দ্রুত আমার বাড়ীর পাশে পাহাড়ের জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া পরিস্থিতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল যে নাপোড়া সেখেরখিল আগুন আগুনময়। আরও দেখিলাম পাক হানাদারেরা চতুর্দিকে লোক খোঁজাখুজি করিতেছে এবং কতকগুলি লোককে বন্দী করিয়া আমার বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা দিয়া লইয়া যাইতেছে ও প্রতিটি বাড়ী তলাশী করিতেছে। পলায়নমান লোক দেখিয়া তাহাদিগকে গুলি করিতেছে। তখন আমি নিজেকে নিরাপদ মনে না করিয়া আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলাম। গোলাগুলির শব্দ বন্ধ হওয়ার পর আনুমানিক দুপুর বারটায় ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলাম। বাড়ী আসিয়া জানিতে পারিলাম পাক হানাদারেরা চলিয়া গিয়াছে এবং সাথে বন্দী করিয়া কতক লোক তাহাদের ক্যাম্পে নিয়া গিয়াছে।

১৩ই অক্টোবর বুধবার পাশ্ববর্তী মিরাপাড়া গ্রামের একজন দালাল আমার গোয়েন্দাগিরি জানিতে পারিয়া হানাদার ক্যাম্পে (চাম্বল) নালিশ করিয়া দেয়। ফলে ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার আনুমানিক বেলা নয়টায় সতেরজন পাক বাহিনী ও ত্রিশজনের মত রাজাকার আমার পাড়া ঘেরাও করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং নাপোড়া বাজারে নিয়া আসে। সেখানে আমি দেখিতে পাইলাম আরও চারজন সেখেরখিল নিবাসী (১) একরাম মিঞা (২) হাজী শফর মুল্লক (৩) দানু মিয়া, পিতা- নজর আলী (৪) আহমদ হোসেন, পিতা-দানু মিঞা ও আমি সহ পাঁচজনকে একই রশিতে বাঁধিয়া তিন মাইল রাস্তা হাঁটাইয়া লয় এবং পথে পথে মারধোর করিতে থাকে। আনুমানিক বেলা এগারটায় তাহাদের ক্যাম্পে গিয়া পৌঁছার সাথে সাথে সকলের চোখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলে এবং একেকজন করিয়া রশি হইতে খুলিয়া নিয়া ৩/৪জন হানাদার মিলিয়া একেকজনকে বেদম প্রহার করিতে থাকে সাথে সাথে উর্দু ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছে বা বলিতেছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি শুধু চীৎকার করিয়া আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিতেছি ‘‘হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা কর। বাবা মারিও না আমি আর সহ্য করিতে পারতেছি না।’’ এই কথা বলার সাথে সাথে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পা উপর দিকে ও মাথা নীচের দিকে করিয়া ক্যাম্পের ছাদের সাথে লটকাইয়া ফেলে। ইহাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি ফলে ইহার পর আর কি ঘটিয়াছে তাহা আমি জানি না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসে তখন বুঝিতে পারিলাম ছাদের উপরিভাগে ফ্লোরের উপর রোদ্রের গরমে ঝলসিয়া যাইতেছি। তখন আমি পানির পিপসায় ও ক্ষুধায় খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছি। নড়াচড়া করিতে পারিতেছি না। সমস্ত শরীরে ব্যথ্যা ও ফুলিয়া গিয়াছে। তখন

পানি, পানি বলিয়া চিৎকার করিয়া খাওয়ার পানি চাহিলাম। এমন সময় একজন হানাদার আসিয়া আমার চোখের বন্ধন খুলিয়া দিয়া একটি বদনায় করিয়া পানিখাওয়াইয়া দেয় ও মাথা ধরিয়া সূর্য্যের দিকে চোখ করিয়া তাকাইয়া থাকার নির্দেশ দেয়। এইভাবে কয়েক মিনিট থাকার পর যন্ত্রণায় মাথা নাড়িয়া মুখ ফিরিইলে তখন আরেক দফা মারধোর চলিল। সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকার অপারগতায় চোখে মরিচের গুড়া ছিটাইয়া দেয়। ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি করিতে থাকি। অনুরোধ করিতে থাকি যে আমাকে এইরূপ কষ্ট না দিয়া একেবারে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল নতুবা বাঁধন খুলিয়া দাও আমি ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করি। কিন্তু পাক বাহিনীর দালাল হানাদারদিগকে বলিয়া দেয় যে আমি ও আমার ভাই নাকি মুক্তিবাহিনী এবং আমাদের নিকট ছয়টা রাইফেল আছে এবং আমাকে গুলি করিয়া মারার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরা নাকি বাঁচিয়া থাকিলে তাহার জীবনের আশঙ্কা আছে। এই বলিয়া সে চলিয়া যায়। ইহার পর আরেক দফা আমার উপর শারীরিক নির্যাতন চলিল। আমি মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যুক্ষণ গুনিতে লাগিলাম। খোদার কৃপায় এমন সময় স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হানদারদের সবেদারসহ তথায় আসিয়া আমাকে সনাক্ত করিয়া নিয়া জামিন দিল এবং সাথে শর্ত দিল যে মুক্তিবাহিনীর একটি নাম তালিকা ও আমার ভাই আওরঙ্গজেবকে চারদিনের মধ্যে হাজির করিয়া দিতে হইবে নতুবা বংশের একজনও জীবিত রাখিবে না। আমি তখন বাধ্য হইয়া তাহাদের নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভের আশায় ইহা স্বীকার করিয়া মুক্ত লাভ করি। তারপর উক্ত ক্যাম্প হইতে একখানা রিক্সায় করিয়া বাড়িতে চলিয়া আসি। শরীর ও চোখের চিকিৎসায় চারদিন কাটাইয়া একটু আরোগ্য লাভ করিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় লইলাম। ইহারও দুই একদিন পর হানাদাররা চাম্বল হইতে ক্যাম্প উঠাইয়া উত্তর বাঁশখালী গুনাগরী ক্যাম্পে চলিয়া যায় এবং রাজাকার বাহিনী মোতায়ন করিয়া আমাদের গ্রামে ক্যাম্প করিয়া দেয়।

স্বাক্ষর/-
মোক্তার মোহাম্মদ

\ ২৩০ \

শ্রী বিমল কান্তি গুহ
গ্রাম- নাপোড়া
থানা-বাঁশখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

৯ই অক্টোবর পাক হানাদার বাহিনী দ্বিতীয়বার বাঁশখালীতে আসে এবং গুনাগরীতে একটি আস্তানা করে। ঐ দিন তারা লোকজনের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করে নাই। কিন্তু আমাদের নাপোড়া গ্রামের লোকরা পাঞ্জাবী আসার খবর পেয়ে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে পাহাড়ে চলে যায় এবং সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ীতে চলে আসে।

১০ই অক্টোবর তারিখে ভোর পাঁচটার সময় পাক বাহিনী আমাদের গ্রামটার পূর্ব জংগলের দিক হতে আক্রমণ করে। আমাদের গ্রামের লোকরা আর জংগলের দিকে পালাতে পারে নাই। নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। আমি যখন আমার পরিবার পরিজন নিয়ে জংগলের দিকে পালাচ্ছিলাম তখন একটা গুলি আমার হাতের ব্যাগের মধ্যে পড়ে এবং ব্যাগটা ছিঁড়ে হাত হতে পড়ে যায়। আমার সামনে একজন মহিলা দুগ্ধপোষ্য একজন শিশুসহ গুলিবিদ্ধ হয়, কিন্তু দূর গিয়ে দেখি আরও তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন কে কোথায় জানি না, দূর পাহাড়ে চলে যাই। গ্রাম তখন জ্বলছে, লুটপাট চলছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাহাড় থেকে দেখা যাচ্ছে। আমার মত অনেকেই পাহাড়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সকলের মুখে হতাশার ছবি। সবাই বলাবলি করছে, মা, বাপ, ভাই, সবাই মারা গেলো, অবশিষ্ট কেউ নাই, খাওয়া দাওয়া নাই, অনেক লোক একত্রিত হয়েছি। গ্রামের খবরাখরব নেওয়ার চেষ্টা করছি। কেউ কেউ তাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে জংগলে খোঁজ করছে, আমিও আমার স্ত্রী, একজন ছেলে ও এক বৎসরের ভাগিনীকে খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না। অনেকে স্বান্তনা দিচ্ছে পাহাড়ে কোনখানে আছে, তিন দিন খোঁজাখুঁজির পর রেজাকাঠা নামক স্থানে তাদের সাথে আমার স্বাক্ষাত হয়। দু'দিন ধরে তারা কিছু খায় নাই। তাদেরকে দেখে আমার ভীষণ কান্না এসে পড়লো, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমি বেঁচে আছি দেখে আনন্দে কেঁদে উঠলাম, আমার ছেলেটিও কাঁদতে লাগলো। তারপর আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি। গ্রামে এসে দেখি বেশ কিছু লোক আছে। বর্বর পাক বাহিনীর হাতে মারা গেছে আমার বাড়ীর পাশের ৫জন লোক। কে কোথায় কিভাবে মারা গেছে তা কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না।

যেদিন আমরা নাপোড়া বাড়ীতে আসলাম সেদিন কয়েকজন পাঞ্জাবী সেনা বাহিনী দক্ষিণ হতে জনাব একরাম মিয়া, তার ভাই দানু মিয়া ও মোক্তার আহমদকে ধরে নিয়ে নাপোড়া বাজারে রেখে গ্রামের ভিতর ঢুকলো। আমি তখন বাইরে ছিলাম। দূর থেকে বর্বর হানাদারদের দেখেছিলাম। আমার স্ত্রীও বাইরে ছিল, তাকে ইশারা করে আমি নাপোড়া বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেলাম। আমার স্ত্রী অন্য দিক দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলো। পর মুহূর্তেই আমার বাড়ীতে দুর্বৃত্তরা ঢুকে পড়ে অন্যান্য যারা ছিল তাদের উপর ভীষণ মারধোর করে। আমার ভাগনী বাসন্তী রাণীর কাছে লুকায়িত বিষ ছিল। তার সতীত্ব রক্ষার জন্য কোন উপায় না দেখে সে বিষ পান করলো। দু-ঘন্টা মধ্যে সে প্রাণ ত্যাগ করে। আমার ভাগনী ২য় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেছিল। রাত্রিতে এসে আমার বাগণীকে মৃত অবস্থায় দেখে চোখের জল রাখতে পারলাম না। রাত্রিতে গ্রামের দুই একজন লোককে ডেকে বাসন্তী রাণীকে কবর দেই।

এটা ছিল আমাদের গ্রামের কাহিনী।

স্বাক্ষর/-
শ্রী বিমল কান্তি গুহ

\ ২৩১ \

মোঃ সামসুল হক
সহকারী হিসাব রক্ষক
বাংলাদেশ রেলওয়ে
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

১০ই নভেম্বর। সেদিনটি ছিল ২০শে রমজান। পাহাড়তলীতে বাঙ্গালী মা বোনদের উপর বিহারী ও পাকসেনারা যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালাইয়াছিলো দুনিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে তা বিরল।

১০ই নভেম্বর খুব সকাল বেলা পাহাড়তলীর পাঞ্জাবী লাইন, ওয়ারলেস কলোনী, বাহাদুর শাহ কলোনীর শিশূ, যুবক, যুবতী, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধকে কলোনীর বাসা হইতে জোরপূর্বক ধরিয়া আনে এবং কাহাকে কাহাকে মিলিটারী অফিসার সাহেব ডাকে বলিয়া ধোঁকা দিয়া ওয়্যারলেস কলোনীর নিকটস্থ পাহাড়ে দল বাঁধিয়া নিয়া যায়। সেখানে জল্লাদেরা ধারাল অস্ত্র ও স্বয়ংক্রীয় অস্ত্র দিয়া দয়ামায়াহীন অবস্থায় হত্যাযজ্ঞ চালায়। সকাল হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে।

আমরা কয়েকজন আবছার উদ্দিন, আবদুস ছোবাহান ও মোঃ ছাবেদ মিয়া হত্যাযজ্ঞ পাহাড়ের জঙ্গল হইতে দেখিতে পাই। সাথে সাথে ডবলমুরিং থানার সহিত যোগাযোগ করি। কিন্তু তাহারা ছলচাতুরী করিয়া আমাদিগকে বিদায় করে।

ঈরে দুপুরে মুসলমি লীগ, জামাতে ইনলামী ও পি, ডি পির দালালদিগকেও এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা বলিয়াছে। সেইদিন নর ঘাতকরা এক এক বারে আনুমানিক দুইশত লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের শরীরের কাপড়গুলি একত্রিত করিয়া পেট্রোল দিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

১০ই নভেম্বর তিনটার সময় একজন সামরিক অফিসারসহ অনেকে ওয়ারলেস কলোনী দেখিতে আসে। সাথে আমরা প্রায় তিনশত লোক তাহাদের সাথে উক্ত জায়গায় গিয়া পৌঁছাই। হাজার হাজার নারী পুরুষের লাশ পড়িয়া আছে। কোথাও কোথাও মৃতদেহ গুলি একত্রিত করিয়া পেট্রোল দিয়া জ্বালাইয়াছে।

এই হত্যাযজ্ঞ দেখিয়া পাঞ্জাবী সামরিক অফিসার ও তাদের দালালরাও ঠিক থাকিতে পারে নাই। নর পশুরা আত্মীয়স্বজনকে লাশ দিতে অস্বীকার করে। পাহাড়ের উপরে নির্লজ্জ অবস্থায় অনেক যুবতী ও নারীদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এমনিভাবে মা বোন দিগকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সামসুল হক।
৭/৪/৭৩

\ ২৩২ \

মোঃ ইদ্রিস
গ্রামঃ জোয়ার কাছাড়
থানা- ফেনী
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী অত্র এলাকায় প্রবেশ করিয়া দালালদের সহযোগিতায় প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রবেশ করে এবং অকস্মাৎ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহাদের বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া আসে এবং প্রকাশ্যে রাস্তার উপর দাঁড় করাইয়া গুলি করিয়া হত্যা করে। ইহা ছাড়া তাহারা প্রতি গ্রাম হইতে দালালদের সহযোগিতায় রাজাকার তৈরী করে। পরে উক্ত রাজাকারদের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া নিরীহ জনগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া গুলি, বেয়নেট চার্জ, লাঠিচার্জ বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করে। পাক সেনারা এই এলাকায় প্রায় ৪৯ জন লোককে হত্যা করিয়াছে।

নিহতদের মাঝে কিছুসংখ্যকের নাম উল্লেখ করা যায়, যেমনঃ ১। মমিনুল হক, ২। তারিকুন নেছা বেওয়া, ৩। আমিনুল হক, ৪। আবুল খায়ের, ৫। হোসনে আরা বেগম, ৬। মোহছেরা বেগম, ৭। হাজেরা খাতুন, ৮। সুলতান আহমদ, ৯। মুজা মিঞা, ১০। মকবুল, ১১। অহিদুর রহমান, ১২। আব্দুল গফুর, ১৩। বোয়দুল হক, ১৪। আমিনুল হক, ১৫। সামসুল হক, ১৬। আব্দুস সালাম, ১৭। ইয়াকুব আলী, ১৮। আব্দুস বারিক, ১৯। জুলেখা খাতুন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া পাক বাহিনীরা এই এলাকায় বহু অপরিচিতি লোক বন্দী করিয়া প্রকাশ্যে তাহাদের দাঁড় করাইয়া গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। মঠবাড়ীয়ার জনাব হাবিব উল্লাহ পাক বাহিনীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহার নিজ বাড়িতে বাঙ্কারে স্বপরিবারে আত্মগোপন করে। কিন্তু পাক বাহিনী তাহাদের ধরিয়া ফেলে। পরে তাহাদের ব্যায়নেট চার্জ করিয়া হত্যা করে।

পাক বাহিনীরা এই ইউনিয়নে বহু নারীর ইজ্জত হরণ করিয়াছে। ধর্মপুর ইউনিয়নে পাক সেনারা এই এলাকার জনাব আহসান সাহেবের উপর পৈশাচিক ব্যবহার করিয়া তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে জনাব আহসান সাহেব মুক্তি বাহিনীদের সাহায্য করিতেন। এই জন্য স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও মেম্বার তাহার উপর অত্যাচার করিতে থাকে। অবশেষে দালালদ্বয় তাহার নাম পাক সেনাদের নিকট জানাইলে তিনি আত্মরক্ষার জন্য বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু দালালরা তাহাকে সেখান হইতে রাত্রিতে গোপনে ধরিয়া আনিয়া পাক সেনাদের নিকট হস্তান্তর করে। পাক সেনারা তাহার উপর প্রায় ৫দিন ধরিয়া দৈহিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে তিনি নিজের দোষ স্বীকার না করায় তাহাকে পাক সেনারা গুলি করিয়া হত্যা করে।

পাক সেনারা অনুরুপভাবে মজলিসপুর গ্রাম হইতে জনাব আবুল খায়ের নামক একজন মুক্তিবাহিনীর বাড়ী আকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া পাক সেনাদের শিবিরে লইয়া আসে। পরে তাহাকে ঝুলন্ত অবস্থায় বেত্রাঘাত করিয়া তাহার নিকট হইতে মুক্তি বাহিনীদের গোপন তথ্য জানিতে চেষ্টা করে। প্রায় ৫দিন ধরিয়া তাহার উপর দৈহিক নির্যাতন চালাইবার পর পাক সেনারা তাহার নিকট হইতে কোন সংবাদ জানিতে না পারিয়া তাহাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে হত্যা করিয়াছে।

পাক বাহিনী ধর্মপুর ইউনিয়নে রাজাকার ও দালালদের সহযোগিতায় প্রতিটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া নিরীহ জনসাধারণের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। তাহারা এই এলাকায় প্রায় পাঁচটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। যেমন, ধর্মপুর, জোয়ার কাছাড়, মটবাড়ীয়া, পদুয়া, মজলিসপুর। যে সমস্ত গ্রামে প্রবেশ করে নাই সে সমস্ত গ্রামে বাস্তত্যাগী জনগণের বাড়ী ঘরের ছাদের টালি, দরজা জানালা প্রভৃতি দালাল ও রাজাকার কর্তৃক লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পাক সেনারা অত্র এলাকায় বহু রমণীর শরীর হইতে সোনার গহনা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

পাক বাহিনী এই এলাকায় গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা ধর্মীয় স্থানের প্রতিও কলংক লেপন করিয়াছে। পাক সেনারা এই এলাকার প্রতিটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। জোয়ার কাছাড় গ্রামে পাক সেনারা আবদুল আলীকে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

স্বাক্ষর /-
মো: ইদ্রিস

\ ২৩৩ \

আফিজা খাতুন
গ্রাম- দ: খানে বাড়ী
ডাকঘর- শর্শদী বাজার
জেলা- নোয়াখালী

আমি অতিশয় দরিদ্র পরিবারের অসহায় নারী। বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নিজ বাড়ীতে ছিলাম। সংগ্রামের প্রথম দিকে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আত্মীয় পরিজনের বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া ছিলাম। আর্থিক অবস্থাহীন বলিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিতে পারি নাই। বৃদ্ধ পিতা সম্পত্তিহীন কৃষক ছিল। অপরের সম্পত্তি চাষ করিয়া ও দৈনিক মজুরী দিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিত।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাক বাহিনী দ: খান বাড়ী গ্রামের নিকট অকাতরে রকেট শেলিং করিতেছিল। তখন আমার পিতা জুলু কামাল মিঞা মাঠে জমি চাষ করিতেছিল। অকাতরে রকেট শেলিং করিতে দেখিয়া ভয়ে জ্ঞান হারাইয়াই মাঠে শাহাদৎবরণ করেন।

পিতার অকালে মৃত্যুর পর আমার পরিবারে দুঃখের ছাপ নামিয়া আসে। অন্য দিকে ফেনী থানায় পাক বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া আমার প্রায় সকল আত্মীয়স্বজন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমি অর্থের অভাবে নিজ বাড়ীতে বৃদ্ধ মাতা ও ছোট ভাইকে নিয়া ছিলাম।

অক্টোবর মাসে পাক বাহিনী শর্শদী বাজারে শিবির স্থাপন করে। পাক বাহিনী, রাজাকার ও দালালরা উক্ত এলাকার গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দিতে থাকে। অস্থায়ী সম্পত্তি লুটতরাজ করিয়া নিয়া যায়।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে স্থানীয় রাজাকারের সহযোগিতায় পাক বাহিনী আমার বাড়ী ঘেরাও করে। হঠাৎ আক্রমণের ফলে আমাদের পক্ষে আত্মগোপনের সুযোগ হয় নাই। আমি ভয়ে ঘরের গোলার নীচে পালাইয়া থাকি, কিন্তু রাজাকার ও পাক বাহিনীর পিশাচরা ঘরে ও বাহিরের সকল কিছু তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করে করে এবং এবং আমাকে গোলার নীচ হইতে টানিয়া বাহির করে। পাক নরপশুরা আমাকে দেখিয়া আনন্দে উৎসাহিত হইয়া ওঠে ও রাজাকারকে একটি ১০ টাকার (দশ টাকা) নোট হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়। আমি নরপিশাচ দিগকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিতে থাকি, কিন্তু কাহাকেও সাহায্যে আসিতে দেখিলাম না। আমার ভীষণ চিৎকার দেখিয়া তাহারা বেয়নেট বাহির করিলে আমি তাহাদের পায়ে জড়াইয়া ধরিলাম এবং বহু বিনয়ের সহিত আমার পিতার মৃত্যুর কথা বলিলাম। আমি আপনাদের বোন, আমার চরিত্রে আপনারা কলঙ্ক লেপন করিবেন না। আমি দরিদ্র মেয়ে। আমার মা বহুবার তাহাদিগকে অনুরোধ করিল। ক্রন্দন করিল তোমাদের তো মা, বোন আছে, কিন্তু নরপিশাচরা আমাকে মাকে পায়ে লাথি মারিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল এবং ঘরের দরজা দিয়া ফেলিল। আমার ভীষণ চিৎকার আকুতি মিনুতি তাহাদের হৃদয়ে একটুও মায়ার সৃষ্টি করিল না। দুইজন পাক নরপিশাচ আমার উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করিল। নরপিশাচদের অত্যাচারে আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে গভীর রাত্রে জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে আর পাশে দেখি আমার অসহায় মা মাথায় পানি দিতেছে। নির্মম অত্যাচারে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ে। আমার অসুস্থ শরীরের উপর এইভাবে তিন দিন অত্যাচার করে এবং প্রতিদিন আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। রাজাকার আমাদের কড়া পাহারা দিতে থাকে। তিন দিন পর একদিন গভীর রাত্রে মা ও ছোট ভাইকে নিয়া বাড়ী হইতে অন্য গ্রামে পলায়ন করি। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরিয়া আসি এবং জানিতে পারি মুক্তিযোদ্ধারা সেই রাজাকার ওসমান আলীকে হত্যা করিয়াছে।

টিপসহি/-
অফিসা খাতুন

\ ২৩৪ \

আব্দুল গোফরান
গ্রাম- পদিপাড়া
থানা- বেগমগঞ্জ
জেলা- নোয়াখালী

২২শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে মাইজদি এবং চৌমুহনী বাজারে পাকসৈন্য প্রবেশ করে। আমি তখন হোটেল জায়েদীতে কাজ করি। পাক বাহিনী যখন প্রবল বাধা সত্ত্বেও চৌমুহনী বাজারে প্রবেশ করিল তখন আমি মনে স্থির করিলাম যে কি করিয়া এই বাজার হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারি। যখন দেখিলাম যে পাক বাহিনী রাস্তার ভিতর নাই, তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া এক পা দু পা করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর একজন পাক দস্যু আসিয়া আমাকে বলিল হ্যাণ্ডস আপ। হ্যাণ্ডস আপ অর্থ কি আমি বুঝিতে না পারিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাক দস্যু আসিয়া আমাকে ভীষণভাবে চপেটাঘাত করিল। চপেটাঘাত করার পর আমি মাটিতে পড়িয়া যাই। যেখানে পড়িয়া যাই ঐখান হইতে আমাকে চৌমুহনী প্রকৌশল বিদ্যালয়ের উত্তর পাশের রোডে নিয়া আসে। এখানে আনিয়া আমাকে বার দুই প্রশ্ন করে যে মুক্তিবাহিনী কোথায়। আমি বলি মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। আমার জবাবে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলে বেটা মুক্তিবাহিনীকে মাছ, ভাত দিতে পারিস আর এখন বলিস মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। তৎক্ষণাৎ পাক নরপশু তাহার ব্যায়নেট বাহির করিয়া আমার ডান হাতের একটা আঙ্গুল তুলিয়া ফেলে এবং বলে এখন সত্যি কথা বল। আমি বলি না হুজুর আমি মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। তখন আবার ডান হাতের তালু ছিদ্র করিয়া দিল। এমন অবস্থাতেও আমি বলি নাই মুক্তিবাহিনী কোথায়।

স্বাক্ষর / -
আব্দুল গোফরান
২১/১/৭৩

\ ২৩৫ \

জামাল মিঞা পাটওয়ারী
গ্রাম- পটিকা
থানা- বেগমগঞ্জ
জেলা- নোয়াখালী

১২/৫/৭১ইং রোজ মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১২ ঘটিকার সময় বাড়ীতে পাক বাহিনী হামলা চালাইলে আমি তাহাদের হাতে ধরা পড়ি। কে বা কাহারা আমার মেঝ ছেলে রুহুল আমিনের নাম পাক বাহিনীদের নিকট দেওয়ায় পাক বাহিনী আমার ছেলে রুহুল আমিনকে খোঁজ করে এবং আমাকে তাহার সম্পর্কে বহু কিছু জিজ্ঞাসা করে। আমি তাহার সম্পর্কে সব কিছু অস্বীকার করিলে তাহারা রাইফেল দ্বারা আমাকে বেদম প্রহার করে। তাহা ছাড়া পা দ্বারা বুকে লাথি মারে। আমি তাহাদের অনুরোধ করিলে তাহারা আমার উপর আরও কঠোর নির্যাতন চালায় ও আমার ঘর দরজা পোড়াইয়া দিয়া আমাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলিয়া যায়। তারপর আমার বাড়ীর অন্যান্য লোকজন বাড়ী আসিলে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া ডাক্তার লইয়া আসে। ডাক্তার আমাকে ঔষধ পত্র ও ইনজেকশন দেওয়ার পর আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। পাক হানাদার বাহিনী মাঝে মাঝেই আমার বাড়ীতে মেঝ ছেলে রুহুল আমিনকে খোঁজ করিত।

স্বাক্ষর /-
জামাল মিঞা পাটওয়ারী

\ ২৩৬ \

মো: আনছার আলী
গ্রাম- করিমপুর
থানা- বেগমগঞ্জ
জেলা- নোয়াখালী

২২শে এপ্রিল ১৯৭১ সনে মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও পাক বাহিনী মাইজদি ও চৌমুহনী বাজারে প্রবেশ করে। পাক বাহিনী চৌমুহনীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে কারফিউ জারি করে। তখন আমরা দোকান পাট বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকি। এই সময় আমি গুলশান চায়ের দোকানে কাজ করি। যখন কারফিউ শেষ হইল তখন আমি দোকানে চা তৈরী করিতেছি। এমন সময় পাক নরপশুরা আমাদের দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানে আসিয়া আমাকে বলিল বেটা একটা চা দে তো। অমনি আমি একটা চা তৈরী করিয়া দেই। চা খাওয়ার পর আমাকে বার বার প্রশ্ন করে বেটা তোরা তো মুক্তিবাহিনীকে ভাত, মাছ দিয়াছিস, বল এখন মুক্তি কাহা হায়? আমাকে পাক বাহিনী বলে ঝুট নাহি বলতা হায়। আমি বলি না হুজুর আমি মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে পাক দস্যু আমার উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হইয়া বলিল ভাত, মাছ দিতে পারিস আর এখন বলিস মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের প্রতি লক্ষ করে এবং গুলি করে। গুলি আসিয়া আমার উরাতের ভিতর প্রবেশ করে। আমি তখন জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া যাই। এমন সময় দুইটা লোক আমাকে দোকানের ভিতর প্রবেশ করে। আমাকে দেখিয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে লোকটা বাঁচিতে পারে। এই লোক দুইটা আমাকে চিনিত, তাহারা আমাকে ধরিয়া আমার বাড়ীতে নিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে আমার বাড়ীতে লোকজন আসিতে লাগিল। তখন আমি আমার পাড়া প্রতিবেশী মো: নজির উদ্দিনকে ডাকিয়া বলি ভাই আমার জমি তোমায় লিখিয়া দেব তুমি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দাও। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মো: নাজির উদ্দিন চৌমুহনী বাজার হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ডাক্তার চিকিৎসা করিতে করিতে আমাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল।

স্বাক্ষর / -
মো: আনছার আলী

\ ২৩৭ \

আহছান উল্লাহ
গ্রাম- দেয়নাথপুর
থানা- রায়পুর
জেলা- নোয়াখালী

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পাক বাহিনী রায়পুর বিনা মোকাবিলায় দখল করে। বাজারের অনতিদূরে একটি হিন্দু বর্ধিষ্ণু গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় ও দুইটি নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়।

কয়েক দিন পর আবার রায়পুর থানায় আসিয়া শিবির স্থাপন করে এবং আরম্ভ হয় নারী নির্যাতন, দৈহিক পীড়ন। পাক বাহিনী স্থানীয় জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ সমর্থিত দালালদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ কর্মী ও হিন্দুদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন ও প্রজ্বলন শুরু করে। রাত্রের অন্ধকারে বাড়ীতে হানা দিয়ে মা বোনদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে এই এলাকায় অগণিত মা বোনের সতীত্ব নষ্ট হয়। শেষের দিকে নিরপরাধ লোকদের বাড়ীও তাহারা জ্বালাইয়া দেয় ও লুণ্ঠন করে।

আমি একজন দরিদ্র মিস্ত্রী। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতাম। পাক বাহিনী ও তাহাদের দালালরা আমার সুখের সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। পাক বাহিনী রায়পুর শিবির করার পর আমার এখানে থাকা সম্ভব হইল না। আমার কাজ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বাঁচার অন্বেষণে সুদূর পল্লী গ্রামে চলিয়া গেলাম। সেখানে কাঠ মিস্ত্রীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি। মে মাসের শেষ সপ্তাহে পাক বাহিনী ও দালালরা আমাদের গ্রামে দেয়নাথপুর আক্রমণ করে। প্রতিটি বাড়ী খুঁজিয়া যুবকদিগকে হত্যা করে ও মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। আমার বাড়ীতে তল্লাশি করিয়া আমাকে না পাইয়া আমার স্ত্রী আরমার নেছা বেগমের উপর অত্যাচার করে। সেই সময় আমার স্ত্রী সাত মাসের গর্ভবতী ছিল। আমাকে বাড়ীতে না পাইয়া মুক্তিফৌজ সন্দেহ করিল। আমার স্ত্রীর উপর নৃশংস অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে আমার স্ত্রী আরমান নেছা ঘটনাস্থলেই শাহাদৎ বরণ করে। এইভাবে এই এলাকায় বহু নারীকে অত্যচার করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিদায় নেয়।

স্বাক্ষর / -
আহছান উল্লাহ

\ ২৩৮ \

মো: বাদশা মিয়া
গ্রাম- লুধুয়া
থানা- রায়পুর
জেলা- নোয়াখালী

৫ই রমজান ১৯৭১ইং সালে পাক বাহিনী লক্ষ্মীপুর হইতে আমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মীরগঞ্জ আসে। মীরগঞ্জে আসিয়া মীরগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মসজিদে তাহাদের শিবির স্থাপন করে। এই শিবিরে প্রায় ৩০ জন পাক নরপিশাচ ও ৯০ জন রাজাকার ছিল।

একদিন আমি আমাদের গ্রামের পাশে সুপারি বাগানে কাজ করিতেছি। এমন সময় একদল রাজাকার আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। রাজাকার কমাণ্ডার আমাকে চোখ বাঁধিয়া রাজাকার ক্যাম্পে আনিল। ক্যাম্পে আনিয়া মসজিদের সামনে যে বাঙ্কার ছিল সেই বাঙ্কারের ভিতর হাত, পা বাঁধিয়া রাখিল। রাত্রিতে আমাকে একটা রড দিয়া ভীষণ প্রহার করে এবং রাজাকার কমাণ্ডার বলে বেটা মুক্তিবাহিনীর লোক, বেটাকে এখন মুক্তিবাহিনীর সাধ মিটাইতেছি। আবার সেই রডটা আগুন দিয়া পোড়াইয়া আমার পায়ে ঠাসিয়া ধরিলে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকি। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। তারপর রাজাকাররা বলে তুই মুক্তিবাহিনীর লোক, তোকে আমরা আর বাঁচাইয়া রাখিব না।

তার পরের দিন পাক বাহিনীর একজন নায়েক সুবেদার আসিয়া আমার চোখ খুলিয়া আমাকে বার বার প্রশ্ন করে মুক্তিবাহিনী কোথায় থাকে ঠিক করিয়া আমার কাছে বল, তোকে আমরা ছাড়িয়া দিব। আমি তখন বলি স্যার আমি একজন নিরীহ মানুষ, মুক্তিবাহিনী কে বা কোথায় থাকে তা আমি জানি না।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাক বাহিনী ভীষণভাবে চপেটাঘাত করে এবং বলে বেটা ঠিক কথা বল না হইলে তোকে আমরা চিরনির্বাসিত করিয়া দিব। এমন সময় একজন পুলিশ আসিল বলিল স্যার এই নিরীহ জনসাধারণকে মারিয়া কোন লাভ হইবে না। তখন রাজাকার কমাণ্ডার নূর মোহাম্মদ বলে বেটারা মুক্তিবাহিনীকে ডাব, নারিকেল দিবে। কাজেই বেটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তখন উক্ত পুলিশটি বলিল দেন বেটাকে আমি শেষ করিয়া দিয়া আসি। তখন পুলিশটি আমাকে দূরে আনিয়া বলিল তুমি এক কাজ কর। কাজ হইল এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে যে পুল আছে ঐ পুলের নীচে কয়েকজন মরা মানুষ ভাসিতেছে, তুমি একটা বাঁশ আনিয়া মরা মানুষ গুলি ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যাও। তখন আমি পুলিশের কথা মত মরা মানুষ গুলি ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া আসি। আজ পর্যন্ত আমার পায়ের সেই দাগ রহিয়াছে।

টিপসহি/-
মো: বাদশা মিয়া

\ ২৩৯ \

মো: আবুল কালাম
গ্রাম- উত্তর দেনাতপুর
থানা- রায়পুর
জেলা- নোয়াখালী

ভাদ্র মাসে পাক বাহিনী আমাদের রায়পুর থানায় আসিয়া রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। এই মাদ্রাসায় রাজাকার বাহিনীর জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে।

এখান হইতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া রাজাকার বাহিনী রায়পুর থানার পার্শ্ববর্তী গ্রামে মুক্তি বাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের বাড়ীতে যাইয়া লুটপাট আরম্ভ করে। এই ভয়ে তখন হইতে আমি আমাদের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করা নিরাপদ নয় বলিয়া অন্য বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিতাম।

একদিন আমি আমাদের গ্রামের মো: রসিদ পাটোয়ারী সাহেবের বাড়ীতে ঘুমাইতেছিলাম। এমন সময় একদল রাজাকার আসিয়া আমাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিল। তখন আমি মনে করিলাম আমার আর বাঁচার কোন পথ নাই। প্রায় ১৫ জন রাজাকার আসিয়াছিল, তার মধ্যে আমার পরিচিত ছিল চারজন।

একজন রাজাকার কমাণ্ডার আসিয়া আমার হাত বাঁধিয়া তাহাদের ক্যাম্পে নিয়া আসিল এবং পাক বাহিনীর হাতে অর্পন করিল। পাক বাহিনী তখন আমার চোখ বাঁধিয়া একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখিল। প্রথম দিন আমাকে তাহারা বেত দ্বারা বেদম প্রহার করিতে থাকে। পাক বাহিনী আমাকে বলে তোদের মুক্তিবাহিনীর দল কোথায় ঠিক করিয়া বল তোকে আমরা ছাড়িয়া দিব। তখন আমি বলি না, হুজুর, আমি মুক্তিবাহিনীর দল দেখি নাই। এই কথা বলার সঙ্গে পাক বাহিনী তাহার পাদুকা দিয়া আমার বুকের উপর ভীষণভাবে লাথি মারিল, এই লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান ইয়া পড়িয়া থাকি।

দ্বিতীয় দিনে উক্ত রাজাকার কমাণ্ডার আসিয়া আমাকে তাহার চাকু দিয়া আমার বাম হাতের রগ কাটিয়া ফেলিল। রগ কাটার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকি।

তৃতীয় দিনে পাক বাহিনী আমাকে তাহাদের হেড কোয়ার্টার মাইজদি পাঠাইবে এই খবর শুনিয়া একজন রাজাকার আমাকে বলিল এবং আমি তাহাকে বলিলাম ভাই আমি তোমাকে কিছু টাকা দিব তুমি আমাকে মুক্ত করিয়া দাও। এই কথা শুনিয়া সেই রাজাকার আমার বাড়ীতে সংবাদ দিল। আমার বাড়ী হইতে বড় ভাই ১৫ শত টাকা নিয়া আসিল।

পঞ্চম দিনে রাজাকার কমাণ্ডার আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং দাবী করে আমাকে দুই হাজার টাকা দিতে হইবে, না হইলে আমরা কালামকে মারিয়া ফেলিব।

এই কথা শুনিয়া আমার বড় ভাই বাড়ী চলিয়া গেল। এমন সময় রাজাকার কমাণ্ডার আমার নাকের ভিতর সুঁচ দিয়া ছিদ্র করিয়া সুতা দিয়া আড়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। এই কথা শুনিয়া আমার বড় ভাই দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আবার ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিল। রাজাকার কমাণ্ডার দেলোয়ার হোসেনকে দুই হাজার টাকা দিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া আনিল।

স্বাক্ষর / -
মো: আবুল কালাম

\ ২৪০ \

মো: নুরুল ইসলাম
গ্রাম- পশ্চিম লতিফপুর
থানা- লক্ষ্মীপুর
জেলা- নোয়াখালী

পাক নরপশু এতদ অঞ্চলের চন্দ্রগঞ্জ হাই স্কুল ও প্রতাবগঞ্জ হাই স্কুলে আসিয়া শিবির স্থাপন করে। শিবির স্থাপন করার পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম পশ্চিম লতিফপুরের উপর বেপরোয়া হামলা চালায়। কারণ চন্দ্রগঞ্জ বাজারের পূর্ব পার্শ্বে একটা পাকা পুল ও রাস্তা কাটিয়া প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলে। ফলে চন্দ্রগঞ্জ বাজারের পাশে সংলগ্ন গ্রাম পশ্চিম লতিফপুরে হানা দেয়। প্রথমে পাক বাহিনীরা গ্রামে প্রবেশ করার পথ লোকজন সামনে যাহাকে পাইয়াছে তাহাদেরকে গুলি করিয়া হত্যা করে। আমাদের গ্রামে পাক বাহিনী নুরু মিঞা মুন্সীর বাড়ীতে যায়। ঐ বাড়ীতে ৬ জন লোককে পায়। ৬ জন লোককেই গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহাছাড়া উক্ত গ্রামে আরও বহু লোক হত্যা করে। নিম্নে উক্ত গ্রামের মৃত ও আহত লোকদের নাম দেওয়া হইল।

মৃত ব্যক্তিদের নামঃ

১। শশীভূষণ পাল, পিতা-রাজ মোহন পাল, ২। সেকান্দার মিয়া, পিতা-ইলিয়াস, ৩। মজীবুল্লাহ, পিতা-আহমদ উল্লাহ, ৪। শফিকুল্লাহ মুন্সী, পিতা-মৃত ছালামত উল্লাহ, ৫। নুর মিয়া মুন্সী, পিতা-মহববত আলী, ৬। রহমত উল্লাহ, পিতা-নূর মিয়া মুন্সী, ৭। মখলেছুর রহমান, পিতা-মহববত আলী, ৮। জাফর আহমদ, পিতা-এমরান আলী, ৯। আবু তাহের, পিতা-ওবায়দুল্লাহ, ১০। করপুন নেছা, স্বামী-আব্দুল মান্নান, ১১। নজির আহমদ, পিতা-আব্দুল হাকিম, ১২। শামসুল হক, পিতা-মুজা মিঞা, ১৩। খলিল, পিতা-হাবিবুল্লাহ, ১৪। আব্দুর রহমান পাটোয়ারী, পিতা-বজলুর রহমান।

আহত ব্যক্তিদের নামঃ

১। জগবন্ধু পাল, পিতা-রতন কৃষ্ণ পাল, ২। অনুকূল চন্দ্র পাল, পিতা-দেবেন্দ্র কুমার পাল, ৩। নুর মোহাম্মদ, পিতা-আহমদ উল্লাহ, ৪। নুরজ্জামান, পিতা-আনোয়ার আলী, ৫। আব্দুল হক, পিতা-নুরুজ্জামান, ৬। ইউছুফ মিঞা, পিতা-মহববত আলী, ৭। নুরুল আমিন, পিতা-জাফর আহমদ। মৃত ব্যক্তির নাম আরও রহিয়াছে।

স্বাক্ষর / -
মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
২৬/২/৭৩

\ ২৪১ \

মো: মফিজ উল্লাহ মুন্সি
গ্রাম- পশ্চিম লতিফপুর
থানা- লক্ষ্মীপুর
জেলা- নোয়াখালী

আমার মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পাক বাহিনী তখন চৌমুহনী হইতে চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আসে। চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আসিয়া চন্দ্রগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে পাক বাহিনী তাহাদের শিবির স্থাপন করে। পাক বাহিনী শিবির খুলিয়া তাহাদের দোসর বন্ধু শান্তি কমিটি গঠন করে।

শান্তি কমিটি গঠন করিয়া পাক বাহিনী চন্দ্রগঞ্জ বাজারের উত্তর পাশে গ্রামগুলি মুক্তিবাহিনীর তল্লাশে তছনছ করিয়া তুলিল।

এইভাবে পাক বাহিনী জনসাধারণের মধ্যে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিল। তখন হইতে আমাদের গ্রামের জনসাধারণ অন্যান্য গ্রামে পলায়ন আরম্ভ করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১২ তারিখে পাক বাহিনী আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে। পাক বাহিনীকে আসা দেখিয়া আমার বাড়ীর লোকজন সবাই পলায়ন করে। শুধু আমি ও আমার ভাই মো: আমিন উল্লাহ মুন্সি বাড়ীতে ছিলাম। যখন দেখিলাম পাক বাহিনী আমাদের পাড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তখন আমরা দুই জন এক পুকুরের মধ্যে ডুব দিয়া কচুরি পানা মাথায় দিয়া লুকাইয়া থাকি। পাক বাহিনী আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রথম তাহার পাদুকা দ্বারা আমার বুকে লাথি মারিল, তারপর রাইফেল দিয়া বেদম প্রহার করিল। রাইফেল দিয়া মারার পর আমার পায়ে দড়ি দিয়া এক গাছের সঙ্গে বাঁধিত। গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া আমার পা উপর দিকে রাখিল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তোদের বাড়ী কোনটা। বাড়ী দেখাইয়া দেওয়ার পর আমার বাড়ী আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিল। আমাকে গাছের সঙ্গে এই অবস্থায় বাঁধিয়া রাখিয়া পাক বাহিনী চলিয়া গেল। বর্তমানে আমি অদ্যাবধি মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছি।

স্বাক্ষর / -
মো: মফিজ উল্লাহ মুন্সি
২৬/২/৭৩

\ ২৪২ \

জগবন্ধু পাল
গ্রাম- লতিফপুর
থানা- লক্ষ্মীপুর
জেলা- নোয়াখালী

রাজাকাররা যখন পাক বাহিনীর সাথে বিশেষভাবে সহযোগিতা করতে থাকল তখন এই গ্রামের নিরীহ জনসাধারনের উপর রাত্রিতে জোর তল্লাসী আরম্ভ করে। লতিফপুর গ্রামটি চন্দ্রগঞ্জ বাজারের অতি নিকটবর্তী। পাক দস্যুরা ও রাজাকাররা চন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুলের সম্মুখে শিবির করেছিল। রাজাকার ও পাক হানাদাররা গ্রামের দিকে আসা মাত্রই আমরা ঘর বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করি। এইভাবে আমাদের মধ্যে সর্বসময় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করত। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝিতে বেশ কয়েকজন রাজাকার রাত্রিতে আমার বাড়ী আসে এবং আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। বাড়ী ঘেরাও করে ঘর হতে আমাকে জোর করে বার করে এবং বন্দুকের বাঁট দ্বারা বেদম প্রহার করে। রাজাকার আমাকে প্রশ্ন করে মুক্তিবাহিনীকে কয় হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিস? মুক্তি বাহনীদেরকে সাহায্যের কথা অস্বীকার করলে বা মুক্তিবাহিনী কারা তাও অস্বীকার করলে পা দ্বারা বুকে জোরে লাথি মারে। নরপশুরা তা ছাড়া যাবার সময় আমার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়ে যায। আমার কাছ হতে বহু টাকা পয়সাও জোর করে কেড়ে নেয়। বর্তমানে আমার চোখ অচল। একেবারে কিছু দেখতে পাই না। তাছাড়া বেদম প্রহারের ফলে আমার একটা হাতও ভেঙ্গে যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে থাকা না থাকা একই অবস্থা।

মুক্তিবাহিনী পাক বাহিনী ও রাজাকারদেরকে সব সময় নাজেহাল করত। ফলে পাক বাহিনী ও রাজাকার অতিষ্ঠ হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে লতিফপুরের নিরীহ বহু জনসাধারণকে ধরে কঠোরভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়। পাক বাহিনী ও রাজাকাররা আমার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। বর্তমানে আমি সর্বহারা।

স্বাক্ষর /-
জগবন্ধু পাল
২৬/২/৭৩

\ ২৪৩ \

মো: আবুল কাসেম
গ্রাম- শেখপুর,
থানা- লক্ষ্মীপুর
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী যখন চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আসে তখন আমি চন্দ্রগঞ্জ বাজারে ছিলাম। চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আমার একটা দোকান আছে। সেই দোকানে আমি ছিলাম। পাক বাহিনী চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আসিয়া চন্দ্রগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে তাহারা শিবির স্থাপন করে। তখন হইতে আমি মুক্তি বাহিনীকে গোপনভাবে সাহায্য করি এবং মুক্তি বাহিনীর পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করিতে থাকি। একদিন রাত্রিতে প্রায় ১৭ জন মুক্তি বাহিনী আসিয়া আমাকে বলিল কিভাবে আমরা নোয়াপুর পুল ধ্বংস করিতে পারি? তখন আমি মুক্তি বাহিনীকে নোয়াপুর পুলের পথ দেখাইয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে আমার দোকানে রুটি খাওয়াইয়া বিদায় করিলাম। ঐ তারিখে তাহারা নোয়াপুর পুল ধ্বংস করিয়া চলিয়া যায়।

ঠিক তার দুইদিন পর একদল রাজাকার আমার দোকানে আসিয়া বলিল কাসেম নামে কোন দোকানদার আছে নাকি? তখন আমি বলিলাম হ্যাঁ আছে। রাজাকার বলিল কাসেমকে আমাদের দরকার আছে। তুমি পলায়ন করিলে দোকান পোড়াইয়া দেওয়া হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি আর দুইদিন দোকানে আসি নাই।

একদিন রাত্রিতে পালাইয়া আমাকে দোকানে আসিলাম। তৎক্ষণাৎ একদল রাজাকার আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং আমার চোখ বাঁধিয়া রাজাকারের ক্যাম্পে নিয়া আসিল।

ক্যাম্পে আনিয়া কোন কথা বলার আগে আমাকে বেত দ্বারা বেদম প্রহার করিল এবং বলিতে লাগিল বেটা কোথায় পলাইয়াছিলি? এখন মজা দেখাইতেছি। এই কথা বলার পর পর আবার বেত দ্বারা বেদম প্রহার করিতে লাগিল।

তারপর আমাকে বলিল যে, নোয়াপুর পুল ধ্বংস করিয়াছিস এবং মুক্তি বাহিনীকে তোর দোকানে রুটি তৈরী করিয়া খাওয়াইয়া ছিস। এখন সত্যি করিয়া বল মুক্তি বাহিনরি ক্যাম্প কোথায়? আমি তখন কোন কথার জবাব দিতে পারি নাই।

তারপর আবার একটা সূচঁ দিয়া আমার ডান হাতের আঙ্গুলের ভিতর ঢুকাইয়া দিলে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকি। এই খবর জানিতে পারিয়া আমার বাড়ী হইতে লোকজন আসিয়া একদল রাজাকারকে কিছু টাকা দিয়া আমাকে রাজাকারের ক্যাম্প হততে উদ্ধার করিল। আজ পর্যন্ত আমার ডান হাত দিয়া কোন কাজকর্ম করিতে পারি না।

স্বাক্ষর /-
মো: আবুল কাসেম
২৬/২/৭৩

\ ২৪৪ \

মো: রফিকুল্লাহ
গ্রাম- কাদির হানিফ
থানা- সুধারাম
জেলা- নোয়াখালী

১৫ই এপ্রিল ১৫ জন রাজাকার আমাদের গ্রামে আসে, আমি তখন আমাদের গ্রামের দক্ষিণ চরায় ধান কাটিতেছি। রাজাকার আসিয়া আমাকে বলে যে, তোদের গ্রাম হইতে আমাদের চাউল তুলিয়া দিতে হইবে। আমি তখন রাজাকারকে বলি না ভাই আমি গ্রাম হইতে চাউল তুলিয়া দিতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ আমাকে ধরিয়া মাইজদি টাউন হল শিবিরে লইয়া যায়। শিবিরে লইয়া রাজাকার কমাণ্ডার মীর কালা মিয়া মেকার আমাকে পাক সেনাদের হাতে অর্পন করে। ঐ হইতে পাক সেনারা আমার শরীরের উপর দৈহিক পীড়ন আরম্ভ করে। প্রথমে আমার পাড়ে দড়ি বাঁধিয়া আমাকে একটা ঘরের আড়ার উপর ঝুলাইয়া রাখে এবং বার বার আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তুই মুক্তি বাহিনী, তোর কাছে অবশ্যই রাইফেল আছে। আমি প্রশ্নের জবাবে বলি না হুজুর আমি কোন মুক্তি নই, আমার কাছে কোন রাইফেলও নাই। এইভাবে আমাকে ঐ খানে ৭ দিন বাঁধিয়া রাখে এবং দিনের শেষে বিকালে আমাকে প্রত্যেক দিন এইভাবে প্রহার করে। ১৭ই এপ্রিল তারিখে আমাকে আবার চোখ বাঁধিয়া একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখে এবং ঐ তারিখে বেগমগঞ্জ শিবিরে লইয়া বেত দ্বারা বেদমভাবে প্রহার করিতে থাকে। এ অবস্থায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। এই খবর শুনিয়া আমার এক আত্মীয় মো: সামছুল হক সাহেব আমাদের গ্রামের ও ইউনিয়নের রাজাকার কমাণ্ডার মো: মীর কালা মিয়া মেকারকে ধরিয়া ৫০০ টাকার বিনিময়ে আমাকে মাইজদি জেলখানায় লইয়া আসিল। মাইজদি জেলখানায় আসিয়া আবার পাক সেনাদের হাতে পড়ি। এই জেলখানায় আমাকে দৈনিক এক হাতে পনের সের পানি আর এক হাতে পনের সের পানি লইয়া আধা মাইল চলিতে হইত। এইভাবে আমি মাইজদি জেলখানায় তিন মাস ছিলাম। মাইজদি শহর মুক্ত হওয়ার পর আমি জেলখানা হইতে মুক্তি পাই।

টিপসহি /-
মোঃ রফিকুল্লাহ

\ ২৪৫ \

মোঃ ছিদ্দিক উল্লাহ
গ্রাম- কাদির হানিফ
থানা- সুধারাম
জেলা- নোয়াখালী

২৮/৯/৭১ ইং তারিখে আনুমানিক ৫০/৬০ জন রাজাকার আসিয়া দিনের বেলায় আমার বাড়ীর চারিদিকে ঘেরাও করিয়া ফেলে। রাজাকারদের আসা মাত্র আমি আমার ঘরের মাচার কোনায় পালাইয়াছিলাম। তবে আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি কোন মুক্তিবাহিনী নই বা কোন অন্যায় কাজও করি নাই। তবে পাক সেনা এবং রাজাকার দেখিয়া ভয় পাইতাম এই কারণে যে বর্বর বাহিনী ও রাজাকারদের মতলবের ঠিক ছিল না এবং সন্দেহ করিয়াই নির্বিচারে গুলি করিয়া হত্যা করিত। তারপর আমাকে বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিল এবং বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল মুক্তিবাহিনীদের থাকার জাযগা দিয়া তাহাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছিস। মুক্তিবাহিনী কোথায় আছে বাহির করিয়া না দিলে আজকে জ্যান্ত কবর দিব। এই সমস্ত বার বার প্রশ্ন করে এবং রাইফেলের বাঁট দ্বারা সমস্ত শরীরের সব জায়গায় বেদম প্রহার করিতে থাকে। বেদম মারের চোটে আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং তারপর তাহারা আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। আমার বাবা ঐ তারিখে বাড়ী ছিলেন না। পাড়ার প্রতিবেশী মো: কালামিয়া, আব্দুল গনি এবং আরও অনেকে তৎক্ষণাৎ আমার বাড়ীতে আসে। আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া মাথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ঢালে এবং জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমাকে তাড়াতাড়ি মাইজদি সদর হসপিটালে লইয়া আসে এবং ভর্তি করিয়া দেয়। সদর হাসপাতালেই থাকি এবং বেশ কিছুটা আরোগ্য হই। আরোগ্য হওয়ার পর বাড়ী চলিয়া আসি। বাড়ী আসিয়া দেখি কাজ কর্ম সম্পূর্ণভাবে করিতে পারি না। রৌদ্রের ভিতর কিছুক্ষণ কাজ করিলে মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যাই। তারপর আমার গ্রামের ডাক্তার মো: নবাব আলীও চিকিৎসা করিয়াছেন।

স্বাক্ষর /-
মোঃ ছিদ্দিক উললাহ

\ ২৪৬ \

হাবিবুর রহমান
গ্রাম- মনিপুর
থানা- পরশুরাম
জেলা- নোয়াখালী

জুলাই মাসের ১৫ তারিখ একদল পাক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মনিপুর গ্রামের উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের প্রথম ভাগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাহাদের আক্রমণের জবাব দেয়। কিন্তু তাহাদের প্রবল আক্রমণের মুখে টিকিতে না পারিয়া ভারতের রাজনগর শিবিরে প্রস্তান করে। ক্রুদ্ধ পাক বাহিনী স্থানীয় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী মি: আমান উল্লাহর বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া আমার বাড়ীর দিকে প্রবেশ করে। পাক বাহিনীর ভয়ে গ্রামের ৫ জন সুন্দরী রমনী আমার বাসগৃহে আত্মগোপন করিয়াছিল। পাক বাহিনী তল্লাশী চালাইয়া তাহাদিগকে ধানের গোলার নীচেও ঘরের কারের হইতে জোরপূর্বক টানিয়া বাহির করে। পাক সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল ১২ জন। তাহারা উক্ত নারীদের উপর দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা যাবৎ অতি বর্বরভাবে অত্যাচার চালায়। তাহাদের অত্যাচারে সকলেই জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। পরে পাক বাহিনী পরশুরামে ফিরিয়া আসে। পাক বাহিনী প্রস্থানের পর স্থানীয় জনসাধারণ মাথায় পানি ঢালিয়া রমণীদের জ্ঞান ফিরাইয়া আসে।

পাক বাহিনী যখন অসহায় নারীদের উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করে তখন তাহাদিগকে অত্যাচার হইতে বিরত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয় এবং ধর্মেরও দোহাই দেওয়া হয়। ইহাতে ক্ষুদ্ধ হইয়া পাক বাহিনী আমাকে কাফের বলিয়া বেদম ভাবে প্রহার করে এবং আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলে পুকুর পাড়ে ফেলিয়া রাখে।

স্বাক্ষর /-
হাবিবুর রহমান

\ ২৪৭ \

হাজী ছানু মিয়া
গ্রাম- মির্জানগর
থানা- পরশুরাম
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী ২৫শে মে ফেনী হইতে পরশুরাম দখল করিয়া নেওয়ার পর আমাদের ১নং মির্জানগর ইউনিয়নের বহুলোক আত্মরক্ষার জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমার একমাত্র ছেলে ও ছেলের বধু ও দুই শিশু সন্তানসহ ত্রিপুরার রাজনগরে আশ্রয় নেয়। আমি এবং আমার সহধর্মিনী হালিমা খাতুন বাড়ীতে ছিলাম। প্রায় ২০০ পাক বাহিনী ১০ই জুলাই মির্জানগরে প্রবেশ করে এবং সেইদিন মির্জানগর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ও গ্রামের অন্যান্য স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া থাকে। রাত্রে পাক বাহিনী গ্রামের নিরীহ নারীদের উপর অত্যাচার করে। ১৫ই জুলাই অধিক রাত্রে আমার বাড়ীতেও পাক বাহিনী হামলা করে।

১৫ ই জুলাই রাত্রে মির্জানগর গ্রামে যুবতী বৃদ্ধা কেহই পাক নরপশুদের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। গ্রামের হাঁস, মোরগ, খাসী, ছাগল সবই নিয়া যায়। ভারত সীমান্ত অতি নিকটে বলিয়া মুক্তিযোদ্ধারা মির্জানগরে পাক সৈন্যদের অবস্থান জানিতে পারিয়া ভোর রাত্রে প্রবল আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া ১৬ই জুলাই সকাল ৯টায় মির্জানগর ছাড়িয়া পরশুরামে চলিয়া যায়। নরপশুদের শিবির ছাড়িয়া যাওয়ার পর প্রায় প্রত্যেক শিবির হইতে জ্ঞানহীন অবস্থায় মা-বোনদিগকে মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করে।

স্বাক্ষর/-
হাজী ছানু মিয়া

\ ২৪৮ \

আব্দুল মোমেন
প্রধান শিক্ষক
দক্ষিণ বল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়
ছাগলনাইয়াঃ, নোয়াখালী

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে পাক বাহিনী অত্র এলাকায় প্রবেশ করে এবং বল্লভপুর হাইস্কুলে শিবির স্থাপন করে। দক্ষিণ বল্লভপুরের রশিদ উল্লাহ সাহেব বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী ছিলেন। নভেম্বর মাসের ১লা তারিখে তাহার নিজ বাড়ী হইতে বন্দি করিয়া বল্লভপুর হাইস্কুলে তাহাদের শিবিরে লইয়া যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ রশিদুল্লাহ সাহেবকে ৫দিন অকথ্যভাবে দৈহিক নির্যাতন চালানোর পর ১৬ই নভেম্বর তারিখে বল্লভপুর হাইস্কুলের নিকটে জীবন্ত অবস্থায় মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করে।

পাক বাহিনী বল্লভপুর গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীই তল্লাশী চালায় এবং প্রতিটি বাড়ী হইতেই টাকা, পয়সা, সোনার গহনা ও সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত বস্তু লুন্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এবং হিন্দুদের বাড়ী ঘরেরই বেশী ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

ইহা ছাড়াও পাক বাহিনী উক্ত স্কুলের শহীদ মিনারটি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে এবং যাবতীয় আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর বই-পুস্তক, ছাত্রদের খেলার সরঞ্জামাদি ও বিজ্ঞান গবেষণার যন্ত্রপাতি আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দেয় এবং লুন্ঠন করিয়া লইয়া যায়। পাক বাহিনী অযথা নিরীহ লোকদের সন্দেহের বশে বন্দী করিয়া তাহাদের শিবিরে লইয়া যায় এবং অকথ্য ভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়।

১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম ৫জন পাকসেনা তাহাদের শিবির হইতে গ্রামের দিকে আসিতেছে। তখন আমি আত্ম রক্ষার্থে বাড়ীর পাশেই আত্মগোপন করি। এমন সময় আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম যে উক্ত ৫জন পাকসেনা আমাদের গ্রাম হইতে ৩জন যুবতী মেয়েকে বন্দী করিয়া তাহাদের শিবিরের দিকে লইয়া যাইতেছে। মেয়ে তিনটি পাক সেনাদের মরণ ছোবল হইতে ছাড়া পাইবার জন্য ভীষণ চিৎকার করিতেছে। নরপশুরা তথাপিও জোরপূর্বক তাহাদের শিবিরে লইয়া যায় এবং প্রায় তিনদিন পাশবিক অত্যাচার চালানোর পর ছাড়িয়া দেয়।

বল্লভপুরের হাইস্কুলটির চর্তুপার্শ্বে প্রায় ২৫টি বদ্ধ পরিখা রহিয়াছে। বদ্ধ পরিখাগুলিতে এখানকার স্থানীয় এবং অন্যান্য এলাকা হইতে প্রায় ১৫০ জন লোককে পাক সেনারা মাটি চাপা দিয়া রাখিয়াছিল।

স্বাক্ষর/-
আব্দুল মোমেন

\ ২৪৯ \

নূর জাহান বেগম
গ্রামঃ- পূর্ব চর চান্দিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

আমার স্বামী মোঃ আব্দুল কুদ্দুস একজন সাধারন কৃষক। সারা দিন পরের বাড়ীতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পাক বাহিনী সোনাগাজী থানায় শিবির স্থাপন করিলে আমরা আত্ম রক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলিয়া যাই এবং বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকি। ১৫ই অক্টোবর তারিখে মুক্তিবাহিনী সোনাগাজী থানা দখল করিলে আমরা নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসি। কিন্তু মুক্তিবাহিনীরা পরবর্তী সময়ে আর সোনাগাজী থানা দখলে রাখিতে পারিল না। তাহারা পাক বাহিনীর প্রবল আক্রমণের সামনে টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া এ এলাকা ছাড়িয়া দিয়া বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে।

উক্ত থানায় পাক সেনারা মুক্তিবাহিনীদের বিতাড়িত করিয়া পুনরায় স্থানীয় শিবির স্থাপন করে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা তছনছ করিয়া লয়। তাছাড়া পাক বাহিনীরা রাজাকারদের সহায়তায় বিভিন্ন গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে।

২৫শে অক্টোবর তারিখে কয়েকজন পাক সেনা রাজাকারসহ আমাদের গ্রামে জোর তল্লাশী চালায়। তন্মধ্যে আমাদের বাড়ীতে ৩জন পাক সেনা ও একজন রাজাকার বাড়ীর আনাচে- কানাচে তন্নতন্ন করিয়া মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। তখনও আমি আমার মা-বাপের হাত ধরিয়া পালাইয়া আসি। আমাদের বাড়ীর চারদিকে খোঁজার পর আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার ভাব দেখিয়া আমি বাপ-মায়ের হাত ছাড়িয়া চৌকির নীচে আত্মগোপন করি। তারপর পাকবাহিনী আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমার বাপ মাকে উর্দুতে প্রশ্ন করে। কিন্তু বাপ-মা তাঁহার কিছুই উত্তর না দেওয়ায় আমার বাবার উপর রাইফেল দ্বারা বেদম প্রহার করে। আমাদের ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজার পর আমাকে চৌকির নীচে হইতে টানিয়া বাহির করে। প্রথমে আমি খুব চিৎকার করিয়া উঠি, চীৎকার শুনিয়া আমার বাপ-মা তাহাদের পা জড়াইয়া ধরে এবং আমিও তাহাদের অনেক অনুনয় বিনয় করি। কিন্তু কিছুতেই তাহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না। পরে আমার বাপ-মাকে জোর করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দরজা আটকাইয়া ফেলে। প্রথমে আমি তাহাদেরকে পা জড়াইয়া ধরিলে লাথি মারিয়া ফালাইয়া দেয় এবং আমার উপর নির্মমভাবে পাশবিক নির্যাতন চালায়। এই ভাবে ৩জন পাক সেনা আমার অকথ্য অত্যাচার করার পর আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। তারপর আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। বাপ-মা পরে আসিয়া আমাকে মাথায় পানি ঢালিয়া জ্ঞান ফিরাইয়া আনে। এই ভাবে কয়েকদিন পর ঐ ৩জন পাকসেনা আসিয়া আমাদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। আমাদের বাড়ীতে যে ৩জন পাকসেনা ও কয়েকজন রাজাকার আসিয়া অত্যাচার চালাইয়াছে তন্মধ্যে একজন রাজাকার ছিল আমার পরিচিত।

টিপসহি/-
নুরজাহান বেগম

\ ২৫০ \

ডাঃ মোঃ ইদ্রিস মিয়া
মেডিক্যাল অফিসার
সোনাগাজী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রঃ
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

১৩ই এপ্রিল চট্টগ্রাম সেনানিবাস হইতে বহু পাক সৈন্য আসিয়া রাঙ্গুনিয়া দখল করে ও রাঙ্গুনিয়া কলেজে শিবির করিয়া থাকে। সেই দিন আমিও প্রথমে ভয়ে রাঙ্গুনিয়া শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই আবার বিকালে হাসপাতালের দিকে আসি। তখন হাসপাতালে কেহই ছিল না। প্রচুর ঔষধ ও বহু জিনিসপত্র ছিল। আমি সেই দিন রাত্রে একাই হাসপাতালে রাত্রি কাটাইলাম। ১৪ই এপ্রিল সকালে শহরের অবস্থা ভালই দেখা গেল। পাক সেনারা তখন কাহারও উপর কোন খারাপ ব্যবহার করিতেছে না দেখিয়া আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদিগকে গ্রাম হইতে বাসায় নিয়া আসিলাম।

কিন্তু সেই দিন গভীর রাত্রে ৪জন সেনা আমার রাঙ্গুনিয়া পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাসায় আসিয়া দরজা খুলিতে বাধ্য করে এবং তাহারা বলে যে তোমার বাসা হইতে গুলির আওয়াজ শুনা গিয়াছে। তোমার বাসায় রাইফেল আছে কিনা তাহা আমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে বলিয়া ৪জন পাক সৈন্য আমার বাসার ভিতর ঢুকিয়া পড়ে এবং আমার হাতের ঘড়িও আমার ভায়রা ভাই এর হাতের ঘড়ি ও ট্রানজিষ্টারটি পাক সৈন্যরা হাতে নিয়া নেয়। আমার বাসায় আমার লাইসেন্সভুক্ত একটি বন্দুক ছিল তাহাও তাহারা ছিনিয়া নেয়। বন্দুকটি লওয়ার পর আমাকে ও আমার ভায়রা ভাইকে দুইজন পাক সৈন্য বাসা হইতে বাহির করিয়া নিয়া গেল। আমাদিগকে পাক নরপশুরা হাত উপরের দিকে উঠাইতে বলিল এবং আমাদিগকে যে গুলি করিয়া হত্যা করিবে তাহা বুঝিতে আর দেরী হইল না।

বহু অনুরোধ করিয়া বলিলাম আমরা মুসলমান, কলেমা পাঠ করিলাম ও কোরআনের সুরা পাঠ করার পর রাইফেলের বাঁট দিয়া প্রহার করিয়া বলিল আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আস। আহাদের কথামত পাক নরপশুদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলাম।

১৫ই এপ্রিল পাক বাহিনীর লেঃ সেলিম আমার অফিসে এবং সবসময়ের জন্য হাসপাতাল খোলারাখার নির্দেশ দিল এবং আমার উপর কোন জুলুম হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিল।

এদিকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আহত মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আসিয়া এখানে চিকিৎসা করিত এবং সপ্তাহে ২/৩ বার সেন্টার পরিদর্শের নামে বনের ভিতরে মুক্তিবাহিনীর শিবিরে আহত মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের চিকিৎসা করিতাম এবং প্রয়োজন মোতাবেক ঔষধপত্র মুক্তিবাহিনীর শিবিরে পাঠাইতাম। আমার সহিত পত্র যোগযোগ হইত রাঙ্গুনিয়ার মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার চেয়ারম্যান নজীর আহমদের। এভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সহিত আমার ও সংগ্রাম চলিতে থাকে।

১৭ই অক্টোবর রাত্রে তারাবির নামাজ পড়া অবস্থায় মসজিদের ভিঃতরে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। আমাকে লেৎ সেলিমের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন আর্মী মার্শাল ল' কোর্টে ক্যাপ্টেন ইসহাক পারভেজ এর নিকটে হাজির করা হয়। বিচারে হাজিরের পূর্বে কোর্টের সম্মুখে একজন সুবেদার আমাকে বেদম প্রহার করে এবং ভারতের দালাল বলিয়া ক্যাপ্টেন ইসহাকের নিকট হাজির করে। সেখানে লেঃ সেলিম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলে উক্ত ডাক্তার মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করে ও ভারতের হাসপাতাল হইতে ঔষধ পাঠায়। সেই সময় চেয়ারম্যান নজীর আহমদের লিখিত একখানা পত্র বাহির করিয়া ক্যাপ্টেন ইসহাক পারভেজের নিকট পেশ করে এবং বলে

কাফের নজীর আহমদের সাথে ডাক্তারের যোগাযোগ আছে। সেই সময় একজন মুক্তিবাহিনী হইতে সারেণ্ডার করা যুবক রাজাকার সাক্ষী দেয়। এই পত্র আমার মারফতে নজীর আহমদ দিয়াছে। আমি সম্পূর্নভাবে এই চিঠি সম্বন্ধে অস্বীকার করি। তখন ক্যাপ্টেন পারভেজ আসিয়া কানে গালে চড় দেয় এবং লেঃ সেলিম ও ইসহাক পারভেজ হাত ও বুট দিয়া বেদম প্রহার করিয়া আমাকে বাহিরে ফেলিয়া দেয়। তখন আমার জ্ঞান ছিল না, প্রায় এক ঘন্টা পরে জ্ঞানহীন অবস্থায় সামরিক জেলখানায় পাঠান হয়। সাথে সাথে আরম্ভ হয় দৈহিক নিয়াতন। প্রতিদিন সকাল বিকালে বেদম প্রহার করা হইত এবং বলিত ভারতের সহিত ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত যোগাযোগ আছে কি না। এইভাবে ৪দিন চলিয়া গেল, বাসায় কোন সংবাদ দিতে পারিলাম না যে আম এখনও বাঁচিয়া আছি। পরে একজন সিপাহীর মারফতে খবর দিলাম আমরা ভায়রা ভাই-এর নিকট। আমাদের প্রায় ৮০ জনকে ছোট একটি কক্ষে আলোহীনাবস্থায় রাখিত। দিবারাত্রে নিদির্ষ্ট সময় ব্যতীত প্রস্রাব, পায়খানাও করা যাইত না। আমার ডাইবেটিস রোগ, আমার কিছুক্ষন পরপর প্রস্রাব করিতে হয়, কিন্তু প্রসাবের কথা বলিলেও তাহারা দরজা খুলিত না, মাঝে মাঝে প্রস্রাবের চাপে জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতাম। আমার সংবাদ পাইয়া আমার স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন ও রাঙ্গুনিয়ার জন সাধারণ আমার মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। পরে তিন হাজার টাকা পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশকে দিয়া ঈদের আগের দিন রাত্রে নরপশুদের কবল হইতে মুক্তি পাই। কিন্তু তাহাদের নির্যাতনে আমার হাতের আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া যায়, কানের পর্দা ফাটিয়া যায়।

স্বাক্ষর/-
ডাঃ মোঃ ইদ্রিস মিঞা

\ ২৫১ \

মোছাঃ পিয়ারা খাতুন
গ্রামঃ- পূর্ব চর চান্দিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

আমার পিতা একজন সামান্য কৃষক, সারাদিন পরের বাড়ীতে শ্রম বিক্রয় করিয়া কোন রকমে সংসার চালায়। পাক বাহিনী আমাদের সোনাগাজী থানায় শিবির স্থাপন করিলে আমরা আত্ম রক্ষার জন্য অন্য এলাকায় চলিয়াযাই এবং দেড় মাসের মত আত্ম গোপন করিয়া থাকি। ১৫ই অক্টোবর তারিখে মুক্তি যোদ্ধারা সোনাগাজী থানা দখল করিলে আমরা পুনরায় আমাদের নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা পরবর্তী সময়ে আর সোনাগাজী থানা দখলে রাখিতে পারিল না। তাহারা পাক বাহিনীর প্রবল আক্রমণে টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া পল্লী গ্রামের আনাচে কানাচে আত্মগোপন করে।

মুক্তিযোদ্ধরা আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লয় এবং আমি তাহাদের নিজ হাতে কয়েকদিন রান্না করিয়া খাওয়াই। মুক্তিযোদ্ধাদের এইরূপ আশ্রয় দেওয়ার সংবাদ কয়েকজন দালাল পাক বাহিনীর নিকট পৌঁছায়। পাক সেনারা উক্ত সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন রাজাকারসহ ৭জস পাক সেনা রমজান মাসের ৫ই তারিখে আমাদের গ্রামে আকস্মাৎ আক্রমণ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তল্লাশ করিতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উক্ত দিনের পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। পাক সেনারা এবং রাজাকাররা অনেক খোঁজাখুজি করার পর যখন মুক্তিযোদ্ধাদের না পায় তখন গ্রামে লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের ও হিন্দুদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিতে থাকে।

পাক বাহিনীদের বিভিন্ন বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা ফলে প্রায় সমস্ত গ্রামেই ছড়াইয়া পড়ে, তখন আমি ভয়ে আমার পিতার সঙ্গে অন্য গ্রামে পালাইবার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন রাজাকার আমাকে আমার পিতার হাত হইতে ছিনাইয়া লয় এবং পাক বাহিনীর নিকট সমর্পন করে। আমার পিতাকে বেদম প্রহার করার পর তাহাকে একটা গাছের সহিত রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখে। এদিকে আমি খুব চিৎকার আরম্ভ করি। কিন্তু নরপশুরা আমার কথায় একটুও কর্ণপাত করিল না, তাহারা হিংস্র দানবের মত আমার শরীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই ভাবে ৭জন পাক সেনাই আমার শরীরের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাহারা আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। প্রায় ১০ ঘন্টা পর জ্ঞান ফিরিয়া পাই এবং সুস্থ বোধ করি। পরের দিন বেলা ১০টার সময় আবার পুনরায় ইক্ত রাজাকারের চক্রান্তে আর তিনজন পাকসেনা আমাদের বাড়ীতে আসে এবং আমার শরীরের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

টিপসহি/-
মোছাঃ পিয়ারা খাতুন

\ ২৫২ \

ছালেহ্ আহমদ
গ্রামঃ- চর চান্দিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

২৫শে মার্চের সময় একটা ধারনা ছিল যে, হানাদার বাহিনীরা এই নতুন এবং অচেনা, অজানা দেশে আসিয়া টিকিতে পারিবে না। সেইজন্য প্রথম দিকে ভারত যাই নাই। অবশ্য প্রথম দিকে ভারত যাইতে পারিতাম। কিন্তু যখন বাংলাদেশের মধ্যে রাজাকার আলবদর ও হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন পল্লীর আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িল তখন আমাদের ভারতে যাওয়া সম্ভব হইল না। আমরা দেশের পরিস্থিতি ভাল না দেখিয়া দুরে এক আত্মীয় বাড়ীতে আশ্রয় লই। আমাদের আত্মীয় বাড়ীতে থাকার গোপন সংবাদ কয়েকজন রাজাকার জানিতে পারায় আমাদের তল্লাশের জন্য যায় এবং আমাদেরকে জুলাই মাসের ২৭শে তারিখে ধরিয়া ফেলে। সেখান হইতে বন্দী করিয়া আমাদের ৪জনকে সোনাগাজী থানায় লইয়া আসে। বহু ভয়ভীতি দেখায় যে, রাজাকারে নাম না দিলে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমরা ভোগ করিব। তাছাড়া থানায় লইয়া আসিয়া ১৫০০০ টাকার বণ্ড সই করিয়া লয় এই মর্মে যে আমাদের এলাকায় থাকিতে হইবে এবং রাজাকার ও শান্তি কমিটিতে নাম দিতে হইবে।

আমরা বণ্ড সই করিয়াছি কিন্তু রাজাকার ও শান্তি কমিটিতে নাম দেওয়ার প্রশ্নে মুখে সব সময়ই অস্বীকার করিয়াছি। তারপর আমাদিগকে সোনাগাজী থানার সি, এণ্ড বি এর গেষ্ট হাউসে লইয়া আসে এবং মাথা নীচের দিকে রাখিয়া পা উপরের দিকে শুণ্য করিয়া রাখে। বেত ও বন্দুকের বাঁট দ্বারা বেদম প্রহার করে। আমরা চিৎকার বা কান্নাকাটি আরম্ভ করিলে আরও বেশী বা জোরে আঘাত করে। এইভাবে আমাদেরকে ৫/৭দিন অত্যাচার ও শাস্তি দিতে থাকে। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে বুট দ্বারা লাথি মারে। তথাপি আমরা রাজাকার ও শান্তি কমিটি করিতে রাজী হই নাই।

আমরা কয়েকজন রাজাকারকে গোপনে কিছু টাকা দেওয়ার স্বীকার হইলাম। তারপর আমাদের নিকট হইতে ৫০০ টাকা লইয়া আমাদেরকে জুলুম ও অত্যাচার হইতে রেহাই দেয়। তারপর আমরা আর বাড়ী ঘরে থাকিলাম না।

দেশ স্বাধীন হইলে আমরা আমাদের বাড়ী ফিরিয়া আসি। বাড়ী ফিরিয়া দেখি বাড়ীর আসবাবপত্র রাজাকার ও হানাদার বাহিনীরা লুটতরাজ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্বাক্ষর/-
ছালেহু আহমদ

\ ২৫৩ \

মোঃ আব্দুল হাদি
গ্রামঃ- পূর্ব চর চান্দিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী যখন সোনাগাজী থানা এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দখল করিয়া বসিল তখন আমি আমার পরিবারসহ সোনাগাজী থানার পূর্ব চর চান্দিয়া গ্রাম হইতে আত্মরক্ষার জন্য দূরবর্তী আত্মীয় বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া প্রায় এক মাস অতিবাহিত করি। কিন্তু মুক্তি বাহিনীরা হঠাৎ করে প্রবল আক্রমণ চালাইয়া সোনাগাজী থানা শত্রুমুক্ত করে এবং পাক বাহিনীদের ও রাজাকারদের বিতাড়িত করে। এইভাবে মুক্তিবাহিনী প্রথমে উক্ত সোনাগাজী থানা শত্রুমুক্ত করে। তখন আমি আমার আত্মীয় বাড়ী হইতে পরিবারসহ আমার নিজ বাড়ীতে আসি। বাড়ীতে কয়েক দিন অবস্থানের পর পাক বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী চারিদিক হইতে সোনাগাজী থানায় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘেরাও করে এবং প্রবল আক্রমণ চালায়। এই প্রবল আত্রমণের সম্মুখে মুক্তিবাহিনী নাজেহাল হইয়া পড়ে এবং সোনাগাজী থানা ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষা জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং পাক ও রাজাকার বাহিনী সোনাগাজী থানা দখল করে। সোনাগাজী থানা দখল করার পর থানার পাশ্ববর্তী গ্রামগুলি তল্লাশী চালাইয়া মুক্তি বাহিনীদের বাহির করার জন্য তাহারা ছড়াইয়া পড়ে।

৫ই রোজার দিনে রাজাকার ও পাক বাহিনী পূর্ব চর চান্দিয়া গ্রামে প্রবেশ করে। পূর্ব চর চান্দিয়া গ্রামের জনসাধারন প্রাণের ভয়ে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করে। আমিও পাক বাহিনীদের আসা দেখিয়া বাড়ীর পুরুষ মানুষ সব বাড়ী ছাড়িয়া আত্ম রক্ষা করি। পাক হানাদার বাহিনীরা যুবক ছাত্র দেখিলে মুক্তিযোদ্ধা বলিয়া সন্দেহজনকভাবে গুলি করিয়া হত্যা করে। কিন্তু আমার বাড়ীর পরিবারবর্গ বাড়ী হইতে বাহির কারবার সময়টুকু পাই না। তাই বাড়ীতে নিজের স্ত্রীকেও ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়ি। তারপর বাড়ীর কোন খোঁজখবর লইতে পারি নাই। পাক হানাদার বাহিনীরা বাড়ী তল্লাশী করিয়া চলিয়া গেলে বাড়ী রওয়ানা হই। বাড়ী গিয়া দেখি যে আমার স্ত্রী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। পাশে আমার মা তাহার মাথায় পানি ঢালিতেছেন। আমিও আসিয়া মাথায় পানি ঢালি। আমার স্ত্রীর জ্ঞান ফিরিয়া আসে। তারপর আমার স্ত্রীকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করি। আমার স্ত্রী আমাকে কয়েকজন রাজাকার ও ৩জন পাক বাহিনী আমাদের বাড়ীর মধ্যে ঢোকে এবং বাড়ীর আনাচে-কানাচে খোঁজাখোঁজি আরম্ভ করে। তখন আমি আমার মার হাত ধরিয়া বাড়ীর পিছনে ঝোঁপের আড়ালে দাড়াইয়া আছি। রাজাকার ও পাক হানাদার বাহিনীরা আমাদের ঘরের মধ্যে তন্নতন্ন করিয়া তল্লাশী করে ও বাড়ীর পিছনে যায় এবং আমার মাকে প্রথমে দেখিতে পায় এবং পরে আমাকেও দেখিয়া ফেলে। প্রথমে একজন পাক হানাদার আমার মার হাত হইতে আমাকে ছিনিয়া আনে এবং জোর পূর্বক টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া যায়। আমার মা অনেক অনুরোধ ও কান্নাকাটি করিতেছেন। আমি অনেক অনুনয় বিনয় ও চিৎকার করিতেছি কিন্তু কিছুতেই পাক হানাদার বাহিনীরা আমার এবং আমার মার কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। বরং আমার মাকে ঘর হইতে রাহির করিয়া দরজা আটকাইয়া দিল এবং দুইজন পাক হানাদার বাহিনী দরজায় পাহারা দিতে লাগিল। প্রথম জন আমাকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল এবং আমাকে অমানুষিক উপায়ে আমার শরীরের উপর দৈহিক নির্যাতন চালাইল। এইভাবে পরপর তিনজন নরপশু আমার শরীরের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন করে এবং পরে জ্ঞান হারাইয়া গেলে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। এই ভাবে আমাকে দুইবার আমার শরীরের উপর নিমর্মভাবে পৈশাচিক উপায়ে অত্যাচার করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আব্দুল হাদি।

\ ২৫৪ \

আলেয়া বেগম
গ্রামঃ- বাঘেরিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী সোনাগাজী ও মতিগঞ্জে শিবির স্থাপন করিয়া স্থানীয় দালাল ও রাজাকারদের সহায়তায় শিবিরের আশপাশের গ্রামগুলি আক্রমণ করিত। হঠাৎ গ্রামে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন লুন্ঠন করিত এবং অসহায় নারীদের উপর চালাইত নির্ন্মম অত্যাচার। পাক বাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে উক্ত এলাকার প্রায় সকল যুবক- যুবতীগণ নিজ বাড়ী ছাড়িয়া কেহ ভারতে এবং অন্যেরা সুদূর গ্রামে আত্মীয়-পরিজনের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

জুন মাসে পাক বাহিনী সোনাগাজী দখল করিলে আমি আমার স্বাধীন বাড়ী ত্যাগ করিয়া সূদুর পল্লীর গ্রামে পালাইয়া ছিলাম। আগষ্ট মাসে আমি নবজাত সন্তান প্রসব করি। সন্তান প্রসবের দুই মাস পর শরীর অসুস্থ থাকায় পিতার বাড়ী হইতে স্বামীর বাড়ী বাঘেরিয়ায় আশ্রই নেই। তখন আমার স্বাস্থ্য অত্যান্ত দূর্বল ছিল। আমি তখন নিয়মিত ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিতাম।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পাক বাহিনী, দালাল , রাজাকার আল-বদর ও আল শামসের অত্যাচার খুব বৃদ্ধি পায়, পাক বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করার সংবাদ গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে আত্মগোপন করিতাম। নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে পাক বাহিনী ও মিলিশিয়া আমার স্বামীর বাড়ী আক্রমণ করে। পাক বাহিনীরা আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং হাত হইতে আমার নবজাত সন্তানকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেখানেই পশুর মত অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। অনুমান ৪-৫ জন নরপশু আমার অসুস্থ দেহের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া আমাকে জ্ঞানহীন অস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যায়। পরে আমার স্বামী অন্যান্য আত্মীয়স্বজন স্থানীয় ডাক্তারের সহায়তায় আমার জ্ঞান ফিরাইয়া আনে।

স্বাক্ষর/-
আলেয়া বেগম

\ ২৫৫ \

এডভোকেট সুরেন্দ্র চৌধুরী
জিন্দাবাজার, সিলেট

২৬শে মার্চ ভোর বেলা হইতেই পাক বর্বর হায়েনার দল সিলেট শহরে কার্ফিউ জারি করে। মাঝে মাঝে জন সাধারণের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের জন্য সময় দিত। কিন্তু ৪ঠা এপ্রিল রোজ রবিবার হইতে কার্ফিউ আরো জোরদার করা হয়। এই সময় তাহারা এমনও করিত যে অনবরত তিন দিন পর্যন্ত কার্ফিউ জারি করিয়া রাখিত।

৪ঠা এপ্রিলে তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংকের সিলেট শাখার কর্মরত পুলিশের সহিত আলাপ হয়। তাহাদের মনে পূর্ব হইতেই এই সন্দেহ জাগিয়াছিল যে হায়েনার দল ব্যাংক লুট করিতে পারে এবং তাহাদেরকে হত্যা করিতে পারে। তাই তাহারা আমাকে বলে যে যদি পাক বাহিনী আমাদের আক্রমণ করে তাহা হইলে আপনি আমাদেরকে আশ্রয় দিবেন। আমি তখন তাহাদের এই আশ্বাস দেই যে, তোমরা যদি বিপদে পড়িয়া আমার বাসায় যাও তাহা হইলে আমি তোমাদের আশ্রয় দিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দিন বেলা ১ ঘটিকার সময় উক্ত ব্যাংক প্রহরীদেরকে বদলি করিয়া অন্য জায়গায় পাঠায় এবং সেখানে অন্য একটি প্লাটুন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ন্যাশনাল ব্যাংক অফিসটি আমার বাড়ী হইতে প্রায় একশত গজ দূরে। ঐ দিন বেলা তিন ঘটিয়ার সময় পাক সৈন্য ভর্তি তিন খানা ট্রাক ও ৪ খানা জীপ ব্যাংকের সামনে দাঁড়ায়। তারপর ট্রাক হইতে প্রায় ৫০ জন পাক সৈন্য ব্যাংকের চারিদিকে পজিশন নেয়। বাকী কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া ব্যাংকের উত্তর দিকে লোহার তার নষ্ট করিয়া ফেলে। পর মূহূর্তেই তাহারা ব্যাংকের ভিতর প্রবেশ করে। উক্ত সময় প্রহরারত পুলিশগণ চিৎকার করিতে থাকে। তখন বর্বর বাহিনী প্রহরারত পুলিশদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের অস্ত্রগুলি নিজেদের হস্তগত করে। বিকাল ৪ ঘটিকার সময় কার্ফিউ জারি করিয়া ব্যাংক হইতে প্রায় ৬-৭ বস্তা টাকা ট্রাকে উঠাইয়া লইয়া যায়। উক্ত দিনে ৪৮ ঘন্টা কার্ফিউ থাকায় জনগণ বাহির হইতে পারে নাই। তাই অনেকেই টাকা নেওয়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

স্বাক্ষর/-
সুরেন্দ্র চৌধুরী
১৩.৯.৭৩

\ ২৫৬ \

ডাঃ আব্দুল লতিফ
গ্রামঃ ছিরামিসি
থানাঃ বিশ্বনাথ
জেলাঃ সিলেট

৩১ আগষ্ট রোজ মঙ্গলবার সময় ৯ ঘটিকার সময় আনুমানিক ১৫ জন পাক সৈন্য ও সমপরিমাণ রাজাকার ছিরামিসি বাজারে আসে। তাহার পূর্বে ঐ বাজারে পাক সৈন্য আসে নাই। রাজাকার কমাণ্ডার স্কুলের শিক্ষক, পোষ্ট অফিস ও তহশীল অফিসের কর্মরত লোকজন সকলেই ছিরামিসি হাইস্কুলে যাইবার জন্য আদেশ দিল। সেখানে শান্তি কমিটি গঠন করা হইবে। নিরীহ জনগণ ভয়ে বিদ্যালয় উপস্থিত হইল। কয়েক মিনিট আলাপ- আলোচনার পর পাক বাহিনী ছিরামিসি এলাকার লোকদিগকে একদিকে এবং সরকারী কর্মচারী ও বাহির হইতে আগত লোকদের অপর পার্শ্বে বসাইল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে দুইভাগে দুই জায়গায় নিয়া যায়। আমি ঐ জায়গায় প্রায় ৭ বৎসর যাবৎ ডাক্তারী করিতেছি। সরকারী কর্মচারীসহ আমাদের বহিরাগত ২৬ জনকে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিসে নিয়া শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে এবং আমাদিগকে পাশ্ববর্তী থানা জগন্নাথ পুর নিয়া ছাড়িয়া দিবে বলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া নৌকায় লইয়া যায়। অপরদিগকে পার্শ্ববর্তী ছিরামিসি গ্রাম ও বাজারের ৩৭জনকে বাঁধিয়া অপর গ্রামের দিকে নিয়া যায়। আমাদের ২৬ জনকে নৌকাযোগে কচরাকেলী গ্রামে নিয়া যায়। সেখানে আমাদিগকে পুকুরের পাড়ে কিছু পানির মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। ঐ সময় আমাদের হাত পিছনের দিকে শক্তভাবে বাঁধা ছিল। দুই দিক হইতে পাক বাহিনী ও রাজাকার গুলি করিতে থাকে। আমি হাতে ও পায়ে গুলিবদ্ধ হইয়া পুকুরের পানিতে ডুব দেই। বহু কষ্টে পুকুরের অপর পাড়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শহীদ লোকদের পার্শ্বে আসি। সেখানে প্রত্যেককে ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখি সকলেই নরপিশাচদের গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করিয়াছে। অপর দিকে ছিরামিসি এলাকার ৩৭ জনকে মাঠে নিয়া অনুরূপ অবস্থায় গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। আমি আহত অবস্থায় অপর গ্রামে গিয়া আশ্রয় নেই। সেই দিন যাহারা শহীদ হইয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

আব্দুল বারিক মেম্বার, আব্দুল লতিফ, সুন্দর মিঞা, তহশীলদার ও তাহার দুই ছেলে, পোষ্ট মাষ্টার ছিরামিসি বাজার, ছিরামিসি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, ছিরামিসি প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক একজন, নজীর আহমদ, একলাস মিঞা, মজীদ উল্লা, দবীর মিঞা, রুসমত উল্লাহ, তৈয়ুব আলী, মোসাদ্দের আলী ও অন্যান্য। ৩১শে আগষ্ট পাক বাহিনী ও তাহাদের অনুচরগণ ৬৩ জন নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর ছিরামিসি বাজার ও গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় ও মা-বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে।

স্বাক্ষর/-
আব্দুল লতিফ

\ ২৫৭ \

আকাদ্দাস সিরাজুল ইসলাম
থানাঃ বিয়ানীবাজার
জেলাঃ সিলেট

পাক বাহিনী একমাত্র বিয়ানী বাজার থানার পশ্চিম পার্শ্বের এক টিলায় ১৭২ জন নিরীহ লোককে নিম্মর্মভাবে হত্যা করে। আজও সেখানে বহু কঙ্কাল পড়ে আছে। একমাত্র সুপাতলা গ্রামে মনোরঞ্জন ঘোষের পরিবারে ১৩জন লোককে গুলি করিয়া হত্যা করে। নিম্নে কিছু শহীদের নাম দেওয়া হলোঃ

একই পরিবার ভুক্ত শহীদরা হলেনঃ

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ-৪৩ (সপাতলা), হিরনবালা ঘোষ-৩৭ (ঐ), মুকুল রঞ্জন ঘোষ-১৮ ছাত্র (ঐ), অমিতারাণী ঘোষ-৯(ঐ), ক্ষেত্রময়ী ঘোষ-৬৮(ঐ), সীতাবালা ঘোষ-৫(ঐ), উমানন্দ ঘোষ-৬৫(ঐ), চারুবালা ঘোষ-৫০(ঐ), মহানন্দ ঘোষ-৫০(ঐ), নিখিল চন্দ্র ঘোষ-১২(ঐ), কৃষ্ণ মোহন ঘোষ-১০(ঐ), বীরেন্দ্র কুমার ঘোষ-৪২(ঐ), নরেশ চন্দ্র ঘোষ-৫৮(ঐ), কমর উদ্দিন-৩৮ (মাথিউরা), মোঃ মিছির আলী-৩০ (সুপাতলা), মোঃ ছলু চৌকিদার-৪৪(দুবাগ), মোঃ আব্দুল হাছিম-২৫ (মাথিউরা), মোঃ আব্দুল লতিফ-১৩(ঐ), গুরুপ্রসন্ন দাস-৭২(জলডুপ কিসমত), শ্রী রাধারামন দাস-৭০(জলডুপ-বড়গ্রাম), শ্রীমাণ দাস-৬২(ঐ), মোঃ জামাল উদ্দিন -২২(খসির কসবা, মোঃ মকদ্দস আলী-৫০, ইর্সাদ আলী-৩০(সারপার), আরব আলী-১৬ (ঐ), মোঃ ইউসুফ আলী-৩৫ (নয়াগ্রাম), নজির আলী-৩৬(ঐ). মোঃ তজিদ আলী-৩০(পুন্নারাই), মোঃ আয়ুব আলী-৩৮(ছাতলপার), মোঃ আব্দুল রউফ-৩৫(ইমামপুর),মোঃ আঃ মুহিত-১৮ (মাইজ কাপন), মোঃ আব্দুস সাত্তার-২০(বাড়ুদা), আব্দুল গফুর-২৫(ঐ), মোঃ রাতিবুর রহমান চৌঃ-২০ (ঐ), মোঃ মুস্তফা উদ্দিন-২৫ (ঐ), মোঃ রকিব উদ্দিন-২৫ (আষ্টগরি), আব্দুল লতিফ-৪০ (ঐ), রাইয়ব আলীর স্ত্রী-২২(ঐ), রাইয়ুব আলীর মেয়ে-৭ (আষ্টগরি), তৈয়ব আলী-৩৫ র(তাজপুর), আঃ খালিক -১৮ (ঐ), মুজাম্মিল আলী-৩৫ (বড়ুদা), মোঃ মিছির আলী-৪৫(ঘুঙ্গাদিয়া), মোঃ মনোহর আলী-৪০(ঐ), মোঃ আকবর আলী-৩৫(ঐ), মোঃ গোলাম ছরওয়ার-৪০(সারপার), মোঃ ওয়াতির আলী-৪০ (পাথারি পাড়া), আয়রুন বিবি-২ (ছফলা), মোহাম্মদ ইয়াজ-৭২ (চুড়খাই), মনোহর আলী (ঘুঙ্গাদিয়া)।

স্বাক্ষর/-
আকাদ্দাস সিরাজুল ইসলাম
২৪.৯.৭৩

\ ২৫৮ \

আব্দুস সোবাহান
সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)
শ্রীমঙ্গল, সিলেট

ডাক বাংলায় থাকা অবস্থায় আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করা হয়। আমি প্রাণভয়ে সব প্রশ্নের উত্তরে কিছুই জানি না উত্তর দিতে থাকি। এতে আমার উপর অত্যাচার শুরু হয়। চড়, লাথি এবং ডাণ্ডা পিটা হয়; কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছু না পাওয়ায় আমাকে ওয়েলফেয়ার বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে দেখতে পাই পাক জান্তারা বাঙ্গালীদের চক্রীর সাথে বেঁধে চক্র ঘুরিয়ে বেত দিতে থাকে। রাইফেলের অগ্রভাগ দিয়ে গুঁতো মারতে থাকে। রাত্রে কোথায় নিয়ে যায় এবং গুলি করে মারা শব্দ শোনা যায়। পরে জেনেছি শ্রী মঙ্গলস্থ সাধু বাবার থলি নামক স্থানে গণহত্যা করা হতো। বুট দিয়ে মানুষকে লাথি দেওয়া হতো। জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে শরীরে ফোস্কা তোলা হতো। এই রকম অত্যাচারের প্রক্রিয়া দেখে আমি প্রাণভয়ে আল্লাহর কাছে প্রাণভিক্ষা করতে থাকি। কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় ১২মে ১৯৭১ সন পর্যন্ত থাকি এবং আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করা হয়। তন্মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল '' তুমলোগ কা মেজর কর্ণেল ক্যাপ্টন কিদর হ্যায়?'' আমি বলতাম আমি জানি না (অবশ্য উর্দুতে উত্তর দিতাম)। তারপর যখন আমি অসহ্য হয়ে যাই তখন আমি বললাম, হাম সরকারী দপ্তর তথা ইউনিয়ন কাউন্সিল কা মেকানিক হ্যায়, হাম কভি মুক্তি মে নেহি খা ইছলিয়ে হাম কোছ নেহি জান্তা হায়।'' এটা শোনার পর ক্যাপ্টেন তারেক আমাকে আমার উপরস্থ কর্মচারীর সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করলে আমি বল্লাম পারব। তখন আমাকে ২জন সিপাহী দিয়ে সি, ও (রেভ) যিনি তখন সি,ও (ডেভ)- এর দায়িত্ব পালন করতেন তার কাছে পাঠায় এবং তার কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনলে ১৪ইমে ১৯৭১ইং তারিখে আমাকে পুনরায় কাজে যোগদান করব বলে স্বীকারনামা লিখিয়ে নিয়ে ছাড়ে এবং পরে হেঁটে হেঁটে ১০ মাইল দুরে রাজঘাট ইউনিয়নে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আমি প্রাণ ভয়ে পায়ে হেঁটে রাজঘাট পৌছি। কিন্তু রাজঘাট গিয়ে আমার নিস্তার হয় নি। কারণ আমাকে শ্রীমঙ্গল থেকে কোন রিলিজ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। তাই আবার সিন্দুরখান ক্যাম্পে আটক করা সেখানে শ্রীমঙ্গলের সাথে যোগাযোগ করার পর আমাকে ছাড়ে।

সেখানে যাওয়ার পর দেখলাম কোথা হতে বাঙালী লোক এনে বাসবাড়ী নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করে এবং মানুষকে বেঁধে ডাণ্ডা দিয়ে পিটাতে থাকে।

এই সমস্ত অত্যাচারের মধ্যে যেটা আমার কাছে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ আমি রিলিজ হওয়ার ২ মাস পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সনের জুন মাসের শেষ দিকে রাজঘাট থেকে শ্রীমঙ্গল যাচ্ছিলাম। আমি ক্যাপ্টেন মুতালিব সাহেবের জীপে যাচ্ছিলাম এবং তার ড্রাইভার আমার সাথে ছিল। আমরা কুনদড়া বাগানে যাওয়ার পথে দেখলাম কুনদড়া বাগানের পতিবরের উত্তরের পুলের উপরে কয়েকজন মিলিটারী এবং এই মিলিটারীরা একজন শ্রমিককে একটি গাড়ির পিছনে বেঁধেপ্রায় ৩০ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়ি এবং আর শ্রীমঙ্গল যাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করি। লোকটিকে গাড়ির পিছনে বেঁধে টানায় তার শরীরের সমস্ত চামড়া উঠে যায়। এই অবস্থা দেখে আমরা আবার রাজঘাট ফিরে চলে আসি। অবশ্য শেষে শুনেছি লোকটা বেঁচেছে। লোকটাকে এভাবে অত্যাচারের কারণ পরে জেনেছি। পূর্ব রাত্রে মুক্তিবাহিনী কুলাউড়া পুল ভাঙ্গাং এ অত্যাচার তাকে করা হয়েছে। কারণ সে কুলাউড়া বাগানের প্রধান নেতৃস্থানীয় শ্রমিক।

নানা স্থানে পাক সেনারা মেয়ে-ছেলেকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করেছে শুনেছি, তবে স্বচক্ষে দেখিনি। ঐ সময় পাক সেনারা শ্রী মঙ্গল শহরে নেতৃস্থানীয় লোকদের বাড়ী জ্বালাতে থাকে এবং বাড়ীস্থ সকল মালামাল লুট করে নিতে থাকে। অবশ্য তাদের লুটের পর বাঙালী লোভীরা তাদের উচ্ছিষ্ট কিছু কিছু জিনিস লুট করে নেয়।

পাক বাহিনীর অত্যাচারে লোক গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, শহর থেকে গ্রামে গ্রামে হেঁটে স্ত্রী-পুত্রসহ পলায়ন করে। কিন্তু সেখানেও রেহাই নেই। পাক সেনারা গ্রামে ঢুকে সকল ব্যক্তিদেরকে ধরে মারধর করত ও তাদের কাজ করাত। রাত্রে মুক্তিবাহিনী যাতে না আসে এজন্য কড়া পাহারা দেওয়াত। যারা পাহারায় ছিল তারাই রক্ষা পেয়েছে, বাকী যারা পাক সেনারা কবলে পড়েছে তারা ফিরতে পারেনি।

স্বাক্ষর/-
আব্দুস সোবাহান।

\ ২৫৯ \

সামসুদ্দীন আহমদ
বুকিং ক্লার্ক
শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে ষ্টেশন
সিলেট

২১শে মে তারিখ শ্রীমঙ্গলের পথে গাড়িতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারপর পায়ে হাঁটিয়া প্রায় ৩৫ মাইল অতিক্রম করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন রশিদপুর ২২ তারিখ আশ্রয় নেই। সেখানে পৌঁছিয়াই আমরা বিপদে আসন্ন বলিয়া আভাস পাইতে থাকি। আমাকে নাকি শ্রীমঙ্গলে পাক হানাদার বাহিনী খোঁজাখুঁজি করে । আমার আর সামনে পা দেওয়া উচিত নহে বলিয়া রশিদপুরস্থ রেলওয়ে কর্মীবৃন্দ হঁশিয়ার করে। এত দূর আসিয়া বাসা বা পুরাতন ভৃত্যের সন্ধান মিলিবে না বুঝিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। একটা ট্রেন শ্রীমঙ্গল অভিমুখে যাইতেছে দেখিয়া (২৩.৫.৭১ তাং) উঠিয়া পড়ি এবং পরবর্তী ষ্টেশন সাতগাঁ যাইয়া নামিয়া পড়ি। সেখান হইতে সরাসরি আমার ষ্টেশন শ্রীমঙ্গলে কথা বলার সুযোগ পাইয়া সহকর্মী এবং ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবের সাথে কর্থাবার্তা বলিয়াছিলাম। আমি ও দিনের ক্লান্ত দেহে খাইয়া অনেকটা কাহিল হইয়া পড়ি এবং ষ্টেশন বিল্ডিং কক্ষে বিশ্রাম করিতে ছিলাম।

বেলা তখন হয়তো বা আড়াইটা। আতর্কিতে আমার সামনে বিভিন্ন ভারী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হানাদার বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও তিনজন সৈনিক উপস্থিত এবং আমার নাম ধরিয়া সন্ধান জানিতে চাহে। তখন আমার মুখে কথা সরিতে ছিল না, মনে হইতেছিল যেন আমার পায়ের নিচের মাটি সরিয়া যাইতেছে। ক্ষণেকের মধ্যে ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবও আসিয়া উপস্থিত এবং আমারই নাম সামসুদ্দিন আহমদ শনাক্ত করিলে ক্যাপ্টেন আমাকে তাহাদের অনুসরন করিতে বলে। কয়েক কদম যাইয়াই তাদের জীপে উঠাইয়া আমাকে একটা বড় রকমের আসামি হিসেবে ঘিরিয়া রাখে। আধ ঘন্টার মধ্যে তাহারা আমাকে শ্রীমঙ্গল ওয়াপদাস্থ তাহাদের সামরিক আইন হেড কোয়ার্টারে নিয়া আসে।

আমাকে প্রথম লেফটেন্ট্যান্ট আতাহারের নিকট হাজির করিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করেন। তাহার জিজ্ঞাসাবাদের সংক্ষিপ্ত বিষয় ছিল চাকুরীতে যোগদান করি নাই কেন, কয়জন অবাঙালী হত্যা করিয়াছি, সদ্য ভারত হইতে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়া আসিলাম কি না। মুক্তিবাহিনীর লোক কাহারা, তাহাদের কি পোষাক, তা ছাড়া শ্রীমঙ্গল ষ্টেশনের তৎকালীন অবাঙালী ষ্টেশন মাষ্টার আখতার ও তাহার ছেলেপেলে কোথায়, তাদের আমি হত্যা করিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে নাকি সরাসরি হত্যার অভিযোগ আছে। তা ছাড়া তিনি আমাকে কয়েকজন সমাজকর্মীর নাম-ধাম, তাহাদের আচার-ব্যবহার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া অন্য রুমে চলিয়া যান।

একজন সৈনিক আসিয়া আমাকে কর্কশ স্বরে তাহার সহিত যাইতে বলে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত গেলাম। একটা রুমে নিয়া আমাকে বসিতে বলিল। চতুর্দিকে কেবল গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর কিছু নাই। আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া একজন বিকট চেহারাধারী সৈনিক বলিল যে, ‘‘যব এক দফে শের কা চক্কর মে আগিয়া আর যানা কাহা হ্যায়’’। কয়েক মিনিট পর আমাকে সেই বিল্ডিং হইতে ২-৩ মিনিটের রাস্তা দূরে অন্য এক বিল্ডিংয়ের ত্রিতলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমার সুপরিচিত একজন বাঙালী পুলিশের লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সেই বাঙালী লোকটা ২-৩জন হানাদার বাহিনীর লোক আমাকে মাটিতে বসিবার আদেশ দিয়া প্রশ্নবানে জর্জরিত করিয়া তোলে। ধমক দিতে থাকে, আর বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া প্রায় দুই-আড়াই ঘন্টা সময় ব্যয় করে। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, তখন আমাকে পার্শ্বস্থ একটা কামরায় ঢুকাইয়া বাহির হইতে তালাবদ্ধ করিয়া দিল। তখন আমার মানসিক অবস্থা কি তাহা আজ আর আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি

না। আটকাবস্থায় পড়িয়া প্রথমেই আমার স্মরণ পড়ে আমার সর্বকনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী পারভিনের কথা। তারপর একে এক প্রতিটি সন্তান ও স্ত্রীর কথা। ক্রমে জীবনের স্মরনীয় মুহূর্তের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি আমার চোখের সামনে সিনেমার মত ভাসিয়া আসিতে থাকে।

আরও দুইজন ভদ্র লোককে সেখানে কয়েদি হিসেবে বন্দি দেখিলাম। একজনকে ভাল করিয়াই জানি, আর একজন আমার অপরিচিত। সন্ধ্যার লগ্নে আমাদের জন্য আটার রুটি ও ডাল দিয়া গেল। সাথের ঐ দুই ভদ্রলোক কয়েকদিন হইতে অভ্যস্থ বলিয়া ডাল-রুটি খাইল, আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর হইল না। দুদিন পায়ে হাঁটিয়া এবং তৃতীয় দিনে আটকা অবস্থায় আমার শারীরিক অবস্থা একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

রাত্র অনুমান আটটার দিকে দুজন সৈনিক আমাকে অন্য কক্ষে নিয়া যায় এবং আবার কেন চাকুরীতে যোগদান করি নাই, মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিয়াছি, কয়েকজন অবাঙালী হত্যা করিয়াছি ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া শাসাইতে আরম্ভ করে। জিজ্ঞাসাবাদ যাহারা করিতেছিল তাহাদেরকে জল্লাদ বলিলেও যথেষ্ট হইবার নহে। লাঠি দ্বারা ধাক্কা দেয়, সত্য কথা না বলিলে জীবনে এখনই শেষ করিয়া দিবে বলিয়া হুঁশিয়ার করিতে থাকে। তাহাদের মনমত কোন কথাই আমার কাছ থেকে পাইতেছে না মনে করিয়া তাহারা আমার প্রতি ভীষণ চটিয়া যায়। হাত দুই লম্বা লাঠি দ্বারা আমাকে বেদম প্রহার করিতে থাকে। জীবনে কোন কারণে কোন অবস্থায় এমন শারীরিক- মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। তাহাদের মারের চোটে আমি কখন কি অবস্থায় সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলি বলিতে পারি না। ভোর বেলা দেখি আমি প্রথম যে রুমে ঢুকি সেখানেই শায়িত। মার খাওয়া জায়গাগুলো কালো ও ফুলিয়া রহিয়াছে, হাত দিয়া ছুঁইতে পারি না। রাত্রে যে রুমে নিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার চর্তুদিকের দেওয়ালে রক্তের দাগে ঐ রুমটা যে জল্লাদের নির্যাতন কক্ষ তা বুঝিতে আমার বাকী ছিল না। প্রত্যুষে তালা খুলিয়া আমাদেরকে পায়খানাপ্রসাব করার জন্য নিকটস্থ খালের পাড়ে নিয়া গেল। সেখানে পৌঁছিয়া আমার ৮-১০ জন কয়েদি হইলাম, ইহাদের মধ্যে অনেকেই আমার মত অচল প্রায়, কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না। কথা বলা ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এক সাথে সকলকে কোন পর্দ্দার ব্যবস্থা ছাড়া লাইন করিয়া বসাইয়া দিল পায়খানা করিতে। কে পায়খানা করিল জানি না। আমার তো পায়খানা- প্রসাব কিছুই হইল না। তা ছাড়া আমি দুদিনের উপবাসী। ২-৩ মিনিটের মধ্যে পায়খানা-প্রসাব ও খালে পানি খরচ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিতে হয়। বন্দুকধারী সৈনিক ও হাওয়ালদার দুইদিকে দণ্ডায়মান।

আবার আসিয়া যার যার রুমে স্থান লইতে হইল। একটা পুরি ও এক কাপ চা খাইতে দেওয়া হইল। দুপুরে আটার রুটি আর ডাইল। শরীরে জ্বর, কিছুই খাইতে পারি না। মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবার - পরিজনদের কথাই মনে পড়িত। বিপদে পড়িয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামই আহার-বিহারে সম্বল করিয়া লইলাম। বিকালে আবার ডাইল-রুটি দিল। ভাতের নাকি ব্যবস্থা নাই, তাই ভাতের কথা উচ্চারণ করিবার সাহসও হইল না।

আমাদিগকে যে রুমে রাখিল তাহার দুদিকে বন্দুকধারী সৈনিকরা পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শুইয়া থাকে। আমাদের দিকে তাহারা প্রকারান্তরে খুব খেয়াল করিত। আমরা কি বলি না বলি তাহা শুনিতে চেষ্টা করিত। জানালায় এক প্রকার কালো তার জড়ানো ছিল, তাহাতে আমাদের মধ্যে হইতে যেন তাহারা টেপ করিয়া রাখিয়াছে। জনমানবশূণ্য এলাকায় আমার ছিলাম, রোজই বিভিন্ন চেহারার সৈনিক আসিয়া তালা খুলিয়া দিলে কয়েদি হিসাবে আমাদের সহিত ঠাট্টা-চাতুরী করিত। কোথায় তোমাদের শেখ সাহেব, কোথায় বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি বলিয়া ব্যঙ্গ করিত। আর লম্বা লাঠি দ্বারা গুঁতা দিয়া জনোয়ার ইত্যাদি বলিত। কেউ কেউ ধীরস্থির হইয়া আমদিগকে হিন্দুর গোলাম, হিন্দুর পয়দা বলিয়া গালি দিত।

একদিন আমাদের সাথের একজন লোক বেলা প্রায় ১১টার সময় পায়খানা করার জন্য অস্থিরভাবে প্রহরারত সৈনিককে মিনতি করিত লাগিল। এমন সময় একজন সুবেদার মেজর আসিল। কর্মরত সৈনিক লোকটার পায়খানার কথা জানায়। তাদের ভাষায়- তারা কি বলিল জানি না। তাহাকে ২-৩ জনে পায়খানা করাইবার

মানসে নিয়া বাহির হইল। উপর হইতে আমরা নজর করিয়া দিখিলাম যে, তাহার হাত রশি দ্বারা বাঁধিয়া আগে- পিছে সৈনিক তাহাকে খালের পাড়ে নিল এবং গুলি করিয়া তাহাকে খতম করিয়া তাহারা ফেরত চলিয়া আসিল। এমনিভাবে প্রতিদিন ২-১জনের মৃত্যু দেখিয়াছিলাম। ক্যাম্পের মধ্যে তাজা কুকুরে ভর্ত্তি ছিল। এই অসংখ্য কুকুর খালের পাড়ে মানুষের তাজা রক্ত খাইয়া দিনে বেশ মোটা- তাজা হইত। আর সৈনিকরা মানুষের সাথে কুকুরও গুলি করিয়া হত্যা করিত।

দুই- এক দিন ফাঁক দিয়াই তাহারা ঐ জল্লাদ খানায় নিয়া আবার নির্যাতন করিত। এমনিভাবে বিভিন্ন উপায়ে আমাকে শারীরিক অত্যাচার আজ চির রোগা করিয়া দিয়াছে। মারের চোটে শরীর হইতে রক্ত ছিটিয়া পড়িত। ক্ষণে ক্ষণে বেহুঁশ হইলেও তাহারা রেহাই দিত না। তিন/চার দিন তাহারা আমাকে দিয়া লিখিত জবানবন্দি নিয়াছে। ২-৩দিন কথিত লেফটেন্যান্ট আতাহারের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহাকে সাহস করিয়া আমার মুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া বলিত, ‘‘সবুর কর, কুই তকলিফ তো নেহি দ্যা রাহা’’।

একদিন রাত্র অনুমান ৯টার সময় দুজন বন্দুকধারী সৈনিক আসিয়া বিশেষ করিয়া আমাকে খুব শাসাইতে লাগিল। আমি নাকি মুক্তিবাহিনীর পৃষ্ঠপোষক ও কয়েকজন অবাঙালী লোককে হত্যার ব্যাপারে অঙ্গাঙ্গিভাবে নির্যাতন চালাইয়া একেবারে অচল করিয়া ফেলে। কর্তব্যরত সৈনিক আমার প্রতি খানিক সদয় থাকাতে আমাকে আবার আমার রুমে আনিয়া রাখিয়া যায়। আমাকে মারিয়া ফেলিবে এই ভাবিয়া আমার সঙ্গী ৮-১০ জন কয়েদি আমি ফিরিয়া দেখি তাহারা কাঁদিতেছে আর কলেমা পড়িতেছে ও দুরুদ পাঠ করিতেছে। আমাকে ফেরত পাইয়া তাহারা অনেকটা শান্তি লাভ করে। তাহারা হানাদারদের কথা বলিত না, আমার মাধ্যমেই তাহাদের হানাদারদের সাথে কথোপকথন হইত।

যেহেতু আমি নিদোর্ষ ছিলাম, কর্ণেল ফখরুল আলম আমাকে ডাকিয়া অনেক শাসাইল। কয়েক দফা গালি দিয়া আমাকে মুক্তির আদেশ দিল এবং কাজে যোগ দিবার জন্য একজন সুবেদার মেজরকে হাওলা করিয়া আমাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলে কোন মতে আমি নয় দিন থাকিয়া স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটি লইয়া শ্রীমঙ্গল হইতে কাটিয়া পড়ি। পাক বাহিনীর হাতে আমি মোট ২১দিন বন্দি ছিলাম।

স্বাক্ষর/-
সামসুদ্দিন আহমদ
১৭.১০.৭৩

\ ২৫৯ \

মোঃ মাজেজুল ইসলাম
জেলা প্রশাসকের অফিস
কুমিল্লা

সংবাদ পাইলাম জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে পাক বাহিনী ধরিয়া নিয়া গিয়াছে। পরের দিন জেলা প্রশাসকের ব্যক্তিগত ড্রাইভার আমার বাসায় আসিয়া জেলা প্রশাসককে ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কবির উদ্দিন সাহেবের মর্মান্তিক সংবাদ জানাইল। পরে পরস্পর জানিতে পারলাম উভয়কে পাক সৈন্যরা গুলি করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করে।

৯ই এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী আমাকে বাসা হইতে ধরিয়া তাহাদের শিবিরে নিয়া যায়। বহু প্রকার প্রশ্ন করে। উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারায় আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখায় এবং সেনানিবাসে নিয়া যাইবার প্রস্তুতি নেয়। সেখানে তৎকালীন অবাঙালী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সুপারিশক্রমে জীবন ভিক্ষা পাই এবং অফিসে কাজকর্ম করাইতে বাধ্য করে।

সার্কিট হাইসে সন্ধ্যার পর গ্রাম ও শহরের আশেপাশে হইতে মা-বোনদিগকে ধরিয়া নিয়া আসিয়া নৃশংসভাবে অত্যাচার চালাইত। রাত্রে মা-বোনদের বিকট চীৎকার শুনিতে পাইতাম। হায় আল্লাহ, ধর্মের নামে, ইসলামের নামে এ কি অত্যাচার! পাক বাহিনীর এই নৃশংসতা দুনিয়ার অসভ্যতাকে হার মানাইয়াছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মাজেজুল ইসলাম

\ ২৬০ \

গোলাম রফিক
থানা- কসবা
জেলা-কুমিল্লা

পাক সেনারা ৩০০ জন লোককে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করে। তন্মধ্যে এই এলাকারান্তগর্ত চারগাছ গ্রামে ঘরের মধ্যে ৩৪জন লোককে গুলি করিয়া হত্যা করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামের জনৈক ব্যক্তি আখতার উদ্দিনের বাড়ীতে সন্ধ্যায় বিভিন্ন পর্যায়ের লোক এক সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজাকার এবং পাক সেনাদের পৈশাচিক উপায়ে নিরীহ জনসাধারণের বাড়ীঘর লুণ্ঠন, প্রজ্বলন, ধ্বংস ও বীভৎসতার সমালোচনা করিতে থাকে। কিন্তু রাজাকার এবং পাক সেনাদের শিবির উক্ত গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। ঘটনার বিবরণে আরও প্রকাশ যে, উক্ত সময়েই কয়েকজন রাজাকার এবং পাক সেনা পাহারায় রত ছিল। একজন রাজাকার গোপনে উক্ত বাড়ীর আড়ালে থাকিয়া তাহাদের নিন্দার কথা শোনে এবং সমস্ত বৃত্তান্ত পাক সেনাদের কর্ণগোচরে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন পাক সেনা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অতর্কিত ষ্টেনগান দ্বারা ঘরটি লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালায়। এই পৈশাচিক আক্রমণে যাহারা আত্মরক্ষার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকেই গুলির আঘাতে চির নিদ্রায় লুটিয়া পড়ে। মুমূর্ষু লোকদের উপরেও চললো বেয়োনেট চার্জ। ফলে ঘটনাস্থলেই ৩৪ জন লোক শাহাদাৎবরণ করেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হইলঃ (১) অশ্বিনী পোদ্দার, (২) মহানন্দ আচার্য্য, (৩) আব্দুল মিছির, (৪) মেথর ছামারিয়া, (৫) কাঞ্চন মিঞা।

ইহা ছাড়াও অত্র এলাকার ও অন্যান্য এলাকার ৩০জন লোককে সন্দেহবশতঃ জীবন্ত অবস্থায় মাটিচাপা দেওয়া হয়। মণিঅন্ধ গ্রামের জনৈক ব্যক্তি জনাব গোলাম শফিককে ঘরের মধ্যে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ফলে ঘটনাস্থলেই গোলাম শফিক সাহেব আগুনে পুড়িয়া মারা যান।

মগুড়া ইউনিয়নে এবং অন্যান্য এলাকা হইতে বহু মেয়েকে ধরিয়া আনিয়া পাক পিশাচরা নির্যাতন ও পাশবিক অত্যাচার চালায়। পাক সেনাদের এই পৈশাচিক ব্যবহারে এই এলাকার শতকরা ৯০ জন লোক দেশ ত্যাগ করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ গোলাম উদ্দিন

\ ২৬১ \

মোছাঃ চানুভান
গ্রাম- ফুলবাড়িয়া
থানা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া
জেলা- কুমিল্লা

আমি দরিদ্র পিতৃহীন অবিবাহিতা নারী। বিধবা মাতা একমাত্র সংসারের আপন পরিজন। আমার কোন ভাইবোন নাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইলে পাক বাহিনী পত্তন ইউনিয়নে শিবির স্থাপন করে। জুন মাসের শেষের দিকে পাক সৈন্য ও রাজাকারদের অত্যাচার ও নৃশংসতা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় রাজাকাররা গ্রামের ও ইউনিয়নের বহু ধনসম্পত্তি লুন্ঠন করে। জুলাই মাসের ১৭ তারিখ বানু মিঞা, সোনা মিঞা ও চাঁন মিঞা গভীর রাত্রে আমার নিজ বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া পাক বাহিনীর শিবিরে নিয়া যায়। আমাকে দেখিয়া পাক বাহিনীরা আনন্দে নাচিয়া ওঠে, আমার ক্রন্দন তাহাদের প্রাণে একটুও মায়ার সঞ্চার করে নাই। রাজাকাররা ধরিয়া নিবার সময় তাহাদের নিকট বহু আকুতি-মিনতি ও পায়ে জড়াইয়া পড়িয়াছি। উক্ত রাজাকারদের নিকট আমি যতই ক্রন্দন করিয়াছি, রাজাকারগুলি আমার সহিত তত বেশী অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছে।

পাঁচ দিন পাক নরপিশাচরা আমাকে তাহাদের শিবিরে ও বাঙ্কারে আটকাইয়া রাখে ও আমার দূর্বল দেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে ও মুক্তিবাহিনীর সংবাদ জানি কি না জিজ্ঞাসা করে। আমি মুক্তিবাহিনীর সম্বন্ধে জানি না বলিলে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করে। এই পাঁচ দিন তাহারা আমাকে গোসল করিতে পর্যন্ত দেয় নাই।

আমাকে ধরিয়া দিবার পরিবর্তে রাজাকারগণ পাক নরপিশাচদের হইতে প্রচুর মদ ও গ্রামে গ্রামে লুন্ঠন করার অনুমতি পাইয়াছিল। সৈন্যদের অত্যাচারে বহুবার আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেও দেখি ও অনুভব করি আমার দুর্ব্বল শরীরে অত্যাচার করিতেছে। সেই কথা ভাবিতে আজও আমার ভয় হয়।

আমাকে ১৭ই জুলাই গভীর রাত্রে রাজাকাররা ধরিয়া নিবার পর ১৮ই জুলাই আমার মা কেসবপুর গ্রামের মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার নজীর আহমদ সাহেবের নিকট আমাকে পাক শিবিরে ধরিয়া নিবার করুন সংবাদ বলিলে উক্ত মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার ২১শে জুলাই গভীর রাত্রে বহু মুক্তিযোদ্ধা নিয়া ফুলবাড়িয়া পাক সৈন্যদের শিবির ও বাঙ্কার আক্রমণ করেন। হঠাৎ আক্রমণে পাক বাহিনী ও রাজাকাররা আত্মসপর্মণ করে। আক্রমণের সময় তাহারা সকলে আমার উপর অত্যাচার করিতেছিল। মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা আমাকেসহ ১৪জন পাক সৈন্য ও তিনজন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়া যান। তাহারা আমার সম্মুখে রাজাকার ও পাক নরপিশাচদের জীবন্ত মাটি চাপা দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি ত্রিপুরা রাজ্য হইতে নিজ জন্মভূমি ফুলবাড়িয়া ফিরিয়া আসি।

স্বাক্ষর/-
মোছাঃ চানুভান

\ ২৬২ \

মোঃ বাদশাহ মিয়া
ম্যানেজার
শ্রীমঙ্গল সোনালী ব্যাঙ্ক
শ্রীমঙ্গল, সিলেটঃ

আমি আমার ছেলে-মেয়েদেরকে ঢাকা পাঠানোর জন্য ঢাকা যাওয়ার রাস্তা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য ১৩ই এপ্রিল হোণ্ডা নিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রেজারী অফিসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পাক বাহিনী বিমান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর ব্যাপকহারে শেলিং আরম্ভ করে। এই সময় ২জন লোক মারা যায় এবং ৫-৬ জন আহত হয়। ব্রাহ্মবাড়িয়া থেকে রওনা হয়ে বিকালে তালশহর রেল ষ্টেশনে যখন পৌঁছাই তখন দেখতে পাই দক্ষিণে লালপুর বাজারে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পাক বাহিনী বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। প্রায় ১ ঘন্টা এই আক্রমণ চলে, বিমান থেকে ব্যাপকভাবে শেলিং ও বোমা ফেলা হয়। খবর পাই এতে মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়।

রাত্রিতে আমি আশুগঞ্জ সোনালী ব্যাঙ্কে অবস্থান করি। ১৪ই এপ্রিল ৬টার সময় থেকে আশুগঞ্জের উপর আক্রমণ চলে। পাক বাহিনী হেলিকপ্টার করে আশুগঞ্জ ওয়াপদার পার্শ্বে অবতরণ করতে। পাক বাহিনীর এই অবস্থান সোনালী ব্যাঙ্কের উপর থেকে নোয়াখালীর একজন টেলিফোন অপারেটর দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ব্রীজের পূর্ব তীরে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে টেলিফোনযোগে খবর দেয়। সে নিজে দোতালার উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে এবং আমাদেরকে বলে যে, যদি বাঁচতে চান তবে পালান।

মুক্তিবাহিনী তাদের অবস্থান গুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দিকে পিছু হটে যায়। পাক বাহিনী আশুগঞ্জ অবতরণ করার পরেই তারা সারা শহর চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ করতে থাকে । এই সময় সেখানে যে লোককে তারা পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করে। আমার মনে হয় যদি পাক বাহিনীর অবস্থানের খবর টেলিফোন অপারেটর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে না জানাত তবে একটিও মুক্তিযোদ্ধা সে দিন পাক বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেত না। পাক বাহিনী পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। আমরা আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাই এবং কয়েকজন আমাদের ব্যাঙ্কের সম্মুখের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে, তখন আমি পেছন দরজা দিয়ে রেবিয়ে একটা চিপাগলি দিয়ে নদীর পারে চলে আসি। নদীর পারে এসে আরও কয়েকজন নরনারীকে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাই। নদীর মাঝখানে একটা নৌকা বাঁধা ছিল। আমি সাঁতার কেটে নৌকাটাকে নদীর পারে নিয়ে আসি এবং অসহায় লোকগুলিকে নৌকায় তুলে নিয়ে উত্তর দিকে পালিয়ে যাই।

আমি যখন নদীর পারের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমি রাস্তার উপর ১৫-১৬ জন লোককে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই এবং অনেককে গুলি লেগে আহত অবস্থায় কাতরাতে দেখি। চারিদিক থেকে শুধু গুলি আর নারী-পুরুষদের করুণ চিৎকার ভেসে আসে।

অতঃপর আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসি। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেই দেখতে পাই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তর দিকে তেলিয়াপাড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ বাদশাহ মিয়া
১৭.১০.৭৩ইং

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ
বাংলাদেশের দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার অভিযানের ওপর একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	'বাংলাদেশের গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	.....১৯৭২

২৫শে রাত থেকে ২৭ শে রাত
-নাজিমুদ্দীন মানিক

পঁচিশে মার্চ উনিশ'শ একাত্তর। রাত সাড়ে ১১টা কি পৌনে ১২টা । বাকী দু'টো লেখা শেষ করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে হোটেল থেকে চারটে খেয়ে বেড়িয়েছি মাত্র- অবজারভার হাউসের সামনে রাস্তায়। দেখলাম অসংখ্য মানুষের ছুটাছুটি-কেউবা ইট টানছেন, কেউ বা বিরাট বিরাট গাছ কেটে আনছেন- কেউ বা পাশের মোটর মেরামত কারখানার সামনে ফেলে রাখা পুরনো ভাঙ্গা গাড়িগুলো এনে রাস্তায় জড়ো করছেন- সবারই মুখে এক কথা - ব্যারিকেড তৈরি করো, ওদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করো, ওদের আসতে দেবো না আমাদের এ জনপদে। মনে পড়লো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশঃ আমি হুকুম দেবার নাও পারি, রাস্তা-ঘাট যা কিছু আছে তোমরা সব বন্ধ করে দেবে। এ নির্দেশ অমান্য করতে পারিনি আমি নিজেও- ওদের সাথে ধরাধরি করে সবে ডিআইটি রাস্তার মুখে রেখেছি একটি গাছ। এমনিই শোনা গেল গুলির শব্দ। রাস্তার মানুষগুলো কোন মতে আত্মরক্ষা করলো। আমি দৌড়ে চলে এলাম আমাদের পূর্বদেশ অফিসে।

অফিসের বারান্দায় আঁধারের চাদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে দেখলাম হায়েনাদের একটি কনভয় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে- দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা) অফিসের সামনে, কনভয়ের সামনে বিরাট ব্যারিকেড। ওরা ডিঙ্গাতে পারছিল না। তখন - তাই গুলী খাওয়া শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে কনভয়ের বিরাট গাড়ীগুলো। আর গাড়ীর আরোহী পাষণ্ডরা গুলি ছুড়ছে ওদের চার পাশে। হায়দার ভাইয়ের ধমক খেয়ে কামরার ভেতর চলে এলাম। জানালা দিয়ে স্পষ্টতঃ দেখতে পেলাম গাড়ী থেকে নামলো দশ-বারোজন হার্মাদ। অনেক কষ্টে ব্যারিকেড সরিয়ে পথ করে নিলো ওদের কনভয়ের। তারপর টয়েনবি সার্কুলার রোড ধরে চলে গেলো।

টেলিফোন করলাম বেগম বদরুন্নেসা আহমদের বাড়ীতে। কেউ ধরলো না। তারপর আর কাউকে টেলিফোন করতে পারিনি। হার্মাদরা টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো। অফিসের সর্বত্র এক বিক্ষুব্ধ নীরবতা আর শহরের সর্বত্র অবিরাম বোমাবর্ষণ, ফিল্ডগান, মেশিনগান, স্টেন, এস এল আর, আর চাইনিজ অটোমেটিকের একটানা শব্দ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে গুলী খাওয়া মুমূর্ষু নরনারীর করুণ আর্তনাদ। হায়দার ভাই, সেলিম ভাই, লোহানী ভাই, রফিক, অহিদ, এরশাদ, আতিক, তওফিক, রকিব, সাদেকীন, মজিদ, আনিস, কামাল, আজমল, জিয়া আমরা সবাই হতবাক- কারো মুখে কোন কথা নেই। বোমার এক ঘন্টা শব্দ শুনছি- আর যেনো মনে হচ্ছে নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে চিবিয়ে খাচ্ছি। অথচ আমরা তখন অসহায়- করার কারো কিছু নেই তখন।

মনে পড়লো সেদিন সন্ধ্যার কথা। রাত ৮টার দিকে শেখ সাহেব ব্রীফ করেছিলেন দেশী সাংবাদিকদের এর আগে চাটগাঁ, রংপুর, খুলনা, রাজশাহীতে জল্লাদের হামলার খবরে গর্জে উঠেছিলেন বঙ্গশার্দুল। এক বিবৃতি দিলেন তিনি। বললেন বাংলায় আগুন জ্বলছে। এ আগুন নেভানোর সাধ্য কারো নেই। আমার মানুষকে

নির্বিচারে এভাবে মারতে দেওয়া যাবে না। সাবধান হও জল্লাদ। শেখ সাহেবের বাড়ীতেই খবর পেলাম সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া- ভুট্টো ঢাকার প্রেসিডেন্ট হাউস আর ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে ক্যান্টনমেন্ট গিয়ে টিক্কা , ওমর, পীরজাদা, ফরমান আলী, হামিদ, খাদিম হোসেন রাজা এসবদের নিয়ে মিটিং করছে- সলাপরামর্শে বসেছে। শেখ সাহেবের প্রেস বিফিংয়ের পর সেলিম ভাই, আমি আর সেলিম মামা হাঁটতে হাঁটতে এসেছিলাম নিউমার্কেট পর্যন্ত। নিউমার্কেট থেকে একবার সার্জেন্ট জহুরুল হলে গেলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। মন এক বিরাট আশঙ্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেলো। অফিসে এসে একটা লেখা শেষ করছি। তারপর খেতে গিয়ে তো এ কাণ্ড ।

সে রাতে আর কোন কাজ হলো না- কোন পত্রিকা বেরোলা না পরদিন। সারা রাত অফিসে আটকা থাকলাম। জল্লাদরা কারফিউ জারী করেছে। পরদিনও সেই অবস্থা। তবে রাজারবাগে বোমার আওয়াজ কমেছে কিছুটা। কিন্তু গুলীর আওয়াজ থামেনি। থামেনি আবাল -বৃদ্ধ-বনিতার আর্তনাদ। দূরে তিন-চার জায়গায় দেখলাম বিরাট বিরাট কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। বুঝতে পারলাম স্বদেশেও যারা মোহাজির সেসব রিকশাওয়ালা-মুটে-মজুর আর কুলী-কামিনদের বস্তীগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে জল্লাদের দল।

ছাবিবশে মার্চ নয়টায় ঢাকা বেতার থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় জনৈক উর্দুভাষী এলাম ফরমাইছেন, টিক্কা ঢাকা শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারী করেছে। আর অনেক নতুন সামরিক আইন জারী করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এর কয়েক মিনিট পরেই তদানীন্তন চতুদর্শ ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের সামরিক পাবলিক রিলেশসন অফিসার মেজর মোহাম্মদ সাদিক সালিক এক বিরাট পরোয়ানা নিয়ে অফিসে হাজির। ওর দাবী গুলো বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার পত্র হিসাবে ছেপে দিতে হবে। সালিকের সাথে ষ্টেনধারী আরো তিন পাষণ্ড। আমরা বললাম, এসব ছাপার মালিক আমরা নই। হামিদুল চৌধুরী সাহেব বা মাহবুবুল হকই পারে। ওরা চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর মাহবুবুল হককে নিয়ে ফিরে এলো। মাহাবুবুল হক ছাপতে রাজী হলো- আমাদের অনুবাদ করে দিতে বললো। আমরা জবাব দিয়েছিলামঃ ক্ষুন্ন পিপাসা আর নিদারুণ উদ্বেগে আমরা ক্লান্ত। এখন অনুবাদ করতে পারবো না। মাহবুবুল হক এতে সালিককে কি যেনো বললো। সালিক আমাদের ধমক দিয়ে বললো- জলদী করো না- নেহী তো দেখতা হায়- পেছনের তিন পাষণ্ডকে দেখালো। অগত্যা অনুবাদ করে দিলাম। পরে অবশ্য সে অনুবাদের প্রচারপত্র ছাপা হয়নি। এরপর ওরা মাহবুবকে নিয়ে আবার চলে গেলো। আমরা অফিসেই বন্দী রইলাম।

এগারোটার দিকে রফিক কোথা থেকে কয়েকটা পাউরুটি আর বনরুটি জোগাড় করেছিলো। সেগুলো দিয়ে কোন মতে কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ করলাম। এ সময় দেখি বেতার থেকে বার বার আমার সোনার বাংলা গানটির দু'তিন পঙক্তি বাজানো হচ্ছে।

পঁচিশে মার্চ রাত থেকে সাতাশে মার্চ- সকালে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আটকা পড়েছিলাম সেই পূর্বদেশ অফিসে। সাতাশে মার্চ সকালে ঢাকা বেতার থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় জনৈক উর্দুভাষী ঘোষনা করলো, টিক্কা দুপুর বারোটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল, করেছে। যে যার ঘরে ফিরতে পারবেন- পারবেন বারটা পর্যন্ত হাট বাজার করতে। তারপরই আবার স্বগৃহে অন্তরীণের পালা শহরবাসীদের। ঘোষনাটি শোনার পর আমরা অবজারভার ভবনে চার দেওয়ালে ভেতর আটকা পড়া লোকগুলো বেরুলাম। রাস্তায় হেঁটেই যেতে হবে, কেননা রাস্তায় দখলদার বাহিনী বিরাট বিরাট লরী আর জীপ ছাড়া অন্য কোন যানবাহন নেই। মহানগরী ঢাকার রাস্তাগলি সকল রকমের যানবাহন শূন্য। মতিঝিল থেকে রায়ের বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ এ মাইলের মধ্যে রাস্তায় একটা রিকশাও আমার চোখে পড়েনি।

রাস্তায় দেখলাম ঘরে ফেরার মানুষগুলোর সে কি উর্ধ্বশ্বাস চলা। কারো দিকে কারো তাকাবার সময়টা পর্যন্ত নেই। সবাই ছুটছে কোনমতে নিজের জানটুকু নিয়ে যেভাবে পারছে পালাচ্ছে। থেকে থেকে পাষণ্ডদের লরীগুলো বিরাট দানবীয় শক্তিতে ছুটে চলেছে রাস্তার দু'পাশের মানুষ আর ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে।

প্রতিটি গাড়ীর ওপরে পজিশন নিয়ে বসে আছে- চারিদিকে তাক করে রেখেছে মেশিনগান, হাল্কা মেশিনগান আর কামানের মুখ। ওদের এহেন সর্তক মহড়া দেখে সেই সদা আতঙ্কিত মনেও হাসি এলো আমার। কার বিরুদ্ধে এমন সতর্কতা? বাংলাদেশের নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর দাবীদারদের এহেন একতরফা বীরত্ব যদি সেই মুহূর্তে আমার কাছে হাস্যস্পদ বলে মনে হয়, তবে কি।

অবজারভার ভবন থেকে বেরিয়ে দুদিনের উপোসী ক্লান্ত দেহটাকে টেনেহিঁচড়ে যখন ন্যাশনাল কোচিং সেন্টারের সামনে হাজির হলাম, তখন অনেকটা সংজ্ঞা লোপ পাবার অবস্থা। কোচিং সেন্টারের ঠিক সামনেই ফুটপাতের ওপর দেখলাম একটা মানুষের লাশ। গুলীর আঘাতে বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। পাশেই পড়ে রয়েছে কিছু নাড়ি-ভুড়ি। নাকে আঙ্গুল এঁটে- চোখ দুটো বন্ধ করে পাশ কাটাতে চাইলাম। কিন্তু পা এগুচ্ছিল না। হাঁটু দুটো কাঁপছে থর থর করে। নার্ভাস হয়ে গেলাম। তবুও এগিয়ে যেতে হলো।

একবার মনে করলাম রাস্তায় নেমে যাই। ফুটপাতে হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু পারলাম না। রাস্তার ওপর দিয়ে পশুদের দানবীয় লরীগুলো যেভাবে ছুটছে- যে কোন সময় তার তলায় পিষ্ট হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। বুক সেন্টারের সামনের ফুটপাতে দেখতে পেলাম চাদর মুড়ি দেওয়া আর একটি লাশ। ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। বায়তুল মোকাররমের মোড়ে রাস্তায় ওপর আরো দু'টো নাম না জানা বাঙ্গালী বীরের নশ্বর দেহ চোখে পড়লো- চোখে পড়লো জি,পি,ও'র পেছনের গেটে এক ঝুড়ি রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড আর নারী-ভুঁড়ি। তবুও আমি হেঁটে চলেছি-হেঁটে চলছেন আমার চার পাশের মানুষগুলো। কেননা, আমি এবং আমার চার পাশের মানুষগুলো- আমরা সবাই তখন বাঁচতে চাই। এবং সে জন্যই আমাদের কারো প্রতি কারো কোন খেয়াল নেই- কারো সাথে কারো কোন কথা নেই। সবাইর চোখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব। সবাই ভীতি বিহ্বল।

এ লাশগুলো দেখার পর চলার পথে আমার অবচেতন মনে বারবারই দৃশ্যগুলো ফুটে উঠতে লাগলো- মনকে বাঁধতে চাইলাম- রাস্তায় আর কিছুর দিকে তাকাবো না- কেবল নিজের পদক্ষেপের জায়গাটুকু ছাড়া- কেননা আমার অনুভূতি তখন ভোঁতা হতে শুরু করেছে- প্রচণ্ড অন্তর্যাতনায় আমি যেন উদভ্রান্ত। পুরানা পল্টন মোড় পেরিয়ে সেক্রেটারীয়েটের ফুটপাতে উঠলাম। ক্যাপ্টেন রেষ্টুরেন্টের বিপরীত দিকের রাস্তায় ডাষ্টবিনের পাশে দেখলাম আর একটা বাঙালীর লাশ। হাতে সোল মাছের একটি কাঁচা মাথা মুষ্টিবদ্ধ। ক্যাপ্টেনওয়ালারা মাছের মাংসটা রেখে মাথাটা ডাষ্টবিনে ফেলে দিল, কোন বুভুক্ষ হতভাগ্য হয়তো বা সেই মাথাটা কাক- কুকুরের সাথে ঝগড়া করে অধিকার করেছিলো- কিন্তু নিয়ে যেতে পারেনি- দখলীকৃত সেই উচ্ছিষ্ট মাথাটা হাতে থাকতেই সে হয়েছে জল্লাদ পাশবিক শক্তির উন্মত্ত শিকার। আর পা চলে না- ইচ্ছে হলো ওখানেই বসে পড়ি।

পেসক্লাবের সামনে দিয়ে পেরুতেই একবার ক্লাব প্রাঙ্গণের দিকে তাকালাম- দেখলাম ফয়েজ ভাইয়ের (বর্তমান বাংলাদেশ সংবাদ সংস্তার প্রধান) পুরানো গাড়ীটা পড়ে রয়েছে। ক্লাবের পশ্চিম পাশের বাড়ীর আঙ্গিনা ভর্ত্তি পশুদের ছাউনি-ওপাশে কমিশনার অফিস প্রাঙ্গণে ভর্ত্তি জল্লাদের দল। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ এক পথচারীর ডাকে সম্বিত ফিরে আবার চলতে শুরু করলাম।

নতুন হাইকোর্ট ভবনের সামনে দিয়ে রমনা পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি- আমি যেন মানুষ নই- দমদেয়া কোন যন্ত্র মাত্র। রমনা রেসকোর্সের পাশে এসে আর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সাহস হলো না- অন্ততঃ মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে ওদের লরীগুলো যদ্দুর সম্ভব এড়িয়ে চলা যাবে, তাই করলাম। রেসর্কোসের মধ্য দিয়ে হাঁটছি- আর আমার সম্ভ্রম চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠছে- মাত্র আঠারো দিন আগের একটি স্মৃতি। এই সেই রেসকোর্স- যেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেনঃ এবারের সংগ্রাম- মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটি বিরাট মঞ্চ- সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন বঙ্গবন্ধু- মাঠ ভর্তি লোক, এক জনসমুদ্র। আমি সেই সমুদ্রের মাঝ দিয়ে হাঁটছি- হঠাৎ মনে হলো

স্বাধীনতা সংগ্রা নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে। অন্ততঃ বিবিসি থেকে সকালে সে আভাসই দেয়া হয়েছে- বাঙ্গালী মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছে- ওরা গোপন বেতার থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা ঘোষনা করেছে- বিবিসি তার উদ্ধৃতি দিয়েছে। গোপন বেতার থেকে দাবী করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু মুক্তিবাহিনীর সাথে আছেন। বঙ্গবন্ধু খবর শুনে কিছুটা নিশ্চিত হলাম (যদিও পরে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি)।

রেসকোর্স- শাহবাগের মোড় পেরিয়ে কাঁটাবন বস্তির পাশে পৌছিলাম- এ পথ আসতে কতক্ষণ লেগেছিলো বলতে পারবো না। বস্তির পাশের রাস্তার ওপর দেখলাম রক্তমাখা বেশ ক'টি পায়ের ছাপ। রাস্তার ওপর বেশ ক'টি ব্যারিকেড চিহ্ন করতে এসে গুলী খেয়েছে। ক'জন মরলো কে জানে। রক্তমাখা পায়ের ছাপগুলোও বস্তির দিকে এগিয়ে গেছে। আরো দশ পায়ের মত সামনে এসে দেখতে পেলাম ফুটপাতে আর রাস্তায় মাঝখানের নর্দমায় একটি রক্তের নহর। রাস্তায় থেকে ড্রেনে জমে থাকা রক্তস্রোতে জমাট বেধেঁ থক থক করছে- ক'জন রীববন্ধু সেদিন সেখানটায় আত্মহুতি দিয়ে ছিলেন- কি নাম তাদের - নিজের দেশে মোহাজের এসব বীরদের পৈতৃক ভিটেই বা ছিলো কোথায়?

এই মুমূর্তে আমার আর কোন অনূভূতি নেই- নেই কোন উপলব্ধিও। আমি হাঁটছি... হাঁটছি নিজের ঘরের পানে- হাঁটছি আমার নিজের এবং আমার আত্মজ-আত্মজাকে বাঁচানো এক স্বার্থপর দুর্দমনীয় মনোবৃত্তি নিয়ে- আর আমার চলার পথের এসব দৃশ্যগুলো কেবল দেখছি আর দেখছি। পুরানো রেল লাইনের (মহসীন হলের পিছনে) ওপারকার বস্তিগুলো ও তখন এক বিরাট ধ্বংসস্তুপ- বস্তির ছোট ছোট ঘরগুলো পুড়ে সুন্দর ছাইয়ের স্তুপে পরিণত হয়েছে। ক'জন ওরা এখানে মরলো- তার হিসাবই বা কে রাখে।

এলিফ্যান্ট রোড আর ল্যাবরেটরী রোডের সংযোগস্থলে দেখলাম বেশ ক'জন পাষণ্ড রাস্তায় টহল দিচ্ছে। আমি অনেকটা টহলে টহলে তাদের সামনে দিয়ে পার হচ্ছি। হঠাৎ একটি বিক্ষুদ্ধ কণ্ঠে থমকে পেছনে ফিরে চাইলাম। দেখলাম পাকিস্তানী সামরিক পোশাকের আবরণে বন্দি একজন বলছেন স্পষ্ট বাংলায়ঃ শালারা আমরা তো গেছি- তোদের দিনও আর বেশী বাকী নেই। এবার যেতে হবে। বুঝলাম কোন বাঙ্গালী হয়তো নিজেকে বাঁচানোর জন্যই তাদের সাথে টহল দিতে এসেছেন একান্ত অনিচ্ছায়। কথাগুলো বলেছেন, তার কোন পাঞ্জাবী হার্মাদ সহকর্মীকেই। সেই বাঙ্গালী সৈনিকটি আজ আর বেঁচে আছেন কিনা কে জানে।

বিজ্ঞান গবেষণাগারের কাছে এসে শুনলাম পাশের বাড়ীতে দু'টি লাশ রয়েছে। আগের রাতে পাষণ্ডরা ওদের হত্যা করেছে- বাড়ীর ভেতর ঢুকেই। এখানেই মীরপুর রোডের ওপর এ পাষণ্ড দাঁড়িয়ে মাইক দিয়ে ঘোষনা করছে, কারফিউ বিকেল চারটা পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছে। এই ঘোষণায় আমার চলার গতিও কিছুটা শিথিল হলো। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম রায়ের বাজারস্থ আমার বাসার দিকে। প্রায় বারোটায় বাসায় পৌঁছিলাম। বাসায় পৌঁছে নতুন করে আবার আতঙ্কগ্রস্থ হলাম।

সাতাশে মার্চ সকালে কারফিউ শিথিল করার পর রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, যেন মানুষের মিছিল। হাজার হাজার মানুষ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছেন- কারো বা কোলে বাচ্চা, পিঠে বোঝা- হাতে ধরা রয়েছেন পত্নী বা কন্যা। সমস্ত লোক ছুটে পালাচ্ছেন শহর থেকে গাঁয়ের দিকে। কেননা তাঁদের ধারনা জল্লাদ বাহিনী হয়তো বা শহরেই চালাবে তাদের তাণ্ডবলীলা- গ্রাম পর্যন্ত হয়তো পৌছুবে না - কিন্তু কালক্রমে ওদের ও ধারণা মিথ্যে বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। ইয়াহিয়া -টিক্কার নরখাদকরা শহরের চাইতেই গ্রামেই শেষের দিকে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল- বাংলাদেশের ৬৬ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩০ হাজার গ্রাম ওরা পুড়িয়েছে- চালিয়েছে মানব ইতিহাসের সব চাইতে জঘন্য ও ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড।

রায়ের বাজারে নদীর ধারে গিয়ে দেখলাম এক অভূতপূর্ব মর্মান্তিক দৃশ্য। প্রাণভয়ে মানুষ যে কত অসহায়, কত কষ্ট স্বীকার করতে পারে এটা তারই একটা প্রতিচ্ছবি। কাঁধে -ঘাড়ে -হাতে ছোট ছোট বাচ্চা আর পোঁটলা পুটলীসহ এক কোমর থেকে এক বুক পানি ভেঙ্গে নদী পার হচ্ছে হাজার হাজার নর-নারী। প্রাণ বাঁচানোর আকুল চেষ্টায় ধাবমান অনেকেরই ইজ্জত- আব্রুর দিকে কোন খেয়াল নেই। যেসব গৃহবধুকে সেদিন রাস্তায় এবং নদী পার হবার সময় এমন বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখেছি - তাদের অনেকেই কোন দিন সূর্য্য দেখেছেন কি না বলা যায় না। অনভ্যস্ত পদে তাড়াহুড়ো করে পথ চলতে গিয়ে কত মহিলা ও শিশু যে হোঁচট খেয়ে পড়ে, পা ভেঙ্গেছেন, কতজনের যে নখ উল্টে গেছে- তার খবরই বা কে রাখে। আমার আত্মীয় সেদিন এমনিভাবে পালাবার সময় আছাড় খেয়ে পড়ে পায়ের নলার হাডডি দু'টো ভেঙ্গেছে- এখনও তিনি হাঁটতে পারছেন না- কোনদিন পারবেন কিনা বলা শক্ত।

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাঙ্গালী হয়ে বাংলাদেশের বুকে বাংলারই মা-বোন আর বাচ্চাদের এ মর্মান্তিক অবস্থা দেখতে পারিনি- পারিনি সহ্য করতে-নিজের অক্ষমতার আত্মদহনের জ্বলে মরেছি কেবল। বিকেল চারটা বাজতে না বাজতেই হার্মাদের বিরাট বিরাট লরীগুলো ঐ এলাকার রাস্তা এবং ছোট ছোট জীপগুলো অলি-গলিতে ছুটোছুটি শুরু করলো। আমরা সবাই আবার গৃহে অন্তরীণ হলাম। চারটার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নদীর পাড়ের দিকে বেশ কয়েকটা গুলীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম, যে হতভাগীরা জানের ভয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছিলো- তাদের ওপরই হার্মাদরা নির্বিচারে গুলী চালিয়েছে- কতজন যে সেদিন এখানে সেখানে শহীদ হয়েছেন কেউ তার কোন হিসাব জানে না- কোন দিন কোন ইতিহাসেও হয়তো বা ওদের কথা আর কেউ লিখবে না।

সন্ধ্যায় ঘরে বসে বসে বহু কষ্টে স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর ধরতে সক্ষম হলাম। সেই প্রথম শুনতে পেলাম এই বেতারে খবর- শুনতে পেলাম ঘোষকের আনাড়ি কণ্ঠে যে, বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চ ভোরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন এবং তিনি মুক্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নিরাপদে রয়েছেন। এই কথাটা শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলাম- আনন্দিতও হলাম। অবশ্য পরে শেষোক্ত ঘোষনাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। রাত যতই বাড়তে লাগলো সারা এলাকাজুড়ে জল্লাদদেরও তাণ্ডবলীলা আরো বাড়তে শুরু করলো। রাত ১১টার দিকে আমার বাসার সামনের গলির মুখের বাসা দু'টোয় ওরা দু'দল ডুকলো, এ বাসা একটি কুমোরদের। অপরটিতে থাকেন দু'টো রিক্সাওয়ালাদের পরিবার। রিক্সাওয়ালাদের বাসা থেকে এরা দু'জন তরুণীকে ধরে নিয়ে গেলো। মুসলমান ধর্মের ধজাধারী ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টোর হার্মাদ বাহিনীর পাশবিকতার যূপকাষ্ঠে দু'জন বাঙ্গালী নিঃসহায় তরুনীর একমাত্র সম্বল নারীত্ব ভূলণ্ঠিত হলো।

কুমোরদের বাসায় ঢুকে ওরা প্রথমে ভাঙ্গলো ওদের ঠাকুর ঘরের দেবী-প্রতিমাগুলো। তারপর ঢুকলো অভ্যন্তরে। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে ঘর থেকে টেনে বের করলো ১০ থেকে ৬০ বছর বয়সের সকল পুরুষকে। ও বাড়ীর একজন বধূ ও একজন মেয়েকে ধর্ষণ করলো তাদের স্বামী, মা- বাবা আর শ্বশুড়-শাশুড়ির সামনে। এক জল্লাদ ঘুমান্ত একটি বছর দেড়েকের বাচ্চার বুকে ঢুকিয়ে দিলো তার সুতীক্ষ্ণ বেয়নেট। তারপর বেয়নেটের আগায় জুলিয়ে রাখলো ওর কচি দেহলতাটিকে। চোখের সামনে দেখলাম, সেই অবুঝ শিশুর হাড়-গোড়গুলো ঝুর ঝুর করে পড়ছে জল্লাদদের হাতে ধরা রাইফেলের গা বেয়ে। বেশীক্ষণ আর সহ্য করতে পারিনি। বাসার পেছনের চোরাগলি পথে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে দৃশ্য। আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। আজো ভাবী এসব দেখে কি করে সহ্য করেছি- কেন পাগল হয়ে গেলাম না। কেন আমি মানুষ হয়ে জন্মালাম!

কুমোরদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসার সময় হঠাৎ ওরা এসে থমকে দাঁড়ালো ওদের পাতিল পোড়ানোর সেই বিরাট বিশাল অগ্নি কুণ্ডটির সামনে। বাড়ীর সবাইকে বন্দুকের নলের মুখে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলো ওটা কি? কুমোর কেউ তো উর্দু জানে না বলতেও পারে না তবুও ওরা বর্বর খান সেনাদের বোঝাতে চেষ্টা করলো। এক বর্ণও বাংলা জানা অথচ বাঙ্গালীর দরদের খান সেনারা তার একটা কথাও বুঝলো না

অথবা বুঝতে চাইলো না। শুরু হলো নির্মম মারধর আর বেয়োনেটের খোঁচা । খান সেনারা চিৎকার করে বলতে লাগলো শালালোক ঘর কা আন্দার এতনা বড়া ব্যাঙ্কার বানায়া হ্যায়। কেতনা গালিচ (মুক্তিযোদ্ধা) হ্যায় হিয়া পার। বাতাও কেতনা হ্যায় তেরা ঘরমে। কুমোরেরা যত বলে হুজুর এটা আমাদের পাতিল পোড়ার কুণ্ড ততই যেন তাদের নির্মম নির্যাতনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। চোখের সামনে স্বামী ও ছটি সন্তানের এমন নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষটায় কুমোর গিন্নী ওদের সর্দার গোছের লোকটির পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এক লাথিতে তাঁকে কমপক্ষে পাঁচ হাত দূরে ঠেলে ফেলে দিলো সেই নারকীয় জল্লাদটি। তারপর কি মনে করে ঘট ঘট করে বেরিয়ে গেলো ওরা সবাই।

চোরাপথ দিয়ে দৃশ্য দেখছিলাম- আর ওরা যদি আমার বাসায় ঢুকে তবে কি করবো- সেটাই ভেবেছিলাম। বাসায় রয়েছেন আমার ঘাট বছরের বুড়ো নানু- একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তিনি সন্ধ্যা থেকেই কোরান শরীফ পড়তে শুরু করেছেন আর তাঁর চোখ বেয়ে পড়ছে অশ্রুধারা । আমার চারটি বাচ্চার মধ্যে বড়টি ছাড়া ছোট তিনটির একজনকে নিজে কোলে নিলাম অন্যটিকে ঝিয়ের কোলে এবং তখন মাত্র একুশ দিন বয়স ছোটটিকে ওর মায়ের কোলে দিয়ে সেই চোরাপথটিতে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। উদ্দেশ্য জল্লাদরা আমার বাসার গেট ভাঙ্গানোর সাথে সাথেই দৌড়ে গিয়ে পিছনের পানি ভর্তি এঁদো পুকুরটিতে নেমে যাবো। অন্ততঃ বেঁচে থাকতে পারি কিনা সে চেষ্টা তো করতে হবে। নানু ঘর ছেড়ে যেতে নারাজ। তিনি বলেনঃ জল্লাদের হাতে যদি এভাবে আমার মরণ থাকে তবে মরব। তোরা আল্লাহর উপর তোয়াক্কা করে পালানোর চেষ্টা কর। তোদের ওরা রাখবে না।

আল্লাহর কি ইচ্ছা- ওরা আর আমাদের বাসার দিকে গেল না তখন। কিন্তু সারারাত ধরে আমরা ওই চোরা পথেই বসে থাকলাম। কেননা কখন ওরা বাসায় ঢুকে পড়ে। এভাবেই রাতটা কেটে গেল।

পরদিন সকালে উঠে ঠিক করে ফেললাম যে রায়ের বাজার এলাকায় আর আমার থাকা উচিত নয়। সাথে সাথে আঠার টাকা দিয়ে দুটো রিকশা ঠিক করে রায়ের বাজার থেকে মতিঝিল কলোনীর দিকে যাত্রা করলাম। যাবার পথে রায়ের বাজারের মোড়ে দেখলাম একখানা গাড়ি। দুজন বিলাতী সাহেব গাড়িতে। ওরা আমাকে থামালেন। কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি জানতে চাইলেন। রাতের ঘটনা তাদের জানালাম পরে জানতে পারলাম যে এ দুজন বৃটিশ সাংবাদিক। কোন মতে বৃটিশ হাইকমিশনের একখানা গাড়ি যোগাড় করে তারা বেরিয়েছেন, বিধ্বস্ত ঢাকার পথ দেখতে। তাড়াহুড়ে করে ওদের সঠিক পরিচয় জানতে পারি নি। কেননা একদিকে পালাচ্ছি আর অন্যদিকে জল্লাদরাঃ তখনো টহল দিচ্ছে।

সাতাশের রাতে তারা রায়ের বাজারের পটারী সেন্টারের দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে কতজনকে গুলি করেছে আজও তার কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। কোনদিন সে হিসাব পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-বাহিনীর 'ইকবাল হল' আক্রমণের ওপর দুটি প্রতিবেদন	দৈনিক আজাদ	১৪ও ১৫ ফেব্রুয়ারী,১৯৭২

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দুর্গ
ইকবাল হল
(নিজস্ব নিবন্ধকার)

গ্যারেজের উন্মুক্ত ছাদে সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন জিনাত আলী ও তার সঙ্গী তারেক, আব্দুর রউফ ও তার ছোট ভাই জগন্নাথ কলেজের ছাত্র মোফাজ্জেম হোসেন। আধ ঘন্টা পর অর্থাৎ একটা-দেড়টার দিকে শুরু হলো পাক হানাদারদের আক্রমণ। অন্ধকারে বুক চিরে ছুটছে বুলেট। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয় অস্ত্রের ভয়াল গর্জনে সমস্ত এলাকাটা প্রকম্পমান। অক্টোপাশের মতন হানাদাররা ঘিরে ফেলেছে হল এলাকা। কামান দাগছে, গ্রেনেড ছুড়ছে এক ধরনের আগুন বোমা। বোমাগুলো ফস করে জানালা দিয়ে ঢুকে ঘরের ভিতরে পড়তেই ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সে আগুনে কাপড়চোপড়, আসবাবপত্রসহ যত কিছু দাহ্যবস্ত এমনকি দালানের আস্তর পর্যন্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। ইকবাল হলের তিরোধকারী তরুণেরাও বীরবিক্রমে প্রতিরোধ দিয়ে যাচ্ছে।

থ্রি নট থ্রির আওয়াজ শুনেই তা বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু যেভাবে আগুন হলের সমস্ত ঘরে তাতে কি করে বেশীক্ষণ আর ওদের পক্ষে প্রতিরোধ দেয়া সম্ভব হবে। আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমেই হিস হিস করে ছড়িয়ে পড়ছে। এসেমব্লি হল ও পাঠাগারে আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। পাশের রেল সড়কের বস্তিও জ্বলছে। ওদিক থেকে ভেসে আসছে মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর মানুষের আর্তনাদ। আকাশের উড়ছে লাল নীল রংয়ের অনুসন্ধানী ফানুস। এক বিচিত্র ভৌতিক পরিবেশ। সারা নগরী যেন জ্বলছে জ্বলন্ত আগুনে, কামান, মর্টার গেনেড, আর যতসব স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মিলিত বীভৎস গর্জন বিভীষিকাময়তার জন্ম দিয়েছে। গ্যারেজের ছাদে ওরা শুয়ে আছে চারজন মৃতুশীতল অনূভূতি নিয়ে। মাথার আধহাত উপর দিয়ে বুলেটগুলো সব উড়ে যাচ্ছে। পানির ট্যাঙ্কিতে যেন বুলেটের খই ফুটছে। তারেক এর ফাঁকেও গড়িয়ে ছাদের এমাথা-ওমাথা ঘুরে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু কাউকেই হলের কাছাকাছি দেখতে পেলাম না। শুধু পড়লো হানাদাররা হলের ভিতরে প্রবেশ করেনি, করতে সাহস পায়নি। দূর থেকে এক যোগে দল তাক করে ছুড়ে দেয় ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট, কামানের গোলা, গ্রেনেড, মর্টার, রকেট। চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি দিয়ে ট্যাঙ্ক এসে থামলো পলাশির মোড়ে। শুরু হলো বিচিত্র শব্দে গোলাবর্ষণ। এমন শব্দ এর আগে কোন দিন কেই শোনেনি।

হঠাৎ জিনাতের মনে হলো এই প্রচণ্ড অগ্নিশিখা আর ঘূর্নিঝড়ের মতো গোলাগুলির আবেষ্টিনীর মধ্যে পড়ে এখন কি করবে ঐ দূর্ধর্ষ তরুণ প্রতিরোধীরা বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। মৃত্যু যে ওদের অক্টোপাশের মত ঘিরে ধরেছে সব দিক দিয়ে। স্বাধীনতার বেদীতে তাহলে ওরা আত্মহুতি দিল মহান মর্যাদায়? চোখ জোড়া আর্দ্র হয়ে এলো জিনাত আলীর। হঠাৎ নিজেদের কথাও তার মনে পড়লো।

মৃত্যু তাদের ও চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। ইকবাল হলের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রেল সড়কের বস্তিতে যখন আগুন লাগিয়ে দেয় হানাদার বাহিনী তখন বস্তিবাসী নারী-পুরুষ শিশু বৃদ্ধ যুবা সবাই পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ছুটছিল হলে ভিতর দিকে আশ্রয়ের আশায়। এমনটা ওরা সবসময়ই করে, ঝড় বৃষ্টি বাদলার দিনে হোক আর কোন

আন্দোলনের শিকার হয়েই হোক, ইকবাল হল তাদের চিরদিনের একটা নিরাপদ আশ্রম। বলতে গেলে তাদের জন্য এটা সুরক্ষিত দূর্গ।

কিন্তু এবার সে দূর্গ তাদের রক্ষা করতে পারলো না। যেমনি দলে দলে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙ্গিয়েছিল তেমনি দলে দলেই মুখ থুবড়ে পড়লো স্বদেশের পবিত্র মাটিতে পাক হানাদারদের বুলেট খেয়ে। এই রেল সড়কের বস্তি সংলগ্ন ইকবাল হলের পিছন দিকটার হলের গৃহ শিক্ষকদের কোয়ার্টার। জনৈক গৃহ শিক্ষক পড়ার টেবিলে থিসিসের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

বই আর শিক্ষা অঙ্গনই তাঁর জগৎ। এর বাইরে যা ঘটে তার আভাস ইঙ্গিত পান ঘটনার পর। যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে বাইরের কিছুরই সাথে তিনি জড়িত নন, তাই এই কালরাতের বিভীষিকা সম্পর্কে কোনরূপ পূর্ব ধারনাই তাঁর ছিল না। রাত ৮টার দিকে ডাকসুর সহসভাপতি আবদুর রব তাঁর ঘরে রাখার জন্য একটা ট্রাঙ্ক পাঠিয়েছিলেন। তখন গৃহশিক্ষক অধ্যাপক চৌধুরী মনে করেছিলেন একটা কিছু হবে বোধ হয় আজ রাতে। এর বেশী আর ভাবনাই তাঁর আসেনি। ইতিমধ্যে কয়েকজন শিক্ষক চলে গিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু অনেকেই যাননি। হলে যতক্ষণ ছাত্ররা রয়েছে ততক্ষণ তাঁদের যাওয়া কি শোভা পায়? তাঁদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে না শিক্ষকদের। এই দায়িত্ব বোধই ধরে রাখে অধ্যাপক চৌধুরীকে সপরিবারে তাঁর দোতালার কোয়ার্টারে।

বস্তিবাসীদের আর্তনাদ চিৎকার আর মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরানি শুনে ধ্যান ভাঙ্গলো চৌধুরী সাহেবের। পড়ার টেবিল থেকে উঠে জানালা দিয়ে দেখতে চাইলেন কি ব্যাপার। আঁতকে উঠলেন অধ্যাপক সাহেব। কি সর্বনাশ, এ যে বিভাষিকা! ঢাকা নগরী যেন এক রাক্ষসপুরী। চলছে পিশাচ দেবতার অর্চনা।

রাক্ষসদের চলছে মহাসমারোহে নরমাংস ভোজোৎসব। সে হিংস্রাতার এক নজীরবিহীন ইতিহাস। অধ্যাপক চৌধুরী যেদিকে তাকালেন শুধু আগুন আর গোলাগুলির বিরামহীন ভয়াল গর্জন।

২৫শে মার্চের বিভীষিকাময় কাল রাতের অবসান হলো। কিন্তু কাক ডাকলো না সম্মিলিত স্বরে, পাখি কলকুঞ্জন দিগন্ত মুখরিত করে ২৬শের প্রভাতকে স্বাগত জানালো না-তবু ভোর হলো। ভোর হলো এক নিস্তব্ধ শোকে মুহ্যমান শ্মশান নগরীতে এক মৃত্যুপুরীতে। বস্তুতঃ বিভীষিকাময়তার অবসান হলো না। বরঞ্চ বাংলাদেশে ইতিহাসের নজীরবিহীন হত্যাযজ্ঞ, লুন্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস আর অত্যাচার নিপীড়নের বিভীষিকাময় অধ্যায়ের এখান থেকেই শুরু। গুলিগোলা থেমে গেছে ইকবাল হল এলাকায়।

কিন্তু সান্ধ্য আইন জারী করেছে হানাদাররা সমস্তদিন ধরে। কারণ হত্যাযজ্ঞ যা চালিয়েছে তা সবটা জানাতে চায়না বিশ্ববাসীকে। তবু ভোর হবার সাথে সাথে ফাঁক বুঝে শোকে মুহ্যমান হাজার হাজার নরনারী জীবন বাঁচাবার তাগিদে ছুটছে শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ইকবাল হলে ও আশপাশে যারা তখনো বেঁছেছিল তারাও জীবনের তাগিদে বেরুচ্ছে ফাঁকার দিকে। রাতে হানাদাররা হলের প্রতিটি ঘরে তালা ভেঙ্গে আসবাব বিছানাপত্র পুড়িয়েছে, মূল্যবান জিনিষপত্র যা চোখে পড়েছে সব লুটে নিয়ে গেছে আর যাকে পেয়েছে সামনে তাকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে।

এর ফাঁকে ফাঁকে দু'চারজন বেঁচে গেছে নানান কৌশল করে। যেমন বেঁচে গেছে তারেক, জিনাত আলী, রউফ, মোয়াজ্জেম, গ্যারেজের ছাদে আশ্রয় নিয়ে। বেঁচে গেছে আর একটি ছেলে আর হলের একটা কক্ষে থেকেও। সে লেপ জড়িয়ে নিঃসাড় দাঁড়িয়ে ছিল দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। হানাদাররা তখন খুনের নেশায় মাতাল তাই অতো খুঁটিয়ে দেখার ফুসরত তাদের ছিল না। বেঁচে গেছে কয়েকজন হলের পেছনে সাধারণ কর্মচারীদের কোয়ার্টারে আত্মগোপন করে। রেল সড়কের বস্তির বাসিন্দা চম্পার মা, তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে আশ্রয়

নিয়েছিল এই সাধারণ কর্মচারীদের একটি ঘরে, রাতে তার ঘরে এসে আশ্রয় নেয় আরো দুজন ছাত্র। সেই ছাত্র দুজনকে ঘরের ভিতরে ছেড়া কাঁথা লেপ দিয়ে ঢেকে সারারাতটা দরজায় বসে কাটিয়েছে চম্পার মা। রাতে দু- দুবার এসেছিল হানাদাররা।

জিজ্ঞেস করেছিল চম্পার মাকে কেউ আছে নাকি তোমার ঘরে। চম্পার মা সভয়ে উত্তর দিয়েছিল না কেউ নেই। আমরাই শুধু হানাদাররা ঘরে ঢুকে আর দেখেনি। হয়তো কুমতলব ছিলো দস্যুদের কারো মনে, কিন্তু ওদেরই একজন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল আরো ছোড়ো বিলকুল বুডটি হায়। চম্পার মার পাশের ঘরে বাহির থেকে তালা লাগিয়ে ভিতরে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গিয়েছিল আরো দুজন ছাত্র। কিন্তু বাঁচতে পারেনি ষ্টুয়ার্ড জলিল। চম্পার মায়ের চোখের সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করে দস্যুরা।

এই মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে যারা বাঁচলো তারাই আগামী দিনে বিভীষিকাময় ইতিহাসের সাক্ষী। ভোর থেকে চম্পার মার কানে কাদের যেন করুণ মা-মা আর্তস্বর ভেসে এলো। চম্পার মা ভাবলো হানাদারদের বুলেটে আহত কারা যেন মৃত্যুর আগে শেষ বারের মতন প্রাণ ভরে মা ডাক ডেকে নিচ্ছে। চম্পার মার হৃদয় সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠলো। পায় পায় এগিয়ে গেল চম্পার মা। দুপা এগুতেই দেখলো পাশের তালাবদ্ধ ঘর থেকে মা ডাক ভেসে আসছে।

চম্পার মা দরজা ঠেলে ফাঁক করে দেখতে চাইলো ওরা জীবিত, অক্ষত, আহত না মৃত। না ওরা দু'জনেই জীবিত ও অক্ষত। ওরা চম্পার মাকে চ্যালাকাঠের মত শক্ত আকাটা জিভে বের করে দেখালো। কিছুই বলতে পারলোনা মুখ ফুটে। চম্পার মা বুঝলো তৃষ্ণায় ওদের জিভ শুকিয়ে গেছে। ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি কিন্তু পানি খাওয়াবে কি করে চম্পার মা ওদের? তেমন কোন পাত্র যে নেই হাতের কাছে। চম্পার মার মাতৃহৃদয় ব্যথায় মোচড় দেয়ে উঠলো। দৌড়ো- দৌড়ি করে চম্পার মা, তার শেতল আঁচল কলের জলে ভিজিয়ে বাড়িয়ে দিল দরজার ফাঁক দিয়ে।

সেই ভিজে আঁচল চুষে ডোক গিলে প্রাণ এলো ছেলে দুটোর। তারপর চম্পার মার সাহায্যে দরজা টেনে ফাঁক করে বেরিয়ে ছুটলো যেদিকে দুচোখ গেল। যাবার সময় চম্পার মার উদ্দেশ্যে বলে গেল মা, তুমি আমাদের মা, গর্ভধারিণী মায়ের চেয়ে ও আপন আর মহৎ । যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তোমার কথা মনে থাকবে মা। চম্পার মা, জানেন সেই দামাল ছেলেগুলো আজ কোথায়, কেমন আছে।

ইকবাল হল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে বেরুতেই হাতে খালেকের পানের দোকান। খালেক রাতেই পালিয়ে গিয়েছিল। দোকানে ছিল খালেকের কর্মচারী কিশোর ইউসুফ। ইউসুফ রাতে দোকানের ঝাঁপ ঠেলে দিয়ে তালাবদ্ধ করে ভিতরে ছিল হানাদাররা যখন গোলাগুলি ছুড়তে ব্যস্ত তখন এক হানাদারের কণ্ঠ শুনেছিল ইউসুফ, শালালোক সব ভাগ গিয়া। কিন্তু ভোর বেলা হানাদাররা এসে ডেকে তুললো ইউসুফকে। কিছুই বললো না, শুধু দোকানে যা কিছু খাবার ছিল বিস্কুট,কেক, টফি সব দিতে বলে একটার পর একটা।

প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট নিয়ে নেয়। সাবান নেয়। পয়সা দেবার প্রশ্নই উঠে না। তারা খায়, ইউসুফকে বলে মন্নু এটা দাও, মন্নু ওটা দাও মন্নু। হিংস্র নেকড়ের আদরের মত তারা আদর করে ইউসুফকে ডাকতো মন্নু বলে। ইকবাল হল হত্যাযজ্ঞের সারারাতের আরেক সাক্ষী এই ইউসুফ। ভোর হবার সাথে সাথে জিনাত আলীরা ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে নামলো গ্যারেজের ছাদ থেকে। ঝাঁপ দিয়ে নামতে গিয়ে ডান পাটা ভেঙ্গে গেল রউফের। ভেঙ্গে ডান পায়ের গোছা থেকে সংযোগটা খুলেই গেল। রউফ আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না।

রউফকে আপাততঃ ফেলে রেখেই শিক্ষকদের কোয়ার্টারের দিকে আশ্রয় নিল। কারণ মৃত্যু চর্তুদিকে হায়েনার মত ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে। একজনের জন্য সবাইকে বোকার মত মৃত্যুর নীলস্পর্শে বিলীন হবার

কোন যৌক্তিকতা নেই। রউফ সেই মুহূর্তে ভীষণভাবে মৃত্যু কামনা করছিল। এত যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। কিন্তু হঠাৎ মা, বাবা, ছোট ভাই, বোনদের কথা আর তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মনে হতেই বাঁচার আকাঙ্খা আবার তীব্র হয়ে উঠলো তার হৃদয়ে।

সে এখন বাঁচতে চায়। ভীষণভাবে বাঁচতে চায়। জীবনটা এত শিগগির শেষ হয়ে যেতে চাচ্ছে কেন? আশপাশ থেকে হানাদারদের পদশব্দ কানে ভেসে এলো রউফের। মৃত্যু কি অতি সন্নিকটে? তবু বাঁচার প্রয়াস। রউফ তার ভাঙ্গা পা থেকে ক্ষতিকর রক্তাক্ত দেহটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে মেখে মখে পড়ে রইল কাত হয়ে মড়ার মত। খানিক পরে রউফের ছোট ভাই মোয়াজ্জেম হোসেন ও জিনাত আলী মিলে ধরাধরি করে রউফকে নিয়ে যায় জনৈক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ঘরে। সেখানে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে পরবর্তী কালে শহীদ ডঃ মর্তুজার সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এমনি মৃত্যু আর জীবনের এক হৃদয় বিদারক কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে ইকবাল হলের চারপাশে।

২৬শে মার্চের ভোরে ইকবাল হলের যেখানেই দৃষ্টি পড়ে সেখানেই দেখা যায় শুধু লাশ। স্বদেশের সোনার ছেলেদের গুলি খাওয়া লাশ। আর আকাশে ধোয়ার কুণ্ডলি। এখান থেকেই শুরু হলো বাংলাদেশে পাক হানাদারদের বীভৎস লঙ্কা কাণ্ডের যাত্রা শুরু।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জগন্নাথ হলে পাক-বাহিনীর গণহত্যার ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন	দৈনিক পূর্বদেশ	ফেব্রুয়ারী,১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-১
পঁচিশের সেই ভয়ংকর রাতে তিনি একটানা ১৯ ঘন্টা ম্যানহোলে ছিলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জগন্নাথ হল। সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। পাশেই গোয়াল। এর নিকটে ম্যানহোলে একটানা ১৯ ঘন্টা আত্মগোপন করে থেকে তিনি আত্ম রক্ষা করেছেন। নিজেকে রক্ষা করেছেন হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলা থেকে। ম্যানহোল পুর্তি দুর্গন্ধময়। মাঝে মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে যেত। মাথা ঝিম ঝিম পা রি রি করত। উপায় নেই বেরুবার। অবিরাম গোলাগুলির শব্দ। মানুষের আর্তনাদ, কান্নার শব্দ, সবই তার কানে ভেসে আসছিল।

একটু পর পর কিছু সময় অন্তর অন্তর ম্যানহোল থেকে কোন রকমে গলাটুকু পর্যন্ত বের করে তিনি শ্বাস- প্রশ্বাস নিয়েছেন। এক পলক দেখে নিতে চেষ্টা করেছেন ম্যানহোলের বাহিরের দুনিয়াটাকে, যখন তখন বীভৎস হত্যালীলা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরিমল গুহ আমার কাছে ২৫শে মার্চের ভয়াল ভয়ঙ্কর রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

তিনি এই দুঃস্বপ্নের রাতের একজন সাক্ষী হয়ে ছিলেন। ম্যানহোলে কোন রকমে ঢুকে পড়ে মৃত্যুপুরীর নিশ্চিত পরিমাণ থেকে নিজেকে অনেকটা অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন ২৫শে মার্চ রাতে প্রায় ১১টার দিকে আমি প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রথীন রায়ের লক্ষীবাজারস্থ বাসা থেকে হলে ফিরি। তখনো হানাদার সামরিক বাহিনীর লোকেরা হামলা শুরু করেনি। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিকেড তৈরী করেছেন। গাড়িগুলো ক্ষীপ্র গতিতে চলাচল করছে। রথীন দার বাসা থেকে রাস্তায় পা বাড়াতেই লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথায় যাবেন। আমি জগন্নাথ হলে যাব শুনে সবাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, শহরের অবস্থা খুব উত্তপ্ত, যে কোন সময় সামরিক বাহিনী নামতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাই হবে এদের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

আপনি যাবেন না। শ্রী পরিমল গুহ বলেছেন, লোকজনের কথা শুনে আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই। ভাবলাম রাত্রে হলে ফিরব না, হলে তখন অনেক ছাত্র। হলে অবস্থানরত ৬০/৭০ জন ছাত্রের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তাদের কথা ভেবে আমি হলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মরলে সবাই একসাথে মরবো আর বাঁচলে সবাই একসাথে বাঁচবো। ওদেরকে ও ভাবে ফেলে আমি নিজের প্রাণ রক্ষাকে বিরোধী ভেবে হলে ফিরি।

রাত্র তখন পুরো ১১টা। চারিদিকে থম থমে ভাব। গাড়ি ঘোড়া চলাচল বন্ধ । নিরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে দূর থেকে গগনবিদারী শ্লোগান ‘‘জয় বাংলা, বাংগালী জেগেছে- বাংগালী জেগেছে।’’ হলের ছাত্ররা হলের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত! কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই অজানা আশংকায় শঙ্কাগ্রস্ত।

আমি তাদেরকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম। আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করলো না। কেই বললেন আমাদের উপর হামলা করার কোন কারণ নেই। এর প্রায় ২৫ জন ছাত্র বাহিরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার জন্য তৎক্ষণাৎ হল ত্যাগ করলেন। জানি না তারা এখন কোথায়? সত্যিই কি নিরাপদ হতে পেরেছিলেন,

না হানাদারদের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। আমাদের হলে পাক বাহিনী আক্রমণ করে রাত সাড়ে বারটায়। এর আগেই আমরা চারদিকে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

সেদিন আমরা রাইফেলের গুলির শব্দ শুনিনি। শুনেছিলাম মেশিনগান, মর্টার শেলিং ও মাঝে মধ্যে ট্যাঙ্কের প্রচণ্ড শব্দ। আমাদের সৈন্য প্রবেশের আগে আমরা যারা হলে ছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কেউ হলের ছাদে উঠলো, কেউ কেউ সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে, আবার কেউ কেউ নিজেদের রুমেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করল। আমি পিছনের দিকের ড্রেনের মধ্য দিয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলাম।

হানাদার সৈন্যরা তখন হলে ঢুকে পড়েছে। আমি দেখলাম তারা প্রতিটি রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। আমার কানে গুলির শব্দ পৌঁছাচ্ছিল। আমি পিছনের দিক দিয়ে বেরুলাম। ধীরে ধীরে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ড্রেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। হানাদার সৈন্যরা হলে ঢুকে পড়েছে। আমি তখনো ম্যানহোলে ঢুকে পড়িনি। দেখলাম সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে প্রতিটি রুম খুঁজছে।

হলে বাতি নেই। হল আক্রমণের আগেই বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল ওরা। তবুও দেখছিলাম ছাত্রদের ধরে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ত, কখনো বেদম প্রহার করতো, আবার কখনো ধরে নিয়ে আসত। এর মাঝেই কাছ থেকে গুলির শব্দ কানে আসলো। গুলির শব্দে আমার অন্তর আত্মা কেঁপে উঠলো। এর পরে আমি ম্যানহোলে ঢুকি। তখন রাত প্রায় ১টা।

২৬শে মার্চ। সকালে ভোরের সূর্য উঠলো। আমি ম্যানহোলে। সারাদিন ম্যানহোলে থাকলাম। সারাদিন আমার কানে শুধু গোলাগুলি আর মানুষের আত্মকান্না ভেসে আসছে বা এসেছে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। আর পারা যায় না। ১৯ ঘন্টা পর আমি প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তায় গুনে গুনে পা বাড়াই। দেওয়াল টপকিয়ে নিকটবর্ত্তী ষ্টাফ কোয়ার্টারে যাই। প্রফেসর সন্তোষ ভট্টাচার্যের বাসায় আশ্রয় নেই।

-দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-২

হোসেন তওফিক

জগন্নাথ হলে পাকিস্তান হানাদার সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণ শুরু হয়ে ২৫শে মার্চ রাত্র সাড়ে বারটায়। ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারলেন আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। ক'জন দল বেঁধে ছাদে উঠলেন, কেউ কেউ নিজের কক্ষেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন, দু'একজন সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলেন। জগন্নাথ হল। নর্থ হাউজ। ২৯ নং কক্ষ। কক্ষে দুজন ছাত্র থাকতেন। হরিধর ও সুনীল দাস। ২৫শে মার্চ সুনীলের একজন অতিথি এসেছিলেন। পরিমল বললো পাকিস্তানী হিংস্র হানাদারেরা নর্থ হাউজে আক্রমণ চালিয়ে প্রথমই ঢুকলো ২৯ নং কক্ষে।

তিনজনই তখন রুমে উপস্থিত। পাকিস্তানী সৈন্যরা এত হিংস্র হতে পারে তারা তা ধারণা করেননি। তাই সরল বিশ্বাসে তারা নিজেদের রুমটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ভেবেছিলেন। সৈন্যরা তিনজনকে পেয়ে গেলো। শিকার ধরতে পেরে এই পশু সৈন্যদের সে কি উল্লাস সে কি আনন্দ! পরিমল গুহ বললেন, হলে বিদ্যুৎ সরবারাহ বন্ধ। সৈন্যরা সার্চ লাইট সাথে এনেছিলো। তিনজনকে একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করল তারা। একত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এরপর সৈন্যরা রুমে একটা গ্রেনেড ছুড়ে মারলো।

পাছে যদি কেউ বেঁচে যায়। ব্রাশে সুনীল ও তার অতিথি মারা গেলেন। সুনীলের খবর নিতে এসে তিনি নিজেই নরপশুদের থাবায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হরিধরের গায়ে গুলি লাগেনি। মেশিনগানের গুলির শব্দে তিনিও অপর দুজনের সাথে পড়ে গিয়েছিলেন মেঝেতে কিন্তু গ্রেনেড লাগলো তার পায়ে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। পরিমল গুহ বললেন, গেনেড ছুড়েই হানাদার সৈন্যরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারা ভেবেছিল সবাই শেষ। কেউ মেশিনগানের গুলি এবং এর পরেই গেনেড চার্জে বাঁচতে পারেনা। কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন হরিধর। তার পা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। নিজের তাজা টকটকে লাল রক্তের ধারা নিজেই চেপে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারেন নি।

হরিধর বসে কক্ষ পাহারা দিচ্ছিলেন তার বন্ধু সুনীল আর তার অতিথির মৃতদেহ। কক্ষে রক্তের স্রোত বেরোবার উপায় নাই। হিংস্র হায়েনার দল এ কক্ষে সে কক্ষে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাদেরকে পেয়েছে তাদেরকেই হত্যা করেছে। হারিধর বিস্ময়ে বিমূঢ়। তার চেতনা শক্তি লোপ পাবার উপক্রম। হতবাক হয়ে বসে রয়েছেন। চিন্তা করছেন হরিধর, সুনীল ও তার অতিথি এবং অপরাপর ছাত্রদের শোচনীয় পরিণতির কথা। তিনি চিন্তা করছেন। খেই হারিয়ে যাচ্ছেন তবুও চিন্তা করছেন। হঠাৎ মনে পড়লো তার কক্ষের কয়টি শিক ভাঙ্গা। চেষ্টা করলে হয়তো বেরোনো যাবে মৃত্যুপুরী থেকে এপথে।

তখন শেষ রাত। হলের ভিতরে গোলা গুলির আওয়াজ কমে গেছে। হরিধর চেষ্টা করলেন। পাইপ বেয়ে নিচে নামলেন। কিন্তু নিরাপদ স্থান কোথায়। ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলেন তিনি পুকুরের দিকে। তখনো তার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তবে রক্তের বেগ কমে গেছে। প্রায় পানির সাথে মিশে তিনি পুকুরের পারে ঘাসের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এরপর এখানে থেকে তিনি আর সরেননি। মার্চ সকাল পর্যন্ত হরিধর এ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন।

সকালে কারফিউ তুলে নেওয়া হলো। জনৈক দোকানী এ পথে যাবার সময় অর্ধমৃত হরিধরকে দেখতে পায়। তিনি হরিধরকে ঢাকা মেডিক্যাল হাসাপাতালে নিয়ে গেলেন। বেশ কয়েকদিনের চিকিৎসার পর হরিধর সুস্থ হয়ে ওঠেন।

-দৈনিক পূর্বদেশ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-৩

২৫জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া কেউ এদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পাননি-
হলের ছাদে লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত

তাদের বুকের সাইজ মিলিয়ে দাঁড় করানো হল। কয়েকটা লাইন। প্রতি লাইনে তিনজন। তারপর ‘‘দ্রিম দ্রিম’’ শব্দ। মেশিনগানের গুলি। সবাই একসাথে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর একটু নাড়াচড়া করে মহান মৃত্যুর হীম শীতল স্পর্শে নীরব হয়ে গেলেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদের কথা বলছি। হানাদার পাকিস্তানী হায়েনার দল ২৫ মে মার্চে শেষ রাতে হলের ছাদে আশ্রয় গ্রহণকারী বেশ কয়েকজন ছাত্রকে এমনিভাবে গুলি করে হত্যা করে।

শ্রী পরিমল গুহ বলেনঃ পাকিস্তানী নর পশুদের তাণ্ডব নৃত্য দেখে সত্য দাস, রবীন ও সুরেস দাসসহ প্রায় জনা পঁচিশেক ছাত্র হলের ছাদে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন আত্মরক্ষার জন্য। একমাত্র সুরেস ছাড়া আর কেউ ওদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পাননি। তিনি বলেছেন সুরেস একটু বেঁটে খাঁটো। বুকের সাইজ অন্যান্যদের সাথে তার মিল ছিলোনা। তাকে সবার পিছনে দাঁড় করানো হলো। তারপর গর্জে উঠলো মেশিন গান। সকলের বুক হানাদারদের মেশিনগানের গুলিতে ঝাঝড়া হয়ে গেল। হলের ছাদ লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত বইলো। সুরেস

বেঁটে খাঁটো, তার বুকে গুলি লাগেনি। লেগেছিল তার কাঁধে। তিনিও সকলের সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ঠিক মৃতের মতো।

মৃতের মিছিলে জীবন্ত

মৃতের মিছিলে জীবন্ত সুরেস। আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিতে গিয়েও সবাই মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করলন; মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। কিন্তু শুধু বেঁচে রয়েছেন তিনি। বেঁচে রয়েছেন তিনি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের জীবন্ত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে। পরিমল বললেন, সুরেসের কাঁধের মাংস উড়ে গেছে মেশিনগানের শক্তিশালী গুলিতে। অবিরাম ধারায় ঝরছিল ক্ষত স্থানে গায়ের জোরে চেপে ধরেও তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারছিলেন না। নিজের শরীরের উষ্ণ রক্তে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

নিজের গায়ের টকটকে তাজা রক্ত অবিরাম ধারায় ঝরছে তো ঝরছেই। কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না তার রক্তপাত, রক্তের বেগ কমছে না। ব্যাণ্ডেজ করা দরকার কিন্তু ব্যাণ্ডেজ করবেন কি দিয়ে। পরনের লুংগি আর গায়ের গেঞ্জি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। লুংগি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে লুংগির ছেঁড়া টুকরো দিয়েই তিনি তৈরী করলেন ব্যাণ্ডেজ। ছাদের উপর সারিবদ্ধ তরুণদের মৃতদেহ। প্রহরীর মত তিনি জেগে আছেন একা। রক্তের স্রোত। হলের ছাদ লাল রক্তে ভেসে গেছে। চারিদিক নীরব নিঝুম। শুধু গোলাগুলির শব্দ ও মানুষের আর্তকান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পরিমল বলেই চলেছেনঃ মৃত্যুর পাশে বসে থাকার উপর তার ধিককার আসছিলো, আবার কখনো তার চোখের সামনে ভেসে উঠত ভীড় জমানো ফেলে আসা স্বপ্ন রঙ্গিন মধুময় হাজারো দিনের স্মৃতি।

আছড়ে আছড়ে কেঁদে সেসব স্মৃতি ফরিয়াদ জানাত। স্মৃতির মিছিলে সুরেস হারিয়ে ফেলতেন। হলের ছাদের উপর পানির ট্যাঙ্ক। হঠাৎ তার চেতনার উদয় হল। সুরেস আর দেরী না করে পানির ট্যাঙ্কে ঢুকলেন। ২৬শে মার্চ পুরোদিন ও সারারাত তিনি পানির ট্যাঙ্কেই কাটালেন আত্মগোপন করে। ২৭ তারিখ পানির ট্যাঙ্কে তার থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ২৭ তারিখে ভোরের দিকে হাতে প্রাণ নিয়ে তিনি ভয়ে ভয়ে নামলেন ছাদ থেকে।

এগিয়ে গেলেন জগন্নাথ হলের উত্তর পার্শ্বের রাস্তার দিকে। সুরেস ভয়ে সোজা হননি। হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিলেন। পরিমল গুহ তখন কারফিউ তুলে নেবার পর ষ্টাফ কোয়টার থেকে এদিকের রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সুরেসকে পরিমলের দেখা হওয়ায় সুরেস প্রাণ ফিরে পেলেন। পরিমল গুহ পরে সুরেসকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দিয়ে আসেন। পরিমল ছাদের নারকীয় হত্যা লীলার কাহিনী সুরেসের কাছ থেকে শুনেছেন।

-দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল- ৪

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল নরপশুরা। অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা তিনজন যখন প্রায় আধমরা তখন তাদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হলো-

২৬শে মার্চ সকাল ১১টা হানাদার সৈন্যরা ৫ জনকে ধরে নিয়ে এলো হলের ভিতরে। তাদের দিয়ে বিভিন্ন কক্ষ, হলের ছাদ, বারান্দা থেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লাশগুলো নিয়ে ট্রাকে তুললো। হলের মাঠে মাঝখানে আগে

থেকেই একটি বিরাট গর্ত খুড়ে রাখা হয়েছিল। লাশগুলো সেখানে নিয়ে এলো মাটি চাপা দেওয়ার জন্য। এই ৫ জনকেও সেখানে নিয়ে গেল। তারপর ঠিক গর্তের পারে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করলো। সবাই সাথে সাথেই লুটিয়ে পড়লো।

শ্রী পরিমল গুহ বললেন ২৬শে মার্চ সকালের কথা। তিনি তখনো ম্যানহোলে। স্বচক্ষে দেখেছেন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, বীভৎস দৃশ্য। তিনি বলেছেন, এই ৫ জনের মধ্যে তিনি কালীরঞ্জন শীলকে চিনতে পেরেছেন। আর কাউকে চেনা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করার পর হানাদার খুনীরা সবাই চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে।

হয়ত তারা আরো শিকার ধরার জন্যেই গেল। মাঠের গর্তের পারে রইলো আগণিত প্রাণের নিঃপ্রাণ দেহ। হঠাৎ এই মৃতের স্তুপ থেকে একজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল। পরিমল গুহ বললেন, আমি স্পষ্ট দেখলাম এই ভাগ্যবান ব্যক্তি কালীরঞ্জন শীল।

জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের স্যালুলয়েড ক্যামেরায় যার ছবি ধরা পড়েছে তিনি কালীরঞ্জন শীল। তিনি আবার ২৬শে মার্চ ভোরের কথা বললেন। খুব ভোরে হানাদার সৈন্যরা অধ্যাপক অনুদ্বেপায়ন ভট্টাচার্যকে ধরে নিয়ে আসে মাঠে। শ্রী ভট্টাচর্য হলেন একজন হাউজ টিউটর। এসেম্বলী বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষে থাকতেন। পরিমল গুহ দেখেছেন হলের ছাত্র বিধান রায় এবং অপর একজন লোককে তারা ধরে নিয়ে আসলো। শেষোক্ত ব্যাক্তির বেশভূষায় তাকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলে মনে হলো।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরনে ধুতি। তিনজনকে একত্র করা হলো। প্রহারের পালা। তারা তাদেরকে বুট দিয়ে লাথি দিচ্ছিল রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারছিল। বেদম প্রহার । তারা চিৎকার করছিলো, বিধান প্রহারের তীব্রভাবে সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দেবার কাকুতি করছিলেন। বার বার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বিধানের কথাতে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলো। নরপশু সৈন্যরা প্রহারে তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিল।

অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা যখন তিনজন প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাদেরকে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। তারপর সেই পরিচিত মেশিনগানের শব্দ। তারা তিনজন এলিয়ে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। পরিমল গুহ বললেন তিনি ২৬শে মার্চ মাঠে মানবতার পূজারী প্রখ্যাত দার্শনিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর গবিন্দ চন্দ্র দেবের মৃতদেহ দেখেছেন। তার গা খালি ছিল। সৈন্যরা তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে রেখেছিল মাটি চাপা দেবার জন্য।

-দৈনিক পূর্বদেশ, ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

‘‘জগন্নাথ হলের মাঠে ২৬শে মার্চের সকালে যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখেছি আমরা জানালা থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মুভি ক্যামেরায় তার ধরে রেখেছি’’-

যিনি টেলিশিন ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের হৃদয়বিদারক দৃশ্য সেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশলের অধ্যাপক ডঃ নূরুল উল্লার সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন : আপনি কি ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের ছবি নিজ হাতে তুলেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ আমি জগন্নাথ হলের মাঠে ২৬শে মার্চের সকাল বেলা যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য ঘটেছিল তার ছবি আমার বাসার জানালা থেকে টেলিস্কোপ ক্যামেরায় তুলেছিলাম।

প্রশ্ন : এ ছবি তোলার জন্য কি আপনার কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল, না এমনি হঠাৎ করে মনে হওয়াতে তুলে নিয়েছেন?

উত্তর : ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণের পর থেকেই আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে এবার একটা বিরাট কিছু পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। তাই তখন থেকেই বিভিন্ন সভা, শোভা যাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, মশাল মিছিল, ব্যারিকেড ইত্যাদির ছবি আমি তুলতে আরম্ভ করি।

প্রশ্ন : ক্যামেরাটি কি আপনার নিজস্ব?

উত্তর : না, ওটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ভি,ডি,ও, টেপ ক্যামেরা। ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি ধরনের আরো বহু ক্যামেরা ও জটিল যন্ত্রপাতি রয়েছে

প্রশ্ন : ক্যামেরাটি আপনার কাছে রেখেছিলেন কেন?

উত্তর : এর জবাব দিতে গেলে আমাকে আরো পেছনের ইতিহাস বলতে হয়। ইতিহাস কথাটা বলছি এ জন্য যে এগুলো ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখা উচিত। ৭ই মার্চের পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কিছু ছেলে এসে আমাকে ধরল, ‘‘স্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি অয়্যারলেস ষ্টেশন তৈরী করতে হবে আমি ওদের কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এর পরে ওরা একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথা ঠিক করে আমাকে তার ধানমণ্ডির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর একেবারে ভিতরের এক প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি প্রথমে ব্যাপারটার গুরুত্ব অতটা উপলব্ধি করতে পারিনি। অনেক ভিতরের একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম সেখানে সোফার উপর তিনজন বসে রয়েছেন। মাঝখানে বঙ্গবন্ধু। তার ডানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ও বাঁ পাশে তাজউদ্দিন সাহেব।

আমি ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে সালাম করলাম। ছাত্ররা আমাকে বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। যদিও অনেকবার তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি সোফা থেকে উঠে এসে আমাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে বললেন, ‘‘নূরুল উল্লা আমাকে ট্রান্সমিটার তৈরী করে দিতে হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই। তুমি আমায় কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা ট্রান্সমিটার আমার জন্য তৈরী রাখবে। আমি শেষবারের ভাষণ দিয়ে যাব।’’ বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ তখন আমার কাছে বাচ্চা শিশুর আবদারের আবেগময় কণ্ঠের মত মনে হচ্ছিল। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমাদের তড়িৎ কৌশল বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে খুলে বললাম। শুরু হল আমাদের কাজ। বিভাগীয় প্রধান ডঃ জহুরুল হকসহ প্রায় সকল শিক্ষকরাই আমাকে সহযোগিতা করতে লাগলেন ৯ দিন কাজ করার পর শেষ হল আমাদের ট্রান্সমিটার। এর ক্ষমতা বা শক্তি ছিল প্রায় সারা বাংলাদেশব্যাপী। শর্ট ওয়েভে এর শব্দ ধরা যেত। যাহোক পরবর্তী সময়ে এর ব্যবহার আসেনি। এই সাথেই আমার মাথায় ধারণা এল, যদি কোন হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ বা গোলাগুলি হয় তা হলে তা আমি ক্যামেরায় তুলে ফেলব। এবং সে থেকেই ক্যামেরাটি আমার সাথে রাখতাম।

প্রশ্ন : আপনি কখন ছবি তোলা শুরু করেন?

উত্তর : রাত্রে ঘুমের মাঝে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবশ্য আমরা তখন অতটা গুরুত্ব দেইনি। আমি ভেবেছিলাম যে আগের মতই হয়ত ছাত্রদেরকে ভয় দেখাবার জন্য ফাঁকা গুলী করা হচ্ছে। অথবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আমাদের নির্দেশ ও সহযোগিতায় যে সমস্ত হাত বোমা তৈরী করছিল তারই দু'একটা হয়ত বিস্ফোরিত হয়েছে। সারা রাতটা একটা আতঙ্কের মধ্যে কাটালাম। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে জগন্নাথ হলের দিকে তাকাতাম। কিন্তু সমগ্র এলাকাটা আগে থেকেই বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। রাতে জগন্নাথ হলের এলাকায় কি হচ্ছিল কিছুই দেখতে পারলাম না। শুধু গোলাগুলির শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে ওখানে দুপক্ষেই একটা ছোটখাটো লড়াই হচ্ছে। সাথে সাথে আমার ক্যামেরাটার কথা মনে পড়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সকাল হবে আর দিবালোকে আমি ছবি তুলতে পারব।

প্রশ্ন : আপনি যে ক্যামেরা বসিয়েছিলেন তা কি বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না?

উত্তর : এমনভাবে ক্যামেরা বসান হয়েছিল যে বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। কারণ পর্দার আড়ালে এমন ভাবে বসান হয়েছিল যে শুধু ক্যামেরার মুখ বের করা ছিল। পুরো ক্যামেরাটা কালো কাপড় দিয়ে মোড়ান ছিল। আমাদের জানালাগুলো এমনভাবে তৈরী যে বন্ধ করার পরেও ধাক্কা দিলে কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। ঐ ফাঁক দিয়ে ক্যামেরার মুখটা বাইরে বের করে রাখলাম।

প্রশ্ন : ক্যামেরা চালু করেন কখন?

উত্তর : সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যবর্তী সময়ে। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম যে জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে কিছু ছেলেকে ধরে বাইরে আনা হচ্ছে এবং তাদেরকে লাইনে দাঁড় করন হয়েছে, তখনই আমার সন্দেহ জেগে যায়। এবং আমি ক্যামেরা অন করি। আমাদের ক্যামেরাটির একটা বিশেষ গুণ এই যে, এতে মাইক্রোফোন দিয়ে একই সাথে শব্দ তুলে রাখা যায়। তাই আমি টেপের সাথে মাইক্রোফোন যোগ করিয়ে ক্যামেরা চালু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম যে ছেলেগুলোকে এক ধারছে গুলী করা হচ্ছে ও একজন একজন করে পড়ে যাচ্ছে। পাক সেনারা আবার হলের ভিতরে চলে গেল। আমি ভাবলাম আবার বেরিয়ে আসতে হয়ত কিছু সময় লাগবে। তাই এই ফাঁকে আমি টেপটা ঘুরিয়ে আমার টেলিভিশন সেটের সাথে লাগিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম যে ঠিকভাবে উঠেছে কিনা। এটা শেষ করতেই আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম যে, আবার কিছুসংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে এসেছে। আবার লাইন করে দাঁড় করান হচ্ছে। আমি তখন পূর্বের তোলা টেপটা মুছে ফেলে তার উপর আবার ছবি তোলা শুরু করলাম।

প্রশ্ন : আপনি পূর্বের তোলা ছবিটার টেপ কেন মুছে ফেললেন?

উত্তর : আমার মনে হচ্ছিল আমার আগের ছবিতে সবকিছু ভালোভাবে আসেনি। আর নতুন ছবি তুলতে গিয়ে আমি হয়ত আরো হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য ধরে রাখতে পারব। আর হাতের কাছে আমার টেপ ছিল না। মোট কথা আমি ঐ সমস্ত দৃশ্য দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেলাম। আজও দুঃখ করি যদি আমি নতুন টেপে ছবি তুলতে পারতাম তাহলে কত ভালো হতো। দুটো দৃশ্য মিলে আমার টেপের দৈর্ঘ্য বেড়ে যেত। কিন্তু তখন এত কিছু চিন্তা করার সময় ছিল না। যা হোক দ্বিতীয় বারের লাইনে দেখলাম একজন বুড়ো দাড়িওয়ালা লোক রয়েছে। সে বসে পড়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে। আমার মনে হচ্ছিল সে তার দাড়ি দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল যে

সে মুসলমান। কিন্তু বর্বর পাক বাহিনী তার কোন কথাই শুনতে চায়নি। তাকে গুলি করে মারা হল। মাঠের অপর অর্থাৎ পূর্বপার্শ্বে পাক বাহিনী একটা তাঁবু বানিয়ে ছাউনি করেছিল। সেখানে দেখছিলাম, ওরা চেয়ারে বসে করেয়কজন চা খাচ্ছে আর হাসি তামাসা ও আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

প্রশ্ন : লোকগুলোকে হলের ভিতর থেকে কিভাবে আনা হচ্ছিল?

উত্তর : যাদেরকে আমার চোখের সামনে মারা হয়েছে ও যাদের মারার ছবি আমার ক্যামেরায় রয়েছে। তাদের দিয়ে প্রথমে হলের ভিতর থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হচ্ছিল। মৃতদেহগুলি এনে সব এক জায়গায় জমা করা হচ্ছিল। এবং ওদেরকে দিয়ে লেবারের কাজ করাবার পরে আবার ওদেরকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সারিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল একটা করে পড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : জমা করা মৃতদেহের সংখ্যা দেখে আপনার ধারণায় কতগুলো হবে বলে মনে হয়েছিল?

উত্তর : আমার মনে হয় প্রায় ৭০/৮০ জনের মৃতদেহ এক জায়গায় জমা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে ওগুলো সবই ছাত্রদের মৃতদেহ?

উত্তর : আমার মনে হয় ছাত্র ছাড়াও হলের মালি, দারোয়ান, বাবুর্চি এদেরকেও একই সাথে গুলি করা হয়েছে। তবে অনেক ভালো কাপড়চোপড় পরা বয়সী দেখে আবার মনে হয় তারা ছাত্রদের গেষ্ট হিসাবে হলে থাকছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি দেখেছেন যে কাউকে গুলী না করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে?

উত্তর : না তবে লাইনে দাঁড় করাবার পরে যে খান সেনাটিকে গুলী করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল সে তখন পিছনে তার অফিসারের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে ছিল এই ফাঁকে দু'জন লোক সামনে স্তুপ করা মৃতদেহ গুলীর মধ্যে শুয়ে পড়ল। আর বাকিগুলোকে গুলি করে মারা হলো। গুলী করে যখন খান সেনারা সবাই কয়েক ঘন্টার জন্য এলাকা ছেড়ে চলে গেল সেই ফাঁকে ঐ দু'জন উঠে প্রাণ ভয়ে পালাতে লাগলো। পরবর্তীকালে তাদের একজন আমার বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে একজন ছাত্রের অতিথি হিসাবে হলে থাকছিল। ঢাকায় এসেছিল চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার ইচ্ছা মত সব ছবি তুলতে পেরেছিলেন?

উত্তর : না, আমি আগেই বলেছি যে আমি থেমে থেমে তুলছিলাম, পাছে টেপ ফুরিয়ে যায়। তাই আমি সব ছবি তুলতে পারিনি বলে আমারও ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। কারণ পরে যখন বুলডোজার দিয়ে সব লাশগুলোকে ঠেলে গর্তে ফেলা হচ্ছিল সে ছবি আমি তুলতে পরিনি। করণ ওরা কিছুক্ষণের জন্যে চলে যাবার পরপরই আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি টেপ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : না আমি সাথে নেয়াটা আরো বিপদের ঝুঁকি বলে মনে করে বাসায়ই যত্ন সহকারে রেখে যাই। আর এ ঘটনা আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানত না। বাইরে নিয়ে গেলে হয়তো অনেকেই জেনে ফেলত এবং আজকে এই মূল্যবান দলিল আমি দেশবাসীর সামনে পেশ করতে পারতাম না।

প্রশ্ন : আপনি কখন এই টেপ সবার সামনে প্রকাশ করলেন?

উত্তর যুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমার আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে। কখন কে জেনে ফেলে। কখন আমি ধরা পড়ে যাই বা কখন এটা এসে নিয়ে যায়। এমনি মানসিক যন্ত্রণায় আমি ভুগছিলাম। যাহোক দেশ স্বাধীন হবার পরে ১৭ই ডিসেম্বর-এর দিকে আমি আস্তে আস্তে প্রকাশ করলাম আমার এই গোপন দলিলের কথা এবং ২/৩ দিন পরেই এটা আমি সবাইকে জানালাম ও কয়েকদিন পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্যদের এটা দেখালাম। এ খবর শুনে অনেক বিদেশী সাংবাদিক আমার কাছে বহু টাকার বিনিময়ে এই দলিলের অরজিনাল কপি অর্থাৎ আসল টেপ চাইলেন।

প্রশ্ন : আপনি কি রাজি হলেন?

উত্তর : আমার রাজি হবার প্রশ্ন ওঠে না। অরিজিনাল কপি আমি হারালে সেটা আমার দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : নির্যাতনের এক অধ্যায়

বাংলার মানস সন্তানকে বিনাশ করতে কুখ্যাত পাক সামরিক চক্র ও তাদের অনুগ্রহলোভী সহযোগীরা যে ব্যাপক চক্রান্তে লিপ্ত হয় তার অন্যতম নিদর্শন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্যাতন। ২৫শে মার্চ রাত্রির নির্বিচারে হত্যা থেকে শুরু করে কয়েক পর্যায়ে এই নির্যাতন সংঘটিত হয় এবং ক্রমেই তা এক সুসংহত রূপ লাভ করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন চিন্তার অনুসারী ও খুনি সরকারের তোষামোদবিরোধী প্রতিটি শিক্ষক তাদের রোষানলে পতিত হয় ও শেষ আঘাতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাদের সবাইকে হত্যা করার এক পরিকল্পনা করা হয়।

কিন্তু বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক আগেই দেশত্যাগ করায় ও পাক বাহিনীর আকস্মিক পরাজয় বরণে এই মহা পরিকল্পনার অংশবিশেষ মাত্র কার্যকরী হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্যাতনের একটি চিত্র নিচে দেওয়া গেল।

মার্চ-এপ্রিলে যাদের হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ও তার কাছাকাছি সময়ে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তারা হলেন- ১। ডঃ গবিন্দ চন্দ্র দেব, (দর্শন), ২। অধ্যক্ষ এ, এন, এম মনিরুজ্জামান (সংখ্যাতত্ত্ব) ৩। ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (ইংরেজী), ৪। ডঃ ফজলুর রহমান খান (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), ৫। জনাব এ, মুকতাদির (ভূবিদ্যা), ৬। জনাব শরাফত আলী (অংক), ৭। জনাব এ, আর, কে, খাদেম (পদার্থ বিদ্যা), ৮। শ্রী অনুদ্বেপায়ন ভট্টাচার্য (ফলিত পদার্থ বিদ্যা), ৯। জনাব এম, সাদাত আলী (শিক্ষা গবেষণা), ১০। জনাব এম, এ, সাদেক (শিক্ষা ও গবেষণা)।

চাকুরী থেকে বরখাস্ত

পাকিস্তানী হানাদারেরা কয়েকজন শিক্ষককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে। তারা হচ্ছেন- ১। ডঃ এ, বি, এম, হাবিবুল্লাহ (ইসলামে ইতিহাস) ২। ডঃ এনামুল হক (বাংলা)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যপদ থেকে বহিস্কৃত হন-১। ডঃ এনামুল হক, ও ২। ডঃ কুদরত-ই-খুদা। যাদেরকে গ্রেফতার করা হয় ও রমনা হাজতে, দ্বিতীয় রাজধানীতে অবস্থিত পিওডব্লিউ কেজ ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয় তারা হচ্ছেন- ১। ডঃ আবুল খয়ের (ইতিহাস-), ২। জনাব রফিকুল ইসলাম (বাংলা), ৩। জনাব আহসানুল হক (ইংরেজী), ৪। জনাব সাদউদ্দিন (সমাজ বিজ্ঞান), ৫। জনাব শহিদুল্লাহ (অঙ্ক), ৬। জনাব রাশিদুল হাসান (ইংরেজী)।

যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় কিন্তু আত্মগোপন করে অথবা দেশ ত্যাগ করে বাঁচেন তারা হচ্ছেন ১। ডঃ আহমদ শরিফ (বাংলা), ২। ডঃ ওয়াজিউর রহমান। যাদের অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াফত করণসহ ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয় হয়। ১। জনাব আবদুর রাজ্জাক (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ২। ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ৩। ডঃ সারওয়ার মুরশিদ (ইংরেজী)।

চাকুরী থেকে বরখাস্ত ও আটক রাখার আদেশ প্রাপ্ত ১। ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (বাংলা)।

যাদেরকে সরকারীভাবে সাবধান করে দেয়া হয়। ১। অধ্যক্ষ মুনির চৌধুরী (বাংলা), ২। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা), ৩। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী), যে সমস্ত হাউস টিউটরকে জেরার জন্য ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হয় ১। জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ (মহসিন হল), ২। জনাব জহুরুল হক (মহসিন হল)।

১৪ই ডিসেম্বর আল বদর কর্তৃক ধৃত হয়ে যারা নিহত হন- ১। অধ্যক্ষ মুনির চৌধুরী (বাংলা), ২। জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), ৩। জনাব আনোয়ার পাশা ৪। ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস), ৫। মিঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য (ইতিহাস), ৬। জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস), ৭। জনাব রাশিদুল হাসান (ইংরেজী), ডঃ ফয়জুল মহী (শিক্ষা ও গবেষণা)।

আল বদর যাদের খুঁজে পায়নি- ১। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা), ২। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী), ৩। জনাব আহসানুল হক (ইংরেজী), ৪। জনাব সাদউদ্দিন (সমাজবিজ্ঞান), ৫। ডঃ মনিরুজ্জামান মিয় (ভূগোল), ৬। জনাব শহিদুল্লাহ (অংক), ৭। জনাব ওয়াকিল আহমদ (বাংলা), ৮। ডঃ আখতার আহমদ (শিক্ষা ও গবেষনা), ৯। জনাব জহুরুল হক (দর্শন), ১০। ডঃ এস ইসলাম (ইঃ ইতিহাস), ১১। ডঃ লতিফ (শিক্ষা ও গবেষণা)। এদের অনুসন্ধান করা ছাড়াও এদের উপর হামলার প্রমাণ পাওয়া যায় আল বদর সদস্য আসরাফুজ্জামান খানের ডাইরিতে। (পূর্বদেশ ১১ ই জানুয়ারী ১৯৭২)। আল-বদর আরো যাদের খোঁজ করেছিল, তারা হচ্ছেন- ১২। জনাব আবদুল হাই (দর্শন), ১৩। ডঃ এম, আর, তরফদার (ই, ইতিাহাস), ১৪। জনাব রফিকুল ইসলাম (বাংলা), ১৫। ডঃ তরিমত হোসেন (ভূতত্ত্ব) ইত্যাদি।

যাঁরা দেশ ত্যাগ করেন-

১। ডঃ সরোয়ার মুরশেদ (ইংরেজী ২। ডঃ আনিসুর রহমান (অর্থনীতি), ৩। জনাব রহমান সোবহান (অর্থনীতি), ৪। ডঃ ওয়াহিদুল হক (অর্থনীতি), ৫। ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ৬। ডঃ এ, বি, এম হাবিবুল্লাহ (ই, ইতিহাস), ৭। ডঃ অজয় রায় (পদার্থ বিদ্যা), ৮। জনাব নূর মোহম্মদ মিয়া (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ৯। ডঃ বেলায়েত হোসেন (পদার্থ বিদ্যা), ১০।। ডঃ জিল্লুর রহমান খান (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ১১। জনাব আবদুল মান্নান চৌধুরী (বানিজ্য), ১২। মিসেস সুলতানা সরওয়াত আরা (মনস্তত্ত্ব), ১৩। জনাব জয়নুল আবদীন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ১৪। মিসেস রাজিয়া খান আমিন (ইংরেজী), ১৫। ডঃ ওয়াজিউর রহমান (শিক্ষা ও গবেষণা), ১৬। ডঃ রওনক জাহান (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ১৭। ডঃ জহুরুল আনোয়ার (ফলিত পদার্থ বিদ্যা), ১৮। শ্রী জয়কুমার সরোজী (পদার্থ বিদ্যা), ১৯। শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য (বাণিজ্য) , ২০। ডঃ এ টি রফিকুর রহমান (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ২১। শ্রী রংগলাল সেন (সমাজ বিজ্ঞান) ও আরো অনেকে।

দৈনিক বাংলা, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

পঁচিশে মার্চে জগন্নাথ হলের সেই ভয়াল রাতের স্মৃতি

\ কালী রাঞ্জন শীল \

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ দিনটির কথা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা ওঠে। প্রতি বছর মার্চ মাসে আসে আর মনে পড়ে পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাতটির কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের উপর পাক

বাহিনীর বর্বর হামলার আমি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। একি সত্যি, না স্বপ্ন, না কোন ঘোরের মধ্যে সে সময়টা কাটিয়েছি। আমি থাকতাম জগন্নাথ হলের দক্ষিণ ভবনের দ্বিতলে, ২৩৫ নং কক্ষে। মার্চের শুরুতেই ঢাকা শহর উত্তপ্ত ছিল। ঘটনা প্রবাহ খুব দ্রুত গতিতে এগুচ্ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মানুষ নতুন নতুন খবর শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। শহরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ঐ দিনটিও গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমিও সমস্ত দিন মিটিং, প্যারেড মিছিল করে রাত ১১টার দিকে হলে ফিরলাম। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অল্পক্ষণের মধ্যে। হঠাৎ মাথার কাছাকাছি বোমার এক বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সজাগ হয়েই শুনি চতুর্দিকে শুধু গগনবিদারী টর টর পর শব্দ আর মাঝে মাঝে সে শব্দকে ছপিয়ে গুর গুর গুরুম শব্দ এবং দালান কোঠা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল হলের পুরান দালান বুঝি এক্ষুণি ভেঙে পড়বে। এমন গোলাগুলির শব্দ জীবনে শুনিনি, কল্পনাও করতে পারিনি। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রথমে একটু ঘাবড়িয়ে গেলাম। কি করা দরকার বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। সঠিক কিছু স্থির করতে না পেরে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নুয়ে নুয়ে দক্ষিণ দিকের সিড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠলাম। সেখানে সিঁড়ির কাছে আরো কয়েকজন ছাত্র জড়ো হয়েছিল আগেই। সুশীলকে খুঁজলাম। দেখলাম তিন তলার সিঁড়ির কাছে তার রুম তালা বদ্ধ। সুশীল ছিল আমাদের হলের সহ-সম্পাদক। পরে শুনেছি সে গুলাগুলির শুরুতেই মেইন বিল্ডিং (উত্তর ভবন)-এ চলে গিয়েছিল এবং সেখানে মারা গেছে। কেউ কেউ ছাদে ওঠার কথা বললো আমাকে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি তিন তলার বারান্দা দিয়ে নুয়ে নুয়ে উত্তর দিকে লেট্রিন ও বাথরুমের কাছে গেলাম। দেখি উত্তর বাড়ীর সমস্ত আলো নিভানো। মিলিটারী হলে ঢুকে টর্চের আলোতে ছাত্রদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে সামনের মাঠে শহীদ মিনারের কাছে গুলি করে মারছে। এক একটা ব্রাশ ফায়ার করছে আর চিৎকার করে কতগুলি তাজা প্রাণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিল। কেউ দৌড়ে পালাতে চেষ্ট করতেই তাকে সে অবস্থায় গুলি করে মারছে। এখনও ভাবতে পারি না এ দৃশ্য এতো বাস্তব ও জীবন্ত, তবুও মনে হয় স্বপ্ন। মাঝে মাঝে দালানের উপর ভারী কামানের গোলাবর্ষণ হচ্ছে। কোন কোনো স্থানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। এক সময় এসেম্বলির সামনে ডাইনিং হলটি জ্বলতে দেখলাম। উত্তর বাড়ীর কয়েকটি বাড়ীর কয়েকটি রুমেও আগুন দেখলাম। মাঝে মাঝে উপর থেকে নীচে সবুজ ও লাল রং-এর আলোর গোলা নামতে দেখছি। তখন চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। আর সেই আলোতে দেখা গেল উত্তর বাড়ীর সামনের মাঠে শত শত মিলিটারী মেশিনগান ও ভারী কামানের গোলাগুলি বর্ষণ করছে নির্বিচারে। এক সময় দেখলাম এক একটি গাড়ির বহর হেড লাইট বন্ধ করে থেকে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকে আবার চলে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ দেখে নিচ্ছে ঠিক ঠিক গুলি হচ্ছে কিনা, মানুষ মরছে কিনা। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেলো সলিমুল্লাহ হলের দিক থেকে ৪০/৫০ জন মিলিটারী দক্ষিণ বাড়ীর ঘরের দিকে এলো এবং দরজা ভেঙে খাবার ঘরে ঢুকল। খাবার ঘরের আলো জলল এবং এলোপাতাড়ি জানালা কবাটের উপর গুলি ছুড়তে লাগলো। কয়েকজন চীৎকার করে মারা গেলো বুঝতে পারলাম। এক সময় দক্ষিণ বাড়ীর দারোয়ান প্রিয়নাথকে দিয়ে বেরিয়ে এলো মেশিনগানের মুখে। তাঁকে দিয়ে মেইন গেট পশ্চিমদি দিক দিয়ে খুলিয়ে ঢুকে পড়লো হলের মধ্যে। তখন আর আমি মিলিটারীদের দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি প্রথমে লেট্রিনে ও সেখান থেকে জানালা পেরিয়ে তিন তলার কার্ণিশে গেলাম ও শুয়ে পরলাম। সেখানে কয়েকটি শাল গাছ ছিল। একটি মোটা ডাল (শাখা) কার্নিশের কাছে নুয়ে ছিল। একবার ভাবলাম গাছে উঠি। শেষ পর্যন্ত গাছে না উঠে কার্নিশেই শুয়ে থাকলাম। হলের মধ্য তখন শুধু গুলির শব্দ আর চীৎকার শোন যাচ্ছিল। একতলা, দোতলা করে এভাবে ওরা তিন তলায় উঠল বুঝলাম। এক সময় আমার কাছেই কয়েকটি গুলির শব্দ হল। আমার মাথা সোজা দেয়ালের বিপরীত দিকে একটা লোক গোঙ্গাচ্ছে শুনতে পেলাম। আমি তখন ভাবছি কখন আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু আমাকে ওরা দেখেনি বুঝতে পারলাম। বুঝলাম ওরা নেমে গেল। নীচ থেকে 'ফরিদ' বলে ডাক দিল। একজন সৈন্য সাড়া দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল। যেভাবে ছিলাম সেভাবে শুয়ে থাকলাম কিছু সময় । এক সময় কার্নিশ থেকে উঠে আবার লেট্রিনে ঢুকলাম এবং সেখান থেকে উত্তর বাড়ী, তার সামনের

মাঠ ও সলিমুল্লাহ হলের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সেখানে তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলাম আর কখন এসে আমাকে ধরে নিয়ে গুলি করবে সেই মুহূর্ত গুনতে লাগলাম। এক সময় দেখা গেলো সলিমুল্লাহ হলের দিকে আগুন। সলিমুল্লাহ হলের দক্ষিণ পূর্ব কোণের বড় একটি গাছেও আগুন জ্বলতে দেখলাম। মাঝে মাঝে উত্তর বাড়ীর পশ্চিম দিকের আকাশ লাল হয়ে উঠছিল। আর বুঝতে পারছিলাম ঐ দিকের কোথাও আগুন লাগিয়েছে পাক সেনারা। বাইরের মতো হলের মধ্যেও চলল সমস্ত রাত গোলাগুলি আর আগুন।

এক সময় কোন একদিকে আজানের শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্য আরো কয়েকদিকে আজান শোনা গেল। মনে হলো আজানের এমন করুণ সুর এত বিষণ্ণ সুর আর কোনো দিন শুনিনি। গোলাগুলির শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো কিন্তু বন্ধ ছিল মুহূর্তের জন্য মাত্র। আবার চলল গোলাগুলি পুরোদমে। ভোরের দিকে মাইকে কারফিউ জারির ঘোষণা শুনলাম। তখন ভাবলাম বেলা হলে বোধ হয় এমন নির্বিচারে আর মারবে না। কিন্তু একটু ফর্সা হয়ে যেতেই দেখা গেলো এখানে সেখানে পালিয়ে থাকা ছাত্রদের ধরে এনে গুলি করছে। যেন দেখতে না পায় আমাকে এভাবেই মাথা নিচু করে লেট্রিনের মধ্য বসে রইলাম।

বেলা হল। এক সময় আমার কাছাকাছি বারান্দায় অনেকের কথা শুনতে পেলাম। ছাত্ররা কথা বলছে তা নিশ্চিত হয়ে আমি লেট্রিনের দরজা খুলে বেরুলাম। বেরিয়ে দেখি সিঁড়ি মাথায় মেশিন গান তাক করে মিলিটারী দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকজন ছাত্র একটি লাশ ধরাধরি করে নামাবার চেষ্টা করছে। রাতে আমার মাথার কাছে দেওয়ালের ওপাশে যে গোঙ্গাচ্ছিল এটা তারই লাশ। এবং সে আর কেউ নয়, আমাদের হলের দারোয়ান, সবার প্রিয় প্রিয়নাথ দা। তাঁকে দিয়ে মেশিনগানের মুখে সব পথ দেখে নিয়ে নামার মুহূর্তে এখানে গুলি করে রেখে গেছে। আমিও আর নিষ্কৃতি পেলাম না।

আমাকেও ধরতে হলো লাশ। তিন তলা থেকে দোতলা, সেখান থেকে একতলা দক্ষিণ দিকের ভাঙা গেইট দিয়ে ব্যাংকের (এখন যেটা সুধীরের কেন্টিন ওটা ছিল ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান) উত্তর পাশে নিয়ে রাখলাম। আরো লাশ জড়ো করা হলো সেখানে। ওখানে আমাদের বসার নির্দেশ দিল একজন পাক সেনা।

তখন ছিলাম আমরা কয়েকজন ছাত্র, কয়েকজন মালী, লন্ড্রির কয়েকজন দারোয়ান গয়ানাথের দুই ছেলে শংকর ও তার বড় ভাই, আর সবাই ছিল সুইপার। লাশগুলো পাশ ঘিরে আমরা সবাই বসেছিলাম। সুইপারগুলো তাদের ভাষায় মিলিটারীদের কাছে অনুরোধ করছিল ওদের ছেড়ে দেয়ার জন্য। বলছিল ওরা বাঙালী নয়। সুতুরাং ওদের কি দোষ? একজন মিলিটারী ওদের আলাদা হয়ে বসতে বললো আমাদের কাছ থেকে। ওদের নিয়ে কয়েকজন মিলিটারী সোজা উত্তর বাড়ী মাঠে চলে গেলো। ভাবলাম ওদের ছেড়ে দেবে। আমাদের আবার ঐ লাশগুলো বহন করতে আদেশ দিল। লাশগুলি নিয়ে এ্যাসেমব্লির সামনের রাস্তা দিয়ে সোজা পূর্ব দিকের গেটের বাইরে চলে গেলাম। গেটের বাইরে দক্ষিণ পাশে একটি বড় গাছের গোড়ায় জড়ো করলাম লাশগুলো। এই সময় আমাদের সাথে প্রায় সমানসংখ্যক মিলিটারী ছিল। এবং তারা সবাই ছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ওখানে যেয়ে মিলিটারীরা দাঁড়ালো অনেকক্ষণ। একজন সিগারেট বের করে দিল সবাইকে। আমাদের কেউ বসে, কেউ শুয়ে থাকলো। আমিও কাত হয়ে ছিলাম গাছের শিকড়ের উপর। এইখানে পাক সেনারা আমাদের উদ্দেশ্যে বিশ্রী ও অকথ্য ভাষায় ক্রমাগত গালাগালি করছিল। যতোটা বুঝতে পারছিলাম তাতে বুঝলাম, শালা! বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেবো; বল শালারা জয় বাংলা। শেখ মুজিবকেও বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেবো। আরো নানা অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছিলো। এ সময় একটি গাড়ীর বহর রেস কোর্সের দিক থেকে এসে ওখানে থামল। আমাদের সাথের মিলিটারীর একজন সামনের একটি জীপের কাছে গেলো। তাকে কিছু নির্দেশ দেয়া হলো বুঝলাম।

সেখান থেকে আমাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে নিয়ে গেলো লাশ বয়ে আনতে। আমাদের অংশটিকে নিয়ে গেলো ডঃ গুহ ঠাকুরদা যে কোয়ার্টারে থাকতেন সেই দিকে। সেই বিল্ডিং-এর সিঁড়ির কাছে অনেকগুলি লাশ পড়ে ছিল, সিঁড়ির কাছে এনে গুলি করেছে বোঝা গেল। একটি লাশ দেখলাম সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরা, মাথায় টুপি, পাতলা চেহারা। সেখান থেকে নিয়ে গেলো দোতলা, তিনতলা ও চারতলায় লাশ বয়ে আনতে। প্রতিটি তলায় ওরা খোঁজ নিচ্ছিল কোন জীবিত প্রাণী আছে কিনা। আর খুঁজছিল দামী মালামাল, ঘড়ি, সোনাদানা ইত্যাদি। চারতলায় একটি রুমে ঢুকতে পারছিল না। কারণ রুমের দরজা বন্ধ ছিল ভিতর থেকে। দরজা ওরা ভেঙ্গে ফেলল। ঢুকে কাউকেই পাওয়া গেল না। কতকগুলি এলোমেলো কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না সেখানে। একজনকে ছাদে উঠে কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা নামাতে বলল। পতাকা নামিয়ে আনলে মিলিটারীদের একজন নিয়ে নিলো সেগুলো। আমাদের নীচে নামতে বলল। নীচে নামলাম আমরা। সিঁড়ির কাছের লাশগুলি নিতে বলল। অনেক লাশ রাস্তায় আগেই জমা করা ছিল। বয়ে আনা লাশগুলিও জড়ো করলাম এগুলির পাশে। পরে নিয়া গেলো ঐ বিল্ডিং এর সামনে দোতলা বাংলো বাড়ীটিতে (তখনকার এস এম হলের প্রভোস্টের বাড়ী)। সামনে দিয়ে ঢুকতে না পেরে পিছন দিয়ে ঢুকলাম ঐ বাড়ীতে। নীচতলা, দোতলার সবগুলি রুমেই খুঁজলাম। এলোমেলো কাপড়-চোপড় সুটকেস, বাক্স, খোলা ফ্যান ছাড়া কিছুই দেখা গেল না সেখানে। মিলিটারীরা দামী জিনিসপত্র খুঁজে খুঁজে নিয়ে নিলো। কোন লাশ কিংবা রক্তের দাগ ছিল না ঐ দালানে। নেমে আসলাম আমরা সবাই এবং জড়ো হলাম আবার লাশের কাছে। মিলিটারীরা কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা পোড়ালো।

আমাদের আবার লাশ নিতে বললো। রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তর দিকে অধ্যাপক গোবিন্দ দেবের বাসার সম্মুখ দিয়ে ইউওটিসি বিল্ডংয়ের সামনের জগন্নাথ হলের মাঠের পূর্ব দিকের ভাঙা দেওয়াল দিয়ে ঢুকতে বলল। হলের মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে শহীদ মিনারের সংলগ্ন লাশগুলির কাছে জড়ো করতে লাগলাম লাশগুলি। লাশ যখন নিচ্ছিলাম তখন দেখলাম ডঃ দেবের বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসছে সেলাইর মেশিন ও অন্যান্য ছোটখাটো রাস্তার তিন মাথায় অনেকগুলি মর্টার চতুর্দিকে তাক করে রেখেছিল।

দুজন তিনজন করে আমরা এক একটা লাশ বহন করছিলাম। কোন জায়গায় বসলে কিংবা ধীরে হাঁটলে গুলি করার জন্য তেড়ে আসছিল। সব সময়ই আমরা গা ঘেঁষে বসছিলাম ও চলছিলাম।

কতগুলো লাশ এভাবে বহন করেছি মনে নেই। শেষ যে লাশটা টেনে ছিলাম তা ছিল দারোয়ান সুনীলের। তার শরীর তখনও গরম ছিল। অবশ্য রৌদ্রে থাকার জন্যও হতে পারে। লাশ নিয়ে মাঠের মাঝামাঝি যেতেই হঠাৎ কতকগুলি মেয়েলোক চিৎকার করে উঠলো দেখি মাঠের দক্ষিণ দিকের বস্তিটির মেয়েছেলেরা মাঠের দিকে দাঁড় করিয়েছে গুলি করার জন্য। এই সব সুইপারদেরই ব্যাংকের কাছে আমাদের থেকে আলাদা করে মাঠে নিয়ে এসেছিলো ওরা। সুইপারদের গুলি করে মারছে আর ঐ ছেলেমেয়েরা চিৎকার করছে এবং ছুটে যেতে চাচ্ছে ওদিকে। বুঝলাম এবার আমাদের পালা। আমাদের আগে যারা লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল তাদেরও দাঁড় করিয়েছে। । তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে জোরে শব্দ করে কোরআনের আয়াত পড়ছিল। ব্যাংকের কাছে যখন বসে ছিলাম তখন জেনেছি এই ছেলেটি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। কিশোরগঞ্জে ছিলো তার বাড়ী। আগের দিন বিকালে আর এক বন্ধুসহ এসে উঠেছিল তার হলের এক বন্ধুর রুমে। গুলি করল তাদের সবাইকে। আমরা কোন রকমে দুজনে লাশটা টানতে টানতে নিয়ে এসেছি। সামনেই দেখি ডঃ গোবিন্দ দেবের মৃতদেহ। ধুতি পরা, খালি গা। ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত সারা শরীর। পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। আমার সাথে যে ছেলেটি লাশ টানছিল সে গবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বলল 'দেবকেও মেরেছে! তবে আমাদের আর মরতে ভয় কি? কি ভেবে, আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশসহ শুয়ে পড়লাম। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা থাকার অবস্থা তখন আমার ছিল না। চোখ বুজে পড়ে থেকে ভাবছিলাম এই বুঝি লাথি মেরে তুলে গুলি

করবে। এক সময় ভাবছিলাম তবে কি আমাকে গুলি করেছে, আমার তখন অনুভূতি নেই। কি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। এই মড়ার মত অবস্থায় কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারি না। এক সময় আমার মাথার কাছে মেয়ে-ছেলেদের ও বচ্চাদের কান্না শুনতে পেলাম। চোখ খুলে দেখি সুইপার, দারোয়ান ও মালিদের বাচ্চারা ও মেয়ে-ছেলেগুলি মৃত স্বামী কিংবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে। তখনও অনেকে মরেনি। কেউ পানি চাচ্ছে তাদের কেউ কেউ পানি খাওয়াচ্ছে। এই সময় দেখলাম কে একজন গুলি খেয়েও হামাগুড়ি দিয়ে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাথা তুলে দেখি যেদিকে মিলিটারীর গাড়ী ও অসংখ্য মিলিটারী ছিল সেদিকে কোন গাড়ী বা মিলিটারী নেই। চতুর্দিকে একনজর দেখে নিয়ে মেয়ে- ছেলে ও বাচ্চাদের মধ্য দিয়ে নুয়ে নুয়ে বস্তির মধ্যে গেলাম। প্রথমে গিয়ে ঢুকি চিৎবালীর ঘরে। চিৎবালী ঘরে ছিল না। এক মহিলা ভয়ে কাঁপছিল। তাঁর কাছে পানি খেতে চাইলে সে একটি ঘটি দেখিয়ে দিল। পানি খেয়ে ওর ঘরের কোণে যে ঘুঁটে ছিল তার নীচে লুকিয়ে থাকতে চাইলাম। মহিলাটি আমাকে তক্ষুনি সরে যেতে বলল। তখন আমি বস্তির পাশের লেট্রিনে ঢুকে পড়ি।

এই সময়ে রাজরবাগের দিকে গোলাগুলি হচ্ছিল। এক একটা প্রচণ্ড শব্দ। থেমে থেমে গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। একটু বাদেই দু'টি প্লেন উড়ে গেলো বুঝতে পারলাম। এভাবে অনেক্ষণ কাটালাম সেখানে।

এক সময় একটা লোক এসে লেট্রিনের দরজা নাড়া দিল। দরজায় নাড়া শুনে ভাবলাম এইবার শেষ। মিলিটারী নিশ্চই এসেছে। খুলে দেখি একটি লোক, মিলিটারী নয়। লোকটি বলল তার নাম ঈদু। পুরনো বই বিক্রি করে রাস্তার ওপারে। বলল, হলে এসেছিল মেয়েদের মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে। আমি আছে শুনে আমাকেও নিয়ে যাবে। প্রথমে যেতে চাইনি। বুঝতে পারছিলাম না কি করব। বলল, সে সাথে যাবে। রাস্তা এখন পরিস্কার- কেনা মিলিটারী নেই। গায়ে সেই চাপ চাপ রক্ত নিয়ে ওর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। বকসি বাজারের কাছ দিয়ে যেতে দেখি ওদিকে কোন মিলিটারী যায়নি। অনেকে অজু করছে নামাজ পড়ার জন্য। সেদিন ছিল শুক্রবার এবং জুমার নামাজের সময়।

ঈদু আমাকে জেলখানার পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গার পারে নিয়ে গেল। এক মাঝিকে অনুরোধ করায় নদী পার করে দিলো। নদীর ওপারে দেখা আমাদের হলের এক প্রাক্তন ছাত্র সুনির্মল চৌধুরীর সাথে। সে নিয়ে গেলো তার কর্মস্থল শিমুলিয়া। সেখান থেকে প্রথমে নবাবগঞ্জ ও পরে নিজগ্রাম বরিশালের ধামুরাতে চলে যাই।

সে ভয়াল রাতে জগন্নাথ হলে যে হত্যাযজ্ঞ হয়েছিল এখন সে দৃশ্য কল্পনা করলে আমার সমস্ত মানবিক অস্তিত্ব মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনও আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না... অমি বেঁচে আছি। এ কি সত্যি! ভাবতে গেলে তখন সবকিছু যেন তছনছ হয়ে যায়। সব কিছুই স্বপ্নের মত মনে হয়। আমি কি কোন এক নেশার ঘোরে সেদিন হল জীবনের নিত্যসঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবের লাশ টেনে মাঠে নিয়ে গিয়েছিলাম। মার্চের শুরুতে এখনও মাঝে মাঝে ঐ দিনের কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যাই। সেই ঘোর এখনও আমার অস্তিত্বে তীব্র কশাঘাত করে।

'বাসন্তিকা'
হীরক জয়ন্তী সংখ্যা
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে, ১৯৭১

শরোনাম	সুত্র	তারিখ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক বাহিনীর হত্যাভিযান	দৈনিক বাংলা	১৯ জানুয়ারী, ১৯৭১

পঁচিশে মার্চ ও তার পরদিন
\ মনজুর হাসান \

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম শহীদ মিনারের সামনে ৩৪ নম্বরের এক তলার ফ্লাট বাড়ীতে। আমাদের এ বিল্ডিং এর পশ্চিম দিকের তিনতলায় পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মনিরুজ্জামান সে রাত্রে বিছানায় যেয়েও ঘুমোতে পারেননি, একথা তাঁর স্ত্রীর কাছে শোনা। দিন কতক আগে এখানে রাস্তায় গাছ ফেলে যে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিল সেনাবাহিনীর একদল প্রথমে তা কেটে সরিয়ে দিতে আসে।

সেই সব ডালাপালা কাটার শব্দ হচ্ছিল। এর কিছু পরই পাক সৈন্যের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আক্রমণ শুরু হয়। ছাত্রাবাসগুলোর দিক থেকে সৈন্যদের গোলাগুলীর আওয়াজে মনিরুজ্জামান সাহেব অস্থির হয়ে ওঠেন এবং বদনায় পানি নিয়ে পরপর তিনবার ওজু করেন। এমন সময় জগন্নাথ হলের কাছে গর্জে ওঠে বর্বর পাক সৈন্যদের গোলার আওয়াজ।

চারপাশে গোলাগুলীর শব্দে আমার ঘুম ঙ্গে যায় এবং পর মহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারের পাশেই মনে হলো তোপধ্বনির আওয়াজ। আমি যে ঘরে ঘুমাতাম, তার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টার, তার দক্ষিণে শহীদ মিনার। সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঘর আলোকিত হয়ে উঠে মুহূর্তের জন্যে। আমি বিছানা থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ি।

আমার ছেলেটিকে আমি আর আমার স্ত্রী মেঝেতে শুইয়ে চেপে ধরি। ছোট ছেলে ভয়ে একবার শক্ত হয়ে যাচ্ছিল আর শুয়ে থেকে শুধু কাঁদছিল। আমি মেঝেতে পড়ে থেকে কয়েক মুহূর্তে চিন্তা করতে চেষ্টা করছিলাম, কি হলো? চারদিকে অনবরত গোলাগুলির শব্দ আর রাস্তা দিয়ে ভারী গাড়ী চলার শব্দ পাচ্ছিলাম। ঠিক এমন সময় জগণ্নাথ হলের পূর্ব দিকে আমাদের ৩৪নং বাড়ীর গেটের ভিতরে তিনটি মিলিটারী গাড়ী ঢোকে। তারপরই ভারী বুটের শব্দ এবং আমাদের দরজায় লাথি ও ধাক্কা শুরু হয়- 'দরজা খোল, দরজা খোল'।

ঠিক এর পরই সব ফ্লাটের দরজায় লাথি মারা আরম্ভ হয় গেছে এবং সব বাড়ীর কলিং বেলগুলো ওরা বাজাচ্ছে। মা, বোনেরা এবং ছোট ভাইটি অন্য ঘর থেকে ছুটে আমার ঘরে এলো। মা বললেন, 'বাবা' ও দিক দিয়ে দেখলাম, মিলিটারীরা বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। আর বিল্ডিং-এর টেলিফোনের লাইনগুলো কেটে দিল। আমার ঘরে সকলকে মেঝেতে শুয়ে যেতে বললাম। মাকে বললাম 'ওরা যদি দরজা ভেঙ্গে আসে তাহলে আসুক, দরজা খুলব না আমরা।

বাড়ীতে আমার বয়সী এক আত্মিয় ছিলেন, উনি এই সময় বিল্ডিং এর ভিতরে বাঁচার আশা ত্যাগ করে বলতে লাগলেন, 'আমি জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে যেয়ে লুকাবো' এবং ফ্ল্যাট ছেড়ে পিছন দিক দিয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হলেন। আমি আর মা ওকে জাপটে ধরলাম। উনি বারান্দার নেট ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হলেন। মা আর আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'যদি আমরা মরে যাই সবাই এক সাথে মরে যাবো'।

এমন সময় দুটো সৈন্য আমাদের জানালার পাশ দিয়ে দৌড়ে এসে ফ্ল্যাটের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। দরজাটি ছিল বাগানে যাবার জন্য খুব কম মজবুত একটা প্লাইউড দিয়ে বানানো দরজা। আমরা বারান্দা থেকে

মুহূর্তে ঘরে ঢুকলাম; কিন্তু আমার ঘরের দরজা লাগাবার সাহস হলো না যদি শব্দ হয়ে যায়। এর অল্প পরই সৈন্য দুটো চলে গেল পাশের পশ্চিম দিকে একতলার ফ্ল্যাটের পেছনে, সম্ভবতঃ ওদিককার দরজা খুলে ফেলার আওয়াজ শুনে। আমি দরজা লাগিয়ে দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

মৃত্যু আসন্ন মনে হলো, আমরা সকলে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম। ততক্ষণে আমাদের দরজায় লাথি মারা থেমেছিল কিন্তু আবার শুরু হলো 'খোল খোল' আর লাথি। ভারী বুটের দুড়দাম করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার শব্দের মাঝে জোরে শুনতে পেলাম মনিরুজ্জামান সাহেবের গলার আওয়াজ-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। চার-পাঁচবার শুনতে পেলাম উনার কালেমা পড়ার শব্দ, তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন যেন।

বাইরে চারিদিকে গোলাগুলীর আওয়াজ-এর পরই আমাদের বাইরের দরজার উপর গুলী হলো, আর কয়েকটা বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে এলো। ১২/১৪ রাউ- গুলীর শব্দ শুনলাম। মনে হলো, মেরে ফেললো- মরে গেল মানুষ। রাত তখন দেড়টা। তারপর আমাদের বিল্ডিং-এ সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে শুনলাম ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরদার চীৎকার, 'বাসন্তী- দোলা।' তিনি স্ত্রী ও মেয়ের নাম ধরে ডেকে উঠেছিলেন। বিল্ডং-এর সামনে তাঁকে গুলি করা হয়েছিল।

উনি ঘাসের উপর পড়েছিলেন। ডঃ জ্যোতির্ময় ২৫শে মার্চের পরও কয়েকদিন জীবিত ছিলেন এবং ২৭শে মার্চের সকালে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে নেয় হয়। মনিরুজ্জামান সাহেবের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙ্গে গিয়েছিল মিলিটারীর বুটের ধাক্কায়। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁর বোন, জ্যোতির্ময় বাবুর গলার আওয়াজ শুনে পানি নিয়ে নীচে নামছিলেন। তাঁরা তিনতলা থেকে আর্মিদের চলে যেতে দেখেছেন এবং তখনো বুঝতে পারেননি যে নীচে তাঁদের বাড়ীর লোকজনদের একতলার দরজার উপর হত্যা করা হয়েছে।

মনে করেছিলেন এরেষ্ট করে নিয়ে চলে গেল। নীচে নামতেই দেখতে পেলেন এক ভয়াবহ দৃশ্য। মনিরুজ্জামান সাহেবের ষোল বছরের ছেলের তখন অন্তিম মুহূর্ত। সে কষ্টে বলেছিল 'মা পানি দাও'। মুখে পানি দেবার পর সে এক মুখ পানি নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ছেলের পাশে পড়ে ছিলেন মনিরুজ্জামান সাহেব, তাঁর প্রায় ৩০ বছর বয়স্ক ছোট ভাই এবং ১৪ বছরের ভাগ্নেটি। এই চারজন শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেয়ে মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী জ্যোতির্ময় বাবুর মুখে পানি দেন।

পূর্ব দিকের দোতলায় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দেখতে পান আর্মি চলে গেছে এবং জ্যোতির্ময় বাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল বিল্ডিং-এর সামনে ঘাসের ওপর থেকে। তখন রাজ্জাক সাহেব বাসা থেকে একজন লোক নীচে নামতে যেয়ে দোতলার দরজায় এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ঘরে ঢুকে পড়ে। এরপর রাজ্জাক সাহেব তাঁকে নিয়ে নীচে নেমে আসেন। এ সময় জ্যোতির্ময় বাবুর স্ত্রী, সারভেন্ট কোয়ার্টার থেকে তাঁর ড্রাইভারকেও ডেকে এনেছিলেন।

তাঁরা কয়েকজন ধরাধরি করে পশ্চিম দিকের একতলায় জ্যোতির্ময় বাবুকে তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। ঠিক এই সময় আবার বিল্ডিং এর গেটের কাছে আর্মি এসে পড়ে। এর আগেই রাজ্জাক সাহেব দোতলায় তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন এবং সকলেই দরজা বন্ধ করে ফেলেন। বাড়ীর বাগানে বেরুবার পেছন দিকের দরজা দিয়ে সৈন্যরা জ্যোতির্ময় বাবুর ফ্ল্যাটে ঢোকে এবং তাঁকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়। এ কথা তাঁর কাছ থেকে শোনা। ২৭শে মার্চ জ্যোতির্ময় বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে মেডিক্যালে দেখা হয় এবং তাঁকে সাথে করে ডঃ জ্যোতির্ময় বাবুর বেডের পাশে যেয়ে দাঁড়াই।

দেখেছিলাম তাঁর ঘাড়ের কাছে গুলি লেগে এদিক থেকে ওদিক দিয়ে বেরিয়েগেছে এবং ডান হাত ও ডান পা অবশ হয়ে গেছে। জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল এবং খুব ভালোভাবে তখন আমার সাথে কথা বলছিলেন। মনের জোর

তখনো অটুট ছিল। বলেছিলেন, রাইট সাইডটা পেরালাইজড কিন্তু বেশ বহাল তবিয়েতেই আছি। উনি বলেছিলেন যে নাম জিজ্ঞাসা করার পরই তাঁকে গুলী করা হয়। এরপর আরম্ভ হলো আমাদের বিল্ডিং-এর উত্তর দিকে প্রায় বিশ গজ দূরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোষ্টের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা।

'খোল খোল, দরজা খোল'-আর দরজায় লাথি, ধাক্কা। কিছুক্ষণ চললো, তারপর থেমে গেল। তারা বাকী রাত্রিটুকুর মধ্যে ওখানে পুরনো দিনের মজবুত দরজা খোলার আরো দুবার চেষ্টা চালায়। চারদিকে অনবরত গুলীর শব্দ। ভোর হলো। থেকে থেকে আশপাশে গুলীর শব্দ হচ্ছে। সকাল ৯টার দিকে শহীদ মিনারের কাছে একটা ক্ষীণ মাইক দিয়ে এক অবাঙ্গালী বাংলাতে বললো, 'আপনারা বাড়ীর বাইরে বেরুবেন না, আপনাদের ঘেরাও করা হয়েছে।' মেঝেতে শুয়ে নিজে নিজে মনে করলাম হয়ত কারফিউ-এর বাংলা তরজমা করতে যেয়ে 'ঘেরাও' বললো। মনকে প্রবোধ দিলাম, কারফিউ-এর কথাই হয়ত বলছে। এর ঘন্টাখানেকের পর এত ঘণ্টার পরিচিত গোলাগুলির আওয়াজের ব্যাতিক্রম ঘটিয়ে শহীদ মিনারের কাছে একটা জোর শব্দ হলো। মনে হলো হাত বোমা।

অল্পক্ষণের মধ্যে ঘরে বারুদের গন্ধ ভেসে আসলো, দরজার নীচে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে পোড়া কাপড়ের মত ছাই উড়ে এসে পড়তে লাগলো। এ হাত বোমার রহস্য উদঘাটন হয়েছিল পালিয়ে যে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেই ধলেশ্বরী নদীর ওপারে এক লোকের কাছ থেকে। সে আমাকে গ্রামে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। কারণ সেও অনেকের মত শুনেছিল, 'প্রফেসর আব্দুল হাইয়ের ফ্যামিলির সকলেই ওই বিল্ডিং-এ ২৫শে মার্চের রাত্রে মারা গেছে। এই লোকটি হলো হাশেম। আমাদের ৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এর পূর্বদিকের তিনতলার ফ্লাটে জার্মান প্রফেসর ওয়ান্টার শোয়েপ্পির সে বাবুর্চি ছিল। তার জীবনের চরম মুহূর্তে সেই ২৫শে মার্চের রাতেই কেটে গেছে। তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছিল অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, তার ছেলে, ভাই, ভাগ্নের সঙ্গে গুলি করে হত্যা করার জন্য। আর্মি অফিসার গুলী করার হুকুম দিতেই গুলীর পূর্বক্ষণে সে চীৎকার দিয়ে পড়ে যায়.... তার পরই কতক গুলো গুলী হয়ে গেছে- তার শরীরের ওপর লুটিয়ে পড়েছে অন্যেরা।

গুলী শেষ করে বর্বর পশুরা মৃত দেহের উপর লাথি মেরেছিল এবং হাশেমের কোমরে বুটের প্রচণ্ড বাড়ি মারে। তারপর তারা সেখান থেকে সরে যেতেই হাশেম উঠে দাঁড়ায় এবং ছুটে তিনতলায় যেয়ে দরজা বন্ধ করে। তার সমস্ত জামায় রক্ত লেগে গেছে, সে বুঝতে পারছিল না তার কোথায় গুলী লেগেছে। জামা খূলে হাশেম তার শরীরটা পরীক্ষা করে দেখে যে গুলী লাগেনি। আমি হাশেমকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল যে সে ঘুমকাতুরে এবং যখন দরজায় কলিংবেল বাজায়, মাত্র তখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গে এবং আমরা কেউ বেল বাজাচ্ছি মনে করে সে ঘুমের ঘোরে দরজা খোলে।

খুলতেই সেনাবাহিনীর লোক সাক্ষাৎ জমদূতের মতো মধ্য বয়সী গোলমাল হাশেমের জামার কলার চেপে ধরে বলে-'তোম প্রফেসর হো?' হাশেম বলে উঠে, জার্মান সাবকা নওকর হুঁ। নিমেষে তাদের কয়েকজন ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। যে তার কলার ধরেছিলো সে পকেটে হাত দিয়ে বলে, 'জয় বাংলাকা ফোটো হ্যায়?' তার পকেটে কয়েকটা বেতনের একশ' টাকার নোট ছিল। জার্মান প্রফেসর হাশেমকে তার আগামী তিন মাসের বেতন দিয়ে ব্যাঙ্কক চলে গিয়েছিল।

নোটগুলো হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় মেঝেতে। বলে শালা তোম রূপিয়ে লেকে কেয়া করোগে, আভি তোমকো গুলী করেঙ্গে'। বলেই হিড় হিড় করে ওকে নীচে নামিয়ে আনে এবং দুজন ওকে ধরে রাখে। এর পরই সে দেখতে পায় মনিরুজ্জামান সাহেব এবং তাঁর বাসার অন্যান্যদের ধরে নিয়ে আসতে। শ্মশ্রুধারী মনিরুজ্জামান সাহেব উচ্চস্বরে কলমা পড়ছিলেন-এমন সময় উনাকে চপেটাঘাত করে এক পঞ্জাবী সৈন্য। এর পর মুহূর্তে গুলী করা হয়!

সেই হাশেম যখন মৃত্যুর হাত থেকে ছুটে এসে দম ফেলেছিল তখন আবার শুনতে পায় বিল্ডিং-এ মিলিটারী আসার শব্দ। এর কিছু পরে কে যেন তার ফ্ল্যাটের দরজায় কাতরাতে থাকে। ও মনে করেছিল হয়ত এ বিল্ডিং-এর কেউ আহত অবস্থায় দরজার কাছে এসেছে। সিঁড়িতে আলো জ্বলছিল। হাশেম কাঠের দরজার ছিদ্রপথে দেখে, এক সৈন্য অস্ত্র হাতে দরজার পাশে বসে অভিনয় করছে। হাশেম ছুটে বারান্দার প্রান্তে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পাক সেনারা ওই ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেনি। এ হাশেমের কাছ থেকেই তখনি শোনা, শহীদ মিনারের অভাবিত দৃশ্যের কথা।

বেলা তখন দশটার মত। হাশেম বলে চললো, আমি লুকিয়ে তিনতলা থেকে শহীদ মিনারের দিকে তাকিয়ে দেখছি-চারজন পাঞ্জাবী সৈন্য শহীদ মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের বিল্ডিং-এর দিকে মুখ করে আছে-এমন সময় কি হয়ে গেল সেখানে- বোমা ফেটে গেল, হাতবোমা। ধোঁয়া, আর শহীদ মিনারের পেছন দিকে দুটো লোক ছুটে পালিয়ে গেল। দেখা গেল সে মুহূর্তে দুজন সৈন্য শহীদ মিনার থেকে মেডিক্যাল কলেজের মোড়ের ট্রাফিক লাইটের দিকে দৌড়ে পালালো। কয়েক মিনিট পরেই এলো একটা গাড়ী। শহীদ মিনারের ওপর পড়েছিল দুটো মিলিটারীর লাশ। সে গাড়ীটি মরা সৈন্য দুটোর অস্ত্রগুলো নিয়ে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর আর একটি গাড়ী এলো এবং লাশ দুটোকে নিয়ে চলে গেল। সে দিন ছিল ২৬শে মার্চ, শুক্রবার শহীদ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছি-।

যে, ২৬শে মার্চে শুক্রবার তাঁর ফ্ল্যাটে বার পাঁচেক পাক সেনারা ঢোকে এবং বলতে থাকে 'আওর এক আদমী হ্যায় ও কিধার হ্যায়?' উনারা জানান যে বড় পুরুষ মানুষ আর কেউ জীবিত নেই। তখণ তাঁরা সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজে এবং জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলে। হয়ত এই অপর এক আদমী ছিল হাশেম। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী ও হাশেম এই বিল্ডিং-এর তিনতলা থেকে জগন্নাথ হলের মাঠে বুলডোজার দিয়ে গর্ত করে বহু মৃতদেহ সে গর্তে ফেলে দিতে দেখেছিলেন।

রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গেও গ্রামে একদিন দেখা হয়, উনিও বুলডোজার দিয়ে গর্ত করে লাশ পুঁতে ফেলার কথা বলেন। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী ধরা গলায় বলেছিলেন, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিকেল বেলা আর্মি গেঞ্জী পরা ১২/১৪ বছরের চারটে ছেলে নিয়ে এসে মনিরুজ্জামান সাহেবের লাশ টানিয়ে নিয়ে গেল গর্তের ওখানে। তখন বোধ হয় আর লাশ মাঠে ছিল না। ছেলে চারটিকে গর্তের পাশে লাইন করে ওরা গুলী করেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণহত্যার কিছু দলিল	দৈনিক বাংলা	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নরঘাতকদের সংলাপ: ওদের খতম কর
গণহত্যার কিছু দলিল
ড: মোজাম্মেল হোসেন

লেখক ড: মোজাম্মেল হোসেন একজন বিজ্ঞানী। ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় বর্বর পাকিস্তানী সেনারা যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তখন পাকসেনাদের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কথোপকথন তিনি রেডিওতে শোনেন ও তার অংশবিশেষ টেপ রেকর্ডের ধরে রাখেন। ঐ টেপের বিশেষ অংশ কপি করে বন্ধুর সাহায্যে কোলকাতায় প্রেরণ করেন। মে, ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি 'আকাশবাণী' কোলকাতা থেকে 'সংবাদ বিচিত্রায়' তা শোনানো হয়।

এছাড়াও কথোপকথনের সময় পাক সেনারা যে সব সাংকেতিক শব্দ করেছিল সেগুলিও যথাসাধ্য অনুবাদ করে অপর এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করেন। মে মাসে আকাশবাণী কোলকাতা থেকে 'সংবাদ পরিক্রমায়' তা শোনানো হয়। ২৩শে ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ অভজার্ভার'এ এই বার্ত্তা ছাপা হয়েছিল।]

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালের কালরাত। সোয়াএকটার দিকে গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। জেগে ওঠার প্রথম মুহূর্ত থেকেই মন বলেছিল এ আর কিছু নয় পাকিস্তানী সেনারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুরো মার্চ ধরে অপেক্ষা করেছি, কি হয় কি হয়। আমরা কি স্বায়ত্তশাসন পাবো, না দেশে নামবে রক্তপাত? বিদেশীরা যখন ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছিল তখন মন বলেছিল, ওরা তো ওদের দেশে বিপদের সংকেত পেয়ে।

কিন্তু বিপদ এলে আমরা তো এদেশেই থাকবো, আমাদের নিজের দেশ। কি হবে সেই বিপদ, কি হবে তার রুপ-তা কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু সেই ভয়ংকর রাতে ঘুম ভাঙ্গতেই বুঝলাম, বিপদ এসে গেছে। শুরু হলো আমাদের ভাগ্যে অমাবস্যা। মনে প্রশ্ন জেগেছিল কবে এই অন্ধকার কাটিয়ে আসবে আলো, আসবে স্বাধীনতা । হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়া ঘুমের ভাব কেটে গেল। উপলবব্ধি করার চেষ্টা করলাম কি হচ্ছে । মনে তখন সবার আগে একটি প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধু নিরাপদে আছেন তো? কিন্তু কি ভাবে সে খবর? হঠাৎ মনে এলো, পাক সেনাদের বিভিন্ন ইউনিটগুলো নিশ্চয়ই একে অপরের সাথে রেডিও মারফত যোগাযোগ রাখবে।

রেডিও তুলে নিয়ে ডায়াল ঘুরাতে আরাম্ভ করলাম। ৯০ মিটার পেয়ে গেলাম যা খুঁজেছিলাম । হানাদার বাহিনীর দলগুলোর একে অপরের সাথে কথাবার্ত্তা । জোরে শোনার উপায় নেই, তাই এয়ারফোন লাগিয়ে নিলাম কানে। ভেসে আসতে লাগল বর্বর পশুদের গলা। ইতিমধ্যে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের যুদ্ধ আরাম্ভ হয়েছে। পাক সেনাদের আগমনের গোড়াতেই কেউ সাইরেন বাজিয়ে বিপদ সংকেত জানাবার চেষ্টা করেছিল। আমাদের বাসা থেকে মাইলখানেক দূরে রাজারবাগ।

সেকি প্রচণ্ড গুলি, তালা লেগে যায়। মাঝে মাঝে পাক সেনারা আকাশে ফানুস ছোড়ে। দিনের মতো আলো হয়ে যায় চারিদিকে। তারপর আবার বৃষ্টির মতো গুলি। মাঝে মাঝে ভেসে আসে ভারী গোলার শব্দ। একটু পরে গুলির তীব্রতা কমে এলো। বুঝলাম আমাদের বীর পুলিশ জন্মভুমির জন্য চরম আত্মোৎসর্গ করে শহীদ হয়েছেন। আরো একটু পরে দেখা গেল আগুনের লেলিহান শিখা-রাজারবাগ পুলিশ লাইন পুড়ছে। সে রাত্রের কথা জীবনে ভুলবো না। কখনো ছুটে যাই জানালায় আগুন দেখার জন্য। আবার ছুটে আসি রেডিও শোনার জন্য।

ইতিমধ্যে রেডিওতে শুনেছি পাক কমাণ্ডারের গলা। জানাচ্ছে দি বিগ ফিস হ্যাজ বিন কট। কার কথা বলেছে তা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী হয়নি। কিন্তু মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি যে বঙ্গবন্ধু বন্দী হয়েছেন। রেডিও শুনে চলেছি আর ঢেকে রাখা স্তিমিত আলোতে প্রধান তথ্যগুলো টুকে রাখছি। হঠাৎ কানে এলো আবার কন্ট্রোলের গলা দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন অব টেকিং প্রিজনার । দে আর শুটিং এ্যাট ইউ। সো ওয়াইপ দেম অফ। কাউকে বন্দী করার প্রশ্ন ওঠে না ওরা তোমাদর গুলি করেছে। সুতরাং ওদের খতম করো। কথাগুলোয় মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। তাহলে এই করছে পাক বর্বররা।

এর প্রমাণ রাখতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে টেপরেকর্ডার এনে সোজাসুজি তার দিয়ে রেডিও সাথে লাগিয়ে দিলাম। এয়ারফোনের মাধ্যমে শুনতে লাগলাম। বাবা, মা, বাড়ীর সবাই তখন চারপাশে জড়ো হয়েছেন। মাঝে মাঝে জানালায় গিয়ে বাইরের দিকে খোঁজ নেয়া হয়-কেউ ওদিকে আসছে কি না। এরপর দুদিন ধরে প্রায় সারাটা সময়ই বাড়ীর কেউ না কেউ এয়ারফোন কানে ধরে বসে রয়েছে কি শোনা যায়। সবকিছু টেপ করা সম্ভব হয়নি। টেপ আছে ২৫শের রাত ও ২৬শের সকালের পাক সেনাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তার অংশ।

অন্য তথ্য টেপে নেই, তবু যা আছে তা আজ এতদিন পরে শুনলেও মনে যে অনুভূতি জাগে, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। বর্বরদের সে কি উল্লাস। বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা নামাতে হবে। রাস্তার ব্যারিকেড সরাতে হবে। এ কথা লাউড স্পীকারের মাধ্যমে প্রচার করার হুকুম দিল পাক কমাণ্ডার নেটিভ টাং এ্যাজ ওয়েল এ্যাজ ইংলিশ এণ্ড উর্দুতে। নেটিভ হচ্ছি আমরা অর্থাৎ বাঙ্গালীরা।

আদেশ না মানলে কি করতে হবে তারও বিশদ হুকুম শুনলাম। আশপাশের লোক ধরে এনে তাদের মধ্যের কয়েকজনকে পুরস্কৃত করতে হবে। (কমাণ্ডারের ভাষায়) সে পুরস্কার হবে মৃত্যুদণ্ড। অন্যদের ফিরে যেতে দেয়া হবে যাতে ব্যাপারটা সবাই ভাল করে বুঝতে পারে। তাই সেই রাতে ঐ মুহূর্তেই নামিয়ে ছিলাম স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কালো পতাকা। নামাতে বলেছিলাম প্রতিবেশীদের। সে পতাকা ফেলে দেইনি, নষ্ট করিনি। লুকিয়ে রেখেছিলাম ঘরে।

পাক কমাণ্ডার আরো হুকুম দিল কিভাবে বাড়ীগুলির তল্লাশী করতে হবে। বাড়ীর সবাইকে বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে ভেতরে খুঁজে দেখতে হবে ভাল করে। স্থানীয় সহযোগীদের দ্বারা সনাক্ত করতে সেসব ব্যক্তিদের যাদের আটক করার প্রয়োজন ইত্যাদি।

ধীরস্থির গলায় হুকুম দিচ্ছিল কমাণ্ডার-এতটুকু উত্তেজনা ছিল না কণ্ঠস্বরে। পরে জেনেছিলাম ঐ গলা ছিল বিগ্রেডিয়ার আরবীর খানের। ঐ গলায় আনন্দে বিভিন্ন টার্গেট দখলের খবর দিচ্ছিলেন, সবাইকে জানাচ্ছিলেন যে দৈনিক পিপল পত্রিকার অফিস উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কি সাংঘাতিক ক্রোধ ছিল পিপল-এর ওপর, ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ব্যবহার করেছে পিপলস অফিসের উপর পাক সেনারা। এটি ছিল ২৬ নম্বর ইউনিট। পরে জেনেছি এর 'ইমাম' ছিল কর্ণেল তাজ। যার হেড কোয়ার্টার প্রেসিডেন্ট হাউস।

এই ২৬ নম্বর ইউনিট হত্যা করেছে লে: কমাণ্ডার মোয়াজ্জমকে। বলেছে, তাকে ধরতে যাওয়া হয়েছিল বাধা দেওয়ায় নিহত হয়েছে সে। ঠাণ্ডা মাথায় তাকে হত্যা করে জীপের পেছনে দাড়িতে বেঁধে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মৃতদেহ। এই ২৬ নম্বর ইউনিট আক্রমণ করেছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন। সবচেয়ে উল্লাস ছিল এই ২৬ নং ইউনিটেরই। তার বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে কর্ণেল তাজকে করা হয়েছিল- ডি,এস, এ,এম,এল-ডেপুটি অব এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মার্শাল ল। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল। কন্ট্রোল বলছে 'দ্যাট ইজ জলি গুড। দ্যাট ইজ একসেলেণ্ট। বা হি ইজ ইউজিং এভরিথিং হি হ্যাজ গট'।

সেই এভরিথিং এ ছিল ট্যাংক, রিকয়েললেস রাইফেল, রকেট লাঞ্চার ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে ছিল পশ্চিম দিক থেকে রেল লাইন জুড়ে ৮১ নং ইউনিট। দক্ষিণ দিক থেকে ৮৮ নং ইউনিট ও উত্তর দিক থেকে

২৬ নং ইউনিট। বাধা এসেছিল জগন্নাথ হল, ইকবাল হল ও লিয়াকত হল থেকে। সবচেয়ে বেশী বাধা এসেছিল জগন্নাথ হল থেকে। ২৬শে মার্চ সকালের দিকে কন্ট্রোল ও ৮৮ নং ইউনিটের মধ্যে যে কথোপকথন হল তা মোটামুটি এইরুপ।

কন্ট্রোল : বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আনুমানিক কতজন হতাহত হয়েছে। আমাকে মোটামুটি সংখ্যাটা বললেই হবে। উত্তর এলো তিনশয়ের মতো।

কন্ট্রোল : চমৎকার। তিনশই মারা গেছে না কেউ আহত বা বন্দী হয়েছে।

উত্তর : আমি একটাই পছন্দ করি। তিনশ মারা গেছে। কন্ট্রোল : ৮৮। আমিও তোমার একমত। ওই কাজটিই সহজ । কিছু জানতে চাইবে না। আবার বলছি চমৎকার।

ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই উপরের কথাগুলোর । ওরা যে কোনও 'বন্দী' নেয়নি, সবাইকে হত্যা করেছে সে কথা এর চেয়ে স্পষ্টভাবে জানাতে পারতো না। শুনতে পেয়েছিলাম শহীদ মিনারের কথা: ঐ রাতেই ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। মিনারের নীচের ঘরে ওদের কথায় চারজন ছাত্র লুকিয়ে ছিল, তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। একজন পালিয়ে গেছে। ২৭শে মার্চ সকালে দেখতে গিয়েছিলাম শহীদ মিনার। মাঝখানের মিনারটি সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

শুনলাম মিনারের নীচের ঘরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা ছাত্র ছিল না। কিন্তু ছিল তো আমাদের দেশেরই মানুষ। দেখলাম ভাঙ্গা কাঁচ, দেয়ালে রক্ত। শনিবার রাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অবশেষে শহীদ মিনার ধবংস করেছিল পাক বর্বরেরা। ২৫শে মার্চের সেই কালোরাত্রি যখন শেষ হয়ে আসছিল, হুকুম এলো কন্ট্রেলের যেখানে যত মৃতদেহ আছে সব সরিয়ে ফেলতে। সরিয়ে ফেলতে হবে দিন শুরু হওয়ার আগে। লোকচক্ষুর অন্তরালে। মৃতদেহ সরাতে ব্যবহার করা হয়েছিলো বাঙ্গালীদের। যে হতভাগ্যদের ব্যবহার করা হয়েছিল এই কাজে, কাজ শেষে তাদেরও হত্যা করেছিল ঐ নরপশুরা। মৃতদেহের হিসাব রেখেছিল ২৬ নং ইউনিট।

কন্ট্রোল জিজ্ঞেস করেছিল ২৬ নং ইউনিটকে, রাজারবাগে পুলিশের মৃতদেহের সংখ্যা। উত্তর এসেছিল গোনা শেষ হয়নি। কিন্তু সংখ্যায় অনেক। ক্যাম্পাসের মৃতদেহ কিন্তু ঐ সময়ে সরানো হয়নি। ২৬শে মার্চ সারাদিন রেখে দেয়া হয়েছে। রেডিওতে শুনেছি, কমাণ্ডার গিয়ে দেখবেন ছাত্রনেতা কেউ আছেন কিনা। সেটা দেখার পরই সরানো হবে। তাই হয়েছিল।

২৭শে মার্চ সকালে দেখছিলাম ইকবাল হলের পেছনের পুকুর পাড়ে সারি দিয়ে রাখা দশটি মৃতদেহ। ইচ্ছে করেই সবাইকে দেখানোর জন্য ওভাবে রাখা হয়েছিল কিছু মৃতদেহ। যাতে বাঙ্গালীরা ভয় পায়, নতি স্বীকার করে। দেখেছিলাম জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে বুলডোজার দিয়ে তৈরী গর্ত করে দেয়া গণকবর। মাসখানেক পরে যখন দু'একজন বিদেশী বাংবাদিককে আসার অনুমতি দিয়েছিল পাক সরকার, তখন একদিন রাতে সেই গলিত দেহের অবশিষ্টও তুলে নিয়ে যায় পাক সেনারা।

জিঞ্জিরায় যে হত্যাকাণ্ড চালায় পাক সেনারা কদিন পরে তার পুর্বাভাসও পেয়েছিলাম ঔ রাতে। কণ্ট্রোল বলেছিল ৮৮ নং ইউনিটকে যে ওখানে অস্ত্র জমা করা হয়েছে, তাই ঐ জায়গায় সেনাদের যেতে হবে আস্তে আস্তে। রাত ফুরিয়ে এলো দিনের আলো জেগে উঠলো। সারারাত ধরে যা দেখেছি যা শুনেছি কোন কিছুই যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছিলো না।

মন চাইছিলো না স্বীকার করতে যে এত বড় বিপদ নেমে এসেছে। মনে হয়েছিল, কবে এই অমাবশ্যা কাটবে কবে আবার সম্মানের সাথে মানুষের মত বাঁচার সুযোগ পাব? সেদিন একদিন আসবেই, কিন্তু ২৫ শের সেই রাতে একথাও মনে জেগেছিলো, যখন সেদিন আসবে আমিও যেন থাকি তখন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক সেনাদের হাতে লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন-এর বিয়োগান্ত বিবরণ	দৈনিক বাংলা	১৮ ফেব্রয়ারী, ১৯৭২

চিরঞ্জীব শহীদের স্মৃতি
লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন

(লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, তথাকথিত আগরতলা মামলার দুই নম্বর আসামী যার চোখে দেখেছি বাংলার ছবি, যার মুখে শুনেছি, প্রথম একদফা-বাংলার মুক্তির কথা, তিনি আজ কোথায়? ২৫শে মার্চের কালো রাত্রে কেড়ে নিয়ে গেল তাঁকে শূন্য করে আমার এ ঘর।

আগরতলা মামলা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হতেই শুরু হয়েছিল তার অক্লান্ত পশ্রিম। অবশ্য তার পরিশ্রম অনেক দিনের। ছেলেবেলা হতেই জীবন যুদ্ধে নেমেছেন তিনি । আই,এস সি পাশ করেই তিনি ঘর ছেড়েছিলেন। সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। বিলেতে কেটে গেলো জীবনের ৯টি বৎসর। সেখান হতেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন তিনি। তারপর ছিলেন পাকিস্তানী নৌ-বাহিনীতে।)

১লা মার্চ হতেই দেখলাম তাঁর মাঝে চঞ্চলতা, কর্মব্যস্ততা। ২রা মার্চ কয়েকজন সহকর্মীসহ তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এক বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। ওদিকে কেন জানি না আমার মন একটা অজানা আশংকায় কাঁপছিল বারবার। উনিও খবর পেয়েছিলেন দুর্দিন আসছে। তাই কিছুটা গোপনীয়তা অবলম্বন করতেই হলো। শুরু হলো লুকিয়ে কাজকারবার করার দিন। ১৫ই মার্চ তিনি ফিরলেন। ২৭শে মার্চ পল্টনে এক জনসভায় আয়োজন করা হচ্ছিল। ২৮শে মার্চ তার আর জীবনে আসেনি।

২৫শে মার্চ এলো সেই ভয়ংকর কালরাত্রি। কে জানত আমার এ জীবনের হাসি গান সবকিছু মুছে নিয়ে যাবে সেই রাত। অকালে আমার ঘর ভেঙ্গে যাবে''। ঘর ভাঙ্গবে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের । ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা হতেই তিনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু এত ব্যস্ততার মাঝেও মনে হচ্ছিল, উনি যেনো বড় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। রাত প্রায় ১১টায় ফোন বেজে উঠলো। আমার দুলাভাই ফোন করে ওকে সরে যেতে বলছিলেন। এমন সময় দুটো ছেলে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে কাঁপতে লাগলো। তারা বললো মিলিটারী ওদের জীপের ওপর গুলীবর্ষণ করেছে। ওদের একজনের গায়ে জ্বর ছিল। আমরা সেবা যত্ন করলাম। পরে জেনেছিলাম আমরা সেই অজানা ভাইদের মধ্যে একজন জালেমদের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। সে রাত্রে আমরা উপর তলায় আমার এক বোনঝির ওখানে থাকি। নিস্তব্ধ রাত্রিকে সচকিত করে দিয়ে অবিশ্রান্ত ভাবে গোলাগুলি চলতে লাগলো।

উনি একটা প্যাসেজে দাঁড়িয়েছেলেন। সারাটা রাত এমনিভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কে জানতো সে রাত্রের সেই দাঁড়ানোই হবে মৃত্যুকে বরণ করার প্রতীক্ষা। ভোর হয়ে এলো। নীল আকাশের শুকতারাটি বিদায় ব্যথিত চোখে বুঝি বা শেষবারের মত মাটির পৃথিবীকে দেখে নিচ্ছিলো। এক সময় উনি এসে জানালায় মাথা দিয়ে ক্লান্ত অলসভাবে দাঁড়ালেন। আমি তাকে অনেকবার বলেছিলাম পিছনের পাঁচিল টপকে পালাতে। বললেন, কোথায় যাব। তাছাড়া যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না।

তিনি বুঝেছিলেন জালিমরা তাঁকে না পেলে অবুঝ অসহায় শিশুদের উপর অত্যাচার করতে পাবে। তিনি পালালেন না। তাঁর ক্লান্ত ভাব দেখে তাঁকে শুতে বললাম। জবাবে উনি বললেন, অনেক কাজ, শোবার সময়

নেই। বরঞ্চ বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে কিছু খাবার ব্যবস্থা কর। টেবিলে খাবার লাগানোও হলো, কিন্তু খাওয়া তাঁর হলো না। মনে হলো বাসার চারিদিকে অনেকগুলো গাড়ী দাড়িয়ে গেল।

বুটের দুপদাপ আওয়াজ শোনা গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে চকিতে দেখলাম একজন উপরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে। ভয়ে হিম হয়ে বললাম, 'তুমি পালাও'। উনি ভেতরের দিকে চলে গেলেন। জালিমরা হুড়মুড়িয়ে উপরে উঠে এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেললো। পিশাচরা আমাদের সামন এসে বললো- 'কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম কাঁহা, উসকা বিবি কাঁহা। আচ্ছা করকে উনকো বাঙ্গাল নাদেগা'। দেখে মনে হচ্ছিল সামনে পেলে যেন ছিঁড়ে খাবে।

আমার ভাগ্নী বুদ্ধি করে বললো' ওরা নীচে থাকেন। কিন্তু ওরা কোন কথা শুনলো না। কজন আমার ভাগ্নী জামাইকে নীচে নিয়ে গেল। জালিমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে ফিরতে লাগলো সমস্ত ঘর। খুঁজতে নীচে চলে গেলো, আশ্বস্ত হবার আগেই ফিরে এলো আবার । কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আবারও চলে গেল ফায়ার করতে করতে নীচের দিকে। কিছুক্ষণ পর ফায়ারিং থেমে গেল। শোকরগোজারী করলাম আল্লার কাছে। না পেয়ে হয়তো ওরা চলে গেল। বাইরে পর্দ সরিয়ে দেখতে গেলাম।

কিন্তু উ: একি দেখলাম! খোদা, এর আগে যদি চোখ অন্ধও হয়ে যেতো! দু'পা দু'হাত ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে গাড়ীতে তুলছে ওকে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডান পাশটা। আছড়ে পড়লাম মাটিতে। চীৎকার করে উঠতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই ভাগ্নী মুখ চেপে ধরল, 'খালাম্মা চীৎকার করবেন না। ওরা আবার এসে যদি বাচ্চাদের মেরে ফেলে। আপনাকে যদি ধরে নিয়ে যায় টের পেয়ে'।

চমকে থমকে গেলাম। পোড়া চোখ জ্বলে ছাই হলো। বুকের ভেতরটা এক শূন্য বেদনায় হাহাকার করে উঠলো। জ্বলে গেলাম-হায়, একটি মানুষ বিহিন সর্বহারা হলাম আজ। পরে জানতে পারলাম, উনি বাথরুমের দরজার এক পাশে উপায়হীন হয়ে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারে ওরা আবার ওর নাম ধরে জিজ্ঞাসা করে বললো, 'তোমহারা নাম কিয়া'? উনি নির্ভিক চিত্তে বললেন, কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন।

আবার ওরা বললো- 'বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। কিন্তু একটা আঙ্গুল তুলে উনি তাঁর শেষ বাণী উচ্চারণ করলেন 'একদফা জিন্দবাদ'। সাথে সাথে গুলি করলো পিশাচ জালিমরা, উনি পড়ে গেলেন। জীবনের অস্তাচলে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত আবার এক আঙ্গুল উঁচুতে তুলে ধরলেন। পরপর গুলি হলো, দ'টো তাঁর মাথায় বিঁধল। আর দু'টো ফসকে গেল। মনে হলো, বুকের রক্ত দিয়ে উনি ধুয়ে দিয়ে গেলেন পরাধীন বাংলার যত কলংক আর মলিনতা-আর রক্তকণিকাগুলো।

কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষীণ আশা জন্মায়, তাঁকে তো মৃত দেখিনি-শুধু গুলি লাগা অবস্থায় তুলে নিয়ে যেতেই দেখেছি। তবে কি তিনি বেঁচে থাকতে পারেন না? নীচে দেখলাম রক্তের বন্যা মাটিতে, শুধু ভোরের আকাশ বাতাস, হাহাকার করি উঠলো নেই-নেই-নেই। কোথা দিয়ে সারা বেলা কেটে গেল, রাত এলো শূন্যতার হাহাকার নিয়ে, তারও শেষ হলো। সকাল হলো, কারফিউ ভাঙ্গল কিছুক্ষণের জন্যে । কত মানুষ ছুটে এলো চেনা-অচেনা। চেয়ে দেখলাম কত মানুষ অশ্রুসজল নেত্রে রক্ত ছুঁয়ে শপথ নিল।

বোবা কান্নায় অসহায় হয়ে ছোট তিনটি শিশু বুকে নিয়ে দুলাভাই ডা: কাজী আব্দুল খালেকের বাসায় ছুটে গেলাম। তাঁরা ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেননি যে আমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। আবার হাহাকার আর্তনাদ উঠল। কিন্তু কান্নার সময় কোথায়, সান্তনার অবকাশ নেই। পালাতে হবে, যদি আবার জালিমেরা আসে। তাই পাড়ি দিলাম অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে অনিশ্চয়তার পথে। জিঞ্জিরা গেলাম। নৌকা পার হবার সময় গোলাগুলি আরম্ভ হলো।

মানুষের মৃত্যু ভয়াল আর্তনাদের মধ্য দিয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে কেটে গেলো তিনটি দিন। তারপর ফিরে এলাম আবার ঢাকায়। আমার বড় ভাই ডা: আমজাদ খবর পেয়ে ছুটে এসে নিয়ে গেলেন আমাদের। জালিমরা তারও সবকিছু পুড়িয়ে জ্বালিয়ে নি:স্ব করে দিয়েছে। তিনিও রাজবাড়ী ফরিদপুরের মুক্তি ফৌজের কমাণ্ডার ছিলেন এবং কয়েকটা অপারেশন করেছেন। এই হলো তাঁর অপরাধ। তাঁকেও পালিয়ে ফেরতে হচ্ছিল।

অথচ আমাদের ফেলে তিনি, আমার অনুরোধ সত্ত্বেও, ওপারে যেতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। আমাদের জন্যই তাঁকে কিছুদিন আগে গ্রহণ করতে হলো একটা ছোট্ট চাকুরী, যাতে সরকার তার পরিচয় না পায়। নানা দুর্যোগ আর ব্যথার মধ্য দিয়ে কেটে গেল দীর্ঘ ৯টা মাস। পথ চেয়ে বসে থেকেছি মিছে আশা বুকে বেঁধে যদি আসেন তিনি। কিন্তু কই আজো তো এলেন না তিনি। বুকে আশা নিয়ে ছুটে এসেছি এই কর্মকোলাহলপূর্ণ নগরীতে যদি কেউ বলে আছেন তিনি।

দেশ স্বাধীন হলো। খুশীর বন্যায় প্লাবিত হলো চারিদিক। শুকরিয়া করলাম খোদার দরগায়। তাঁর আদরের সাত বছরের শিশুকন্যা শিপু ফুঁপিয়ে শুধালো'' মাগো সবাই আজ এতো খুশী, কিন্তু আমার খুশী লাগছে না কেন? আমার যে খালি বাপির কথা মনে হচ্ছে। কেন আজও তিনে এলেন না। কেন আমার বাপি নেই মা?'' শিশুর মনের এই আকুল করা প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

-মিসেস কোহিনুর মোয়াজ্জেম হোসেন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকা প্রেসক্লাবের উপর ট্যাঙ্কের বোমাবর্ষণ	বাংলাদেশে গণহত্যা বাংলার বাণী	১৯৭২

প্রেসক্লাবের সম্মুখ দিয়ে যে রাজপথ গেছে সেটা ছিল
ঢাকার সেকেণ্ড আপারেশনাল সড়ক অভিযান
জল্লাদ বাহিনীর দ্বিতীয় রুট

-ফয়েজ আহমদ

প্রেসক্লাবের সম্মুখ দিয়ে যে রাজপথ গেছে, সেটা ছিল সেকেণ্ড অপারেশনাল রুট-রাজধানী ঢাকার উপর গণহত্যা অভিযানে জল্লাদ বাহিনীর দ্বিতীয় সড়ক। এখন সেটা স্বাধীন বাংলাদেশের ফরেন অফিস এবং এক সময় কমিশনার্স অফিস বলা হতো। সেই ইমারত আজ অঙ্গন রাতারাতি গড়ে উঠেছিল গেরিলা কৌশলে ট্রেনিংপ্রাপ্ত জেনারেল মিঠার অধীনস্থ অফিসারদের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

ঢাকার সাংবাদিকদের ক্লাবটা তার প্রায় উল্টো দিকে-গুলী গোলার পাল্লার মধ্যে।

মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে প্রত্যেকটি নাগরিকের চরম বিপর্যয়পূর্ণ কাহিনীগুলো এক দিকে যেমন পৃথক পৃথক সত্তা নিয়ে প্রকাশ পায়, অপরদিকে সব ঘটনার সামগ্রিক একটা আদল আছে। ঘটনার প্রচণ্ডতা, তার বীভৎস রুপ আর পরিণতি প্রকৃত বিচারে একই। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর বিভীষিকাময় আক্রমণ ও অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ডের সার্বিক ইতিহাসের মধ্যে প্রেসক্লাবের ঘটনা অসাধারণ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

এই ক্লাবটাকে কেন্দ্র করে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনবিরোধী কোন ব্যাপক প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল বা সে সময় সেখানে শাসন বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত প্রকট ছিল, তা নয়। তবে সৎ ও বলিষ্ঠ সাংবাদিকগণ সে সময় প্রকাশ্যভাবে বাংলাদেশের স্বাধিকারের প্রতি, মুক্তির প্রতি সমর্থন জুগিয়েছেন। তখন বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠে যে ধ্বনি উঠতো সেসব সাংবাদিকের মুখমণ্ডলে তা প্রতিভাত হতো-অনেকের কলমের ডগায় সেটা আরো স্পষ্ট ছিল। দেশের হাজার হাজার বিভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যেভাবে সমর্থন জুগিয়েছিল শেখ সাহেবকে তাঁর হস্ত শক্তিশালী করার জণ্যে, ঢাকায় বা অন্যান্য স্থানের সাংবাদিকরাও তেমনি সমর্থন দিয়েছিলেন (কিছুসংখ্যক সাংবাদিকের ভূমিকা অবশ্যই প্রশ্নাতীত নয়)। তা'ছাড়া এমন অনেক বন্ধু ছিলেন, যারা তাস পেটানো, আড্ডা জমানো, সস্তায় খাদ্য প্রহণ ব্যতীত কোন ঝামেলায় যেতেন না।

সাংবাদিকদের ক্লাব কক্ষের এই সাধারণ পরিবেশটা অবশ্যই অস্ত্রধারী বিদ্রোহীদের সমতুল্য নয়। এমনকি অনেকে এই ক্লাবগোয়ারদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনেছেন। বিরুপ মন্তব্য করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। সেক্ষেত্রে তবুও শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত প্রেসক্লাবের উপর সেল নিক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিল কেন? ক্লাব ইমারত ধ্বংস করে দিলেই যে সচেতন সাংবাদিকের বিলুপ্তি ঘটবে, তা'নয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন বা ক্লাব কমিটির সদস্য বিনা দ্বিধায় সামরিক শাসকদের পদানত হয়ে সর্বক্ষেত্রেই যে কলমের ব্যবসা করবেন, সে কথাও গ্রহনযোগ্য হবে না। এবং ব্রাস-হ্যাট জেনারেলগণ সে কথা জানতেন। তবু কেবলমাত্র খেয়ালের বশে নয়, পরিকল্পিত পন্থায় প্রেসক্লাবের উপর ২৫শে মার্চের রাতে ট্যাঙ্ক থেকে শেলবর্ষণের তাগিদ দেখা দেয়।

দেড় বছর আগের প্রেসক্লাবে শেলবর্ষণের পর থেকে বন্ধু-বান্ধব ও অনেকে এই ঘটনার কারণ সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন। সমগ্র দেশটা পুড়িয়ে খাক করে দেয়ার, ত্রিশ লক্ষ শান্তি প্রিয় মানুষকে নির্বিচারে হত্যার

যেমন কোন ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা বা যুক্তি বাইরে থেকে সভ্য সমাজের পক্ষে উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি, প্রেসক্লাবের ব্যাপারে তাই ঘটেছে। কেউ বলেছেন: সাংবাদিক সমাজকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্যে এটা ছিল তাদের আস্তানার উপর প্রতীক হামলা। আর এক লোক বলেন: প্রেসক্লাবে গেরিলারা প্রতি আক্রমনের জন্যে সুরক্ষিত চৌকি প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে হয়তো ভুয়া তথ্য তাদের কাছে কেউ পৌঁছে দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন: সে রাতে প্রেসক্লাবে বহু সাংবাদক আটক পড়েছেন বলে কোন সূত্র থেকে খবর হয়তো সামরিক অফিসারদের কাছে পৌঁছেছিল। এই সুযোগটা তারা ছড়তে চায়নি এবং খবরটা দেরীতে তারা পায় বলেই ভোর রাতে আক্রমণ হয় । রাত তখন সাড়ে দশটা হবে, আমি প্রেসক্লাবের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। আর এই কারণেই সে রাতে ক্লাবে শেল নিক্ষেপের কারণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা আমার পক্ষে অনেকটা সম্ভব হয়েছে।

এক্ষেত্রে ২৫শে রাতে প্রেসক্লাবে দু'টো রহস্যজনক টেলিফোন কলের উল্লেখ স্বাভাবিকভাবেই আসে।

ক্লাবে প্রবেশের দশ মিনিট পরেই পরপর দু'টো কল আসে এক বিশেষ আধা-সাংবাদিকের নামে। এই ভদ্রলোক বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল, উকিলদের লাইব্রেরী, সাংবাদিকদের আড্ডা ও অফিসারদের ক্লোজপার্টিসহ সর্বত্রই মোটামুটি পরিচিত। উর্দু প্রস্বর মিশ্রিত বাংলা ও ইংরেজীতে অপর প্রান্ত থেকে উক্ত আধা-সাংবাদিকের সন্ধান করা হচ্ছিল। ক্লাবের ম্যানেজার জনাব কুদ্দুস আমার হাতে ফোন তুলে দিয়ে বললেন: স্যার, চড়া গলায় কা'কে যেন খুঁজছেন ভদ্রলোক।

রুক্ষ কণ্ঠস্বর ও বিশেষ ভাষার ব্যবহার থেকে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে, সামরিক ঘাঁটি বা সেনানিবাস থেকে কেউ টেলিফোন করছে। উক্ত আধা-সাংবাদিককে না পেয়ে সেই ভদলোক ক্ষেপে উঠেছিলেন ঠিকই, তবে কণ্ঠে তার নৈরাশ্যও ছিল।

টেলিফোন কলের এই ঘটনা কোন অর্থ হয়তো বহন করে, তবে এ থেকে প্রেসক্লাব আক্রমণের কারণ সন্ধান করা কষ্টকর।

এ সময়টা সমগ্র শহরের উপর সুপরিকল্পিতভাবে একযোগে আক্রমণ চলছে।

তখনো ক্লাবের পেছনে বা সামনের দিকে গোলাগুলী আসেনি। তোপখানা রোডের কাছে 'স্বরাজ' অফিস থেকে বেরিয়ে আমি গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাজপথে পড়ে সেকেণ্ড গেটের উল্টো দিকে বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটা রিক্সাও ছিল না। কিন্তু সে সময় এই আঙ্গটায় কিছুসংখ্যক দুরন্ত যুবক অন্ধকারের মধ্যে সামরিক যান চলাচল বন্ধ করার জন্যে দ্রুত ব্যারিকেড তৈরী করছিল, ইট-ড্রাম কাঠের গুঁড়ি দিয়ে।

একটা রিক্সা এসে সেখানে আটকা পড়ল। চালক ত্বরিত গতিতে রিক্সা ঘুরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দিকে ছুটলো। আমি জোর করে ধরে তাকে অনুরোধ করেছিলাম। আমাকে একটু আজিমপুরায় নামিয়ে দিন। পুরানো হাইকোর্টের প্রবেশ গেটের কাছে প্রথম বাধা পেলাম-গাছ আর ড্রাম ফেলে ব্যারিকেড করা হয়েছে। সেটা পেরিয়ে কার্জন হলের গেটের সামনে গিয়ে সম্পূর্ণ থেমে যেতে হল। অন্ধকার থেকে কয়েকজন লোক একে বলল, অন্য দিকে যান। আর্মি আসবে। সেখানেও ব্যারিকেড।

রিক্সাওয়ালা বলল, স্যার, আমি আর যাব না ডর করছে।

আমি তাকে ফিরিয়ে আনলাম সেকেণ্ড গেটের দিকে-আজিমপুরার বাসায় সে রাতে আর যাওয়া হল না প্রেসক্লাবের সম্মুখে আমাকে নামিয়ে রিক্সাওয়ালা উধাও হয়ে গেল।

আমি বাধ্য হলাম প্রেসক্লাবে আশ্রয় নিতে। ক্লাব ম্যানেজার কুদ্দুস আর দারোয়ান খয়ের ছাড়া কেউ তখন ছিল না । খয়ের বাইরের গেটে তালা দিয়ে রেখেছে। কুদ্দুস বাসায় ফেরার জন্য আয়োজন করছিল।

মর্নিং নিউজের শহীদুল হককে এবং অবজার্ভারের মুসা ও কে জিকেও কয়েকবার টেলিফোনে চেষ্টা করলাম-লাইন পেলাম না । শেষ পর্যন্ত শহীদুল হককে পেলাম, কিন্তু তখন আর আমাকে প্রেসক্লাব থেকে উদ্ধার করার উপায় ছিল না। সে উৎকণ্ঠার সাথে জবাব দিল, আমাদের সামনে চৌমাথায় আর্মি। গাড়ী বের করা যাবে না । ক্লাবের একটা কক্ষে রাত কাটানো ছাড়া তখন আর উপায় কি!

এর পরই সে দুটো সহস্যজনক টেলিফোন কল এলো। প্রেসক্লাব আক্রমণের সাথে এই ফোন কলের কোন যোগসূত্র রয়েছে কিনা প্রতিষ্ঠা করা কষ্টকর। তবে প্রেসক্লাব আক্রমণের যত কারণই থাকুক না কেন, একটা কারণ আমার কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়।

দারোয়ান খয়ের আমারই নের্দেশে আমাকে দোতালায় লাউঞ্জে বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে গিয়েছিল। সিঁড়ি ও বাইরের গেটেও তালা ছিল । এ রাড়ীতে কেউ থাকে না, এমন একটা ধারণা দেয়ার জন্যেই সর্বদা দ্বারে বাইরে থেকে তালা দেয়া হয় । আমি তখন ক্লাবে একা-নীরব নিস্তব্ধ ক্লাব এলাকা । সমস্ত আলো নেভানো। গরমের মধ্যেও ফ্যান চালাইনি। বের হবার পথ বন্ধ।

চারদিকে ভয়াবহ আক্রমণ চলছে। তোপখানা রোডের উপর প্লাটুন দৌড়ে যাচ্ছে । ট্রাকের ঘর ঘর শব্দ। আমি রাইফেল ষ্টেনগান, মেশিনগান আর মর্টার শেলের গগনবিদারী বীভৎস শব্দের রাজ্যে একা একটা সোফায় বসে আছি। রাজারবাগ আর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিক থেকে গোলার আওয়াজ আসছিল। হঠাৎ মর্তমান ফরেন অফিস ও ইউসিসের তেমাথায় একটা আলো জ্বলে উঠলো-সমগ্র এলাকাটা তঅন দিনের মতো স্পষ্ট। জানালার ফাঁক দিয়ে আর্মির চলাফেরা লক্ষ্য করা সম্ভব । বহুসংখ্যক ট্রাক বোঝাই সৈন্য ক্লাবের সম্মুখ দিয়ে পুরানা পল্টনের দিকে যাচ্ছে।

একটু পরেই নাবাবপুর রেল গেটের দিকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। আকাশের দিকে কালো ধোঁয়া আর আগুনের শিখা উড়তে থাকে। তারপর এক সময় পুরানো শহরের মধ্যভাগে বংশাল রোডের দিকে আগন দেখা গেল।

তখন একথা সত্যই যে, শত্রু বহিনী পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ধ্বংসের অভিযানে নেমেছ-গণহত্যক চলছে। কিন্তু তখনো জানতাম না যে পিলখানায় ইপিআর বাহিনীর সাথে দখলদার সেনাদের যুদ্ধ চলছে। রাজারবাগে বীর পুলিশরা ম্যাগাজীন খুলে প্রতিরোধ লড়াই করছে। পুরনো শহরের গলিগুলোর ব্যারিকেড বিদেশী সেনাদের পথ বন্ধ করে রেখেছে আর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলীবর্ষণ হচ্ছে।

এই নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যেও শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব মুক্তিকামী মানুষ হানাদারদের প্রতিরোধ করছিল তাদের একটা সাহসী দল সেকেণ্ড গেটের পাশের সম্মুখে সারারাত ব্যারিকেড সৃষ্টি করে গেছে। প্রেসক্লাবের ডান দিকে সেক্রেটারিয়েটের শেষ দেয়ালের গা ঘেঁষে যে কাঁচা গলিটা গেছে, তার মুখে সন্ধ্যার সময়ই একটা বড়ো ট্রাক রাখা হয়েছিল এবং তার পাশে কয়েকটা রিক্সা রেখে হানাদারদের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয় । আর সেখানেই একদল দুঃসাহসী যুবক, যারা দোকানদার, রিক্সাচালক গভীর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বড় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে চলছিল।

প্রতিবার ইয়াহিয়ার বাহিনী তোপখানা রোড দিয়ে যারার সময় এইখানে বাধা পেয়েছে, কনভয় থামিয়ে রাস্তা পরিস্কার করেছে। ক্লাব দোতলার দরজার ফাঁক দিয়ে সারারাত দেখেছি সাঁজোয়া বাহিনী বা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্লাটুন এই পথ ধরে পুরানো শহরের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে এই ব্যারিকেডের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রত্যেক বারই সৈন্যরা গাড়ি থেকে নেমে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলত। কিন্তু শেষের দিকে তারা ব্যারিকেডের উপর স্প্রে করে আগুন ধরিয়ে দিত । বাধা পেয়েই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেন আর রাইফেল শতকণ্ঠে গর্জে উঠত। বিদ্রোহীদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যেই যে কেবল এভাবে অজস্র গুলী ছোড়া হ'ত তা নয়, কল্পিত গেরিলাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হানাদার সৈন্যরা নিজেদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যেও নিষ্প্রয়োজনে ট্রিগার টিপেছে।

রাত প্রায় তিনটার দিকে বড় রাস্তা থেকে ক্লাব বিল্ডিং লক্ষ্য করে কয়েকজন সৈন্য গুলী নিক্ষেপ করে। তখনো আমি ভাবতে পারিনি যে, এটা প্রেসক্লাবের উপর আক্রমণের ওয়ার্নিং।

ব্যারিকেড উঠিয়ে বা পুড়িয়ে দিয়ে যাওয়ার পর সৈনারা কেউ থাকত না। দশ মিনিটের মধ্যেই পাশের গলি থেকে কিছু লোক ইট, কাঠের টুকরো, টিন এমন কি ছোট ছোট আস্ত পান-বিড়ির দোকান তুলে এনে রাস্তা বন্ধ করে দিত। এটা ছিল তাদের জন্যে অসহ্য এবং কাউকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে অন্ধকারে গুলী ছোড়া ছাড়া পথ ছিল না। কিন্তু প্রেসক্লাবের পাশের গলিতে ঢোকার সাহস তাদের ছিল না। আমি ভেবেছিলাম ক্ষিপ্ত ইয়াহিয়া-সৈন্যের এই জাতীয় গোলাগুলীর অংশ ক্লাবে এসে পড়েছিল।

ভোর রাতের দিকে ঢাকা শহরের কয়েকটা অঞ্চলের আকাশ অগ্নিশিখায় রঙিন হয়ে উঠিছিল-নাগরিকদের উপর আক্রমণের তোড়াটা তখন ছিল অনেক বেশী এবং সে সময় অসহায় হাজার হাজার নগরবাসীর কণ্ঠে ছিল নাগরিক এই করুণ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

এর একটু পরই প্রেসক্লাবের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

অন্ধকার কক্ষের মধ্যে আমি তখন একটা সোফা ছেড়ে আর একটায় গিয়ে বসছিলাম। বেরিয়ে পালিয়ে যাবার কোন উপায় তো তখন ছিল না-একটার পর একটা চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল। ২৪ তারিখ রাতে ৩২নং রোডের বাড়ীতে শেখ সাহেব সাংবাদিকদের একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেছিলেন: আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে বলে ওরা সময় পাচ্ছে। এই যদি মনে কর-তবে আমি কি সময় পাচ্ছি না?

ভাবছিলাম যে সময় তিনি পেয়েছেন তা'চব্বিশ ঘন্টা পর অত্যাধুনিক সেনাবাহিনীকে রোখার জন্যে যথেষ্ট কি না। আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে একটা ট্যাঙ্কের শব্দ ভেসে আসলো । ছুটে গেলাম একটা জানালার কাছে। সে রাতে এই প্রথম একটা ট্যাঙ্ক দেখলাম! কমিশনার অফিসের অঙ্গন থেকে ছোট একটা ট্যাঙ্ক (এম ২৪) গর্জন করে ইউসিসের সামনে এসে দাঁড়াল।

ট্যাঙ্কের নলটা ক্লাবের দেকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর কয়েকজন সৈন্য ট্যাঙ্কের কাছে ছুটাছুটি করছে। তখনও আমি ভেবে উঠতে পারিনি যে, প্রেসক্লাবের উপরও তাদের সরাসরি আক্রমণ চলবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবলাম সব অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো তাদের দ্বারা আজ রাতে সম্ভব হয়েছে।

কক্ষ থেকে বের হবার প্রশ্ন ওঠে না। বাথরুমের ব্যাকস্টেয়ার দিয়ে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবলাম। বাথরুমের পেছনের দরজা খুলে দেখলাম, দেয়ালের উপর কতোগুলো ফেস্টুন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছেতাতে ইয়াহিয়ার কার্টুন আর সরকারবিরোধী শ্লোগান খচিত। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে দেখলাম হাতল নেই-অন্ধকারে আমার চেষ্টা করা অসম্ভব। কক্ষের দিকে ফিরে আসার সময় ফেস্টুনগুলো টেনে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। সমস্ত ঘটনাটাই মিনিটখানেকের মধ্যে।

আমি তখনো সোফার কাছে এসে পোঁছাইনি একটা ভয়াবহ শব্দ করে প্রথম শেল এসে কক্ষের মধ্যে পড়ল । কোন কিছু চিন্তা করার পূর্বেই একটা ইসপ্লিন্টার প্রচণ্ড বেগে আমাকে উপড়ে ফলল ফ্লোর থেকে! এই

ইসপ্লিন্টারের প্রচণ্ডতা এত বেশী ছিল যে, আমি কখন ফ্লোরে পড়েছি, তা বুঝতে পারিনি। আমার উপর দিয়ে পরপর আরো তিনটে শেল নিক্ষেপ করা হয়। তারপর সব নিস্তব্ধ। দ'টো দেয়ালের কোণে আমি পড়ে ছিলাম। আঘাতে পশ্চিম দিকের দেয়াল উড়ে গেছে-বাইরে থেকে সবই দেখা যায়।

আমার উপর বাথরুমের একটা কপাট, দেয়ালের ইট পড়ে আছে। ঠিক কত মিনিট পর জ্ঞান ফিরে পেয়েছি, জানি না।

শার্ট ও প্যান্টের অনেক অংশ উড়ে গেছে, চোখে চশমা নেই, সমগ্র শরীর ইটের গুঁড়োতে লাল হয়ে আছে। পড়ে থাকা অবস্থাতেই হাত-পা নেড়ে দেখলাম কোন হাড় ভেঙ্গেছে কি না। বাঁ পা'টা উঠাতে পারলাম না-একটা অংশে অনবরত রক্ত ঝরছিল। শররীরের অনেক স্থানে আঘাতের ব্যথা বেড়ে উঠতে লাগল। ভাবলাম, জল্লাদরা শেল নিক্ষেপ করেই যে ক্ষান্ত হবে, তা' নয়। ক্লাবে ''শত্রুপক্ষের'' অবস্থান সম্পর্কে সন্দেহ করলে পরবর্তীকালে উঠে এসে স্টেন দিয়ে ব্রাস করে যাবে। আমি বাঁ' পাটা টেনে টেনে বাথরুমের পেছনের দরজার দিকে গেলাম।

তখন ভোর হয়ে গেছে। কিন্তু শহরের সর্বত্রই ব্যাপক গোলাগুলী চলছে। শহরে কার্ফু চলছিল জানতাম না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার পরই ক্লাবের বিপরীত দিকের কোয়ার্টার থেকে দারোয়ান খয়ের এসে আমাকে ক্লাবের ডাইনিং রুমে নিয়ে যায়। আমি সেখানে ফ্লোরে এসে বসলাম, সমস্ত শরীর রক্তে ভেজা।

খয়ের ছুটে গেল একটা লুঙ্গি আনতে আমার জন্যে। কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যেও সে ফিরে আসল না-ক্লাবের পশ্চিম কোণে তখন সৈন্যরা ঢুকেছে। তার বিলম্ব দেখে আমি এটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। আমার পা' টেনে টেনে পেছনের দরজা দিয়ে রান্না ঘরের পাশে গেলাম-সেখান থেকে পুকুরের পাশে সেক্রেটারিয়েটের দেয়াল ঘেঁষে যে গলিটা গেছে সেখানে উপস্থিত হলাম বিধবস্ত অবস্থায় । দশ বারোজন ছোট দোকানদার ও রিক্সাচালকদের আশ্রয় পুকুরের ধারের এই ঘরগুলোতে। কয়েকজন আমাকে ধরে নিয়ে একটা চৌকির নীচে লুকিয়ে রাখল। ইতিমধ্যে প্রেসক্লাবে আর তার পাশের সরকারী বাড়ীর মধ্যে সৈন্যেরা প্রবেশ করেছে। আমি সেই ঘর থেকে স্পষ্ট ওদের দেখতে পারছিলাম।

একজন বুড়োকে বললাম: আপনারা এখান থেকে পালান। একটু পরেই আক্রমণ হবে।

বুড়ো: যাবো কোথায়? সারারাত তো এখানেই ছিলাম-আর রাস্তা বন্ধ করেছি ব্যাটাদের। সব গাড়ি থামাতে হয়েছে ওদের, কাউকে বিনা বাধায় যেতে দেইনি।

কিন্তু এখন তো দিন আসছে, সব দূর থেকে দেখা যাবে, বললাম।

পালানোর চাইতে প্রতি আক্রমণের আগ্রহই তাদের মধ্যে প্রবল। জনৈক যুবক, হয়তো কোন দোকান কর্মচারী, সারাত কিভাবে হানাদার সৈন্যদের সন্ত্রাসের মধ্যে রেখেছিল তার বর্ণনা দিল। প্রেসক্লাবের পেছনের অংশে প্রতিবারই তারা আশ্রয় নিয়েছে হনাদারদের তাড়া খেয়ে। সাংবাদিকদের এই প্রেসক্লাবের উপর আক্রমণের কারণটা তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই সমস্ত বীর প্রতিরোধকারীদের কোন সন্ধান তারা করতে পারেনি-তাদের উপর আঘাত হানাও সম্ভব হয়নি।

এই আক্রোশেই ইয়াহিয়ার সৈন্যরা প্রেসক্লাবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল-তোপের মুখে প্রেসক্লবাবটা উড়িয়ে দিয়ে গেরিলাদের স্তব্ধ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সারারাত অন্ধকারের মধ্যে যে গেরিলারা তাদের সন্ত্রাসের মধ্যে রেখেছিল তাদের ধ্বংস করার জন্যে নিকটস্থ আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেসক্লাবে শেল বর্ষণ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

গুলীবর্ষণ সকালের দিকে কোন অঞ্চলে পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। সৈন্যরা তোপখানা রোডের উপর দাঁড়িয়ে রাইফেলের নল উঁচিয়ে আছে।

একজন মধ্য ব্যক্তিকে বললাম: এখানে গুলি আসবে, আপনারা সরে যান।

প্রশ্ন করলেন তিনি: আপনি কি করবেন?

তিন-চারজন যুবক দেয়ালের পাশের গাছটায় উঠে আমাকে টেনে দেয়ালের ওপারে নিয়ে গেল । নীচেই সরকারী মসজিদ। সেক্রেটারিয়েটের ভেতরের পরিবেশটা অন্য-প্রত্যেকটি মানুষ আক্রমণের আশঙ্কায় সময় গুনছেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোককে দেখলাম সাদা পোশাকে নির্বাক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আকস্মিকভাবে এক তরুণ এসে জিজ্ঞেস করল: রাতে কোথায় ছিলেন, কোথায় গুলী লেগেছে, শরীরের সর্বত্রই রক্ত কেন? কাপড় বদলানো দরকার। তার অনেক প্রশ্ন।

শান্তি তার নাম। মোতালেব কণ্ট্রাক্টারের মিস্ত্রী। এখানেই কাজ করে থাকে। তারপর এলো আরো কয়েকজন-সেই সাদা পোশাকের লোকগুলো।

একজন আমার পরিচয় জানতে চইলেন। বললাম: আমি কুমিল্লায় ব্যবসা করি-রাতে লঞ্চ থেকে নেমে বড় ভাই-এর বাড়ী যাচ্ছিলাম। এ সমস্ত কিছুই জানতাম না। রাতের বেলা তোপখানা রোডে গুলী খেয়েছি।

নিজেকে সাংবাদিক বলতে চাইনি বলে সবটাই মিথ্যে বললাম তাদের কাছে।

এখানে আক্রমণ হলে আপনার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হবে না, চলুন ঐ ন'তলায়। একজন প্রস্তাব করলেন। শান্তি ছেলেটা তক্ষুণি একটা লুঙ্গি নিয়ে এলো ওর ঘর থেকে। আমাকে দু'জনে ধরে দু'নম্বর ন'তলায় নিয়ে গেল। পয়লা মার্চ থেকে দেশে অসহযোগ চলেছে-অফিস -আদালত বন্ধ।

সে কারণে লিফট নেই। পাঁচতলায় গিয়ে পৌঁছলাম। কোন কক্ষই খোলা নেই। কৃষি বিভাগের একটা বাথরুম পাওয়া গেল খোলা। তখন রক্ত ঝরছিল ক্ষত দিয়ে। এই বাথরুমেই ২৬শে মার্চ ও পরবর্তী রাত কাটাতে হয়। বাইরে মৃত্যুর বিভীষিকা।

যারা আমাকে এই স্থানে আশ্রয় দিয়ে চলে গেলেন, তারা, সেক্রেটারিয়েটে প্রহরারত বিদ্রোহী পুলিশ। সকলেই পোশাক খুলে রেখে সাদা পোশাকে সেক্রেটারিয়েট পাহারা দিচ্ছেন। প্রত্যেক্যের কাছে মাত্র কুড়ি রাউণ্ড বুলেট ছিল। তারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে, রাজারবাগ ও পিলখানায় বিদ্রোহ হয়েছে। যুদ্ধ হয়েছে বর্বর বাহিনীর সাথে। বাঙ্গালী পুলিশ ও সেনাদের দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে। লড়াই না করে তারা কেউ মৃত্যুকে স্বীকার করতে চান না।

সাততলার উপর তাদের ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছিল। বিদেশী সৈন্যরা সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশ করলে এই ঘাঁটি থেকে আক্রমণ করার সমস্ত প্রস্তুতি তাদের ছিল। সেকেণ্ড গেটের ভেতর দিকে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তারা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

সাতাশ তারিখে দশটার দিকে একজন এসে বললেন, এখন গোলাগুলি বন্ধ। লোকজন রাস্তায় বেরিয়েছে। কারফিউ উঠিয়ে নিয়েছে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা সকল এখানে?

হয়তো সবাই চলে যাব, আপনাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত দিয়ে আসি, চলুন।

দু' জনে ধরে আমাকে নিয়ে এলেন সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেট পর্যন্ত। শান্তি সাথে ছিল।

পরনে লুঙ্গী, গায় গেঞ্জী অথচ তখনো আমার পায়ে ভালো এক জোড়া জুতা ছিল। শান্তিকে বললাম: তোমার বাবার সেণ্ডেল জোড়া দাও-আমার জুতার সাথে বদল কর। নইলে পোশাকে বড্ড বেশী গরমিল দেখাচ্ছে।

বিব্রত শান্তি তাই করল কিন্তু সেও আমার সাথে বেরিয়ে এলো।

আব্দুল গনি রোডে একটা রিক্সা পাওয়া গেল। বিদায়ের সময় একজন বললেন: হাসপাতালে যাবেন না। আহতদের সৈন্যরা তুলে নিয়ে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ওপর দুটি প্রতিবেদন	দৈনিক বাংলা	২১শে জানুয়ারী ও ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে ধীরেন দত্ত ও লে: কর্নেল জাহাঙ্গীরসহ শত শত বাংগালীকে গুলে করে হত্যা করা হয়

সাখাওয়াত আলী খান প্রদত্ত

২৫শে মার্চের কালোরাতে জল্লাদ ইয়াহিয়ার দখলদার বাহিনী বাংলাদেশের জনগনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে কি ঘটেছিল? উল্লেখযোগ্য যে হানাদার বাহিনী যে সমস্ত ক্যান্টনমেন্টে সবচেয়ে বেশী হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, ময়নামতি তার মধ্যে অন্যতম। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে যে সমস্ত বাংগালী সামরিক অফিসার ও জোওয়ান আটকা পড়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় কেউই বেরিয়ে আসতে পারেননি।

বাংগালী সামরিক অফিসারদের পত্নীরা কেউ কেউ বেরিয়ে আসতে পেরেছিলন, কিন্তু তারাও বন্দী অবস্থায় থাকায় প্রকৃত ঘটনার কথা বেশী জানতে পারেননি। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই ময়নামতির মত কাব্যিক নামের একটি স্থানে নরপিশাচরা যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছিল, তার প্রত্যক্ষদর্শী ১ জনার কাছ থেকে আমরা সেখানকার ঘটনার বিবরণ পেয়েছি। এ দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন, সাবেক পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনীর সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান এবং অপর জন হচ্ছেন ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের বেসামরিক কর্মচারী শ্রী রমনীমোহন শীল। শ্রী রমনীমোহন শীল ক্যান্টনমেন্টে ক্ষৌর কর্ম করতেন। প্রথমোক্ত লেফটেন্যান্ট ইমাম বেঁচেছেন সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে । তিনি জানিয়েছেন যে, তার বেঁচে থাকার এবং মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণের কথা তার বাবা যেন এখনো বিশ্বাস করতে চান না।

২৯শে মার্চ লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামানকে হানাদার বাহিনীর লোকেরা গ্রেফতার করে নিয়ে আরো ১ জন সামরিক অফিসারের সংগে একটি ঘরে বন্দী করে রেখেছিলো। ২০শে মার্চ বিকাল চারটার সময় একজন হানাদার সৈন্য ঘরে ঢুকে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে এই তিনজন অফিসারের উপর গুলি চালায়। লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামানের সংগী অপর ২ জন অফিসার সংগে সংগেই প্রাণ হারান। লেফটেন্যান্ট এর গায়েও গুলি লাগে এবং তিনি মনে করেন যে, তার মৃত্যুও হতে যাচ্ছে। গুলি করে সৈন্যটি বেরিয়ে যাওয়ার পর সেখানে একজন সামরিক অফিসার হত্যালীলা তদারক করতে আসে।

এ সময় ইমামুজ্জামান মরার ভান করে পড়ে থাকেন। অফিসারটি তাদের দেখতে এসে বলে ঠিক হ্যায় বাংগালী সব খতম হো গিয়া। এরপর পৃথিবীর বুকে নেমে আসে ঘন কালোরাত্রি। লেফটেন্যান্ট ইমাম ও অন্যান্যরা যে ঘরে ছিলেন তার বাইরে সেন্ট্রি পাহারা দিতে থাকে। ইমাম এসময় দেখেন যে, তিনি নড়াচড়া করতে পারছেন। হাতের কব্জী চোখের পাশে এবং কাঁধে গুলে লাগলেও কি আশ্চর্য ইমাম উঠে দাঁড়ালেন। বিস্ময়াভিভূত ইমাম দেখলেন শুধু উঠে দাঁড়ানোই নয়, তিনি হাঁটতেও পারছেন। মুহূর্তে সংকল্প ঠিক করলেন ইমাম যিনি কাকুলের সামরিক একাডেমিতে পাঞ্জাবী ইন্সপেক্টরদের বাংগালী দাবিয়ে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও তার ব্যাচে ৪র্থ স্থান লাভ করে কমিশন পেয়েছিলেন।

তিনি ঠিক করলেন পালাতে হবে, বেরিয়ে যেতে হবে, এই নরক পুরী থেকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে মৃত সহকর্মীদের দিকে আরেকবার তাকিয়ে ইমাম পিছনের জানালার কাছে গেলেন। টুক করে জানালা খোলার শব্দ

হলো, বাইরে সচকিত হয়ে গেল প্রহরী। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাইরে লাফ দিলেন তিনি। ধপ করে আওয়াজ হওয়ায় লাশ প্রহরারত প্রহরী ভাবল ভূত দেখছে, চিৎকার করে উঠল সে। ইমাম গায়ের শক্তি দিয়ে দৌড় দিলেন, চললেন অন্ধকারে।

এর মধ্যে গুলি হতে থাকল কিন্তু ভাগ্য ভালো ইমামের, একটা গুলিও তার গায়ে লাগেনি। কখনো দৌড়ে, কখনো হেঁটে, কখনো ক্রল করে ইমাম বেরিয়ে এলেন অন্ধকার মৃত্যুপুরী থেকে। সকালের আলোয় তিনি দেখলেন এক বুক সহানুভূতি নিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গ্রামবাংলার অনেক মানুষ। যেন মায়ের কোলে ফিরলেন আহত ইমাম। তিনি যত্ন পেলেন, পেলেন সেবা। সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেলেন আরো অনেক অনেক মুক্তিযোদ্ধার সংগে যোগ দিতে।

ইমাম আমাকে জানালেন, বন্দী অবস্থায় তিনি ঘরের জানালা দিয়ে বাংগালীদের গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন । এক জায়গায় বাংগালী ছেলেরা ভলিবল খেলছিল, তিনি দেখলেন হঠাৎ একটি হানাদার সেখানে গিয়ে গুলি চালিয়ে সবাইকে ধরাশায়ী করল । তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড গোলাগুলি। ইমাম তার সংগীদের আর্তচীৎকার শনেছেন এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মরতে দেখেছেন।

তিনি বললেন আসলে শয়তান হচ্ছে গোলন্দাজ বাহিনীর লে: কর্নেল ইয়াকুব মালিক। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে হত্যাযজ্ঞ সেই সংঘটিত করেছিল। মূলত: তার নির্দেশেই চলে এই হত্যাযজ্ঞ। এছাড়া মেজর সুলতান, ক্যাপ্টেন জাহিদ জামান, মেজর মোহাম্মদ ইয়াসিন খোকার (এই পশু নিজ হাতে গুলি করে মেজর আনোয়ারুল ইসলাম, লেফটেন্যান্ট সালাহউদ্দিন এবং সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আতিকুর রহমান সিরাজীসহ আরো অনেককে হত্যা করেছে।)

ক্যাপ্টেন ইকতেখার হায়দার (এই অফিসারের নেতৃত্বে কুমিল্লা পুলিশ লাইনে হামলা চালানো হয়) লে: কর্ণেল মালিকের নেতৃত্বে ২৯শে মার্চ কুমিল্লা শহরে গোলাবর্ষণ শুরু করা হয়। ক্যাপ্টেন আগাবোখারি ও সুবেদার মেজর সুলতান এবং আরো অনেক হানাদার নরপিশাচ নারকীয় উল্লাসে মেতে নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায় বলি ইমাম জানান।

সুবেদার মেজর ফয়েজ সুলতান সম্পর্কে লেফটেন্যান্ট ইমাম বলন যে, এই নরপশু ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলামসহ বহু লোককে হত্যা করেছে। পাগলা কুকুরের মত এই নরখাদক ক্যান্টনমেন্টে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো এবং বাংগালী দেখলেই গুলি করে হত্যা করতো।

ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে যে সমস্ত শহীদ বাংগালী সামরিক অফিসারদের কথা বললেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন, লে: কর্ণেল জাহাংগীর, লে: কর্ণেল আনোয়ারুল ইসলাম, মেজর খালেক, মেজর শহিদুজ্জামান, খ্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন বদরুল আলম লেফটেন্যান্ট ফারুক, লেফটেন্যাণ্ট এনামুল হক, লেপটেন্যাণ্ট তুর্কে (ডাকনাম), ক্যাপ্টেন আইয়ুব আলী, লে: সালাউদ্দিন, সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট আতিকুর রহমান, সেকেণ্ড লে: হারুনুর রশিদ, ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন সিদ্দিক প্রমুখ।

প্রত্যক্ষদর্শী রমনী শীলের বিবরণ

এরপর আমাদের উল্লেখ করতে হয় নর সুন্দর রমনী শীলের কথা। অত্যাবশ্যকীয় কাজে নিযুক্ত থাকায় সম্ভবত: হানাদারেরা অন্যান্যদের সংগে বন্দী করে নিয়ে গিয়েও একে হত্যা করেনি নিজেদেরই স্বার্থে।

হয়ত তারা ভেবেছিল পরে সুযোগ বুঝে এদের হত্যা করা যাবে। ক্ষৌর কর্মের মত অত্যাবশ্যকীয় কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য বর্বর পশুরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, কিন্তু সে সময় হয়তো তারা বুঝতে পারেনি, দেবপুর

রমনী শীলের চোখ আছে, আছে অনুভূতি। নরপিশাচদের এই ভুলের জন্য হয়তো রমনী শীল আজো বেঁচে আছেন, বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্কজনক নরহত্যার একটি জীবন্ত দলিল হিসাবে। কুমিল্লায় সামসুণ নাহার রারবী শ্রী রমনী শীলের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন, আমরা তার বিবরণ পেয়েছি। রমনী জানিয়েছেন, কিভাবে বাংলার কৃতি সন্তান স্বনাম ধন্য-শ্রী ধিরেন্দ্রনাথ দত্তকে হানাদারেরা অত্যাচারের জর্জরিত করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। তিনি জানিয়েছেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন।

ধীরেন বাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমনী শীলের চোখের জল বাঁধ মানেনি। মাফলারে তিনি চোখ মুছে বললেন আমার সে পাপের ক্ষমা নেই। বাবু স্কুল ঘরের বারান্দায় অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোথায় প্রসাব করবেন আমি আঙ্গুল দিয়ে ইশারায় তাকে প্রসাবের জায়গা দেখিয়ে দেই। তখন তিনি অতি কষ্টে আস্তে আস্তে একটি পা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নামেন। তখন আমি ঐ বারান্দায় বসে এক জল্লাদের দাড়ি কাটছিলাম।

আমি বার বার বাবুর দিকে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলাম বলে জল্লাদ উর্দুতে বলে এটা একটা দেখার জিনিস নয় নিজের কাজ কর। এরপর আর বাবুর দিকে তাকাবার সাহস পাইনি। মনে মনে শুধু ভেবেছি বাবু জনগণের নেতা ছিলেন, আর আজ তার কপালে এই দুর্ভোগ। তার ক্ষতবিক্ষত সমস্ত দেহে তুলা লাগান, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় উপর্যুপরি কয়দিনই ব্রিগেড অফিসে আনতে নিতে দেখি।

রমনী শীলের জবান বন্দীতে ময়নামতির মর্মান্তিক কাহিনীর আরো কিছু অংশ এখনে তুলে দিচ্ছি:

২৯শে মার্চে ক্যাণ্টনমেণ্ট

গত মার্চের ২৯ তারিখে কুমিল্লা ক্যাণ্টনমেণ্টে বাংগালী অফিসার বেসামরিক কর্মচারীসহ প্রায় তিনশত ব্যক্তিকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের তিনটি কামরায় আটক করে রাখে। বিকাল অনুমাণিক সাড়ে তিনটায় ৪০ নং ফিল্ড এম্বুলেন্স ইউনিটে কিছু গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। তার পর পরই আমরা দেখতে পাই ক্যাণ্টনমেণ্টের বিভিন্ন এলাকা থেকে সমস্ত বাংগালী অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে নিয়ে জমা করতে থাকে। এবং এই সংগে আমাকেও আমার সরকারী বাসগৃহ থেকে ধরে নিয়ে আসে।

তিনি, বলেন, ‘‘বেসামরিক, সামরিক বিভাগের সাধারণ ব্যক্তিদেরকে আটক করা হয়। ৪০ নং এম্বুলেন্স এর ফিল্ড কমান্ডিং অফিসার লে: কর্ণেল জাহাংগীরসহ অন্যান্য অফিসারদের এনে আমাদের সংগে আটক কারে। পরের দিন দুপুরে প্রশাসনিক জে: সি: ও সুবেদার আকবর খান, লে: কর্ণেল জাহাংগীর-এর গায়ের জামা খুলে তা দিয়ে তার চোখ বেঁধে ফেলে। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

তার উত্তরে উক্ত জল্লাদদ্বয় তাকে ইস্পাহানী স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে জানায়। তারপর তাকে ব্রিগেড অফিস প্রাংগণের আনুমানিক ২৫ গজ দক্ষিণে একটি গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয় । তাকে এইভাবে গুলি করে হত্যার দৃশ্য আমরা সকল বন্দী ও ব্রিগেড হেড কোয়ার্টরের ব্রিগেডিয়ার থেকে সকল ষ্টাফ অফিসার নিজ নিজ কক্ষে বসে অবলোকন করি।

এর পরপরই ১ লা মার্চে অবসরপ্রাপ্ত সিলেটের অধিবাসী মেজর হাসিব (এস, এসও) এবং শিক্ষা বিভাগের ক্যাপ্টেন মকবুলকে নিয়ে একইভাবে পরপর গুলি করে হত্যা করা হয়। ইত্যবসরে ক্যাণ্টনমেণ্টে মুজাহিদ বাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন মন্তাজ এসে উক্ত জল্লাদদ্বয়কে শাসিয়ে বলে যে একজন একজন করে এভাবে হত্যা করলে সময়ে কুলোবে না, কারণ তিনশত এর মত বাংগালীকে হত্যা করতে হবে। ক্যাপ্টেনের ধমক খেয়ে এর

পর প্রতি চারজন অফিসারকে এক একটি দড়িতে বেঁধে নিয়ে একই জায়গায় হত্যা করতে থাকে। পরে অন্যান্য সকলকে এক একটি দড়িতে (১৪ জনকে) বেঁধে নিয়ে হত্যা করে।

এর মধ্যে কর্ণেল জাহাংগীর, ইয়াকুব আলী, মেজর হাসিব, লে: বাতেন, ইঞ্জিনিয়ার্সের একজন কপ্টেন, ব্রিগেডিয়ারের সহকারী কেরানী, নায়েব সুবেদারসহ ১৫ জন কেরানীকে আমি চিনতে পারি। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর ১২ জন বেসামরিক লোক থেকে যায়। সন্ধ্যার ঠিক পরপরই একটি পাঞ্জাবী নায়েক আমাদের ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে চুপি চুপি ডেকে আমাকে বলে যে, ''তুমি ঘাবড়িওনা তোমায় কিছু করা হবে না ব্রিগেডিয়ার সাহেব বলেছেন।'' এ পর্যন্ত বলে রমনী শীল জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার সেই স্মৃতিচারণ করেন। এর মধ্যে নায়েকটি পুনরায় অভয় দিয়ে যায়।

রমনী শীল জানান তার সংগে যে, ১২ জন বেসামরিক লোক ছিল তারা হচ্ছেন ইস্পাহানী হাই স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের দুই পুত্র, রমনীসহ চারজন নরসুন্দর ও ছয়জন ঝড়ুদার। সেই কালো রাত্রি কিভাবে তারা কাটিয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া তখন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

একদিন ভোরে মুজাহিদ বাহিনীর সেই জল্লাদ ক্যাপ্টেন মন্তাজ এসে এই বন্দী ১২ জনের সবাইকে ব্রিগেডের কর্মচারী বলি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, এবং নিজ নিজ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য হুকুম দেয় । সে সময় সহকারী অধ্যক্ষের দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন জানতে পারে যে, তারা ব্রিগেডের কর্মচারী নন, ঠিক তখনই তাদেরকে ঐ গর্তের পার্শ্বে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। রমনী শীল জনান যে সারা দিন চোখের সামনে শত শত বাংগালী হত্যার দৃশ্য দেখা এবং সেই সংগে কালো রাত্রিটি অতিবাহিত করা যতটা অসহনীয় ছিল তার চাইতেও কঠিন ও দু:সাধ্য হয়ে দাঁড়ালো যখন তাকে ঐ সময়ই উপস্থিত জল্লাদদের দাড়ি কাটার নির্দেশ দেওয়া হলো।

অশ্রুসিক্ত রমনী শীল আরো জানান যে, তিনি শুধু বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারের লোকজনকে হত্যা করতে দেখেননি, ব্রিগেড হেকোয়ার্টারের বিপরীত দিকে ২৪ নং এফ, এফ রেজিমেন্টের গার্ডে ক্যান্টনমেন্ট-এর বিভিন্ন ইউনিট হতে জমাকৃত কয়েকশত বাংগালীকে ফতেহ মোহাম্মদ ষ্টেডিয়ামের দক্ষিণ প্রান্তে গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন। এই কাহিনী বলতি গিয়ে রমনী শীল কখনো হু হু করে কেঁদে ফেলেছেন, কখনো এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন এটা একটা মামুলী ব্যাপার, আবার কখনো চুপচাপ ''থ'' হয়ে গেছেন।

তিনি গভীর দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে বলেন, ''বোধ হয় এসব দেখার জন্যই আমি শত শত মৃত্যুর মাঝেও বেঁচে ছিলাম এবং এখনও আছি। আমার বাসা ও ব্রিগেড ডেকোয়ার্টারের মাঝামাঝি জায়গাতেই লে: কর্ণেল জাহাংগীরসহ ২৪ জন অফিসার ও শতাধিক অন্যান্য বাংগালীকে একটি গর্তে মাটিচাপা দিতে দেখি । ঐ সব লোককে মাটাচাপা দেওয়ার সময় গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে কয়েকজন নরখাদক ক্ষৌর কর্ম করতে হয়।

সেখান থেকে দেখতে পাই ফতেহ মোহাম্মদ ষেটডিয়ামের দক্ষিণ পাশের গর্তে নিক্ষিপ্ত কয়েকশত মৃত দেহের উপর পেট্রোল দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। পরে বুলডোজারের সাহায্যে গর্তে মাটিচাপা দেওয়া হয়। রমনী শীল বলেন, সে সব মৃত দেহের কংকাল আমি একনো মাটি খুঁড়ে তুলে দিতে পারব। আড়াই দিন অনাহারে থাকার পর রমনী শীল তার বাসায় পৌঁছার সময় দেখতে পান একটি বৃহদাকার ট্রাক ভর্তি মৃতদেহ (সম্ভবত: কুমিল্লা শহর থেকে আনা) সেই ফতেহ মোহাম্মদ ষ্টেডিয়ামের দক্ষিণ পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ট্রাকটি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত রাস্তাটি রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। গত এপ্রিল মাস থেকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ এফ, আই ওতে কাজ করার সময় তিনি যে দৃশ্য দেখেছেন তার বর্ণনা প্রসংগে রমনী শীল বলেন, এফ, আইওর অত্যাচার থেকে ব্রিগেড অফিসের সামনের হত্যাকাণ্ড অনেক ভাল

ছিল। মেজর সেলিমের এফ আইও ইউনিটে যাদেরকে একবার নেওয়া হয়েছে, কাদের মধ্যে খুব কম লোকই ফিরে এসেছে।

গত আগষ্ট মাসে রমনী শীল সি, এম, এইচ, এ বদলী হন। সেখানে তার বাসগৃহের পাশেই হানাদার সৈন্যদের লাশ কবর দেওয়া হত। এই সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে রমনী শীল উৎসাহব্যঞ্জক কণ্ঠে বলেন, সারাদিন কাজ করেছি আর সন্ধ্যায় ঘরে বসে পাক হানাদারদের কবরের সংখ্যা গুনেছি। লক্ষ্য করতাম দিন দিন তাদের কবরের সংখ্যা বাড়ছে। রাত্রে এ সমস্ত কবর খনন করা হত। এ দ্রশ্য মনে আশার আলো নিয়ে আসত।

মনে মনে ভাতাম, যে নির্যাতন ও রক্ত ক্ষয় দেখেছি, তা বৃথা যায়নি। প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। তা নাহলে শত শত পাক সেনা কি ভাবে লাশে পরিণত হচ্ছে।

-দৈনিক বাংলা, ২১ জানুয়ারী, ১৯৭২

শুধু কংকাল আর কংকাল

কুমিল্লা, ২৯শে জানুয়ারী। টিক্কা নেয়াজী ফরমান আলীর নরপশুরা ঠাণ্ডা মাথায় বাঙ্গালী নিধনের পৈশাচিকতায় ইহুদী হত্যাযজ্ঞের নায়ক আইকম্যানকেও হার মানিয়েছে। জল্লাদ পাক বাহিনী যে কি নির্মম, কি বর্বর আর পাষণ্ড ছিল তা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের হাজার হাজার বাঙ্গালীর কংকাল, সামরিক, বেসামরিক পোশাক, খসে পা মাথার চুল, হাত, পা বাঁধা অবস্থায় বিকৃত লাশ, চোখ বাঁধা অবস্থায় কংকাল নিজ চোখে না দেখলে অনুমান করাও সম্ভব নয়।

ময়নামতী পাহাড়ের গর্তে লুকায়িত ছিল প্রাচীন সভ্যতার অনেক প্রতীক। ইতিহাসের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রত্নতাত্ত্বিকের সভ্য জগতের নিকট গর্বের সঙ্গে এ বহু প্রাচীন সভ্যতার দ্বার খুলে আজকের সুসভ্য মানব জাতিকে দেখাচ্ছেন হাজার হাজার বছর আগেও এ অঞ্চলে ছিল সুসভ্য সংস্কৃতিবান একটি জাতি।

কিন্তু এই ময়নামতিতেই হানাদার বাহিনী গত ২৫শে মার্চের পর থেকে যে হিংস্রতা আর বর্বরতার প্রমাণ রেখে গেছে গভীর কম্যাণ্ড পোষ্ট অগভীর মাটির নীচে, গর্তে এবং জংগলের মধ্যে, আজকের মানুষই শুধু নয়, ভরিষ্যতের মানুষও তা দেখে ঘৃণায় আর ভয়ে শিউরে উঠবে।

বস্তুত: গোটা কুমিল্লা ক্যান্টনমেণ্টই ছিল একটি কসাইখানা। কসাই ছিল হানাদার বাহিনী আর তাদের দালালরা। সেখানে তারা খুন করেছে হাজার হাজার বাঙ্গলীকে। সেই বদ্ধভূমিটা আজ একটা কবরস্থান। ময়নামতি ক্যান্টনমেণ্ট এলাকাটা পাহাড়ি অঞ্চল। উঁচু নিচু । কোথাও কিছুটা সমতল ভূমি। ঘন শণ আর কাশ বনে ভরা।

গত শনিবার শ্রী রমনী শীলকে নিয়ে আমি ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায় পৌঁছি। ক্যাণ্টিন পেছনে রেখে কয়েক গজ এগুনোর পরই হাতের ডান দিকে আমাকে দুটো কম্যাণ্ড পোষ্টের গর্ত দেখান।

মাটি সরিয়ে সেখানে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের স্বাক্ষর দেখতে পাই তা যেমন ভয়ংকর তেমনি মর্মবিদারক। কংকাল। অনেকগুলোর উপরই সামরিক পোশাক। আর আছে সামরিক টুপি, কোমরের বেল্ট, সামরিক পরিচয়ের প্রতীক। পরে কুমিল্লা পুলিশ সুপার শ্রী চিত্তাবিনোদ দাস জানান, এ গর্তটিতে পে বুক, চেক বই, কলম, হাতের ঘড়ি, চশমা, টুপি ও নষ্ট হয়ে যাওয়া কিছু টাকা পাওয়া গেছে।

উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের পরিচয় প্রতীক। রমনী শীল যে এ ক্যান্টনমেন্টে দীর্ঘ বছর ধরে ক্ষৌর কার্যে নিয়োজিত ছিল, ও মনসুর আলী যে দীর্ঘ দিন ধরে এখানে জুতা মেরামতের কাজ করতো, উভয়েই এই বাঙ্গালী নিধন পর্বের প্রত্যক্ষদর্শী। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জাহাঙ্গীর, কয়েকজন মেজর, আর্মি এডুকেশন কোরের ক্যাপ্টেন মকবুলসহ মোট ২৪ জনের লাশ একটা স্তর প্রথম গর্তে পাওয়া গেছে।

একটি লাশ মহিলার বলে মনে হয়। সারা দুপুর আমি বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঘুরে ঘুরে দেখলাম্ আমার সঙ্গে নর সুন্দর রমনী শীল আর জুতা মেরামত কারী মনসুর। তারা আমাকে শহ শত গর্ত দেখালো। কোন কোন গর্ত হতে শেয়াল লাশের কিছুটা টেনে বের করেছে। অনেক গর্ত থেকে ভেসে আসছে পূতি গন্ধ। এখানে সেখানে এলোমেলো পড়ে রয়েছে জামা কাপড়, গেঞ্জির টুকরো। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি মাঠ। সেখানে হেলিকপ্টার উঠানামা করে।

তার দক্ষিণে আরো একটি মাঠ। সেটা কিছুটা নীচু। সমস্তটা জায়গা জুড়ে রয়েছে গর্তের পর গর্ত। প্রতিটি গর্তেই অসংখ্য কংকাল। আর মাঠটায় ছড়িয়ে রয়েছে শত শত অসহায় বাঙ্গালীর হাড় আর মাথার খুলি। কোথাও পড়ে রয়েছে খসে পড়া মাথার চুল। পূর্বদিকে বিরাট বিরাট তিনটি ডোবা দেখালো আমাকে রমনী শীল। দেখলেই বোঝা যায় সেখানে মাটি কেটে আবার চাপা দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের লাশ এখানে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে বলে তারা আমাকে জানালো।

জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তরফ হতে এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি গর্ত খোঁড়া হয়েছে। সবগুলো খুঁড়তে সময় লাগবে। নরসুন্দর রমনী শীল ৩৫/৪০ বছর বয়সের ছোটখাটো মানুষটা আর মনসুর আলী লম্বা হাল্কা গড়নের প্রৌঢ়। উভয়ে দীর্ঘ দিন ধরে এ সামরিক ছাউনীতে কাজ করতো । গত ২৭শে মার্চ বিকেল ৫টার দিকে কোয়ার্টার মাষ্টার মিটিং আছে বলে উভয়কে ব্রিগেড অফিসে ডেকে নিয়ে যায়।

সেদিন থেকে উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তাদের ঐ অফিসে আটকে রাখা হয়। তাদের সঙ্গ আরো ৫০ জন লোক ছিল ঐ কক্ষে বন্দী। ২৯শে মার্চ বিকেল অনুমান চারটার দিকে তারা দেখতে পায় ব্রিগেড অফিসের পাশের কুল গাছটার নেচে তাদের প্রিয় বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের গুলি করে নর্মিমভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছে। প্রথমে একজন একজন করে ও পরে তাড়াতাড়ি নিধনযজ্ঞ শেষ করার জন্যে ৩/৪ জনকে এক সাথে কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা ও দড়ি দিয়ে শক্ত করে হাত বাঁধা অবস্থায় ঐ কুল গাছের নিচে নিয়ে এসে গুলি করে হত্যা করা হয়।

পরদিন ভোর বেলা তাদের মাটিচাপা দেয়া হয়। ওরা সবাইকে জানিয়েছে যে তাদের চোখের সামনেই অন্তত: তিনশতেরও বেশী লোককে খুন করা হয়েছে। রমনী শীল ও মনসুরের সাথে যারা বন্দী ছিল তাদের মধ্যে অতি আবশ্যক কাজ সমাধানের জন্য দু'চারজনকে রেখে বাকী সবাইকে ৩০শে মার্চে খুন করা হয়। তাদের দুজনকে খুন করা হয়নি কিন্তু হুকুম ছিলো সামরিক ছাউনি এলাকার বাইরে তারা যেতে পারবে না।

সে হুকুমেই তারা সেদিন মেনে নিয়েছিল প্রাণে বাঁচার জন্য। তাদের চোখেমুছে সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর ভয়াল ছাপ আজো বিদ্যমান। এ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায় বিশ্বের এ জঘন্যতম পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয় ব্রিগেডিয়ার শফির নেতৃত্বে। হত্যাযজ্ঞে তার সহযোগীরা ছিল কর্ণেল খিজির হায়াত খান। আর্টিলারীর লেফটেন্যান্ট মীর, মেজর সুলতান আহমদ, ক্যাপ্টেন বোখারী, ক্যাপ্টেন জাবেদ ইকবাল, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বার্কি, সিকিউরিটি বিভাগের মেজর সেলিম, মেজর মোস্তফা, মেজর সিদ্দিকী ও ক্যাপ্টেন কবির। এই নরপশুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৈশাচিকতায় সহযোগিতা করে কুমিল্লা ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এম, কে আমীন ও কুমিল্লা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের অবাঙ্গালী ম্যানেজার আলীম।

সে আজও কুমিল্লায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আলীমকে খুঁজে বের করা হলে আরো তথ্য উদঘাটিত হবে বলে স্থানীয় জনসাধারণ মনে করেন। জুতো মেরামতকারী মনসুর আলী আমাকে জানিয়েছে যে, ১১৪ নং ব্রিগেডের খান সেনারা বহু মহিলাকে এমন কি কোলে নবজাতসহ মহিলাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে এনেছে। এদের ভাগ্যে কি পরিণতি ঘটেছে তা সে জানে না সামরিক ছাউনীর পাশে দ্বিতল ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলের উপরের সব কয়টি কক্ষে বহু দিন ধরে নির্যাতিত মহিলারা বন্দী ছিলেন। তাদের অনেকের আর্তচীৎকারে আশপাশের লোকজন শিউরে উঠতো বারবার। মিত্র বাহিনী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৬০/৭০ জন লাঞ্ছিতা মহিলাকে উদ্ধার করেছে বলে কোতোয়ালী পুলিশ সাব ইনেসপেক্টর বজলুর রহমান আমাকে জানিয়েছেন। তাছাড়া ঐ সময় আরো অনেকে পালিয়েও গেছে। কুমিল্লা কোতোয়ালী পুলিশের মতে শধু মাত্র সামরিক ছাউনীতেই চার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলেব শিক্ষক মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের অবাঙ্গলী শিক্ষককে একদিন আলোচনা করত শুনেছেন এখানে ত্রিশ হাজার বাঙ্গালীকে নিধন করা হয়েছে।

ঐ তিন শিক্ষক হচ্ছে, মঞ্জুর, সাইদ ও সোলেমান। মঞ্জুর আর সোলেমান ত্রিশ হাজার বাঙ্গলীকে হত্যা করার ঘটনা সানন্দে প্রকাশ করার সময় সাইদ মন্তব্য করেছিল 'ইয়ে কুছ নেহী, মামুলী হ্যায়'। পশুদের কাছ থেকে অন্য কোন মন্তব্য আশা করা যায় কি?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নারায়ণগঞ্জে দ'জন ছাত্রের হত্যা কাহিনী	দৈনিক ইত্তেফাক	৫ জানুয়ারী, ১৯৭২

তোমাদের খুনে পবিএ এ মাটি-

''ওরা আমাকে গুলী করেছে। ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার'' বলেছিল নারায়ণগঞ্জ ছাত্রলীগের সভাপতি ১৮ বছরের তরুণ মোশাররফ হোসেন মাশা। ২৭শে মার্চ হানাদার বাহিনীর গাড়ীর শব্দে নারায়ণগঞ্জের স্তব্ধ পরিবেশ ভেঙ্গে গেল। শহরের উপকণ্ঠ জামতলায় সবাইকে নিয়ে মোশাররফ হোসেন মাশা প্রস্তুত হয়েই ছিলো। ওদের রাইফেল গর্জে ওঠে। হানাদার বাহিনী থমকে দাঁড়ায়। ২৯শে মার্চ হানাদার বাহিনী শহরে প্রবেশ করলো। মর্টারের গর্জনে ট্যাঙ্কের নিনাদে ভীতসন্ত্রস্ত শহরবাসী পালাতে থাকে শহর ছেড়ে। এতদিনের জনকোলাহল মুখ শহরে নেমে এলো মৃত্যুর বিভীষিকা।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। হানাদার বাহিনীর গাড়ীগুলো ঘুরছে এদিকে-সেদিকে । মাশা টান বাজারে ওদের কার্যলয়ে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সহকর্মীদের নিয়ে ভাবছে কি করা যায়। এমন সময় নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন জনৈক কুখ্যাত দালালের ইঙ্গিতে হানাদার বাহিনী ওদের কার্যালয়ে প্রবেশ করে ওদের আক্রমণ করলো। হানাদার বাহিনীর গুলীতে আহত হয়ে মাশা ঢলে পড়ে। মাশার বুকের রক্তে ভিজে যায় কার্যালয়ের কক্ষতল। আহত মাশার বুক চেপে ছুটে যায় ওর মা বাবার কাছে । বলে, ডাক্তার ডাকো-আমি বাঁচবো, আমাকে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে আমার সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গলী ভাই-বোনকে। কিন্তু কোথায় ডাক্তার! শহরে তখন ভীতির রাজত্ব, চারিদিকে তখন আর্ত মানুষের মরণ হাহাকার। ডাক্তারের অভাবে রাত ১ টায় এই তরুণ দেশপ্রেমিকের প্রাণবায়ু বেদনা ব্যথিত বাংলার আকাশে মিলে গেল। শহরের স্তব্ধ পরিবেশে জেগে উঠলো আর একটি আর্ত চীৎকার।

বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী মাশা কেবল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সুনাম অর্জন করেনি, বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার প্রতিভার পরিচয় ভাস্বর হয়ে আছে। মাশা আজ আমাদের মধ্যে নেই।

ও কি জানতো, এমনি করে ওকে বিদায় নিতে হবে, ওর এত প্রিয় বাংলাদেশ থেকে। ও কি ভেবেছিল ওরা আসবে, নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ভিক্ষা করে আনা অস্ত্র নিয়ে।

কিন্তু ওরা এলো। ২৮ শে মার্চ রাত্রে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ওদের উপর হীন আক্রমণ চালালো। চিত্ত বীরের মতোই তাদের আটকাতে গিয়েছিল। গর্জে উঠলো হানাদার বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র। চিত্ত ঢলে পড়লো ওদের টানবাজারের ছাত্রলীগের কার্যালয়ের কক্ষতলে। হানাদার বহিনী একটি গুলী করেই ক্ষান্ত হয়নি, পরপর চারটি গুলী করেছে, ওর মৃতদেহটি কার্যলয়ে আগুন ধরিয়ে তার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে।

বন্দর হাইস্কুলের সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মবীর এবং দেশভক্ত চিত্তকে আমরা ভুলব না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
''অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নরপশুরা''	দৈনিক বাংলা	২০ জানুয়ারী, ১৯৭২

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নরপশুরা

ওরা যখন ওদের ফুপার রক্তাক্ত লাশ জড়িয়ে কাঁদাছিল তখন পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনটি নরপিশাচ অট্টহাসি দিয়ে ওদের বিদ্রুপ করছিল। ২৭শে মার্চ শনিবার । হানাদার বাহিনীর ৬টি জীপ ঢাকা থেকে নদী বন্দর নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হয়ে দীর্ঘ ১০ মাইল পথের দু'পাশেই চালিয়েছিল হত্যাযজ্ঞ। কামানের গোলা আর মর্টারের শেল দিয়ে জ্বলিয়ে একাকার করিয়ে দিয়েছিল অসংখ্য ঘরবাড়ী। অবশেষে নারায়ণগঞ্জ শহর উপকণ্ঠে এসে জেটি মাসদাইরে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

পরে হানাদার দস্যুরা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল নিরস্ত্র নিরীহ নারী-পুরুষের উপর। এতে অনেক জীবন অকালে ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুক থেকে। মাসদাইরেই ছিল জনাব জসিমুল হকের বাড়ী। তিনি ছিলেন জামিল ডকইয়ার্ডের মালিক। নারায়ণগঞ্জ শহরে সকলের পরিচিত। জনাব জসিমুল হক ও তার স্ত্রী হত্যা সম্পর্কে কিছু জানার জন্য আমি তাদের মাসদাইর গ্রামের বাড়ী যাই। বাড়ীতে কেউ ছিল না। ছেলেমেয়েরা সবাই অন্যত্র আত্মীয়স্বজনের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।। ঘটনাটি আমাকে জানিয়েছিল হীরা নামে একটি কিশোরী।

মিসেস হক তার ফুফু। হীরাও সেদিন জনাব হক এবং ফুফুর সাথে মৃত্যুর সারিতে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে আজও সেদিনকার ভয়ংকর দৃশ্য ছবি হয়ে আছে। কেমন করে হীরা বেঁচে গিয়েছিল এখন সে তা ভাল করে বলতে পারে না। কিন্তু সেদিনকার ভয়ংকর দৃশ্য সে ভুলতে পারেনি মোটেই। হীরা বলেছিল ২৭শে মার্চের দুটোয় সাত-আটজন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ীতে হানা দিয়ে চারিদিকে গুলী করতে থাকে। তখন ঘরের মেঝেতে আমরা সবাই শুয়ে পড়ি।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার সামনে রাইফেল ও এল, এমজি নিয়ে এসে হানাদারেরা গালাগালি দিতে দিতে আমাদের ঘরের বাইর আসতে বলে। আমরা একে একে বাইরে আসি। হানাদারেরা আমাদেরকে বাইরে এনে আংগিনায় দু'সারিতে দাঁড় করায়। পাশের বাড়ীর লোকজনও ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের সবাইকে ওরা হত্যা করে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে। অবশ্য তার আগে টাকা পয়সা লুট করতে ওরা ভুলেনি। হীরার ফুফু আসমাও রেহাই পাননি। তার বুকে বেওনেট চার্জ করে পরে গুলী করে তাকে হত্যা করে।

আমি আর শেলী (ফুফাতে বোন) তখন ফুফার লাশের কাছ থেকে বাড়ীর ভিতরে ফুফুর খোঁজে এসে এই ঘটনার সম্মখীন হই। আমাদের দেখে ফুফু আম্মা ডাক্তার ডাকতে বলে আলমারি থেকে ''নভালজীন'' ট্যাবলেট দিতে বলেছিলেন। তখন ফুফু আম্মার শরীর থেকে রক্তের স্রোত বইছিল। শেলী কাপড়চাপা দিয়ে ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। টিলিফোনে ডাক্তার ডাকছিলাম। ডাক্তার পেয়েছিলাম, কিন্তু এলাকাটার নিরাপত্তার কথা ভেবে ডাক্তার আসেননি। তখন চারিদিকে গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ আর মৃতপথযাত্রীদের যন্ত্রণা ও চীৎকার যেন এক প্রলয় বইছিল বাইরে।

ইতিমধ্যে আমাদের অপর একটি ঘরে হানাদারেরা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফুফু আম্মা তখন বেদনায় গোঙ্গাচ্ছিলেন। বাঁচার চেষ্টায় তিনি অস্থির। আমাকে তিনি পাকঘর থেকে দুধ এনে দিতে বললেন। আমি দুধ এনে ফুফু আম্মার মুখের কাছে ধরলে অতি কষ্টে দুধ পান করে ফুফা কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথমে শেলী ফুফার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখতে চেয়েছিল। কিন্ত আমি ফুফু আম্মার অন্তিমকাল বুঝতে পেরে বলেছিলাম ফুফাকে ওর মেরে ফেলেছে।

এ কথা শুনে ফুফু আম্মা একটি দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে আমাদেরকে শুধু বললেন, তোর ফুফার কবরের পাশে বাড়ীর তেঁতুল গাছের তলায় আমাকে কবর দিস। সন্ধ্যার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক বাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণ	দৈনিক বাংলা	৩ এপ্রিল, ১৯৭২

জিঞ্জিরায় নারকীয় তাণ্ডব

মোঃ সাইফুল ইসলাম

২রা এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সাল। একটি প্রভাত। কেরানীগঞ্জের একটি রক্তাক্ত প্রভাত। মাত্র কয়েক ঘন্টায় মধ্যেই পৃথিবীর ইতিহাসের ঘৃণ্যতম পশুদের আক্রমণে করে গেলো শত শত প্রাণ: লুণ্ঠত হলো কেরানীগঞ্জ, ছাই হয়ে গেলো গ্রমের পর গ্রামের পাস গ্রাম। ধর্ষিতা হলো কেরানীগঞ্জের অনেক মা বোন। রক্তের বন্যা বয়ে গেলো প্রতিটি গ্রামে। সৃষ্টি হলো রক্ত নদী সে নদী মিশে গেলো বাংলার রক্ত সমুদ্রে।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে পাক বর্বর বাহিনী যখন আক্রমণ চালায় ঢাকা নগরীতে, যখন নরপশুরা মর্টার আর মেশিনগানের ষ্টিমরোলার চালায় বুড়িগঙ্গার উত্তর পারের বাসিন্দাদের ওপর যখন নগরবাসীদের হাহাকার আর্তনাদ আর করুণ চীৎকার প্রতিধ্বনিত হয় নদীর দক্ষিণ পারে তখন কেরানীগঞ্জবাসী শুধু আশ্চার্য ও বিমূঢ়ই হয়নি, প্রতিবাদ তুলেছিলো, দলে দলে এসে জমায়েত হয়েছিলো নদীর এপারে গভীর রাতের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রি পেরিয়ে ভোর হলো। সগরবাসীরা প্রাণভয়ে নগরী ছেড়ে কেরানীগঞ্জের গ্রামে এসে ভীড় করতে লাগলো। প্রত্যেকের মুখে মলিনতার ছাপ স্বজন হারানোর। গন্তব্যস্থল ঠিক নেই সম্পূর্ণ অচেনা গ্রাম, শুধু জানটুকু সম্বল, টাকা পয়সা জিনিসপত্র কিছুই নেই সাথে। শুধু একটু ঠাঁই, একটু বাঁচার প্রচেষ্টা। ২৬শে মার্চের পরে পরপর কয়েকটি দিনে নগরীর প্রায় সমস্ত লোক বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে চলে এলো এই কেরানীগঞ্জে। যে যেভাবেই পেরেছে ছুটে এসেছে। প্রায় প্রত্যেকেই স্বজন বিচ্ছিন্ন। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেই চলে এলেন কেরানীগঞ্জে। আর কেরানীগঞ্জবাসী? সেবায় এলো কেরানীগঞ্জের প্রত্যেকে। শহরের মাতাকে করে নিল মাতা, পিতাকে পিতা, ভাইকে ভাই, বোনকে বোন। নগরীর প্রত্যেককে বুকে করে নিল কেরানীগঞ্জ। কারো অসুবিধে নেই, সব এক।

অবশেষে নেমে এলো কেরানীগঞ্জের বিভীষিকাময় সেই সকালটি। পৃথিবীর ঘৃণ্যতম পশুরা শহর থেকে দৃষ্টি ফেরালো। বক্র দৃষ্টি। সে দৃষ্টি কেরানীগঞ্জে। ইতিমধ্যে শহরের অনেকেই ভয়াতুর মনে চলে গেছে শহরে নিজ নিজ আবাসস্থানে। ছলছল দৃষ্টি নিয়ে বিদায় নিয়েছে তারা।

২রা এপ্রিলের আগের রাতে কেরানীগঞ্জের অনেক স্থানে শোনা গেলো এক চাপা কণ্ঠস্বর-মিলিটারী আসতে পারে।

অবশেষে ভোর হলো। কেরানীগঞ্জবাসী তখন ঘুমে অচেতন। সহসা শোনা গেলো কামান আর মর্টারের শব্দ। অনেকে লাফিয়ে উঠলো ঘুম থেকে। যে যেখানে পারলো ছুটাছুটি করতে লাগলো। শুরু হলো নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চারিদিকে কেবল চীৎকার শুধু প্রাণ বাঁচানোর আকুল প্রচেষ্টা। পশুরা রাত্রিভর প্রস্তুতি নিয়েছিল। কেরানীগঞ্জকে ঘিরে রেখেছিলো। ক্ষেতের মধ্যে নালা কেটে যখন তারা প্রস্তুতি নেয় কেরানীগঞ্জবাসী তখন ঘুমে অচেতন। ঝোপ, ঝাড়, পুকুর, ঘরের ছাদ যে যেখানে পারলো সবাই আত্মগোপন করলো। কিন্তু খুনী টিক্কার কুখ্যাত ব্রিগেডিয়ার বশীর রেহাই দেয়নি কাউকে। গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বলিয়ে দিলো। মেশিনগান আর

টমিগানের প্রচণ্ড আওয়াজে সকলেই বিচলিত। সমানে চলল জিনজিরা, সুভাড্যা ও কালিন্দী ইউনিয়নের লোকদের উপর গুলী, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, ধর্ষিতা হলো কেরানীগঞ্জের মা বোনেরা। প্রত্যেকটি ঘর আক্রান্ত হলো তিনটি উইনিয়নের। অবশেষে হত্যাযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটলো। বর্বর বাহিনী কুখ্যাত ব্রিগেডিয়ার বশীরের নির্দেশ মত থেমে গেল। রেখে গেল এক রক্তাক্ত কাহিনী।

প্রতি গ্রাম থেকে খবর এলো অসংখ্য মৃত্যুর। শত শত লাশ। রক্তে রঞ্জিত লাশ, পিতার বুকে জড়ানো শিশুর লাশ, মার কোল থেকে গুলী খেয়ে ছিটকে পড়া শিশুর বিকৃত বীভৎস লাশ, মায়ের লাশ, বোনের লাশ, বর্বর পিশাচের দল রক্তের নদী বইয়ে দিল কেরানীগঞ্জে।

প্রতিটি ঝোপ-ঝাড় নালা-ডোবা, আর কাশবন থেকেও পাওয়া গেলো অসংখ্য লাশ। এমন কোন বাড়ী নেই, যে বাড়ীর ক্ষতি হয়নি। প্রতি গ্রামেই বর্বর বাহিনী বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। হিন্দু এলাকাগুলো পুড়িয়েছে বেশী। এমনকি মসজিদ ও বাদ যায়নি। খোলা মাঠে পড়ে থাকা লাশে নিজের হারিয়ে যাওয়া আপন জনকে খুঁজে ফিরেছে কেরানীগঞ্জের লোক। খান সেনারা প্রত্যেক গ্রামে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে। শহর থেকে আসা অনেক অপরিচিত লোকের লাশকে নিজ হাতে গোর দিয়েছে এখানকার লোকেরা।

মান্দাইল ডাকের সড়কের সামনের পুকুর পারে দস্যুরা এক স্থানে প্রায় ষাটজন লোককে হত্যা করে। কালিন্দীর এক বাড়ীতে বর্বর বাহিনী পাশবিক অত্যাচার করতে গিয়ে এগারজন মহিলাকে হত্যা করে। খোলা মাঠ ও গ্রাম দিয়ে যখন গ্রামবাসী ছুটাছুটি করে প্রাণভয়ে তখন খান সেনারা উপহাস ভরে চালিয়েছে ব্রাশ ফায়ার। বহু অপরিচিত লাশ এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রড়ছিল। অজানা স্থানে ইতস্তত বিকৃত বীভৎস লাশ কুকুরকে খেতে দেখেছে কেরানীগঞ্জবাসী। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ভাইয়ের বিকৃত লাশ দেখে সংজ্ঞাহীন হয়েছে এখানকার মানুষ। মেয়েকে পিতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া, ভাইকে বোনের সামনে মারা, সন্তানসম্ভবা মাকে ছেলের সামনে হত্যা, প্রভৃতি করুণ দৃশ্য দেখার তিক্ত অভিজ্ঞতা কেরানীগঞ্জবাসীর। সে অভিজ্ঞতা ২রা এপ্রিলের।

জিঞ্জিরা ধ্বংসলীলার আরো বিবরণ-

On the night of 25 March a severe measure was taken by the army, against the fireservice in the city. I dit not then realise why these innocent people doing essential humanitarian services were butchered in that manner. The wholesale arson atarted in April together with the perpetual curfew during the night poignantly brought home the realisation that the massacre of the fire-men with their equipments and vehicles, ytet unheard of inhuman history, was part of a calculated plan, to deprive the people of any means of extinguishig fire after atroncious military action. Almost every night flames of fire and smoke could be seen in the sky and it was from the direction of the smoke that people guessed about the ara which was set on fire, although none came, out to enquire about the fire as the city was in the grip of curfew. During the whole week when houses were being burnt people were leaving Dacca in still larger numbers and this time the exodus was as true of the new city as also of the old city. It was estimated that population in the city was reduced to one-third of its previous size. People in their desperation to leave the city and take shelter in the safer region of the country-side abandoned their houses leaving all valuables to be looted and plundered. Men, women and children crossed the Burigana and began their long marches from the other side of the river. It is with great difficulty that we resisted the temptation to join the evacuees. Everyone we

met during these days either told us that he had left already and came back to look after the house by day or that he was contemplating to leave in a day or two. As the night crept in and with it the curfew the whole atmosphere became one of gloom and despair.

While the pendulum of our heart swung between life and death and we were thinking seriously of crossing over to the other side of the Buriganga our milkman, who hailed from jinjira dissuaded us from doing so. He told us that people who had moved out already were in great troubles. The exodus made life in the area difficult. According to an estimate the population in Jinjira had swollen to about one hundred thousand. Then suddenly came the catastrophe on the night following 1st April, similar to the one that occurred on the night following 25th March. On both occasions the da preceding was a Thursday. On both occasions the morning hours of Friday witnessed the greates massacre. We were awakened from our sleep at 5 A.M. on Friday the 2nd April by an equally severe and deafening sounds. It was still dark and time for Morning Prayer. Were Thursday nights and Friday mornings favourite operational hours for the army of the so-called Islamic State? Was the morning Azan on each Friday to be replaced by the furious sound of guns? These were the questions we asked ourselves. At once we went up to the roof and heard roaring sounds still raging while the smoke enveloped the entire southwest of the city. The roof of Mitford Hospital was made the base of operation and guns were fitted there. It was reported t6hat thousands of lives were cut short in Jinjira in this big military swoop. Those who sought safety from the city during the last six or seven days fell easy victims to this unprecedentede barbarity of the army. There were a few lucky souls, however, who miraculously escaped even from this massacre. We heard pathetic stories of several brothers returning from the mosque after Morning Prayer when they were lined up by the army men. Every time one brother was aimed at by the gun he looked to the eldest brother for guidance. The eldest brother advised him to rememder his Lord till at last when his own chance came the man in charge of the operation ran short of bullets and the victim escaped after slight injury. We heard stories of people hiding in pools of night-soil, or pounds covered by water-hyacinth, stories of mother separated from children, of brother separated from brother, and of wife separated from husband and yet eluding detection by the brutes. The army plundered the Jinjira Bazar, robbed many people of their wealth and destroyed crores of rupees worth of food-grains stocked in the area. The whole operation was directed against fugitives from Dacca, amongst whom, they alleged, were two leaders of the Mukti-Bahini, whom they searched relentlessly. For quite sometime after the incident the story got currency that the army people asked every villager about these two leaders saying, "Khasra, Monta Kidar hai"? (Where are Khosru and Montu?), and that in their utter disappointment in not finding them there they indulged in wanton ravatges. Our hearts palpitated in silent agony. As the sun rose the whole JInjira looked dark and sombre.

The Jinjira Massacre And After
Experiences of an Exile At Home
Mafijullah Kabir
December, 1972

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"জল্লাদেরা স্বামীর লাশটাও আমাকে দেখতে দিল না"	দৈনিক বাংলা	১৯ জানুয়ারী, ১৯৭২

কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে এলো মিসেস আহমদের

জল্লাদেরা স্বামীর লাশটাও একবার আমাকে দেখতে দিল না

সে হৃদয়বিদারক হত্যার বর্ণনা যখন শেষ হলো মিসেস কামরুন নাহার আহমদের দুগণ্ড বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। তীব্র শোকে বেদনায় বার বার রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার বাকশক্তি। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন: তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এত দিনের তিলে তিলে গড়া সংসারের সবকিছু ফেলে শহর ছেড়ে দূরের গাঁয়ে পালিয়েছি। কিন্তু জল্লাদ সেনাদের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না।

ব্যাঙ্কের চেকটাই তাঁর মৃত্যুর পরওয়ানা হয়ে ফিরে এলো। মিসেস কামরুন নাহার আহমদ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান রেলের চীফ পারসোনেল অফিসার মরহুম নাসিরউদ্দিন আহমদের স্ত্রী। তাঁদের বাসা ছিল চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে কলোনীতে। গত ১১ই মে রাউজানের ডাবুয়ার্গ থেকে খান সেনারা তাকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে।

বিপ্লবী বাংলার বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। বীর চট্টলার মার্চ এলো বিপ্লবীর বান নিয়ে। সর্বত্র অসহযোগ। রাস্তায় রাস্তায় বীর জনতার মিছিলে সমারোহ। জনতার পদভারে বন্দর নগরী প্রকম্পিত। বিপ্লব আর বিদ্রোহের গানে দশদিক মুখরিত। সংগ্রামের উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলছিলেন বীর চট্টলার অধিবাসীরা। সংগ্রাম মুখর সে নগরীর লাখো পরিবারেরই একটি নাসিরউদ্দিন আহমেদের পরিবার। তারপর এলো ২৫শে মার্চ।

খানা সেনারা নেকড়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র বাঙ্গালদদের উপর। এক পৈশাচিক নরহত্যাযজ্ঞে মেতে উঠলো তারা। বাঙ্গালীর রক্তে হলি খেললো দস্যু সেনারা। মিসেস কামরুন নাহার আহমদ স্বচক্ষে দেখলেন এই হত্যাযজ্ঞ। সেই বীভৎস দিনগুলোর কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে কামরুন নাহার আহমদ যেন আমাকে নিয়ে গেলেন এক প্রেতপুরেতে। একের পর এক তিরন ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগলেন আর আমি যেন মানসচক্ষে দেখতে পেলাম হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের এক লোমহর্ষ চিত্র।

কামরুন নাহার আহমদ বললেন, আমরা থাকতাম পাহাড়তলী রেলওয়ে কলোনীতে। রেলের অবাঙ্গালকির্মচারীরাই সংখ্যায় বেশী ছিল সেখানে। ২৫শে মার্চের আগে আমরা তাদের রক্ষা করেছি। কিন্তু ২৫শে মার্চের পরে ঘটনা প্রবাহ ঘুরে গেল। তারা হামলা চালালো আমাদের উপর। লুটতরাজ, নরহত্যা আর নারী নির্যাতন চললো নির্বিচারভাবে। তারপর এলো ২৭শে মার্চ, দস্যু বাহিনী শুরু করলো বোমা বর্ষণ হোসেন গ্লাস ফ্যাক্টরী, ম্যাডিকেল কলেজ ও কালুরঘাট এলাকায়।

একত্রিশে মার্চ খান সেনাদের পুরাপুরি দখলে চলে গেল চট্টগ্রাম নগরী। আবার শুরু হলো বাঙ্গালী নিধন। ২রা এপ্রিল আমরা বাসা ছেড়ে পাশের এক বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। কারণ খান সেনারা আর অবাঙ্গালীরা আমার স্বামীকে খুঁজছে। তার অপরাধ ছিল বাঙ্গালী কর্মচারীদের সাথে কথা বলতেন। বাংলার স্বাধীনতার স্বপক্ষে গোপনে কাজ করতেন।

এপ্রিল মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত আমরা সেখানেই থাকি। ৫ তারিখে আমরা জানালা দিয়ে দেখলাম আমাদের প্রতিবেশী রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মোজাম্মেল চৌধুরী, একাউন্টস অফিসার আব্দুল হামিদ, এল, আর খান, এবং তাদের পরিবারের চাকর বাকর নিয়ে মোট ১১ জনকে জবাই করে হত্যা করা হলো।

সকাল ১১টায় এই হত্যালীলা দেখে আমরা আঁতকে উঠলাম। সেদিনই পালিয়ে গিয়ে উঠলাম ২০ নং চৌধুরী নাজীর আহমদ রোড, ডা: সামসুল আলমের বাড়ীতে। সেখানে থাকাও আমাদের নিরাপদ ছিল না। তাই ডাক্তার সাহেবের পরামর্শে পালালাম তার ডাবুয়ার্গ এর বাড়ীতে। ১১ মে পর্যন্ত সেখানে আমরা থাকি। মেসেস কামরুন বলেন, এই ১১ মে আমাদের জীবনে ডেকে আনলো দু:খের অমানিশা। আমাদের হাতের অর্থ ফুরিয়ে যাওয়ায় আমার স্বামী একটি চেক ভাংগানোর জন্য ডাক্তার সাহেবের ছেলেকে পাঠান চট্টগ্রাম।

রেলওয়ে বিল্ডিং-এস ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে তার একাউন্ট ছিল। কিন্তু সেখানকার কর্মচারীরা সবাই ছিল অবাঙ্গালী। চেকের দস্তখত দেখে তারা ছেলেটিকে আমার স্বামীর খোঁজ দিতে বল। কিন্তু চেকের ব্যাকডেট এর অজুহাত দেখিয়ে ছেলেটি কিছু জানাতে অস্বীকার করলে তারা রেলওয়ে ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড-এর অবাঙ্গালী অফিসার ওয়ার্সীকে ডেকে আনে। ওয়ার্সী তখন ছেলেটিকে ও তার বাবা ডা: সমসুল আলমকে ধরে সেনাবহিনীর সদর দফতরে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আমার স্বামীর সন্ধান বের করে।

তারপর দুজন খান সেনাকে সংগে নিয়ে ওয়ার্সী রাউজানের ডাবুয়া গ্রামের ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়। তারা আমার সামনে থেকে আমার স্বামীকে নিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। তাদের সঙ্গে ডাক্তার সাহেব ও তার ছেলেও ছিল। পথে ডাক্তার ব্রিজের কাছে বাস থামেয়ে খান সেনারা আমার স্বামীকে নামিয়ে খানিক দূরে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই গুলির শব্দ পান বাসে উপবিষ্ট ডাক্তার সাহেব। মিনিট দশেকের মধ্যে খান সেনারা ফিরে আসে এবং ডাক্তার সাহেবকে চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়।

আমার স্বামীকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ডাক্তার সাহেব আমাকে জানান। মিসেস কামরুন নাহার তারপর এসে উঠলেন ঢাকাতে। অনেক অনুসন্ধান করে স্বামীর সন্ধান পাননি। দস্যু সেনাদের হাতে নাসিরউদ্দিন শহীদ হয়েছেন। সদা কর্মব্যস্ত বাঙ্গালী দরদী একটি জীবনের অবসান হলো। জীবন দিয়ে নাসিরউদ্দিন মূল্য দিলেন তার দেশ ও স্বজাতি প্রেমের। তিনি আর এই সুন্দর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। কিন্তু রেখে গেলেন বিধবা কামরুন, আর স্নেহের দুটি ছোট্ট মেয়ে রিনু আর নিড্ডুকে।

অভিশপ্ত ১১ই মেতে তাদের জীবনে নেমে এলো অমানিশার নিকষ কালো রাত্রি । মে থেকে একে একে ৮টি মাস কেটে গেল। বীভৎস রজনীর অন্ধকার জেতে দশদিক আলোয় ঝলমল করে স্বাধীনতার সূর্য উঠলো। শহীদ নাসিরউদ্দিনের স্বপ্নসাধ সফল হয়েছে। মুক্তির সোনালী আলোতে রিনু আর নিড্ডুর জীবন সুন্দর হবে, সার্থক হবে, এটাই বিধবা মার একমাত্র সান্তনা। কিন্তু এই সান্তনার মাঝেও মিসেস কামরুন নাহারের একটি মাত্র আক্ষেপঃ জল্লাদেরা একটি বারও তার লাশটি দেখতে দিল না। পুলের ধারে না মেরে তারা যদি আমার সামনেই তাকে হত্যা করত আমি তো লাশটা পেতাম।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মেজর জিয়ার পরিবারের উপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বিবরণ	দৈনিক বাংলা	২রা জানুয়ারী, ১৯৭২

মেজর জিয়া যখন দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন হানাদার খান সেনারা তখন তাঁর পরিবার পরিজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

মনজুর আহমদ প্রদত্ত

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) জিয়া যখন হানাদার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদেরকে নাজেহাল করে তুলছিলেন তখন তাঁর প্রতি আক্রোশ মেটাবার গৃণ্য পন্থা হিসেবে খান সেনারা নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজনের ওপর।

তাদের এই প্রতিহিংসার লালসা থেকে রেহাই পাননি কর্নেল জিয়ার ভায়রা শিল্পোন্নয়ন সংস্থার সিনিয়র কো-অর্ডিনেশন অফিসার জনাব মোজাম্মেল হক।

চট্টগ্রাম শহর শত্রুকবলিত হবার পর বেগম খালেদা জিয়া যখন বোরখার আবরণে আত্মগোপন করে চট্টগ্রাম থেকে স্টিমারে পালিয়ে নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছেন তখন জনাব মোজাম্মেল হকই তাঁকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। সেদিন ছিল ১৬ই মে। ঢাকা শহরে ছিল কারফিউ। নারাণগঞ্জেও সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। এরই মধ্যে তিনি তাঁর গাড়ীতে রেডক্রস ছাপ এঁকে ছুটে গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জ টার্মিনালে।

বেগম জিয়াকে নিয়ে আসার দিন দশেক পর ২৬শে মে শিল্পোন্নয়ন সংস্থায় হক নাম সম্বলিত যত অফিসার আছেন সবাইকে ডেকে পাক সেনারা কর্নেল জিয়ার সঙ্গে কারোর কোন আত্মীয়তা আছে কিনা জানতে চায়। জনাব মোজাম্মেল হক বুঝতে পারলেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে তিনি সেখানে কর্নেল জিয়ার সাথে তাঁর আত্মীয়তার কথা গোপন করে অসুস্থতার অজুহাতে বাসায় ফিরে আসেন এবং অবিলম্বে বেগম জিয়াকে তাঁর বাসা থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

কিন্তু উপযুক্ত কোন স্থান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ২৮শে মে তিনি তাঁকে ধানমণ্ডিতে তাঁর এক মামার বাসায় কয়েকদিনের জন্য রেখে আসেন এবং সেখান থেকে ৩রা জুন তাঁকে আবার জিওলজিক্যাল সার্ভের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জনাব মুজিবুর রহমানের বাসা এবং এরও কদিন পরে জিওলজিক্যাল সার্ভের ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব এস কে আব্দুল্লাহর বাসায় স্থানান্তরিত করা হয়।

এরই মধ্যে ১৩ই জুন তারিখে পাক বাহিনীর লোকেরা এসে হানা দেয় জনাব মোজাম্মেল হকের বাড়ীতে। জনৈক কর্নেল খান এই হানাদার দলের নেতৃত্ব করছিল। কর্নেল খান বেগম জিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং জানায় যে, এই বাড়ীতে তারা বেগম জিয়াকে দেখেছে। জনাব হকের কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে তাঁর দশ বছরের ছেলে ডনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ডন কর্নেল খানকে পরিষ্কারভাবে জানায় যে, গত তিন বছরে সে তার খালাকে দেখেনি।

সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে খান সেনারা তাঁর বাড়ী তল্লাশী করে। কিন্তু বেগম জিয়াক সেখান না পেয়ে হতোদ্যম হয়ে ফিরে যায়। যাবার আগে জানিয়ে যায়, সত্যি কথা না বললে আপনাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

এরপরই জনাব হক বুঝতে পারেন সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে। যেখানেই যান সেখানেই তাঁর পেছনে লেগে থাকে কেউ। এই অবস্থায় তিনি মায়ের অসুখের নাম করে ছুটি নেন অফিস থেকে এবং সপরিবারে ঢাকা ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

ব্যবস্থা অনুযায়ী ১লা জুলাই গাড়ী গ্যারেজে রেখে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা দুটি অটোরিকশায় গিয়ে ওঠেন। উদ্দেশ্য ছিল ধানমণ্ডিতে বেগম জিয়ার মামার বাসায় গিয়ে আপাতত: ওঠা। কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরী পর্যন্ত আসতেই তাদের অটোরিকশা বিকল হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাঁরা কাছেই গ্রীনরোডে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওঠেন। কিন্তু এখানে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এক বিরাট বিস্ময়। জনাব হক এখানে গিয়ে উঠতেই তাঁর এই বিশিষ্ট বন্ধুর স্ত্রী তাঁকে জানান যে, কর্নেল জিয়ার লেখা চিঠি তাঁদের হাতে এসেছে। চিঠিটা জনাব হককেই লেখা এবং এটি তাঁর কাছে পাঠাবার জন্যে কয়েকদিন ধরেই তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছে।

তাঁর কাছে লেখা কর্নেল জিয়ার চিঠি এ বাড়ীতে কেমন করে এলো তা বুঝতে না পেরে তিনি যারপর নাই বিস্মিত হন এবং চিঠিটা দেখতে চান। তাঁর বন্ধুর ছেলে চিঠিটা বের করে দেখায়। এটি সত্যই কর্নেল জিয়ার লেখা কিনা বেগম জিয়াকে দিয়ে তার পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্যে তিনি তাঁর বন্ধুর ছেলের হাতে দিয়েই একটি জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব মুজিবর রহমানের কাছে পাঠান।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় জনাব হক তাঁর এই বন্ধুর বাসায় রাতের মত আশ্রয় চান। তাঁদেরকে আরো নিরাপদ স্থানে রাখার আশ্বাস দিয়ে রাতে তাঁদেরকে পাঠানো হয় সূত্রাপুরের একটি ছোট্ট বাড়ীতে। তাঁর বন্ধুর ছেলেই তাঁদেরকে গাড়ীতে করে এই বাড়ীতে নিয়ে আসে। এখানে ছোট্ট একটি ঘরে তাঁরা আশ্রয় করে নেন।

কিন্তু পরদিনই তাঁরা দেখতে পেলেন পাক-বাহননীর লোকেরা বাড়ীটি ঘিরে ফেলেছে। জনা দশেক সশস্ত্র জওয়ান বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে। এই দলের প্রধান ছিল ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ আর ক্যাপ্টেন আরিফ। তারা ভেতরে ঢুকে কর্নেল জিয়া ও বেগম জিয়া সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জনাব হক ও তাঁর স্ত্রী জিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে যান। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ জনাব ও বেগম হকের সাথে তোলা বেগম জিয়ার একটি গ্রুপ ছবি বের করে দেখালে তাঁরা জিয়ার সাথে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। তবে তাঁরা জানান কর্নেল ও বেগম জিয়া কোথায় আছেন তা তাঁরা জানেন না।

এই পর্যায়ে বিকেল পাঁচটার দিকে জনাব হক ও তাঁর স্ত্রীকে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ীতে তুলে মালিবাগের মোড়ে আনা হয় এবং এখানে মৌচাক মার্কেটের সামনে তাঁদেরকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়ীতে বসিয়ে রাখা হয়। এখানেই তাদেরকে জানান হয় যে বেগম জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর তাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকা ঘুরিয়ে আবার সূত্রাপুরের বাসায় এনে ছেড়ে দেয়া হয়। এখান থেকে রাতে তারা গ্রীনরোডে জনাব হকের বন্ধুর বাসায় আসেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন খিলগাঁয়ে তার নিজের বাসায়।

উল্লেখযোগ্য যে এই দিনই জনার এস কে আব্দুল্লাহর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে বেগম জিয়া ও জনাব আব্দল্লাহকে এবং একই সাথে জনাব মুজিবর রহমানকেও পাক-বাহিনী গ্রেফতার করে এবং ৫ই জুলাই তারিখে জনাব মোজাম্মেল হক অফিসের কাজে যোগ দিলে সেই অফিস থেকেই ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

ক্যান্টনমেন্ট তাঁকে এফ আই ইউ (ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন ইউনিট) অফিসে রাত দশটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয় এবং দশটায় তাঁকে স্কুল রোডের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেলে প্রবেশের আগে তাঁর ঘড়ি, আংটি খুলে নেয়া হয়। সারাদিন অবুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কিছুই খেতে দেয়া হয়নি।

পরদিন সকালে তাঁকে এক কাপ মাত্র ঠাণ্ডা চা খাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের অফিসে। সাজ্জাদ তাঁর কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। তিনি তাঁর কোন পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ এতে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করে এবং শাস্তি হিসেবে তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দেবার হুমকি দেখায়। কিন্তু এরপরও কোন কথা আদায় করতে না পেরে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নীচে শুইয়ে রাখার হুকুম দেয়।

হুকুম মত রাতে তাঁকে তাঁর সেলে চিৎ করে শুইয়ে মাত্র হাত দেড়েক ওপরে ঝুলিয়ে দেয় পাঁচশো পাওয়ারের দুটি অত্যুজ্জ্বল বাল্ব। প্রায় চার ঘন্টা অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়।

পরদিন আবার তাঁকে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের কছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সাজ্জাদ আবার তার পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। জানতে চায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কি কি কথা হয়েছে, তিনি ভারতে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা। জনাব হক এ সব কিছুই অস্বীকার করলে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁর ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে। এরপর তাঁর সেলে চব্বিশ ঘন্টা হাজার ওয়াটের বাতি জ্বালিয়ে রাখার হুকুম দেয়।

বেলা একটায় তাঁকে সেলে এনেই বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঘন্টা কয়েক পরেই তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকেন। চীৎকার করে তিনি একটি কথাই বলতে থাকেন: আমাকে একবারেই মেরে ফেল। এভাবে তিলে তিলে মেরো না।

তিনি যখন অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করছিলেন তখন তাঁর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো একজন পাঠান হাবিলদার। তাঁর এই করুণ আর্তি বোধ হয় হাবিলদারটি সইতে পারেনি। তারও হৃদয় বোধ হয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মানুষের ওপর মানুষের এই নিষ্ঠুর জুলুম দেখে। আর তাই বোধ হয় সে সেন্ট্রিকে ডেকে হুকুম দিয়েছিল বাতি নিভিয়ে দিতে। বলেছিল, কোন জীপ আসার শব্দ পেলেই যেন বাতি জ্বালিয়ে দেয় আবার জীপটি চলে যাবার সাথে সাথেই যেন বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়।

এরপর্ ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে আরো কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নতুন ধরনের নির্যাতন চালায়। তাঁর কাছ থেকে সারাদিন ধরে একটির পর একটি বিবৃতি লিখিয়ে নেয়া হয় এবং তার সামনেই সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে আবার তাঁকে সেগুলি লিখতে বলা হয়। এবং যথারীতি আবার তা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই অবস্থায় ক্লান্তি ও অবসন্নতায় তিনি লেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। এদিকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নীচে থাকায় তিনি দৃষ্টি শক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেন। দিন ও রাতের মধ্যে কোন পার্থক্যই বুঝতে পারতেন না।

২৬ শে জুলাই বিকেলে তাঁকে ইন্টার স্টেটসস্ক্রিনীং কমিটির (আই এস এস সি) ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে ছোট্ট কামরায় তাঁরা মোট ১১০ জন আটক ছিলেন। বিকেল পাঁচটার দিকে তাঁকে বের করে রান্নাঘরের বড় বড় পানির ড্রাম ভরার কাজ দেয়া হয়। এই কাজে আরো একজনকে তাঁর সাথে লাগানো হয়। তিনি হচ্ছেন জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব এস কে আব্দুল্লাহ। তাঁরা দুজনে প্রায় পোয়া মাইল দূরের ট্যাপ থেকে বড় বড়

বালতিতে করে পানি টেনে তিনটি বড় ড্রাম ভরে দেন। রাতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাঁদেরকে একজন একজন করে খাবার দেয়া হয়। এতদিন পরে এই প্রথম তিনি খেতে পান গরম ভাত ও গরম ডাল।

পরদিন সকালে তাঁর এবং আরো অনেকের মাথার চুল সম্পূর্ণ কামিয়ে দেয়া হয়।

এখানে বিভিন্ন কামরায় তাঁকে কয়েকদিন আটকে রাখার পর ৬ই আগষ্ট নিয়ে যাওয়া হয় ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন সেন্টারে (এফআইসি)। মেজর ফারুকী ছিল এই কেন্দ্রের প্রধান এবং এখানে সকলের ওপর নির্যাতন করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল সুবেদার মেজর নিয়াজী। ফারুকী এখানে থাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাকে বিবৃতি দিতে বলে। কিন্তু বিবৃতি লেখানোর নাম করে সেই পুরোনো নের্যাতন আবার শুরু হয়। একটানা তিন দিন ধরে তিনি একই বিবৃতি একের পর এক লিখে গেছেন এবং তাঁর সামনে তা ছিঁড়ে ফেলে আবার এই একই বিবৃতি লিখতে বলা হয়েছে।

৯ই আগষ্ট তাঁকে দ্বিতীয় রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানে বিভিন্ন কক্ষে তাঁকে প্রায় দেড় মাস আটক রাখার পর ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ৩০শে অক্টোবর তিনি মুক্তি পান।

ইতিমধ্যে রাজাকাররা তিনদফা তাঁর বাড়ীতে হামলা চালিয়ে সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায়। সর্বশেষ গত ১৩ই ডিসেম্বর তারা তাঁর গাড়ীটিও নিয়ে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বর্বরতার রেকর্ড'	দৈনিক আজাদ	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

বর্বরতার রেকর্ড

\ রহিম আজাদ প্রদত্ত \

বরিশাল: 'মহাদেবের জটা থেকে' নয় বাংলা মায়ের নাড়ী ছিঁড়ে জন্ম নিয়েছিলেন যে সোনার মেয়ে সে ভাগীরথীকে ওরা জ্যান্ত জীপে বেঁধে শহরের রাস্তায় টেনে টেনে হত্যা করেছে। খান দস্যুরা হয়তো পরখ করতে চেয়েছিল ওরা কতখানি নৃশংস হতে পারে। বলতে হয় এক্ষেত্রে ওরা শুধূ সফলই হয়নি, বর্বরতার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

অষ্টাদশী ভাগীরথী ছিল বরিশাল জেলার পিরোজপুর থানার বাঘমারা কদমতলীর এক বিধবা পল্লীবালা। বিয়ের এক বছর পর একটি পুত্র সন্তান কোলে নিয়েই তাকে বরণ করে নিতে হয় সুকঠিন বৈধব্য।

স্বামীর বিয়োগ ব্যথা তাঁর তখনও কাটেনি। এরই মধ্যে দেশে নেমে এল ইয়াহিয়ার ঝটিকা বাহিনী । গত মে মাসের এক বিকালে ওরা চড়াও হলো ভাগীরথীদের গ্রামে। হত্যা করলো অনেককে যাকে যেখানে যেভাবে পেলো।

এ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের মধ্যেও ভাগীরথীকে ওরা মারতে পারলো না। ওর দেহলাবণ্য দস্যুদের মনে যে লালসা জাগিয়েছিল তাতেই হার মানল তাদের রক্তপিপাসা। ওকে ট্রাকে তুলে নিয়ে এল পিরোজপুরে। তারপর ক্যাম্পে তার উপর চালানো হলো হিংস্র পাশবিক অত্যাচার।

সতী নারী ভাগীরথী। এ পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে তিনি একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতেই এক সময় এল নতুন চিন্তা হ্যাঁ মৃত্যুই যদি বরণ করতে হয় ওদেরই বা রেহাই দেব কেন?

ভাগীরথী কৌশলের আশ্রয় নিল এবার। এখন আর অবাধ্য মেয়ে নয় দস্তুরমত খানদের খুশী করতে শুরু করল, ওদের আস্থা অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলো।

বেশী দিন লাগলোনা অল্প ক'দিনেই নারীলোলুপ ইয়াহিয়া ওর প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করল। আর এই সুযোগে ভাগীরথী ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে শুরু করল পাক বাহিনীর সব গোপন তথ্য।

এক পর্যায়ে বিশ্বাস ভাজন ভাগীরথীকে ওরা নিজের ঘরেও যেতে দিল। আর কোন বাঁধা নেই। ভাগীরথী এখন নিয়মিত সামরিক ক্যাম্পে যায় আবার ফিরে আসে নিজ গ্রামে।

এরই মধ্যে চতুরা ভাগীরথী তাঁর মূল লক্ষ্য অর্জনের পথেও এগিয়ে গেল অনেকখানি। গোপনে মুক্তিবাহিনীর সাথে গড়ে তুলল ঘনিষ্ট যোগাযোগ।

এরপরই এল আসল সুযোগ। জুন মাসের একদিন ভাগীরথী খান সেনাদের নিমন্ত্রণ করলো তাঁর নিজ গ্রামে। এদিকে মুক্তিবাহিনীকেও তৈরী রাখা হলো যথারীতি। ৪৫ জন খান সেনা সেদিন হাসতে হাসতে বাগমারা কদমতলা এসেছিল কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৪/৫ জন ক্যাম্পে ফিরতে পেরেছে বুলেটের ক্ষত নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। বাকিরা ভাগীরথীর গ্রামেই শিয়াল কুকুর শকুনের খোরাক হয়েছে।

এরপর আর ভাগীরথী ওদের ক্যাম্পে যায়নি। ওরাও বুঝেছে, এটা তারই কীর্তি। কীর্তিমানরা তাই হুকুম দিল জীবিত অথবা মৃত ভাগীরথীকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

কিন্তু ভাগীরথী তখনও জানতো না ওর জন্য আরও দু:সহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। একদিন রাজাকারদের হাতে ধরা পড়লো ভাগীরথী। তাকে নিয়ে এল পিরোজপুর সামরিক ক্যাম্পে।

খান সেনারা এবার ভাগীরথীর উপর তাদের হিংস্রতার পরীক্ষার আয়োজন করলো । এক হাটবারে তাকে শহরের রাস্তায় এনে দাঁড় করানো হলো জনবহুল চৌমাথায়। সেখানে প্রকাশ্যে তার অঙ্গাবরণ খুলে ফেলল কয়েকজন খান সেনা। তারপর দু'গাছি দড়ি ওর দু'পায়ে বেঁধে একটি জীপে বেঁধে জ্যান্ত শহরের রাস্তায় টেনে বেড়াল ওরা মহাউৎসবে। ঘন্টখানেক রাজপথ পরিক্রমার পর আবার যখন ফিরে এল সেই চৌমাথায় তখনও ওর দেহে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে।

এবার তারা দু'টি পা দু'টি জীপের সাথে বেঁধে নিল এবং জীপ দ'টিকে চালিয়ে দিল বিপরীত দিকে। ভাগীরথী দ'ভাগ হয়ে গেল। সেই দ'ভাগে দু'জীপে আবার শহর পরিক্রমা শেষ করে জল্লাদ খানরা আবার ফিরে এল সেই চৌমাথায় এবং এখানেই ফেলে রেখে গেল ওর বিকৃত মাংসগুলো।

একদিন দু'দিন করে মাংসগুলো ঐ রাস্তার মাটির সাথেই একাকার হয়ে গেল এক সময়। বাংলামায়ের ভাগীরথী এমনিভাবে আবার মিশে গেল বাংলার ধূলিকণার সাথে।

কেবল ভাগীরথী নয়, আরও দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকেও ওরা এমনি করে পিরোজপুর শহরে হত্যা করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রমনা পার্কের বধ্যভূমি	দৈনিক বাংলা	৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রমনা পার্কের বধ্যভূমি
ক্ষয়ে যাওয়া পোষাক দেখে কি
তাদের সনাক্ত করা যাবে?
\ হাসিনা আশরাফ \

রমনা পার্কের উত্তর পূর্ব কোণটা কি পাক সামরিক চক্রের কোন বধ্যভূমি সমাধিস্থল? রাজধানী ঢাকার কেন্দস্থলে অবস্থিত রমনা পার্কের উত্তর কোণটার যেদিকে ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট হাউসের সীমানা শুরু হয়েছে, তার থেকে কিছুটা ভেতরের দিকেই এটি অবস্থিত। পুরো জায়গাটাই প্রায় জুড়ে রয়েছে, বেগুনী বর্ণের বোগেন ভিলা বা বাগান বিলাসের রঙিন কুঞ্জ।

এই ঝোপটির নীচে বড় বড় কয়েকটি গর্তে এবং পাশের উঁচু স্থানে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে নরকংকালের অস্থি এবং মাথার খুলি। মাটির সাথে সমান হয়ে ছড়িয়ে আছে হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। জায়গাটা যে সত্যিকার কতখানি বিস্তৃত বার থেকে তা আজ বেঝার উপায় বেই। তবে এখানকার অনেকেই জানিয়েছে যে, পশরা অসংখ্য মানুষকে ট্রাকে করে প্রেসিডেন্ট হউসের মধ্যে নিয়ে হত্যা করার পর গর্তের মধ্যে পুঁতে রাখতো।

বৃষ্টির পানিতে গর্তগুলো যখন ভরে যায় তখন পানির সাথে সাথে কতকগুলো আধপচা লাশ এবং সঙ্গে অসংখ্য স্কুল, কলেজের বই লেসে উঠতো। এসব লাশের মধ্যে কয়েকটি লাশের লম্বা চুল এবং দেহের গঠন দেখে মহিলা বলে চেনা গিয়েছিল। রমনা পার্কের নিভৃত এই প্রান্তে কোন হতভাগা ভাইবোনদের সমাধি স্থল যে রচিত হয়েছিল কংকালের অস্তি আর ভগ্ন খুলির মাঝে, আজ তা জানা যাবে না।

তবে প্রশ্ন জাগে মনে এরা কি সেই হতভাগা পুলিশ ভইদের কেউ, যারা অসহযোগ আন্দোলনের সময় দস্যু ইয়াহিয়াকে পাহারা দেবার জন্য প্রেসিডেন্ট হাউসে নিযুক্ত হয়েছিল; প্রশ্ন জাগে মনে, এরা কি সেই ছাত্র ভইদের কেউ, যারা শুধু দেশপ্রেমের শপথ নিয়ে জীবন্ত আত্মার তাগিদে শূন্য হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল জল্লাদ পাক বহিনীর বিরুদ্ধে?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাভারের কয়েকটি হত্যা কাহিনী	দৈনিক সংবাদ	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

আম কাঁঠালের আর শন বনে ঘেরা সাভার জনপদ
আজ কাঁদছে: আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও

শহরের একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি দূর করতে আর চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতি রোব্বার অসংখ্য লোকের ভীড় জমে এখানে । সেই প্রকৃতি সুন্দরী সাভার আজ হাহাকার করছে।

হারানো মানিকের দিকে যেন সাভার অপলক দৃষ্টি রেখে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন তার জিজ্ঞাসা বুঝা কঠিন। হয়তো বলবে আমার সোনার মানিকদের ফিরিয়ে দাও। কত অফুটন্ত ফুলের কুড়ি অকালে ঝরে পড়েছে। কে তার হিসাব রেখেছে। বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে, ছড়িয়ে অসংখ্য নরকংকাল। এদের একত্র করলে হয়ে উঠবে এক কঙ্কালের পাহাড়।

বর্বদের পৈশাচিক তা থৈ থৈ নৃত্য শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন শিয়াল, কুকুর শকুনি খুঁজে বেড়াচ্ছে এর মাংস। এমনি এক অভাগিনী স্বামীহারা সাভারের হরিপদ মজুমদারের স্ত্রী। শভ্র বসনে বসে রয়েছেন। পাশেই তার ছোট বোন সান্তনা দিচ্ছে নানা কথা বলে। কিন্তু তার অবুঝ মন মানে না। কোলের শিশু নানা প্রলোভন দেখালেই কান্না থেমে যায়। হরিপদ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করা হলো, কিন্তু চকিত চাহনীতে তাকিয়ে আছে। কোন ভাষা নেই তার মুখে। কি যেন বলতে চাইছে অথচ কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। ‘‘মুন্সগঞ্জের কেওয়াড় গ্রামের পাশে একটি খাল আছে। সেই খালের পাশে গেলে দেখতে পাবেন কতকগুলো নরকংকাল ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে ওদিকে। ওরই মাঝে শুয়ে রয়েছে হরিপদ মুজমদারের কংকালটা।’’ অপলক দৃষ্টিতে দীর্ঘনি:শ্বাস ফেলে কথা কটি বলল মজুমদারের শ্যালিকা। হরিপদ মুজমদারের বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বৎসর। কর্মজীবন সবেমাত্র শুরু। ব্যাক্তিগতভাবে তার সাথে মিশে দেখেছি। সদালাপী, শান্ত, দৃঢ়, প্রত্যয়ী এবং অমায়িক পুরুষ। ভবিষ্যত গড়ার সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা তার ছিল। ছোট সংসার। তখন মাত্র ২ টা বাচ্চা- যখন তার সাথে প্রথম পরিচয়। এখন তার ৫ টি সন্তান।

ফরিদপুরের মুকসুদপুরে লাইভষ্টক ডিপার্টমেন্টের ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট। এর উপর নির্ভর করত তার সুখের সংসার। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিলেন ‘সকল কলকারখানা ব’ন্ধ। তাই কাজে যোগ দেননি। তারপর ২৫শে মার্চ নিয়ে এলো বাংলার বুকে ঘন তমসাচ্ছন্ন এক বিভীষিকাময় রাত। দিকে দিকে আগুন আর কান্নার রোল। হরিপদ মজুমদার পালাল। এসে স্থান নেয়েছিল মুন্সিগঞ্জের কেওড়ার গ্রামে। কিন্তু মৃত্যুর সাথে এত সংগ্রাম করেও সে বাঁচতে পারেনি। ‘‘পালাবার পথ নেই যম আছে পিছে।’’ ১৪ই মে। নেমে এলো জীবনের শেষ পরিণতি হরিপদ মজুমদারসহ আরও ২১টি নিষ্পাপ প্রাণের। পাক মেজর জাভেদ আক্তারের পরিচালনায় গ্রাম ঘেরাও করা হলো। এরা ২২ জন ধরা পড়লো। খালের পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হলো। তারপর নৃশংস অত্যাচার। তাদের হৃদয়বিদারক চীৎকার হয়ত তখন গাছের কচি পাতাগুলোও ঝরে পড়েছিল।

কিন্তু নরপশুদের এতটুকু মমতা ছিল না। হঠাৎ কয়েকবার গুলির আওয়াজ শুনা গেল। তারপর তাদের সেই মর্মস্পর্শী চীৎকার ধীরে ধীরে কোন অতল তলে তলিয়ে গেল বলা যায় না।

হরিপদ মুজমদার আর নেই। কিন্তু তার পরিবারের শোকের ছায়া এখানো স্তিমিত হয় নাই। বিধবা স্ত্রী উচ্চস্বরে না কাঁদলেও তার দু’গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা যেভাবে অঝোরে নীরবে ঝরছিল তাতেই তার শোকের পরিমাণ অনেকটা বুঝা যাচ্ছিল।

সাভারের দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মুখ মনে করলেই স্ত্রী বিরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়ের কথা প্রথমে মনে পড়ে। ১৯৭১ সালে সাভারের নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রাণপণ লড়েছেন তাঁদির মধ্যে রয়েছেন জগদীস সাহা, ডা: গুরুদাস সাহা এবং বিরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়। কিন্তু আজ? সে আজ পুত্র শোকাতুর। সাভারে নিহতদের মধ্যে অন্যতম হরিপদ মজুমদার ও বিরেন্দ্র বাবুর বাড়ী পাশাপাশি। পাশাপাশি একজন বাস করছে স্বামীহারা অবলা নারী। অপর জন পুত্রহারা নারী।

এমন স্বামীহারা, পুত্রহারায় আজ বাংলার বুক ছেয়ে গেছে। দ্বিতীয় ছেলে নির্মল রায়। বয়স মাত্র ৩২ হয়েছিল। ঢাকাতে দুলিচান ফার্মের গোডাউন ইনচার্জ। একজন ভাল খেলোয়াড়। স্থির বিনম্র দৃষ্টি। মিষ্টি ব্যবহার। সাভারের নির্মল রায় নামটি বললে সবার মানসপটে ভেসে ওঠে সে নির্মল রায়। আজ আমাদের মধ্যে নেই। হারিয়ে গেছে লক্ষ হতভাগ্যের মাঝে।

৮ই ডিসেম্বর। ভোর রাত। অন্যান্যসহ নর্মিলও তখন রয়েছে ঘুমিয়ে। হঠাৎ বাহিরে বিকট আওয়াক। সকলেরই ঘুম ভেংগে গেল। উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল চারদিকে কুখ্যাত আল-বদর পাক বাহিনীর কয়েকজন তাদের সবার দিকে অস্ত্র নিশানা করে দাঁড়িয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে আপাদমস্তক অবলোকন করছে।

তারপর নির্মলসহ অন্যান্য কয়েকজনকে পাশেই এক বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর কয়েকটি গুলির আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বিদারক চীৎকার। তারপর গভীর নীরবতা, সব শেষ। ছেলের এমন মৃত্যকাহিনী বলতে এক সময় নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না বিরেন্দ্র রায়। ছেলের ছবি বুকে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। ‘‘যে নির্মল আজীবন স্নেহ লালিত্যে মানুষ, একটা কটু কথা বলা যার অভ্যাস নেই আর আজ আমার নির্মলের এ কি পরিণতি।’’

দুলীচাঁদ ফার্ম থেকে নির্মল রায়ের সাথে যারা জীবনের শেষ সঙ্গী হয়েছিলেন তাদের একজন হলেন সূর্য কান্ত রায়। শেষ বয়সী ভদ্রলোক। উক্ত ফার্মের একজন পদস্থ কর্মচারী। সূর্য কান্ত রায়ের স্ত্রী তার একখানা ফটো বের করে দিলেন। তারপর বিলাপ এবং কান্না।

উমেশ চন্দ্র সাহা। বয়স মাত্র ২৮ বৎসর। সংসারের দারিদ্রকে কাটিয়ে উঠতে ম্যাট্রিক পাশ করার পরেই এই ফার্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐ একই দিনে তাদের শরীক হতে হয়েছিল জয় গোপাল সাহার। ব্যাক্তিগত জীবনে ছিলেন ধীর, স্থীর, নম্র, শান্ত এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী। সর্বশেষ যে মধ্য বয়সী ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন মতিলাল সাহা। দুলীচাঁদ ফার্মেরই একজন কর্মচারী। বর্বরদের হাত হতে রেহাই পাননি, ওদের সবার সাথে মতিলাল সাহার আত্নাহুতি দিতে হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বরের কালো রাতে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমি	দৈনিক বাংলা	১৯ জানূয়ারী, ১৯৭২

রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূম: শিক্ষক শ্রমিক
ছাত্র কিষান-কিষানীর অতলান্ত
সেই রক্তস্রোত

‘‘আবার গোলযোগ হলে আমাদের পালানোর জায়গা আছে। ভরতে গিয়ে আশ্রয় নেবো, বেঁচে যাবো। ভাই, আপনারা যাবেন কোথায়? আপনাদের যে আর কোন পথ রইলো না।’’ প্রিয় মুসলিম সহকর্মীদের জন্য অকৃত্রিম সমবেদনায় সহকারী অধ্যাপক রেজাউল হককে এই কথাগুলো বলেছিলেন বরিশাল জেলার অধিবাসী অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে। আইয়ুবের যোগ্যতর উত্তরসূরি রক্তপিপাসু নয়া সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন জারীকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

কিন্তু না। অধ্যাপক অধিকারী পালাতে পারেননি। বাঁচাতেও পারেননি তার প্রাণ। তার এই তাৎপর্যবহ মন্তব্যের সাক্ষী দেওয়ার জন্য সৌভাগ্যেক্রমে অধ্যাপক রেজাউল হক আজও বেঁচে আছেন। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর আক্রমণ শুরুর পর অধ্যাপক অধিকারী পালিয়ে ছিলেন। গাইবান্ধা মহকুমার সুন্দরগঞ্জে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় অপর সহকর্মী অধ্যাপক আবুল কাশেমকে বলেছেন টাকা-পয়সা নেওয়ার জন্য কেউ যদি মেরে ফেলে তাদের হাতে মরতেও রাজী আছি। কিন্তু বর্বর খানসেনাদের হাতে নয়। বেতন নেয়ার জন্য রংপুরে এসেছিলেন। কিন্তু বেতন নিয়ে আর ফিরে যেতে পারেননি।

১৯৭১ সালের ৩০শে এপ্রিল। রপুর কারমাইকেল কলেজের ২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দমদমার পুলের নীচে তার অপর তিন সহকর্মী রসায়নের লেকচারার কুমিল্লার শ্রী কালিচাঁদ রায় ও তার পিতা, দর্শনের লেকচারার বরিশালের শ্রী শুনেল বরণ চক্রবর্তী ও গণিতের লেকচারার বরিশালের শ্রী চিত্তরঞ্জন রায়ের সাথে খুনি পাক সেনাদের গুলিতে প্রাণ হারান।

বাড়ী গিয়েও রেহাই নেই

রংপুর কারমাইকেল কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান দিনাজপুরে তার গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ী দেকেই সেনাবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর আর কোন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।

তিনি কাজে যোগ দিতে পারেননি

রসায়নের লেকচারার কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরীর অধিবাসী জনাব আব্দুর রহমান মে মাসের শেষদিকে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজে যোগ দেওয়া আর হয়নি। তখন হয়ত এ দু’জন অধ্যাপক হত্যা করেছে। খান সেনাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন রংপুর শহরের বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও রাজনৈতিক নেতা জনাব ইয়াকুব মাহফুজ আলী।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে রংপুরের শ্মশান ঘাটে তার সাথে আরো ১০ জনকে এক সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে এক দিনে।

আর পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পূর্বমুহূর্তে ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের কোন এক সময়ে রংপুর বার-এর বিশিষ্ট আইনজীবী একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী রংপুর জেলা ন্যাপের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী শিবেন মুখার্জীকে সম্ভবত: হত্যা করা হয়েছে। শেষ দিকে তিনি দিনাজপুরে জেলে ছিলেন । ১১ই ডিসেম্বর তাকে মুক্তি দেওয়ার নাম করে দিনাজপুর জেল থেকে বের করে আনা হয়। তারপর আর শিবেন বাবুর কোন খোঁজ মেলেনি।

কত যে বধ্যভূমি

গোটা জেলায় প্রতিটি শহরে মহকুমায়, থানায় আনাচে কানাচে, কত যে বদ্ধভূম আছে তার অন্ত নেই। বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ নয়, যেখানে শত শত এমনকি হাজার হাজার লোককে মেরেছে এমন বধ্যভূমিগুলির মধ্যে উল্লেখ করার মত রংপুর শহরও সদর মহকুমার নবিরহাট, জাফরগঞ্জের পুল, নিশবেতগঞ্জ, শ্মাশান ঘাট (রংপুর শহরের কাছে) সাহেবগঞ্জ এবং রংপুর শহরের কাছে মডার্ন সিনেমা হলের পিছনে এবং দেবিপুর।

এসব এলাকায় মানুষের হাড়গোড় অসংখ্য পড়ে আছে। ভাল করে খনন করা হলে শত শত নয় হাজার হাজার মানুষের কংকাল খুঁজে পাওয়া যাবে। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে কুকুরণের বিলে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

গাইবান্ধা

এ ছাড়া গাইবান্ধা শহরের হেলাল পার্ক, লালমনির হাট, শহর, এবং সৈয়দপুরে হাজার হাজার নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুন্দর গানুর এলাকা থেকে বহু ঘরের মা, বোনদের ধরে এনে পাশবিক লালসা চরিতার্থ করে হত্যা করা হয়েছে। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত উত্তম নামক স্থানের রিক্সাচালক আহাব উদ্দিন মডার্ন সিনেমা হলের পিছনের একদিনের হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

গত নবেম্বর মাসের ৮ তারিখে আমি যখন রংপুর রেলষ্টেশনে আমার রিক্সার খোঁজ পাই তখন জুম্মাপাড়া নিবাসী পাক বহিনীর জনৈক দালাল আমাকে ন্যাপের কর্মী হিসাবে দুষ্কৃতকারী ও মুক্তি ফৌজ বলে পাক বাহিনীকে সনাক্ত করে দেয়। তখন পাক বাহিনীর জোয়ানরা আমাকে আটক করে রংপুর মর্ডান হলে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে ১৪ দিন আটক করে রাখে। আটক অবস্থায় পাঞ্জাবী পুলিশ আমার দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে আমাকে অমানুষিক অত্যাচার করে। তের দিন পর আমাকে ও আমার সাথে আটক আরো ১৩ জন লোককে যথাক্রমে লালমনির হাটের এক ক্ষত্রিয়মেয়ে, জিনকি, মালেকা, গাইবান্ধার আলী হোসেন, ফারুক, পলাশবাড়ীর আশরাফ আলী, রংপুর উপশহরের রিক্সাচালক আলী ও অন্যান্য সবাইকে রাত্রি ১০ টার সময় মডার্ন হলের পিছনে নিয়ে যায়। আমার সামনে তিনজন পাঞ্জাবী পুলিশ (এদের মধ্যে আজমল খান নামক এক সুবেদার পরে মুক্তিবাহনীর হাতে নিহত হয়েছে) পরপর পাঁচজনকে যথাক্রমে জিনকি, মালেকা, আলী হোসেন, ফারুক ও আর একজনকে যার নাম জানে না আমার সামনে জবাই করেছে। তখন আমি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে প্রাণভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করি এবং পরে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাই।

যখন আমি মডার্ন হলে আটক ছিলাম তখন সেখানে ৩৪০ জন লোক ছিল। তাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
''আমার ভাইকে তোমরা হত্যা করো না''	দৈনিক ইত্তেফাক	২২ জানূয়ারী, ১৯৭২

''আমার ভাইকে তোমরা হত্যা করো না''

সৈয়দ আকবর হোসেন মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বার আক্রমণে পলায়নপর পাকিস্তানী বর্বর জল্লাদদের হাতে ব্রাহ্মনবাড়িয়া নিহত হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্ত হওয়ার ঠিক আগের দিনে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের শিকার তিনি। আগরতলা থেকে নভেম্বর মাসে তিনি তার গ্রাম সরাইলে ফিরে আসেন। সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে মুক্তিবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে। রাতের বেলায় হিংস্র পাকিস্তানী পশুরা অতর্কিতে তার গ্রামের বাড়ী ঘিরে ফেলে।

তার ছোট ভাই সৈয়দ আফজাল হোসেন (যিনি গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিলেন) তাকেও আকবর হোসেনের সাথে গ্রেফতার করা হয়। ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে (১৯৭১) যখন উভয়কে চোখ বাঁধা অবস্থায় হত্যা করার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আকবর হোসেনের ছোট ভাই আফজাল হোসেন জল্লাদদের কাছে অনুনয় করে বলেন,-''আমাকে হত্যা কর। আমি নিজেকে মুক্তিবাহিনীর সদস্য স্বীকার করছি। আমার ভাইকে তোমরা হত্যা কর না। তিনি নির্দোষ। আমি ছেলেমানুষ। আমি অবিবাহিত। আমাকে মেরে ফেলা হলে কারো কোন ক্ষতি হবে না। আামার ভাই বিবাহিত তিনটি শিশুসন্তানের পিতা। নিষ্পাপ শিশুদেরকে এতিম করবে না। ওদেরকে দেখাশুনা করার মতন কেউ আর পৃথিবীতে নাই।'' সে আকুল আবেদন নির্মূল হলো। গর্জে উঠলো মেশিনগান। অন্যান্য ৪০ জন বুদ্ধজীবীর সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দুই ভাই-এর নশ্বর দেহ। একই মায়ের দু'ছেলে একই মুহুর্তে জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দিয়ে বাংলার শস্য শ্যামল বুককে আরো উর্বর করে দিয়ে গেল। আকবর হোসেন ঢাকা হাইকোর্ট বার এর এডভোকেট ছাড়াও কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের সদস্য ও মগবাজার আওয়ামী লীগ ইউনিট এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কংকালের মিছিল এখানে	দৈনিক সংবাদ	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নরপশু পাকসেনাদের ধ্বংসযজ্ঞের আর এক অধ্যায়: কংকালে মিছিল এখানে

বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহাঙ্গন যেন এক একটি বধ্যভূমি। প্রতিটি ভিটা এক একটি শহীদ মিনার। পল্লীর শ্যামল দিগন্ত তাই বেদনায় মলিন। বিস্তৃত মাঠের মাটি ঘাসে লেগে আছে শহীদের রক্ত। নরসিংদী শহরের অদূরে নরসিংদী তারাবো রাস্তার খাটারা পুলটিও হানাদার জল্লাদদের একটি বধ্যভূমি। নরপিশাচরা এই সেতুটিকে পরিণত করেছিল নির্যাতন কেন্দ্রে ও বধ্যভূমিতে।

হায়েনার দল পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে তরুণ, তরুণী, ছেলে, বুড়ো নির্বিচারে সকলকে ধরে নিয়ে আসতো এখানে। ওদের উপর চলতো নির্যাতন। নির্যাতনের পর্ব চুকলে তাদের হত্যা করে লাশগুলো পুলের আশেপাশে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হতো। হত্যালীলার নীরব সাক্ষী এই পুলের চারিদিকে বহু নর কঙ্কাল ও মাথার খুলি আজও ছড়িয়ে আছে।

ব্যাপক অনুসন্ধানে পাক বাহিনীর নিষ্ঠুরতম নির্যাতান ও পাইকারী নরহত্যার অনেক মর্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশ হতে পারে বলে সকলে মনে করেন। স্থানীয় সমাজকর্মীরা অনুসন্ধান চালিয়ে ইতিমধ্যেই ঝাটারা পুলের আশেপাশের পতিত জমি থেকে বহু নরকঙ্কাল উদ্ধার করেছেন। এসব নর কঙ্কালের মধ্যে একটি কঙ্কাল জনৈক মহিলার বলে অনুমান করা হচ্ছে।

কঙ্কালগুলোর আশেপাশে পাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হতভাগ্য ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তেমনি অনুমানের ভিত্তিতে ঐ কঙ্কালটি কোন যুবতীর বলে ধারণা হচ্ছে। কারণ কঙ্কালটির হাতে কাঁচের চুড়ি রয়েছে। আরো একটি কঙ্কাল সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে সেখানে। এই কঙ্কালটি শিবপুর থানার করার চর গ্রামের জনৈক ব্যক্তির। পোশাক-পরিচ্ছেদ দেখে আরো দুটি কঙ্কাল সনাক্ত করা হয়েছে। সম্ভব কঙ্কাল দুটি নরসিংদী মহাবিদ্যালয়ের নিখোঁজ দুজন হিন্দু অধ্যাপকের বলে উদ্ধারকারীরা ধারণা করেছেন। তাঁত বস্ত্রের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ সেখের চরের জনৈক সমাজকর্মী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে, বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবতীদের ধরে এনে হানাদার পাক সেনারা নরসিংদী টেলিফোন একচেঞ্জে নিজেদের পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো। যারা নরপশুদের কাছে আত্মসর্পণ করতো না তাদের হত্যা করা হতো। তারপর সেই মৃতদেহের উপর পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে লাশগুলো ফেলে দেওয়া হতো।

এই একচেঞ্জেই নরপশুরা ক্যাম্প খুলেছিল। এখান থেকেই নরপশুরা দালালদের সাহায্যে রাতে গ্রামে হানা দিয়ে বাঙ্গালী নর-নারীদের ধরে আনতো। তারপর তারদর উপর চালাতো বর্বর অত্যাচার। নির্যাতন শেষে তাদের এই খাটারা পুলের কাছে এনে হত্যা করতো। পাঁচদোলাপুল ও খাটারাপুল ছাড়াও আরো কয়েকটি বধ্যভূমি রয়েছে নরসিংদীতে। সেগুলো হচ্ছে পুটিয়া পুল, সানখোলা পুল, খাসির দিয়া রায়পুরা থানার হাটু ভাংগা, বাদুয়ার চর রেলপুল। এসব বধ্যভূমিতে কত বাঙ্গালী লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, মা-বোনের বিদেহী আত্মা আজো হাহাকার করে ফিরছে তার হিসেব কেউই দিতে পারবে না।

বাংলার মানুষদের হত্যা করে, তাদের বসতবাটি জ্বালিয়ে, সম্পত্তি লুট করে কৃষককের গবাদি পশু জবাই করে, মাঠের ফসল বিনষ্ট করেই এসব নরপশুরা ক্ষান্ত হয়নি, তাদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়নি শিক্ষা ও ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠান, এমনকি সমজিদ মন্দির গীর্জাও। স্যার কেজি গুপ্ত হাই স্কুলটিও এইসব বর্বর পশুরা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। জিনারদি এলাকার অবিভক্ত বাংলার কৃতী সন্তান স্যার কে, জি গুপ্ত ১৯১৯ সালে নরসিংদী তারাবো রাস্তার পাশে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। তার নামানুসারেই স্কুলটির নামকরণ করা হয়। এই স্কুলের সন্নিকটে অবস্থিত পাঁচদোলা পুল। এখানেই ছিল নর পশুদের একটি ক্যাম্প। নরপশূরা নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও গণহত্যা চালাতো এখান থেকে। নর পশুদের জবাব দিচ্ছিলো মুক্তিবাহিনী। মাঝে মাঝে মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের আক্রমণ কারে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। অতর্কিত আক্রমণের জন্য মুক্তি সেনারা স্কুলটিকে ব্যবহার করতো বর্ম হিসাবে।

তাই পাক সেনারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে অগ্নিসংযোগ করে। বর্তমানে এই স্কুলের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় ২০ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি এই সব অক্ষরজ্ঞানহীন পশুরা নষ্ট করে দিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিরাজগঞ্জ যমুনা পারের কিছু হত্যা-কাহিনী	দৈনিক আজাদ	২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

এখানকার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পাকিস্তানীদের নৃশংস নরমেধযজ্ঞের কাহিনীগুলো একে একে বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে আসছে কি ভাবে তারা পল্লীমায়ের নিভৃত কোল থেকে তার তরুণ যুবক ছেলেদের ছিনিয়ে এনে লঞ্চ ঘাটে জবাই করতো আর নদীর বুকে ছুড়ে ফেলে দিত। সিরাজগঞ্জের সাবজেলটি ঠিক এমনি জবাই খানার কাজে ব্যাহৃত হতো।

এসব একদিন দু'দিনের ঘটনা নয়। এপ্রিল মাসে হানাদাররা সিরাজগঞ্জে প্রবেশের পর থেকে নয় মাস ধরে দিনের পর দিন এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে । আর গ্রামে গ্রামান্তরে মানুষ হতভাগ্যদের আর্তনাদে শিউরে উঠেছে।

এতে করে সিরাজগঞ্জের জবাইখানাগুলোর কমপক্ষে ৩ হাজার লোক মারা পড়েছে। আর যে বন্দর ২৫শে মার্চের আগে অহরহ কর্মব্যস্ত থাকতো তা-ই আরা ২৭ শে এপ্রিলের পর এক জনমানবহীন প্রেতপুরীতে পরিণত হয় । লোকজন যতদূর সম্ভব এই ঘাটি এড়িয়ে চলতে চাইত।

বার্তা প্রতিষ্ঠান বি এস এস এর প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জের আওয়ামী লীগ, ন্যাপ মুক্তিবাহিনী আর মুজিব বাহিনীর বহু নেতার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তারা জানান যে ২৭শে এপ্রিল থেকে পাঁচ দিন ধরে তারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কম করে ৫শত লোককে হত্যা করেছে।

আজ এসব কথা লিখতে বসে বারইতলা গ্রামটির কথা মনে পড়ে গেলো। কাজীপুর থানার এই গ্রামে গত বছর নভেম্বরের কোন এক সময়ে তারা হামলা করে। মাত্র একটি দিনের নারকীয় যজ্ঞ। অথচ এই একটি দিনে নারী, পুরুষ ও শিশুতে মিলে ২শত লোককে জল্লাদরা হত্যা করে। কমপক্ষে ২ শত ঘাবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।

এরও আগে মে মাসে সিরাজগঞ্জ থানার বাবতীতে মারা পড়ে ১৭০ জন। বারইতলা আর বাবতী এই দুজায়গাতেই মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে শত্রুকে বাধা দিয়েছে।

এভাবে নরহত্যা, লুটতরাজ আর অগ্নিসংযোগের অমানুষিক ইতিহাস ঘাটলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক একটি গ্রামের ছবি: তামাই, রাজাপুর, সাইদাবাদ, সিংলাবাড়ী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আর এক বধ্যভূমিত চট্টগ্রামের দামপাড়া	দৈনিক বাংলা	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়া

ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীরা এখানে কয়েক হাজার লোক হত্যা করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম, ২১ শে জানুয়ারী। এই শহরের দামপাড়াস্থ গরীবুল্লা শাহর মাজারের পাশে একটি লোমহর্ষক বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। গত ৩০ শে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই বধ্যভূততে বর্বর পাক বাহিনী প্রায় কয়েক হাজার লোককে হত্যা করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বধ্যভূমির স্থানটি আমাকে দেখিয়েছেন গরীবুল্লা মাজারের সংলগ্ন দোকানদার নাসির আহমদ।

গত ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বধীন না হওয়া পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞের ষোল আনাই তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর দোকানেই ছিলেন। নাসির আহমদ আমাকে বলেছেন, গত ৩০শে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অতিরিক্ত বৃষ্টির দিন ছাড়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় কড়া মিলিটারী পাহারায় পাঁচ থেকে ছয় ট্রাক বোঝাই লোক নিয়ে আসা হত।

এই হতভগ্যাদের চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকতো। তাদের বধ্যভূমিতে নামিয়ে দিয়ে ট্রাকগুলি চলে যেতো। এই হতভাগ্যদের বধ্যভূমিতে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হতো। তারপর অন্য একদল মিলিটারী ট্রাক নিয়ে বদ্যভূমিতে এসে লাশগুলি ট্রাক বোঝাই করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেত। নাসির আহমদ আমাকে আরো বলেছেন যে, নিয়মিত এই হত্যাযজ্ঞের শুরুতে লাশ পুঁতবার জন্য বধ্যভূমির পাশে একটি গভীর গর্ত খনন করা হয়।

মাত্র কয়েক দিনে লাশে এই গভীর গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে সদ্যমরা লাশগুলিকে ট্রাকে চড়িয়ে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। আমার অনুরোধে নাসির আহমদ এই গর্তের মুখ থেকে সামান্য মাটি সরিয়ে পাঁচটি নরকংকাল উঠান। তাঁর মতে সেই গর্তে কমপক্ষে পাঁচ হাজার নরকংকাল রয়েছে। এই লোমহর্ষক বধ্যভূমি চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বধ্যভূমির চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে হতভাগ্যদের জামা-কাপড় জুতা প্রভৃতি। মাটিতে রয়েছে চাপ চাপ বিস্তর রক্তের দাগ যা প্রমাণ করেছে যে গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এখানে কয়েক'শ লোককে হত্যা করা হয়েছে।

বধ্যভূমির পাশে হাঁটার সময়ে মাটিতে আমি গোটাদশ স্যুটও দেখতে পেয়েছি। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রেলওয়ে পোর্ট ট্রাস্ট এবং অন্যান্য অফিসের যে সব হতভাগ্য অফিসার নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের অনেককেই এই বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়েছে। নাসির আহমদের মতে অত্যাচারের কালো দিনগুলোতে বর্বর পাক বাহিনী এই বধ্যভূমিতে কয়েক হাজার লোককে হত্যা করেছে। তিনি বলেছেন যে, নিয়মিত এই হত্যাযজ্ঞের শুরুতে চোখ বাঁধা অবস্থায় বধ্যভূমিতে আনা এক দল লোককে গুলি করে হত্যা করলে গুলির আওয়াজে হতভাগ্যদের লাইন করে দাঁড়ানো অন্যদল মৃত্যুভয়ে চীৎকার করতো বলে পরে রাইফেলে সাইলেন্সার লাগিয়ে গুলি করে মারার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

নিয়মিত এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের আরও দুইজন সাক্ষী পাওয়া গেছে। এরা হচ্ছেন গরীবুল্লা শাহর মাজারের দারোয়ান আব্দুল জব্বার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গ্রামে গ্রামে পথে পথে বধ্যভূমি	পূর্বদেশ	৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

গ্রামে গ্রামে পথে পথে বধ্যভূমি
\ পূর্বদেশ রিপোর্ট \

বারিশাল, পটুয়াখালী, আশুগঞ্জ কুষ্টিয়া এবং চট্টগ্রামের দামপাড়ায় সম্প্রতি বেশ কটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সব বধ্যভূমিতে হানাদার ইয়াহিয়ার সৈন্যরা গত ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে গত ন'মাস ধরে কয়েক লাখ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চলে কয়েকটি এলাকায় পাক হানাদার বাহিনী কয়েক লক্ষ লোক হত্যা করেছে। এ অঞ্চলে এখনো অনেক স্থানে নরকঙ্কাল ও মানুষের হাড় পড়ে আছে। বরিশালে হানাদার বাহিনী সুপরিকল্পিত উপায়ে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। ওরা বারিশাল শহরে কোন ঘর-বাড়ী ধ্বংস না করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে, বরিশালে তারা কোন গণহত্যা বা ধ্বংস চালায়নি।

কিন্তু শহর থেকে একটু গ্রামের দিকে এগুলোই দেখা যাবে পশু বাহিনীর হিটলারী কার্যকলাপের চিহ্ন। বরিশাল শহরে কীর্তন খোলার তীরে অবস্থিত ওয়াপদা কলোনী এলাকায় এবং সি, এস, ডি, গোডাউন এলাকায় ও স্টেডিয়ামের নিকেটে পশু পাক বাহিনী বাঙ্গালীদের হত্যা করতো। এই সকল এলাকায় নদীর তীরে এখনও মানুষের মাথার খুলি এবং হাড় দেখতে পাওয়া যায় । বারিশাল মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসের কতিপয় ছাত্র বদর বাহিনীর সদস্য ছিল। ঐ সকল বদর সদস্যরা বহু বাঙ্গালীকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ঝালকাঠি একটা প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

ঝালকাঠি বন্দরে পশু বাহিনী পেট্রোলের সাহায্যে আগুন ধরিয়ে সব ঘরগুলো পুড়িয়ে দেয়। এই বন্দরে কমপক্ষে বিশ কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। ঝালকাঠির অদূরে আটঘর, কুরিয়ানার পেয়ারা বাগানে মুক্তি যোদ্ধারা সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এই পেয়ারা বাগানের পেয়ারা সমগ্র বাংলাদেশে সরবরাহ হয়ে থাকে। এই বাগান এলাকায় একদিনেই পশু বাহিনী কয়েক হাজার লোককে হত্যা করে। এর ভিতর ষোল বছরের যুবক থেকে চল্লিশ বছরের লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী।

পাক বাহিনী এই পেয়ারা বাগান কেটে পরিষ্কার করার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হাজার হাজার লোককে বলপূর্বক ধরে আনে এবং তাদেরকে দিয়ে পেয়ারা বাগান কেটে পরিষ্কার করাতে থাকে। নিরীহ গ্রামবাসী গাছ কাটতে অস্বীকার করলে তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। এই এলাকায় দালাল ব্যতীত অন্য কোন নিরীহ বাঙ্গালীর পক্ষে টিকে থাকা দুরুহ ব্যাপার। কউখালি, বরিশালের আর একটি প্রধান বন্দর। এই বন্দর হানাদাররা সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেয় ও গ্রামের গ্রামে ঢুকে নিরীহ বাঙ্গালীদের হত্যা করে। পিরোজপুর মহকুমা শহরে নদীর তীরে যে স্থানে বাঙ্গালীদের দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হতো সেই জায়গায় রক্তের জোয়ার বইতো।

পিরোজপুর হানাদার বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত হওয়ার পর সেখানে যত যুবক ছিল সবাইকে হত্যা করা হয়। রাজাপুর বানরি পাড়া মঠবাড়িয়া স্বরুপকাঠি এবং অন্যান্য এলাকায় হানাদার বাহিনী শান্তি কমিটির সহযোগিতায় বিপুলসংখ্যক বাঙ্গালীকে হত্যা করে। পটুয়াখালী শহরেই কয়েক হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়। পটুয়াখালী জেলার অন্যান্য এলাকায় যে সংখ্যক নিরীহ লোকদের হত্যা করা হয় তার প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হলে মোট হত্যার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

কুষ্টিয়া থেকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার একটি খবরে বলা হয়েছে য়ে, পাকিস্তানী সেনা এবং তাদের যোগসাজশকারীরা কুষ্টিয়া জেলায় গত ন'মাসে প্রায় চল্লিশ হাজার লোককে হত্যা করেছে। নিহতের সংখ্যা বলতে গিয়ে গণপরিষদ সদস্য জনাব আজিজুর রহমান আক্কাস এখানে এক বিবৃতিতে বলেন যে, যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই হচ্ছেন ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সের কিশোর ও যুবক।

পূর্বদেশের ভৈরবস্থ সংবাদদাতা মেহদী হাসান জানিয়েছেন, গত বিশে ডিসেম্বর আশুগঞ্জে গিয়েছিলাম যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলার বাস্তব চিত্র দেখতে। আশুগঞ্জে মেঘনা নদীর চরে যা দেখলাম তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেদিন আশুগঞ্জের বালুচরে দাঁড়িয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম স্তূপীকৃত মানুষের লাশ দেখে। সেনারা আত্মসমর্পণের পূর্বে এই সমস্ত লোকদের হত্যা করে। আশুগঞ্জ ভৈরব বাসীদের নিকট গত ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল মৃত্যুপুরী। ভৈরব শহরের কতো লোককে যে ধরে নিয়ে আশগঞ্জের এই বধ্যভূমিতে হত্যা করেছে তার হিসেব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই আশুগঞ্জ ছিল ভৈরব বাসীর কাছে মৃত্যুপুরী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহীর গর্তে আরো নরকংকাল	দৈনিক বাংলা	৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রাজশাহীর গর্তে আরো নরকংকাল
আধমরা লোকগুলোকে পশুরা মাটিচাপা দিয়েছিল
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

রাজশাহী, ২রা ফেব্রুয়ারী।- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেলওয়ে ষ্টেশনের পাশে নরকংকাল ভর্তি আরো গর্ত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। দৈনিক আজাদের প্রতিনিধি ও রাজশাহী জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদকে হত্যার পর বর্বর পাক বাহিনী এই গর্তে পুঁতে রাখে। জানা গেছে যে, গত বছর ২৮শে জুন পাক বাহিনীর কতিপয় দালাল জনাব আবু সাঈদকে ধরে নিয়ে যায়।

এই দালালদের মধ্যে তৎকালীন দৈনিক সংগ্রামের স্থানীয় প্রতিনিধিও ছিল। জনাব সাঈদকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে প্রায় এক সপ্তাহ আটক রাখা হয়। এরপর ৫ই জুলাই অপর ১৫ জন ব্যক্তির সাথে জনাব সাঈদকে জোহা হলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে দিনাজপুরের জনৈক রেলওয়ে কর্মচারীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। বর্বর পাক বাহিনী মৃতদেহটি রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে বয়ে নিতে বন্দীদের বাধ্য করে। ষ্টেশনের পাশে একটি বাবলা গাছের নীচে তাদের সামনেই একটি গর্ত করা হয়। এরপর তাদের সকলকে জোর করে গর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খোঁচানো হয়। এই সাথে পাশ থেকে মাটি নিয়ে তাদের সবাইকে অর্ধমৃত অবস্থায় গর্তের মধ্যে চাপা দেওয়া হয়।

কিন্তু এদের মধ্যে রাজশাহী জিন্না ইনষ্টিটিউটের পিয়ন আব্দুল কাদের, শ্যামপুরের জনৈক রুপভান মিয়া পরস্পরের সাহায্যে গর্তের মধ্যে থেকে কোন রকমে উঠে ভারতে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর এদের কাছ থেকেই এই লোমহর্ষক কাহিনী জানা গেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাধীনতার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইটখোলা, বদর বাহিনী ও রাজাকার ক্যাম্প বোয়ালিয়া, ক্লাব প্রভৃতি স্থানে এ ধরনের শত শত গর্তের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া পাক বাহিনী আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পূর্বে নিহত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ছাত্র ও অপরাপর বুদ্ধিজীবীর লাশ উদ্ধার করা হয়। শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের হাজার হাজার বাঙ্গালীকে বর্বর পাক বাহিনীর নৃশংসভাবে হত্যা করে লম্বা গর্তের মধ্যে পুঁতে রাখে। এদেরকে গলা কেটে হত্যা করা হয় বলে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে জানা গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ধামরাই আজ শ্মশান	সংবাদ	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রথযাত্রা উপলক্ষে আর ভীড় জমবে না এখানে
ধামরাই আজ শ্মশান

বাংলাদেশের একটি স্থান নাম ধামরাই। নামটাকে কন্দ্রে করে প্রচলিত আছে অনেক কিংবদন্তি। অনেক ভক্ত প্রাণ এই নামটিকে স্মরণ করে ভাবাবেগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানকার প্রাচিন কীর্তি ধামরাইয়ের পথ। বাংলাদেশের এত বড় রথ আর কোথাও ছিল না। শোনা যায় এই রথটাকে টানতে প্রায় একশত মণ পাটের দড়ির দরকার হতো।

রথযাত্রার সময় ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা এ পাট দান করতেন। রথযাত্রা উপলক্ষে বসতো মেলা। ভক্তজনেরা এসে ভীড় জমাতো এই ধামরাইয়ে । অসংখ্য সাধূ সন্ন্যাসীর পদধুলিতে পবিত্র হয়ে উঠতো ধামরাইয়ে পথ ঘাট।

গত এপ্রিলের প্রথম দিকে এই ধামরাইয়ে প্রবেশ করলো পাক-ফৌজের একটি দল। লুট করলো মন্দিরের সোনাদানা টাকা-পয়সা ও মূল্যবান আসবাবপত্র। বাংলার এই বিখ্যাত রথটাকে লাগালো আগুন। কয়েকদিন ধরে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল রথটি। পাক সেনারা রথটি পুড়িয়েই ক্ষান্ত হলো না । এর স্মৃতি বাঙ্গালীর মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য ছাই ও কয়লাগুলো ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে গেল।

বাংলাদেশ থেকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিল একটা ঐতিহ্যকে। ভক্তজনের কলগুঞ্জনে ধামরাই আর জেগে উঠবে না সহসা । ভাক্ত রথীরা আর আসবে না এখানে। রথটিও কোনদিন নতুন করে গড়ে উঠবে না। ধামরাই কালের বুকে জেগে থাকবে ধ্বংসের ইতিহাস হয়ে পাক হানাদার এ ঐতিহাসিক রথটিকে নিশ্চিহ্ন করে থেমে যায়নি। এখানকার বহু লোককে গ্রেফতার করেছে। নির্যাতন করেছে। হত্যা করেছে। পাক হানাদারদের সাথে জুটেছিল বাংলার কতিপয় ঘৃণ্য নরপিশাচ। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো হানাদারদের। এখানেও পথ দেখিয়েছিল কতিপয় এদেশী মোহাম্মাদী বেগ। ধামরাইয়ে নিহত হতভাগ্য বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ধামরাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক দীনেশ বাবুর কথা। বার্নিয়ার রোগী ছিলেন দীনেশ বাবু। তার স্ত্রী মস্তিষ্ক বিকৃত। তার তিনটা ছেলে। তৃতীয় ছেলে হাবুল জগন্নাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

বাবার সঙ্গেই বাড়ীতে ছিল গোলযোগের সময়। ৯ই এপ্রিল বেলা ১২টা । তিনি রান্না করছিলেন। এর ফাঁকে উঠতে হলো তাকে। কারণ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে লোক। বেলা ১২টার মধ্যে ৩/৪ বার দৌড়ালেন আবার ফিরে এলেন। অদৃষ্টে যা আছে তা খণ্ডাবে কে? পাক বাহিনী রাস্তা কেমন করে চিনবে বা তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবে? কিন্তু ঘরের শত্রুবিভীষণ।

বাংলার মাটিতে ছিল অসংখ্য মীরজাফর আর জগত শেঠ। এই মীরজাফর, জগতশেঠের বংশধরদেরই একজন ধীনেশ বাবুকে সনাক্ত করে দিল । দীনেশ বাবু ধরা পড়লেন। ছেলে হাবুল বাড়ীতেই। তার সঙ্গে ৪/৫ হাজার টাকা। হাবুল ভেবেছিল হয়ত টাকা পেলেই বাবাকে ছেড়ে দিবে। তাই এগিয়ে গিয়েছিল দালালদের হাতে পায়ে ধরে বাবাকে ছাড়তে। তহি বুঝি কাল এসেছিল। তাকেও রেখে গেল না বর্বর ডাল কুত্তার দল।

তাকে থানায় রেখে দেয় একরাত । দীনেশ বাবু এবং তার ছেলে হাবুল এর উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় এতেও দণ্ড শেষ হলো না দুটি নিষ্পাপ প্রানের। দীনেশ বাবার দিন শেষ প্রায়। হাবুলের জীবনের যাত্রা

হয়েছে শুরু। তহি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয় সম্ভাবনাময় প্রাণটিকে। এদের সঙ্গে আরো যাদের ধরা হয়েছিল তারা নিতান্তই গরীব। তাদের প্রতিদিন কাজ না করলে পেটের খোরাক জোটে না।

এরা হচ্ছেন গান্ধীপাল (দোকানদার), বুদ্ধ সূত্রধর, (লোহার কামার) গনেশ পাল (পান বিক্রেতা), চিনু বণিক (হকার), গয়া রাজবংশী (মাছ বিক্রেতা) প্রবেশ সূত্রধর (লোহার কামার) আরো ৪ জন নাম না জানা লোক। দীনেশ রায় এবং ছেলে হাবুলকেসহ এদের ধামরাই থেকে ৩/৪ মাইল দূরবর্তী কালামপুর বাজারে নিয়ে যায়। সবার চোখ বাঁধা । বাজারের পাশে কালামপুর আতাউর রহমান হাইস্কুলের মাঠ। মাঠের পাশ দিয়ে একটা খাল নদীতে গিয়ে পড়েছে।

বাজার থেকে স্কুলে আসতে একটি কালভার্ট। উপরে সিমেন্টের আস্তরণ নেই। বাঁশ নিয়ে সাঁকো বেঁধে লোক যাতায়াত করার মত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। তখনও খালে জল গড়ায়নি। কালভার্টের নিচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হলো ১৪টি মানুষকে। সবার পুরোভাগে সর্বজন শ্রদ্ধেয় দীনেশ রায় এবং তার পিছনে আদরের দুলাল হাবুল।

এভাবে ১৪ জনকে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপর আর বলা যায় না। বাংলার বুকে হানাদার ডাল কুত্তারা কত বীভৎস কাণ্ডইনা করেছে। গুলী চালাল। সবাই শেষ বারের মত ঘুমিয়ে পড়ল বাংলা মায়ের কোলে-চিরনিদ্রায়।

এ নিদ্রা থেকে আর তারা জাগবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাজীগঞ্জে খান সেনাদের হত্যাযজ্ঞের স্বাক্ষর	সংবাদ	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হাজীগঞ্জে বর্বর খানসেনাদের হত্যাযজ্ঞের অসংখ্য স্বাক্ষর প্রতিদিনই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে

কুমিল্লা, ৩ রা ফেব্রুয়ারী। এ জেলার প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র হাজীগঞ্জ ও এর পাশ্ববর্তী এলাকা হতে প্রতিদিন বর্বর পাক বাহিনীর হাতে নিহত মানুষের হাড়, মাথার খুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিনই উৎঘাটিত হচ্ছে নারকীয় বর্বতার ভয়াল স্বাক্ষর। ডাকাতিয়া নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত মাকিমাবাদের জলাভূমিতে প্রায় তিনশ' মাথার খুলি এবং মানুষের হাড় বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার একজন প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, বর্বর হানাদাররা এ অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এলাকাকে কেমন করে ধ্বংস করেছে তার অনেক কাহিনী এখন পাওয়া যাচ্ছে।

স্থানীয় হামিদা জুট মিলকে বর্বর পাক পশুরা ৩ হাজার বাঙ্গালী নিধনের বধ্যভূমিতে রুপান্তরিত করেছিল। মিলের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে অবস্থানরত সেকেন্দার আলী সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে জানান যে, প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বাঙ্গালী যুবকদেরকে এখানে ধরে এনে সারা রাত পাক পশুরা নির্যাতন চালাত। তারপর তাদের কয়েকজনের হাত, পা একসাথে বেঁধে মৃত বা অর্ধমৃতাবস্থায় ডাকতিয়া নদীতে ফেলে দিত।

হাজীগঞ্জ থানা প্রধান জনাব হাতেম আলী, একজন প্রত্যক্ষদর্শী আবদুস সোবহান এবং ৭৫ বৎসর বয়স্ক একজন প্রতিনিধিকে আরো অনেক চাঞ্চল্যকর কাহিনীর কথা জানান। হাজীগঞ্জ থানায় লুটপাট অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যাতনের কাহিনীর অন্ত নেই। একমাত্র বারকুল গ্রামেই বর্বর বাহিনী এবং তাদের চাঁইয়েরা ১২০ জন আবালবৃদ্ধবনিতাকে খুন করেছে। অনেক বালিকাকে পাশবিক অত্যাচার করেছে এবং দালালদের সহযোগিতায় ৪ঠা মে গ্রামটিকে সম্পূর্ন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

এ থানায় এমন কোন গ্রাম নেই বললে চলে, যেখানে অগ্নিসংযোগ, লুট এবং নারী নির্যাতন করা হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, মুজাফফরগঞ্জই বর্বরতা চরম রুপ নিয়েছিল। এখানে এক বাড়ীতে ২ জন রাজাকার একটি বালিকাকে ধর্ষণে প্রবৃত্ত হলে বাড়ীর অন্যান্য লোক তাতে বাধা দেয়। পরদিন একদল রাজাকার এবং দখলদার বাহিনীর লোকজন সেই বাড়ী আক্রমণ করে ৩৭ জন লোককে হত্যা করে।

শুধু এতেই নিবৃত্ত ছিল না ডাল কুত্তার দল, সেই বাড়ীর ৪টি বালিকাকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করতে থাকে এবং ৩/৪ দিন পর তাদের মৃতদেহ পাশের একটি খালে ভাসতে দেখা যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কিশোরগঞ্জের হত্যাযজ্ঞ	দৈনিক বাংলা	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

কিশোরগঞ্জে হত্যাযজ্ঞ
সেই রাতে ধুলদিয়া রেলওয়ে পুলের উপর
সবাইকে লাইন করে গুলি করা হলো
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

কিশোরগঞ্জ, ২রা ফেব্রুয়ারী। কিশোরগঞ্জে বর্বর হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক নরপশু মেজর ইফতেখার সম্পর্কে দু' একটি তথ্য দৈনিক বাংলা-এর ২৪শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই জঘন্য পশুর পাশবিকতা কিশোরগঞ্জে যে, বিভীষিকা ও ভয়াবহতার সৃষ্টি করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

১৯৭১ সনের জুলাই মাসের শেষের দিকে এই নরাকৃতি পিশাচ কিশোরগঞ্জে আসে। সে এখানে এসেই শুরু করল তার নরমেধযজ্ঞ। প্রত্যহ ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, এমনকি আরও বেশী করে লোক ধরে ধরে এনে মারতে শুরু করল। বলা বাহুল্য অধিকাংশ লোকই হিন্দু। কাজেই হিন্দু অধিবাসী যারা কিছুটা নির্ভয় হয়েছিলেন, তারা শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করলেন। অনেকে প্রায় ভয়ে মুসলমান হতেও শুরু করলেন।

ইফতেখার দেখল হিন্দু আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই তার গণহত্যার পরিধি বিস্তৃততর করার জন্য এই নর-শয়তান তথাকথিত শান্তি কমিটির মাধ্যমে হিন্দুদের আহবান করল এই বলে যে, নির্দোষ কোন লোককে কোন রকম হয়রানি করা হবে না, হিন্দুরা যেন নির্বিঘ্নে নিজ নিজ কাজ শুরু করে। শয়তান দলের এই কপটতায় অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে শহরে ফিরে এলেন।

ভয়ে ভয়ে শহরে নিজ নিজ কাজ শরু করলেন। ইফতেখার আর এক ফরমান জারী করল যে, সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কাউকে ধর্মান্তরিত করা চলবে না আর হিন্দুদের ধুতি পরে থাকতে হবে। এইভাবে নরপিশাচ তার হত্যাযজ্ঞ বিস্তৃত করা প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করল। শয়তানের কপটতায় বিশ্বাস করায় প্রথম বলি হলেন বাবু গিরিজা মোহন চক্রবর্তী। এ ছাড়া কত অসংখ্য মানুষ যে নরপিশাচের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তার সঠিকতথ্য বের করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার।

খগেন্দ্র নাথ লৌহ নামক এক ভদ্রলোক অত্যন্ত নিরীহ মানুষ। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই । একটা ক্ষুদ্র চায়ের দোকান চালাচ্ছিলেন, তিনি, পরিবারের অন্ন সংস্থানের একমাত্র অবলম্বন রুপে। নরপিশাচ ইফতেখার হঠাৎ এক রাতে হানা দিয়ে এই পরিবারের সকলকে ধরে নিয়ে গেল। এই সঙ্গে ধরা পড়ল হরিমোহন নামে বৃদ্ধ একজন মেইল রানার। শয়তান কাউকে রেহাই দেয়নি। নৃশংসভাবে এদের সকলকে হত্যা করে। এদের মধ্যে খগেন বাবুর জ্যেষ্ট পুত্র কাজল লৌহ যেন অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়ে গেল।

কাহিনীটা তার কাছ থেকেই শোনা। গচিহাটা রেলষ্টেশনের সন্নিকটে ধুলদিয়া রেলওয়ে পুলের উপর সকলকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে জল্লাদরা গুলি করে হত্যা করেছে সকলকে। গুলি করার সময় কাজল লাফ দিয়ে নীচে পানিতে পড়ে যায়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পিশাচরা পানিতে অসংখ্যবার গুলি ছুড়েছে। কিন্তু রাখে আল্লা মারে কে? কাজল রাতের অন্ধকারের সুযোগে ডুব সাঁতার দিয়ে দিয়ে অনেকদূর গিয়ে ডাঙ্গায় উঠে পাড়ি জমায় সীমান্তের ওপারে। কাজল ফিরে এসেছে। কিন্তু গোটা পরিবারটা যেন ছত্রখান হয়ে গেছে।

অশ্বিনী বাবু একজন গোবেচারা বৃদ্ধ আইনজীবী। স্বামী, স্ত্রী ছিলেন কিশোরগঞ্জের বাসায়, দুই ছেলে প্রবীর ও সুবীর। প্রবীর বি, এসসি, পাশ করে শিক্ষকতা করছিলেন করিমগঞ্জ স্কুলে, আর তার ছোট ভাই সুবীর কলেজে পড়তো। পিশাচ ইফতেখার এক রাতে অশ্বিনী বাবুকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে আসে। তারপর বন্দুকের নলের মুখে অশ্বিনী বাবুকে দিয়ে দুই ছেলের কাছে চিঠি লেখায় ওদের কিশোরগঞ্জে আসার জন্য । পিতৃভক্ত দুই ভাই-ই এসে জল্লাদের ফাঁদে পা দেয়। দুটো ছেলেকেই এই নরঘাতক হত্যা করে, অশ্বিনী বাবুকে ছেড়ে দেয়।

অশ্বিনী বাবু আজও বেঁচে আছেন, তবে সে বাঁচা বাঁচা নয়- জীবন্মৃত অবস্থা। শোনা যায় অশ্বিনী বাবুর দেশের বাড়ী ও সম্পত্তির লোভে জনৈক দালাল ইন্ধন যুগিয়ে ইফতেখারের মত নররাক্ষসকে দিয়ে বৃদ্ধের দুটো ছেলেকেই খুন করিয়েছে। পাকুন্দিয়া থানার মেডিক্যাল অফিসার সংস্কৃতিবান একজন হিন্দু ভদ্রলোক দুই ছেলেসহ নিহত হলেন নরপিশাচ ইফতেখারের হাতে। তার তিন মেয়ে-দু'জন গ্রাজুয়েট, একজন ম্যাট্রিকুলেট। ভাইপো, জামাইরা সবাই কাঠের মিস্ত্রী ছিল। তথাকথিত শান্তি কমিটির আহবানে ওরা ফিরে এলো শহরে, শুরু করল কাজকর্ম । হঠাৎ একদিন সবগুলো সক্ষম পুরুষকে ধরে নিয়ে গেল জল্লাদরা। ওদের কেউ বাঁচতে পারেনি ঘাতক ইফতেখারের হাত থেকে। এ জাতীয় অসংখ্য নরহত্যা করেছে ইফতেখার তার পিশাচ সহচরদের সহায়তায়। এই তো গেল তার রক্তলোলুপ পিশাচ মনোবৃত্তির কথা। এছাড়া তার মত লম্পট, ঘৃণ্য নরপশু, নৈতিকতা বিহীন পিশাচ পৃথিবীর আর কোন দেশে কোন কালে ছিল কিনা কেউ বলতে পারবে না।

এই নারাধম কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, কত নারী যে নিধন করেছে, কত হতভাগিনীকে উন্মাদে পর্যবসিত করেছে তার সীমা নেই। তার কবল থেকে কেই রক্ষা পায়নি। ব্রাক্ষণ, পুরোহিতদের হত্যা করে তাদের ছেলে মেয়েদের যেমন করেছে নির্যাতন, ঠিক তেমনি হিন্দু, মুসলমান কাউকে সে রেয়াত করেনি। তার পাশব প্রবৃত্তির লেলিহান শিখায় যে সকল সদ্য স্বামী হারা, পিতৃহারা, মাতৃহারা হতভাগিনী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তাদেরকে এরপর স্থানান্তরিত করা হয়েছে মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্রে নরাকৃতি পশু পশ্চিমা হানাদার আর কুখ্যাত রাজাকার, মুজাহিদ, আল বদর বাহিনীর কমাণ্ডার এবং স্বঘোষিত অফিসার ইন-চার্জদের হাতে।

ইফতেখার লুণ্ঠন চালিয়েছে নির্বিচারে। নিজে গ্রহণ করেছে স্বর্ণ, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস, আর তার অনুচরদের দিয়েছে বাকী সমস্ত মালামাল। এছাড়া তথাকথিত শান্তি কমিটির যোগসাজশে যাকে তাকে ধরে আটক করে, শান্তি কমিটির মাধ্যমে মোটা অংকের নগদ অর্থের বিনিময়ে দু একজনকে ছেড়ে দিয়েছে। অনেক সময় টাকা গ্রহণ করেও সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য তথাকথিত শান্তি কমিটি টাকা আদায়ের সময় নিজেদের অংশ আলাদা করে আদায় করেছে।

হিন্দু প্রাণভয়ে মুসলমান হয়েও এই নরপিশাচ এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। বল্লভ সাহা নামক একজন হিন্দু ব্যবসায়ী প্রাণভয়ে সপরিবারে মুসলমান হয়। তাকেও হত্যা করেছে। নরপিশাচ দীর্ঘকাল এক ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়ে কিশোরগঞ্জকে শ্মশানে পরিণত করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা এলো, দানবীর আর, পি, সাহা আজও এলেন না	দৈনিক আজাদ	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

গাড়ীর শব্দ শুনলেই মনে অয়-'এই বাবু আইতাছে'
স্বাধীনতা এলো, দানবীর আর পি সাহা আজও এলেন না

'জেঠামণি না আসলে আমার কান্না পাবে, আমি এখানে থাকতে পারব না।' কথা কটি বললো ভারতেশ্বরী হোমসের কিণ্ডার গার্টেন দ্বিতীয় মানের ছাত্র রোকেয়া ইসলাম। বলতে বলতে কেঁদে ফেললো ৮ বৎসরের মেয়ে রোকেয়া। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাঁধ ভাংগা বন্যার মত তার অশ্রু ঝরছে। এ দৃশ্য বড় বেদনাদায়ক। এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেও রোকেয়া তার সহগামী বোনদের সাথে মাঠে ছুটাছুটি করছিল।

ভারতেশ্বরী হোমসের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা হোমসের ছাত্রীদের সবার প্রিয় জেঠামণি। ৭১-এর মে মাসে পাক বাহিনী হোমসের ছাত্রীদের প্রিয় জেঠামণি আর তার ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহাকে ধরে নিয়ে যায়।

অভিযোগ ''ওরা হিন্দু। ভারতের চর। আওয়ামী লীগের সমর্থক''। কিন্তু হোমসের ছাত্রীরা উচ্চকণ্ঠে বলেছে'' সব মিথ্যে সব মিথ্যে।'' তিনি আমাদের আদর করেন। কান্না পেলে চোখের জল মুছিয়ে দেন। সত্যিই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা একটি মহিরুহ। এ মহিরুহের ছায়াতলে বিগত ৩০ বৎসর যাবত অসংখ্য ছাত্রী জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়েছে। আর পি সাহা হোমসের ছাত্রীদের ভালবাসতেন গভীরভাবে।

তাদের শাসনও করতেন কঠোরভাবে। আবার পরক্ষণেই মাথায় হাত বুলোতেন সস্নেহে। সকল দু:খ, সকল বেদনা অসুখ বিসুখ ভুলে যেতেন এখানে এসেই। হোমসের ছোট ছোট মেয়েরাই ছিল তার কর্মজীবনের সঞ্জীবনী শক্তি তার কর্মবহুল জীবনের প্রেরণা। আর এদের দিকে তাকিয়েই তিনি কাজ করতেন দিনরাত অনবরত। এদের মুখে হাসি দেখলে তিনি খুশি হতেন, পুলকিত হতেন। কুসুমের মতই ছিল তার মন, কোমল আর বজ্রের মতই ছিল কঠোর তার বাহিরের রুপ।

হোমসের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্বাধীনতার পর আজ অবধি নিখোঁজ। তবে এ অন্তর্ধান সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্যই উদঘাটিত হয়নি। হোমসের ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী কুমুদিনি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স রোগী কুমুদিনি জনকল্যাণ ট্রাষ্টের কর্মচারী সহ তার বন্ধুবান্দব শুভানুধ্যায়ী সবিশেষ উদ্বিগ্ন।

জেঠামণি ফিরে আসবেন। বাবু ফিরে আসবেন। আমাদের বিশ্বাস তিনি আজও বেঁছে আছেন। এ মহামানবের মৃত্যু হতে পারে না । তিনি তো মানবতাবাদী, সমাজবাদী। তার কোন শত্রুথাকতে পারে না।'' এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সবাই অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে। এ প্রতীক্ষা তাদের যেন আর শেষ হতে চাচ্ছে না । গভীর উৎকণ্ঠা আর প্রতিক্ষায় তাদের দিন কাটছে। হোমসের প্রিন্সিপাল মিসেস প্রভা মুৎসুদ্দি বল্লেন, আপনারা চেষ্টা করে দেখুন, কোন না কোন ভাবে কাকা বাবুকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা ।

বিক্ষিপ্তভাবে সকলেই কাতর কণ্ঠে হরেক রকম মন্তব্য করেছন। হোমসের ভাইস প্রিন্সিপাল মিস সালমা রহমান বললেন এখান থেকে বিগত দিনগুলোতে শত শত ছাত্রী জ্ঞানের আলোক নিয়ে মানবতার মশাল নিয়ে

ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে। আর তা শুধু সম্ভব হয়েছে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার মহৎ অনুভূতির ফলেই। এখানে ধনী, গরীর, হিন্দু মুসলমানের কোন পার্থক্য নেই। আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য । জাতি ধর্ম বর্ণের এখানে কোন বাছ বিচার নেই। হোমসের দারোয়ান ইউনুছ মিয়া, আর ইমান আলী মিয়া আমাদেরকে দেখেই প্রশ্ন করলো 'আপনারা কি বাবুর কোন খবর নিয়া আইছেন?' জিজ্ঞাসা করলাম 'কোন বাবু?' 'আমাগো বড় বাবু'।

তারপর অনেক আলাপ আলোচনার পর তারা বললো, 'আমাগো মনে অইতেছে যেন অহনো বাবু আছে। গাড়ীর শব্দ শুনলেই মনে অয় যে, এই বুঝি বাবু আইতাছে।' সত্যিই কত গভীর অনুভূতি, সবাই এ অভাব অনুভব করছে। মনে মনে প্রাণে প্রাণে সবাই আজ এই অনুভবের অনুসারী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কুমিল্লা ও রাজশাহীতে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) গণহত্যার স্বরুপ	সংবাদ	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

কুমিল্লা ও রাজশাহীতে গণহত্যার স্বরুপ

কুমল্লিা, ৫ই ফেব্রুয়ারী (বি, এস, এস)। বিভিন্ন সূত্রের খবর থেকে জানা গেছে, ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী এবং তাদের অনুগত চররা বিগত ৯ মাস ধরে এখানে ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে কমপক্ষে ২০,০০০ লোককে হত্যা করে। হাজার হাজার বাড়ী পুড়িয়ে দেয় এবং অগণিত পরিবারকে গৃহহারা করে দখলদার বাহিনী বাংলাদেশ ভারতের সীমান্তের ৩ মাইলের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি এবং বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে অথবা ধ্বংস করেছে।

এ সব এলাকার মধ্যে ব্রাক্ষণবাড়ীয়া এবং আখাউড়া সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। জেলার প্রায় সকল হাট-বাজার লুট ও ধ্বংস করাতে সারা জেলায় চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ সম্পূর্ণ রুপে নির্ধারন করার কাজ সম্পন্ন হলে হত্যা এবং ধ্বংসের পরিমাণ বহুগণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশাঙ্কা করা হচ্ছে।

পাক হানাদার বাহিনী এবং অনুচররা বিভিন্ন হাট-বাজার, ঘরবাড়ী রেল এবং বাস থেকে বহুসংখ্যক যুবককে ধরে এনে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে এখনো কিছু বলা যায়নি। যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুপুরের জনাব আলী আকবার নামে এক যুবক জীবন্ত ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

বিএসএস-এর প্রতিনিধির নিকট তিনি জল্লাদ বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এপ্রিল মাসের ৮ তারিখে তাদের বাড়ী ঘেরাও করে তল্লাসী চালান হয় এবং ২৩ বৎসর বয়স্ক বাসেতকে হত্যা করা হয় তার বাড়ী লুট করে সমস্ত কিছু সার্কিট হাউসে নিয়ে যায় এবং তাকেও ধরে নিয়ে যায়। সার্কিট হাউসে আরো ১২ জনকে ঐ সময় ধরে আনা হয় এবং সারারাত ধরে তাদের আটকে রাখা হয়। পরদিন সকালে চোখ এবং হাত বেঁধে ট্রাকে করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

একটি গুদাম ঘরে তদদের নিয়ে আসা এবং চোখ খুলে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি বহু হতভাগ্যকে পা বাঁধা হাত বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখতে পান। ঐ সব হতভাগ্যের মধ্যে শহরের নামকরা আইনজীবী শ্রী যতীন্দ্র ভদ্রকে তিনি দেখতে পান। তাঁর গায়ে যথেষ্ট ক্ষত চিহ্নও তিনি দেখেছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

রাজশাহী হতে বা, স, স-র অপর খবরে প্রকাশ সুদীর্ঘ নয় মাস পাক বাহিনীর অত্যাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যায়ের ৩ জন শিক্ষকসহ ১৮ জন পার্সোনেলের কর্মচারী হত্যা। পাক বাহিনীর হাতে বশ্বিবিদ্যালয়ের যেসব জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে তার মূল্যের পরিমাণ প্রায় ২২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিশেষ প্রতিনিধিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জানান যে পাক বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসকৃত জিনিসপত্রের মূল্যের পরিমাণ যথাযথ নিরুপণ করতে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। গত এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পাক বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে বিভিন্ন হল এবং ষ্টাফ কোয়ার্টারে ক্যাম্প স্থাপন করে। প্রথমেই বর্বর বাহিনী শহীদ মিনারটি ধ্বংস করে দেয়।

পরে জোহা হলসহ অন্যান্য অনেক হল সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। সকল হল ষ্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য কর্মচারীর বাসা এমনকি লাইব্রেরী ও লেবরেটরী পর্যন্ত হানাদার বাহিনী লুটপাট করে। সংবাদ দাতা পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ড: হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড: মোশারফ হোসেন, বাংলা বিভাগের রীডার ড: আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন এবং হানাদার বাহিনীর নানা প্রকার চাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনেন।

এপ্রিল মাসে ১৪, ১৫ এবং তারিখে যথাক্রমে অংক বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর জনাব হাবিবুর রহমান, বাংলা বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার এবং মনস্তত্ত্ব বিভাগের ডেমনষ্ট্রেটর জনাব মীর আব্দুল কাইয়ুমকে বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। বর্বররা কি ঘরনের ষ্ঠিুর ছিল তার এক নজীর পাওয়া যায় একজন অধ্যাপককে হত্যা করার পর তার মেয়েকে একজন মিলিটারী অফিসারের সাথে বাস করতে বাধ্য করার দৃষ্টান্ত থেকে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, প্রাক্তন উপচার্য জনাব সাজ্জাদ হোসেনই ৩০ জন অধ্যাপক এবং অন্য দু'জন অফিসারকে হত্যার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। একে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, ২য় কারাবরণ, ৩য় পদ হতে অপসারণ এবং ৪র্থ বেত্রাঘাত । তাছাড়া আরো জানা গেছে যে, ৪ জন অধ্যাপক ট্রাক ভর্তি করে মালপত্র নিয়ে ২৮শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আবুল বাশার নামের একজন পিয়ন সংবাদদাতাকে জানায় যে, কেবলমাত্র জোহা হলের নিকটেই ৩ হাজার লোককে সমাধিষ্থ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নাটোরের ছাতনীতে পাক বাহিনীর বর্বরতা	পূর্বদেশ	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নাটোরের ছাতনী মাইলায়ের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে

হাজার মাইলাইয়ের এক ছাতনী। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সমগ্র বাংলার মানুষ যেমন সাড়া দিয়েছিল তেমনি ছাতনীর মানুষও সমস্বরে শ্লোগান দিয়েছিল: শোষকের মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

আর এটাতেই সমগ্র বাংলার ধ্বংসের মতো ছাতনীর ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে পড়ে। ''আমাকে তোমরা খুন করো, কার বিনিময়ে আমার গ্রামের মানুষকে বাঁচাও। তোমাদের খোদার কসম তোমরা আমার মানুষদের মেরোনা।'' মৃত্যুমুখোযাত্রী ভাবশী গ্রামের মণি সরকার আর্তি করেছিলন হানাদার পাক বাহিনীর সৈন্যদের নিকট। হানাদার বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। নির্মমভাবে গায়ের চামড়া উঠিয়ে হত্যা করেছে। ছাতনীর হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী যুবক আবুল কালাম কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে শোনাচ্ছিলেন ছাতনীর এ মর্মান্তদ কাহিনী । আবুল কালাম বললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের দু'মাস পর্যন্ত আমরা এদিক-সেদিক পালিয়ে ভালই ছিলাম।

হিন্দুদের আমরা পাহারা দিয়ে রাখতাম, কিন্তু এর মধ্যেও আমাদের অনেকবার লাঠিসোঁটা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হতো, কখন হয়তো নরপিশাচ অবাঙ্গালী জল্লাদের দল গ্রামে ঢুকে পড়ে। তাদের তিনবার যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে আসতে হয়। বিংশ শতকে হালাকুর বংশধররা তিনদিন পর সশস্ত্রে ছাতনী গ্রামকে আক্রমণ করতে আসে। গ্রামের মানুষ একত্রে খোদার নাম নিয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে দলে দলে তাদের তাড়া করে। হানাদার বাহিনী বিভ্রান্ত হয়েছে ঘটনা দেখে। তারা পিছু হটেছে। কিন্তু অবাঙ্গালী পাকিস্তানী অসামরিক নাগরিকদের দ্বিতীয় পিতা, ধর্মের কুলাঙ্গার জল্লাদ হাফেজ আব্দুর রহমান এ পরাজয়কে অপমান মনে করলো।

তহি প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা প্রবল হলো তার। খুনের নেশাখোর এই জল্লাদ তাই পথ খুঁজতে চেষ্টা করেছে সর্বক্ষণ। আবার হেঁটেছে সেই পথে। বনবেলা ঘুরিয়ার মসজিদ থেকে টেনে বের করলো ১০৫ বছর বয়স্ক আওয়ামী লীগ সমর্থক বৃদ্ধ সৈয়দ আলী মুন্সীকে । ঘটনা ঘটলো ১৫ ই জ্যৈষ্ঠে। সৈয়দ আলী মুন্সীর লাশ দেখলো ছাতনীর মানুষ। ওরা কাঁদলো । এর পরের ঘটনা সুপরিকল্পিত। ছাতনীর বর্তমানে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ৮২ বছরের নলীনিকান্ত বললেন ওরা রাতে এসে ছাতনী দিঘীর পাড়ে জমা হয়। রাত তখন প্রায় দুটো।

সকাল পাঁচটার দিকে গাঁ ঘিরে নেয়। ঘরে ঘরে ঢুকে সবাইকে বের করে হাত পিছনে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধের একমাত্র ছেলেকেও ওরা হত্যা করেছে। শিশুকেও হত্যা করতে ছাড়েনি। বৃদ্ধ বলছিলেন, ডাক্তার মনিরুদ্দিনের তিনটি বিবাহিত যুবক ভাইকেও ওরা হত্যা করে গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ নলিনি কান্ত বললেন, পিশাচরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করল। লাখ লাখ অভিযোগ বর্বরদের এরুপ কাজের। এই গ্রামের আরেকজন যুবক আবুল কাশেম। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁচেছে সে। বলল: যখন আমি বুকে ছুটে জমির আইলের পাশ দিয়ে হানাদারদের চোখের বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন যুবতীকে বিবস্ত্র অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।

আবার দেখলাম একটি বৃদ্ধ এবং ক'জন লোক পিছনে হাত বাঁধা মরে পড়ে আছে। ওরা সংখ্যায় ছিলো কমপক্ষে ২৫০ জনের মতো । ৫০ জনের মতো পাক বাহিনীর সৈন্য। অবশিষ্টরা ছোরা হাতে অবাঙ্গলী তারা ছাতনীর সমস্ত কিছু লুট করেছে, ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে পুরুষদের হত্যা করেছে।

আবুল কালাম আমাকে বললেন, গ্রামের যে এলাকায় বেশী লোক হত্যা, নারী নির্যাতন হয়েছে সেদিকেরই এক ধানের জমিতে পানির মধ্যে নিজেকে আড়াল রেখে সবকিছু দেখেছেন তিনি। সৈন্যরা এসেছিল রাইফেল হাতে নিজের পোশাকে। অবাঙ্গালীরা সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরনে, ছোরা হাতে কালা মুখোশ ছিল হাফেজ জল্লাদদের। তার অল্প কিছু দুরেই এক মহিলার কোলের শিশুকে ফেলে হানাদার বাহিনীর সৈন্য জমির ওপরে মহিলাকে অত্যাচার করলো। মহিলার শাশুড়ি শিশুটিকে কোল নিয়ে সরে গেল।

একটু পর গুলির আঘাতে শিশুটি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গুলির শব্দ, শুধু শব্দ। সকাল পাঁচটা থেকে ন'টা। অত্যাচার হত্যার পাশবিকতার তাণ্ডবলীলা চললো। হাহাকার, আর্তচিৎকার । গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল আরো অন্য গ্রামের আত্মরক্ষা প্রয়াসী বহু পরিবার। সব একাকার হলো, ছাতনীর মাঠ, খালের পানির সঙ্গে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৪১ জন। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, মধ্য বয়সী। শুধু পুরুষদের বেছে বেছে হাত পিছনে বেঁধে গুলী করেছে বর্বররা। এখানেই শদাব্দীর অভিশাপ মুসলিম কলঙ্ক পাকিস্তানী বর্বর শাসক নাটোরের ছাতনীকে লক্ষ মাইলাই-এ পরিণত করে গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
খান সেনারা ওকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়েছিল	দৈনিক বাংলা	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

খান সেনারা ওকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়েছিল

বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী জনাব সিরাজুদ্দৌলা ঠাকুরগাঁ শহরেরই অধিবাসী। দিনটি ছিল ২২শে জুলাই। বিকাল ৪টা। দোকানে বসে ছিলেন সিরাজুদ্দৌলা। এমন সময় ৭/৮ জন খান সেনা এসে তাঁকে ধরে ফেলল। তিনি কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খান সেনারা তার কোন কথাই শুনল না। ওরা ওকে জুতা পরতেও দেয়নি। তখনই শুরু হলো মার।

ঘুষি, কিল, চড়, থাপ্পড়। এক নাগাড়ে, বিরামহীন। ওদের একজন তার হাত দুটো বেঁধে ফেলল। মার খেতে খেতে তিনি ধরাশায়ী হয়ে গেলেন। কে কত মারতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হল। চলতে থাকলো সরু পায়ের লাথি। আর মুখখিস্তি। ওদের ক্যাম্পে যাওয়ার আগে চেকপোষ্ট। পশুদের সেকি উল্লাস। মুখ ব্যাদান করা হাসি।

একে অপরকে বলছে, ''বহুত উদমা শিকার মিল গিয়া।'' সাথে সাথে পরম সুখে মারধোর চলতেই থাকলো। ওদের পায়ে পায়ে ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলাম। ক্যাম্পে আরো বিরাট চেহারার কতকগুলো গাট্রা গোট্রা খান সেনা এগিয়ে এলো তখনো জ্ঞান হারাইনি। মনে হল এদের মার আমি হজম করতে পারবো না । আজ আমার এখানেই শেষ।

কেন জানি না, ওরা মারলো না। ঘরের বারান্দায় শূন্য পাটাতনের উপর আমাকে বসতে বললো। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, আমি একজন মেডিক্যাল চাত্র, শিক্ষিত মানুষ। চেয়ার দাও । যেনো ভূত দেখেছে। এমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো পশুর দল। বলল, চেয়ার? বাঙ্গালী সে অধিকার হারিয়েছে। খুঁটির সাথে আমার হাত বেঁধে ফেলা হলো। তখন আসরের নামাজের সময় হয়েছে। তিনি অজুর পনি চাইলেন। এনে দিল, বাঁধা হাত ছাড়িয়েও দিল।

নামাজের আধঘন্টা খানেক পর শুরু হলো ওদের জিজ্ঞাসাবাদ। আমি নাকি অনেক অবাঙ্গালী হত্যা করেছি, আমি একজন সামরিক অফিসার। আমি ছেলেদের রাইফেল ট্রেনিং দিয়েছি ইত্যাদি। ওরা আমাকে খুবই পীড়িপীড়ি করতে থাকে আমি যাতে সব কিছু স্বীকার করি। এরপর মনে হলো, সিকিউরিটির কিছু অফিসার এলো। তারাও একই ধরনের প্রশ্ন করেত থাকে। আমি সব কিছুই অস্বীকার করি। এবার ভয় দেখালো, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

এরপর ওরা কোত্থেকে একটা বানর জোগাড় করে আনলো। ওরা বানরটাকে আমার উপর ছেড়ে দিল। চলল বানরের অত্যাচার। কামড়, আঁচড়, থাপ্পড়। এক সময় বানরও শ্রান্ত হয়ে গেল। সন্ধ্যা নেমে এলো। এরপর ওরা আমাকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিল। কি মর্জি হলো। ওরা আমাকে খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে এলো।

সেই মুহূর্তের মনের অবস্থা আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না। নিশ্চিত বুঝতে পারছি, আমি মরছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য মনে মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে এসে ওরা আমাকে পাশেই একটি কক্ষে ঢুকিয়ে দিল। খাঁচা আর কক্ষটার মাঝখানে শুধু একটি রেলিং । সেখান থেকে খাঁচার মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছিলাম। আচমকা বাঘটা রেলিং টপকে এসে আমাকে আক্রমণ করে বসল।

ডান হাত, ডান উরু ও ডান দিকের পিঠে তার তীক্ষ্ণ নখর বসিয়ে দিল। আবার তার স্থানে ফিরে গেল। রাত ৮ টার দিকে আমাকে সে ঘর থেকে ওরা বের করে আনলো। ভাবলাম এবার হয়তো মেরে ফেলবে। না মারলো না। নিজের হাতও দেখতে পাচ্ছি না এমনি একটি অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে একজন সিপাই বলল, দেখ বিছানা আছে-শুয়ে পড়। হাত দিয়ে যা পেলাম তা হলো একটি চটের ছালা আর ইলেট্রিক হিটার। হাত দুটো জানালার সাথে বাঁধাই রইলো।

সকালে ওরা আমাকে মেজর রাজার কাছে নিয়ে গেল। সেখানে আমার বাবাকেও দেখলাম। অদ্ভুত সব প্রশ্ন মেজর রাজার। কোন জেলায় বাড়ীর সংখ্যা বেশী? বললাম, জানি না।

ঠাকুরগাঁয়ে কত মেয়ে আছ? বললাম, আপনি বলুন।

মেজরের জবাব ঠাকুরগাঁয়ে মেয়ে বেশ, কেননা তার মতে বাঙ্গলী মেয়রাই নাকি সেখানে অবাঙ্গলীদের মেরে ফেলেছে। এরপর কর্নেলের কাছে আমাকে পাঠানো হলো। অনেক সদুপদেশ দিয়ে কর্নেল আমাকে ছেড়ে দিল।

এরপর আরো একবার মেজর তাকে তলব করেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী	পূর্বদেশ	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী

\ এম এ খায়ের মিয়া \

লাকসাম, কুমিল্লা

লাকসাম জংশনে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলে দেয়াল ঘেরা সুবিশাল এলাকা জুড়ে কালো রং মাখা যে দ্বিতল প্রাসাদটি দেখা যাবে সেটি একটি সিগারেট ফ্যাক্টরী। কিন্তু তার নাম যা-ই থাকুক না কেন লাকসামবাসীরা এটাকে হত্যাপুরী বলেই জানে। বিগত নয়টি মাসে এই ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন কোনায় বিভিন্ন কক্ষে ও কোঠায় বিভিন্ন সেলে এবং ছাদে যে অত্যাচার, নারী ধর্ষণ এবং নির্বিচারে গণহত্যা চলেছিল তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

দিনে-রাতে যখন-তখন লাকসাম থানার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে হানা দিয়ে গ্রাম বাংলার নিরীহ নারী-পুরুষদের ধরে এনে এবং লাকসাম জংশনে অপেক্ষমাণ ট্রেন থেকে যুবক-যুবতী ও যাত্রীদের ছিনিয়ে এনে এই হত্যাপুরীতে বর্বর খান সেনারা বিনষ্ট করেছে অগণিত মা, বোনের ইজ্জত, বধ করেছে হাজার হাজার প্রাণ।

ট্রেন থেকে মহিলা যাত্রী আর গ্রাম থেকে পল্লীবালা ও কুলবধূদেরকে ছিনিয়ে এনে ওদের উলঙ্গ করে কারখানার ছাদের উপরে উঠিয়ে দু'হাত উপরে তুলে সারাদিন ভর রেলিংবিহীন ছাদের উপরে হাঁটতে বাধ্য করা হতো কারখানার অনতিদূরে যাত্রীবাহী ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের ঐ ছাদের উপর দৃষ্টিপাত করতে নির্দেম দেয়া হতো। এমনিভাবে সারাদিনভর ধৃত মা-বোনদের বেইজ্জতি করে রাতে কারখানার বিভিন্ন কোঠায় নিয়ে মেজর গার্দিজি ও তার দোসররা মা-বোনদের উপর চালাতো পাশবিক অত্যাচার। নিজেরা তো মদ পান করতো, নারীদেরও মদপানে বাধ্য করা হতো। চাবুকে আর চাবুকে এবং পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে রাত্রির গভীরতা ভেঙ্গে প্রায়ই ভেসে আসতে মা-বোনদের বুকফাটা করুণ আর্তনাদ। কিন্তু মদ্যপায়ী নর-পশুদের অট্টহাসিতে সবকিছু চাপা পড়ে যেত। অনেক অনেক মা-বোনকে বলাৎকার স্থলেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আর যারা নামে মাত্র বেঁচে থাকত তাদের সংজ্ঞাহীন দেহ রাতের আঁধারে সে কারখানার বিভিন্ন কোনায় পুঁতে ফেলা হতো।

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী সে কারখানায় প্রহরারত মিত্রবাহিনীর অনুমতি নিয়ে লাকসামের এম, সি এ জনাব আব্দুল আউয়াল ও থানার সেকেণ্ড অফিসার এবং জনকয়েক ভুক্তবোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী সহকারে কারখানাটি দেখতে গিয়েছিলাম। পশ্চিম কারখানাটিতে ঢুকতেই ভেসে এল পঁচা গন্ধ। হয়তো রক্ত পঁচা গন্ধই হবে। এ কারখানার যেখানেই যে কক্ষে ঘুরেছি সর্বত্রই অনুভব করতে পেরেছি রক্তের চাপ সে রক্তে দুর্গন্ধের আবাস। ভিতরে ঢুকতেই সামনেই দেখতে পেলাম দুটি জীবন্ত পেয়ারা গাছ এবং সদ্য মৃত একটি কাঁঠাল গাছ।

গাছ তিনটির প্রত্যেকের ডালে দেখলাম এখনো ঝুলে রয়েছে হত্যার প্রতীক কয়েকটি রশি। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন এ গাছ তিনটিতে যে সমস্ত রশি এখনো ঝুলে রয়েছে সে সমস্ত রশিতে অসংখ্য নারী পুরুষকে ঝুলিয়ে রেখে চাবুকের প্রহারে নিস্তেজ করা হতো। তারপর সে সমস্ত সজ্ঞাহীন দেহ গুড় মেখে একটি চিলে কোঠায় ফেলে রাখা হতো। বলা বাহুল্য, সেই চিলে কোঠায় পূর্বাহ্নেই লুট করা খেজুরের গুড় বা মিষ্টি দ্রব্য

ছিটিয়ে অজস্র পিঁপড়া জড়ো করে রাখা হতো। তারপর সেই পিঁপড়ার ভিড়ে সংজ্ঞাহীন দেহকে ফেলে রাখা হতো।

সারা রাত বিষাক্ত পিঁপড়ার তীব্র দংশনে অনেককেই সেই চিলে কোঠায় নির্মভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এমনিভাবে প্রাথমিক নির্যাতন শেষে অনেককে চোখ বেঁধে লাইনে দাঁড় কারানো হতে তারপর গর্জে উঠতো হিংস্র হায়েনাদের অস্ত্র নিমিষে ভূলুণ্ঠিত হতো অগণিত প্রাণ। আর একটু এগিয়ে গেলাম, দেখলাম একটি পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে দুটি আম গাছ্ এ গাছেও দেখলাম কয়েকটি রশি ঝুলছে আর গাছের নীচে দেখলাম আগাছায় ভরা এক ফালি জমি।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন ঐ সব পেয়ারা-কাঁঠাল গাছের নীচে, এই আম গাছের নীচে, আর ঐ আগাছা ভরা জমিটুকু খুঁড়লেই বের হয়ে পড়বে অসংখ্য ভাই-বোনের অজস্র নর-কঙ্কাল। আর এক প্রত্যক্ষদর্শী পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটি ভরাট গর্তের চিহ্ন দেখিয়ে জানালেন যে, একটি জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে এই গর্তে ফেলে দিয়ে মাটিচাপা দিতে তিনি দেখেছেন। তাছাড়া এম, সি, এ আউয়াল সাহেবও এ খবরটি বহু লোকের মুখে শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। তারপর ঢুকলাম কারখানার ভিতরে।

সঙ্গী সেকেণ্ড অফিসার সাহেব পূর্বেই শুনেছিলেন যে ইলেট্রিক হিট দিয়ে নাকি এখানে লোক মারা হতো। তাঁর নেতৃত্বে আমরা সে রুমটি খুঁজে পেলাম। দেখলাম একটা সুইচ বোর্ড আর অসংখ্য বৈদ্যুতিক তার। সে ঘরটির পাশেই দেখলাম বেশ কিছু সামরিক ও বেসামরিক লোকের পোশাক। এখানে বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক লোকদের উলঙ্গ করে ইলেট্রিক হিট দিয়ে মারা হতো। সারাটা কারখানা ঘুরে দেখলাম।

সর্বত্রই দেখা যায়, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে অনেক কাগজপত্র খানসেনাদের ব্যক্তিগত চিঠি ও পারিবারিক ফটো। লাকসাম রেলওয়ে হাসপাতালে মালী মণিন্দ্র চন্দ্র, উপেন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীরাম চন্দ্রমালীকে বিগত কয়েক মাস ধরে এ কারখানায় খান সেনাদের কাজ করতে হয়েছে বলে অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তারা আমাকে জানিয়েছেন যে, এখানে অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ দেখে সে ভীত হয়ে অনেকবারই পালাতে চেয়েছিল কিন্তু সুযোগ মেলেনি।

মণিন্দ্র চন্দ্র আরো জানিয়েছেন যে, প্রায় রাতেই দলে দলে লোকদের চোখ বেঁধে জংশনের দক্ষিণের বড় হাই লাইটটির পূর্বদিকে বেলতলায় নিয়ে যেয়ে ব্রাশ মেরে হত্যা করা হতো। যাদের হাতে দিনের বেলা গর্ত করা হতো রাত্রির বেলায় তাদেরকেই সেই গর্তে মাটিচাপা দেওয়া হতো।

মণীন্দ্র চন্দ্রের ও তার সঙ্গীদের নির্দেশিত গর্তগুলি খুঁড়লে আজও অসংখ্য প্রমাণ মিলবে বলে তারা জোর দাবী জানান। লাকসামের প্রখাত ডাক্তার জনাব মকবুল আহমদ, মিল মালিক জনাব আব্দুর রহিম ও আব্দুল মমিন এক সাক্ষাৎকারে জানালেন যে, পাক সেনাদের কুখ্যাত মেজর মুজাফফর হাসান গার্দিজি, ক্যাপ্টেন ওবায়দুর রহমান, সুবেদার মুস্তফা খান ও রেলওয়ে পুলিশ বাকাওয়ালীর নেতৃত্বে এবং স্থানীয় কতিপয় দালালদের যোগসাজশে লাকসামে সহস্রাধিক লোকের প্রাণনাশ ঘটে।

লাকসাম থানার প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ কর্মী ২৪ নং আর্দ্রা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আলী আশরাফকে এবং লাকসামের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক ও খসরুকে এই হত্যাপুরীতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চাঁদপুরে আট মাসের বিভীষিকা	দৈনিক বাংলা	৭ পেব্রুয়ারী, ১৯৭২

চাঁদপুরে ৮ মাসের বিভীষিকা
জ্যান্ত মানুষগুলোকে হাত-পা বেঁধে গায়ে সিগারেটের
আগুন দেওয়া হতো--- কখনও বা নদীতে ফেলা হতো--- চোখ তুলে
নেয়া হতো--- দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হতো---

চাঁদপুর, ২রা ফেব্রুয়ারী।-চাঁদপুরবাসী দীর্ঘ ৮ মাসের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা আজও ভুলতে পরেনি নরঘাতক পিশাচ পাঞ্জাবী মেজর তৈমুর ও তার দোসর সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের শওকতের অত্যাচারের কথা। তাদের বীভৎস নারকীয় তাণ্ডবে বহু মা সন্তানকে হারিয়েছে। বিধবা হয়েছে বহু নারী, ধর্ষিতা হয়েছে কয়েকশ' অবলা।

কচি খুকীটিও এদের বিলাস লালসার কামনা থেকে বাঁচতে পারেনি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় দালাল ইত্যাদি আখ্যায়িত করে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের প্রাণ নিয়েছে। মানুষকে এরা পিটিয়ে মারত। ইট ও পাথর ছুড়ে হত্যা করত।

হাত-পা বেঁধে জ্যান্ত মানুষগুলোকে নদীতে ছুড়ে ফেলত। চোখ উঠিয়ে নিত। দাঁত বেঙ্গে দিত। মাথা নিচু করে পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত। নরপশু এই মেজর শওকত মানুষ হত্যার সময় উল্লাসে মেতে উঠত। হত্যাটা ছিল তার কাছে আনন্দদায়ক। এই ঘৃণ্য চরিত্রহীন শয়তানের একান্ত প্রিয় ছিল নারী ও সুরা। নারীদের দেখলে সে পাগলা কুকুরের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তো। সে মুক্তিবাহিনীর সহায়ক ও আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে নিরীহ লোকদের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে বহু টাকা আদায় করে।

এ ছাড়া অগ্নিদগ্ধ দোকানপাট ও ঘরবাড়ীগুলো জঙ্গী শাহীর মেজর মাসুদের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই হলো লুটেরাদের নায়ক। তার নির্দেশেই লুণ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রখাত বাণিজ্য কেন্দ্র পুরান রাজাদের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ। ৭১-এর ৭ ই এপ্রিল থেকে শুরু হয় চাঁদপুরে জল্লাদ বাহিনীর নরমেধযজ্ঞ।

সেদিন সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিটে দুইটি রঙের স্যাবর জেট চাঁদপুরবাসীকে আতংকিত করে তোলে। শুরু হয় এক টানা ৪০ মিনিট গুলীবর্ষণ। নিমেষের মধ্যে আকাশ ছেচে যায় ধোঁয়ায়। চারিদিকে ধ্বনিত হয় হতভাগ্যের আর্তচীৎকার । হতাহত হয় প্রায় ৫০০ লোক। আর তারই সাথে ছুটে চলে নিরীহ মানুষের কাফেলা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

এর পরদিন সন্ধ্যায় মেজর ইফতেখারের নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্য ও অস্ত্র বোঝাই ৭৮টি ছোট বড় সামরিক অসামরিক যান চাঁদপুরে প্রবেশ করে। কুমিল্লা থেকে চাঁদপুরে আসার পথে রাস্তার দু'ধারে তারা নির্বিবাদে গুলি চালায়। চাঁদপুর এসে টেকনিক্যাল স্কুলে আস্তানা গাড়ে। আসার অব্যবহিত পর এক বৃদ্ধা গরু নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে গরুটি ছিনিয়ে রাখে এবং বৃদ্ধাকে গুলী করে হত্যা করে। এদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাদের আস্তানাটি ঘিরে ফেলে গুলী ছুড়তে থাকে।

তখন দখলদার বাহিনী মর্টার ও কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। রাত্রি প্রভাতেই তারা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। পুড়িয়ে দেয় পার্শ্বস্থ গ্রামের কুড়ি-পঁচিশটি বাড়ী। এরপরেই ছুটে যায় শহরের অভ্যন্তরে। কয়েক ঘন্টা

টহল দিয়ে এরা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কাউকে বেয়নেট কাউকে গুলী করে মারে। সেদিন চাঁদপুর কলেজের জনৈক ছাত্রসহ ৫ জনকে খুন করে।

১০ই এপ্রিল থেকে শুরু হয় এদের কারিফিউ-এর পালা। কারফিউ-এর সঠিক সময়সীমা এরা জনসাধারণের কাছে গোপন রাখত। আর এ সুযোগে তাদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেলগুলো সক্রিয় হয়ে নিধনযজ্ঞে মেতে উঠত। সে দিনই কারা ডিনামাইট দিয়ে শহরের কয়েকটি এলাকার ঘর উড়িয়ে দেয়।

শুধু তারাই নয়- কুখ্যাত আল বদর, আল শামস, রাজাকার ও দালাল কমিটির সদস্যদের অকথ্য নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ। এরা কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। জুলুম আর অত্যাচারই ছিল এদের প্রধান ধর্ম । এরাই অধিকাংশ সম্পদ লুণ্ঠন করেছ। লুণ্ঠন করেছ শহরের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার ঘরগুলো। দালান থেকে দরজা জানালা খুলে নিয়েছে। শুধু রেখে গেছে বিটে মাটিটুকু।

এদের ইঙ্গিতেই প্রাণ হারিয়েছে দশ হাজার নিরীহ লোক। মেঘনা তীরবর্তী চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন এলাকা ছিল খুনীদের কসাইখানা। একবার কাউকে সেখানে নিয়ে গেলে আর কোনদিন খোঁজ পাওয়া যেত না। এ এলাকা ছিল চাদপুরবাসীর আতংকের স্থান। প্রয়োজনেও কেউ সেই এলাকায় যেতে সাহস পেত না।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে বলেন, ওরা নিমর্মভাবে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে সিগারেটের আগুন লাগিয়ে দিত, পরে হাত-পা বেঁধে ওয়াগনের মধ্যে দু'চার দিন আবদ্ধ করে রাখত। এরপরেও যদি প্রাণ না যেত তাহলে ফেলে দিত নদীতে। এ ছাড়া পানিতে দাঁড় করিয়েও গুলী করা হত। এমনি সুপরিকল্পিতভাবে হত্যালীলা চালিয়ে কমপক্ষে দু'হাজার লোককে নিমর্মভাবে হত্যা করা হয়। সেইখানে হানাদার বাহিনীর এরুপ অসংখ্য বর্বরোচিত ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকাবাহিনীর হত্যা, লুট ও নির্যাতন	আজাদ	৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ধ্বংস
জল্লাদ বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন ও পাশবিক অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী

রাজশাহী, ৫ই ফেব্রুয়ারী গত ন'মাস ধরে বর্বর পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশে যে অবাধ হত্যালীলা চালিয়েছিল সে সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষকসহ ১৮ জন কর্মচারী নিহত হন। ঐ সময় জিনিসপত্রের দিক দিয়ে দখলদার বাহিনী ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার মত ক্ষতি করেছে।

গত শুক্রবার জনৈক সাংবাদিকদের নিকট বিবরণ দানকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পাকবাহিনীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটির অনুসন্ধানের কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী গত বছর এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং জোহা হল, আব্দুল লতিফ হল, জিন্নাহ হল, আর্টস বিল্ডিং কেমিষ্ট্রি বিল্ডিং, মিলিটারী সায়েন্স ডির্পামেন্ট, এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল বিল্ডিং এবং বহু ষ্টাফ কোয়ার্টারে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে।

বর্বর হানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে এবং জোহা হল ও অন্যান্য হলসহ কতিপয় বিল্ডিংয়ের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় বিল্ডিং হল এবং শিক্ষকদের কোয়ার্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাসা থেকে নানাবিধ জিনিসপত্র এবং গৃহস্থালীর মালপত্র লুট করে। এমনকি লাইব্রেরী সমূহের পুস্তকাদি এবং ল্যাবরেটরি সমূহের যন্ত্রপাতিও বাদ যায়নি।

উক্ত সাংবাদিক সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ড: হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ও বাংলাদেশ প্লানিং কমিশনের নবনিযুক্ত সদস্য মোশাররফ হোসেন, বাংলা বিভাগের রীডার ড: আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং অন্যান্য কতিপয় শিক্ষক ও কর্মচারীর সাথে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষককে রাতের আঁধারে তাঁদের বাসা থেকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। এঁরা হচ্ছেন-ম্যাথমেটিক্সের এসোসিয়েট প্রফেসর জনাব হাবিবুর রহমান, ভাষা সাহিত্যের এসোসিয়েট প্রফেসর শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার এবং মনস্তত্ত্ব বিভাগের ডেমনেষ্ট্রেটর মীর আব্দুল কাইয়ুম। গত ১৪ই, ১৫ই এপ্রিল এবং ২৫শে নভেম্বর তারিখে তাদের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ছাড়া ১৫ জন নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী শেখ এমাজুদ্দীন (ষ্টেনোগ্রাফার), সাইফুল ইসলাম (ইউডি এসিষ্ট্যান্ট), শফিকুর রহমান (ছুতার), কলিমুদ্দীন (ওয়ার্কস এসিষ্ট্যান্ট) আবদুল আলী (ড্রাইবার), আব্দুল মজিদ, মোহাম্মদ ইউসুফ (সাইকেল পিওন), মোহাম্মদ আফজাল (গার্ড), আব্দুর রাজ্জাক (গার্ড) আব্দুল ওয়াহার (আর্দালী পিওন), কোরবান আলী (বেয়ারা), আবদুল মালেক (বেয়ারা), নুরু মিয়া (গার্ড), ওয়াজেদ ইলী (পিওন), এবং মোহন লালকে তারা হত্যা করে।

তারা সংখ্যতত্ত্ব বিভাগের লেকচারার কাজী সালেহ, ম্যথমেটিক্সের লেকচারার জনাব মুজিবুর রহমান এবং ড: আবু হেনা মোস্তফা কামালের উপর বর্বরোচিত অত্যাচর করে। কাজী সালেহ আহমদ এবং মুজিবুর রহমানকে বন্দী শিবীরে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ চার মাস ধরে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাদের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে জনাব মুজিবুর রহমানের পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হতে থাকে। ড: আবু হেনা

মোস্তফা কামালকে ২৪ ঘন্টা পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে তাঁকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান ডঃ রফিককেও গ্রেফতার করে বন্দী শিবিরে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হয়। প্রায় আটদিন ধরে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালানোর পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী জনান যে, সেনারা হাবিব ব্যাঙ্কের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা লুট করে এবং কুমারী মেয়েসহ বহু মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তিনি বলেন, একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর পত্নী এবং ৩২ বৎসর বয়সের কন্যাকেও তারা রেহাই দেয়নি। তিনি বলেন পাক সেনারা এতই নিষ্ঠুর ছিল যে একজন অধ্যাপককে হত্যা করার পর তাঁর তরুণী মেয়েদেরকে একজন সামরিক অফিসারের গৃহে গান গাইতে বাধ্য করে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অসংখ্য কবর রয়েছে যা থেকে আরও বহু লাশ উদ্ধার করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পিওন আবুল বাশার জোহা হলের নিকট বাস করতো । তাকে কবর খনন করতে বাধ্য করা হতো। তার কাছ থেকে জানা যায় যে, জোহা হলের নিকট অন্যূনপক্ষে তিন হাজার লাশের কবর দেওয়া হয়েছে।

বি, এস, এস

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নৃশংসতার আরেক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস	আজাদ	৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নৃশংসতার আরেক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস
(নজস্ব নিবন্ধ)

একাত্তরের মে মাসে যখন জল্লাদ বাহিনী আক্রমণ করে তখন তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহি:প্রকাশ ঘটেছিল। বাংলাদেশে গণহত্যার কাপালিক দলের অন্যতম জল্লাদ ক্যাপ্টেন আয়ুব হোমসে ঢুকেই তীব্র ঘৃনা ভরে তাচ্ছিল্যের সাথে বলেছিলো এটা হিন্দু তৈরীর কারখানা। অথচ জাতি ধর্মবর্ণের এখানে কোন প্রশ্ন নেই। জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এখানে সবাই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সে বলেছিলো এ কারণে যেহেতু সংখ্যালঘু তথা হিন্দুদের সম্পর্কে তারা এলার্জিক, তা ছাড়া ২৫ শে মার্চ রাতে যখন তাদেরকে হত্যাযজ্ঞে পাঠানো হয়, তখন হত্যাযজ্ঞের পাণ্ডা কুখ্যাত টিক্কা খান বলেছিলো শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এ দেশের সব মানুষ হিন্দু হয়ে গেছে অতএব তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে, মুসলমান বানাতে হবে। মানবতা বিবর্জিত এ সব পাকিস্তানীরা তার স্বাক্ষর রেখে গেছে বাংলাদেশের সর্বত্র।

ক্যাপ্টেন আয়ুব আরো বলেছিল, পাকিস্তান মুসলমানদের জন্য হিন্দুস্থান হিন্দুদের জন্য, বার্মা বৌদ্ধদের জন্য। পাকিস্তানে থাকতে হলে সাবাইকে মুসলমান হতে হবে। এক পর্যায়ে হোমসের ছাত্রীদের সে নামাজের সুরাহ কেরাত জিজ্ঞাসা করে । স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুরা তার জবাব দিতে পারেনি। আয়ুব তখনও রাগে থর থর করে কাঁপছিলো। তার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছিল । বলছিল, সবাইকে নামাজের সুরাহ কেরাত শেখাতে হবে। চোখে কাজল আর কপালে টিপ দেয়া চলবে না। আর তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল হোমসের ভাইস প্রিন্সিপাল সি সালমা রহমানেরা উপর। আয়ুবের সাহায্যকারীর স্থানীয় জামাতে ইসলামের কুখ্যাত পাণ্ডা মওলানা অদুদের জনৈক ছেলে কাকে বলেছিল, ''এদেরকে শায়েস্তা করতে হবে, ইসলামকে বাঁচাতে হলে এসব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ফলতে হবে।'' প্রিন্সিপাল মিসেস মুৎসুদ্দীকে শাসিয়ে বলেছিল, তোমরা হিন্দু, তোমরা ভারতের চর, আওয়ামী লীগের সমর্থক।''

তিনি দেখেছেন কিভাবে পাক বর্বর বাহিনী মির্জাপুরের অসহায় নিরীহ বাঙ্গালীদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, লাইন করে মেশিনগান দিয়ে শত শত বাঙ্গালীকে হত্যা করছে। বাড়ীঘর লুটপাট করেছে। পশুরা হোমসের সকলকে শাসিয়েছে। ধমকিয়েছে। ভয় দেখিয়েছি।। যাওয়ার পথে হোমসের আর হাসপাতালের ক'জন দারোয়ানকে হত্যা করে গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিনাজপুর হত্যা ও লুণ্ঠন	দৈনিক বাংলা	৯ ফেব্রয়ারী, ১৯৭২

দিনাজপুর নির্যাতিত রিক্ত নি:স্ব সর্বস্বান্ত
নরহত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ সর্বত্র একই কাহিনী।
\ আমিনুল ইসলাম প্রেরিত \

দিনাজপুর: বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার ধানের দেশ দিনাজপুর। কাটারিভোগের দেশ দিনাজপুর। যার দক্ষিণ-পূর্বে পলির সমতট, উত্তর-পশ্চিমে শাল বন, কাশ ঝোপ জঙ্গল লতার লাল খিরার মাটির মালভূমি। করতোয়া, মহানন্দা, কাঞ্চন পুনর্ভবা, টাউন নদীর স্বচ্ছ সলিলে সতত অবগাহমান দিনাজপুর। কাঞ্চন পুনর্ভবার তীরে তীরে একদিন ছিল সকল অনাড়ম্বর মাটির মানুষ সাঁওতালদের অধিবাস।

ঘরে ঘরে চোলাই করা ধেনো মদের নেশায় মতোয়ারা আবালবৃদ্ধবণিতার আনন্দে মুখর থাকতো এই জনপদ। খোলা মৃদঙ্গের তালে তালে ঝুমুর নৃত্যরতা বিশ্ব কর্মীর নিজ হাতে গড়া খোদাই করা কালো সাঁওতাল বালাদের পায়ের ওঠানামা। বলিষ্ঠ দেহবল্লরীর ভাঁজে ভাঁজে রেখায় রেখায় জাগতো স্পন্দন। এখন নেই। না নেই। ঘর নেই । ভিটি নেই। ধান নেই। সে মন নেই।

রংপুর থেকে সৈয়দপুর। সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর ৪৫মাইল। আবার দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁ ৩৬ মাইল। সৈয়দপুর শহরের বড় বড় পাটের গদীগুলো গুদাম ঘরগুলো শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। রেল লাইন পেরিয়ে শহরের পশ্চিম প্রান্তে কাঁচা বাড়তো নেইই-অধিকাংশ পাকা পেস্তা ইটের বাড়ীগুলো ভূশয্যা গহণ করেছে। দিনাজপুর পর্যন্ত পথের দু'ধারে শত শত বাড়ী জ্বলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শূন্য ভিটিতে একটা-দুটো করে মানুষ ফিরে এসেছে। আরো ফিরছে। দিনাজপুর শহরের পাঁচ, ছয় মাইলের মধ্যে ধ্বংসটা আরো ব্যাপক।

নেই, কিছুই নেই। মানুষের বসতি ছিল তার চিহ্ন মাত্র নেই। নেই পাখ-পাখালীর কিচির-মিচির। তারাও যেন কোথায় শরনার্থী। হিলি থেকে তেঁতুলিয়া, দু'শ মাইলের বেশী সীমান্ত এলাকার অভ্যন্তরে সাত মাইল পর্যন্ত কোন জনবসতি নেই। কমপক্ষে তিন লাখ পরিবার হয়েছে ছিন্নমূল সর্বহারা। তাদের অতীত ছিল। ওরা মাঠে মাঠে বীজ বুনতো। পাকা ধান ঘরে তুলতো। হাসতো গাইতো। পালা পার্বণে ঈদে পূজায় আনন্দ করতো। নেই-নেই। কিছু মানুষ নিজ দেশে পরবাসী। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে প্রান্তরে এই জেলাটাই বোধ হয় খান সেনাদের জবর-দখল আমলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দিনাজপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার বললেন, আপনি যদি দিনাজপুর জেলার সীমান্ত এলাকায় যান, তাহলে আপনার মনে হবে আপনি আফ্রিকার সাহারার কোন এলাকায় গিয়েছেন। এ জেলার পচাগড় থানা এলাকায়, অমর খানায় প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। আর সে লড়াই ছিল বেশ দীর্ঘস্থায়ী। দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁ যেতে সড়কের ডান ধারে রয়েছে ছোট ছোট শাল গাছের বন। সারাটি পথ বরাবর বনের মাঝ মাঝে বাংকার। হত্যা আর নারী ধর্ষণ, লুণ্টন, আর ঘর জ্বালানী। যেখানেই যাই, সেখানেই একই কথা। সব খোয়ানো মানুষগুলোর একই বিলাপ। অভিন্ন কাহিনী । দিনাজপুর শহরে খুব কম বাড়ী আছে যা লণ্ঠিত হয়নি। অসংখ্য ঘরবাড়ী মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পার্বতীপুরে খান সেনা ও তাদের দালালেরা ইঞ্জিনের বয়লারে জ্যান্ত মানুষকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওরা রাতের বেলা রেষ্ট হাউসে মেয়েদের নিয়ে আসতো । চালাতো পাশবিক অত্যাচার। গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়েদের বের

করে নিয়ে আসতো। ইরিগেশন বিভাগের ওয়ার্কশপের পিছনে খান সেনারা বহু লোককে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে বীরগঞ্জ থানার পুলিশের সার্কল ইন্সপেক্টর জনাব ফজলুর রহমানকে, দেবীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আবদুল কাদেরকে, পার্বতীপুর থানার থার্ড অফিসার আমিনুদ্দিনকে পঁচাগড়ের এস, আই আব্দুর রশিদকে, এস, আই মকবুল হোসেন, এবং আরো বহু পুলিশ কর্মচারীকে।

পার্বতীপুর হলদী বাড়ী পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার তোজাম্মেল হোসেন বললেন,-পার্বতীপুর থেকে দিনাজপুর আসার পথে রেল সেতুর কাছে ১০ জন লোকের কংকাল পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দুটি শিশুর। বীরগঞ্জ থানার ঘোড়াবান্দ গ্রামের জনৈক প্রাইমানী স্কুলশিক্ষক বললেন, নভেম্বর মাসে তার পুত্রবধূর এক আত্মীয়ার উপর খান সেনা ও তার সহযোগীরা জোর করে ঘরে ঢুকে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। ডিসেম্বরের ৯ তারিখে তিনজন খান সেনা ছয়ঘাটি গ্রামের জনৈক চার সন্তানের জননীর ওপর তাদের পাশবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে''	দৈনিক বাংলা	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

"অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছ''
\ মোঃ কামরুজ্জামান প্রদত্ত \

ঢাকা ঘোড়দৌড় ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে কালী বাড়ীর ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে সেদিন আমাকে শুনতে হয়েছিল তাদের কথা। লালমোহন মালী-হামি তখন পালাইয়া গেছি। অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছ। নন্দনের গায়ে পাঁচটি গুলি লেগেছে।

রাম প্রসাদ-হামার পোলাভি মারা গেছে। এখন শুধু তিনটি মাইয়া আচে, সাদিবি হয়নি।

সোভা রাণী মজুমদার-ছার-হামারভি ছেলে মারা গেছে।

লক্ষী রাণী ঘোষ-আমার স্বামী, আর দুটি মেয়ে মারা গেছে।

সোনিয়া-হামার ছামী, এক পোলা, দুই মাইয়া মারা গেছে। এক পোলা কোলে আছে।

পুরান দাস-হামার ছেলে মারা গেছে।

লিলিয়া-হামার ছামীভি মারা গেছে দুইটা মাইয়ভি মারা গেছে।

বেচন-হামার ভগনা সুরুজ ভল্লী মারা গেছে। ও যেদিন মারা গেছে ছেদিন তার মাইয়া পার্বতীর জনম হইছে।

বৃদ্ধা-নন্দুর পোলা মারা গেছে।

সকলের কণ্ঠে-ছামীভি মারা গেছে ছাব। আরো অনেক, অনেকের কণ্ঠে শুনছিলাম আমি সেদিন কালীবাড়ীর ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে-লিলিয়া, বেগনিয়া, লক্ষী রাণী, পুরান দাস, আর শোভা রাণীর মত আপন জনদের হারিয়ে যাওয়ার বেদনামিশ্রিত কথা।

কিন্তু আমি অপারগ। তাদের সকলের নাম আর কথা সেদিন লিখে রাখতে পারিনি। সবার তো একই কথা-কারো ছেলে, করো স্বামী, কারো বা মেয়ে, আবার অনেকেই স্বামী, পুত্র, সবাইকে হারিয়েছে। তারা তাদের আপন জনকে হারিয়েছে নরপিশাচ পাক জল্লাদদের হাতে। ২৪শে মার্চের কাল রাতে হানাদার বাহিনী ধ্বংস অভিযান ঢাকা শহরের সর্বত্র শুরু করে। তাদের তাণ্ডবলীলা থেকে প্রাচীন মন্দিরও রেহাই পায়নি। রমনার কালীবাড়ীর মন্দিরটি হানাদাররা ২৭শে মার্চের রাতে ট্যাঙ্কের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়।

মন্দিরসহ পুরা কালীবাড়ী আজ রমনার মাঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর সাথে কালীবাড়ীতে আশ্রিত মোট ৫০ জনের প্রাণনাশ করেছে জল্লাদ সেনারা। আমি সেদিন রমনার কোরবানির হাটে ছবি আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাটের ছবি আর আনতে পারিনি, এনেছি তাদের ছবি যারা হারিয়েছে তাদের আপনজনকে। তারা আজ সবাই মুক্ত আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছে-তাই সেদিন আমার সাথে তাদেরই একজন লালমোহন মালীকে কথা বলতে দেখে মনে করেছিলাম-আমি হয়তো রিলিফ সম্পর্কে তাদের নাম ঠিকানা লিখছি। তাই অনেক নারী পুরুষ আমাকে ঘিরে বলেছিল সাব হামার নাম লিখেন হামার স্বামী, হামার ছেলে--- ইত্যাদি ইত্যাদি। রমনা কালীবাড়ীতে মোট ৭০০ নারী পুরুষের বাসস্থান ছিল। তাদের মধ্যে স্বামীজী-প্রেমানন্দগিরিসহ

মোট ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীজীর বয়স প্রায় ৭০ বছর হয়েছিল। তাকে রমনার মাঠে অন্যান্যদের সাথে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে ২৮ শে মার্চে। তার স্ত্রী এবং তিন বছরের শিশু সন্তান ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল।

পিতার মৃত্যুর দিন-পার্বতীর জন্মদিন। কালীড়ীতেই আশ্রিত ছিল সুরুজভল্লী। সুরুজভল্লী সেদিন ২৭শে মার্চের রাতে অনেকের সাথে সারিতে দাঁড়িয়েও মনে করেছিল তার স্ত্রীর প্রসব বেদনার কথা-। নবজাত পার্বতীর পিতা আর নেই আছে রমনার কালীবাড়ীতে পিতার জমাট বাঁধা রক্ত।

ঝরছে অশ্রু অবিরল

কালীবাড়ীর এক বৃদ্ধা নাম প্রিয়বালা ঘোষ। বয়স ৬০ বছরের মত। দুই গণ্ড বেয়ে ঝরছিল শুধু অশ্রুর ফোঁটা। আমার কাছে আসতে পারেনি ভিড় ঠেলে। তাই অনেক পরে সাবার শেষে আমি তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম'' আপনি এমন করে কাঁদছেন কেন?'' উত্তরে হতবাক। কিছুই প্রথমে বলতে পারেনি। তখন চোখের পানি যেন বাঁধ ভাংগা স্রোতের মত বইছিল। বৃদ্ধার পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি ফুটফুটে রক্ত গোলাপের মত শিশুকে কোলে নিয়ে তার পুত্রবধূ লক্ষীরাণী ঘোষ।

কেউ কিছু বলছে না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে ৫ বছরের শিশু মন্টুচন্দ্র ঘোষ আমাকে উত্তর দিল-'' আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে সে জন্য ঠাকুর মা কানছে।'' আঁচলে চোখ মুছে বৃদ্ধা প্রীয়বালা তখন ছেলে বউ আর পাঁচটি শিশু সন্তানকে দেখিয়ে আমাকে বলল, সবাইকে ভাসিয়ে আমার মানিক (ছেলে সন্তোষ ঘোষ) গুলীখেয়ে মারা গেছে। দু'টি নাতনী মঞ্জু, সঞ্জুও মারা গেছে। বৃদ্ধা এর বেশী আমাকে আর কিছুই বলতে পারেনি। শিশুর মত কেঁদে উঠেছিল সেদিন রমনার মাঠে দাঁড়িয়ে। পুত্রহারা জননীর কান্নায় আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কে ক'টা হত্যা করলো তার ওপর নির্ভর করতো খান সেনাদের পদোন্নতি	দৈনিক বাংলা	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

কে ক'টা হত্যা করল তার উপর নির্ভর
করত খান সেনাদের পদোন্নতি
\ আমিনুল ইসলাম প্রেরিত \

গাইবান্ধ: একদিকটা প্রায় ৬ ফুট সমান দেয়ালে ঘেরা। খোলা ফটক। ঢুকতে এক ঝলক দমকা বাসাত রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চোখে মুখে এসে পড়ল। না বাতাস নয় যেনো এক সাথে অনেকগুলো মাংসহীন কংকালের দীর্ঘশ্বাস। এই সে স্থান-যা এক ক্রীড়ারসিক সিভিলিয়ান বৈকালীক বিহার, শরীর চর্চা ও খেলাধুলার জন্য নির্মাণ করেছিলেন।

যদিও তিনি জানতেন না যে ভবিষ্যত এক দিন সেখানে নরমুণ্ডের গেন্ডুয়া খেলা হবে। হবে মানুষ মারার নৃশংস খেলা। কোনো কংকাল? হাত-পায়ের অস্থি? চোয়ালের হাড়? মাথার খুলি কিংবা ঠুলি? না কিছুই পাইনি। অত কাঁচা কাজ তারা করেনি। সব পুঁতে ফেলেছে, খুঁড়লে পাওয়া যাবে। দশ, বিশ, তিরিশ, শ, দুশ, তিনশ?

কত জানি না । গাইবান্ধার হেলাল পার্ক এর কথা বলছি। এস, ডিও-র অনুপস্থিতিতে তার স্থলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার জনাব আজিজুল হক আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, সেখানে কত লোকের প্রান হনণ করা হয়েছে তা তিনি বলতে পারবেন না। জনাব হক বললেন একদিন মেজর ডেকেছেন। একটু দূরে পাশের রুমে বসে আছি। একজন সুবেদার মেজরের ঘরে ঢুকলো। মেজর প্রমাণ করলো কিতনা। সুবেদারের জবাব তেরা। মেজর সব মিলকরকে আবতক কিতনা। সুবেদার, তিনশ চুরানব্বই অর্থাৎ খুব কম করে হলেও পাঁচশ' লোককে সেখানে হত্যা করা হয়েছে। জনাব হক আরো বললেন, আলাপের ধরন-ধারন দেখে মনে হলো কে কত লোককে হত্যা করতে পারলো তার উপরই নির্ভর করতো ওদের পদোন্নতি।

১৮ এপ্রিল গাইবান্ধা শহর থেকে সাইকেলে চড়ে ফিরছেন বাদিয়াখালির খোকা মিয়া । হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখেন দুটো ছেলে একপাল ছাগল নিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। পেছনে তাকিয়েই দেখলেন দুটো জীপ। রাস্তার পার্শে একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন তিনি। শুধু কয়েকটি মুরগীর বাচ্চা ছাড়া বাড়ীতে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। পাটকাঠির বেড়ার আড়ালে শুয়ে পড়লেন। ঠিক বাড়ীর সামনেই জীপ দুখানি থামলো। খানসেনারা পেছনের দিকে হাত বাঁধা সাদা কাপড় পরা তিনজনকে জীপ থেকে নামালো। দুজন যুবক। একজনের বয়স কত তা লক্ষ্য করেননি। ওরা যুবক দুটিকে মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড় করালো।

তারপর কোমরে লাথি মারলো। লাথির ধাক্কায় দুজনে দৌড় দিতে শুরু করলো। অমনি প্রথমজনকে গুলীকরলো। হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে সে পড়ে গেল। আর উঠল না। দ্বিতীয়জন যেই ফিরে তাকিয়েছে অমনি তাকেও গুলী করলো। একটা আলের পাশে সে এলিয়ে পড়লো। ততক্ষণে ওরা চলে গেছে। দেখে শনে বের হলাম। আমার মতই কোথাও লুকিয়ে থাকা আর একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। আলের আশে রক্ষিত গুলী খাওয়া যুবকের কাছে গেলাম। পানি দিলাম। ঢোক গিললো কিন্তু পরক্ষণেই গলগল করে তারা লাল রক্ত বমি করলো।

তারপর সব শেষ হয়ে গেল। খোকা মিয়া আরো বললেন জুন মাসের প্রথম দিক। কারফিউ। রাস্তার পাশে দোকান ঘর। হরদম সামরিক গাড়ী আসা যাওয়া করেছ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত। তখন হবে দুটো। ঠিক আমার ঘরের কাছে দুটো জীপ থামলো। গাড়ীতে চার-পাঁচটি মেয়ে। চিৎকার করছে প্রাণের ভয়ে।

কিন্তু গলা দিয়ে যেনো স্বর বের হচ্ছে না। জীপ চলে গেল। ওদের ভাগ্যে কি ঘটেছে জানি না। স্বাধীনতার পর হিলাল পার্কের বিপরীতে একটি দেয়াল ঘেরা স্থানের এক কোণে একটি গর্তের মাটি তাজা দেখে খনন করা হলে তার মধ্যে থেকে অনেকগুলো মেয়ের লাশও পাওয়া যায়।

এরা কোন বাবা, মায়ের স্নেহের দুলালী তা জানা যাবে না কোন দিন। লাশ দেখে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাদের মুখ গাল ক্ষতবিক্ষত করে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে, স্তন ফেলা হয়েছে কেটে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বগুড়ায় পাক বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের ওপর দুটি প্রতিবেদন	সংবাদ	২ ও ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

প্রতিদিন বধ্যভূমি থেকে ভেসে আসতো
মানুষের মরণ চীৎকার-
সাধুবাবা আতঙ্কে বিহবল হয়ে তা-ই শনতেন

---আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগের কথা। আমাদের গুরু এসে আস্তানা পেতেছিল বগুড়া জেলার বাগাবান কাবরার একটি বটগাছের ছায়ায়। বগুড়া শহর বলতে তখন কিছুই গড়ে ওঠেনি। একটা টিনের ঘরে থানা এবং ফুলবাড়ীর রমজান মণ্ডলের একটি কাঠের কারখানা বোধহয় ছিল। আজকের সাত-মাথা তখন ছিল গাছপালা আর জঙ্গলে ভরা। আমাদের গুরু আনন্দ গোস্বামী এবং ভেরেণ্ডা গোস্বামী এই পৃথিবী ছেড়ে অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়েছেন কিন্তু সেদিন এক সঙ্গে চলে গেল আমার দিন ভাই। হাত বেঁধে বগুড়ার সেউজাগড়ীর আনন্দ আশ্রমে সকাল বেলা বসে বসে এই সাধুবাবা সব ঘটনা বলছিলেন। হানাদার পাক বাহিনী বগড়া দখল কারা পরও আশ্রমে চারজন সাধু ও তিন জন মাতা ছিলেন। হানাদার বাহিনী তিনজন সাধুকে বগুড়া রেলষ্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রি কলেজ সড়কের পার্শ্বে গুলী করে হত্যা করে। এদের ভিতর ছিলেন সুন্দর সাধু, মঙ্গল সাধু এবং স্থানীয় বাদুরতলার একজন বৃদ্ধ মুনেন্দ্রনাথ সরকার। তিনজনই ছিলেন বগুড়ার প্রাক্তন অধিবাসী। এই তিন সাধু-বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন সাধুবাবা। বগুড়া অতীত ইতিহাসকে বুকে নিয়ে এই সাধু বাবা আজও বেঁচে আছেন। বগুড়ায় এমন লোক কমই আছেন যারা এই সাধুবাবাকে চেনে না। পাক দস্যুদের জঘন্য নৃশংসতার পরও আজ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে আছেন এই সাধুবাবা। যুগোল কিশোর গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বাঁচলেন কেমন করে? হেসে তিনি বললেন,'' ওরা আমাকে কেন যে হত্যা করেনি তা আমি বলতে পারব না। আমার তিন ভাই তখন খেতে বসেছিল। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো কয়েকজন অবাঙ্গালী। ওরা আমার ভাইদের খেতে দেয়নি। এসেই ভাইদের হাত বেঁধে ফেললো। ওদের নিয়ে যাওয়ার সময় আমি বললাম, আমাকে মার, ওদের নিয়ে যেয়ো না। বৃদ্ধ বলেই বোধহয় আমাকে ওদের সঙ্গে নেয়নি। কিন্তু আমার ভাইয়েরা আর ফিরে আসেনি। একদিনকে ধাঙ্গড় এসে আমাকে জানালো, পাক সেনারা রাস্তার ধারের গর্তে আমার ভাইদের পুঁতে রেখেছে।'' সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা সবাই আগে পালালেন না কেন? সাধুবাবা প্রত্যুত্তরে বললেন, সে অনেক কথা বাবু। প্রায় সকলেই কখন শহর ছেড়ে চলে যান। ভক্তরা এসে আমাদের অনেক অনুরোধ করেছে। কিন্তু সংঘের সাধুর মাতারা নিষেধ করেছিল। আমরা কারো অন্যায় করিনি। ওরা নিষ্ঠুর ওরা কাল, ওরা অনেক অন্যায় করেছে- কথা বলতে বলতি মিষ্টভাষী সাধুবাবার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠছিল। সাধুবাবা বললেন, 'ওরা আমাকেও ছাড়েনি।' মাঝে মাঝেই পাক সেনারা আশ্রমে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করতো। আমার সামনে বন্দুক ধরে বলতো, 'টাকা কাঁহা-টাকা দোঁ-ওরা আমার পাঁচশত টাকা অগেই নিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও আসতো টাকার খেঁজে। এই দেখুন আমার পিঠে রড দিয়ে অনেক মেরেছে। সবসময় ওরা আমাকে ছোরার ভয়ে কাবু রেখেছে। একদিন ওরা আমাকে মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, কুয়া কাহা হায়? আমি ভেবেছিলাম ওরা এবার আমাকে মেরেফেলবে। ওরা আমাকে বললো, বুড্ডা তুম কালেমা পড়। এরপর হঠাৎ জানিনা ওদের কি মনে হওয়াতে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি বেঁচে আছি, কিন্তু ওরা আমাকে যেমন অত্যাচার করেছে, তাতে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। জানতে চাইলাম, নয়টি মাস আপনার ও মাতাদের খাবার সংগ্রহ করলেন কোত্থেকে? তিনি বললেন অনেক কষ্ট করেছি। ভিক্ষেও করেছি। পাশের গ্রামে গিয়েছি।

একটু আধটু যা পেতাম তাই খেয়ে বাঁচতাম। আমাদের দশ মণ চাল, ৮টা গরু, প্রায় হাজার টাকার বাসনপত্রাদি সব লুট করে নিয়ে গেছে ওরা। চোখের সামনে দেখতাম কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি। মাঝ মাঝে ভক্তরা গোপনে কিছু সাহায্য দিয়ে যেত। তাই দিয়ে চালিয়ে নিয়েছি।

আশ্রমের পূর্বদিকের বাগানে (গুরুর প্রথম আস্তানা) দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন-ঐ যে ওখানে একটা বদ্ধ কূপ আছে। প্রায় প্রতিদিনই করুণ কান্নার আওয়াজ আমি শনেছি। একদিন এক ছোট শিশু, বাবা মা, বাঁচাও-বাঁচাও করে চীৎকার করছিল। ঐ ছেলেটাকে জবাই করে কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমি প্রায় প্রতিদিনই এরকম চীৎকার শুনেছি। সাধুবাবার অনুরোধে আমি বদ্ধকূপে হিংস্রতার অনেক চিত্র দেখেছি। আজো এই বাগানের একটি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মানুষের রক্ত লেগে আছে। কূপে নরকংকাল আর মাথার খুলিগুলো এখনো দেখা যায়। কত নিরাপরাধ, ণিষ্পাপ মানুষ এখানে জল্লাদদের হাতে বলি হয়েছে কে তার হিসাব দিতে পারে?

বগুড়া শহরের অতি পুরাতন এবং সবার পরিচিত সাধুর আশ্রম আজ আবার ভক্ত আর গুণগ্রাহীদের আগমনে ভরে উঠেছে। কিন্তু আশ্রমের সেই পরিচিত মুখগুলো আর নেই। জিজ্ঞেস করলাম দেশ সম্বন্ধে। আপনি কি ভাবছেন? উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'ওরা খুবই বেআইনী কাজ করেছে। ওরা গণভোট মানে না। শেখ মুজিবকে ক্ষমতা না দিয়ে তারা খুবই অন্যায় করেছিল। ওরা অত্যাচারী। অত্যাচারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।'

আশ্রমের মন্দিরে গুরুদের আস্তানা দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন, ''আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়েরা এমনিভাবেই থাকত। কিন্তু দস্যুরা তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। মাথায় তার ছোট জুঁটি বাঁধা। সামান্য সাদা কাপড়ের একটি গামছা তার পরনে। তিনি বললেন, পরের অন্যায় করা আমাদের নীতি নয়। তবুও ওরা আমাদের মেরেছে। বৃদ্ধ সাধূ যুগোল কিশোর গোস্বামীই শুধু তার ভাইকে হারান নাই, বগুড়াবাসীও হারিয়েছে তাদের পরিচিত শ্বেতবস্ত্রধারী তিনটি ভাইকে। তারা আর আসবে না।

বগুড়া রেলষ্টেশনের চারপাশেই ছিল জল্লাদদের কসাইখানা

"তখন জুন মাসের বোধ হয় প্রথম সপ্তাহ। রাত্রিবেলা শুয়ে আছি। হঠাৎ ইন্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুমে থেকে ভেসে আসলো মানুষের করুণ আর্তনাদ। 'আমাকে বাঁচাও' করে কে যেন চিৎকার করছিল। একটু পরেই থেমে গেল্ বুঝলাম, সে আর নেই।'' কথাগুলো বলতে বলতে শিউরে উঠছিলেন বগুড়া রেলওয়ের একজন পদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী। জানতে চাইলেম আপনি দস্যুদের আর কি নৃশংসতা দেখেছেন। উত্তরে তিনি জানালেন, ''কি দেখি নাই বলুন। ওরা সব করেছে। বাঙ্গালীরা সবাই ছিল ওদের শত্রু কেননা, যে বাঙ্গালীই রেলষ্টেশনের আশপাশে আসতো তাকেই তারা হত্যা করেছে। একদিন একজন নিরীহ বাঙ্গালীকে দিয়ে কয়েকজন মিলিটারী তাদের মালপত্র ট্রেনে উঠালো। তারপর কাজ শেষ হলে শুরু হলো তার উপর অমানুষিক অত্যাচার। একজন মিলিটারী লোকটাকে ওয়াগনের পিছনে নিয়ে দু'পা সমান করে পায়ের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে বসিয়ে রাখলো। তারপর একজন উঠলো তার পিঠের উপর। জোর করে ওরা জীবন্ত মানুষটার হাড়গুলো এমনি করে ভেঙ্গে দিল। মানুষটার অনুরোধ আর মিনতি ওরা শুনে নাই। এরপর লোকটাকে আর ভাইদের মত হত্যা করা হলো। পাক দস্যুরা ষ্টেশনের আশপাশে অহরহই মানুষদের এমনি নিষ্ঠুরভবে অত্যাচার করে হত্যা করতো।''

জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ওরা কিছু বলেন নাই? উত্তরে তিনি বললেন, "বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় বাঙ্গালী কর্মচারীদের ওরা ক্ষমা করে নাই। যারা সরতে পারে নাই তাদের মৃত্যু ছিল ওদের হাতে।'' প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন,'' একদিন মেজর জাকী সামরিক হেডকোয়ার্টারে আমাকে ডাকলো। তারপর পাশের রুম থেকে রক্তমাখা কাপড় পরিহিত একজন বাঙালীকে ডেকে আনা হলো। তার হাত বাঁধা ছিল এবং মুখ

ছিল রুমাল দিয়ে বাঁধা আমাকে মেজর বললো, এ-দেখো। এরপর কড়া মেজাজে হুকুম হলো-আভি তোম যাও। আমি মেজর জাকীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি বটে, কিন্তু ঐ রক্তমাখা ভাইটি বেঁচে আছে তিনা জানি না। শেষের দিকে (বগুড়া ছাড়ার পূর্বে) ওরা রেলওয়ের বাঙ্গালী কর্মচারীদের হত্যা কারারও ষড়যন্ত্র করেছিল। রেলষ্টেশনের আশপাশে নিরীহ বাঙ্গালীদের হত্যা করেও ওদের রক্ত পানের তৃষ্ণা তখনও মেটেনি। বগুড়া ছাড়ার পূর্বে ওদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু রেলষ্টেশনের বধ্যভূমিতে হারিয়ে যাওয়া ভাইরা আর আসবে না। রেলষ্টেশনে সুইপার দশন (৭০) জমাদার সতর্কতার ইঙ্গিত দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ৭টি মাস কেটে গেছে ষ্টেশনের আশপাশের মৃত বাঙ্গালীদের কবর দিতেই।

দশীন জমাদার

বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের একজন সুইপার। বয়স প্রায় ৭০ বছরের বেশী। এই বৃদ্ধ তার সাতটি মাস কাটিয়ে দিয়েছে বর্বর পাক দস্যুদের হত্যা করা লাশ সরিয়ে। দস্যুদের হত্যাযজ্ঞের সে একজন নীরব সাক্ষী। "আমি পূর্বে আরো মোটাসোটা ছিলাম স্যার। আমি লাল টক টকে ছিলাম। কিন্তু বগুড়া ষ্টেশনের আশপাশের বাঙ্গালী ভাইদের রক্ত দেখে দেখে আমি খুব রোগা হয়ে গেছি। আমার শরীরে আগের মত মাংস নেই। আপনিই বলুন, একজন মানুষ শত শত রক্তমাখা লাশ সরালে আর কি করে বাঁচার আশা রাখে! জীবন নিয়ে খেলা হয়েছে সাহেব। আপনারা কিছুই জানেন না। আমি কেমন করে বেঁচে আছি জানি না-ওরা কত জবাই করছে, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারিনি। মুক্তি আর ইণ্ডিয়ার সৈন্য আমাদের রক্ষা করল হুজুর---।'' বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রায় ৩০০ গজ দক্ষিণে একটি বদ্ধ কূপ দেখাতে গিয়ে সুইপার দশীন কথাগুলো বলছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বগুড়া লেওয়ের এস ডি ও সাহেব পরিবারসহ এই প্রথম আসলেন তাঁর বাংলোতে। পাক বাহিনীর আমলে তার বাংলোটা সম্পূর্ণভাবে সামরিক দস্যুদের হাতে ছিল। তারা এই দু'তলা বাড়িটি ব্যবহার করতো কসাইখানা হিসেবে। নিরীহ বাঙ্গালীদের পাকদস্যু আর তার সহযোগীরা ধরে আনতো, তারপর এই বাড়ীতে জবাই করা হতো, বাড়ীর সংলগ্ন একটা বৃহৎ কূপে হত্যা করার পর মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হতো। বাড়ীটার আউট কিচেনে সবচেয়ে বেশী হত্যা করা হতো বলে মনে হয়। কারণ এখান থেকে কূপটি মাত্র ২০ গজ দূরে। বাড়ীটার চারিদিকে দীর্ঘ নয় মাসে ঘাস আর জঙ্গলে প্রায় ভর্তি হয়েছিল্ পাকবাহিনীর সেগুলো পরিষ্কার করতো না। কারণ জঙ্গলের মাঝে এই রকম একটি বাড়ীতে তাদের বাঙ্গালনিধনের নেশা খুবই বেড়ে যেত। শুধু তাই নয়, বর্বর পাক-সেনারা এই বাড়ীটাতে মদ আর জুয়ার আড্ডাও বসাতো। দিনে রাতে তারা এখানে আসর জমাতো নির্বিঘ্নে। ওদের কেউ বাঁধা দিতে পারে নাই। রক্তের নেশায় বর্বররা হন্যে হয়ে বাঙ্গালীদের খুঁজে আনতো। দাশীন জমাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তুম কতজন বাঙ্গালীর মৃতদেহ এই কূপে ফেলেছো।-'' কি আর বলব হুজুর! বিশ্বাস করবেন না! আমার হাতেই কমপক্ষে চার-পাঁচ শত লাশ এই কূয়ায় ফেলেছি। জল্লাদরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো হুজুর, আমি কি করি। আমি লাশগুলো পুঁতে রাখতে চাইতাম। কিন্তু ওরা দেয় নাই। ওরা আমাকে বলতো, 'তু' শালা হিন্দু হায়। এইসে দরদ কিউ লাগদো! "জানতে চাইলে তোমার সামনেই কি ওরা হত্যা করতো।'' বৃদ্ধ বলি চলছিল, ''কি বলেন সাহেব! আমাকে ওরা ভয় পেত না। প্রথমে বাঙ্গালীকে ধরে আনতে, তারপর হাত বেঁধে মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেয়। এরপর হয় পেটের ভিতর চাকু মারে, না হয় জবাই করে। কোনটার আবার পিছন দিক থেকে ঘাড়ে ছুরি বসিয়ে জবাই করতো। ওদের দয়া নাই। কান্নাকাটি অনুরোধ কিছুই শুনেনি। কত বাঙালী যে কাঁদতো হুজুর, কি করবো। মিলিটারীরা খুশিমত মানুষকে গুলি করতো। তারপর আমাকে বলতো 'ইছি কি হঠাদো'। আমি বাধ্য হয়ে কাজ করেছি হুজুর। কিন্তু ওরা আমাকেও ছাড়ে নাই। রেল ষ্টেশনের বাঙ্গালীদের আমি আগেই বলতাম তোমরা সরে যাও। আমি ওদের এই দিকে আসতে দেইনি। গোপনে গোপনে আমি অনেক বাঙ্গালী সাহেবকে সাবধান করেছি। কিন্তু মিলিটারীরা এটা জানতে পেরে আমাকে সন্দেহ করে ঘাড়ে রাইফেল দিয়ে মারে। শুধু লাশ সরাবার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা হুজুর

বড় বড় সাহেবকেও জবাই করেছে- গুলি করেছে।'' পাশে পার্ক-রোডের একটি ড্রেন দেখিয়ে বলল, ''এখানে তিনটা, ওখানে ১টা, এই রকম অনেক সাহেবের লাশ এই ড্রেনেই আছে হুজুর। ওরা ভালভাবে পুঁতে রাখতেও আমাকে দেয়নি। আমাকে সন্দেহ করে খুব মারতো, তার উপর আমার চাকুরী নষ্ট করে দিল সাহেব। কয়েক মাস ধরে না খেয়ে আছি।'' ঝাড়ুদার দাশীন পাক বর্বরদের বুলেটের সামনে না খেয়েই দীন কাটিয়েছে। চাকুরীতে পূর্নবহালের কথা সেদিন সে মুখে আনতে পারি নাই। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যারা এমনিভাবে শত শত মানুষকে হত্যা করতে পারে তাদের এক মুঠো ভাতের অভাবে এক গরীবের জন্য চিন্তা করার সময় কোথায়? বগুড়া রেল এস ডি-ও বাংলোর পূর্বদিকের মাঠটা এখন কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। বগুড়া শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত এই বাংলোতে কেন বাঙালী আসতে পারেনি। বগুড়া শহর শত্রুমুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বাংলোর প্রতি ঘরের মেঝে আর দেয়ালে মানুষের রক্তে ভেজা বহু কাপড়-জামা ইত্যাদি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। বাংলোর উপর তলার হাউজে বর্বরতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। এই হাউজটি ছিল সম্পূর্ণ মানুষের রক্তে ভরা। রক্তগুলো জমা হয়ে ক্রমশঃ জমাট বেধে যায়। কোদাল দিয়ে মাটি কাটার মত জমাট বাঁধা রক্ত কেটে এই হাউজ পরিষ্কার করা হয়েছে। জবাই করা মানুষের রক্তে স্রোত দেখার জন্যই বোধ হয় হাউজে রক্ত জমা করতো। রক্ত দেখেই হয়তো রক্তপানের তৃষ্ণা জল্লাদদের বাড়তো বেশী । বগুড়া রেলষ্টেশন আর ষ্টেশন সংলগ্ন রেললাইনের আশেপাশে কত নিরীহ বাঙালীকে যে পাকসেনা আর তার সহযোগীরা হত্যা করেছে তার হিসেব নেই। কত নিরীহ মানূষ যে এই দুস্যদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন আর একান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুকে মেনে নেয়েছেন কেউ বলতে পারেনা। বগুড়ায় পাক দস্যুরা বাঙ্গালীদের ধরে বলত, 'ইছিকো খরচা খাতা মে (মৃত্যু খাতা) উঠা দেও।' ---বোধ করি রেলষ্টেশনের ও তার আশপাশের নিষ্ঠুর বর্বরতা আর হত্যাযজ্ঞের দ্বারাই তাদের খরচের খাতা পূর্ণ হয়ে গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
খুলনার নরমেধযজ্ঞ	দৈনিক বাংলা	১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

খুলনায় পাকবাহিনীর নরমেধযজ্ঞ

\ নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত \

খুলনা: খুলনা শহরের হেলিপোর্টে ও ফরেষ্ট ঘাটে বাঙ্গালীদের যে নৃশংভাবে হত্যা করা হতো, তা দেখে খুলনার তৎকালীন জেলা জজ হার্টফেল করে মারা যান। বর্তমানে হেলিপোর্ট ফরেষ্ট ঘাটের কথা বলা যাক। হেলিপোর্ট জজকোর্টের সামনে এবং সার্কিট হাউস সংলগ্ন। যেসব বাঙ্গালীদের উপর তাদের অত্যাধিক রাগ ছিল জল্লাদরা তাদের প্রকাশ্য দিবালোকে হেলিপোর্টের প্রবেশ পথে ছাগল ঝোলা করে পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতো।

আর ঐ অবস্থায় চলতো অত্যাচার-চড় ঘুষি ও চাবুকের আঘাত। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ অবস্থার উপর বেয়োনেট দিয়ে খোঁচানো হতো । যতক্ষণ না সে মারা যায় ততক্ষণ চলতো এই নির্যাতন । যার কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হতো ঐভাবে অত্যাচার করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে নামানো হতো, জ্ঞান ফিরলে আবার ঝোলানো হতো পূবর্বৎ।

একদিন আমার নিজের দেখা একটি মৃত্যুর কথা উল্লেখ করছি। সকাল ১০টা হবে। হেলিপোর্টে লুঙ্গি ও গেঞ্জী পরা দীর্ঘ সবলদেহী একজন বাঙ্গালীর পায়ে, হাঁটুতে ও অন্যান্য গিরায় কাঠের রোলার দিয়ে দু'জন সেনা পিটাচ্ছে আর দু'জন সেনা তা উপভোগ করছে। যার উপর অত্যাচার চলছে তিনি বার বার বাধা দিচ্ছেন আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তারপর তার দু'পায়ে দাড়ি বেঁধে পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলানো হলো।

পরনে থাকলো জাঙ্গিয়া ও গায়ে গেঞ্জী। পরে খালি গা করে গেঞ্জীটিও অপসারণ করা হলো। আর চললো চাবুকের বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির সাথে সাথে তার দেহটি মুচড়ে উঠতে লাগলো। ঐ ঝুলন্ত অবস্থাতেই তিনি হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছেলেন। কিন্তু পরে আর তার হাতে সে জোর রইল না। কিন্তু চাবুকের বাড়ি চললো অব্যাহতভাবে। আর এইভাবেই সমাপ্তি হলো একটি বাঙ্গালী জীবন। পরে তার সেই ঠাণ্ডা শীতল দেহটাকে নামিয়ে অবজ্ঞায় তারা দূরে ফেলে দিল-আবার অপর একজনকে। আমি সরে পড়লাম।

রাতের বেলায় জজকোর্টের পিছনে ফরেষ্ট ঘাটে বাঙ্গালীদের এনে জবাই করে হত্যা করা হতো এবং দেহগুলোর পেট চিরে নদীতে ফেলা হতো। ঘাটটি আবার জজ সাহেবের বাসার ঠিক পেছনেই। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সেইসব মৃত্যুপথযাত্রী বাঙ্গালীদের করুণ আর্তনাদ জজ সাহেবের কানে পৌঁছতো। দিনে হেলিপোর্টে ও রাতে ফরেষ্ট ঘাটের এইসব হত্যাযজ্ঞ সহ্য করতে না পেরে জজ সাহেব তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকে অনুরোধ করেছিলেন যে বিচারালয়ের সামনে যেন এ ধরনের কাজ না করা হয়। তার উত্তরে তিনি পেয়েছিলেন মৃত্যুর শাসানি। কিন্তু তাদের সাধ মেটেনি। তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একরাতে মারা গেলেন।

আর একটি বধ্যভূমি চিল গল্লামারী। খুলনা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র দেড় মাইল। হেলিপোর্ট ও ফরেষ্ট ঘাট, কাষ্টমস ঘাট প্রভৃতি জায়গায় প্রথমে বাঙ্গালীদের হত্যার জন্য বেছে নিলেও পরে বর্বর পাক বাহিনীর গল্লামারীকেই তাদের নৃশংসতার উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নিয়েছিল।

সারাদিন ধরে শহরে ও গ্রাম থেকে বাঙ্গালীদের ধরে এনে জেলকানা হেলিপোর্ট ও ইউ, এফ, ডি ক্লাবে জমায়েত করা হত। তারপর মধ্য রাত হলে সেই সব হতভাগ্য নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের পেছনে হাত বেঁধে

বেতার কেন্দ্রের সামনে দাঁড় করিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্বারা তারা 'ব্রাস' মারতো, রক্তাপ্লুত দেহে লুটিয়ে পড়তো হতভাগ্যরা। হত্যার আগে ট্রাক ভরে যখন তাদের নিয়ে যাওয়া হতো তখন সেই সব নিরুপায় মানুষের আর্তনাদ রাস্তার আশপাশের সবাই শুনতো। কিন্তু তাদের তো বাড়ীর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই কারফিউ রয়েছে।

সেই আর্তনাদ সহ্য করতে না পেরে শেরে বাংলা রেডের এক ব্যক্তি জানালা খুলে মুখ বাড়িয়েছিল মাত্র। ব্যাস, অমনি তাকে লক্ষ্য করে হানাদার বাহিনী গুলি ছুড়লো আর বুলেট বিদ্ধ হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো। হানাদার বাহিনী প্রতিরাতে কম করেও শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করতো। দিনের বেলায় তাদের লাশ জোয়ারের পানিতে ভেসে আসতো। কিন্তু কারও সাহস হতো না তাদের দাফন করার।

অনেকে তাদের আপনজনের লাশকে সনাক্ত করলেও সেখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিতে পারেনি। কেননা বর্বরেরা জানতে পারলে তাকেও হত্যা করবে। কিছুদিন জল্লাদরা ঠিক করলো গুলি করে আর হত্যা নয়। অন্য পন্থা। এবার থেকে শুরু হলো জবাই, কিন্তু সংখ্যায় কমলো না-সেই শতাধিক প্রতিরাতে। এরপরের ঘটনা চরম নিষ্ঠুরতার । রাত্রের বদলে হত্যার জন্য দিনের বেলাকে বেছে নিল।

সকলের চোখের সামনে দিনে পিঠ মোড়া দেওয়া ট্রাক ভর্তি বাঙ্গালী নিয়ে যাওয়া হতো আর ঘন্টাখানেক পর শূন্য ট্রাক ফিরে আসতো-গল্লামারীতে পড়ে রইতো কিছুক্ষণ আগের যাওয়া সেইসব মানুষের শীতল দেহগুলে। খুলনা শহর মুক্ত হওয়ার পর গল্লামারী খাল থেকে দুই ট্রাক মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল।

ছবি তুলবার জন্য গল্লামারীর অভ্যন্তরের ধানক্ষেতে ঢুকে দেখলাম এক নৃশংস দৃশ্য। একাধিক লাশ পড়ে আছে, সেদিকে একটি কুকুর খাচ্ছে আর দূর অপর একটি লাশের পাশে আর একটি কুকুর বসে হাঁপাচ্ছে। মনে হয় মানুষ খেয়ে তার উদর অতিমাত্রায় পরিপূর্ণ।

ভাবতেও অবাক লাগে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে খ্যাত মানুষকে কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চট্টগ্রামে বধ্যভূমির সন্ধান	পূর্বদেশ	১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

চট্টগ্রামের ২০টি বধ্যভূততে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ চলেছে
\ পূর্বদেশ প্রতিনিধি \

চট্টগ্রাম, ১২ই ফেব্রুয়ারী। -চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এলাকা সমেত জেলার আরো ৯টি থানাতে হানাদার খান সেনারা সর্বমোট ২০টি বধ্যভূমিতে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠান চালিয়েছে। শহর ও শহরতলী এলাকার ১০টি বধ্যভূমির মধ্যে আটটিতে গড়ে পাঁচ হাজার করে বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে।

এ ছাড়া পোর্ট এলাকা এবং নেভীব্যারাক এলাকাতে সুদীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী মানুষকে হত্যা করে কি হারে কর্ণফুলি নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, তার কোন হদিসও খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এলাকার ১০টি এবং গ্রাম অঞ্চলের গোটা পাঁচেক বধ্যভূমি ইতিমধ্যে আমি ঘুরে দেখেছি।

এসব বধ্যভূমি বাঙ্গালী হত্যার সঠিক সংখ্যা হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু এখনো সরকার যদি ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এগিয়ে আসেন তবে হত্যাযজ্ঞের ব্যাপকতাসহ একটা আনুমানিক সংখ্যাও নির্ণয় করতে পারবেন বলে বিশ্বাস। কোন কোন মহল চট্টগ্রামে নিহত লোকের সংখ্যা ১ লাখ হবে বলে অনুমান করছেন।

কিন্তু আমার মনে হয়, বিভিন্ন থানাসহ এ সংখ্যা অন্তত: তিন লাখে দঁড়াবে । শহর ও শহরতলীর আম বাগান, ওয়ারলেস কলোনী, শেরশাহ কলোনী ও ফয়েজ লেকসহ গোটা পাহাড়তলী এলাকাতে এখনো ২০ থেকে ২৫ হাজার বাঙ্গালীর মাথার খুলি পাওয়া যাবে। এছাড়াও রয়েছে চাঁদগাও, লালখান বাজার, হালিশহর, কালুরঘাট, ও পোর্ট কলোনী ইত্যাদি বধ্যভূমি। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও সার্কিট হাউসেও হাজার হাজার লোককে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে মিরেশ্বরাই ও সীতাকুণ্ডের পাহাড়, রাউজান, পটিয়া, সাতকানিয়া এবং বাঁশখালীর বনাঞ্চলেও হাজার হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে সমস্ত এলাকায় রিপোর্ট সংগ্রহ অনেকটা কঠিন কাজ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সারা চট্টগ্রাম জেলাতে তিন লাখ বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে।

বিভিন্ন বধ্যভূমিতে আজো বহু নরকংকাল ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। শহরের ওয়ারলেস কলোনী ঝাউতলা ও নাছিরাবাদের পাহাড়ী এলাকাগুলোতে লুকায়িত বহু নরকংকালের অস্তিত্ব আজো পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ঝাউতলা এলাকার বিভিন্ন সেপটিক ট্যাঙ্ক, পাহাড়ী ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অনেকগুলো কংকাল দেখতে পেয়েছি।

সীতাকুণ্ডের শিবনাথ পাহাড়ে কয়েক হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে। মিরেশ্বরাইয়ের জোরারগঞ্জ এবং ওয়ারলেস এলাকাতে মানুষ জবেহ করার স্থায়ীকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। রাস্তার ট্রাক, বাস এবং ট্রেন থেকে হাজার হাজার লোককে ধরে এনে আটক করে রাখা হতো এবং প্রতিদনি ৫০ জন অথবা ১০০ জন করে হত্যা করা হতো।

এ সমস্ত এলাকাতে অসংখ্য কবর আজো দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের পরিহিত কাপড়-চোপড়, জুতা, স্যাণ্ডেল ইত্যাদি এখানে সেখানে পড়ে আছে। স্থানীয় জনসাধারণের ধারনা মতে শুধু মিরেশ্বরাই ও সীতাকুণ্ডের বধ্যভূমিগুলোতে ১৫ থেকে ২৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে।

এ ছাড়া রাউজান, পটিয়া ও বাঁশখালী ইত্যাদি থানাতেও প্রায় অনুরুপহারে গণহত্যা চালানো হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চাঁদপুরে পাকবাহিনীর হত্যা লীলার আরো কাহিনী	পূর্বদেশ	১৩ ফেব্রুয়রী, ১৯৭২

চাঁদপুরে পাকবাহিনী ও তাদের হত্যালীলার চাঞ্চল্যকর কাহিনী

\ পূর্বদেশ সংবাদদাতা \

কুমিল্লা. ১০ই ফেব্রুয়ারী। -কুমিল্লা জেলার নদীবন্দর চাঁদপুর ও তার আশপাশের বর্বর বাহিনীর নৃশংসতার বহু তথ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। কেবল মাত্র চাঁদপুরেই দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, মোজাহিদ বাহিনীর হায়েনাগুলো প্রায় ৫ হাজার নিরীহ বাঙ্গালীকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

উপরন্তু এই ছোট বন্দর শহরটিতে আল-বদর দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের অনতিপূর্বে (৭-১২-৭১ইং) সুপরিকল্পিত উপায়ে বহু বুদ্ধিজীবী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যা করার চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া যাচ্ছে।

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর বড় ভাই ডাঃ মজিবুর রহমান চৌধুরী এক সংবাদদাতাকে বলেন, চাঁদপুর পুরান বাজারস্থিত নূরীয়া হাইস্কুলে আল-বদর বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে তাদের প্রধান-এর নির্দেশে অত্র এলাকায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। লুটতরাজ ও নির্বিচারে হত্যা তখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়ায় বলে তিনি জানান। একদিন আল-বদর বাহিনীর কয়েকটি হায়েনা গ্রাম অঞ্চল থেকে আগত চারজন নিরীহ বাঙ্গালীকে অচেনার অজুহাতে প্রকাশ্য বাজারে গুলি করে হত্যা করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পেলেই তারা ধরে নিয়ে যেত এবং এদের কাউকেই ফিরতে দেখা যায়নি বলে জানা যায়। একদিন তার অনুপস্থিতিতে তার ছেলে বাবুলকেও বদর বাহিনীর কয়েকটি হায়েনা বড় ষ্টেশন ও তাদের নির্যাতন কক্ষে নিয়ে আরো প্রায় ২০-২৫টি ছেলের সাথে অকথ্য নির্যাতন করে।

বহু চেষ্টা তদবীরের পর জৈনিক আর্মি অফিসারের মারফতে বাবুলকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন সত্য কিন্তু তারপর সে প্রায় এক মাস অচল হয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গের হতভাগ্যদের কি হয়েছিল তা তিনি বলতে পারেন নি।

দখলদার বাহিনীর অত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে ফ্যাসিষ্ট আল-বদর বাহিনী সুপরিকল্পিত উপায়ে বুদ্ধিজীবী নিধন শুরু করে। চাঁদপুর টেলিফোনের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার জনাব সায়েদুল হক আল-বদর বাহিনীর তৎপরতার কথা বলতে গিয়ে তারা কি করে তার দু'জন কর্মীকে হত্যা করেছে এবং তিনি কেমন করে তাদের মৃত্যু ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছেন তা এই সাংবাদদাতাকে জনান।

৭ই ডিসেম্বর তার একজন সুপারভাইজার জনাব আব্দুল খালেক ও অপারেটর জনাব মোরশেদুর রহমান শহরের উপকণ্ঠের এক গ্রাম থেকে ফেরার পথে বদর-বাহিনী তাদের ধরে নিয়ে যায়। এর নূরীয়া হাইস্কুলস্থিত ক্যাম্পে আটকিয়ে রাখে। উক্ত খবর পাওয়ার পর তিনি বদর বাহিনীর সাথে টেলিফোনে যোগযোগ করলে উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে সকালে মুক্তি দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়।

সান্ধ্য আইন থাকায় নিজে গিয়ে তাদের খবর নেয়া নিরাপদ কিংবা সম্ভবও ছিল না। সকাল বেলা এক বেনামী টেলিফোন থেকে জানতে পেরে তাদের খোঁজ করতে গিয়ে নূরীয়া স্কুলের নিকটবর্তী রাস্তায় তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেদিনই কিছু একটা বিপদের আশংকা মনে জাগলে জনাব সায়েদুল হক শহর ছেড়ে

পালাতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এবং ঝুঁকি নিয়ে সপরিবারে নৌকা করে সরে পড়তে সক্ষম হন। পরে তিনি জানতে পারেন যে, তিনি বাসা ত্যাগ করার মাত্র কয়েক মিনিট পরেই আল-বদর বাহিনীর হায়েনাগুলো তার বাসায় পৌঁছে হতাশ হয়। সেই মানবতার শত্রুহয়েনাগুলো অনেক বুদ্ধিজীবীকে তাদের নিজ নিজ বাসা থেকে ধরে এনে হত্যা করে।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ম্যালেরিয়া সুপারিনটেনডেন্ট জনাব জোয়রদার মতিউর রহমান, ষ্টোরকিপার জনাব মাকসুদুর রহমান, মেকানিক জনাব কবীর আহমদ, ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর জনাব সফিউদ্দীন আহমেদ, ও দু'জন সুপারভাইজার বজলুর রহমান ও ইদ্রিস মিয়া। কৃষি বিভাগের একজন প্রোজেক্ট অফিসার জনাব ফয়েজ আহমেদও আল-বদর বাহিনী কর্তৃক নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ওয়াপদার দু'জন মেকানিক ছিলেন, তারা হচ্ছেন নাজিমুদ্দীন ও মাহফুজুল হক।

দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী এদেশের জারজ সন্তানগুলো নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায় তার চাক্ষুস সাক্ষী রেলওয়ে হাসপাতালের সেনিটারী এসিষ্ট্যেন্ট জনাব ফজলুল বারী। এপ্রিল মাসে চাঁদপুর দখলদার বাহিনীর কবলে পতিত হওয়ার পরও তিনি হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত থাকায় বর্বর বাহিনীর নৃশংসতার সাক্ষী হয়ে আছেন তিনি এবং তার ডোম বাহিনীর অনেকেই। রেলষ্টেশনের অফিস সমূহে রেষ্টহাউসে দখলদার ও রাজাকার বাহিনীর ক্যাম্প করা হয়।

শান্তি বাহিনীর সহযোগিতায় এই সমস্ত নরপশু চাঁদপুর পুরান বাজার ও পাশ্ববর্তী এলাকা সমূহে হত্যা, লুট, নারী নির্যাতন, ও অগ্নিসংয়োগে এক নারকীয় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। নির্বিচারে গণহত্যা ও বহু নারীর সতিত্ব নষ্ট করার বিবৃতি দান করেন জনাব ফজলুল বারী। রেল, লঞ্চ,রাস্তা-ঘাট, নৌকা সমূহ ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে নিরীহ নিরপরাধ বাঙ্গালীদের ধরে এনে তাদের ক্যাম্প সংলগ্ন নির্যাতনকক্ষে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করা হতো।

একটি আম গাছ নির্দেশ করে তিনি বল্লেন এই আম গাছটি হাজারো নরহত্যার নীরব দর্শক। আম গাছটির নীচে ফিশিং কর্পোরেশনের গুদামের পিছনেই দুর্ভাগাদের হত্যা করে ২০-২৫ জনকে একই তারে গ্রথিত করে নদীতে ফেলে দিত। যেদিন মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হত সেদিন ডোমদের তলব করা হতো।

দুজন ডোমের বর্ণনা

রেলের ডোম ছুনুয়া ও গয়া প্রসাদ এই সংবাদাতাকে বলে যে, গভীর রাত্রে এসে পাকবাহিনীর লোক তাদের কোয়ার্টার থেকে ধরে নিয়ে যেত। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে জিঃ আরঃ পিঃ হাজতে অথবা আক্কাস আলী হাইস্কুলে রক্তাক্ত মৃতের স্তুপ দেখিয়ে বলতো, ভাঙ্গী ইয়ে জলদী সাফ করো।

মৃত দেহ বয়ে নদীতে ফেলতে হতো এবং ভোর না হতে উল্লিখিত নির্যাতন কক্ষের স্থান পরিস্কার করে ফেলতে হতো।

''কত আদমীকে যে এই লোক মেরেছে, কত মা বোহিনের ইজ্জত নষ্ট করেছে তা বলতে পারুম না বাবু।'' আক্ষেপের সাথে বলে ছুনুয়া। অনেক সময় দু'এক কথা বলতে গিয়ে নরপশুদের হাতে ওরা মারও খেয়েছে বলে জানায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সৈয়দপুরে বাঙ্গালী নিধন অভিযানের একটি প্রত্যক্ষ বিবরণ	সংবাদ	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

সৈয়দপুরে বাঙ্গালী নিধন অভিযানের একজন দুঃখিনী সাক্ষী সুরাইয়া বেগম

দু'সন্তানের জননী বেগম সুরাইয়া রহমান। বেগম সুরাইয়া রহমান হচ্ছেন সৈয়দপুরের তদানীন্তন হাউসিং এবং সেটেলমেন্ট বিভাগের মহকুমা ইঞ্জিনিয়ার শহীদ ফজলুল রহমানের পত্নী। অশ্রুসজল চোখে বেগম সুরাইয়া রহমান সেদিন আমার কাছে তাঁর স্বামী, দেবর ও ভাগ্নের শহীদ হবার কাহিনী বলেছিলেন।

তিনি বললেন, ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল আমার জীবনে সেই ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনলো। আমার ব্যক্তিগত জীবনে ঐদিনই হলো শহীদ দিবস। তিনি বলেছেন, ১লা এপ্রিল বিকেলের দিকে প্রায় ২০ জন হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের বাঙ্গালীপুরস্থ বাসভবনে আসে। তারা সবাই আমাদের লাইন করালো।

আমার সাড়ে তিন বছরের শাহনাজ পারভীন (রুমা) তখন কোলে। হানাদার বাহিনীর ভয়ে সে তাকে চেপে ধরে রয়েছে। আমার স্বামীর গলায় পবিত্র কোরান শরীফ ঝোলানো।

বাচ্চাটি কোলে। কোরান শরীফ ছুড়ে ফেলে তারা বলল, কেয়া তুম জয় বাংলা বোলতা? তোম আওয়ামী লীগকে সাথ হ্যায়? এই বলে তারা আমার স্বামী, তার ভাই ১ম বর্ষ এম, বি, এস-এর ছাত্র রফিকুল ইসলাম, তার ভাগ্নে এস, এস, সি পরীক্ষার্থী আনোয়ার হোসেন, বাসার মালী রুহুল আমীনকে ধরে নিয়ে যায়। ছোট মেয়েটি তখন তার আববুর গায়ের সাথে মিশে ছিল। নামতে চায় না। কিছুতেই সে তার আববুকে ছাড়বে না। আমি তাকে জোর করে নামালাম তার আববুর কোল থেকে।

হাউসিং এ- সেটেলমেন্ট বিভাগের ড্রাইভার অবাঙ্গালী আবিদ হোসেন সৈন্যদের সাথে এসেছিল। সে বাসায় ঢোকেনি, বাইরে ছিল। সে-ই হানাদারদের সব খবর দিত। তার এক ভাই নাজিরও হানাদার বাহিনীর দালালী করতো। বেগম সুরাইয়া তাঁর সুখের নীড় ভাঙ্গার কাহিনী বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। অনেক কিছু বলতে চেয়েও তিনি বলতে পারেননি।

তিনি বললেন, বাসা থেকে ওদেরকে নিয়ে বেরুবার পাঁচ মিনিট পর আমি কয়েকটা গুলির শব্দ শুনেছি। হয়তো এই গুলিতে ওদের সবাইকে এক সাথে হত্যা করা হলো। আমরা সবাই তাদের চারজনের আগমনের প্রতিজ্ঞা করছিলাম। আমার শাহনাজ তার পিতা, চাচা ও ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের জন্যে উন্মুখ হয়ে প্রহর গুনছিল।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। আসলেন মেজর গুল, মেজর জাভেদ, ক্যাপ্টেন বখতিয়ার, কর্নেল শফি। তারা আমাদের ছাদের উপর কামান বসালেন। দারুণ উত্তেজনা, অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটালাম।

২রা এপ্রিল। ১৯৭১ সাল। আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যাবার দ্বিতীয় দিন। ড্রাইভার আবিদ জানতো আমার স্বামী, দেবর, ভাগ্নে প্রমুখের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। সে জানতো তারা তখন কোথায়। তার তখন অবাধ সুযোগ-সুবিধা।

সে ঐ দিন কয়েকজন অবাঙ্গালীকে নিয়ে এসে আমাদের বাসা লুট কর নিয়ে গেলো। আমাদের পরিবারটা ছোট। বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম। বাসায় প্রায় ৫০/৬০ হাজার টাকার বিভিন্ন জিনিসপত্র ছিল। সেসব কিছু নিয়ে গেল। হানাদার সৈন্য বাহিনী ঐদিনই আমাদের সৈয়দপুর টেকনিক্যাল স্কুলে নিয়ে গেলো।

সেখানে শুধু মহিলা আর মহিলা। কমপক্ষে ৬০০ থেকে ৭০০। সবাই এক একটা সকরুণ কাহিনীর প্রতিকৃতি, জীবন্ত সাক্ষী। সেখানে আমরা হানাদার সৈন্যদের পৈচাশিকতা দেখেছি, শুনেছি তাদের বিদ্রুপপূর্ণ টিটকারী। এরপর আমাদেরকে দারুল উলুম মাদ্রাসায় সরিয়ে নেয়া হয়। তারপর দু'মাস পর আমরা ঢাকায় চলে আসি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
''জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে।''	দৈনিক বাংলা	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে
\ বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত \

গাইবান্ধাঃ ''বাবা, মা নেই। কাকা খোঁড়া। চলতে পারেন না। জ্যাঠা পাগল। বোন বিধবা। বচ্চাও আছে একটি। মোট ১০ জনের পরিবার। আমি এদের নিয়ে কি করব বলতে পারেন?''

অটো প্রমোশনে প্রদীপ এখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু বেতন দেবে কোত্থেকে। ''না। কোথাও যাইনি। যাদের উপার্জনে সংসারের চাকাটা ঘুরতো খান সেনারা তাদের একদিন ধরে নিয়ে গেল। ধরে নিয়ে গেল, চলতি বাংলা সনের জৈষ্ঠ মাসের ১৭ তারিখে। নিয়ে গেল আমার ভগ্নিপতি অমল লাল চাকী এবং পরিবারের অপর তিনজন ননী গোপাল দেব, নিরোদ বিহারী দেব, আর নিরঞ্জন দেবকে। ওরা তো আর ফিরে আসেনি।''

হয়ত হেলাল পার্কের বধ্যভূমিতে তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। তারপর পলিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। আজ এ গ্রাম কাল সে গ্রাম এমনি করে। বাড়ী লুট হয়েছে। কিছু নেই। স্কুলের বেতন দেবে তেমন কিছুও আর অবশিষ্ট নেই। প্রদীপের বোনের বিয়ে হয়েছে মাত্র দু'বছর। এখন বয়স বড়জোর আঠারো উনিশ, সে্ এখন অর্ধ উন্মাদিনী। ''সরাকারের দয়ায় মানুষের সহায়তায় হয়ত একদিন আবার আমরা দাঁড়াতে চলতে পারবো, কিন্তু আমার বোনের স্বামীকে ফিরিয়ে দেবে কে? ছোট ভাগ্নে যখন বড় হয়ে জিজ্ঞেস করবে মামা আমার বাবা কোথায় তখন আমি তাকে কি করে বোঝাবো? কোত্থেকে এনে দেব তার বাবাবে? ''নাম রাখা সার্থক হেয়েছে। প্রদীপ পড়তে চায়। পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যে করেই হোক তাকে পড়তেই হবে। অশিক্ষিত ছেলেকে চাকুরী দেবে না কেউ। সামান্য কিছু জমি আছে তার।

গাইবান্ধা এমারজেন্সী ফোর্স-এ কর্মরত সুবেদার আবদুর রাজ্জাক। তিনি খান সেনাদের বিচারের মহড়া দেখেছেন। একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি। রান্নার খড়িতে ঘাটতি পড়েছে। মেজর আফজাল ডেকে পাঠাল।জ্বালানী কাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

গেলেন রাজ্জাক সাহেব। তার তখন ৮টা। রাজ্জাক সাহেব বললেন, সুবেদারের নাম এখন মনে নেই। সে মেজর আফজালের ঘর থেকে দুজন লোককে বের করে নিয়ে এল। সুবেদারকে সুধোলাম, কেয়া ভাইয়া ইন দোনোকা বিচার হো গিয়া। খান সুবেদার জবাব, তোমহারে সামনে হোগা দেখো। ওদের দুজনকে মাঠে খাড়া করলো। সিপাইকে হুকুম দিল, ইন লোগকো খরচা কর দো।

লোক দু'টোকে পিছন ফিরতে ও চোখ বন্ধ করতে বলা হলো। তারপর এক, দুই, তিন, চার। পরপর চারটে গুলি। কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে করতে ওরা মরে গেল। তারপর তাদের কফিল শাহর গুদামের মাঠে যেখানে রয়েছে আরো শত শত মানুষের সমাধি সেখানে গর্তে ফেলে মাটি দেয় হলো। হেলাল পার্কে এবং এখানে যাদের হত্যা করা হয়েছে এই প্রাঙ্গণেই তারা শুয়ে আছে। শুয়ে আছে দশ, বিশ জনে গাদাগাদি হয়ে।

আমার যে বোনের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে পড়ে রয়েছে তাদের পরনের শাড়ীর ছিন্ন অংশ। মাথার চুল। চোখে বাঁধা রয়েছে তার রুমাল। গুদামের কক্ষগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইট। তাতে রক্তের দাগ। অনেককে গুলি খরচ না করে ইটের উপর আছড়ে মারা হয়েছে। চিৎকার করতো বলে আর আশপাশের

পাড়ার লোকেরা গুলির শব্দ শুনে শুনে গুণে রাখতো তাই পরের দিকে পশুরা ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেলতো।

হেলাল পার্কের সংলগ্ন ওয়াপদা রোড পাড়ার আবদুল ওয়াদুদ খান শহীদ। কলেজের ছাত্র। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সে গুপ্তচরবৃত্তি করছে বলে তাকে একবার নয় দু-দুবার ধরা হয়েছিল। শেষ বার ৬ই অক্টোবর প্রথমে তার বন্ধু মকসুদার রহমান মুকুল এবং পরে শাহীনকে ধরা হয়। শাহীন আমাকে জানালো, ''ওরা প্রথমে আমাকে সিকিউরিটি অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। আমি মুক্ত এলাকায় যাতায়াত করার কথা স্বীকার করি। স্বীকার করার উপায় ছিল না। ওদের লোকেরা আমার যাতায়াতের সঠিক খবর রাখতো। মেজর ছিল না তাই আমাকে এক ঘন্টার জন্য ছেড়ে দেয় হলো বলা হল, যদিনা ফিরে তবে আমার বংশে বাতি দেওয়ার মতও কাউকে রাখা হবে না। অগত্যা এক ঘন্টা পর ফিরতে হলো। মেজরের জিজ্ঞাসাবাদের পর কফিল শাহর গুদাম ঘরে হাত আর চোখ বেঁধে শুরু হলো নির্যাতন। সেই ঘরে বিমান বাহিনী থেকে আগত একজন মুক্তি সেনাকে রক্তাপ্লুত ও উলঙ্গ অবস্থায় তিনি দেখতে পেয়েছেন।'' শাহীন জানাল আমার সামনেই দলে দলে লোক ধরে আনছে আর চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার।

শাহীন বললো পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর মাহমুদ, বালুচ রেজিমেন্টের মেজর আফজালম লেফটেন্যান্ট নেওয়াজ রিজভী, ২৯ ক্যাভালরীর মেজর তহসীন মির্জা এবং মেজর শের খান ও ক্যাপ্টেন খককর গাইবান্ধার হেলাল পার্কের সকল হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের জন্য দায়ী। মেজর শের আলী তহসীন মীর্জা কত মেয়ের যে সতিত্ব হরণ করেছে তার কোন হিসাব নেই।

ভরতখালিতে পুরাতন ফুলছড়ি ঘাট ও নয়া ঘাটের লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে বহু লোককে খান সেনারা হত্যা করেছে। বগুড়া জেলার শরিয়াকান্দী থানার লোকদেরও ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়েছে। নলডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ নেতা একরাম উদ্দীনম, রংপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী বিজয়চন্দ্র মৈত্র (পাখীদা); তার দু'ছেলে এবং গফুর নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে।

সুন্দরগঞ্জে একদিন সভার কথা বলে ডেকে এনে চেয়ারম্যানসহ ১৩ জনকে হত্যা করা হয়। সাইমাগঞ্জের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের তিনজনকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে ক্যাম্পে ডেকে এনে হত্যা করা হয়েছে। তারা নাকি মুক্তি সেনাদের সহায়তা করতো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
খুলনায় পাক বাহিনীর নরমেধযজ্ঞ	দৈনিক বাংলা	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

খুলনায় পাক বহিনীর নরধেমযজ্ঞ

\ নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত \

খুলনাঃ খুলনা শহরের কেন্দ্রস্থলে রেল ষ্টেশন ও রেল লাইনের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল বাঙ্গালী নিধনের আর একটি ঘাঁটি। এপ্রিল মে মাসে জল্লাদ সৈন্যরা খুলনা রেলষ্টেশন এলাকাতে বহু বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে ছিল প্রদেশের অন্যত্র থেকে আসা ট্রেনের যাত্রীরা। প্রথমে তাদের সর্বস্ব লুট করা হতো। তারপর হত্যা করা হতো এবং সেই সব মৃত দেহগুলির পেট চিরে নদীতে ফেলে দেয়া হতো যাতে করে লাশ নদীর গভীরে তলিয়ে যায়।

রেলষ্টেশন ও ষ্টীমার ঘাটগুলির শক্ত সবল মুটে শ্রমিকেরাই তাদের হাতে মারা গিয়েছে সর্বাধিক। রেল কলোনী এলাকাতে প্রাধান্য ছিল পাকসেনাদের সহযোগী একদল অবাঙ্গালীদের। ঐ সময়ে রেল কলোনী এলাকাতে দিনে বা রাতে যখনই কোন বাঙ্গালী গিয়েছে, সে আর ফেরেনি কোন দিনও। তাকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হতো। বহিরাগত লঞ্চ-ষ্টীমারের যাত্রীরাই হয়েছে তাদের প্রধান শিকার।

ঐ সব কলোনীতে বসবাসকারী অনেক বাঙ্গালী রেলকর্মচারীও হয়েছে তাদের শিকার। লুণ্ঠিত হয়েছে তাদের গৃহসামগ্রী। এই এলাকা থেকে অন্যান্য গলিত দেহের সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছিল খুলনা থানার দারোগা জনাব কাশেমের মৃতদেহটি। ডিউটি করে বাড়ী ফেরার পথে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন। এই এলাকায় আশিয়ানী হোটেলের সামনে বিরাট একটা ডোবা আছে। এই ডোবার ভেতরেও নিক্ষিপ্ত হয়েছে বহু বাঙ্গালীর মৃতদেহ।

গত ডিসেম্বরের কথা। যুদ্ধ চলছে একদিকে্আর বাঙ্গালীকে হত্যা করে ভর্তি করা হচ্ছে রেল রোডের একটি গুদাম। খুলনায় বিমান হামলা চলাকালীন পথের লোকজন রেল রোডে বা রেল কলোনীতে আশ্রয় নিলেই সেখান থেকে তাদের ধরে নিয়ে হত্যা করে ঐ গুদামে ফেলে দেয়া হত। ঐ সময়ে খুলনায় কেউ ভাবতে পারতো না যে রেল রোডের মত ব্যস্ত সড়কে এই ধরনের একটি গুদাম রয়েছে যেখানে বাঙ্গালীদের লাশ রোজই বেড়ে উঠেছে। ষ্টেশনরোডে ঐ সময়ে কেরোসিন বিক্রি হতো। কেরোসিন তখন ছিল আক্রা। তাই সুদুর গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রেতারা এসে ভোর থেকে লাইন দিত। কিন্তু বিমান হামলার সাইরেন বাজলেই তারা আত্মরক্ষার্থে আশপাশে আশ্রয় নিত। তারা জানতো না যে যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে রয়েছে বাঙ্গালীদের মরণফাঁদ। তাদের পাহারাদারদের সহায়তায়ও বর্বর সেনারা বাঙ্গালীদের অর্থ লুণ্ঠন ও হত্যা করতো।

পাহারাদার খানরা পথেঘাটে, বাজারে ব্যাংকে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। ঐ সব জায়গায় কোন বাঙ্গালীর কাছে বেশী টাকা দেখলেই তাকে মুক্তিবাহিনী বলে ধরে আনতো হেলিপোর্টে অবস্থানরত জল্লাদ সেনাদের কাছে। সেখানে তার সর্বস্ব লূট করে তারপর তাকে মেরে ফেলা হত। এ ধরনের হত্যা অনেক ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ম্যাটার্নিটি রোডের ননী, স্যার ইকবাল রোডের সিমেন্ট ব্যবসায়ী কাঞ্চন মিয়া, আরও অনেকে।

এখানে শুধু ননীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটনার কথা বলছি। ননীদের কণ্ট্রাক্টরী ও নৌপরিবহন ব্যবসা আছে খুলনাতে। ঘটনার দিন সে ব্যাংকে গিয়েছিল ব্যবসার জন্য কয়েক হাজার টাকা তুলতে। ননী টাকাটা তুলে তার

সাথীকে নিয়ে ঢুকল পিকচার প্যালেসের কাছে এক রেষ্টুরেন্টে চা খেতে। তখন সে বুঝতেও পারেনি এটাই হল তার জীবনের শেষ চায়ের কাপ। বাইরে অপেক্ষা করছিল দুজন খান। যেই মুহূর্তে ননী বেরিয়েছে অমনি তাকে পাকড়াও করে তুলল রিকশাতে। রিকশা ছুটল বধ্যঘাঁটি হেলিপোর্টে, যেখানে অপেক্ষা করছিল বর্বর পাকসেনারা।

১৭/১৮ বছর বয়সের ননী ছিল নির্ভীক ও তেজোদ্দীপ্ত। মৃত্যু অবধারিত জেনেও বাঙ্গালী তরুণ ননী খানসেনাদেরকে রেখে কথা বলেনি। কঠিন ভাষায় সে প্রতিবাদ করেছিল- যার প্রতিশোধে তাকে তারা হত্যা করেছিল নির্মমভাবে। বর্বররা তার পায়ে দড়ি বেঁধে হেলিপোর্টের সিলিং-এ পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়েছিল।

তারপর চালালো তার দেহে চাবুক। চাবুকের প্রতিটি বাড়ি তার দেহে কেটে বসে যাচ্ছিল। আর সে অর্তনাদ করছিল। সময়টা ছিল দুপুর। তার সাথীরা ছিল নির্বাক পথযাত্রী কয়েকজন বাঙ্গালী। চাবুকের বাড়িতে যন্ত্রণায় তার মুখম-ল থেকে চোখ দুটো বেরিয়ে গিয়েছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নওগাঁয় পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের আরেক অধ্যায়	পূর্বদেশ	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নওগাঁয় পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের আরেক অধ্যায়ঃ কূপে পানি নেই আছে শুধু গলিত লাশ

\ পূর্বদেশ প্রতিনিধি \

যে কেউ নওগাঁ শহরে ঢুকলেই দেখতে পাবেন শহরের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর যমুনা ওপর নির্মিত পুরানো অথচ অতি সুন্দর সেতুটির পাশেই বিধ্বস্ত তাজ সিনেমা হলটি। এর দক্ষিণে দেখা যাবে অসংখ্য বাঙ্গালী বিকৃত মৃতদেহ স্তুপাকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এরই আর মাত্র সমান্য দূরে একটি পুরানো পাকা কূপ।

সুস্বাদু পানীয় জলের এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য কূপটি এলাকার মানুষের প্রভূত উপকারে আসতো। আর এক্ষণে এই কূপটির তিন হাত নীচে থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল গলিত ও বিকৃত লাশ আর লাশই দেখা যাচ্ছে। একদা সুপেয় ছিল যার পানি সেখানে পনির চিহ্ন মাত্রও আর নেই। শবদেহ রক্তের ধারার সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে দু'টি বড় ঢেউ টিনের ঘর। ঘরের ভেতর ঝুলে আছে বহু দড়ি। নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জুতো, জামা, প্যাণ্ট ও অন্যান্য পোশাক পরিচ্ছেদ। এক নজরেই মনে হবে, এগুলো এক বা একধিক লোকের নয়, শত শত মানুষের ব্যবহৃত কাপড়। আর মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত এবং সে রক্তের বিস্তৃতি কূপ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

কূপটির ভেতরে প্রথমেই যে মৃত দেহটি চোখে পড়ে তা কোন উচ্চপদস্থ লোকের বলেই মনে হয়। এরই চারপাশে দেখা যায় বহু নিহত ব্যাক্তির মাথা মাত্র। শরীরগুলো নীচের বহু লাশের ভেতর অন্তর্হিত বলেই মনে হয়। সনাক্ত করার কোনই উপায় নেই। এবার তাজ সিনেমার নিকটবর্তী পুরোনো পশু হাসপাতালটি অতিক্রম করে উত্তর দিকে কিছুদূর গেলেই দেখা যাবে বাঁয়ে ছোট্ট একটি মসজিদ।

তার পাশেই রয়েছে দালান বাড়ীটি। বসাবাস করত তথাকথিত কামিজ বিহারী ব্যবসায়ী। নাম ইদ্রীস। প্রতি বৎসর খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর মৃত্যু বার্ষিকী পালনের নাম করে তিনদিন ধরে ওরস হতো এই বিহারীর বাড়ীতে। কিন্তু তার বাসার ভেতরে যেতেই যে কেউ চমকে উঠবেন। দেখতে পাবেন দুই ঘরের ভেতরে নির্মম হত্যার প্রমাণ চিহ্ন। একটি ঘরে অনেক দড়ি ঝুলে আছে। আর অপরটিতে রয়েছে অসংখ্য বাঙ্গালীর রক্তের ছাপ।

নরপশুরা বাঙ্গালীর রক্তে দরজায় আলপনা আঁকত

জানালা, দেওয়ালে সর্বত্র রক্ত ছড়িয়ে আছে, সর্বত্র ঘরের দেওয়ালে এবং চতুর্পার্শ্বে। জানা গেছে, উক্ত বিহারী ব্যবসায়ী খানসেনাদের সহযোগিতায় যেসব বাঙ্গালীকে ধরে এনে জবাই করতো তাদের রক্তে তার

অপবিত্র হস্ত রঞ্জিত করে তার ঘরের দরজা ও জানালা রাঙ্গিয়ে নিত। যেনো আলতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। এ নারকীয় দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আর খান সেনারা তখন উল্লাসে মেতে উঠতো। শুধু কি তা-ই। ইদ্রিসের বাড়ীর ভেতর কাঁচা কূপটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। এখনও সে কূপের ভেতর দড়ি দেখা যায়। কূপটিতে বহু অচেনা বাঙ্গালীর লাশ চাপা রয়েছে। আর এর পাশেই দেখা যায়। প্রচুর রক্তের দাগ। স্থানীয় বিহারীদের সহযোগিতায় পশু সেনারা কত বাঙ্গালীর জীবন প্রদীপ নির্মমভাবে নির্বাপিত করেছে, এই ক্ষুদ্র নওগাঁ শহরে তারই একটি ক্ষুদ্র প্রামাণ্য তুলে ধরা হলো।

গত ১৯শে ডিসেম্বর এই পশুসেনারা এখানে আত্মসমর্পণ করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
''অমানুষিক নির্যাতনেও তার মনের বলিষ্ঠতা কমেনি''	দৈনিক বাংলা	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

''অমানুষিক নির্যাতনেও তার মনের বলিষ্ঠতা কমেনি''

\ ষ্টাফ রিপোর্টার \

''আমার আব্বাকে কি মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা যেত না?'' সাক্ষাৎকারের শুরুতেই প্রশ্নটি কেরছিলেন বাবুল। বাবুল আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য, যশোরের গৌরব, মরহুম মশিহুর রহমানের বড় ছেলে। তাঁর আম্মা এবং অন্য তিন ভাইবোন সহ কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছেন। স্বাধীন বাংলার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আজ বাবুল অসংখ্য প্রশ্নের আঘাতে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হচ্ছেন। বোনের বাসা ধানমন্ডিতেই তিনি উঠেছেন।

আলাপের প্রথম দিকে স্তব্ধভাবে পাথরের মুর্তির মত বসেছিলেন তিনি। হয়ত শুনেছিলেন তার আত্মজের কণ্ঠের অশ্রান্ত অর্তনাদ-এত লোক থাকতে কেন আমার আব্বা বাঁচলো না? কেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন আবেদন পৌছালো না আব্বার অমূল্য জীবনের জন্য। একান্ত ধীরস্থির কণ্ঠে বেগম রহমান বললেন তাঁর মহান স্বামী মরহুম মশিহুর রহমানের সাথে তার সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলোর কথা।

তিনি বলেছিলেন কিভাবে ২৫শে মার্চের কালো রাতটাকে স্ত্রী পুত্র এবং বন্ধু-বান্ধবের অসংখ্য অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পালিয়ে যাননি। সকলের অনুরোধের উত্তরে একবার শুধু তিনি বলেছিলেন- নির্দয় এই সেনাবাহিনীর হাতে এ দেশের সরল জনগণকে ছেড়ে দিয়ে কি ভাবে আমি শুধু নিজের জীবন রক্ষা করবো। আপন আদর্শে বিশ্বাসী জনাব মশিহুর রহমান নিজস্ব নীতি থেকে কখনো বিচ্যুত হননি।

ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে পাকহানাদার বাহিনী তিল তিল করে তাঁকে সংহার করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি এই ঘৃণিত পশুর দল প্রথমে তাকে নীতিচ্যুত করার জন্য নানা ধরনের অত্যাচার চালায়। শরীরের নানা স্থানে অগুনে পোড়ানো, দেহকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে তাতে লবণ মাখানো থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। অত্যাচারে যখন তার বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল তখনও তার মনের বলিষ্ঠতা একটুও কমেনি। সব সময় তিনি একই কথা বলেছেন, ''আমি আমার জনগণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে পারবো না।''

সত্যিই তিনি তা পারেননি। হানাদার বাহিনী যখন তার বাম হাত কেটে ফেলে ডান হাতে লেখার জন্য হুকুম চালায় তখন যন্ত্রণায় শুধু কেঁপেছেন তিনি। কিন্তু তার বলিষ্ঠ ঠোট দুটো একটুও কাঁপেনি। প্রতি দিনে একে একে হানাদার পশুরা তাঁর দুই পা, দুই হাত কেটে বিকলাঙ্গ দেহের, পরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তখনও একটু কেঁপে ওঠেনি তাঁর দৃঢ়ভাবে বন্ধ ঠোট দুটো।

বেগম রহমান জানেন তাঁর স্বামীর সেই নৃশংস মৃত্যুর কথা। তিনি সহ্য করতে পারেন না নিষ্ঠুর সেই ঘটনার কোন বর্ণনা। তবুও মাঝে মাঝে তাঁর অবুঝ মন জানতে চায়- কিভাবে স্বাধীন বাংলার মাটি গ্রহণ করবে তাঁর স্বামীর মত মহান প্রেমিকের বিদেহী আত্মাকে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মানিকগঞ্জের একটি বধ্যভুমি সাটুরিয়া হাট	দৈনিক বাংলা	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মানিকগঞ্জের বধ্যভুমি
সাটুরিয়া হাট
\ সংবাদদাতা প্রেরিত \

মানিকগঞ্জঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী। -মানিকগঞ্জ মহকুমার সাটুরিয়া থানায় একটা বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে। সাটুরিয়া হাটের নিকট মোঃ মনোয়ার হোসেন নামক জনৈক ব্যক্তির পরিত্যক্ত বাড়ীর ভিটা খনন করে বহু লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত লাশগুলো থেকে পাক পশুসৈন্যদের মর্মান্তিক নৃশংসতার স্বাক্ষর পাওয়া গেছে।

লাশগুলোর হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। চোখ মুখ কাপড় দিয়ে জড়ানো। মুখের ভিতর কাপড় দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি লাশ গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অনেকগুলো মাথার খুলি ও হাড় পাওয়া গেছে। স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় পাক সৈন্য শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। মেয়েদের ধর্ষণ করেছে এবং লাখো লাখো টাকা লুট করে নিয়েছে।

গত নয় মাসে এখানে বানিয়াটি গ্রাম থেকে হরিদাস সাহা ৫৫, অতুল সাহা ৪৫, নিতাই চন্দ্র সাহা ৩০, রাধুঘোষ, আওলাদ হোসেন, গাঙ্গুটিয়া গ্রাম থেকে সুধির রায়, কালু রায়, ডাঃ বিজয় সাহা, মৃণালকান্তি রায়, কমলপুর থেকে মুক্তার আলী, পারাগ্রাম থেকে কালু মিয়া, কাউননারা থেকে হালিম ফকির, আমতা থেকে যথীন্দ্র কর্মকার, নয়াপাড়া থেকে শ্যাম সাহা, হাজিপুর থেকে হযরতকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। হানাদারদের হাতে সরকারী ডাক্তার নরেন্দ্র ঘোষও রেহাই পাননি। চর সাটুরিয়ার নারায়নবাবুর স্ত্রী আভারাণী ভট্টাচার্য ৩৫-কে পশুরা ধর্ষন করে হত্যা করে। যতীন কর্মকারের ১৫ বৎসরের নাতীকে চোখ উপড়ে ফেলে হত্যা করে।

এমনি করে ওরা কতগুলো হতভাগ্য মানুষকে এখানে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার সঠিক পরিসংখ্যান হয়তো কোনদিনও পাওয়া যাবে না। তবে ঐ হানাদার পশুদের অত্যাচারের এক রাশ বিভীষিকাময় স্মৃতি মানব সভ্যতার দূরপনেয় কলংক হয়ে থাকবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা কলোনী	পূর্বদেশ	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা করোনী
\ হাবিবুর রহমান \

ভোলায় বর্বর হানাদার বাহিনী নৃশংসতার দ্বিতীয় পর্যায়ের হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক নরপশু ক্যাম্পেন মুনির হোসেন ও সুবেদার সিদ্দিক। এদের গণহত্যা ও জঘন্য পাশবিকতা যে বিভীষিকা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তা অবর্ণনীয়। গত জুন মাসের প্রথম দিকে এই নরপশু আর তার দোসর সুবেদার ভোলাতে আসে। সে এখানে এসে প্রথম অতি স্বাভাবিকতা দেখাতে আরম্ভ করে।

মাইক্রোফোনে শান্তি কমিটির মাধ্যমে কেবলই ঘোষণা করতো যে, আপনাদের কোন ভয় নেই। অকুতোভয়ে প্রত্যেকে কাজ কর্ম করে যান। আর হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলা হতো আপনারা গ্রাম ও চরাঞ্চল হতে শহরে প্রত্যেকে নিজ বাড়ী ঘরে ফিরে আসুন প্রেসিডেন্ট আপনাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা করেছেন। নির্দেশিত সময়ের মধ্যে ফিরে না এলে অতঃপর বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এ আহবান আর জল্লাদ ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমার অন্তরালে ছিল নারী ধর্ষণ, অর্থ সংগ্রহ ও লুটতরাজ এবং নরহত্যার পরিকল্পনা। এ ফাঁদের মাধ্যমেই তাদের ঘৃণ্য কামনা, বাসনা ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছিল। প্রথমতঃ যে পরিবারে সুন্দরী মেয়ে ছিল তার অভিভাবককে শান্তি কমিটির পাণ্ডা বা রাজাকার দিয়ে সামরিক বাহিনীর দফতর ওয়াপদা কলোনীতে ডাকা হতো। ডাকার পূর্বেই তার বাড়িঘরের চারদিকের পলায়ন পথে রাজাকার আর দালালরা সাধারণ ভাবে ঘোরাফেরা করত যেনো কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে।

অতঃপর উপায়ান্তর না দেখে দালালদের সহায়তায় মরণপুরী ওয়াপদা কলোনীতে যেতে হতো। সেখানে নরপ্রকৃতি পশু মুনির আর সুবেদার বুকের কাছে বন্দুক আর বেয়োনেট ধরে জিজ্ঞাসা করতো-''ভারত মে তোমহাত্যারা লাড়কা গিয়া, আওর মুক্তিবাহিনীকো হামারা খবর পৌছাতা''। এমনি করে দু'এক ঘন্টা আটকিয়ে রেখে দালালদের মাধ্যমে প্রথমতঃ টাকা, তারপর মেয়ে দাবী করত।এদু'টির একটিকে পুরণ করতেই হতো। তা না হলে রাতের অন্ধকারে নরপশুদের বেয়নেটের আঘাতে মরতে হতো। এ পরিকল্পণার শিকারে যে পড়তো কেবল সেই জানতো। এ হত্যাকাণ্ড ও পাশবিকতার নীরব প্রত্যক্ষদর্শী ওয়াপদার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খালেদ, টেকনিক্যাল অফিসার জনাব সিরাজুল ইসলাম, সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার জনাব আবু তাহের ও মনসুর আলী এবং সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ওয়াহিদ উদ্দিন।

সাহেদ ও আবদুর রব খাঁন। তাঁরা গত ৪ঠা মে হতে চার দেয়ালে ঘেরা ও ওয়াপদা কলোনীর একটি দালানে বলতে গেলে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে অনুমতি নিতে হতো এবং তাদের গতিবিধির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা হতো। এ কলোনীতে নরপিচাশ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর আর পদলেহী দালালেরা পাশবিকতা ও নরহত্যার কাহিনী এমন কোন ভাষা নেই যে পুরোপুরিভাবে রূপ দেয়া যেতে পারে। আমরা কলোনীর বাইরে বাসা নিয়ে থাকবো এবং সেখান হতে এসে অফিস করার অনুমতি চেয়েছিলাম।

কিন্তু পিশাচরা এতে আমাদের উপর বিক্ষুব্ধভাবে পোষণ করল। তারপর প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। এ ঘটনার কয়েকদিন পর আমাদের স্পীডবোট ড্রাইভার আতাহারকে ধরে নিয়ে অপর দিকের দালানে ৭দিন পর্যন্ত আটকিয়ে রাখে। আতাহারের নারকীয় মৃত্যু কাহিনী বলতে গিয়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জনাব খালেদ অশ্রু সজল বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন-আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি জানতাম হয়তো আমরা কেউ বাঁচবো না। ভাবলাম অনুরোধ করলে হয়ত সাধারণ কর্মচারী হিসেবে ছেড়ে দিতে পারে।

এ বিশ্বাস নিয়ে মেজর জেহানজেব খানকে অনুরোধ করলে এ কলোনীর গোপন তথ্য ফাঁস করেছে তাদের কেউ বাদ যাবে না বলে দৃঢ়কণ্ঠে জানায় এবং সে রাতেই ওকে মেরে ফেলে। তখন আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুই ভেবেছিলাম। এমন কোন রাত ছিল না যে নরপশুরা দশ-বারোজনকে হত্যা না করেছে। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতো আর উল্লাসে ফেটে পড়তো।

কলোনীর রেস্ট হাউস ছিলো পাশবিকতার কেন্দ্রস্থল। রাতের পর রাত দোসর সুবেদার কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, কত নারী যে নিধন করেছে, কত হতভাগিনীকে উন্মাদে পর্যবসিত করেছে তার সীমা নেই। মনির হোসেন লুণ্ঠন চালিয়েছে নির্বিচারে। নিজে গ্রহণ করেছে স্বর্ণ, নগদ টাকা প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস, আর তার অনুচরদের দিয়েছে বাকী মালামাল।

এ ছাড়াও শান্তি কমিটির যোগসাজশে যাকে তাকে ধরে আটক করে, শান্তি কমিটির মাধ্যমে মোটা অঙ্কের নগদ অর্থের বিনিময়ে দু'একজনকে ছেড়ে দিয়েছে। অনেক টাকা গ্রহণ করেও তাকে হত্যা করা হয়েছে। দুলারহাটের মোহাম্মদ উল্লাহ কণ্ট্রাক্টর তাদের একজন। চরফ্যাশনের শান্তি কমিটির পাণ্ডা রাজাকার ও পুলিশ দিয়ে ওকে ধরিয়ে দেয়। এমনি করে সমগ্র মহকুমায় হিংস্র নখর বিস্তার করে পাশবিকতা আর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পটুয়াখালীর জেলখানায় বধ্যভূমি	দৈনিক বাংলা	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

পটুয়াখালীর জেলখানায় বধ্যভূমি

\ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত \

পটুয়াখালী, ১৫ই ফেব্রুয়ারী। -বর্বর পাকবাহিনী গত বছরের ২৬শে এপ্রিল পটুয়াখালী শহর কব্জা করার পর গত ৮ মাসে ঠাণ্ডা মাথায় তাদের দালালদের সহযোগিতায় হাজার হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে। প্রকাশ, নিহত ব্যক্তিদের কাউকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে কাউকে বা বিভিন্ন স্থানে গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছে। এই পাষ-রা। সম্প্রতি পটুয়াখালীর জেলার অভ্যন্তরে একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখানে বহু কবর রয়েছে। কয়েকটি কবরের মাটি খুঁড়ে কংকালের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একটি গর্তের মধ্যে ৩ থেকে ৪ জন, কোথাও বা বেশী মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে এখানে (জেলের অভ্যন্তরে) ৫০০ শত লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মৃত ব্যাক্তিদের অনেকেই যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তা কংকাল দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না। কংকালে বুলেটের ছিদ্র স্পষ্ট দেখে যায়।

মৃত ব্যাক্তিদের মধ্যে পুলিশের লোক রয়েছে, কবরের মধ্যে পোশাক দেখে বুঝা গিয়েছে। এখানেই ঘুমিয়ে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় কম্যুনিষ্ট নেতা হিরালাল দাসগুপ্ত, পাথরঘাটার সি, ও, তরুণ ব্যবসায়ী নিরঞ্জন বিশ্বাস সহ নাম না জানা দেশমাতৃকার সন্তানেরা। জানা গিয়েছে এদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হতো। জানা গিয়েছে যে এসকল মানুষকে যখন লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হতো তখন বুলেট মানুষের শরীর ভেদ কর দেওয়ালে এসে আঘাত করতো। জেল খানার অদূরে বসবাসকারী ব্যক্তিরা আমাকে জানিয়েছেন যে, যখন মানুষ গুলিকে গুলী করা হতো তখন মৃত্যুযন্ত্রনায় কাতর বহু লোকের করুণ আর্তনাদ তারা শুনতে পেতেন।

তারা আরো জানিয়েছেন যে দুপুর ২টা থেকে ৫টার মধ্যে কাজ হতো। জানা গিয়েছে যে বরিশাল জেলার আটঘর কুড়িয়ানায় পৈচাশিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সৈন্যরা পটুয়াখালীতে ফিরে এসেই তৎকালীন মেজর নাদির পারভেজের নির্দেশে ৬০/৭০ জন লোককে জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ময়মনসিংহে খান সেনাদের বর্বরতা	দৈনিক বাংলা	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

ময়মনসিংহে খান সেনাদের বর্বরতা
বাক্সভর্তি নরকংকাল
কুয়োভর্তি নরমুণ্ড
\ নিজস্ব সাংবাদদাতা \

ময়মনসিংহ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী। - ময়মনসিংহ শহর ও শহরতলী এলাকা সমেত জেলার ৭টি থানাতে পাক-হানাদার বাহিনী সর্বমোট ১২টি বধ্যভূমিতে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে। শহর ও শহরতলী এলাকার ৫টি বধ্যভুমির মধ্যে বহু নরকংকাল পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ডাকবাংলো, কেওয়াটখালী, বড় বাজার, নিউমার্কেট ও কালীবাড়ীর বধ্যভূমিতে সহস্রাধিক নরকংকালের সন্ধান পাওয়া গেছে।

গত এক সপ্তাহ পূর্বে ময়মনসিংহ শহরের সাহেব আলী রোডের একটি পুকুরে বাক্সভর্তি নরকংকাল পাওয়া গেছে। অনুমান করা হচ্ছে পাকসেনারা ময়মনসিংহ শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে লাশগুলোকে টুকরো টুকরো করে বাক্সভর্তি করে পুকুরে ডুবিয়ে রাখে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ময়মনসিংহ শহর শত্রুমুক্ত হবার অব্যহতি পর শহরের বাসিন্দারা কালীবাড়ী, বড় বাজার, নিউমার্কেটের অন্ধকার গলিতে দুটি কয়োভর্তি নরকংকাল, নরমু- উদ্ধার করে।

ময়মনসিংহ মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের এপার ওপারে অসংখ্য গর্ত ও অসংখ্য নরকংকাল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। নরকংকাল গুলোর উপরে ও পাশে পড়ে রয়েছে চট ও কাপড়ের টুকরো টুকরো অংশ। জানা গেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন ধরে নিয়ে নদী তীরে গুলী করে হত্যা করা হতো। পরে ঐ সব লাশের কতক এখানেই মাটিচাপা দিয়ে ফেলতো আর কতক লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো।

রাম অমৃতগঞ্জের ফজর ও চর আলমগীরের মফির নামক চর এলাকার দু'জন বাসিন্দা জানায়, ৮মাসব্যাপী তারা ব্রহ্মপুত্র নদে গলাকাটা ও হাত পা বাঁধা অবস্থায় অসংখ্য লাশ ভেসে যেতে দেখেছে। এছাড়া পাকসেনারা ময়মনসিংহের সরচা, ক্ষীরা ও সুতুয়া নদীতে কত অসংখ্য বাঙ্গালীকে হত্যা করে যে ভাসিয়ে দিয়েছে তার হদিস হয়তো বা কোন কালেই পাওয়া যাবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অগ্নিদগ্ধ, লুণ্ঠিত ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী	পূর্বদেশ	২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

অগ্নিদগ্ধ, লুণ্ঠিত ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী

।। গবিন্দলাল দাস।।

অজপাড়া গাঁ হলেও কাশিয়াবাড়ী একেবারে ছোট্ট গাঁ নয়। গাইবান্ধা মহকুমার পলাশবাড়ী থানার এই গাঁটাতে ছিলো সাতশো গৃহস্থবাড়ী। হিন্দু-মুসলমানের বাসস্থান। মিলেমিশে ছিলো তারা এই গাঁয়ের মাটিতে। এক সম্প্রদায়ের সাথে ছিলো আরেক সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। পার্শ্ববর্তী গাঁয়ের অবাঙ্গালীরা কত সময় কতবার চেষ্টা করেছে এখানে দাঙ্গা বাঁধাবার কিন্তু কোনবারই তাদের সে চেষ্টা সফল হতে পারেনি। এ গাঁয়ের সাতশো হিন্দু-মুসলিম গৃহস্থ এক পরিবারের ছেলে মেয়ে, ভাই-বোন মা, বাবা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে বর্বর পাকবাহিনী অত্যাচারের তান্ডব লীলা চালিয়ে পার্শ্ববর্তী থানা ঘোড়াঘাটে এসে আস্তানা গেড়ে বসে। এখান থেকে মাইল চারেকের পথ ঘোড়াঘাট। একদিন এ গাঁয়ের লোক জানতে পারলো শীঘ্রই ওই পশুগুলো আশ-পাশের গাঁগুলোতে অত্যাচারের বিভিষীকার রাজত্বের সৃষ্টি করবে। কথাটা ঠিকই ফললো। কদিনের মধ্যেই ঘোড়াঘাট সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে অত্যাচারের তান্ডবলীলা শুরু হলো।

ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে ছাই করতে লাগলো। মা, বোনদের ইজ্জত নষ্ট করতে লাগলো। মানুষ ধরে ধরে গুলী করে পাখি শিকারের মতো মারতে লাগলো। ঘরের জিনিসপত্র লুটতরাজ করে নিয়ে যেতে লাগলো। লোকগুলো দিশেহারা হয়ে পড়লো। অত্যাচারের বীভৎস হাওয়া কাশিয়াবাড়ীতেও একদিন এসে ধাক্কা দিলো। ঘোড়াঘাটে ছিলো অবাঙ্গালীদের এক কলোনী। ওই অবাঙ্গালী কলোনীর দুষ্কৃতকারী পাকবাহিনীর সাহায্য সমর্থন পেয়ে রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হানা দিতে লাগলো কাশিয়াবাড়ীর শ্যামল মাটির বুকে।

কিন্তু হারেস মিয়া বাড়ী থেকে পালায়নি। তার বিশ্বাস ছিলো পাক বাহিনী কাউকে মারবে না শান্তি কমিটির সেদিনের সভাতে সে আশ্বাসই তো বক্তারা দিয়েছিলো। কিন্তু হারেস মিয়া জানতো না ওদের কথার উপর বিশ্বাস করে বাঁচবার কারো উপায় নেই। তাই হারেস মিয়া বাঁচেনি। কাশিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হারেস মিয়াকে ছোরা দিয়ে জবেহ করেছে।

জবেহ করেছে স্কুলের শিক্ষক গোলজার মিয়াকে এবং আরো অনেককে। ধর্ষণ করেছে ফুলবানু, গিরিবালাকে। সাত মাসের গর্ভবতী ফুলবানুর উপর এক এক করে ওই পশুগুলো ধর্ষণ চালালে ফুলবানু অতিরিক্ত স্রাবে সেদিনই মারা যায়। পেট থেকে গড়িয়ে পড়ে একটি ছোট্ট মৃত শিশু। আর গিরিবালাকে ধর্ষণ করার পর হাত উঁচু করে খুঁটির সাথে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে বুক চিরে মেরে ফেলে। গ্রামটা আগুন লাগিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে নরপশুরা।

তখনো যারা পালাতে পারেনি তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ফেলে। প্রায় ৭ শত লোককে স্কুলের মাঠে নিয়ে এসে বেদম প্রহার শুরু করে। তোমহারা গাঁওমে মুক্তি ফৌজ হ্যায়। নেই স্যার। ঝুট বোলতো। তোমহারে গাঁওছে গোলিকা আওয়াজ শোনাথা। আওর হামারা পাছ ইনফরমেশন হ্যায়। এর কদিন বাদেই এ গাঁয়ে তথাকথিত শান্তি কমিটির তরফ থেকে মিটিং করতে এলো জামাতে ইসলাম আর মুসলিম লীগের লোকেরা। তারা আশ্বাস দিয়ে গেলো এ গাঁয়ের লোকদের। আপনারা পালাবেন না, কোথাও। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী

আপনাদের ধ্বংস করতে আসেনি। আপনাদের খুশী করাই তাদের কাম্য। গাঁয়ের সরল নিরীহ লোকগুলো ভাবলো কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছে।

এবার থেকে হয়তো অত্যাচারের পালা শেষ হবে। দেশে শান্তি আসবে। কিন্তু কি যে শান্তির দিন তাদের সামনে অপেক্ষা করছিল- একদিন আগেও তারা তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু যেদিন তারা বুঝলো সেদিন আর আত্মরক্ষার কোন পথই তাদের সামনে থাকলো না। ১১ই জুন ক্যাশিয়াবাড়ীর সরল লোকগুলো দেখলো পিল পিল করে পায়ে হেঁটে কয়েকশ পাক সৈন্য দ্রুত তাদের গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে।

পালাও, পালাও, যে যেখানে পারো পালাও। ওই যে দূরে দস্যু পাক বাহিনী ছুটে আসছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামটায়। মেয়ে পুরুষ বুড়ো জোয়ান যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। তাড়া খাওয়া হরিণের মতো, অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে সবাই গাঁয়ের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ওপারে পালাতে থাকে। আবার অনেকে ধান আর পাটের ক্ষেতে শুয়ে লুকিয়ে পড়ে। শিশুরা কান্না থামাতে মাকে পাগল হতে হয়। সবাই আত্মগোপনে ব্যস্ত।

বাড়ী বাড়ী ঢুকে গরু-ছাগল চাল-ডাল থেকে শুরু করে সামনে যা পেত তাই ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতো। প্রতিরোধের সর্বপ্রকার উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও এই হিংস্র পশুগুলোকে কোন বাধা দেয়ার সাহস পায়নি কাশিয়াবাড়ীর অসহায় লোকগুলো। অবাঙ্গালীদের এই ধরনের অত্যাচারে ভীত হয়ে পড়লো গাঁয়ের হিন্দুরা। তারা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলো। কারণ তাদের উপরেই ওই দস্যুদের অত্যাচারের মাত্রাটা ছিলো বেশী। ঠিক এমনি সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন দারাজ কবিরাজ এবং গাঁয়ের অন্যান্য মাতববর। তোমরা যাবে না এখান থেকে। আমাদের ত্যাগ করে চলে যেয়ো না তোমরা। আমাদের জান দিয়ে হলেও তোমাদের আমরা রক্ষা করবো।

থমকে দাঁড়িয়েছিলো হিন্দুরা। তাই তো, এদের ছেড়ে আমরা কেমন করে যাই। এরা কোন দিন তো তাদের ত্যাগ করেনি। কোন দিন তো বেঈমানী করেনি। তবে কেনো এই দুর্দিনে তাদের ছেড়ে তারা পালাবে। যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো হিন্দুরা। গাঁয়ের মাতব্বরদের সিদ্ধান্ত মতে হিন্দুদের মূল্যবান জিনিসপত্র মুসলমানদের ঘরে ঘরে এনে জমা রাখা হলো যাতে অবাঙ্গালীদের কোপদৃষ্টি থেকে জিনিসপত্রগুলোকে বাঁচানো যায়। সবাই মিলে অবাঙ্গালী কলোনীর সেই দুষ্কৃতকারীদের হামলাকে প্রতিরোধ করবার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুললো।

অতঃপর আরেক দিন সেই দুষ্কৃতকারীরা এ-গাঁয়ে হামলা চালাতে আসতেই চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেললো গাঁয়ের লোকেরা। তোমরা আর এভাবে আমাদের জান-মাল লুটতরাজ করতে পারবে না। আমরা তোমাদের ক্ষতি করিনি। আমাদের তোমরা বাঁচতে দাও। ফুঁসে উঠেছিলো সেই অবাঙ্গালী দুষ্কৃতকারীরা। কিন্তু সেদিন কিছু একটা করবার সাহস তারা পায়নি। কারণ সেদিন যার যা ছিলো তা-ই নিয়েই তৈরী হয়েছিলো গাঁয়ের লোকগুলো। কিন্তু সেদিন এ-গাঁয়ের লোকরা ভাবতেও পারেনি যে, ওই দুষ্কৃতিকারীরা তাদের জীবনের সর্বনাশ ঘটাবার জন্য কি জঘন্য ষড়যন্ত্র করে বসেছে।------(অসম্পূর্ণ)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভৈরবের হত্যাকাণ্ড	দৈনিক বাংলা	২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

ভৈরবে একদিনেই ৪শ' লোককে গুলি করা হয়েছে

\ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত \

ভৈরব, ১৯শে ফেব্রুয়ারী- ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ৯ মাসে বর্বর পাকবাহিনীর দস্যুরা বাংলাদেশের অন্যতম নদী বন্দর ভৈরবে ত্রাস এবং বিভিষীকার রাজত্ব চালিয়েছিল। হানাদাররা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, ভৈরব এবং আশুগঞ্জ এলাকার শত শত মাকে করেছে বিধবা, সন্তানহারা অনাথ, আবার অনেক পিতাকে করেছে স্ত্রীহারা, সন্তানহারা।

গত ১৫ই এপ্রিল পাকবাহিনীর ছত্রী সেনারা ভৈরবের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় চারশত নিরপরাধ লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। ঐ দিন ইব্রাহিমপুরের আলগড়ার মাঠেই ২৫০ জন লোককে হত্যা করেছে।

এছাড়া ভৈরব ব্রীজের কাছে রেললাইনের উপর দাঁড় করিয়ে পঁচিশ জনকে গুলি করে মেরেছে। মেজর ইফতেখার ধরে নিয়েছে ভৈরবের ব্যবসায়ী, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মতিউর রহমানকে, ধরে নিয়েছে ভৈরব পৌরসভার সহসভাপতি মসলন্দ আলীকে এবং ভৈরব ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব হাফিজউদ্দিন মিয়াকে।

বাঁচাতে পারেনি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীমহোনবাঁশি, কলেজের ছাত্র লোকমান, স্কুলের ছাত্র সেলিম, নীরব সমাজকর্মী সাত্তার, পথের ভিখারী আওয়াল, এবং মুজিব বাহিনীর তরুণ যোদ্ধা ফরহাদ আলী, আখতার মিয়াকে দস্যু জল্লাদ বাহিনীর হাত থেকে। জল্লাদ ইয়াহিয়ার খান সেনারা ভৈরব ব্রীজের নিকট চলন্ত রেলগাড়ী থামিয়ে যাত্রীদের ধরে নিয়ে যায় নিকটস্থ রেল কলোনীতে। সেখানে যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে বেয়নেটের আঘাতে তাদের বুক চিরে হত্যা করে মেঘনার প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

গত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে বর্বর মেজর ইফতেখার বাজিতপুর এবং নিকলী থাকার প্রায় দেড়শত লোককে ধরে এনে তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৩৫ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং বাকী লোকদের আশুগঞ্জের মেঘনার চরে গুলি করে হত্যা করে। গত ১৫ই এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত একটানা সাতদিন ধরে বর্বর পাক বাহিনীর দস্যুরা ভৈরবের রাণীর বাজার, চক বাজার, মরিচ পট্টি, কলেজ রোড, মসজিদ রোড, মিউনিসিপ্যাল অফিস রোড, রসুন বাজার, মুড়ি পট্টি, মিষ্টি পট্টি, বাতাসা পট্টি, সিনেমা রোড বলতে গেলে বন্দরের সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে কোটি কোটি টাকার মালসহ শত শত গোলা-গুদাম এবং দালানকোঠা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভৈরব বাজার এখন সম্পূর্ণ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফেনীতে পাক বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী	দৈনিক আজাদ	২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞই ওদের কাজ ছিল

ফেনীতে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ফেনী, ২২শে ফেব্রুয়ারী- লক্ষাধিক শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও তথায় কর্মচাঞ্চল্য শুরু হওয়ার পর জেলার ক্ষয়ক্ষতি ও গণহত্যার আরও চাঞ্চল্যকর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশ, ফেনী মহকুমার ১ লক্ষ ২০ হাজার শরণার্থীর মধ্যে ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ফিরে এসেছে। এদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার ও দখলকৃত সম্পদ দেয়ার জন্য গণপরিষদ সদস্যের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিগুলো দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। জানা গেছে যে, গত ২৩শে এপ্রিল পাক হানাদাররা ফেনী মহকুমায় প্রবেশকালে সর্বপ্রথম দরবেশ আব্দুল কাদেরকে গুলী করে হত্যা করে। তারা ফেনী শহরের প্রবেশকালে দেওয়ানগঞ্জ, আমতলী ও শহরতলীতে কয়েকশত লোককে হত্যা করেছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেওয়ানগঞ্জের ট্রাঙ্করোডের পার্শ্বে বহু নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেয়া যায়। শহর উপকণ্ঠে একটি সরকারী ভবন সংলগ্ন বধ্যভূমিতে শতশত দেশপ্রেমিককে ধরে এনে হত্যা করা হয়।

একই সময়ে বর্বরেরা মার্চেন্ট সমিতির কর্মকর্তা আব্দুস সাত্তারকে অপর ৮ জনের সঙ্গে বেঁধে গুলী করে হত্যা করে। ফেণী কলেজের পার্শ্ববর্তী একটি গোপন বধ্যভূমিতে বাহির থেকে বহু লোক ধরে এনে হত্যা করা হয়েছে। এ দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী একজন রেলকর্মীর কাছ থেকে এ সংবাদ জানা গেছে। এছাড়া ধুমঘাট রেলওয়ে পুলের পার্শ্বে বৃদ্ধ যুবক ও অগণিত বালককে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে। জনৈক উর্দুভাষী ষ্টেশনের অদূরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনটি বয়স্কা মেয়েসহ আশ্রয় নিয়েছেল। হানাদারেরা তাকেও রেহাই দেয়নি। পরিবারের সকলকে হত্যা করে আর মেয়ে তিনটিকে নিয়ে যায়। পরে তাদের লাশ পাওয়া যায়। পাক বর্বরেরা ধুম এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ ৩ শতাধিক লোককে হত্যা করে আর ১০২ টি ঘর ভস্মীভূত করে। মে মাসে ফেনী রেলষ্টেশনের পিছনের ডোবায় বহু অফিসারকে হত্যা করে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

পাক হানাদারদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল কুখ্যাত মহকুমা প্রশাসক বেলাল আহমদ খান। ফেনীতে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনায় ও লুণ্ঠনকাজে নেতৃত্ব দিয়েছিল সে। ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে সে বহু বিশিষ্ট লোককে হত্যা আর তাদের বাড়ীঘর বিধ্বস্ত করতে সহায়তা করেছে। রাজাকার ও বদর বাহিনীর শয়তানেরাও বহু বিশিষ্ট লোককে হত্যা করেছে। ফেনী এলাকার খালবিলে আর নদীতে মাছ ধরার সময় এখনও বহু নরকঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বগুড়ার 'মান্নান ভাই' এবং আরো কয়েকজন তরুণের বিবরণ	সংবাদ	২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

বগুড়ার পরিচিত মুখ 'মান্নান ভাই'

আজ একুশের রক্তপলাশে আরেক পুষ্পস্তবক

মান্নান ভাই কোথায়? বগুড়ার সবার মনেই একটি প্রশ্ন। বগুড়ার আনাচে-কানাচে সবাই জানেন এই ভাইটিকে। বয়স বেশী নয়। খুব বেশী হলে বিশ-বাইশ বছর হয়েছে। মান্নান ভাই ছিলেন খুবই ব্যস্ত, ঘুরতেন কাজের নেশায়। তাঁর কাজ ছিল ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। শ্রমিক আর কৃষকদের মাঝে নিবিড় করে সম্পর্ক স্থাপন করা। বগুড়া জেলার পূর্বে চন্দনবাইসা আর পশ্চিমে শান্তাহার, পাঁচবিবির প্রায় প্রতিটি ছাত্রই তাঁর পরিচিত। অপরদিকে শেরপুর থেকে বগুড়ায় ঐতিহাসিক মহাস্থান আর গোবিন্দগঞ্জ পর্যন্ত তাঁর নাম ছাত্রদের মাঝে নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে আছে। স্কুল জীবনেই তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বগুড়া সেন্ট্রাল হাইস্কুল থেকে এস,এস,সি পাশ করার পর তিনি বগুড়া আযিযুল হক কলেজে ভর্তি হন। তিনি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাশ করে একই কলেজেই বি,এসসিতে ভর্তি হন। জনাব আব্দুল মান্নান প্রথমে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বগুড়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক। পরে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি। মান্নান ভাই-এর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। বর্বর পাক দস্যুরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাঁকে। ১১ই নভেম্বর তারিখে পাক দস্যুরা তাঁকে হাত বেঁধে ধরে নিয়ে যায়। শুধু তাঁকেই নয়, বগুড়া শহরের সুতরাপুর থেকে আরো তিরজনকে ঘেরাও করে পাক বাহিনী ধরে ফেলে। মান্নান ভাই সেদিন তাঁর ভাইয়ের সঙ্গেই ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে নিষ্ঠুর আল-বদর বাহিনী পাক দস্যুদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে। সেদিনের সূর্য ওঠার বহু পূর্বেই রাতের অন্ধকারে জল্লাদরা তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলে। এরপরই মান্নান ভাইয়ের সামনে হাজির হয়েছিল একজন নরঘাতক। হাত বেঁধে ফেলল মান্নান ভাইয়ের। ছোট ভাই হান্নানও রেহাই পেল না। তার হাতও বাঁধা হলো। ট্রাক বোঝাই করে একসঙ্গে চৌদ্দজন বাংলার দামাল ছেলেকে ছিনিয়ে নিল ওরা। মায়ের বুক খালি করে মানুষ বোঝাই ট্রাকটি চলে গেল বহুদূরে। তখনো সান্ত্বনা ছিল হয়তো তারা ফিরে আসবে। কিন্তু মিথ্যে সান্ত্বনায় কি আর মনকে প্রবোধ দেয়া যায়। খবর এলো শহর থেকে দূরে 'রাণীর হাট' নামক জায়গার কাছে চৌদ্দ জনকেই এক লাইন করে হাত চোখ বেঁধে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। খবর শুনে ছুটে গিয়েছিলেন মান্নান ভাইয়ের আত্মীয়স্বজন। তাঁরা সবাই সেদিন জল্লাদদের নিষ্ঠুরতা অবাক হয়ে স্বচক্ষে দেখেছেন। একটি দেহের উপর আর একটি দেহ জড়িয়ে ঠিক একটি লাইন হয়েই পড়ে আছে। পড়েছিল মান্নান আর হান্নান। দুই ভাই যেন গলাগলি ধরে শুয়ে আছেন আর বারটি ভাইয়ের সঙ্গে। পাক দস্যুরা একটি লাশও আত্মীয়-স্বজনদের পছন্দমত জায়গায় কবর দিতে দেয় নাই। বাধ্য হয়েই একসঙ্গে একস্থানে সকলকে কবর দেয়া হয়েছে।

বগুড়া জেলার এই ছাত্র সংগঠক আইয়ুব আমলের কালো দশকে ছাত্র আন্দেলনের নেতৃত্ব দেয়ায় কারাগারে গিয়েছেন। তিনি ছাত্র আন্দেলনে জড়িত থাকায় বহুবার 'ওয়ারেন্ট' মাথায় নিয়ে আত্মগোপন করেছেন। এবারের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় তার উপর নেমে এসেছিল মৃত্যুর পরোয়ানা। আত্মগোপন করে তিনি এবার অক্টোবর মাস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কিন্তু ১১ই নভেম্বর দালালদের সহযোগিতার ধরা পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ধরা পড়েছিল প্রতিবেশী মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম। সবার সঙ্গে মান্নান ভাই চিরতরে ঘুমিয়ে আছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মনুব্রীজে প্রকাশ্য গণহত্যা	দৈনিক আজাদ	২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মৌলভীবাজার মনুব্রীজে প্রকাশ্যে গণহত্যা
জল্লাদরা **শেরপুর জেটিতে দুই হাজার**
লোককে মেরেছে

মৌলভীবাজার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মৌলভীবাজার মহকুমার বিভিন্নস্থানে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে সেসব বধ্যভুমি ক্রমে আবিষ্কার করা হচ্ছে।

এ ধরনের একটি বধ্যভূমি শেরপুর জেটি থেকে আবিষ্কৃত হয়। তথায় প্রায় দুই হাজার লোককে হত্যা করা হয় এবং তাদের লাশ কুশিয়ারা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

শেরপুরে হানাদার বাহিনীর একটি সরবরাহ কেন্দ্র ছিলো। সেখান থেকে তারা নৌ ও সড়ক পথে সমগ্র জেলায় হামলা চালিয়েছে। শেরপুরে তিন-তিনবার মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম হালোরখুনা, শেরপুর, ব্রাþণগ্রাম, কলরগাঁও, আয়েনপুর, নতুনবস্তি, মোবারকপুর ও কাসুরপুর জনশূন্য হয়ে পড়ে।

শেরপুরে পাক বাহিনীর সুন্দর ঘাঁটি ছিলো।এমনকি তথায় নৌবাহিনীও ছিলো। এখান থেকে তারা নরহত্যাসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো। তারা নৌ জাহাজ ও গানবোট ব্যবহার করতো এবং তা থেকে কূলবর্তী গ্রামে গোলাবর্ষণ করতো। তারা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে বিশেষতঃ মহিলাদের ধরে তাদের অন্যান্য ক্যাম্পে নিয়ে যেতো।

প্রকাশ্য হত্যা

এছাড়া গত ১৪ই মে হানাদার সৈন্যরা মৌলবীবাজারে মনুব্রীজের উপর বিভিন্ন লোককে ধরে এনে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় অধিবাসীরা এ হত্যাকাণ্ডের নারকীয়তা এখনো ভুলতে পারছে না। হানাদার জল্লাদ বাহিনী উল্লেখিত দিনে সমস্ত থানাবাসীকে উক্ত ব্রীজে সতবেত হবার নির্দেশ দেয়।

ভয়ে আতঙ্কিত প্রায় এক হাজার লোক তথায় উপস্থিত হলে তাদের সামনে হিলারপুরবাসী ময়না মিয়া, কলমদার মিয়া ও উস্তার হাজীকে আনা হয় এবং ব্রীজের উপর শুইয়ে গুলী করে হত্যা করা হয় এবং পরে তাদের পানিতে ফেলে দেয়া হয়। ময়না মিয়া প্রাণে বেঁচে গেলে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে তথায় হত্যা করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মৌলভীবাজারে আরো বধ্যভূমির সন্ধান	সংবাদ	২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মৌলভীবাজারে আরো অনেক বধ্যভূমির
সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে

মৌলভীবাজার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী (এনা)- শেরপুর জেটিতে হানাদার বাহিনীর বর্বরতার সাক্ষী এমন একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে প্রায় ১ হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। তারপর মৃতদেহগুলো কুশিয়ারা নদীতে ছুড়ে ফেলা হয়।

বরুরা চা বাগানের পশ্চিমে আচেরাতে আর একটি বধ্যভূমির খবর পাওয়া গেছে। জনসাধারণের সহায়তায় পুলিশ এটি আবিষ্কার করেছে। শ্রীমঙ্গল কলেজের পূর্বদিকে এই বধ্যভূমিটি ছিল। এখানে ৪৩ জন চা বাগান শ্রমিককে হত্যা করা হয়। মৃতদেহগুলো একসাথে একটি গর্তে কবর দেয়া হয়।

সাধুবাবাতেও তাঁরা আর একটি বধ্যভূমি আবিষ্কার করেছেন। এখানে জল্লাদরা ৫০ জন হতভাগ্যকে হত্যা করে। ভাগ্যগুণে চারজন রক্ষা পায়। তারা মরেনি কিন্তু আহত হয়েছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনা তাঁরাই বর্ণনা করেন।

আর একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে কুলাউড়া রেল ক্রসিংএ। এখানে একটি কবরে চল্লিশটি কংকাল পাওয়া গেছে। জল্লাদদের আর একটি বধ্যভূমি ছিল মৌলভীবাজার কোর্ট। এখানে ৩৫ জনকে হত্যা করে জল্লাদরা। তারপর মৃতদেহগুলো গর্তে কবর দেয়া হয়। বারবাড়ীতে আর একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌলভীবাজার শহর থেকে দুরত্ব আধা মাইল। এখানে যে কত লোককে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গোপালপুর সুগার মিলে গণহত্যা	দৈনিক বাংলা	২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

গোপালপুর সুগার মিলে গণহত্যাঃ আজিম সাহেব বাঁচেননি
তিনশ কর্মচারীকেও বাঁচাতে পারেননি
**\ সাখাওয়াত আলী খান প্রদত্ত **

''আগে আমাকে গুলি কর। আমাকে গুলি না করে আমার লোকদের তোমরা গুলি করতে পারবে না।'' বর্বর হানাদার পাক বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে কোন জননেতার উক্তি নয় এটা। এই উক্তি একজন দেশপ্রেমিক নির্ভীক বাঙ্গালী মিল প্রশাসকের। এই প্রশাসক ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল আজিম। নাটোরের গোপালপুর সুগার মিলে আরো প্রায় তিন শতাধিক হতভাগ্য মানুয়ের সঙ্গে নির্দয় হানাদার বাহিনী গুলিবিদ্ধ করেছিল এঁকেও।

কথা বলছিলাম মিসেস আজিমের সঙ্গে। সুরুচিশীলা, তিন সন্তানের জননী মিসেস আজিমকে খুব রোগা দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, প্রায় দশ মাস হয়ে গেছে সে নেই- এখন স্বপ্নের মতো মনে হয় সব। দুঃখ করবো কি বলুন শুধু ওকেই তো মারেনি।''

তিনশত মানুষকে- নিরপরাধ নিরস্ত্র তিনশত মানুষকে ঠিক পাশের কলোনীতে যাদের স্ত্রী-সন্তান আর আত্মীয়স্বজন রয়েছে কেউ কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে দেখেছেও- এক সময়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলী করে মেরেছে। তারপর তাদের লাশ ফেলে দিয়েছে পাশের পুকুরে।

মিসেস আজিম আরো জানালেন, হানাদার বাহিনী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ঢুকেছিল গোপালপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে। তাদের দোসর ছিল স্থানীয় অবাঙ্গালীরা। প্রথম দলটি ঢুকেছিল মূল মিলের অভ্যন্তরে, অপর দলটি একই সঙ্গে প্রবেশ করে মিলের পাশের কলোনীতে। প্রথম দলটি মিলে ঢুকে মিলের প্রশাসক জনাব আজিম, প্রশাসনিক অফিসার জনাব শহিদুল্লা, একাউন্ট্যান্ট জনাব সাইফুদ্দীন আহমদ, ইক্ষু সুপারিনটেনডেন্ট জনাব গুলজার হোসেন তালুকদার,সহকারী একাউন্ট্যান্ট জনাব মান্নান ভূঁইয়া, কৃষি অফিসার জনাব কিবরিয়া, সহকারী ইক্ষু উন্নয়ন অফিসার জনাব হাসেম ও ষ্টেনোগ্রাফার জনাব রউফ সহ তিনশরও বেশী কর্মচারী ও শ্রমিককে মিলের পুকুরের পাশে লাইন করে দাঁড় করায়। তারপর তাদের গুলী করে হত্যা করে। মিসেস আজিম জানালেন, গোপালপুরে এই হত্যালীলার সঙ্গে যে সমস্ত পাক সামরিক অফিসার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তারা হচ্ছে, মেজর শেরওয়ানী, ক্যাপ্টেন মোখতার ও মেজর ইউলিয়াম।

এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন থাকতো নাটোরে আর তৃতীয়জন থাকতো ঈশ্বরদীতে। মিলের অবাঙ্গালী কর্মবারীদের যোগসাজশের কথা বলতে গিয়ে মিসেস আজিম জানালেন, ২৫শে মার্চের কালো রাতের পর থেকেই এখানে অবাঙ্গালীদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা হিন্দুদের আর দেশপ্রেমিক অধিকার সচেতন মানুষের বাড়ীঘর দখল করতো, লুটপাট করতো বিষয় সম্পত্তি, কিন্তু কিছু বলার উপায় ছিল না, কারণ তখন তারাই সর্বেসর্বা। কিছু বলতে গেলে বলতো ''ইয়েচীজ কো উপর হামলোগকা হক হ্যায়।''

মিসেস আজিম বলেন, এসমস্ত যোগসাজশকারী যা করেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হানাদার সৈন্যরা গুলী করে তিনশ' বাঙ্গালীকে হত্যা করার পর মিল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এসব দালাল মৃত জনদের আত্মীয় স্বজনদের লাশের কাছে যেতে দেয়নি। পুকুরে এসব হতভাগ্যের লাশ পচে যখন দুর্গন্ধ ছুটছিল তখন

তারা গর্ত করে সেগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে রাখে। এর আগে লাশের মধ্যে থেকেও ঘড়ি, আংটি, কলম ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুটপাট করে।

এছাড়া এই পশুরা বাঙ্গালীদের 'মিলিটারী ফের আয়েগা' বলে বার বার ভয় দেখায়। ফলে মিল অঞ্চলের বাঙ্গালীরা সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে কেবল প্রাণ হাতে করে যেতে বাধ্য হয়। মিসেস আজিমও তার এক ছোট ভাই ও সন্তানদের সঙ্গে করে মিল এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন গ্রামে। মিসেস আজিম জানালেন, আজিম সাহেব গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের মিলের গাড়ী ব্যবহার করতে দিয়েছেন, সাহায্য করতে চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রথম অবস্থায় হানাদার বাহিনীর মেজর আসলাম গোপালপুরে নিহত হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে।

তাই মিলে হত্যাকান্ড চালাবার আগে হানাদাররা জানতে চেয়েছিল মেজর আসলামকে কে মেরেছে। মিলের নিরীহ কর্মচারীদের বাঁচাবার আশায় রিজার্ভ বাহিনীর সাবেক লেফটেন্যান্ট আজিম বলেছিলেন, আমি মেরেছি, আমাকে ধরে নিয়ে চল তোমরা, কিন্তু মিলের নিরীহ কর্মচারীদের মেরো না। কিন্তু দয়া বলে কোন বস্তু ছিল না পশুদের অন্তরে। তাই মেশিনগান চালিয়ে পাইকারী হত্যা করে পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তারা গোপালপুরের বুকে। যে পুকুরটিতে নরপশুরা ফেলে দিয়েছিল হতভাগ্য মানুষের লাশ, গোপালপুরের সহানুভূতিশীল জনগণ সে পুকুরটির নাম দিয়েছিল 'শহীদ সাগর'।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতার বেদীমূলে পিতা-পুত্র	সংবাদ	২ মার্চ, ১৯৭২

স্বাধীনতার বেদীমূলে পিতা-পুত্র
।। আবুল কাসেম ।।

পিতার বহু স্বপ্ন লুকায়িত ছিল তার তৃতীয় পুত্র আয়নাল হককে কেন্দ্র করে। শৈশব থেকে মায়ের মায়া মমতা থেকে ছিল সে পুরোপুরি বঞ্চিত। তাই বাবাকে সেই স্নেহ পূরণের জন্য এই মাতৃহীন সন্তানের সব আব্দারই নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। এমনি করে ক্রমশঃ কেটে যায় আয়নালের ছাত্র জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে।

পিতার মা মরা ছেলের শেষ আব্দারে তার বিয়ে হলো ফেব্রুয়ারীতে। পাবনা দখলের পর পাকসেনারা অগ্রসর হলো দাসুড়িয়ার দিকে। সেটা কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদী ও রাজশাহীর রাস্তায় সংযোগস্থল। কয়েকজন ছেলের সাথে আয়নালও অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে ছিল দাসুড়িয়াতে এক গোপন জায়গায় সেই সময়। ওদের মধ্যে একজন হানাদারদের হত্যা করার আক্রোশ সম্বরণ না করতে পেরে গুলী ছুঁড়লো ভুল করে। নিমেষেই বিরাট বহর দেখে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হলো। যেদিকে তারা পা বাড়ায় সেদিকেই গুলী। সমস্ত দাসুড়িয়া ঘিরে ফেললো সেনারা। বের করলো লুকায়িত মুক্তি সংগ্রামীদের।

৯ই এপ্রিলের ঘটনা। এ অমানুষিক অত্যাচারের ইতিহাস প্রকাশ করা যায় না। এসিড ঢেলে দিল তাদের চোখে মুখে তারপর বেয়োনেটের অত্যাচারে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিল তাদের। দস্যুদের কার্যকলাপ দেখলেন অদূরে দাঁড়িয়ে এক বুড়ি- যার থাকবার শেষ সম্বল কুঁড়ে ঘরখানা জ্বালিয়েছে, কিন্তু তাকে হয়ত মারেনি খুবই বৃদ্ধা বলে।

পিতা পরের দিন দেখতে পেলেন তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার মানিক আয়নালের দেহ যা কোন রকমে পরের ভোররাতে চুরি করে সরিয়ে আনা হয়েছিল। এত বড় আঘাত পিতা সইবেন কেমন করে। তিনি হতবাক হয়ে পড়লেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন ''তুমিই এর বিচার করো''। খোদাপাক বোধহয় নিজ কানে শুনেছিলেন তাঁর এই আকুল আর্তনাদ। তাঁদের আশা পূর্ণ হয়েছে। এরূপ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে দেশ আজ স্বাধীন, কিন্তু দুঃখ হয় এই বুড়ো বাবাও দেখে যেতে পারেননি তাঁর সাধের স্বপ্ন।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। ইতিমধ্যেই তফিজউদ্দীন আহমদের ছোট ভাই মহিউদ্দীন, ঈশ্বরদী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী ও তাঁর ছেলে পরিবার পরিজন ছেড়ে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে পাড়ি দিয়েছেন। সেখানে গিয়ে প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার শত্রুউৎখাতের সংগ্রাম শুরু করার জন্য।

প্রায় সাড়ে চারমাস এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকার পর তাঁর পক্ষে আর আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ভাইদের পরিবার-পরিজন নিজের ছেলে মেয়ে, জামাই ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ৪০ জনের খোরাকের চিন্তায় তিনি শহরের দিকে ছুটলেন। ইতিমধ্যে কুচক্রী ইয়াহিয়া জোর গলায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে জেনে শহীদ আয়নালের বাবা মনের মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চারও পেয়েছেন। শহরেও দু'এক বার গেলেন। ঈশ্বরদীর অবাঙ্গালী ও দালালরা দেখে ফেললো তাঁকে। এই সময় রাত কাটাতেন তিনি তার দাসুড়িয়াতে অবস্থিত ফার্মের মধ্যকার চাকরের একটি কুটিরে। এটাকেই তিনি সব থেকে নিরাপদস্থান ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁবেদার ও অবাঙ্গালীরা মিলে ঘিরে ফেললো তাঁর এই আশ্রয় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বড় শিকার দাসুড়িয়া আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও কর্মীকে শেষ করতে। ১৪ই জুনের মাঝরাতে তাদের অজস্র গুলীর আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। বিলীন হয়ে গেল একটি সুখী বাঙ্গালী পরিবার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি	দৈনিক আজাদ	৮ মার্চ, ১৯৭২

বারো বছরের কচি কিশোরী কিংবা পঞ্চাশের বৃদ্ধা
কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি
\ আবুল হোসেন মীর \

'উধার আটঠো লাশ হ্যায়। কুত্তাছে খিলানা হ্যায়, খিলাদো। আউর না কিসিকো দেনা হ্যায় দে দো। যাও, যো তোমহারা মর্জি করো।''

পাক জল্লাদদের কথাগুলো অবিকল মনে রেখেছেন আমির হোসেন। ঠিক তেমনি মুখ বিকৃত করে শব্দগুলো শোনালেন আমাদের। ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছেড়ে আমরা পশ্চিম দিকের মনোহরপুর গ্রামে গিয়ে উঠতেই দেখা হয়েছিল। আমির হোসেনের সাথে। আমির হোসেন মুক্তি বাহিনীকে গোপনে তথ্য সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পাক বাহিনীর হাতে ধরাও পড়েন। দীর্ঘ চারমাস হানাদারদের নরকে কাটাবার পর সৌভাগ্যক্রমে ছাড়া পেয়ে যান। ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফেরার পথে গাঁয়ের বিসু মণ্ডলের বাড়ীর কাছে দেখা হয় একদল দস্যুর সাথে। সেই দস্যুদের একজন আমির হোসেনকে শোনায় উপরোক্ত কথাগুলো। তিনি ক পা এগুতেই সত্যি সত্যিই দেখতে পান হাত পা বাঁধা উলঙ্গ অবস্থায় আটটি মরদেহ। তাদের কারো কারো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা। বিমূঢ় আমির হোসেন দেয়ালটা ভেঙ্গে লাশগুলো মাটিচাপা দিয়ে চলে যান আপন ঘরের দিকে। নীল বেদনার্ত হৃদয়ে।

আমির হোসেনের কাছ থেকে জানা গেল ক্যান্টনমেন্টের অসংখ্য হত্যাযজ্ঞের কাহিনী। তিনি বললেন, সেভেন ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের ও, সি লেঃ কর্নেল আব্দুল হাইয়ের লাশ হত্যার দু'দিন পর আনা হয় সি,এম,এইচ-এ। তাঁর লাশ পাওয়া যায় গ্যারিশন সিনেমা হল সংলগ্ন পশ্চিম দিকের তালতলায়। তাঁর তলপেটে সতেরটি বুলেটের চিহ্ন ছিল। এই কোম্পানীর কোয়ার্টার মাষ্টার ক্যাপ্টেন শেখের ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটেছিল।

আমির হোসেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আরো জানালেন, সি,এম,এইচ-এর নার্সিং ষ্টাফ হাবিলদার আব্দুল খালেক এবং তার সঙ্গী ফজর আলী ও একজন সুবেদার এম, আই রুমে ঔষধ আনতে যাওয়ার পথে রানওয়ের নিকটবর্তী দরজার কাছে ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের সিপাইরা তাদেরকে গুলী করে হত্যা করে। এছাড়া সি,এম,এইচ-এর মসজিদের ইমামকেও তারা গুলী করে হত্যা করে। হত্যা করার আগে দস্যুরা ইমাম সাহেবকে কলেমা পড় বললে তিনি শ্রদ্ধার সাথে পবিত্র কলেমা আবৃত্তি করে শোনান। কিন্তু জনৈক দস্যু মুখ বিকৃত করে বলে, শালা গাদ্দার এক মাওলানা কলেমা ভী পড়নে নেহী স্যাকতা।

আমির হোসেন জল্লাদদের নরহত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে বললেন, বাঙ্গালীদের ধরে এনে প্রথমে আই, এস, আই, অতঃপর সেখান থেকে ৬১৪ এম, আই, ইউ এবং পরে ৪০৯ জি, এইচ, কিউ-এ পাঠিয়ে দেয়া হতো। ৬১৪ এফ, আই, ইউতেই নাকি জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। এম, ই, এসের জনৈক কর্মচারী হারেছ উদ্দীন জানান যে, ৩০শে মার্চ তিনি গ্রেফতার হন। ১৪ দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর পাক সেনাবাহিনীর জল্লাদেরা তার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়

হারেছ উদ্দীনের কাছ থেকে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত তৎকালীন সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী কর্মচারীদের পরিবারের মহিলাদের একটি বন্দী শিবিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে জানিয়েছে যে, ৫৫ নং ফিল্ড রেজিমেন্ট

আর্টিলারীর ফ্যামিলী কোয়ার্টারের বারো থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের দু'শ পঁচানব্বই জন মেয়েকে ঐ সময় আটক করে রেখে প্রতিদিন রাতে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হতো। তিনি আরো জানান যে, তাদের সেলটি কিছুটা দূরে হলেও প্রতিদিন রাতেই ভেসে আসতো মেয়েদের করুণ আর্তনাদ। সেই সাথে বর্বর পাক সেনাদের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি বাতাসের সঙ্গে মিশে এক মর্মবিদারী দৃশ্যের সৃষ্টি করতো।

প্রতিদিন বিকেলে জনৈক সুবেদার এসে এইসব মেয়েরা কে কোথায় যাবে তারই একটি তালিকা প্রস্তুত করে যেতো। অতঃপর সন্ধ্যা হলেই উক্ত লিষ্ট মোতাবেক নির্ধারিত মেয়েটিকে পাঠানো হতো নির্ধারিত স্থানে। কখনো কখনো আপন খেয়াল খুশীতে বাইরে নিয়ে এসে পাহারারত কুকুরের দল উপর্যুপরি নারী ধর্ষণে লিপ্ত হতো। একদিন একটি মেয়েকে এইভাবে পরপর চৌদ্দজন নির্যাতন চালালে মেয়েটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তবুও দুর্বৃত্তরা তাকে রেহাই দেয়নি। অচৈতন্য অবস্থায়ই নিজেদের লালসা চরিতার্থ করেছে। মেয়েটির পুনরায় জ্ঞান ফিরে আসতে নাকি ৩৬ ঘন্টা সময় লেগেছিল। জনাব হারেছ বলেন, চৌদ্দ দিন পর তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর ঐ মহিলা বন্দী শিবিরের বাসিন্দাদের পরিণতি সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারেন না।

অপর একটি মহিলা শিবিরের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর জেলখানা থেকে পুনরায় তাকে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে আসা হলে সেথায় এফ, আই, ইউ-এ তার উপর নতুনভাবে নির্যাতন করা হয়। সেখানে তিনি ১২ নং এফ, আই, ইউ ব্যারাকের ১০ নং রুমে বহু মহিলাকে বন্দী অবস্থায় দেখতে পান। প্রতিরাতে ঐ ঘর থেকে তাদের চিৎকার শুনা যেতো। এবং একই উপায়ে তারা পাশবিক নির্যাতন চালাতো। এইসব মেয়েদের যৌবন সাধারণতঃ অফিসাররাই উপভোগ করতো। এ সম্বন্ধে হারেছ উদ্দীন আরো বলেন বন্দীশিবিরের মহিলাদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করে রাখা হতো। প্রথম ভাগে ছিল যুবতী, দ্বিতীয় ভাগে ছিল মধ্যবয়সী এবং তৃতীয় ভাগে কয়েক সন্তানের মাতা। তিনি স্কুল কলেজের সুন্দরী মেয়েদের প্লেনে করে ঢাকা পাঠাতেও দেখেছেন।

হারেছ উদ্দীনের বর্ণনা থেকে আরো অনেক তথ্য জানা যায়। দখলদাররা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আন্ডার গ্রাউন্ড সেল তৈরী করেছিল। যশোর পতনের পর ঠিক এমনি একটি সেল থেকে ১১৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সবাই জীবিত অবস্থায় থাকলেও তাদের মধ্যে প্রাণ ছিলো না বললেই চলে। আলো বাতাস ও খাদ্যের অভাবে মাংসহীন হয়ে তাদের শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। হাড্ডি কংকালসার দেহগুলি অসহ্য নির্যাতনের জ্বালা বহন করে এনেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পীর-দরবেশরাও রেহাই পায়নি	দৈনিক আজাদ	১১ মার্চ, ১৯৭২

পীর-দরবেশরাও কসাইদের হাত থেকে রেহাই পায়নি

কইবুল্লা। উত্তর বাংলার আনাচে-কানাচে তার হাজার হাজার মুরীদ সাগরেদ। এঁর ছোট আরও ৩ ভাই। পীর এঁরাও। মাঝারি ধরনের বাড়ীটায় সর্বদা গমগম করতো শত শত দর্শণার্থী। কোরান পাঠ, মৌলুদ পাঠ, ওয়াজ নসিহত আর ওয়াক্তে ওয়াক্তে নামাজ-এক স্বর্গীয় পবিত্রতায় ভরে থাকতো এ পীর বাড়ী সারাক্ষণ।

পীর হলে হবে কি। সবাই 'প্রোগ্রেসিভ মাইনণ্ডেড'। একদিকে সামরিক জান্তা যখন ধর্মের দোহাই দিচ্ছে এবং অন্যদিকে লাখে লাখে মানুষ খুন করেছে, ইজ্জত লুট করেছে, মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন পীরবাবা। মুখ ফুটে কিছু বলতেন না, শুধু ডাকতেন আল্লাহকে... কাঁদতেন আর করুণা ভিক্ষা করতেন... আল্লাহ তুমি এই নিরপরাধী মানুষদের বাঁচাও... বাঁচাও সতী মা-বোনদের। ... আল্লাহ মুখ তুলে চেয়েছেন। বাঙ্গালী জাতিকে সর্বগ্রাসী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তিনি... জয় ঘোষণা করেছেন মানবতার। কিন্তু পীরবাবা, তাঁর ভাই আর অন্যান্য কয়েকজন পারলেন না সে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে... দেখতে পেলেননা বাঙ্গালী আজ কতো খুশী। কসাই খানসেনাদের হাতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ দিতে হলো তাঁদের।

পীর পবিবারের এক যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পঁচিশে মার্চের পর সে পালিয়ে যায় ও ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়। খবর পায় মিলিটারীরা। তারা হঠাৎ গ্রাম ঘেরাও করে। তখন শেষ রাত। রমজান মাস। সেহরী সেরে এবাদতে মগ্ন হয়েছেন পীরবাবা। এক ভাই দুধ ভাত খেতে বসেছেন। একজন কাছের মসজিদে গিয়ে কোরান তেলাওয়াৎ করছিলেন... হঠাৎ বাড়ী ঘিরে ফেললো সামরিক জান্তারা, তারপর হঠাৎ গুলী। একে একে চার ভাইকে মাথায় গুলী করে নিষ্ঠুরভাবে মারলো ওরা। সেই সাথে আরও ১১ জন সাগরিদ।

বড় হুজুর ঢলে পড়লেন, ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস। হাতে তার তসবীহ ধরা। অন্য এক ভাইয়ের সামনে দুধভাতের থালা। হাতের ভাত হাতেই রয়ে গেল। একজন গড়িয়ে পড়েছেন ওজুর ঘটির উপরই... সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

... পরদিন সকালের দৃশ্য আরও মর্মান্তিক, আরও হৃদয়বিদারক। পীর বাড়ীতে যেনো সৃষ্টি হলো কারবালা। শত শত ভক্তের ভিড়... লুটিয়ে পড়েছে ভক্তরা আঙ্গিনায়... চীৎকার করে কাঁদছে... গড়াগড়ি যাচ্ছে... বুক চাপড়াচ্ছে কেউ কেউ মৃতদেহের চারপাশের রক্তরঞ্জিত মাটি তুলে মাথায় মাখছে। দেখলে যে কোন লোকের চোখে জল আসে। ভক্তরা ওঁদের সৎকার করে। তারপর পীরবাড়ীর মুঠো মুঠো ধুলো মাটি নিয়ে যায়। এই পবিত্র মাটি ওরা সযত্নে তুলে রাখবে।

এখানে কসাইরা একটি শিশুকেও নির্মমভাবে মেরেছে। সে পীর বংশেরই আগামী দিনের নাগরিক। দোলনায় ঘুমিয়ে ছিলো বাচ্চাটা। খান সেনা কয়েকবার গুলী চালায় ঘুমন্ত বাচ্চাটার উপর। হায়, ইশ্বর!

গোকুল গ্রামের তসিম পাড়ের জনৈক এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য নায়ক। কালো বোরখা পরে মেয়ের সাজ নিয়ে সে মিলিটারীদের সাথে এখানে আসে ও পীরবাড়ী সনাক্ত করিয়ে দেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সে আদেশ নির্দেশও দিচ্ছিলো বলে জানা গেছে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাও এখানে তুচ্ছ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নারকীয় তাণ্ডবের আরেক লীলাভূমি	দৈনিক বাংলা	২৮ মার্চ, ১৯৭২

নারকীয় তাণ্ডবের আরেক লীলাভূমি
গোপালগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে আজো
ছড়িয়ে আছে চুড়ি, শাড়ী আর অসংখ্য কংকাল
**\ সংবাদদাতা প্রেরিত **

গোপালগঞ্জ, ১৬ই মার্চ। - গোপালগঞ্জ সিও ডেভেলপমেন্ট অফিস। পাকিস্তানী সেনাদের একটা শক্ত ঘাঁটি। এ ঘাঁটির নায়ক ক্যাপ্টেন ফয়েজ মোহাম্মদ কালান্তরে অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন সেলিম। বাঙ্গালীর সংগ্রামী লহুতে হাত রঞ্জিত করেছে এরা।

পাক জল্লাদেরা গোপালগঞ্জের এইস্থানে কসাইখানা তৈরী করেছিল। কসাইয়ের অঙ্গনে মাহবুব-উর-রহমান চৌধুরী, গোলজার চৌধুরী প্রাণ দিয়েছে ওদের হাতে। কত যে মাহবুব-উর-রহমান চৌধুরী এখানে দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই।

জল্লাদেরা কাকে কোথায় হত্যা করেছে সব ঘটনা মানুষ জানতে পারেনি। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। রাতের অন্ধকারে যেমন পাক জল্লাদেরা ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক তেমনি এ রাতে মুক্তি বাহিনী ও মিত্র বাহিনীর যৌথ আঘাতে দিশেহারা হয়ে গোপালগঞ্জের ক্যাম্প ছেড়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে সরে পড়ে। অসংখ্য মানুষের মৃত্যুকেন্দ্র মিলিটারী ক্যাম্পে মানুষ যাত্রা করেছে।

কেউ গিয়েছে প্রিয়জনদের স্মৃতি চিহ্নের অন্বেষণে, কেউ গিয়েছে শহীদ সংখ্যা নিরূপণ করতে। স্মৃতিচিহ্ন অনেকে পেয়েছেন। ক্যাপ্টেন ফয়েজ ও সেলিমের কক্ষে মেয়েদের হাতের চুড়ির স্তূপ, চেনা শাড়ী অথবা ব্লাউজ অনেকেই চোখের পানি মুছতে মুছতে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু শহীদের সংখ্যা কেউ নিরূপণ করতে পারেননি। ক্যাম্পের সামনে ইটের স্তূপে খুলি, হাড়, ক্যাম্পের সামনে খোলা জায়গায়ও খুলি হাড়ের মেলা এবং ক্যাম্পের সামনে নদীর ভিতর জেলেদের জালে এখনও জড়িয়ে পড়ে মানুষের মাথার খুলি অথবা মৃত মানুষের কংকাল। কি করে এর হিসেব মিলবে ?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
একটি হালকা মেশিনগানের জন্য বত্রিশটি জীবনের পরিসমাপ্তি	পূর্বদেশ	৮ এপ্রিল, ১৯৭২

একটি হালকা মেশিনগানের জন্য
বত্রিশটি জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে
\ নজরুল ইসলাম চৌধুরী \

একটি মাত্র এল, এম, জির জন্য গঙ্গাসাগর সেদিন রক্তসাগর হয়েছিল, বলছিলেন ডাঃ মোস্তাক চৌধুরী। গঙ্গাসাগর দীঘির পশ্চিম পাড়ের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনটি গণকবর খুঁড়ে ইয়াহিয়ার বর্বর কর্তৃক নিহত কিছু মানুষের লাশ উঠাবার সময় ওদের না ছিল হৃদয় না ছিল কাণ্ডজ্ঞান। এ দু'টোর একটা থাকলেও এ মানুষগুলোকে মারতে পারতো না। বস্তুতঃ একটি এল, এম, জির জন্যই বত্রিশজন লোক প্রাণ হারিয়েছিল ইয়াহিয়া-ভুট্টোর জল্লাদ বাহিনীর হাতে। সম্প্রতি আখাউড়া রেলওয়ে জংশনের অনধিক পাঁচমাইল দক্ষিণে গঙ্গাসাগর রেলষ্টেশনের পাশে তিনটি গণকবর খুঁড়ে ২৬টি লাশ উঠান হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, গত জুন মাসের মাঝামাঝি এক সময় দু'জন মুক্তিযোদ্ধা রেকি করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঙ্গাসাগর এলাকায় আসেন এবং তানমান্দাইল নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আত্মরক্ষার জন্য তাদের হাতে ছিল একটি মাত্র হালকা মেশিনগান। জানা যায় যে প্রাথমিক রেকির পর মুক্তাঞ্চলে তাঁদের কেন্দ্রে চলে যাবার পরিবর্তে তাঁরা একটি মাত্র হালকা মেশিনগান নিয়ে শতাধিক পাঞ্জাবী সেনার ছাউনি সরাসরি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই অনুযায়ী রাতের অন্ধকারের সুযোগে তাঁরা ছাউনি এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ইত্যবসরে জনৈক স্থানীয় দালাল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান সম্বন্ধে তার সামরিক প্রভুদের সংবাদ দেয়। খান সেনারা তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। এবং মুক্তিযোদ্ধা দু'জনকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। বেষ্টনীতে পড়ে অস্ত্র নিয়ে পালানো অসুবিধাজনক মনে করে তারা এল, এম, জি, টি গঙ্গাসাগরের জলে ফেলে খান পশুদের চোখে ধুলা দিয়ে বেষ্টনীভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু এল, এম, জি, টি কোথায় ফেলা হয়েছিল শত্রুরা সে স্থান চিনে রাখতে পেরেছিল। এদিকে সেই রাতেরই শেষের দিকে অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা দু'জন আবার পাঞ্জাবীদের ছাউনি এলাকায় প্রবেশ করেন এবং সন্তর্পণে তাঁদের এল, এম, জি, টি উঠিয়ে নিয়ে আসেন। পরদিন পাঞ্জাবী পশুরা পরিত্যক্ত অস্ত্র উঠানোর উদ্দেশ্যে পানিতে নেমে অবাক হল। সে সময় পুর্বোক্ত স্থানীয় দালালটি সংবাদ দিল যে মুক্তিযোদ্ধা দু'জনই অস্ত্র উঠিয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী তানমান্দাইল অথবা ডাঙ্গাইলে কারো ঘরে সেটা রেখে পালিয়ে গেছেন। এল, এম, জি, উদ্ধারের জন্য শুরু হল পাকজল্লাদদের তানমান্দাইল ও ডাঙ্গাইল গ্রামদ্বয় অপারেশন। পাক বর্বররা মুক্তিযোদ্ধা কিংবা অস্ত্র কিছুরই সন্ধান পেলনা বটে, তবে তাদের অমানুষিকতা থেকে রেহাই পেল না এই দুই গ্রামের সরল নিরপরাধ মানুষ। শিশু, বৃদ্ধ, নারী পুরুষ সবাই হল ইয়াহিয়ার জল্লাদদের উন্মত্ততার শিকার। অকথ্য নির্যাতনের পর তারা উভয় গ্রামের প্রায় সব পুরুষ মানুষ ধরে নিয়ে আসে এবং মামুলি জিজ্ঞাসাবাদের পর বত্রিশজনকে রেখে অন্যান্যদের ছেড়ে দেয়। পরে এই বত্রিশজনকে তারা হত্যা করে গঙ্গাসাগরের পশ্চিম পাড়ের তিনটি গণকবর পুঁতে রাখে।

হত্যাকারী জল্লাদ বাহিনী ও তাদের পোষ্য দালালদের বিরুদ্ধে আনীত এক মামলার ব্যাপারে এই লাশগুলো উঠানো হয়। নিহতদের আত্মীয় স্বজনেরা যে তেরটি মৃতদেহ সনাক্ত করতে পেরেছে তারা হলেনঃ-

(১) আব্দুল গনি (২) রিয়াজ উদ্দীন (৩) সাধন মিয়া (৪) মুসলিম মিয়া (৫) কমল মিয়া (৬) আবুল বাসার (৭) আব্দুল খালেক (৮) তারা মিয়া (৯) আবুল ফয়েজ (১০) আবুল হাসেম (১১) ওমর আলী (১২) সালু মিয়া এবং (১৩) গোলাম কাদের।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আরেক শহীদ গণপরিষদ সদস্য নজমুল হক সরকার	দৈনিক বাংলা	১০ এপ্রিল, ১৯৭২

আর এক শহীদ গণপরিষদ সদস্য
নজমুল হক সরকার

৩৪ বছর বয়স্ক নজমুল হক সরকার ২৫শে মার্চের কালরাতে রাজশাহী শহরের এক গোপন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ রাতেই দেড়টার দিকে হানাদার বাহিনী জনাব সরকারের রাজশাহী শহরের রাণীবাজারস্থ বাসভবন ঘেরাও করে। সেই সময় বাড়ীতে কয়েকজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছাড়া কেউই ছিল না।

বিপদের আভাস পেয়ে জনাব সরকার সন্ধ্যায় তাঁর পরিজনদের বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেন। এবং নিজেও আত্মগোপন করেন। কিন্তু বিবেকের দারুণ দংশন সহ্য করতে না পেরে এবং কর্তব্যের আহবানে রাত আড়াইটার দিকে রিক্সা করে আওয়ামী লীগ অফিসের দিকে যাত্রা করেন মূল্যবান কাগজপত্র সরানোর উদ্দেশ্যে।

পথিমধ্যে তিনি হানাদার বাহিনীর একটি জীপের সম্মুখে পড়ে যান। সেখানেই জল্লাদের গুলিতে তিনি শহীদ হন। গুলি করার পর হানাদাররা তাঁর লাশ ট্রাকে করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। জনাব সরকার গত সাধারণ নির্বাচনে রাজশাহী ৮ (এনই-৩৭) থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ছয়জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং রাজশাহী জেলার মধ্যে সর্বাধিক ভোট পেয়ে জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই জনাব সরকার আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত। ১৯৬২ সালের গণআন্দোলন থেকে শুরু করে তিনি সব সময়ই বাঙ্গালীর অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে গেছে।

রাজশাহী কোর্টের এই তরুণ এ্যাডভোকেট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি পরপর দু'বার রাজশাহী উকিল সমিতির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। মিষ্টিভাষী, সুবক্তা, সাহসী, নজমুল হক আওয়ামী লীগের কর্মী মহলে নজমুল ভাই নামে পরিচিত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দানবীর নূতনচন্দ্র সিংহও বাঁচতে পারেননি	দৈনিক বাংলা	১৩ এপ্রিল, ১৯৭২

দানবীর নূতনচন্দ্র সিংহ

গত বছর এই দিনে খান সেনারা
তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল

তাঁর একমাত্র ইচ্ছে ছিল তিনি যেনো দেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। সে ইচ্ছা তার পূরণ হয়েছে। দেশের মাটিতে তিনি মরতে পেরেছেন। তবে বড় নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে- কখনো কেউ যা কল্পনাও করেনি।

গত বছর এই ১৩ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অদূরে নিজের হাতে গড়া কুণ্ডেশ্বরী ভবনে তাঁকে হত্যা করা হয়। কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা বাবু নূতন সিংহের কথা বলছি। এপ্রিলের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম শহরের পতন হয়েছিল। ১৩ তারিখে পাক বাহিনী কুণ্ডেশ্বরী আক্রমণ করে। বাবু নূতন সিংহ তখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪৭ জন অধ্যাপক সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে। সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ এ, আর, মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ কোরাইশী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে জনাব এম, আর, সিদ্দিকীও কুণ্ডেশ্বরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পাক বাহিনীর অগ্রগতির খবর শুনে সবাই কুণ্ডেশ্বরী ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। বাবু নূতন সিংহকে যাওয়ার কথা বললে তিনি রাজী হননি। বলেছিলেন, যদি মরতে হয় দেশের মাটিতেই মরব। অনেক পীড়াপীড়ির পরও তাকে রাজী করান গেল না। এদিকে পাকবাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছিল। ১৩ই এপ্রিল পাকবাহিনী কুণ্ডেশ্বরী ভবনে প্রবেশ করে।

ছেলেরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। বাবু নূতন সিংহ তখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। জনৈক সালাউদ্দীন তাঁকে সেখান থেকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এসেছিল। তাঁর চোখের সামনে মন্দির উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল নৃশংসভাবে। মেজর তিনটি গুলি করার পরও সালাহউদ্দীন রিভলবারের গুলি ছুড়েছিল নূতন বাবুর দিকে। তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন। তেমনি মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন তিন দিন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নূতন বাবুর জন্ম ১৯০১ সালে। শৈশবেই তিনি মাতৃ-পিতৃহারা হন। আট বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। তিনি নয় বছরে বার্মা যান। সেখানে মুদির দোকানে চাকুরী করেন। ১৯২২ সালে চট্টগ্রাম ফেরেন এবং বিয়ে করেন। তারপর কলকাতা যান। ১৯৪৬ সালে ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারের বৈদ্যনাথ ধামে গিয়ে কুণ্ডেশ্বরী মায়ের কবচ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।

কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যাপীঠ

নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি তিনি। সে জন্য একটা ক্ষোভ ছিল মনে। তখন রাউজান থানায় কোন বিদ্যালয় ছিল না। রাউজান থানার মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগের জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন কুণ্ডেশ্বরী বালিকা মন্দির। পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিদ্যালয় ছিল এটি। শুধু রাউজান থানা নয়, দেশের সব এলাকা থেকেই ছাত্রীরা যায় সেখানে লেখাপড়া করার জন্য। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ডাকঘর, সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ, পানির পাম্প, জেনারেটর, বাস ইত্যাদি ছিল। মোট প্রায় ২ লাখ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে সেখানে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রংপুরের দু'টি গণসমাধি	পূর্বদেশ	৩০ এপ্রিল, ১৯৭২

রংপুরে দুটি গণসমাধির সন্ধান লাভ

রংপুর, ২৬শে এপ্রিল (বাসস)- এখানে দু'টি গণসমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি রংপুর ক্যান্টনমেন্টের কাছে, আর একটি শহর থেকে চারমাইল দূরে সাহেবগঞ্জ গ্রামে। একটি বিশেষ গণহত্যা অনুসন্ধানকারী দল এ গণসমাধিগুলোর সন্ধান দেন।

ক্যান্টনমেন্টের কাছের গণসমাধিটিতে প্রায় দু'শ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। ডাঃ জিকরুল হক এমসিএকেও এখানে হত্যা করা হয়েছে। সৈয়দপুরের ক'জন মাড়োয়ারীকেও এখানে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

সাহেবগঞ্জ গণসমাধি হত্যাকাণ্ডের আর একটি লীলাক্ষেত্র। এখানে ১৯ জন বাঙ্গালী সামরিক অফিসার ও সৈনিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একজন অফিসারের পকেট থেকে একটি ফটো ও চিঠি পাওয়া গেছে। অনুমান করা হচ্ছে সে অফিসারটি একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর লেখা পত্রে তাঁকে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যাবার অনুরোধ ছিল।

হত্যাকাণ্ডের শিকার সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের হাত বাঁধা ও চোখ তুলে ফেলা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান আজ দেবদাস হয়ে বেঁচে আছেন	পূর্বদেশ	৯ মে, ১৯৭২

হানাদারদের নির্যাতনের লক্ষ্য শিকারের অন্যতম
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান আজ
দেবদাস হয়ে বেঁচে আছেন
\ নজরুল ইসলাম বুলবুল \

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক জনাব মুজিবুর রহমান পাক বাহিনীর অসহ্য নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছেন। প্রতিদিনের মত ২৫-এর রাত্রিতেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বসে গল্প করছিলেন তিনি। রাত্রি গভীর হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই কারো।

যাঁদের সঙ্গে গল্প করছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু অধ্যাপক। দেশে যে সামরিক নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে তা কারো জানা ছিল না। গভীর রাত। একদল লোকের বুটের শব্দ শুনে সবাই আঁৎকে উঠলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন পাক সৈন্য ঢুকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে। অধ্যাপকবৃন্দ তখনও বসে আছেন। সৈন্যরা কাছে এসে তাদের জিজ্ঞেস করতে লাগলো। হিন্দু অধ্যাপকগণ নিজেদেরকে মুসলমান নামে পরিচয় দিলেন। কিন্তু মুশকিলে পড়েছিলেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

তিনি নিজেকে সে নামে পরিচয় দেবার সাথে সাথে সৈন্যরা তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। বেশ কিছুক্ষণ মারধর করে তাঁরা চলে যায়। অধ্যাপক রহমানের একমাত্র দোষ বঙ্গবন্ধুর নামের সাথে তা নামের মিল ছিল। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। ৪ঠা এপ্রিল মুক্তিবাহিনী রাজশাহী শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পাঞ্জাবীদের হাত থেকে মুক্ত করে।

১৩ই এপ্রিল পাকবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা শহরের কর্তৃত্ব হারায়। এরপর শুরু হয় গণহত্যা ও নির্যাতন। ১৪ই এপ্রিল ভাষা বিভাগের একমাত্র হিন্দু অধ্যাপক শ্রী সুখরঞ্জন সমদ্দারকে এবং ১৫ই এপ্রিল অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক জনাব হাবিবুর রহমানকে পাক সেনারা ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

শহীদ সমদ্দার বাবুর মরদেহের অংশবিশেষ কাজলাগ্রাম থেকে উদ্ধার করা গেছে, কিন্তু শহীদ হাবিবুর রহমানের কোন খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় অতিথি ভবনে থাকতেন। ২৫শে মার্চের দুঃসহ বেদনা সহ্য করে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলেন।

জনাব রহমানের বন্ধুবর্গ, যাঁরা ছিলেন হিন্দু, তারা সবাই সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। এসব কথা চিন্তা করে জনাব রহমান ক্রমেই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। ইসলাম রক্ষার জন্য পাকবাহিনী যে পন্থা অবলম্বন করেছিল তা দেখে মুজিবুর রহমান সাহেব ধর্মের উপর আস্থা হারাতে বসেছিলেন। যদিও ২৫শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত তিনি একজন খাঁটি ইসলামপন্থী মুসলমান হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

ইয়াহিয়া এবং তার লেলায়িত সেনাবাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর ইসলাম রক্ষার অজুহাতে যে অত্যাচার, গণহত্যা আর নির্যাতন চালিয়েছিল তা দেখে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ধর্মের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন।

এই কারণে তিনি ১৯৭১ সালে ১০ই মে তারিখে নিজেকে মুজিবুর রহমানের পরিবর্তে 'দেবদাস' নামে পরিচিত হন। তাঁর এই নাম পরিবর্তনের কথা লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন এবং এর পর থেকে তার সাথে দেবদাস নামে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান। ১০ই মে তারিখে অধ্যাপক রহমান নিজেকে 'দেবদাস' নামে পরিচিত করেন।

পাক সামরিক বাহিনী ঘটনাটি জানতে পায়। ১২ই মে তারিখে সামরিক কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক 'দেবদাসকে' গ্রেফতার করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অতিথি ভবনের দোতলায় একটি ছোট্র রুমে তাঁকে রাখা হয়। এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক 'দেবদাস' আমাকে জানালেন যে, এখানে থাকা অবস্থায় সাধারণ সৈন্যরা তাকে অকথ্য নির্যাতন করেছে।

তাঁর শরীরে, মাথায় বুটের লাথি মারা হতো। ১১ দিন ধরে অতিথি ভবনে তাঁকে নির্যাতন চালানো হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সহকর্মী বন্ধুই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাননি বলে তিনি আমাকে জানালেন।

ঐ সময় অতিথি ভবনে সামরিক অফিসারদের অফিস ছিল। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকবাহিনীর সহযোগী অধ্যাপক ডঃ বারী, ডঃ মকবুল হোসেন ও ডঃ মতিউর রহমানকে তিনি সামরিক অফিসারদের কাছে যাতায়াত করতে দেখতে পেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দী থাককালীন সামরিক অফিসাররা মোটামুটি ভালই ব্যবহার দেখাতো, কিন্তু সাধারণ সৈন্যরা অকথ্য অত্যাচার চালাতো বলে অধ্যাপক 'দেবদাস' জানালেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ দিন বন্দী রাখবার পর একটি গাড়ীতে করে সামরিক কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক 'দেবদাসকে পাবনা নিয়ে যায়। পাবনায় তাঁকে ৩/৪ দিন রাখা হয়। এই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কাজী সালেহ আহমদকেও তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাবনায় সামরিক অফিসাররা অধ্যাপক 'দেবদাস'কে নানা রকম প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি তাদের অন্যায় অত্যাচারকে মাথা পেতে নিতে অসম্মতি জানান। যার ফলে তাঁকে সামরিক প্রহরায় নাটোরে পাঠানো হয়। নাটোরে তাঁকে পুলিশ লাইনে রাখা হয়। এখানে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালানো হয়।

কিন্তু নিজের অত্যাচারের কথা অধ্যাপক দেবদাস কিছুতেই বলতে রাজী নন। শেষে কিছুটা মৃদু হেসে তিনি বললেন, ওরা আমার উপর যে অত্যাচার করেছে, তা বলে আর কি লাভ হবে। ওরা আমার সাথে বেশ ভাল ব্যবহার দেখিয়েছে, এই বলে তিনি চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারলাম, অত্যধিক নির্যাতনের ফলে তিনি কথার খেই মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন। ঠিকমত খেয়াল করতে পারছেন না পূর্বের সব ঘটনা।

নাটোরে অধ্যাপক দেবদাসকে তিন মাস একটি ছোট্ট কামরায় বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অপরাধের শাস্তিস্বরূপ নাটোর জেলখানায় তাকে আটক রাখা হচ্ছে। নাটোরে বন্দী থাকাকালীন সময়ে পাকসামরিক অফিসাররা অধ্যাপক দেবদাসকে কয়েকটি প্রশ্ন করে।

সবগুলো প্রশ্নের কথা তিনি বর্তমানে মনে করতে পারছেন না। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নের কথা তাঁর আজও মনে আছে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ''আপনাকে ছেড়ে দিলে আপনি কাজে যোগদান করবেন কি না''? উত্তরে অধ্যাপক দেবদাস বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানান, ''তোমাদের স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে আমি কাজে যোগ দিতে রাজী নই ?''

দ্বিতীয় প্রশ্ন, আওয়ামী লীগকে বাতিল করা সম্পর্কে তোমার মতামত কি? উত্তরে তিনি জানান, ''আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল। সুতরাং আওয়ামী লীগকে বাতিল ঘোষণা করতে হলে নির্বাচনের পূর্বেই তা করা উচিত ছিল। নির্বাচনের পরে তাকে বাতিল ঘোষণা করবার অধিকার জনতা তোমাদের দেয়নি- তাই এটা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি।''

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলে ভারত একে দখল করে নেবে কিনা? উত্তরে জনাব দেবদাস জানান, ''ভারতের পাশে আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও বার্মার মতো ছোট ছোট রাষ্ট্র রয়েছে স্বাধীনভাবে। সুতরাং ভারত তাদের যদি দখল না করে থাকে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তাকে দখল করবে না।''

নাটোরে বন্দী থাকবার সময় যে বাবুর্চি তাকে খাবার দিয়ে যেতো সে ছিল বাঙ্গালী। ঐ বাবুর্চিটি মাঝে মাঝে বাইরের জগতের খোঁজখবর ও সিগারেট এনে দিত বলে অধ্যাপক দেবদাস আমাকে জানালেন। এছাড়া নাটোরের ছোট দারোগা ছিল বাঙ্গালী। সেও মাঝে মাঝে গোপনে দেখা করতো।

নাটোর জেলে বন্দী থাকাকালে অধ্যাপক দেবদাস মিলিটারীর সরাসরি হাত থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছিলেন। জেলখানার পার্শ্বের একটি বাসার আনোয়ার নামে একজন ছাত্র তাঁর পরিচিত ছিল। আনোয়ার তাঁর পরিচিত অধ্যাপককে বন্দী দেখতে পেয়ে গোপনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর বন্দী থাকার সংবাদটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়।

নাটোরে দীর্ঘ তিন মাস বন্দী থাকবার পর ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। অধ্যাপক দেবদাস মুক্তি পেয়ে জয়পুরহাট চলে যান এবং দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত জয়পুরহাটে বোনের কাছে থাকেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ফিরে এসেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি কাজে যোগ দেননি। কাজে যোগদানের ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি হেসে উত্তর দেন, কি হবে কাজে যোগ দিয়ে। বিগত ন'মাসের বেতনও তিনি এ পর্যন্ত নেননি।

অত্যধিক নির্যাতনের ফলে অধ্যাপক দেবদাস বর্তমানে গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি জ্বরে ভুগছেন। মাথায় মিলিটারীর বুটের আঘাতের ফলে তার মস্তিষ্কের গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

পূর্বের কোন স্মৃতিকে তিনি ভালভাবে স্মরণ করতে পারছেন না। এছাড়া বেশীক্ষণ কথা বলতেও তার পক্ষে কষ্ট হয়। এ অবস্থায় তিনি পুনরায় অধ্যাপনা কাজে অংশ নিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান দেবদাস নামে এখনও নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।

জনাব মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্ক শাস্ত্রে এম, এ পাস করেন। ১৯৬৪ সনে তিনি মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্ক শাস্ত্রে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। করাচী ও সিলেট সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৭ সনে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গাজীপুর অস্ত্র কারখানায় কয়েকজন কর্মচারীর হত্যাকাণ্ড	পূর্বদেশ	১০ মে, ১৯৭২

অস্ত্র কারখানার কর্মচারীদের এম, এন, এ হোষ্টেলে এনে হত্যা করা হতো

গাজীপুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে পাক বাহিনী বাঙ্গালী অফিসারদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। তাই প্রথমে অফিসারদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে মেশিনগানের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু এই সমস্ত অফিসারদের পরিবারের লোকজনদের কান্নাকাটি ও অনুরোধে তাদের সেই সময়ের জন্য ক্ষমা করে দেয়া হয়।

এই সময় গাজীপুর অস্ত্রাগারের আবাসিক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হেলিকপ্টার যোগে সেখানে আসে এবং পাক বাহিনীর সেনাদের সাথে গোপন আলোচনা করে। সেই সময় বাঙ্গালী অফিসারদের নিজ নিজ কোয়ার্টারে চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। পরের দিন ৩০শে মার্চ (১৯৭১) পাক বাহিনী বাঙ্গালী অফিসাদের কোয়ার্টারে খানাতল্লাশি করার অজুহাতে তাদের মালপত্র লুট করে নেয়। পরে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সিপাহীরা বাঙ্গালী অফিসারদের কোয়ার্টারগুলিতে হানা দিয়ে নানারূপ অত্যাচার করতো।

হানাদার পাকবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক বাঙ্গালী অফিসার তাদের পরিবারসহ গাজীপুর ছেড়ে নানাদিকে পালিয়ে যেতে থাকেন। ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ৬ জন অফিসারকে পাকবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ঢাকা চলে যাবার নির্দেশ দেয়। এই ৬ জন অফিসার ছিলেন ওয়ার্কস ম্যানেজার জনাব এ, কে মাহবুব চৌধুরী, ডাঃ মেজর নঈমুল ইসলাম, হেডমাষ্টার কুদ্দুস সাহেব, ওয়েলফেয়ার অফিসার মাহবুবর রহমান, ও আরো দু'জন অফিসার।

এই সমস্ত অফিসার ও তাঁদের পরিবারদের একটি বাসে করে এবং দু'টি গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। বাসে বিহারী এবং পাঞ্জাবীদের সাথে পাকবাহিনী বাঙ্গালীদের পাহারা দিচ্ছিল। গাড়ীগুলো যখন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে তখন ব্রিগেডিয়ার কুরিমুল্লাহ, ওয়াহেদ নামক একটি পাঞ্জাবী অফিসারকে বাস থেকে নামিয়ে নিজের গাড়ীতে তুলে নেয়।

জনাব মাহবুব চৌধুরী তখন ব্রিগেডিয়ারকে বাঙ্গালী অফিসারদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নামিয়ে দেবার অনুরোধ করেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার কোন জবাব না দিয়ে গাড়ী নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট কোয়ার্টারের দিকে চলে যায়। আর বাসটি তখন পাক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে আবার ঢাকার দিকে চলতে থাকে।

বাস ঢাকার এম, এন, এ হোষ্টেলে এসে থামলে পাকবাহিনী সকলকে নিচে নামবার আদেশ দেয়। বাসের বিহারীরা মোহাম্মদপুর চলে যায়। অন্য অবাঙ্গালীরা পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য একটি ট্রাকে চড়ে বিমানবন্দরের দিকে যায়। নিরুপায় হয়ে বাঙ্গালী অফিসারগণ নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য রিকশা ডাকবার উদ্যোগ নিলে বর্বর সেনারা অফিসারদের হোষ্টেলের ভেতর যেতে নির্দেশ দেয়।

এই সব অফিসারের পরিবারবর্গ তখন হোষ্টেলের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটি নির্জন কক্ষে অফিসাদের নিয়ে আসা হলো। জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে আসছে দেখে তারা পানির অভাবে বিনা অজুতেই হেডমাষ্টারের ইমামতিতে নামাজ আদায় করে নেন। নামাজ শেষ হতেই একজন সিপাই হেডমাষ্টার সাহেবের পেন দিয়ে প্রত্যেক অফিসারের পরিচয় লিখে নেয়।

দেরী হচ্ছে দেখে অফিসারগণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সিপাইকে তাঁদের পরিবারের লোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছেন- এ কথা জানালে পরিবারবর্গকে ভেতরে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দেয়। কিন্তু কেউ রাজী হলেন না এ প্রস্তাবে। তখন সকলে হেডমাষ্টার সাহেবকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষারত পরিবারের লোকজনদের সান্ত্বনা দেবার জন্য পাঠালেন।

হেডমাষ্টার সাহেব সিপাইর সাথে তখন বাইরে এলেন। সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি আবার চলে গেলেন। কতক্ষণ পরে বর্বর সেনারা শুধু হেডমাষ্টার সাহেবকে বাইরে চলে যেতে অনুমতি দেয়। মাষ্টার সাহেব যখন চলে আসছিলেন, তিনি দেখতে পান যে সিপাহীরা বাঙ্গালী অফিসারদের কাছে থেকে সমস্ত জুতা, মোজা, ঘড়ি ও টাকা-পয়সা কেড়ে নিচ্ছে। তারপর হায়েনার দল বাঙ্গালী অফিসারদের উপর পরপর চারটি গুলি করে।

একই সময়ে বাইরে অপেক্ষারত বাঙ্গালী অফিসারদের পরিবারের লোকজনও এই গুলির শব্দ শুনতে পান। কিন্তু তখনও তারা জানতেন না যে তাদের আপন জনদের পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বাঙ্গালী হয়ে জন্মলাভ করার অপরাধে বর্বর পশুশক্তি গুলি করে হত্যা করেছে। এম, এন, এ হোষ্টেলে গুলির শব্দের পরেই মেজর মাহবুব চৌধুরী এবং মেজর নঈমুল ইসলাম তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে হেডমাষ্টারের পরিবারবর্গের সাথে চলে যান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্মম অত্যাচারে নিহত ও, সি	পূর্বদেশ	২০ মে, ১৯৭২

নরপশুদের নির্মম অত্যাচারে তিলে তিলে ও,সি খালেক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন

\ নুরুল ইসলাম \

গত বছর ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রাম শহরের কোন প্রত্যক্ষদর্শী যদি শহরের রাজপথে খোলা এক খানি জীপ গাড়ীর সামনে দু'হাত দু'দিকে দিয়ে বিধ্বস্ত একটা লোককে বাঁধা অবস্থায় হানাদার দস্যুদের গাড়ীতে ঘোরাতে দেখে থাকেন- তবে তিনি নিশ্চয়ই বিবস্ত্র লোকটার ওপর খড়িমাটি দিয়ে সাদা অক্ষরে লেখা ক'টিও পড়ে থাকবেন, ''কোতোয়ালির ওসি খালেক এরেষ্টেড''।

সম্ভবতঃ দস্যুরা গ্রেফতারের পর এভাবে আর কোন বাঙ্গালীকে প্রকাশ্য রাজপথে প্রদর্শনী সহকারে পাশবিক অত্যাচার করেনি- কিন্তু কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জনাব আব্দুল খালেককে নিয়ে তারা তাই করেছে। শুধু তাই নয়, চলন্ত গাড়ীতে পশুর দল রাস্তার মানুষকে সাক্ষী করে ওসি খালেকের গায়ে জুতা, লাঠি, কিল, ঘুষি মারতো।

এভাবে সারা বিকেল তারা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে তাঁকে কোতোয়ালিতে এনে হাজির করে সন্ধ্যায়। তারপর সারারাত বিরামহীনভাবে খালেক সাহেবের উপর চালায় অমানুষিক অত্যাচার। এরপর পাঠানো হয় তাকে ক্যান্টনমেন্টের জল্লাদখানাতে। ১৮ই এপ্রিল বিকেল বেলা জল্লাদখানা থেকে এক ফাঁকে জনাব খালেক তাঁর কাকার বাসায় টেলিফোন করে জানান যে, কাকা যেন তার মুক্তির তদ্বির করেন।

খবর পেয়ে তিনি ক্যান্টনমেন্টে যান- খালেক সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু তিনি অনুমতি তো পান। ই-নি, বরং খান সেনাদের অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনে বাসায় ফিরে আসেন। ২২শে এপ্রিল সকালের দিকে তিনি আবার তাঁর কাকার বাসায় টেলিফোন করলেন, জানতে চাইলেন কাকা তাঁর জন্য কিছু করতে পেরেছেন কিনা । জনাব খালেকের কাকা করম আলী সাহেব আমাকে জানালেন, ২২ তারিখে সকালে সে টেলিফোন করেছিল এবং বিকাল বেলায় আর তাকে জীবিত রাখা হয়নি।

প্রথমে হাতের আঙ্গুল ও হাত, এরপর পায়ের আঙ্গুল ও পা কেটে এবং শেষে দু'চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়ার পর খালেক আর বেশীক্ষণ বেঁচে থাকেননি। অশ্রুসিক্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জনাব আলী বললেন, খালেক পশ্চিম মাদার বাড়িতে আমার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল- সেখান থেকে বাড়ী ঘেরাও করে তাঁকে ধরে নিয়ে আসে এবং আমার টাকা-পয়সা, স্বর্ণালঙ্কার, রেডিও, সেলাই মেশিন, কাপড়-চোপড়, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, দলিলপত্র এবং আমাদের যাবতীয় সার্টিফিকেট তারা নিয়ে যায়।

জনাব আলী জানান যে, তিনি খালেককে ছোট বেলা থেকে লালন-পালন করে মানুষ করেছেন- কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। খালেক সাহেব চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া করে, চাটগাঁ কলেজ থেকে বিএসসি পাস করেছিলেন। যদিও তার বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বৈদ্যেরবাজার থানার মুচার চর গ্রামে, তথাপি তিনি তার এ চাচার লালন-পালনে চাটগাঁতেই ছিলেন আশৈশব।

জনাব আলী জানান যে, খালেক সাহেব আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছাত্রজীবন থেকেই জড়িত ছিলেন। তখনকার অসহযোগ আন্দেলন-পর্ব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খালেকের রাজনৈতিক সমর্থন ও কার্যকলাপের ব্যাখ্যাদান বাতুলতা হবে মাত্র। তিনি বললেন, ২৫শে মার্চের পর ২৬, ২৭ এবং ২৮শে মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণে বার্মা সীমান্তের টেকনাফ থেকে আরম্ভ করে বাঙ্গামাটি, রামগড় ইত্যাদি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের জন্য বিপুল পরিমাণে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহের কাজে খালেক সাহেব অত্যন্ত সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে এসেছেন।

শহীদ খালেক তার বিধবা স্ত্রী এবং তিনটি শিশুসন্তান রেখে গেছেন। এরা সবাই করম আলী সাহেবেরই পোষ্য হিসেবে চট্টগ্রামে বসবাস করছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহীতে পাক বাহিনীর বর্বরতার প্রাথমিক জরীপ	পূর্বদেশ	২২ মে, ১৯৭২

রাজশাহীতে দস্যুবাহিনীর বর্বরতার প্রাথমিক জরীপ রিপোর্ট প্রকাশ

রাজশাহী, ২১শে মে (এনা)। -ইয়াহিয়ার হানাদার দস্যুবাহিনী রাজশাহীতে যে গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে গেছে তার একটি প্রাথমিক জরীপ রিপোর্ট বের হয়েছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমজকল্যাণ বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ সপ্তাহব্যাপী এক জরীপের মাধ্যমে বহু ঘটনা উদঘাটন করেছেন।

তারা পঁচিশটি গ্রাম থেকে এ ব্যাপারে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গগণবাড়িয়ার জনৈক জেলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানান, পবিত্র রমজান মাসের এক কালো রাতে হানাদার বাহিনী গ্রামে ঢুকে মেশিনগানের সাহায্যে পঁচিশ জনকে গুলি করে হত্যা করে। জেলেটি গুলিবিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। ১৯৭১ সালের মে মাসে জুগিসশো গ্রামে হানাদার বাহিনী শান্তি কমিটি গঠনের নামে ১৭ জন গ্রামবাসীকে একত্রিত করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। তারপর পেছন থেকে মেশিনগানের গুলিতে সকলকে হত্যা করা হয়। এখানে ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা ২১৪ জনের উপর নির্যাতন চালায়। এর মধ্যে ১৪৫ জনকে মারধর করা হয় এবং অবশিষ্টদের গ্রেফতার, ধর্ষণ ও নানাভাবে নির্যাতন চালানো হয়। অত্যাচারিতদের মধ্যে ১৫৯ জন পুরুষ ও ৫৫ জন মহিলা ছিলেন।

এছাড়া হানাদার বাহিনীর দালালদের হাতে ৫০ জন নির্যাতিত হয়েছে। এসব গ্রামের ৩০৯টি ঘর আংশিকভাবে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং মোট ৭০৭টি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পাক বাহিনী যেসব ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে তাতে ৫ লাখ ৬৯ হাজার ২০০ টাকার মতো সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ক'জন শহীদ	পূর্বদেশ	১১ জুন, ১৯৭২

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ক'জন শহীদ

মরণের দামে জীবনকে যাঁরা কিনলেন-
শহীদদের নামে নামকরণ করা হয়েছে
ক'টি ছাত্রাবাসের

ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী অন্যান্য জায়গার মত রাজশাহী জেলার অসংখ্য মানুষকে খুন করেছে। খুন করেছে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ অঙ্গনের কাজী নুরুন্নবী, আবুল আমজাদ, আলমগীর, কাজল কুমার ভদ্র, সাইফুল, কাইয়ুম, মান্নান, মোস্তফা, মনসুর, সিরাজ ও শামসুলকে।

কাজী নুরুন্নবী। অত্যন্ত চেনা একটি মুখ। একজন সংগ্রামী ছাত্রনেতা। ছাত্রদের অধিকার আদায়ের অগ্রনায়ক। ভয় কি জিনিস তিনি জানতেন না। ১ম বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষ পর্যন্ত তিনি অধিকার আদায়ের বিপ্লবী যোদ্ধা।

কাজী নুরুন্নবীর বাড়ী রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার কাজীপাড়ায়। জল্লাদ ইয়াহিয়ার পাকবাহিনী অধিকৃত আমলে তিনি (কাজী) সম্পূর্ণভাবে অসহযোগিতা করেন। এমনি সময়ে ৫ম বর্ষের পরীক্ষা শুরু হলো। তিনি পরীক্ষা দানে বিরত রইলেন। শোনা যায় সেই মুহূর্তে তিনি গোপনে রাজশাহীতে কিছু অনুসন্ধান চালান। অনুসন্ধানকালে পাকবাহিনীর একজন দালাল রাস্তায় তাঁকে দেখা মাত্র ক্যান্টনমেন্টে গার্ড দিয়ে নিয়ে যায়। তারপর আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়। সম্প্রতি শহীদের মহীয়সী মা, মেডিক্যাল কলেজ প্রধান ছাত্রাবাসের 'শহীদ কাজী নুরুন্নবী ছাত্রাবাস' নামকরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

অধিকার আদায়ের আরেক সংগ্রামী নায়ক ছিলেন ৫ম বর্ষের (নতুন) শহীদ আবুল আমজাদ। অত্যন্ত মিষ্টিভাষী, মিশুক ছিলেন। ডাক নাম 'পেয়ারা' নামে বন্ধুদের নিকট তিনি প্রিয় ছিলেন। ছাত্র হিসেবে ছিলেন খুবই মেধাবী। রাজশাহীস্থ আন্তর্জাতিক হেরিকেন মিউজিক পার্টির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ভাল গিটার বাজাতেন। পেয়ারার বাবা কুষ্টিয়ার মেহেরপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ছিলেন। এরপর তিনি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। ইয়াহিয়ার আমলের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে তিনি, পেয়ারা ও পেয়ারার ছোট ভাইকে নিয়ে আশঙ্কায় কাল যাপন করছিলেন। কিন্তু একদিন পর নরপশুরা এসে বাসা থেকে পেয়ারা ও তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। আর ফিরে এলো না।

নাটকীয়ভাবে বেঁচে গেলো তার ছোট ভাই। আর তাই পেয়ারার দেশের বাড়ীতে মা, ভাই-বোনদের সব ভার এসে পড়লো ঐ ছোট ভাইটির ঘাড়ে। শহীদের নামে শহীদ আবুল আমজাদ ছাত্রাবাস নামকরণ করা হয়েছে।

সুন্দর, সুশ্রী, এক কথায় স্মার্ট বলতে যা বোঝায় সবগুলি গুণ ছিল কাজল কুমার ভদ্রের। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সবচেয়ে চেনা মুখ। কাজল- কাজলদা একগাল হেসে কথা বলতেন। তিনি তখন তৃতীয়

বর্ষের ছাত্র। দেশের গোলযোগকালে কুমিল্লায় তার বাপের বাড়ী চলে যান। কুমিল্লার প্রখ্যাত ব্যারিষ্টারের একমাত্র ছেলে কাজল গোলযোগের প্রথমভাগেই জল্লাদদের শিকার হলেন। কাজলের বোনদের উপর অনেক অত্যাচার চলে। পরে আর তাদের কোন সংবাদ আমরা পাইনি।

রাজনীতির পোকা ছিলেন যিনি, তিনি হলেন আলমগীল। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি রাজনীতি করতেন। তিনি ছিলেন ১ম বর্ষের ছাত্র। তাঁর বাপ, মা থাকতেন বরিশালে। দুর্যোগকালে তিনি রাজশাহীতে ছিলেন। পাকবাহিনী তাঁকে পাকড়াও করলো। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হল।

পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হলো। তিনি পরীক্ষা দিলেন। পাস করলেন। তারপর ক্যান্টনমেন্টে ডেকে আনা হলো। গুলি করে মারা হল। উদ্ভট উপায়ে পাকবাহিনী ঘৃণ্য ইচ্ছা চরিতার্থ করলো। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা একজন রাজনৈতিক নেতাকে হারালো।

শহীদের নামে আল হেলাল ছাত্রাবাসের ‘‘শহীদ আলমগীর ছাত্রাবাস’’ নামকরণ করা হয়েছে।

হানাদার আমলে গোপনে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন যে দু’জন কর্মরত কর্মচারী, তাঁরা হলেন কাইয়ুম ও সাইদুল। কাইয়ুম ছাত্রাবাসের কেরানী। আর সাইদুল টাইপিষ্ট। জীবনের প্রতি ঝুঁকি নিয়ে কাইয়ুম, সাইদুল অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই কাজের একটি দুর্বল অংশ বুঝতে পারে স্থানীয় অবাঙ্গালী ছাত্রদল। তারপর আর বিলম্ব হয়নি। একদিন দু’জনেই একসঙ্গে শেষ হয়ে গেলেন। তাই ছাত্রদের মাঝে কাইয়ুম, সাইদুল স্মৃতি হয়ে থাকবেন চিরকাল।

নগরবাড়ীর পথ দিয়ে আগত হিংস্র পাকবাহিনীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বর্ডার-এর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল বাবুর্চি মান্নান ও বয় মন্টু, সিরাজ, শামসুল এবং মনসুরেরা। বিধির ইচ্ছায় পদ্মার পাড়ে বড়কুঠির সামনেই বাঘের সম্মুখে পড়ে সেইসব হতভাগার দল। তারপর এক লাইনে মেশিনগানের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল এতগুলো প্রাণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে কয়েকটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন	পূর্বদেশ	২৩ জুন, ১৯৭২

পাক হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে
কয়েকটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন
\ মাজেদুর রহমান \

পাকিস্তানী হায়েনার দল ১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার বিকেলে সৈয়দপুর থেকে (রংপুর) বৃষ্টির মতো বুলেট ছুড়তে ছুড়তে দিনাজপুর শহর যখন পুনর্দখল করলো তখন অনেকেই ধারণা করতে পারেনি যে, তারা শুধু এ দেশের মানুষেরই রক্ত নিয়ে হোলি খেলবে না, সব রকম ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলোর ধ্বংস সাধন করবে।

দিনাজপুর শহর পুনর্দখল করবার পর সম্ভবত ১৭ই এপ্রিল রোজ শুক্রবার বেলা ৯/১০ টার দিকে পাঞ্জাবী হায়েনারা কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে শহর থেকে এলোপাতাড়ি গুলী করতে করতে দক্ষিণের পাকা রাস্তা ধরে ভারত সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু চেরাডাঙ্গীর নিকট ''লক্ষ্মী জলের সাঁকো'' বলতে একটি রাস্তার সংযোগস্থলে ঐ পল্লী এলাকার সংগ্রামী ছাত্র-জনতার নির্মিত আমগাছের একটি ব্যারিকেডে বাধা পেল।

রাস্তার উপর ব্যারিকেড দেখতে পেয়ে পাক দস্যুরা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলো। এরই প্রতিশোধ হিসেবে তারা ব্যারিকেডের স্থান থেকে দূরপাল্লার শক্তিশালী রকেটের দ্বারা একের পর এক মহরমপুর, পাইকপাড়া, তাজপুর ও মহব্বতপুরের কিয়দংশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছিল। সেদিনের সবচাইতে বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারী ঘটনা হলো যে পাঞ্জাবী নরাধমরা পাইকপাড়া নিবাসী স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ রোস্তম আলীকে ধরে নিয়ে আসে। বয়সে তরুণ ও বলিষ্ঠ চেহারার অধিকারী যুবক রোস্তম তার পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তান ছিলেন। তাকে তারা কি বলেছিল এবং তিনি নিজে কি বলতে চেয়েছিলেন তা আজও জানা যায়নি। পাক সেনারা ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার পর দেখা গেল রোস্তম আলী আর বাড়ী ফিরছে না।

তার উদ্বেগাকুল পরিবার খোঁজাখুঁজি শুরু করলে বিকেল বেলা দেখা গেল রোস্তমের তাজা লাশ লক্ষ্মীজল সাঁকোর ধারে কয়েক রাউন্ড গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্বাভাবতই আঁচ করা গেছে যে গাছ কেটে ব্যারিকেড নির্মাণের অভিযোগে রোস্তম দেশের জন্য ঐ এলাকার বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন। শহীদ রোস্তম কোনকালেই রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িত করেননি।

হায়েনার দল যখন বেলা ১/২ টার দিকে শহরে ফিরে আসছিল তখন পথে জেলার প্রাচীনতম (১৯৩২ সন) হাইস্কুল চেরাডাঙ্গীপাড়ায় তারা সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়ে। চেরাডাঙ্গী হলো উক্ত ইউনিয়নের বোর্ড কার্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র। বোর্ড কার্যালয় ভবনটি প্রধান মিলনায়তনসহ কয়েকটি ছোট ছোট কক্ষে বিভক্ত ছিল।

এসব কক্ষে জেলার বৃহত্তম চেরাডাঙ্গী জেলার কার্যালয়, চেরাডাঙ্গী ডাকঘর, চেরাডাঙ্গী দাতব্য চিকিৎসালয় ও ইউনিয়ন কনজুমার্স ষ্টোর্সের অফিসগুলো বিদ্যামান ছিল। এ ছাড়াও ঐ একই এলাকায় জেলার বৃহত্তম বেসরকারী ১৯৩২ সালে নির্মিত চেরাডাঙ্গী উচ্চবিদ্যালয়ের এক বিরাট হোষ্টেলসহ চেরাডাঙ্গী নবীন মজলিস ও পাবলিক লাইব্রেরী নামে একটি ক্লাবও রয়েছে। হানাদার বাহিনী প্রথমে চেরাডাঙ্গীতে ঢুকে বেদম এলোপাতাড়ি গুলি করে স্কুলের বিজ্ঞান ভবন ও অফিস ঘরটিতে ঢুকে পড়ে।

এর পরপরই নাকি একদল সেনা ছুটে আসে চেরাডাঙ্গীর বোর্ড কার্যালয়টিতে। প্রথমে ভালভাবে পেট্রোল ভবনটির বিভিন্ন কক্ষে ছিটিয়ে দেয় এবং একসঙ্গে কয়েক স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয়। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে প্রাচীনকালের এ বোর্ড ভবনটি দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে বোর্ড ভবনে রক্ষিত ইউনিয়নের ২২ হাজার অধিবাসীর যাবতীয় রেকর্ড ও আনুষঙ্গিক দলিলপত্র পুড়ে যায়।

বোর্ডের প্রায় ১৫ হাজার টাকার আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন মালামাল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। চেরাডাঙ্গীর পশু মেলার একটি বিরাট লোহার সিন্দুকসহ চেয়ার টেবিল আলমারী এবং বিগত ২৫ বছরের সবরকম কাগজপত্র পুড়ে গেছে। চেরাডাঙ্গী ডাকঘরটিও সেখানে তার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘ওরা ডাক্তার মেরেছে’	‘বাংলাদেশে গণহত্যা’ বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

ওরা ডাক্তার মেরেছে

‘‘শুধু শ্লোগান আর মিছিলের সংগ্রাম নয়। যত সত্বর পার ইমার্জেন্সী মেডিক্যাল ফার্ষ্ট এইড স্কোয়াড তৈরী কর। ব্যাপক রক্তক্ষয়ের জন্য প্রস্তুত থাক।‘‘ ১৯৭১ সালের ২১শে মার্চ যখন বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন সিলেট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলেছিলেন মানবতার সেবায় আত্মোৎস্বর্গকৃত নির্ভীক মহৎপ্রাণ সিলেট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শল্য চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদ।

বাংলাদেশে গণহত্যার বর্বরোচিত ও নৃশংসতম উদাহরণ বিশ্বে তুলনাহীন। কয়েক মিনিটের ঘটনা কিন্তু কত ব্যাপ্ত, কত বিস্তৃত, কত মর্মান্তিক, কত দুর্ঘটনা, কত মর্মস্পর্শী দৃশ্য, কত পৈশাচিকতা ছিল এ হত্যাকাণ্ডে। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশে গণহত্যার কাছে সবকিছু ম্লান হয়ে গেছে। এত বড় হত্যাকাণ্ড কোন ভাষায় লিখব, কেমন করে লিখব, কি লিখব, কে লিখতে পারবে? বাংলাদেশের এক কোটি পরিবারের ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হলে এক কোটি ইতিহাস লিখতে হবে। তা না হলে এ নৃশংসতার বহু অধ্যায় বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু তা কি সম্ভব? না সম্ভব নয়। সুতরাং এ ইতিহাস অলিখিত থাকবে। এ ইতিহাস লেখা যায় না। এ ইতিহাস লেখা যাবে না। এখানে ঐতিহাসিক ব্যর্থ, এখানের ইতিহাস ব্যর্থ।

এ ব্যর্থ ইতিহাসে শহীদ ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদকে প্রকাশ করাও এক ব্যর্থ প্রয়াস। কেন তাকে হত্যা করা হলো? কেমন করে তাকে হত্যা করা হলো? সৌম্য দর্শন দেবতুল্য লোকটিকে পাক বর্বর পশুরা কি করে গুলী করলো? এতো মানুষকে হত্যা করা নয়, মানবতাকে হত্যা করা হয়েছে।

মার্চের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদ নতুন এক কার্যক্রমের অবতারণা করলেন।। অসহযোগের ফলে অন্যান্যদের কাজ কমে গেলেও তাঁর নতুন আরও কাজ বেড়ে গেল। সামনে কি ঘটতে যাচ্ছে তা তিনি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। ছাত্রছাত্রী সেবক-সেবিকাদের ডেকে ফার্ষ্ট এইড স্কোয়াড গঠনে প্রবৃত্ত হলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে অনেকগুলো প্যাকেট তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে মওজুত করে রাখলেন। তিনি যেন দেখতে পারছিলেন ঐ যে কয়েক গজ দূরে হানাদার বাহিনী তেড়ে আসছে, এতেই আঘাত করবে, এক্ষুনি ফার্ষ্ট এইডের প্রয়োজন হবে।

হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই নরপশুরা এসে বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে, অসংখ্যা লোককে হত্যা করেছে, অগণিত লোককে আহত করেছে আর শল্যবিদ সামসুদ্দিন আহমদ তড়িৎ গতিতে চিকিৎসা শুরু করেছেন। কিন্তু মানুষ শাসমুদ্দিনকে যখন হিংস্র দস্যুরা গুলী করেছে, গুলী করে ধরাশায়ী করেছে, হত্যা করেছে, তখন তাঁকে কেউ ফার্ষ্ট এইড দিতে আসেনি। কেউ দাফন করতে আসেনি। কারণ তিনিই ছিলেন শেষ মানুষ, তিনিই ছিলেন শেষ সেবক, তিনিই ছিলেন সে ইতিহাসের শেষ নায়ক।

১লা এপ্রিল, ১৯৭১ সাল। সূর্য সারা প্রকৃতিকে ছেয়ে রেখেছে। রক্তিম রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিদিকে। সিলেট শহর আবার শত্রুদের কবলিত। ২৫শে মার্চের কাল রাতের পর হতেই স্বতঃস্ফুর্তভাবে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তখনকার ই, পি, আর, আনসার, মোজাহিদ, ইউওটিসি, ক্যাডেট, জেসিসি, ক্যাডেট, পুলিশ, ছাত্র ও যুবকরা

সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করে শত্রুদের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। কয়েক দিনের ভেতরই সিলেট জেলায় তিন শত মাইল সীমান্ত এলাকা থেকে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা অথবা বিতাড়িত করে মার্চের মধ্যেই সমস্ত হবিগঞ্জ মহকুমা, মৌলভীবাজার মহকুমা ও সুনামগঞ্জ মহকুমা মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। ৩রা এপ্রিল মুক্তিপাগল বাঙ্গালী বীরেরা সিলেট শহর দখল করে নেয়। হানাদার বাহিনী শালুটিকর বিমানবন্দর ও সংলগ্ন জংগলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপরই শুরু হয় বৃষ্টির মত পাক বাহিনীর বিমান হানা। সারা শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীর ঝড়। শত শত আদম সন্তান রক্তাক্ত আহত হয়ে হাসপাতালের দারস্থ হয়। মানব সেবার প্রতীক প্রখ্যাত শল্যবিদ অধ্যাপক শামসুদ্দিন শাণিত ছুরি হাতে ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে কাজে রত রয়েছেন। হাসপাতালে আলো নেই, পানি নেই, পথ্য নেই। তাতে কি, শামসুদ্দিন সাহেব আছেন। এক হাতে অস্ত্র চালনা, অন্য হাতে অন্যান্য সব কাজ। ৮ই মার্চ থেকে আবার শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। পাক দস্যুরা স্থল ও বিমানবাহিনী নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে মুক্তিবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমস্ত শহর তখন জনশূন্য। প্রাণপণ বাঁচাবার আদিম উগ্রতায় শহরবাসী চলেছে গ্রামের আশ্রয়ে- দুর্গত শহরের সাক্ষী ডাঃ শামসুদ্দিন আর তার রোগী।

ছাত্রদের প্রতি ডাঃ শামসুদ্দিন- ''আমরা প্রবীণ। আহত বাঙ্গালীদের সেবায় আমাদের থাকতে দাও। তোমরা নবীন যুবক, নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর। এখান থেকে বর্বর পশুদের শিকার হয়ে কোন লাভ নেই।''

ডাক্তারদের প্রতি- ''কোথায় যাবেন আপনারা? আমরা ডাক্তার। রোগী ফেলে আহত মানুষ ফেলে আমরা তো কোথাও যেতে পারি না।''

সেই রক্তস্নাত ৯ই এপ্রিল। ইতিহাস থমকে গেছে। আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ভঙ্গ করে জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম অমান্য করে মারণাস্ত্রসহ কতকগুলো পাক নরঘাতক সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতল ঘেরাও করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। শল্য প্রকোষ্ঠ। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গৌরবর্ণ সুদর্শন অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদ অবিশ্রান্ত কর্মরত। ঝড়ের বেগে প্রকোষ্ঠে ঢুকে সংগীন উচিয়ে ক'টি পশু সেনা ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। হাসপাতালের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অশ্রুসিক্ত সবুজ ঘাসের শীষে দাঁড় করালো তাকে। তারপর। না, আমি সম্বিত হারিয়ে ফেলছি। কি লিখবো, কেমন করে লিখবো। লিখে কি হবে? লাভ কি? পৃথিবীর মানুষ কি বিশ্বাস করবে আমাকে? অবিশ্বাস্য ঘটনা কি বিশ্বাস করা যায়। না, অন্যের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে আমি লিখবো নাকি? আমি আমাকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। ভগবান যীশুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। হ্যাঁ, হাসপাতালের চিরাচরিত মানবিকতা পবিত্রতাকে বিদীর্ণ করে গুলী করা হলো। গুলী করা হলো ঋষি শামসুদ্দিনকে, মানুষ শামসুদ্দিন আহমদকে।

ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে ডাঃ শামসুদ্দিন বলেছিলেন- ''হে সভ্য জগত, গণআন্দোলনকে দমন করতে গুলী করো না। তার বদলে ব্যবহার করো রাবারের বল বা বেগে চালিত পানি।''

এক-দুই করে তিনটি গুলী করা হলো তাঁকে। মৃত্যুহীন প্রাণ ক্ষণিকের ভিতর শেষ হয়ে গেল। প্রাণপ্রিয় দরদী শিক্ষককে অনুসরণ করল তরুণ অস্ত্রোপচারক ডাঃ শ্যামল কান্তি লালা, সহকারী সেবক মাহমাদুর রহমান, এ্যাম্বুলেন্স চালক কোরবান উল্লাহ। ক্লান্ত হলো নরপশুদের সামরিক ক্ষুধা।

ডাঃ শামসুদ্দিন ছিলেন মানবসেবার ইতিহাসে এক বিরল আদর্শ। কি সম্মোহনী শক্তি তাঁর ছিল জানি না। ছাত্রবেলা থেকেই তিনি ছিলেন নম্রভাষী। তাঁর কাজই কথা বলত। বিভাগ-পূর্ব ভারতে তিনি ছিলেন আসাম মুসলিম ষ্টুডেন্টস ফেডারেশনের সভাপতি। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রনেতাদের অন্যতম।

সেবাই ছিল অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদের প্রধান ও প্রথম ধর্ম। তাই সেবা করতেই তিনি জীবন বিলিয়ে দিলেন। আজীবন সেবাধর্মী ডাঃ শামসুদ্দিন ছিলেন গঠনমূলক কাজে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ। তরুণ ডাক্তার হিসাবেই তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। অফুরন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ডাঃ শামসুদ্দিন মেডিক্যাল সার্ভিস এসোসিয়েশনের মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সংগঠক। তিনি বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন
পাকিস্তান
এ্যাম্বুলেন্স কোর।

''আমার যেটুক সাধ্য করিব তা আমি।''

১৯৬৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন জালালাবাদ অন্ধ-কল্যাণ সমিতি। ''অন্ধজনে দেহ আলো'' এ মূল মন্ত্র নিয়ে এ সমিতির উদ্যোগে সিলেট, মৌলভীবাজার, শ্রীমংগল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে এ পর্যন্ত ১৪টি অন্ধ চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমে কয়েক হাজার রোগীকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াব্যাপী এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বিস্তৃত।

ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদের আর একটি কীর্তি হলো সিলেট যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি। এর মাধ্যমে বহু দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগীকে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগ নিরোধ কেন্দ্র। বহু লোকও এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'ওরা সাংবাদিক মেরেছে'	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

ওরা সাংবাদিক মেরেছে

নিজামুদ্দীন আহমেদ সাংবাদিক জগতে একটি বিশিষ্ট নাম। এই নামটির সাথেই সম্পর্ক ছিল বিপিআই; বিবিসি; এপিএ, ইউপি, আই'র।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা চূড়ান্তরূপ নেয়ার প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের (বি, বি, সি) অনুষ্ঠান শুনতে গিয়ে যেসব সাংবাদিকের পাঠানো সংবাদ শুনতে বহু উদগ্রীব হয়ে থাকতেন তাদের মধ্যে নিজামুদ্দীন আহমেদ অন্যতম। এখানে বি, বি, সি'র সংবাদ ঘোষকদের কণ্ঠ থেকে খবর ভেসে আসে নিয়মিত প্রতিদিন, কিন্তু শোনা যায় না একটি ঘোষণা ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা নিজামুদ্দীন আহমেদ খবর পাঠিয়েছেন। কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকতো তাঁর পাঠানো সংবাদ শোনার জন্যে, আর অবাক হয়ে ভাবতো কি দুরন্ত সাহস লোকটার। সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে কেমন করে তিনি সেদিন পাঠিয়েছেন খবরের পর খবর- বাংলাদেশে পাক বর্বর বাহিনীর হত্যাকাণ্ড আর ধ্বংসলীলার খবর পাঠিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন বিশ্ব মানবতাকে। আর মুক্তিযোদ্ধাদের এক একটি দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন বাংলাদেশের মানুষকে। আলবদর তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ১২ই ডিসেম্বর দুপুর দুটোয় তাঁর একান্ত প্রিয়জনের মাঝ থেকে। সে দিন তাঁর প্রিয়জন, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ১১ বজরের মেয়ে শিল্পী, ৯ বছরের রিমি আর ছোট্ট বাপ্পি অবাক বিস্ময়ে দেখেছিল তাদের প্রিয়জনকে খাবার টেবিল থেকে নিয়ে যাচ্ছে দস্যুরা। ছোট্ট ছেলে-মেয়েগুলোর আকুল আর্তনাদেও নরপিশাচদের মন এতটুকু টলেনি।

তাকে নিয়ে যাবার পর ছোট্ট শিল্পী, রিমি, বাপ্পি তাদের বাবার ফিরে আসার অধীরতর অপেক্ষায় কাল কাটিয়েছে, মিসেস আহমেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন বারবার কিন্তু সব কিছুই নিস্ফল।

বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন তাঁর বন্ধুবান্ধব তাঁর সৎসাহসের জন্য প্রশংসা জানাতে। তাঁর নির্ভীকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু নিজামুদ্দীন আহমেদ আর ফিরে আসেননি তাঁর প্রিয়জনের মাঝে।

সাংবাদিক জগতে নিজামুদ্দীন আহমেদের পরিচিতি দীর্ঘদিনের। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি জড়িয়ে পড়েন এই পেশায় এবং সে সময়ই তিনি 'সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট, 'দৈনিক মিল্লাত' ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

এরপর তিনি তদানীন্তন পিপিআই'র প্রথম ও একমাত্র সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন ১৯৫৮ সালে। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানকে তিনিই সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে তোলেন এবং ১৯৬৪ সালে এর সম্পাদক হন। নিখোঁজ হবার দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী কর্মকর্তা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যোগেশ বাবুর হত্যা-কাহিনী	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

কেউ ভাবতে পারেননি যে যোগেশ বাবুকে এভাবে হত্যা করা হবে

শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ। একটি নাম। একটি ইতিহাস। দুঃস্থ অসহায় মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একটি প্রাণ। তাঁর জীবনের একমাত্র ছিল 'সাধনা ঔষধালয়'। যে ঔষধালয়ের বাংলাদেশ ছাড়াও সমগ্র বিশ্বজোড়া রয়েছে খ্যাতি। এমনি নব নব সৃষ্টির মাঝেই যোগেশ বাবু বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই বাঁচতে পারেননি। বর্বর খান সেনাদের হাতে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হলো। নরপিশাচদের হাতে অবসান হলো একটি অমূল্য জীবনের।

সহকর্মীদের সবাই সেই কালরাত্রিতে কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিল। প্রাণের মায়ায় পালাতে বাধ্য হয়েছিল তারা। শুধু যোগেশ বাবুর পোষা প্রিয় বানরটা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। প্রভূর সমূহ বিপদের আশংকায় সেদিন বনের পশুটি পর্যন্ত চীৎকার দিয়ে ঘোষণা করেছিল বিপদ বার্তা। কিন্তু যোগেশ বাবু তেমনি রইলেন। পালানোর সামান্যতম চেষ্টাও করেননি তিনি। বিপদের আশঙ্কায় তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আকস্মিক ভয়াবহ মৃত্যুর কথা বোধ হয় ভাবতে পারেননি।

পঁচিশে মার্চ। ভয়াল বীভৎস রাত। এই দিন বাংলার বুকে নরপশু খান সেনারা যে হত্যালীলা চালিয়েছিল তার করুণ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় কালো কালিতে বাঁধা থাকবে। রাজধানীর ঢাকার সমস্ত শহরটা ভয়ে প্রকম্পিত। গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে নগরবাসী। সবাই পালাচ্ছেন- দূরে অনেক দূরে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। বর্বরদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রত্যাশা প্রত্যেকের।

পুরান ঢাকার সূত্রাপুর এলাকার অনেকেই এরই মধ্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সমস্ত এলাকার মাঝে শুধু একটি মাত্র বাড়ীই যেন একমাত্র প্রহরী। স্তব্ধ, নিঃঝুম পরিবেশ। বিরাট এলাকা জুড়ে একটা কারখানা সাধনা ঔষধালয়। সমস্ত বাড়ীটার প্রহরী যোগেশ বাবু। কারখানার নির্জন প্রকোষ্ঠে তিনি কাটিয়েছেন জীবনের সুদীর্ঘকাল। তাঁর একমাত্র সাধনাস্থল এই কারখানা। নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাথী ছিল কারখানার শ্রমিকরা। দিন শেষে পড়ন্ত বেলায় শ্রমিকরা সবাই যখন একে একে চলে যেত, তখন রামপাল আর সুরুজ ছিল তাঁর একমাত্র সাথী।

রামপাল ও সুরুজ কারখানার দারোয়ান। তারা দীর্ঘ সতের বছর ধরে বাবুর সাথে কাটিয়েছে। পঁচিশে মার্চের পর সবাই যখন একে একে চলে গেল- তখনও ওরা বাবুকে ছেড়ে যায়নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ওরা তাঁর কাছে ছিল। রাত দুপুরে বাবু যখন উন্মনা হয়ে উঠতেন- তখন ওরাই ছিল তাঁর একমাত্র সাথী- নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘদিনের সহচর।

আলাপ করছিলাম দারোয়ান দু'জনের সাথে। তখন সূর্যদেব সবে বিদায়ের তোড়জোড় করেছেন। আধো আলো আধো আঁধারের এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে বসে কথা হচ্ছিল আমাদের।

পঁচিশে মার্চের পরের ঘটনা। সম্ভবতঃ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ অথবা মাঝের শেষের দিক। সেই দুর্যোগ রাতের সঠিক তারিখ আজ নাকি ওদের কারো মনে নেই। স্মরণ নেই সেই ভয়াবহ তারিখের কথা।

নিস্তব্ধ নগরী। রাত নিঃঝুম। সাধনা ঔষধালয়ের গেটে প্রহরারত দারোয়ান। রামপাল, ইউসুফ মিস্ত্রি, ভূমিসিংহ, সুরুজ সেই ভয়াল রাতের প্রহরী। সেই থমথমে পরিবেশে হঠাৎ একটি মিলিটারী জীপ এসে থামলো। তখন রাত দুপুর। পাঁচ-ছয়জন সশস্ত্র সৈনিক গাড়ী থেকে নামলো। তাদের সবার হাতে ভারী অস্ত্র। একে একে গেটের তালাগুলো আঘাতে ভেঙ্গে ফেললো ওরা। তারপর কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলী ছুড়লো। দোতলায় যোগেশ বাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সুরুজ পাহারাদারও সন্ত্রস্ত। বর্বরদের বিরুদ্ধে তার বন্দুকটা গর্জন করে উঠলো। পরপর কয়েক রাউন্ড গুলী ছুড়লো সে এলোপাতাড়ি। জল্লাদ খান সেনাদের উদ্যত রাইফেল গর্জিয়ে উঠল। গুলীর মুহুর্মুহু আওয়াজে রাতে নিস্তব্ধতা যেন ভঙ্গ হলো, সারা এলাকাটা যেন কেঁপে উঠল। উভয় পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ হলো গুলী বিনিময়। সে রাতে খান সেনারা সুবিধা করতে পারলো না। সামান্য একজন অস্ত্রশিক্ষণীয় বাঙ্গালী পাহারাদারের কাছে পরাজিত হলো খান সেনারা। কি যেন ভেবে তারা পালিয়ে গেল।

বাঙ্গালী বীর সুরুজ সেই স্মরণীয় রাতেই বাবুকে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলেছিল। বাবু তখনও তার কথায় কর্ণপাত করেননি। ভেবেছিলেন হয়তো মরতে যদি হয়, জন্মভূমিতেই মরবো।

পরদিন সকাল। রাতের সেই ভয়াবহ ঘটনা তখনো চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। সন্ত্রস্ত যোগেশ বাবু ও তাঁর ভীত সহকর্মীরা ঘটনাস্থল দেখতে নিচে নেমে এলেন। সকাল তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। যোগেশ বাবু নিচে নেমেছেন, সবে গত রাতে খান সেনারা যে ধ্বংসের স্বাক্ষর রেখে গেছে তা অবলোকন করছেন। এমনি সময়ে তিনটি মিলিটারী জীপ কারখানার সামনে এসে থামল। গাড়ীগুলো ভর্তি সশস্ত্র সৈনিক। খান সেনা বর্বরদের সাত-সকালে আগমনে বাবু আরো ভীত হয়ে উঠলেন। এক অজানা আশঙ্কায় মনটা যেন দমে গেল তাঁর। যদিও তিনি নাকি কখনো মৃত্যুকে ভয় করেন না। তাঁর সঙ্গী সাথী (সহকর্মীরাও) কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তারাও। জল্লাদ খান সেনারা নিচে সবাইকে লাইন করে দাঁড় করাল। বর্বরদের কয়েকজন যোগেশ বাবুকে নিয়ে উপরে গেল। উদ্যত রাইফেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ সেদিন কি বলেছিলেন কেউ জানতে পারেনি।

এদিকে নিচে সবাই ভাবল এই হয়তো সময়। মোক্ষম সুযোগ। প্রথমে একটি বাড়ীতে সুযোগ বুঝে পালাল ওরা। হয়তো বর্বরদের চোখে পড়েনি। তাই সেদিন তারা কয়েকজন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু একজন বাঁচতে পারলেন না। যিনি ভালবাসতেন এদেশকে। এদেশের মাটিকে। দেশের জনগণকে। যোগেশ চন্দ্র ঘোষ নিহত হলেন বর্বরদের নিষ্ঠুর সঙ্গীনের খোঁচায়। জল্লাদরা তাদের হিংস্র বেয়নেটের আঘাতে একটা অনন্য জীবনের অবসান এনে দিল।

সাথীরা সেদিন সবাই প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিল সত্যি। কিন্তু ফিরে এসে তাদের মনিবকে পায়নি তারা আর। পরে বর্বর খান সেনারা চলে গেলে অনেকে এসছিল। এসেছিল সহকর্মীরা। পাড়া-পড়শীরা। তাদের প্রাণপ্রিয় যোগেশ বাবুকে একবার দেখতে। না, শ্রদ্ধাভাজন যোগেশ বাবুকে তারা আর দেখতে পারেনি। ওরা যখন দেখতে এসেছে ডোমেরা তখন যোগেশ বাবুর লাশ নিতে এসেছে।

অবশেষে তাঁর দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হলো রান্নাঘরের মেঝেতে। উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। বুকে তাঁর সঙ্গীনের ক্ষত চিহ্ন। রক্ত ঝরার ধারা ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। শুকনো কালো রক্তের মাঝে তিনি পড়ে আছেন। বর্বরা তাঁকে শুধু হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাবুর সারা জীবনের অর্জিত সকল ধন-সম্পদ নিয়ে গেছে লুণ্ঠন করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইত্তেফাকের সাংবাদিকের লেখায় ২৫শে মার্চ রাতের সামরিক হামলার প্রত্যক্ষ বিবরণ	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই
বেঁচে থাকাটাই পরম বিস্ময়

মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, বেঁচে থাকাই পরম বিস্ময়। কথাটা যে কে বলেছিলেন, ঠিক এ মুহূর্তে আমি তা স্মরণ করতে পারছি না। তবে কথাটা যে অসত্য বা অতিরঞ্জিত কিছু নয় নিজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। আর না করেই বা উপায় কি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে যাওয়া সে যে কত বড় বিস্ময় তা অনুমানের পর অনুভূতির ব্যাপার, সে বিভীষিকাময় স্মৃতি যখন মনে করি, তখন প্রকৃতই নিজেকে নিজের জিজ্ঞেস করতে প্রবৃত্তি হয়, আমি বেঁচে আছি তো।

এর জবাব দেবার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে পঁচিশে মার্চের সেই ভয়ঙ্কর রাতে। যে রাতে আমরা আটটি প্রাণী প্রাণান্তকর অবস্থার ভিতর দিয়ে অনুভব করেছি প্রতিপক্ষের মৃত্যুযন্ত্রণা। লক্ষ্য করেছি একদল মানুষ জন্তুর হু-হুংকার। আর শ্মশানের শেষ প্রান্ত চরদের মানুষের জীবন নিয়ে কানামাছি খেলার নিদারুণ উপহাস।

দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদকীয় বিভাগের একজন সদস্য হিসাবে সাধারণতঃ রাতের বেলায় অফিসে থাকার কথা আমার ছিল না। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। আড্ডা মেরে যার অভ্যাস, সকাল সকাল সে বাসায় ফিরে কেমন করে। সকাল দশটার দিকে অফিসে আসতেই এডিটর সাব ডেকে বললেন, শেষ পরিণতি মোটামুটি ভালর দিকেই মনে হচ্ছে। আপনাকে একটা এডিটরিয়াল লিখতে হবে।

এডিটরিয়ালটার বক্তব্য বিষয় হবে মোটামুটি এরকম। সাড়ে বারটার মধ্যেই আমার লেখা শেষ হয়ে গেল। গেলাম প্রেসক্লাবে এবং তারপর সেখান থেকে সবুজ শ্যামল ছাওয়া রমনা পার্কের পূর্বদিকস্থ সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবনের (গণভবন) কাছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবনের পশ্চিম দিকের ফুটপাতের উপর একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে যতদূর চোখ যায় শুধু পুলিশ আর পুলিশ এবং সে সাথে উর্দি পরা ও সাদা পোশাক পরিহিত সামরিক সেনারা। এদের গর্হিত পদক্ষেপ আর শ্যেনদৃষ্টি কালা পাহাড়ের চিত্তকেও ভীতিবিহ্বল করে তোলে। সেখানে অধিকক্ষণ দাঁড়ানো তাই স্বস্তিকর বোধ হলো না। ফিরে এলাম প্রেসক্লাবে। কথাবার্তা এবং বাতাসে ভেসে আশা গন্ধে যেন অনুভব করলাম একটা দ্রুত পরিবর্তনের সুর। প্রভাত সূর্য যে আশা ও সম্ভবনার বাণী নিয়ে উদিত হয়েছিল, পড়ন্ত বেলায় যেন তা রাহুগ্রস্ত প্রায়। এ অবস্থায় বাসায় ফিরব মনে করে পথে নামতেই সিরাজ ভাই (শহীদ) ডেকে বললেন ''মিলন, চল অফিসে যেতে হবে।'' কেন জিজ্ঞেস না করেই রিকশায় তার পাশে যেয়ে বসলাম। তিনি বলতে লাগলেন, ''সবকিছু উলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা ভীষণ পরিণতির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।'' এমনি বেশী কথা বলার অভ্যাস আমার নেই, তদুপরি বক্তব্যটির কোন সুদত্তর খুঁজে পেলাম না। পুনর্বার যখন অফিসে ফিরে এলাম রাত তখন ন'টা। তাড়াতাড়ি প্রেস থেকে এডিটরিয়ালটা আনিয়ে আপাদমস্তক সংশোধন করলাম। তখন কে জানতো কাল প্রভাতে কেন কোন দিনই এ সম্পদকীয় আর আলোর মুখ দেখবে না। রাত দশটার দিকে সিরাজ ভাইকে বললাম, 'ভাব-সাব ভারী খারাপ মনে হচ্ছে, চলুন বাসায় ফিরে যাই।'' তিনি জবাব দিলেন, ''কেমন করে যাব, কাগজ বের করতে হবে না?'' প্রত্যুত্তরে আমি আর কিছু বলা সমীচীন বোধ করলাম না। জানতাম ইত্তেফাক সিরাজ ভাইর প্রাণ, সিরাজ ভাইর ধমনীতে এর স্রোত প্রবাহিত, সুতরাং বলে-কয়ে লাভ নেই। আরও কিছুক্ষণ আলাপ করার পর তিনি বললেন, 'তুই বরং চলে যা।' কিন্তু আমার জানি কেন অফিস ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কি ঘটে না ঘটে তা দেখার ও

জানার কৌতূহলে পেয়ে বসেছিল আমাকে। তবু রাত এগারোটার দিকে আমি, আমির হোসেন আর নজরুল অফিসের পিকআপ কারে রওয়ানা হলাম মগবাজারের দিকে। কিন্তু যাওয়া আর হলো না। তদানীন্তন, গভর্নমেন্ট হাউস (বঙ্গভবন) এর কাছাকাছি যেয়ে থেমে গেল পিকআপের চাকা। প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে ইট, কাঠ, লোহা-লক্কড়ের বেরিকেড। দশ হাত অন্তর সমস্ত পথ জুড়ে এ অবস্থা। আর ইতঃস্তত চঞ্চল চরণের ভিড়। কারো হাতে লোহার ডান্ডা, কারো বা বাঁশের লাঠি। এ ডান্ডা আর লাঠি দিয়েই মানুষ জঙ্গীশাহীর দানবদের রোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনে মনে ভাবলাম এ কি সম্ভব? আধুনিক মারণাস্ত্রের সম্মুখে লাঠি সম্বল করে তিষ্টে থাকা কি অকল্পনীয় নয়? তবু মনে মনে আনন্দিত হলাম এ ভেবে যে, সত্যি বাঙ্গালী আজ জেগেছে।

সেখান থেকে গাড়ী ঘুরিয়ে আমি ফিরে এলাম অফিসে কিন্তু আমির হোসেন আর নজরুল ফিরলেন না। শ্রীচরণ ভরসা করে তারা চলে গেলেন যে যার গন্তব্যস্থলে। অফিসে ফিরে সিরাজ ভাইর নিচের তলার ঘরটিতে যেয়ে দেখি ঘর শূন্য। তিনি চলে গেছেন উপরে বার্তা বিভাগীয় কক্ষে। সেখানে তখন অস্বাভাবিক অবস্থা। সকলেই কলম তুলে বসে আছেন। দলে দলে লোক আসছে-যাচ্ছে, বেশীর ভাগই তরুণ। তাদের চোখে মুখে ভীতি মিশ্রিত জিজ্ঞাসা। খবর পেলাম মহাখালীর দিকে নাকি মিলিটারী এগিয়ে যাচ্ছে। আর একজন তরুণ প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে এসে বললেন, এই মাত্র খবর পেলাম, মিলিটারী ইকবাল হল ঘিরে ফেলেছে। সেখানে গোলাগুলি চলছে। আপনারা কিছু জানেন কি? আমরা তাদের মতই উড়া খবরের কথা বললাম। সিরাজ ভাই তাদের যার যার ঘরে চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। মুহুর্মুহু টেলিফোন আর সংবাদ সংগ্রহেচ্ছুক লোকজনের আগমনে ইত্তেফাক অফিস চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সে মাত্র স্বল্পক্ষণের জন্য, রাত বারোটা বাজতেই বহির্জগতের সাথে আমরা সম্পূর্ণ যোগাযোগ হারিয়ে ফেললাম। এতক্ষণ যে টেলিপ্রিন্টারের শব্দ হচ্ছিল তা স্তব্ধ হয়ে পড়ল, ছিন্ন করে দেওয়া হলো টেফিফোন যোগাযোগ।

আমরা তখন আটটি প্রাণী অপেক্ষা করছি চরম মুহূর্তের জন্য। রাত গভীর হতে শুরু করল। আর সে গভীরতার সাথে পাল্লা দিয়ে নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল মেশিনগানের কর্ণবিদারী শো-শো গর্জন, অসহায় মানুষের প্রাণফাটা আর্তনাদ, মাতা, ভগ্নি, জায়ার সকরুণ বিলাপ ধ্বনি। ঢাকার বুকে শুরু হল নারকীয় তাণ্ডবের উন্মত্ত লীলা। এরই মধ্যে আমরা নীচের ক্যান্টিন থেকে এক টিন টোষ্ট বিস্কুট আর অফিস পিয়ন আমিরের দোকান থেকে আনিয়ে নিলাম কয়েক প্যাকেট সিগারেট। মৃত্যু যতক্ষণ না তার হিমশীতল বক্ষে টেনে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা কিছু খেতে হবে। এমনি প্রাণান্তকর উৎকণ্ঠা আর মেশিনগান ও ষ্টেনগানের গর্জনের ভেতর দিয়ে রাত শেষ হয়ে এল। আবছা অন্ধকারে ঢাকা রাজধানীর রাজপথের চেহারাটা দেখার জন্য সিরাজ ভাই আর রেজা ভাই যেয়ে দাঁড়ালেন ইত্তেফাক অফিসের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দ্বিতলের জানালার পাশে।

প্রভাত রজনীর অবস্থা অন্ধকারের অবগুঠনে ঢাকা সাবেক গভর্নমেন্ট হাউসের দিক থেকে তখন ছুটে আসছে একটি সামরিক জীপ। সিরাজ ভাই আর রেজা ভাই ভাবলেন, জীপটা বোধ করি ইত্তেফাকের মোড় দিয়ে নারায়ণগঞ্জের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু নিমিষে তাদের সে ধারণা টুটে গেল। সম্বিত ফিরে পেতে দেখলেন সিরাজ ভাই দ্বিতলে মেঝেতে পড়ে গেছেন। আর তারই পাশে রক্তাক্ত দেহ শামছু, আমাদের কেন্টিন বয়। মেশিনগানের শিশার বুলেট ডান কানের নীচে দিয়ে গণ্ডদেশ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু জীবন তখনও স্পন্দনহীন হয়ে পড়েনি। কে যাবে ডাক্তার ডাকতে? কোন ডাক্তার আসবে এ সময়। আমরা কয়টি প্রাণী অশ্রুহীন অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলাম নিরপরাধ শামছুর মৃত্যু।

কিন্তু এখানে রুদ্ধবাক বিস্ময়ের শেষ নয়। একজন ছুটে এসে বললেন নীচে আমাদের গেইটের সামনে একটি প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে এক সময় আমরা অজ্ঞাত পরিচয় সে ব্যক্তির মৃতদেহ নিয়ে এলাম অফিসের আঙ্গিনায়। সে একজন হকার। তার পকেটে তখন আশিটি টাকা, হাতে হাতঘড়ি, আর একটা সাইকেল। কে জানে এই আশিটা টাকাই তার পরিবার-পরিজনের অন্নবস্ত্র সংগ্রহের মূলধন কিনা।

বেলা অনুমান ১০টার দিকে (২৬শে মার্চ) অনেক কষ্টে এ বাড়ীর ও বাড়ীর উপর দিয়ে সামছুর মৃতদেহ পাঠানো হলো গোপীবাগ মসজিদে। কিন্তু নাম না জানা হকার ভাইটির মৃতদেহ পাঠানো সম্ভব হল না।

শামছুর মরদেহ মসজিদে অপসারণের পর আমরা আবার বার্তা বিভাগের কক্ষে যেয়ে আশ্রয় নিলাম। জীবানানুভূতি বলতে যা বুঝায় কিছুই তখন নেই। সিরাজ ভাই তখন শুধু মাঝে মাঝে আক্ষেপ করছেন, 'হায়' বাচ্চাকাচ্চাদের দেখে যেতে পারব কিনা কে জানে। সাড়ে দশটার দিকে একটি বিশেষ শব্দে আমরা চমকিত হয়ে উঠলাম। রেজা ভাই বললেনঃ "এটা ট্যাঙ্কের শব্দ।" পূর্ব দিকের জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম-হ্যাঁ তাই। তিনটি ট্যাঙ্ক মতিঝিল রোড হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গন্তব্যস্থল সম্ভবতঃ রাজারবাগ। সেখানে কি হত্যাযজ্ঞ চলছে? হানাদার পশুর দল কোন কোন এলাকাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছে কিছুই তার জানার বা বুঝার উপায় নেই। শুধু অভিসার সিনেমা হল আর গোপীবাগের মোড়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানুষজন ভর্তি ডজন ডজন সামরিক যানের ভীড়। দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে অভিসার সিনেমা হলের দিকে তাকাতে নজরে পড়ল তিন চারটি পশু সিনেমা হলের পশ্চিম দিকের একটি প্রাচীর ঘেরা বাসার প্রাচীরের ওপর উঠে ভেতরে মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করছে। রেজা ভাই সাবধান করে বললেন, খবরদার কেউ বাইরে তাকাবে না। বাইরে থেকে দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। রক্ষা প্রকৃতই ছিল না। কারণ লক্ষ্য করেছিলাম রাজপথে কোন বেরিকেড কিংবা কাক পাখীর চিহ্ন না থাকলেও কতক্ষণ পর পরই মেশিনগান থেকে ইত্তেফাকের উপর গুলী বর্ষণ করা হচ্ছিল। এ যেন নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের উপর জাত-ক্রোধ মেটানো। মেশিন গানের গুলীর চোটে ইত্তেফাকের পশ্চিম দিকের জানালার শার্শী ঝন-ঝন করে ছিটিয়ে পড়ছিল। আর সে সাথে আমরা ক'জন কখনও আশ্রয় নিচ্ছিলাম টেবিলের তলায়, আবার কখনও বা আলমারী-টালমারীর তলায়।

জীবন মৃত্যুর এ লুকোচুরি খেলায় জঠর জ্বালার কথা স্বভাবতই মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু মনে করিয়ে দিলেন প্রেসের কয়েকজন কর্মী বন্ধু। হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে তারা বললেন পাশের বাসা থেকে কিছু ভাত আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। কে জানে আরও কতকাল এমনিভাবে থাকতে হবে। আপনারাও দুমুঠো খেয়ে নিন। কিছুক্ষণ পর উক্ত কর্মী বন্ধুটি একটি এলুমিনিয়ামের পাত্রে করে ভাত দিয়ে গেলেন তরকারী আনতে। কিন্তু সে যাওয়াই তার শেষ যাওয়া হল। তিনি আর তরকারি নিয়ে ফিরে আসতে পারলেন না। নীচে থেকে ভেসে আসল সুপারী ঠুকলে যে বিশেষ ধরণের শব্দ হয় তেমনি শব্দ। পরে বুঝেছি সে শব্দটা আর কিছুই নয়, তালা ভাঙ্গার শব্দ। সে শব্দ শেষ না হতেই আবার ভেসে আসল সেই পরিচিত আওয়াজ। দেখলাম একটা ট্যাঙ্ক এসেছে। দাঁড়িয়েছে ইত্তেফাক অফিসের পশ্চিম দিকের মোড়ে। তারপর আর দেখতে হল না। বিকট এক বোমার আওয়াজের সাথে সাথে থরথর করে কেঁপে উঠল ইত্তেফাক ভবন। মাটির পুতুলের মত ঝরে পড়ল টেলিফোন একচেঞ্জ কক্ষটি। আমরা উন্মাদের মত লুটিয়ে পড়লাম মেঝেতে। এ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম মনে নেই। মনে হল রেজা ভাইর হাঁক ডাকে, চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে বললেন, দেখতো ধুয়া দেখা যাচ্ছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে একজন পশ্চিম দিকে সরে এসে তাকালেন নীচে এবং জানালেন মেশিন ঘরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

অন্যের মনে তখন কি ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল তা অন্তর্যামী জানেন। তবে আমার মনে কেন জানি অপার্থিব একটা ভরসা এসে দানা বেঁধেছিল। মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় বাঁচব। ওরা আমাকে মারতে পারবে না। মুহূর্তে আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম, স্থির করলাম, যেমন করে হোক প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে?

বার্তা বিভাগ ও হিসাব রক্ষা বিভাগের মাঝখানে একটা ছয়-সাত ফুট উঁচু পার্টিশান ওয়াল। স্থির হল, পার্টিশানটা ডিঙ্গিয়ে হিসাব রক্ষা বিভাগে প্রবেশ করতে হবে। তারপর সেখানে লিফটের জন্য সংরক্ষিত গর্ত পথে নামতে হবে দেড় তলায় অবস্থিত জব সেকশনে। এবং জব সেকশন থেকে পেছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে পাশের বাড়ীতে। আমার জানি তখন কেমন মনে হল যে, স্যাণ্ডেল পায়ে এভাবে যাওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে স্যাণ্ডেলগুলো বার্তা বিভাগে রেখে দিয়ে একে একে আমরা গেলাম হিসাব রক্ষা বিভাগে।

আগুনের লেলিহান শিখার তাপ তখন আমাদের গায়ে এসে লাগছে। কিন্তু সেদিকে আমাদের কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। হিসাব রক্ষা বিভাগে এসে আমি আর ইয়াহিয়া বখত লিফটের গর্ত দিয়ে লাফিয়ে পড়লাম নীচে। কিন্তু বিধি বাম। জব সেকশনের দরজা জানালা বন্ধ। প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি করেও যখন খোলা সম্ভব হল না আবার দেয়াল বেয়ে সেই গর্ত পথে উঠে এলাম হিসাব রক্ষা বিভাগে। আজ ভাবি কেমন করে এটা সম্ভব হয়েছে? এখন কি আমার দ্বারা সম্ভব !

পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর আমাদের সামনে রইল দুইটি বিকল্প, এক আগুনে আত্মাহূতি দান এবং দুই, জীবন বাজী রেখে ভেতরের সিঁড়ি পথে পালানোর চেষ্টা। উঁকি মেরে দেখলাম, মেশিনগান হাতে দুইটি মানুষ জন্তু সাক্ষাৎ যমদূতের মত ইত্তেফাকের সামনের দিকের ছোট্ট খোলা আঙ্গিনায় পায়চারী করছে। তবু কি আর করা যায় । হামাগুড়ি দিয়ে আমরা আটজন হিসাব রক্ষা বিভাগ থেকে আসলাম ঢাকা টাইমস-এর অফিসে এবং তারপর সেখান থেকে হামাগুড়ি দিতে দিতে ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে নামলাম নীচে। সদ্য আমদানীকৃত ইত্তেফাকের মেশিন ঘর থেকে আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছে অস্থায়ী ঘরগুলোর মেশিন ঘরে। তারই ভেতর দিয়ে প্রায় উন্মাদের মত আমরা ছুটে গেলাম দেওয়ালের দিকে। তারপর সে ছ'ফুট দেয়াল পলকে অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম পাশের বাড়ীতে। দেখলাম, প্রেসের কর্মী ভাইয়েরা আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। পাশের বাড়ীর ছোট ছোট মেয়ে-ছেলেগুলো তখন প্রাণফাটা চীৎকার করছে। গৃহকর্তা পশ্চিমের ঘরটার বাঁশের বেড়া খুলে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কারণ, আগুন তখন ইত্তেফাক অফিসের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

ঠিক মনে নেই কে একজন যেন বললেন, আপনারা এখান থেকে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ওদিকে চলে যান। বুঝলাম, ইত্তেফাকের কর্মী ও সাংবাদিক আমরা, তাই এত ভয় তারপর আবার শুরু হল দেয়াল টপকানোর পালা। একের পর এক দেয়াল টপকিয়ে আমরা চারজন এলাম পূর্বদিকে আর অবশিষ্ট চারজন চলে গেল অন্যদিকে। সিরাজ ভাই হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন। আমার ডাক পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে তখন অঝোর ধারায় রক্তপাত হচ্ছে। ইত্তেফাকের তদানীন্তন ড্রাইভার করিম আমাদের দেখতে পেয়ে তার সাথে আরও কিছুটা নিয়ে গেলো। রেজা ভাই বললেন, ব্রাþণ চিরণের কাছে আমার ছোট ভাই বেণু থাকে। সেখানে যেতে পারলে রাতটা কাটানো যাবে। বলা বাহুল্য, তখন ২৬ শে মার্চের সন্ধ্যা।

সব পথ আমাদের জানা ছিল না, করিম এগিয়ে এলো সাহায্যার্থে। এ বাড়ী ও বাড়ী এ গলি ও গলির ভেতর দিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম গোপীবাগের পূর্বদিকস্থ রেল লাইনের ধারে। দূর থেকে তখন ভেসে আসছে মুহুর্মুহু মেশিনগানের গুলীর আওয়াজ। রেল ষ্টেশনের নির্মাণাধীন ওভার ব্রীজের উপর দণ্ডায়মান জল্লাদ ইয়াহিয়ার মানুষ জন্তুর বাহিনীর দুজন রোজ গার্ডেনের দিকে অবিরাম গুলী ছুড়ছে। ঝন ঝন করে উঠছে টিনের ঘরগুলো। তারই ভিতর দিয়ে ময়লা ও বিষ্টায় সংকীর্ণ রেল লাইনের ঢালু দিয়ে রাতের আবছা আঁধারে আমরা হামাগুড়ি দিতে দিতে যেয়ে উঠলাম ব্রাþণ চিরণের বেনু সাবের রাস্তায়। রাতে ঘুম হল না। এদিকে গুলীর আওয়াজ, মানুষের আর্তচীৎকারে আর অন্যদিকে বাসার চিন্তা। ২৭ তারিখে আটটায় ঢাকা বেতার থেকে ঘোষিত হল ''সকাল সাতটা থেকে সান্ধ্যআইন তুলে নেওয়া হয়েছে।''

আমরা বেরিয়ে এলাম। চলে গেলাম যে যার বাসার দিকে। সেদিনই সিরাজ ভাইর সাথে আবার দেখা করেছি। দেখতে এসেছি ইত্তেফাক-এর ধ্বংসস্তূপ আর বিধ্বস্ত নগরীর অবস্থা। পথে পথে লক্ষ্য করেছি- শত শত নিরীহ নিরপরাধ মানুষের মৃতদেহ। সিরাজ ভাইর বড় আশা ছিল তার নোট বইয়ে তুলে রাখা এসব ঘটনা তিনি একদিন না একদিন ব্যক্ত করবেন। কিন্তু কে জানত সে আশা তার পূর্ণ হবার নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পাক বাহিনীর হামলার বিবরণ	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

হানাদারদের ঘাঁটি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ

\ অধ্যাপক গোলাম জিলানী নজরে মোরশেদ \

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মত ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজেও কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে ছাত্রদের পদভারে কলেজ আজ সরগরম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যা বর্বর পাক বাহিনী তাচ্ছিল্যভাবে নষ্ট করে দিয়েছিল তা এক এক করে জোগাড় করা হচ্ছে। কলেজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিরলস চেষ্টা চলছে। সবই একদিন হয়ত হবে। আর সব অভাবই হয়ত একদিন পূরণ হবে। কিন্তু পূরণ হবে না কয়েকটি নিবেদিত প্রাণের অভাব, এরা ফিরে আসবেন না। এরা হচ্ছেন অধ্যাপক লেঃ কর্নেল মনজুরুর রহমান, অধ্যাপক হালিম খান, মালি আবদুস সাত্তার, চৌকিদার গাজী ও চৌকিদার সইজদ্দীন।

এদের মর্মান্তিক মৃত্যুর কাহিনী বলতে গেলে আরও একটু গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। ২৫ তারিখের রাতে ঢাকার বুকে ইয়াহিয়ার সৈন্য বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের খবর যখন ঝিনাইদহ পৌঁছল তখন ঝিনাইদহের জনসাধারণের সাথে সাথে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মচারীরাও দেশের জন্য সংগ্রাম করার বলিষ্ঠ শপথ নিল। সেই সময় বর্তমান প্রবন্ধকার, অধ্যাপক আবদুল হালিম খান (মরহুম) ও অধ্যাপক শফিকুল্লার (বর্তমানে ক্যাপ্টেন), নেতৃত্বে ক্যাডেট কলেজ প্রতিরক্ষা দল গড়ে তোলা হলো এবং ঝিনাইদহের সে সময়কার এস, ডি, পি, ও জনাব মাহবুব উদ্দীন (বর্তমানে মেজর ও বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী) এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। (ইনি প্রথমে ঝিনাইদহ প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলে চুয়াডাঙ্গাস্থ সাবেক ই, পি, আর-এর মেজর আবু ওসমানের নির্দেশ মত কাজ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন ও পরে মুজিব নগর থেকে মেজর পদে উন্নীত হন)।

এরপর ৩০ শে মার্চ গভীর রাতে কুষ্টিয়া থেকে পাক বাহিনীর ২৫ বেলুচ রেজিমেন্টের ১ কোম্পানী সৈন্য যখন অতি সন্তর্পণে ঝিনাইদহের নিরীহ নিরপরাধ জনসাধারণের উপর তাদের হিংস্র নখরাঘাতের জন্য মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো, তখন ঝিনাইদহে শুধু ক্যাডেট কলেজের মুষ্টিমেয় সংগ্রামী বীর ছাড়া আর কেউ ছিল না। এরাই রাত দুটোয় তাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করে। এরপর এই হানাদার দলকে বাংলার যে বীর সৈনিকরা নির্মূল করে তাদের অধিকাংশই ছিল এ কলেজের কর্মচারী।

এরপর ১লা এপ্রিল যখন যশোহর থেকে আগত সৈন্যরা নতুন করে ঝিনাইদহ দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করে তখন তাদেরকে ঝিনাইদহের ছ'মাইল দূরে বিষখালিতে যে বাধা দেওয়া ও পর্যুদস্ত করা হয় তাতেও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীদের দান অপরিসীম। শুধু যুদ্ধ করাই নয়, নতুনদের শিক্ষা দেওয়া, সংবাদ সরবরাহ, মুক্তিবাহিনীর রসদ যোগানোর দায়িত্ব নেয় এ কলেজের কর্মচারীরা। ৫শত মুক্তিযোদ্ধার খাবার তৈরী করার ভারও নেয় এই কলেজের কর্মচারীরা। অবশ্য সে সব কথার অবতারণা অন্যত্র করা যাবে।

এখন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। এরপর জয়-পরাজয়ের মাঝে চললো কিছুদিন। কখনও মুক্তিবাহিনী যশোহরের দিকে এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে। এদিকে হানাদার বাহিনী প্রতিদিনই বিমানযোগে যশোহরের প্রচুর গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র ও নতুন সৈন্য সমাবেশ করে ফেলল। সে সময় মেজর আবু ওসমান সাহেবের নির্দেশে ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দীন মুক্তি বাহিনীকে Close up করে ভারতে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন পড়ে রইল অরক্ষিত অবস্থায়। পাক বাহিনী ফাঁকা মাঠ পেয়ে বীরদর্পে ঝিনাইদহে প্রবেশ করল ১৬ই এপ্রিল।

এ সময় এ মহতি প্রতিষ্ঠান ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অন্যান্য সবাই প্রাণের মায়ায় কলেজ ত্যাগ করে চলে গেলেও কয়েকটি প্রাণী এ কলেজ ত্যাগ করেননি। সম্ভবতঃ এ প্রতিষ্ঠানের মায়ায়। এ প্রতিষ্ঠানের সব কিছুকে অক্ষত রাখার জন্যই তাদের এ ব্যর্থ চেষ্টা। এদেরই একজন চৌকিদার গাজী হলেন হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত প্রথম বীর সৈনিক। অধ্যক্ষ কর্নেল রহমান তাকে নিজ সাইকেল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ঝিনাইদহের অবস্থা দেখে আসতে। কর্তব্যনিষ্ঠ এ মহাপ্রাণ লোকটি তার দায়িত্ব পালন করতে যখন ঝিনাইদহ শহরের দিকে এগুচ্ছিলেন, তখন হানাদার বাহিনীর নির্মম বুলেট এসে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দেয়। তার প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ে ক্যাসেল ব্রীজের তলায়। পরে বর্বর বাহিনী তার পবিত্র দেহ আরও বহু দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর পবিত্র দেহের সাথে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগায়। আজও ক্যাসেল ব্রীজের পাশে রাস্তা খুঁড়লে অনেক কঙ্কাল পাওয়া যাবে।

এরপর ঐদিন বেলা চারটার দিকে হানাদার বাহিনী কলেজে ঢুকে অধ্যক্ষ কর্নেল রহমান (মরহুম), অধ্যাপক আবদুল হালিম খান (মরহুম), ইলেকট্রিশিয়ান মোহাম্মদ আলী ও অধ্যক্ষের বাবুর্চী আবুল ফজলকে ধরে নিয়ে যায়। আর্মির একজন সিনিয়র অফিসারকে সামান্যতম সম্মানও তারা দেখায়নি। অন্যান্যদের সাথে তাকেও তারা হাত বেঁধে নিয়ে যায়। বিভিন্ন ক্যাম্পের বিভিন্ন লোকের কাছে তারা লাঞ্ছিত হন। এদেরকে এরা নির্মমভাবে প্রহার করে। এরপর প্রহসনস্বরূপ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় তদানীন্তন যশোহর গ্যারিসন কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার দুররানীর কাছে। ব্রিগেডিয়ার তাদের চা পরিবেশন সারেন। মৌখিক ভদ্রতাও দেখালেন ও সর্বোপরি ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদের রাত বারটায় কলেজে গেটে পৌঁছে দেওয়ালেন। ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষুধার্ত চারটি প্রাণী কলেজে এসে সে রাতের জন্য মসজিদে আশ্রয় নিলেন। পরের দিনটা ভালই কাটল।

এরপর এলো ১৮ই এপ্রিল। কলেজে মাত্র চারটি প্রাণী আছেন- অধ্যক্ষ, অধ্যাপক হালিম খান, বাবুর্চী আবুল ফজল ও হসপিটাল এ্যাটেনড্যান্ট শামসুল আলম। চারিদিক জনপ্রাণীহীন, খাঁ খাঁ করছে। একটা থমথমে ভাব। মাঝে মাঝে এ স্তব্ধতা ভেঙ্গে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কে দ্রুতগামী আর্মির গাড়ীর আওয়াজ। একটা অমঙ্গলের ছাপ যেন চারদিকে বিরাজ করছে। সবেমাত্র অধ্যক্ষ কর্নেল রহমান ও অধ্যাপক হালিম খান দুপুরের খাবার খেয়ে অধ্যক্ষের বাংলোর উপর তলায় বিশ্রামের জন্য গেছেন। যাবার সময় হসপিটাল এ্যাটেনড্যান্টকে তাদের দুজনার জন্য ঔষধ আনতে বলে গেছেন (আগের দিনের প্রহারের ফলে দুজনারই নাক মুখ ফুলে গিয়েছিল ও কানে ব্যথা হয়েছিল)। হসপিটাল এটেনড্যান্ট সবেমাত্র সাইকেলে করে অধ্যক্ষের বাংলো গেট পার হয়ে কিছুদূর গেছে। এমন সময় পেছনে ১ নম্বর গেট ভেঙ্গে কয়েকটা আর্মি ট্রাক কলেজে ঢুকে পড়ে এবং অধ্যক্ষের বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়।

এই দলটি আসছিল কুষ্টিয়া থেকে। এদের অধিনায়ক ছিল ১২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ইকবাল। এই নরপিশাচের আদেশে জোওয়ানরা অধ্যক্ষকে, অধ্যাপক হালিম খানকে ও বাবুর্চী আবুল ফজলকে ঘর থেকে বের করে গেটের নীচে বসায়। হানাদার বাহিনীর সাথে ছিল তাদের চর কয়েকজন বিহারী। এদের মধ্যে সব চাইতে বেশী উদ্যোগী ছিল ঝিনাইদহে টমেটো নামে পরিচিত বিহারীটি। এই নরপিশাচ অধ্যাপক হালিম খান ও অধ্যক্ষ কর্নেল রহমানের নামে তার পরিবারবর্গ নিধনের মিথ্যে অপবাদ দেয়। আর এই মিথ্যে অপবাদের উপর ভিত্তি করেই ক্যাপ্টেন ইকবাল তার ও তার অনুচরদের হাতে ছেড়ে দেয় অধ্যাপক হালিম খানের প্রতিশ্রুতিশীল জীবনকে। অধ্যক্ষের বাংলোর পেছন দিকে এরা অসহায় হালিম খানকে নিয়ে বেয়োনেট আর তলোয়ারের নির্মম আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। অধ্যক্ষ এক সময় গর্জে উঠলেন, Don't torture him, if you want to kill him, better shoot. তাদের এই নির্মম আঘাতে এক সময় এই নির্ভীক দেশপ্রেমিকের বিশাল দেহ এই দেশের পবিত্র ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে।

তারপর চলে এ হত্যাযজ্ঞের আর এক অধ্যায়। অধ্যক্ষকে ঐ একই অপবাদ দেওয়া হয়। তারপর নরপিশাচ ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথে কর্নেলের কথা কাটাকাটি হয়। কর্নেল বললেন, ‘‘আমি আর্মি অফিসার, আমাকে এমনি

মারা অন্যায়। আমার অপরাধের বিচার একমাত্র সামরিক আদালতই করতে পারে।'' প্রশ্ন করলেন, ''একজন আর্মি কর্নেল একজন ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে সে মর্যাদা পেতে পারে, আমাকে দেওয়া হচ্ছে না কেন?''

কিন্তু এ নরপিশাচদের কাছে সকল যুক্তিই বৃথা গেলো। সিংহ-হৃদয় মহাপুরুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন, হাত থেকে খুলে দিলেন ঘড়ি, পকেট থেকে বের করে দিলেন নিজের ও কলেজের চাবি যা এতোদিন ছিল তার দায়িত্বে। নিজের চোখে দেখলেন একজন সিপাই তারই চোখের সামনে থেকে তারই ঘড়ি তুলে নিয়ে নিজের হাতে পরে ঘড়ি পরা হাতটা কেমন লাগে তাই-ই লোলুপ দৃষ্টিতে নেড়ে চেড়ে দেখছে। দেখলেন জোয়ানরা উল্লাসের সাথে তার দামী জিনিসপত্র ও কলেজের মূল্যবান জিনিসপত্র ট্রাকে তুলছে। এই মহাপুরুষের কোন ভাবান্তর হলোনা, আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলেন না, করলেন না করুণা ভিক্ষা, অমূল্য ধনপ্রাণ ভিক্ষাও চাইলেন না। শুধু চাইলেন পাঁচ মিনিটের সময়। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন বাংলোর সামনের লনে। বসলেন গিয়ে গোলাপ গাছের পাশে, কি যেন বিড় বিড় করে পড়লেন, বোঝা গেল না-শুধু ঠোঁট নড়া দেখে বোঝা গেল, তারপর হাত তুলে আল্লাহর কাছে যেন কি ফরিয়াদ করলেন, মোনাজাত শেষ করে বললেন, I am ready. এরপর কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম তিনটে আওয়াজ। নরপিশাচ মানব জাতির কলঙ্ক ইয়াহিয়ার সৈনিক ইকবালের ষ্টেনগানের তিনটি গুলী এক এক করে এ পবিত্র দেহে বিদ্ধ হলো। শরীরটা ঢলে পড়ল। আর শোনা গেল একটি মাত্র ক্ষীণ স্বর, ''মা আয়েশা, তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না।''

এরপর প্রাণভরে লুটে নিল কলেজের দামী দামী জিনিসপত্র, বাধা দেবার কেউ রইল না। তারপর তারা যখন উল্লাস করতে করতে ২ নম্বর গেট দিয়ে বের হচ্ছিল সে সময় তাদের নজর পড়লো গেটে কর্তব্যরত মালী সাত্তারের উপর। তাকে তারা ধরে নিয়ে ড্রেনের পাশে দাঁড় করিয়ে পর পর দুটো গুলী করে হত্যা করলো। গুলী দুটো তার দেহ ভেদ করে দেয়ালে বিদ্ধ হল। তার দেহ এলিয়ে পড়লো ড্রেনের মধ্যে। এত করেও ওরা শান্তি পেল না। আশেপাশের গ্রামে খুঁজতে লাগল কলেজের চাকুরে কে কোথায় আছে। এমনি এক গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসল হতভাগ্য চৌকিদার সইজদ্দীনকে। তাকে ধরে নিয়ে এসে কলেজের সামনে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের পুলের তলায় দাঁড় করিয়ে গুলী করল। তার প্রাণহীন দেহ পুলের তলায় পানিতে পড়ে গেল।

এমনি কত জানা অজানা লোকের রক্তের স্রোতের উপর ভেসে স্বাধীনতার তরী আমাদের কাছে নতুন জীবনের সাওগাত নিয়ে এসেছে। এদের রক্ত বিফল যায়নি। যেতে পারে না। কেননা স্বাধীনতার রক্তকে উন্নত ও সজীব রাখতে সারের প্রয়োজন হয়। আর সে সার হচ্ছে অত্যাচারীর ও অত্যাচারিতের তাজা উষ্ণ লাল রক্ত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
একাত্তরে রংপুরের আলমনগর	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

১৯৭১: আলমনগর, রংপুর

তিনটে গুলী, তিনটে শব্দ, তিনটে দাগ দাসু মিঞার। একটি চোখে, একটি মুখে একটি বুকে। বাসু মিঞার আর এক নাম মোহাম্মদ ইসমাইল মিঞা। তিনি রংপুর শহরের আলমনগর নিবাসী একজন জনগণমান্য দেশবরেণ্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন।

তার অপরাধ তিনি ধনী এবং আওয়ামী লীগার। তাকে যেদিন মারা হয় আমি সেদিন রংপুরে। একাত্তরের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে সপরিবারে নিজস্ব মোটরে করে শহর থেকে পালালেন দূর মফস্বল- ''পদ্মগঞ্জে''। বাসু মিঞা পালানোর কয়েক দিন আগেই তার বাড়ীর পাশের পাড়ার (মোড়ল) আজিজ মিঞাকে খান সেনারা রংপুর প্লাটফর্ম থেকে অবাঙ্গালীদের ইশারায় ধরে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্তও সে আজিজ মিঞা আর ঘরে ফিরে আসেননি। আমি তখন স্বয়ং প্লাটফরমে দাঁড়ানো।

বাসু মিঞা পালালেন জানাজানি হয়ে গেল অবাঙ্গালীদের মধ্যে। শুরু হল তার তল্লাশী। এদিকে শহরে ধরপাকড় করে পথে-ঘাটে সমানে গুলী করে মারছে খান সেনারা বুনো শুয়োরের মত।

একদিন শহরের গণ্যমান্য সর্বপরিচিত এগারজন বাঙ্গালীকে হাত পা বেঁধে মাহিগঞ্জ শ্মশানে রাত বারটায় গুলী করে মারে। তার মধ্যে একজন ভদ্রলোক ''ডাঃ মন্টু''। তিনি প্রথম গুলীর আওয়াজে মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান ঘাতকের অগোচরে। এগারজনের উপর প্রায় ৩০/৪০ টি বুলেট চালিয়ে চলে যায়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ডাক্তার মন্টু মরেন নি। শেষ রাতের দিকে তিনি আহত অবস্থায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে শ্মশান ও বাঁধন মুক্ত হয়ে ভারতের কোন এক হাসপাতালে যেয়ে ভর্তি হন। মৃত দশজনের মধ্যে জরজেট মিঞার জন্য আজও রংপুরের লোক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

এদিকে বাসু মিঞার তল্লাশী চলছে। ''বাসু মিঞা গাদ্দার হ্যায়, ও জয়বাংলাকা আদমী।'' অবাঙ্গালী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখেও শুনেছি। বাসু মিঞার জনৈক অন্তরঙ্গ দালাল বন্ধু খোঁজ পেয়ে বাসু মিঞার কাছে যেয়ে টাকা খাওয়া শুরু করলেন এবং তাকে শহরের বাড়ীতে ফিরে আসতে অনুরোধ জানালেন। সে দালাল বন্ধুটি অভয় দিলেন মেজর, কর্নেল, সবাই তার বন্ধু লোক। তাঁদের সঙ্গেই তিনি উঠাবসা করেন। অতএব তার কোন ভয় নেই, চিন্তা নেই, আশঙ্কা নেই। তাকে তো মারবেই না বরঞ্চ মেজর, কর্নেল তাকে তাদের নিজের গাড়ীতে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। সে দালালের তখন যথেষ্ট আধিপত্য রংপুর শহরে (দালালটি সম্ভবতঃ খৃষ্টান ধর্মীয় বাঙ্গালী)। বন্ধুর আধিপত্য দেখে, বিশ্বাস করে দীর্ঘ দেড় মাস পরে ফিরে এলেন শহরে নিজগৃহে। দালাল বন্ধুটি মিথ্যা বলেন নি। সত্যিই মেজর, কর্নেল, নায়েক সবাই দলে দলে যাতায়াত শুরু করেন বাসু মিঞার বাড়ীতে। বাসু মিঞাকে তারা দোস্ত বানালো, বাসু মিঞার মাকে মা, স্ত্রীকে ভাবী এবং অন্যান্য আর সবাইকে বেটা, মেয়ে, দোস্ত, চাচা, বন্ধু ইত্যাদি পাতিয়ে নিলো খান সেনারা।

বাসু মিঞা ওদের বন্ধুত্ব পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন মৃত্যুর হাত থেকে। এদিকে রোজ বাসু মিঞাকে সকাল বিকাল ক্যান্টনমেন্টে গাড়ী করে নিয়ে যায় আবার রেখে যায়। যখন বাড়ীতে থাকে তখন অগোচরে দুটো মিলিটারী যে সিভিল পোষাকে তাকে চোখে চোখে করে রাখতো তা আমি নিজে চোখে দেখেছি। ক্যান্টনমেন্টে রোজ বাসু মিঞাকে নিয়ে নাচ, গান বাজনা আর পানীয় চলতো। এতে প্রায় দৈনিক ১/২ হাজার টাকা খরচ

হতো। এর সবই বাসু মিঞাকে বহন করতে হতো। তাছাড়া যখন বাড়ীতে আসে তখন তো গোশত পোলাও চা মিষ্টি, কফি, কলা, রয়েছেই। শুধু বন্ধুত্বের জন্যই এসব করেননি, প্রাণের ভয়েও করেছেন। কেননা আর বাঙ্গালী যাদের কাছে গাদ্দার, শত্রু বাসু মিঞা তখন বাঙ্গালী হয়ে তাদেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই এমন খাতির করাটার চেয়ে না করাটাই অস্বাভাবিক।

এরই মধ্যে একদিন আমি নিজে ধরা পড়ে গেলাম খান সেনাদের হাতে। রাত তখন নয়টা। আমার অপরাধ যুবক বাঙ্গালী এবং মুক্তি ফৌজের সন্দেহে। আমাকে নিয়ে গেল। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অনেক এলোমেলো ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে শেখ মুজিবকে গাল দিয়ে পাকিস্তানের সুনাম কীর্তন গেয়ে ছাড়া পেলাম ঠিকই কিন্তু আমার শরীর থেকে রক্ত বের করে নিল যথেষ্ট পরিমাণে।

এছাড়াও রংপুর মডার্ন হলের পিছনে যে বীভৎস দৃশ্য দেখেছি তা বলতেও শিহরণ জাগে। বেশ বড় একটা আগাছার বন তারই মধ্যে লেপ, কাঁথা, বালিশ তোষক পাটে পাটে সাজান, এ গুলো ধর্ষণ বা নারী সঙ্গমের শয্যা। পাশেই বেশ বড় একটা অত্যধিক ধর্ষণের গর্ত পড়ে। যেসব মেয়েরা, মা-বোনেরা সঙ্গমে অপারগ হয়ে পড়তো, অক্ষমতা প্রকাশ করতো তাদেরকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করে এই গর্তের মধ্যে ফেলা হত। এদেরকে কুকুরে খেত, পোকা মাকড়ে খেত। দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকগণ মেপেজুকে হিসাব করে বলেছিলেন এ গর্তে প্রায় চার-পাঁচশ মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। উক্ত গর্তের মধ্যে তাদের এলোমেলো চুল, লম্বা বেণী গাঁথা চুল, ছায়া, শাড়ী, সালোয়ার, কামিজ, মাথা, খুলি, আধাপচা গোস্তসহ পোকা ঘিন ঘিন করা মাথা, এসব নিজে দেখেছি নেড়েচেড়ে দেখেছি। মডার্ন হল ছিল উচ্চপদস্থ খানদের ক্যাম্প।

শুনেছি- সেখানে নাকি কয়েক ঝুড়ি শুধু ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি পাওয়া গেছে। তবে নিজে দেখেছি মডার্ন হলের দেয়াল ঘেঁষা ইন্দারার পাশে যে কুল গাছটি আজও হত্যার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার ডালে লটকানো ফাঁসির দড়ি, আশে-পাশে ছেঁড়া রক্তমাখা কিছু কিছু ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার, শাড়ীর পাড় এবং টুকরো টুকরো ব্যাণ্ডেজ আকারের অনেক সাদা কাপড়। কুল গাছটা যদি আজ কথা বলতে পারতো তবে নিশ্চয় জানা যেত কতটা অসহায় নারীকে ধর্ষণ শেষে ফাঁসি দেয়া হয়েছে তার ডালে।

সেদিন একাত্তরের তিরিশে মে-র দিনগত একত্রিশে মে-র রাত। রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নাচগানের বড় আয়োজন। খানসেনারা এসে রোজকার মত গাড়ী করে নিয়ে গেল বাসু মিঞাকে। সঙ্গে গেল তার শালা হবিবর রহমান, ওরফে চাঁদু। এই চাঁদুকে মিলিটারিরা দোস্ত বলে ডাকতো, এসেই হাত মেলাতো, কেলি করতো। কিন্তু সেদিন রোজকার মত ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরতে না দেখে স্ত্রী, মা, কন্যা, ভাইবোন সবাই চিন্তা আর শঙ্কার মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। রাত তখন ঠিক সাড়ে এগারটা।

সারা রংপুর শহরে সান্ধ্য আইন থম থম করছে। ঠিক এই সময় সম্ভবতঃ ষড়যন্ত্রমাফিক দু'খানা জীপ গাড়ী ভর্তি পাকসেনা এসে ঘিরে ফেলল বাসু মিঞার বাড়ী। ব্যাপারটা সম্যক অনুভব করে বাসু মিঞার কনিষ্ঠ ভগ্নিপতি মিঃ নুরুল ইসলাম আকন্দ যুবতী বাসু কন্যা জ্যোৎস্না এবং অন্যান্য যুবতী বৌদের পাশের বাড়ীতে সরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর টপকিয়ে আর গেট ভেঙ্গে ছয়-সাত জন সেনা ঢুকে পড়লো। ঢুকেই পেল বাসু মিঞার ছোট ভাই গেদু আর ভাগ্নে জুল্লুকে। বেঁধে ফেলল ওদের হাত আর চোখ। মুখে-শালা, বাহেনচোত খিঞ্জিরাকা বাচ্চা তুম জয় বাংলাকা আদমি হ্যায়, বাতাও বাসু মিঞা কিধার হ্যায়। ধড়াস করে মারল রাইফেলের বাঁট দিয়ে গেদুর ঘাড়ে। গেদু চোখ বাঁধা অবস্থায় মা বলে ডেকে উঠে পড়ে গেল। ঠিক এমনি সময়ে আর একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো বাড়ীর গেটে। বাসু মিঞা আর চাঁদুকে নামিয়ে দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে গাড়ীটা হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে গেল। রোজ তারা বাড়ীর মধ্যে যেয়ে চা পানি পানের পর যেতো কিন্তু আজ গেলো না। এটা যে এইভাবেই ধরি মাছ না ছুঁই পানি ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কাজ হাছিল করা হচ্ছে তা নিশ্চয় দুর্বোধ্য নয়। বাড়ীর মধ্যে চাপা কান্না আর আওয়াজ শুনতে পেয়ে চাঁদু ছুটে এসে প্রবেশ করে অন্দরে, ঢুকে দেখে রোজ যারা এসে

গোশত, পোলাও, কলা খেয়ে যেত সেই সব দোস্ত বন্ধুদেরই দল। গেদুকে, জুল্লুকে তখনও খেয়াল করেনি। তাদের সঙ্গে কর মর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই দোস্তজি খপ করে হাত ধরে বলে বাহেনচোত শা-লা। তারপর হাত বেঁধে ফেলে। ততক্ষণে বাসু মিঞাও ঢুকে পড়েছেন। এসব অবাঞ্ছিত ব্যাপার দেখে সাধারণ জ্ঞান লোপ পেয়ে যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। বাসু মিঞা ধরা পড়লেন। হাত বাঁধলো, চোখ বাঁধলো, নিয়ে গেলো, ছয় মাইল দূরে দমদমা নদীর ধারে। এখানে পা রাখার জায়গা নেই। আধ হাত মাটির নীচে নীচে সোনার বাংলার মানুষ বাস করছে। নদীর পটভূমি ছোট্ট এক কুলগাছ। সেখানে তাদের বাঁধলো এবং ওদের দিয়েই ওদের কবর খোঁড়ালো। চাঁদু, জুল্লু, আর গেদুকে সেই কুল গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে কয়েকজন সেনা বাসু মিঞাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো, উদ্দেশ্য মোটা মালপানি কিছু নেবে। নিলো সামান্য কিছু-মাত্র ১৯০০.০০ টাকাই ঘরে ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল। আবার হাত বাঁধলো, চোখ বাঁধতে যাবে, বাসু মিঞা কাকুতি জানালেন এক মিনিট আমায় সময় দিন। কথাটা রাখল পাষণ্ডরা মা জহুরা তখন মিলিটারীর পায়ের তলায় কেঁদে কেঁদে কাকুতি মিনতি করে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন। মাকে বল্লেন- মা, লিটনকে (ছোটছেলে) একবার নিয়ে এস। মা কাঁদতে কাঁদতে লিটনকে নিয়ে এলেন। কিন্তু হাততো বাঁধা। মাকে বলেন, লিটনকে আমার বুকের সঙ্গে একটু ঠেকাও।

মা লিটনকে তার বুকে চেপে ধরলেন, চোখের সমস্ত পানি যেন একেবারে শেষবারের মত বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এল বাস মিঞার। চোখ বেঁধে ফেল্ল পাষণ্ডরা। শেষ কথা মাকে ডেকে বল্লেন- তা এই শেষ দেখা। দমদমার গর্তের কাছে ওদের বেঁধে রেখেছে আমার গর্তও হয়ে গেছে। তোমরা সবাই মিলে মিশে থেকো, আমার মৃতদেহকে নিয়ে এসে ভাল করে দাফন করো। কিন্তু তা আর হয়নি। পাষণ্ডরা তার মৃতদেহ নিয়ে আসতে দেয়নি।

দমদমার ছোট কুল গাছটির তলায় যেখানে রংপুর সরকারী কারমাইকেল কলেজের তরুণ দম্পতিকে একসঙ্গে একই গর্তে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছে ঠিক তারই পাশে আজ তিনটে গুলী, তিনটি শব্দ, তিনটে দাগ চিহ্নিত বাস মিঞার দেহকে মাটিচাপা দিয়ে গেল ওরা। কিন্তু চাঁদু, জুল্লু, গেদুর লাশ কোথায়- এ প্রশ্নের জবাব আজও পাওয়া যায়নি।

-আজাদ এম, কবির

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনের মধুদা	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার প্রিয় মধুদা
ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী **মধুদা**

মধুসূদন দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সকলের প্রিয় মধুদা। মাত্র কয়েকটি অক্ষরের এই নামটিতে তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনেই নয়, সবার কাছে ছিলেন প্রিয়-পরিচিত। সবার প্রিয় ছিলেন 'মধুদা'। এই 'মধুদা' নিহত হলেন বর্বর পাক-সেনাদের হাতে।

পঁচিশে মার্চের ভয়াল বীভৎস রাত। তার পরদিন সকাল। সন্ত্রস্ত প্রতিটি মুহূর্ত। বর্বর বাহিনী আক্রমণ চালাল জগন্নাথ হলের পার্শ্ববর্তী শিবাবাড়ীতে। মধু বাবু তার পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকতেন শিববাড়ী কোয়ার্টারে। বর্বররা ২৬শে মার্চ সকালে আক্রমণ চালাল শিবাবাড়ীতে। নিমর্মভাবে হত্যা করল মধুবাবুর ছেলেকে, পুত্রবধুকে, স্ত্রীকে। বর্বররা মধুবাবুকেও নৃশংসভাবে হত্যা করল। বর্বররা মধুবাবুর বাড়ীর দরজায় সজোরে করাঘাত করল। দ্বিধাসংকোচচিত্তে মধুবাবু দরজার কপাট খুলে দিলেন। সাথে সাথে একজন ভিতরে ঢুকে পড়ল। মধুবাবুকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। পাশের বাড়ীর আঙ্গিনায় ওরা তাকে আটকিয়ে রাখল।

বর্বর দস্যুর লোলুপ-দৃষ্টি পৈশাচিকতায় উন্মত্ত ওরা। সন্ত্রস্ত গৃহবধূ। উন্মত্ত রাইফেল আর প্রলুব্ধ হুঙ্কারের কাছে অসহায় বধূ।

প্রমত্ত হায়েনারা ছুটে গেল গৃহবধূকে ছিনিয়ে আনতে। লাজনম্র অসহায় বধূর বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা।

এ ঘর ও ঘর করে, ছোট ঘরের আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন মধুবাবুর পুত্রবধূ রাণী। বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা। চীৎকার করে ছুটছেন এ ঘর ও ঘর। অসহায় গৃহবধূর আর্তি প্রমত্ত হায়েনাকে এতটুকু বিচলিত করল না।

স্বামী রণজিত দে ছুটে এলেন অসহায় স্ত্রীকে রক্ষা করতে। ক্রুদ্ধ বর্বরের প্রমত্ত হুঙ্কার অধিকতর সোচ্চার হয়ে উঠল। উদ্যত রাইফেলের আঘাতে ওরা লুটিয়ে পড়লো। দাদা-বৌদির কাছে ছুটে এলো ছোটবোন রানু। সকল ঘটনায় একমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী পরিবারের এই মেয়েটি। আর সবাই ছোট ছোট। ওরাও দেখেছিল। তাদের আপনজনকে বর্বর নরপিশাচদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হতে। নরপিশাচদের ভয়ে ওরাও প্রকম্পিত। অসহায় অবুঝ শিশু ওরা। সেদিনের ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ওরা। রানুই ছিল তাদের মধ্যে বড়টি। সে জানে সে দেখেছে নিজেও বর্বরদের শিকার হয়েছে। দাদা-বৌদিকে রক্ষা করতে অবুঝ মেয়ে রানু ছুটে গিয়েছিল পাশের ঘরে। সাথে সাথে বর্বরদের উদ্যত রাইফেলের গুলী তার চোয়ালে আঘাত করল।

রানু সেদিন প্রাণে বেঁচে গেল। রণজিত বাবু আর তার স্ত্রীকে হত্যা করে বর্বররা মধুবাবুকে আঙ্গিনায় এনে দাঁড় করাল। একজন দস্যু সেনা উঁচিয়ে ধরল রাইফ । স্ত্রী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। সাথে সাথে বর্বরের উদ্যত রাইফেলের গুলী ছুটে এলো। সাথে সাথে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। গুলীর আঘাতে হাত দুটো তার ঝাঝরা হয়ে গেল। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজে প্রাণ দিলেন। গুলীর আঘাতে মধুবাবুর দেহও জর্জরিত হয়ে গেল। স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তিনি লুটিয়ে পড়লেন। বর্বররা কি ভেবে তখন চলে গেল। বর্বরদের গুলী রানুকে আহত করেছিল। একটা গুলী তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল। ''তবুও আমি

বেঁচে গেলাম। কিন্তু সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল অবিরল। গুলী পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল তবুও আমি মরলাম না। সবাই যখন মরে গেছে, আমার বেঁচে আর লাভ কি।'' প্রিয়জন হারাবার বেদনায় ব্যথিত রানু কান্নাভেজা কণ্ঠে বলছিল কথাগুলো।

গুলীর আঘাতে জর্জরিত মধুবাবু বর্বররা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ বেঁচে ছিলেন। তার ঘন্টাখানেক পর আবার ওরা এসেছিল। ওরা মধু বাবুকে নিয়ে গেলো। বাবাকে রেখে যাবার জন্য চীৎকার করে সেদিন বলছিল রানু। বুক ভরা সাহস নিয়ে রানু বলছিল তাহলে আমাকেও বাবার সাথে নিয়ে যাও। আমারও তো গুলী লেগেছে। বর্বররা তাকে নিয়ে যায়নি। বাবাকে নিয়ে গেলো। আবার ফিরিয়ে দেবে আশ্বাস দিয়েছিল। কচি শিশু মন সেদিন সারাদিন আর রাত ভরে অপেক্ষা করেছিল তার বাবার জন্য। বর্বররা তার আহত বাবাকে আর ফিরিয়ে দেয়নি। নির্মমভাবে হত্যা করল জগন্নাথ হলের মাঠে।

ঘটনার পর চৌদ্দ দিন পর্যন্ত শিববাড়ীতে পড়ে ছিল মধুবাবুর ছেলে, পুত্রবধূ আর স্ত্রীর লাশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লেঃ কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

লেঃ কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর

\ শামসুল হক আলীনুর \

''আমার হাতে একটা পিস্তল তুলে দিয়ে তিনি বললেন, কর্নেল শাহনুরের বদলা হয়তো আমার ওপর থেকেই ওরা নেবে। তোমাকে আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল দিয়ে গেলাম। ওরা তোমার ওপরও আক্রমণ চালাতে পারে।

কথাগুলো বলেই তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সশস্ত্র পাকসেনারা তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি।''

পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত ৪০ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের পত্নী মিসেস জেবুন্নেসা জাহাঙ্গীর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।''

''বাংলার মাটি আর বাংলার মানুষের প্রতি ভালবাসাই ছিল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। তা না হলে কেন এমন হবে? আমার স্বামী কোন অন্যায় করেননি। তবু কেন ওরা আমার স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করলো? তিনি বাঙ্গালী-এটাই কি তার সবচেয়ে বড় অপরাধ?'' একটু থেমে থেমে কথা বলছিলেন মিসেস জেবুন্নেসা জাহাঙ্গীর।

তিনি বলেছিলেন একাত্তরের উনিশে মার্চের একটি ঘটনা। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে উচ্চ পদস্থ আর্মি অফিসাদের জরুরী কনফারেন্স। আলোচনার বিষয়-বাংলাদেশের যুবসমাজকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। উক্ত কনফারেন্সে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি, লেঃ কর্নেল ইয়াকুব মালিক, মেজর আগা বোখারী, মেজর সুলতান (বেলুচ রেজিমেন্টের লোক) সহ অনেক উচ্চপদস্থ পাক আর্মি উপস্থিত ছিলো। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো-বাংলার সংগ্রামী যুব সমাজকে এলোপাতাড়ি ভাবে হত্যা করা হবে। কিন্তু প্রস্তাবের বিরোধীতা করলেন লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর। না, তা হতে পারে না, অসম্ভব। দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে তিনি সেদিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আর এর পর থেকেই কোন কনফারেন্সে জনাব জাহাঙ্গীরকে ডাকা হতো না। তিনি যেতে চাইলেও তাকে ঢুকতে দেয়া হতো না।

এর ক'দিন পর সাহেবজাদা ইয়াকুব আমার স্বামীকে ডেকে পাঠান এবং ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যেতে বারন করেন। বললেন মিসেস জাহাঙ্গীর।

তারপর এলো পঁচিশে মার্চ। সেদিন রাত সাতটার দিকে ব্রিগেডিয়ার শফি লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরকে ডেকে পাঠান ক্লাবে। ক্লাব থেকে ফিরে এসে তিনি আমাকে জানান আজ রাতের বেলায় ওরা হয়তো বাঙ্গালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওদের কথা বার্তায় তাই মনে হয়েছে। কথা শেষ না হতেই ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাতি নিভে গেল। রাতে আমরা আর ঘুমাইনি। শুধু মেশিনগান, কামান আর ট্যাঙ্কের শব্দে বার বার শিউরে উঠলাম। মাঝে মাঝে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মানুষের অসহায় চিৎকারও শুনতে লাগলাম। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে আগুনদেখা গেল। আমার স্বামী আমাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

ভোরবেলা দেখলাম আমাদের বাসার সম্মুখে আরটিলারী গান বসিয়ে ওরা কয়েকজন বসে আছে। যেন আমরা বাইরে বেরুতে না পারি।

লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর বুঝতে পারলেন তিনি বন্দী। আর তাই তিনি ফোন করে তার ইউনিটের বাঙ্গালী সৈনিকদের সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়ে বাংলার মুক্তি সংগ্রামে শরীক হতে বললেন। দূরালাপনীতে তিনি তার ইউনিটের বাঙ্গালী সৈনিকদের বললেন মরতে যদি হয় তাহলে বীরের মতোই মরো। আমিও তোমাদের কাতারে এসে শামিল হচ্ছি। কথা শেষ করে ব্রিগেডে যাবার উদ্দেশ্যে বাইরে এসে দাঁড়াতেই পশ্চিমা হানাদার বাহিনী তাকে বাধা দেয় এবং বলে-আপনার বাইরে যাওয়া চলবে না।

২৯শে মার্চ রাতে তিনি খবর পেলেন চট্টগ্রামের কুমিরায় যুদ্ধ করতে গিয়ে বাঙ্গালী সৈনিকদের হাতে লেঃ কর্নেল শাহনুর নিহত হয়েছেন।

৩০শে মার্চ খুব সকালে এক দল পাঞ্জাবী দানব বাসা থেকে তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে গেল, যাবার আগে আত্মরক্ষার জন্যে তিনি আমাকে একটা পিস্তল দিয়ে গেলেন। এরপর আমি তার আর কোন খোঁজ পাইনি।

স্বামী নেই, ঘরে খাবার নেই। দুধের শিশু কাঁদছে, দুধ নেই। এক ফোঁটা পানিও নেই। ঘরের বাইরে গোলাগুলী চলছে। বাইরে বেরুবার পথ বন্ধ। এক ফোঁটা পানির জন্যে ছটফট করেছ আমার সন্তানরা। তবু দানবরা পানি দেয়নি। খাবার দেয়নি। কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মিসেস জাহাঙ্গীর। আর ঠিক সেই সময় মিসেস জাহাঙ্গীরের ছোট ছেলে আরিফ বললো- পানির জন্যে আমরা আল্লাহর কাছে কত কেঁদেছি। তারপর থেকেই আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছেন। আর আমরা সেই বৃষ্টির পানি পান করেছি। পাত্রে জমিয়ে রেখেছি।

বৃষ্টি না হলে ছেলেমেয়েদের বাঁচানো যেতনা, অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন মিসেস জাহাঙ্গীর।

এমনিভাবে ক'দিন অনাহারে কাটার পর নরপিশাচরা তাদেরকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি স্কুলে আটক করে রাখে। সেই স্কুলে বাঙ্গালী আর্মি অফিসার ও সৈনিকদের অনেক পরিবারকে আটকে রাখা হয়েছিল।

তারপর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে মিসেস জাহাঙ্গীর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত অধিকাংশ বাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে তার স্বামী লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরসহ লেফটেন্যান্ট ফারুক, ক্যাপটেন হুদা, ক্যাপটেন বদরুল আলম, মেজর ইসলাম, মেজর খালেক, মেজর মুহিদুল জামালের নাম তার স্মরণ আছে বলে তিনি আমাকে বলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা লাভের পর কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে অসংখ্য বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সে সব বধ্যভূমি থেকে লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরসহ অগণিত বাঙ্গালী আর্মি অফিসার ও সৈনিকদের নরকংকাল উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরের দেহাবশেষ সমাধিস্থ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ডাঃ আয়েশার হত্যাকাণ্ড	দৈনিক বাংলা	২৪ জানুয়ারী, ১৯৭২

ওরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল
ডাঃ আয়েশাকে
\ মঞ্জুর আহমদ প্রদত্ত \

বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর শেষ মুহূর্তের উন্মত্ততার একজন করুণ শিকার তৎকালীন ষ্টেট ব্যাঙ্কের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ আয়েশা বেদোরা চৌধুরী। জল্লাদদের বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল ডাঃ আয়েশা চৌধুরীর সমস্ত শরীর।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ১৮ নং রাস্তায়। ঘটেছিল সেই সর্বজন পরিচিত বাড়ীটার সামনে যে বাড়ীতে মাসের পর মাস দুঃসহ জীবন কাটিয়েছেন বেগম শেখ মুজিবর রহমান। ঘটনাটি ঘটেছিল বেগম মুজিবের অসহায় দৃষ্টির সামনেই।

খান সেনাদের আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে আরো অনেকের মতই আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিলেন ডাঃ আয়েশা চৌধুরী। এতদিন গোপনে গোপনে তিনি যে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন, সাহায্য করেছেন সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে তাদের এই সামান্য সাফল্যে উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে তিনি সেদিন চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারেননি।

তিনি বেরিয়েছিলেন তাঁর খালু সড়ক বিভাগের সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব হাতেম আলী খানকে সাথে নিয়ে তাঁর নিজের গাড়ীতে। শত্রুমুক্ত ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ায় মুক্তির আস্বাদে হৃদয়কে ভরিয়ে তোলার বাসনায় বেগম হাতেম আলী খান এবং তাদের পুত্রবধূ মাহবুবা রশিদ চপলও সাথী হয়েছিলেন সেই যাত্রায়। তাঁরা প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলেন ১৮ নং রাস্তার সেই বাড়ীতে যে বাড়ীতে বেগম মুজিব ছিলেন বন্দিনী।

তাঁরা গিয়েছিলেন বেগম মুজিবকে মুক্তির খবর জানাতে। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তখনও খানসেনারা মেশিনগান উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছিল এই বাড়ীতে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁদের গাড়ী বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তারা হাতের মধ্যে শিকার পেয়ে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিল।

মুহূর্ত মাত্র দেরী না করেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গাড়ীটার উপর। একটানা গুলিবর্ষণে তারা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল গাড়ীকে। জর্জরিত করে তুলেছিল গাড়ীর আরোহীদের। গুলির আঘাতে ডাঃ আয়েশা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আর নিহত হন গাড়ীর চালক মনির আহমদ। জনাব হাতেম আলী খানের পায়ে এসে গুলি লাগে। বেগম খানের লাগে হাতে। তাদের পুত্রবধূর মাথার তালু ছুঁয়ে গুলি চলে যায়। অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি। বুলেট বিদ্ধ গুরুতরভাবে আহত জনাব ও বেগম খান এবং তাদের পুত্রবধূ কোনমতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাশের একটি বাড়ীতে। পরে সেখান থেকে তাঁদেরকে পাঠানো হয় হাসপাতালে।

মাত্র কয়েকটি ঘন্টা পরেই যারা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল সামান্য সময় আগেই তাদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হলো দু'টি শিশু সন্তানের জননী ডাঃ আয়েশা বেদোরা চৌধুরীকে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হানাদার বাহিনীর সহযোগী আল-বদরদের হত্যার শিকার কয়েকজন	সাপ্তাহিক বিচিত্রা জাতীয় দিবসের বিশেষ সংখ্যা	১৯৭৩

শেষ দিন শেষ কথা

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

চৌদ্দই ডিসেম্বর খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো মুনীর চৌধুরীর। হাতমুখ ধুয়ে ধীরে সুস্থে নাস্তা করলেন। তারপর আবার বিছানায়। রেডিও ছেড়ে শুয়ে শুয়ে খবর শুনতে লাগলেন। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া নিঃঝুম। মাঝে মাঝে ভারতীয় বিমানের হামলা। দু একটা গাড়ী ভর্তি পাকিস্তানী সেনা মাঝে মাঝে ছুটে চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় মুনীর চৌধুরীর ফ্লাট যদিও দোতলায়, যুদ্ধের সময় তিনি নীচের একটা ফ্লাটে থাকতেন। শুয়ে শুয়ে রেডিও শুনতে শুনতে এক সময় স্ত্রীকে ডেকে বললেন, শোন, আর মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা বাকী আছে দেশ স্বাধীন হতে। সে সময় গলার স্বরে তার স্থির বিশ্বাস ফুটে উঠেছিল।

এরই মাঝে স্ত্রী এসে একবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি আর এক কাপ চা খাবেন কিনা। সম্মতি জানালেন। তারপর চা খেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

বিছানা ছেড়ে ওঠার পর মুনীর চৌধুরী গোসল করতে ওপরে চলে গেলেন। ময়লা কাপড়-চোপড়ও কিছু ধুলেন। কারণ পরিবারের সবাই তখন ভাগাভাগি করে সংসারে কাজকর্ম সারেন। স্নান সেরে এসে স্ত্রীকে বললেন, যাও তোমার জন্য পানি গরম করে রেখেছি। তুমি গোসল করতে যাও। বলে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলেন। অসুস্থ স্ত্রীও গোসল করতে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

নিশ্চিন্ত মনে চুল আঁচড়াচ্ছেন মুনীর চৌধুরী। বেলা তখন বারো কি এক। এমন সময় নীচে লোহার গেটে শব্দ শোনা গেল। কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে। মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখলেন কম বয়সী কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলে দরজা ধাক্কাচ্ছে। মুনীর চৌধুরী সে সময় স্ত্রীকে বললেন, থাক দেখার দরকার নেই। সরে এসো। বলে তিনি আবার চুল আঁচড়াতে লাগলেন। স্ত্রীর সাথে মুনীর চৌধুরীর ঐ ছিল শেষ কথা।

এমন সময় নীচে থেকে তাঁর ভাই ওপরে এসে বললেন, মুনীর ভাই আপনাকে নীচে ডাকছে।

মুনীর চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাম করে বলেছে?

হ্যাঁ।

পাঞ্জাবী পরে তিনি আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেলেন। মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী লিলি চৌধুরী কিন্তু তখনও আতংকিত হননি। তাঁর স্বামীকে কেউ যে ধরে নিয়ে যেতে পারে একথাও তার মনে হয়নি। কারণ যারা তাকে ডাকতে এসেছে সবাই কম বয়সী, বাঙ্গালী।

---

* একাত্তরে হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা সংঘটিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের হত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ দানের প্রয়াস বোধ হয় সাধ্য ও সামর্থ্যের অতীত। বাংলাদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছেন। আমরা কেবল তার কতিপয় উদাহরণ উপস্থাপন করছি। ১৯৭৩ জাতীয় দিবস, বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রিত সাপ্তাহিক বিচিত্রার এই নিবন্ধটি ১৪ ডিসেম্বর '৭১ তারিখে 'আল-বদর'দের হাতে নৃশংসভাবে নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্ত্রীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।

তবুও লিলি চৌধুরী সিঁড়ি ধরে নীচে নামলেন। দেখলেন মুনীর চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন নীচে। আশেপাশে বন্দুক নিয়ে আরেকটি অল্প বয়সী ছেলে। তিনি শুনলেন, মুনীর চৌধুরী তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অফিসার কোথায়?

একথা বলার সাথে সাথে একটি ছেলে তাঁর পিঠের কাছে বন্দুক উঁচিয়ে বললো, আছে, আপনি চলুন। মুনীর চৌধুরী আস্তে আস্তে হেঁটে তাদের সাথে চলে গেলেন।

অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে তখন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সস্ত্রীক চলে গিয়েছিলেন ফয়জুল হকের বাসায়। শেরে বাংলার পরিবারের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু নিরিবিলি মানুষ মোফাজ্জল হায়দার ঐ বিরাট বাড়ীর হট্টগোলে থাকতে চাননি। আত্মীয়-স্বজন এমনকি স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন মালিবাগে ছোট ভাই লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর বাসায়।

আল-বদর এবং রাজাকারেরা চৌদ্দই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লাটে তাঁর খোঁজ করলো। পেল না। পরে তাঁর তবলীগ পন্থী চাকরের কাছ থেকে মালিবাগের ঠিকানা জেনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

চৌদ্দই ডিসেম্বর দুপুরের দিকে আল-বদররা এসে হাজির হলো লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর বাসায়। দরজায় কড়া নাড়ার পর লুৎফুল হায়দার দরজা খুলে দিলেন।

'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কোথায়?'

'এখানেই আছেন।'

'আমাদের অফিসার তাঁর সাথে কথা বলবেন, তাঁকে একটু ডেকে দিন।'

লুৎফুল হায়দার ডেকে দিলেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সাথে তাঁর স্ত্রীও এলেন বাইরের ঘরে। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের অফিসার কোথায়?'

'গাড়ীতে আছেন।'

আপনারা যে তাঁকে নিতে এসেছেন, ওয়ারেন্ট আছে আপনাদের সাথে? মোফাজ্জল সাহেবের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে।'

'আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে?' ফের তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। 'জানি না।'

'বাঃ, এটা কেমন কথা।' স্ত্রী অবাক হলেন, ভয় পেলেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখন বললেন, 'ঠিক আছে আমি কাপড় পরে নেই।'

বাথরুমে তাঁর গোসলের জন্য তখন গরম পানি তৈরী। কিন্তু তিনি আর গোসল করলেন না। স্ত্রী স্যুট বের করে দিলেন। তিনি স্যুট পরে আবার বাইরের ঘরে এলেন। তাঁর স্ত্রী তখন বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে যাবো।'

একজন আল-বদর জওয়াব দিল, 'আপনি তো আমাদের মায়ের মতো। আপনি আর কই যাবেন। আর উনি তো আমাদের স্যার। আমরা এখনই ওকে ফেরত দিয়ে যাবো।'

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখন হঠাৎ বললেন, 'আমি চাট্টি খেয়ে নিতে পারি?'

'আমাদের ওখানে সব ব্যবস্থা আছে। আপনি চলুন।'

তিনি তখন আবার হঠাৎ বললেন, 'ঘড়িটা পরে নেই?'

'না, না, দরকার নেই। আপনি তো এখনই আবার চলে আসবেন।'

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শেষ যাত্রার জন্য পা বাড়ালেন। পা বাড়াবার আগে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তো অন্যায় কিছু করিনি, তুমি ঘাবড়াচ্ছো কেন? আমি এখনই চলে আসবো।'

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও
অধ্যাপক রাশীদুল হাসান

একসাথে আজীবন থাকতে চেয়েছেন। দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় এক সাথে চলে এসেছিলেন। একজন চাকুরী নিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, অপরজন ইংরেজী বিভাগে। আমি অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং অধ্যাপক রাশীদুল হাসানের কথা বলছিলাম।

যুদ্ধের সময় রাশীদুল হাসান নিজের বাসা ছেড়ে বন্ধু আনোয়ার পাশার বাসায় চলে আসেন। দু'বন্ধু এক সাথে থাকলে বুকে আশা থাকে, সাহস থাকে।

চৌদ্দই ডিসেম্বর সকাল সাতটায় আনোয়ার পাশার ঘুম ভেঙ্গেছে। গড়িমসি করে বিছানা ছেড়েছেন আরো পরে। তারপর দু'বন্ধু মিলে ন'টার দিকে নাস্তা করেছেন, রেডিও শুনেছেন। ন'টার খানিক পরে আনোয়ার পাশার স্ত্রী পিছনের বারান্দা দিয়ে দেখলেন একটি লাল গাড়ী এসে থামলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার চত্বরে। কয়েকজন রাজাকার নামলো।

আনোয়ার পাশা এরই মধ্যে স্ত্রীর সাথে দু'একটা খুচরো সাংসারিক আলাপ সেরেছেন। রাশীদুল হাসানের সাথে গল্পে বসার আগে হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বললেন, কাসুটা উঠুক তারপর তোমার জন্য ভালো করে বাজার টাজার করে দেব। রাশীদুল হাসানের স্ত্রী তখন সংসারের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পর দরজায় নক। দরজা খুললেন আনোয়ার পাশার ছোট ভাই। তারা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। আনোয়ার পাশা আর রাশীদুল হাসান তখন ড্রইংরুমে। একজন আনোয়ার পাশাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার নাম আনোয়ার পাশা।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বাইরে আসুন।'

এমন সময় তাদের চোখ পড়লো রাশীদুল হাসানের দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার নাম?'

'রাশীদুল হাসান।'

'আপনিও চলুন।'

সেই সময় রাশীদুল হাসানের স্ত্রী এসে দরজার মুখে দাঁড়ালেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আনোয়ার পাশা এবং রাশীদুল হাসান একবার তার দিকে তাকালেন। চোখ তাঁদের ছলো ছলো। কিন্তু একেবারে নিশ্চুপ তারা। ছলো ছলো চোখে দুজনে আরেকবার তাঁর দিকে (রাশীদুল হাসানের স্ত্রী) তাকিয়ে আস্তে আস্তে আল-বদরদের সাথে পা বাড়ালেন। আনোয়ার পাশার স্ত্রী জানালা দিয়ে শুধু দেখলেন তাদের গায়ের চাদরে তাদের চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ডঃ সিরাজুল হক খান

যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে তখন ডঃ সিরাজুল হক খান পরিবারের সবাইকে নিয়ে রাতের বেলা ফ্লাটের নীচের তলায় থাকতেন। সকালে আবার দোতলায় নিজের ফ্লাটে চলে যেতেন। ১৪ই ডিসেম্বর খুব ভোরে তিনি ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়লেন। একবার ওপরে নিজের ফ্লাটে গেলেন তারপর আবার নীচে নেমে এলেন। এবং সে সময় তার নজরে পড়লো, একটু দূরে আল-বদর বাহিনীর কিছু লোক রুমাল দিয়ে এক ভদ্রলোকের চোখ বাঁধছে। সাথে সাথে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। সবাইকে বললেন, 'ওরা আমাদের এলাকায় ঢুকেছে। তোমরা সাবধানে থাকো।' তাঁর স্ত্রী তখন তাঁর জন্য নিজের হাতে ঔষধ তৈরী করছেন। তিনি ডঃ খানকে ঔষধ খেতে ডাকলেন। জবাবে ডঃ খান 'এসে খাবো' বলে নীচের তলায় বোটানীর অধ্যাপক জনাব ইসমাইলের ড্রইংরুমে যেয়ে বসলেন। গল্প-গুজব করতে লাগলেন। এদিকে আল-বদর বাহিনী ওপর তলায় তাঁর ফ্লাটে এসে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা ডঃ সিরাজুল হকের বাসা?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কোথায়?'

'নীচে গেছেন।'

'কোন বিভাগের অধ্যাপক তিনি।'

'শিক্ষা-গবেষণা কেন্দ্র।'

'হ্যাঁ, আমরা তাকেই খুঁজছি।'

এই বলে তারা ডঃ খানের ভাইকে নিয়ে ইসমাইল সাহেবের ড্রইংরুমে উপস্থিত হলো। ডঃ খানকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলো। তারপর তাঁকে ঘর থেকে বাইরে এনে, তাঁরই পকেটের রুমাল দিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে অচেনা গন্তব্যের দিকে নিয়ে চললো। পরিবারের সবাই তাকিয়ে রইলো বিমূঢ় হয়ে।

ডঃ খান স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলেন, নীচে থেকে এসে ঔষধ খাবেন। স্ত্রীর সাথে ঐ ছিলো তাঁর শেষ কথা। কিন্তু ঔষধ খেতে তিনি আর ফিরে আসেননি।

ডঃ আবুল খায়ের

ডঃ আবুল খায়ের সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত ছিল। একদিন রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ লাল বাতি। গাড়ী থামালেন। এদিকে লাল বাতি সবুজ হয়ে আবার লাল হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি চুপচাপ গাড়ী নিয়ে বসে আছেন। এমন আপন-ভোলা লোককেও আল-বদররা চৌদ্দই ডিসেম্বর তুলে নিতে ভুলে যায়নি।

ডঃ খায়েরের ফ্লাট নীচের তলায়। চৌদ্দই ডিসেম্বর সকাল আটটায় পায়জামা এবং শার্ট পরে, স্ত্রীর গরম চাদর গায়ে সিঁড়ির সামনে তিনি পায়চারী করছিলেন। ভাবছিলেন, কার্ফু উঠলেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিরাপদে কোন জায়গায় চলে যাবেন। এমনি সময় আল-বদরের লোকেরা এসে হাজির। তারা তাঁকে ঐ পায়চারি করা অবস্থায় ধরে নিয়ে চলে গেল।

ডঃ খায়ের তাঁর স্ত্রীকে কিছু বলে যেতে পারেননি। আল-বদরের লোকের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল তাও কেউ শোনেনি।

সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য

সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরাগীরা তাঁকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন। দেশ ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু তিনি যাননি স্বাধীনতা দেখে যেতে চেয়েছেন এখানে থেকে।

জীবনের শেষ দিন সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য বেশ ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছিলেন। যথারীতি নাস্তা করে রেডিও শুনেছেন। তারপর আহ্নিক করতে বসেছেন। সকাল তখন সাড়ে আট কি নয়। আহ্নিকে বসবার আগে মেয়ে স্বপ্নাকে ডেকে বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছেরে মা, খুব শীঘ্রই তোর দাদাকে দেখতে পারবি। স্বপ্নার দাদা অর্থাৎ সন্তোষ বাবুর বড় ছেলে কলকাতায় থাকতেন।

সন্তোষ ভট্টাচার্য আহ্নিকে ব্যস্ত এমন সময় দরজায় ধাক্কা। দরজা খুলে দিলে ভিতরে ঢুকলো এক বাঙ্গালী যুবক। কাঁধে ষ্টেন।

উর্দুতে জিজ্ঞেস করলো 'কই হ্যায়?'

এমন সময় সন্তোষ বাবু বেরিয়ে এলেন। যুবকটি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলো। সন্তোষ বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কি অপরাধ?'

'চুপ, বেশী কথা বলবেন না।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'যেখানে খুশী।'

তারা তাকে বাসা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। চোখ বাঁধলো এবং সেই শেষ বাসে নিয়ে তুললো।

ডাক্তার আলীম চৌধুরী

২৯ নম্বর পুরানা পল্টনের দোতলায় থাকতেন মিটফোর্ড হাসপাতালের ডাক্তার আলীম চৌধুরী। তার নীচের তলায় থাকতেন মওলানা আব্দুল মান্নান, নীচের তলায় আগে ডাক্তার আলীমের ক্লিনিক ছিল। কিন্তু মাওলানা সাহেব একবার বিপদে পড়ে প্রাক্তন স্পীকার এ,টি, এম, মতিনকে ধরে বসেন আশ্রয়ের জন্যে। মতিন সাহেব আলীম সাহেবকে বললেন, ডাক্তার চৌধুরী, ক্লিনিক উঠিয়ে মওলানাকে আশ্রয় দিন।

১৫ ডিসেম্বর ঢাকায় তখন ভারতীয় বিমান হরোদমে বোমা বর্ষণ করছে। কার্ফ্যুও চলছে। শুধু সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত কার্ফু উঠান হল।

আলীম চৌধুরী ভাবছিলেন, এ ফাঁকে একবার অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়া যায় কিনা দেখে আসবেন এবং একবার হাসপাতালটা ঘুরে আসবেন।

তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না তখন তিনি বের হন। আলীম চৌধুরী বেরুবেনই। স্ত্রীকে বললেন, আমাকে তো একবার হাসপাতালে যেতেই হবে। ডাক্তার মানুষ আমি যদি না যাই তো কে যাবে? তারপর বললেন, আমি যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরবো। তুমি তৈরী থেকো। আমি ফিরলে সবাইকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবো। আলীম চৌধুরীর স্ত্রী বললেন, তুমি ঠিক মতো ফিরবে- তাহলেই হয়েছে। তুমিও কার্ফ্যুর সময় পার করে দিয়ে আসবে আর আমাদেরও যাওয়া হবে।

আলীম চৌধুরী স্ত্রীকে বারবার কথা দিলেন যে কার্ফুর অনেক আগেই তিনি ফিরবেন। তারপর কেরোসিনের একটি টিন নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। বাসায় তখন কেরোসিনের অভাব।

গাড়ী করে হাসপাতালে গেলেন ডাঃ চৌধুরী। হাসপাতালে তার সহকর্মীরা তো তাঁকে দেখে অবাক। এই দুর্যোগ আর উনি কিনা এসেছেন হাসপাতালে। তাঁরা বললেন, ডাক্তার সাহেব, আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন আর বাড়ী ফিরতে পারবেন না। এখানেই থেকে যান। ডাক্তার আলীম বললেন, 'না, না, বাসায় সবাইকে রেখে এসেছি। বাড়ী ফিরে ওদেরকে নিয়ে আবার বেরুতে হবে।'

এরপর ডাঃ চৌধুরী গেলেন মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাক্তার লতিফের সাথে দেখা করতে। উদ্দেশ্য তিনি যদি সাময়িক একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেন, কারণ তখন অনেক ডাক্তার সপরিবারে হাসপাতালের কেবিনগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন ডাঃ চৌধুরীও সেরকম একটা আশ্রয় চাচ্ছিলেন। কিন্তু ডাঃ লতিফ আলীম চৌধুরীকে সেরকম কোন আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন না।

অতঃপর ডাঃ চৌধুরী বিমর্ষ মনে হাসপাতাল ছেড়ে বেরুলেন। ভাইপোর বাসায় যাবেন কেরোসিন আনতে। কেরোসিন নিলেন। ভাইপোকে তেলের দাম দিলেন। ভাইপো তো হেসে অস্থির। ডাঃ চৌধুরী তখন বললেন, 'দেখ, মানুষের মরার কথা তো বলা যায় না। এই এখন আমাকে দেখছিস কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমি তো নাও বেঁচে থাকতে পারি।'

ডাঃ চৌধুরী বাড়ী ফেরার জন্য গাড়ীতে উঠবেন ঠিক এমন সময় কার্ফুর সাইরেন বেজে উঠলো। ভাইপো তাঁর হাত ধরে তাঁকে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি বাসায় যাবেনই। তাঁকে বললেন, 'আমার গাড়ীতে রেডক্রস চিহ্ন আছে। কিছু ভেবোনা। আমি ঠিক ঠিক বাসায় পৌঁছে যাবো।'

বাসায় ফিরলেন। স্ত্রী সাথে সাথে ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'কি বলেছিলাম, সেই কার্ফু পার করে দিয়েই তো ফিরলে।'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। কাল একেবারে সক্কালেই চলে যাবো।'

বেলা দুটো থেকে আবার বোমা বর্ষণ শুরু হলো। দোতলার বারান্দায় বসে সেই বোমা বর্ষণ দেখছিলেন ডাঃ চৌধুরী। বিকেল সাড়ে চার। একটা মাইক্রোবাস এসে থামলো বাসার নীচে। কয়েকজন আলবদর নামলো। ডাক্তার চৌধুরীর স্ত্রী একটু উঁকি দিয়ে দিয়ে তাদের দেখছিলেন তখন তিনি বললেন, অতো উঁকিঝুঁকি দিয়ো না। বোধহয় আর্মি এসেছে। বলে তিনি বাথরুমে গেলেন। ব্যাপারটার তেমন গুরুত্ব দেননি স্বামী-স্ত্রী। কারণ মওলানা মান্নানের বাসায় হরদম এ ধরনের লোকজন আসা-যাওয়া করতো।

বাথরুম থেকে তিনি বেরিয়েছেন, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো।

স্ত্রী বললেন, 'বোধহয় আমাদের বাসায়ই আর্মি এসেছে। কি করবো এখন?'

ডাঃ চৌধুরী হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এলোমেলোভাবে বললেন, ও, এসেছে, তা দরজা খুলে দাও।

একথা বলেই তিনি নীচে নামার উদ্যোগ নিলেন। ডাঃ চৌধুরীর মা তখন বলে উঠলেন, 'আরে কোথায় যাচ্ছো?'

তিনি বললেন, 'নীচে, মওলানার কাছে, কারণ মওলানা বলেছিল, এ ধরণের কোন ব্যাপার ঘটলে যেন তাকে খবর দেয়া হয়।

নীচে নেমে তিনি মওলানার দরজা ধাক্কা দিতে লাগলেন। এমনিতে মওলানার দরজা সব সময় খোলা থাকতো কিন্তু সেদিন দরজা বন্ধ। এদিকে ডাঃ চৌধুরী দরজা ধাক্কাচ্ছেন, চীৎকার করে মওলানাকে দরজা

খুলতে বলছেন। কিন্তু মওলানার কোন সাড়াশব্দ নেই। খানিক পর মওলানা ভিতর থেকে বললেন, ভয় পাবেন না। আপনি যান। আমি আছি।

তিনি ফের উপরে ওঠার জন্য পা বাড়ালেন। এমন সময় আল-বদরের আদেশ 'হ্যাণ্ডস আপ, আমাদের সাথে এবার চলুন।'

'কি ব্যাপার কোথায় যাবো?'

প্রশ্ন করলেন ডাঃ চৌধুরী।

'আমাদের সাথে চলুন।'

'প্যান্টটা পরে আসি।

'কোন দরকার নেই।'

আলবদররা তাঁকে ঘিরে ধরলো। আস্তে আস্তে তিনি মাইক্রোবাসের দিকে অগ্রসর হলেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার

এমনিতে শহীদুল্লাহ কায়সার খুব কথা বলতেন। কিন্তু যেদিন যুদ্ধ শুরু হলো সেদিন থেকে তিনি চুপ। সারাদিন টেনশনে থাকেন। যুদ্ধের আগে তাঁকে অনেকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তিনি রাজী হননি। কারণ তিনি ব্যস্ত ছিলেন একটি উপন্যাস রচনায়। তাই তিনি বলতেন, 'যুদ্ধ আমাকে দেখতে হবে। কারণ তথ্যগুলো আমার উপন্যাসে লাগবে।''

চৌদ্দই ডিসেম্বর। সকাল বেলায় দেখা গেল বিদেশী দূতাবাসের নম্বর প্লেট লাগানো একটি গাড়ী এসে শহীদুল্লাহ কায়সারের বাড়ী থেকে একটু দূরে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ গাড়ীটা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর এক সময় চলে গেল।

সকাল ন'টা-দশটার দিকে সদরী ইস্পাহানীর টেলিফোন।

'কি করবো কায়সার সাহেব?'

কায়সার সাহেব তাকে অভয় দিলেন।

বেলা তখন তিনটা। বারান্দায় স্ত্রীর সাথে বসে আছেন তিনি। এমন সময় দেখলেন টুপি মাথায় একটি লোক এক দৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এ দেখে তাঁর স্ত্রী বললেন, 'তুমি ভিতরে যাও, দেখনা লোকটা কিভাবে তাকিয়ে আছে।'

সন্ধ্যে ছ'টা। শহীদুল্লাহ কায়সার বসে বসে খবর শুনলেন। এক সময় চাকরকে ডেকে বললেন, আমার জন্য দু'টো রুটি বানিয়ো।

শহীদুল্লাহ কায়সার প্রায়ই স্ত্রীকে বলতেন, দেখো, আমাকে যে কোন সময় নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং সব সময় আমার জন্য কিছু কাগজ-কলম আর সিগারেট রেখে দেবে। আর কিছু টাকা। শহীদুল্লাহ কায়সার আরো বলতেন, 'আমি একজন সাংবাদিক। তারা আমাকে যাই করুক মারবার সাহস পাবে না।'

চাকরকে তিনি রুটি বানাবার কথা বলেছেন এমন সময় দরোজায় ধাক্কা। মিলিটারী এসেছে।

মিলিটারী এসেছে এ সংবাদ পেয়েই তিনি ইস্পাহানীকে টেলিফোন করলেন। কি কথা হয়েছে কেউ জানে না। শুধু দেখা গেল সংক্ষিপ্ত কথা শেষ হওয়ার পর তিনি চুপচাপ টেলিফোন রেখে দিচ্ছেন।

আলবদররা এদিকে দরজা ধাক্কাচ্ছে। তিনি বললেন দরজা খুলে দাও। একথা বলে উপরে বেডরুমে গেলেন; স্ত্রীকে বললেন, শিগগির আমাকে কিছু টাকা দাও।' বলে তিনি প্যান্ট পরতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী তখন বললেন, 'টাকা দিতে বলে তুমি যাচ্ছো কই?' শহীদুল্লাহ কায়সার বললেন, 'না একটু ভালো পোষাক পরে নেই।'

স্ত্রী তাঁকে ঘরের বাইরে যেতে দেবেন না। কিন্তু তিনি যাবেনই। স্ত্রীকে বললেন, 'আমাকে না পেলে ওরা বাসার সবাইকে মারবে।'

ইতিমধ্যে যিনি দরজা খুলে দিয়েছেন, তাঁকে আলবদররা সিঁড়ির কাছে বেঁধে রেখে সোজা দোতলায় উঠে তাঁর বেডরুমে ঢুকে পড়লো।

বেডরুমটা বেশ বড়। অন্য এক দরজার কাছে শহীদুল্লাহ কায়সার দাঁড়িয়ে। ঘরের মাঝামাঝি তাঁর স্ত্রী। আলবদররা ঘরে ঢুকে শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেখতে পেলো না। তাঁর স্ত্রীকে একলা ঘরে দেখে তারা বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করলো। এমন সময় পর্দার কাছ থেকে শহীদুল্লাহ কায়সার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কাকে চান?'

'আপনার নাম কি?' তারা পাল্টা জিজ্ঞেস করলো।

'শহীদুল্লাহ কায়সার।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত ধরলো। 'আপনার সাথে কথা আছে।' বলে তারা তাঁকে বারান্দায় নিয়ে এলো।

এদিকে বাসা জুড়ে হৈচৈ চীৎকার। আলবদররা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় শহীদুল্লাহ কায়সার কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো যাচ্ছিই। আপনারা আমার হাত ধরবেন না।' এ বলে তিনি একবার পিছন ফিরে সবাইকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু আলবদররা তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি।

সিরাজউদ্দিন হোসেন

[দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন হোসেনের স্ত্রী বেগম নূরজাহান সিরাজের বিবৃতির উপর ভিত্তি করে এটি লেখা হয়েছে। (ইংরেজী থেকে অনুবাদ)]

সিরাজউদ্দিন হোসেন ছিলেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। ইত্তেফাকের 'মঞ্চে নেপথ্যে' কলামটি তিনিই লিখতেন।

১৯৭১ সনের ১১ই ডিসেম্বর ভোর ২-৪৫ মিনিটে পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্দেশে একদল উর্দুভাষী লোক তাঁকে তাঁর বাসা থেকে অপহরণ করে হত্যা করে। সিরাজউদ্দিন হোসেনের মৃতদেহের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

জনাব হোসেন সপরিবারে ৫ নম্বর চামেলীবাগে থাকতেন। জনৈক ডাক্তার ছিলেন এ বাসার মালিক। অন্তিম দিনে দুষ্কৃতকারীরা সেই ডাক্তারকে সঙ্গে করে তার বাসায় প্রবেশ করে। জনাব হোসেনের দ্বিতীয় ছেলে দরজা খুলে দিলে দুষ্কৃতকারীরা বন্দুক উঁচিয়ে তাকে তার বাবার ঘর দেখিয়ে দিতে বলে। ঠিক এই সময় বেগম হোসেন বেডরুমের দরজা খুলে বের হন। সিরাজউদ্দিন হোসেনের উপর তখন একজন দুষ্কৃতকারীর নজর

পড়লে সে জনাব হোসেনের নাম এবং পেশা জানতে চায়। সিরাজ সাহেব জানান যে তিনি পত্রিকায় চাকরি করেন। তখন তারা তাকে বেডরুম থেকে বারান্দায় নিয়ে আসে। এরপর দুষ্কৃতকারীরা জনাব হোসেনের ছেলেকে একটি ন্যাপকিন আনতে বলে, পরিবারের সবাইকে ভিতরের বেডরুমে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। তারপর সিরাজউদ্দিন হোসেনকে একটি গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। কোথায় কেউ জানে না।

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ

১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। ঢাকা শহরে তখন চলছে একটানা কারফিউ। সকাল সাড়ে সাতটা। একটা মাইক্রোবাস এসে দাঁড়াল হলের হাউস টিউটরদের বাসার সামনে। বাস থেকে সশস্ত্র ৩/৪ জন লোক নেমে দাঁড়াল। তারা ছিল ইউনিফর্ম পরা। তাদের দুইজন এসে প্রথমে নীচতলায় পরিসংখ্যান বিভাগের বজলুল হক সাহেবের বাসায় তল্লাশী চালায়। এরপর তারা উপর তলায় আমাদের দরজায় আঘাত করতে থাকে আমার স্বামী (জনাব নুরুল হক সরকারী চাকুরে) দরজা খুলে দেন। একজন বন্দুক হাতে কাল মুখোশ পরা তাঁর বুকের সাথে বন্দুক লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল, গিয়াস উদ্দিন কে? উনি বল্লেন, বাসায় নেই, হলের কাজে গেছেন। লোক দুটো তখন বলে, আপনি চলুন। আমাদের সাথে, তাঁকে খুজে বের করে দেবেন। আমরা থাকতাম আজিমপুর কলোনীতে। কলোনীতে মিলিটারী আসায় ভাই -এর বাসায় আমরা চলে আসি। আমার স্বামী তাদের বলল, আমরা এখানে নতুন এসেছি, হলের কোন কিছু জানি না। তারা বলল ভিতরে চলুন, এখানে গিয়াস উদ্দীন সাহেব থাকতেন। ভাই এর কামরায় এসে ওরা সমস্ত রুম তছনছ করে দিয়ে গেল। ঘরে আমার এক মামাতো ভাই ছিল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে, ওকে নিয়ে চলল- হলে ভাইকে খুঁজে দিতে। হলে গিয়ে তারা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো, গিয়াস সাহেব কোথায়? তারা বল্লো, হলের পেছনে পানির পাম্প ঠিক করছেন। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে ভাইকে ঘরে নিয়ে এল। সামনে পড়া একজন দারোয়ানের কাছ থেকে একটা গামছা ছিনিয়ে নিয়ে চোখ বেঁধে তাঁকে নিয়ে চলল। বাসে উঠার আগে ভাই মামাতো ভাইটিকে বললেন, 'নূরুলকে বলিস টেলিফোন করতে।'' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন সাহেবের বোন।

এ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অতি পরিচিত মুখ ইতিহাস বিভাগের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং মহনিস হলের ছাত্রদের অত্যন্ত আপন জন হাউজ টিউটর অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন সাহেবের বদর বাহিনীর হাতে মর্মান্তিক ভাবে হত্যার পূর্বকাহিনী। এর আগেও ২৭শে রমজান তারিখে গিয়াস উদ্দিন সাহেবকে, মহসিন হলের প্রভোষ্ট ওদুদুর রহমান এবং আর একজন হাউজ টিউটর জনাব জহুরুল হক সাহেবকে মিলিটারীরা এসে ধরে নিয়ে দুদিন কড়া জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এর কারণ যা পরে জানা গেছে হলের ইসলামী ছাত্র সংঘের ছাত্রদের যা ইচ্ছে তা করার প্রতিবাদে হল প্রশাসন নাকি তাদের সাথে সহযোগিতা করেননি। তারও আগে সেপ্টেম্বর মাসে গিয়াসউদ্দিন সাহেব যমদূত শিরোনামায় লিখিত একটি চরমপত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু তা তিনি তখন ততটা আমল দেননি।

মীর শাহাবুদ্দীন মাহমুদ
দৈনিক বাংলা, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭২

ডঃ আবুল কালাম আজাদ

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের ছেলে আজাদ ছাত্রজীবনে বরাবরই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিতগণিতে রেকর্ড ভাঙ্গা নম্বর নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক পান। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আজাদ ফ্লাইং অফিসারের পদমর্যাদা নিয়ে অধ্যাপক হিসেবে তৎকালীন পাকিস্তান বিমান বাহিনী একাডেমীতে যোগ দেন।

সেখান থেকে প্রশিক্ষণের জন্য তাকে যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়। বিমান বাহিনীতে তার মেধা এবং কৃতিত্ব অবাঙ্গালীরা ভালো চোখে দেখেনি। এজন্যে তার চাকুরীর মেয়াদ তারা হঠাৎ শেষ করে দেয়। নিরুপায় হয়ে

তিনি তখন ঢাকায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতির কাছে চাকুরীর সন্ধান চেয়ে চিঠি লেখেন। চিঠির উত্তরে তিনি সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান এবং পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

একসময় তিনি জগন্নাথ মহাবিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখান থেকে তিনি গণিত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে উন্নয়ন বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষণ কেন্দ্রে (আই, এ, এস, টি,টি) যান। সেখানে তিনি বৎসরখানেক ছিলেন। অধ্যাপনা জীবনে আজাদ বৃত্তি নিয়ে আর একবার যুক্তরাজ্যে যান। এবার তিনি ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, মেঘবিজ্ঞানে ডক্টরেট এবং তরল পদার্থ সম্পর্কিত বলবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা নেন।

এছাড়া গণিতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যে তিনি লন্ডনের রাজকীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান সমিতি, যুক্তরাজ্যের ফলিত গণিত সমিতি এবং বোষ্টনের আবহাওয়া বিজ্ঞান সমিতির ফেলো নির্বাচিত হন। ম্যানচেষ্টারে তিনি কিছু দিন সার্বক্ষণিক অধ্যাপক ছিলেন। সার্বক্ষণিক এবং স্থায়ী অধ্যাপকের পদও তাকে দেয়া হয়। কিন্তু মা, ভাইবোনদের কথা ভেবে তিনি ফিরে আসেন।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন যুদ্ধের আগে কয়েকদিন আজাদের সাথে আমি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারিনি। হঠাৎ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পেলাম ১৭ই ডিসেম্বর। আমি সেদিন পাড়ার মুক্তি যোদ্ধাদের সম্বর্ধনার আয়োজনে ব্যস্ত।

কাজের চাপে সেদিন আজাদের বাসায় যেতে পারিনি, শুধু মুক্তিবাহিনীর কাছে আজাদের সন্ধানের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছি। পরদিন তার বাসায় যাওয়ার উপক্রম করছি, তখনই এলো সেই শেষ খবর। আজাদ ফিরেছেন। কিন্তু নিষ্প্রাণ, ক্ষতবিক্ষত দেহে, রায়েরবাজারের বধ্যভূমি থেকে। খবরটি শোনামাত্র আমার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করেছিলেন।

তাঁকে নিয়ে কোনক্রমে আজিমপুরের দায়রা শরীফের দিকে ছুটছিলাম। আজাদের বাসা দরগার ভেতরে। সেই দরগার মর্যাদাহানি করে বদর বাহিনীর পাঁচটি খুনী ১৫ই ডিসেম্বর সকালে তাদের বাসায় ঢুকে পড়ে। প্রথমে তারা আজাদের সামনে রিভালবার ধরে তাঁকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অকারন তল্লাসী চালায়।

তারপর নিরপরাধ আজাদকে বাসি মুখে ধরে নিয়ে যায়। ছোট বোনটি তখন তাদের পায়ে ধরেছিল। মা, বার বার তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা তোমরা বাঙ্গালী, তোমরাও আমার ছেলে, ওকে তোমরা ছেড়ে দাও। কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেনি, নরপশুরা এই নারীকে প্রতিবারই প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

সেদিন তিন ঘন্টার জন্যে সান্ধ্য আইন উঠে যায়। তখন আজাদের ছোট ভাই 'ইভনিং পোষ্ট'-এর সম্পাদক হাবিবুল বাশার, বড় ভগ্নিপতি ইষ্টার্ন নিউজ এজেন্সির মালিক গোলাম রসুল আজাদের সন্ধান নেওয়ার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া গেল ১৭ই ডিসেম্বর বিকেলে, ডঃ রাবিবসহ আরো কয়েকজন জ্ঞানীগুণীর লাশের পাশে।

আতোয়ার রহমান
দৈনিক বাংলা, ৭ জানুয়ারী, ১৯৭২

আ, ন, ম, গোলাম মোস্তাফা

আ,ন,ম গোলাম মোস্তফাকে আলবদরের জল্লাদরা ১১ই ডিসেম্বর সকাল ন'টায় তাঁর গোপীবাগের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। বদর বাহিনীর তিনজন জল্লাদ বাসায় এসেছিল। বলেছিল, আপনার সাথে কিছু কথা আছে, বাইরে আসুন।

মোস্তফা তখন তাঁর নয় মাসের শিশুসন্তান অভীকে কোলে নিয়ে পায়চারী করছিলেন। বাচ্চাকে নামিয়ে রেখে তিনি ওই জল্লাদদের সাথে বেরিয়ে যান।

বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্ত থেকে ওর খোঁজখবর শুরু হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু আকস্মিকভাবে কারফিউ জারী করায় সেদিনের মত অনুসন্ধান কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এবং একটানা কারফিউ চলতে থাকায় এই অনুসন্ধান কাজ আর শুরু করা যায়নি। ইতিমধ্যে জামাতে ইসলামীর সদস্য বলে পরিচিত পূর্বদেশের ষ্টাফ রিপোর্টার চৌধুরী মঈনুদ্দীনের শরণাপন্ন হয়েছিলো অনুসন্ধানকারীরা। হায়, তখনও কে জানতো এই চৌধুরী মঈনুদ্দীনই ছিল আলবদর বাহিনীর অপারেশনাল ইনচার্জ।

মোস্তফার খোঁজে বেরিয়েই জানা গেলো বদর জল্লাদদের আগ্রাসী ক্ষুধার কথা। জানা গেল এই দিনই ভোরে ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দীন হোসেনের গ্রেফতারের কথা। আরো অনেকের বাড়ীতে তাদের হানা দেবার কথা।

তার ভাইয়েরা, আত্মীয়স্বজনেরা, বন্ধুবান্ধবরা, রায়ের বাজারের বিলের বধ্যভূমিতে পাগলের মত খুঁজে ফিরেছে তাঁর লাশ। কিন্তু না, কোন সন্ধান তাঁর মেলেনি।

মনজুর আহমদ
দৈনিক বাংলা, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজা

তাঁর সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল একাত্তুরের মার্চ মাসের সম্ভবতঃ বাইশ তারিখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে, উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে, কাগজ পড়ছিলেন; টুকরো টুকরো কিছু আলাপঃ অসহযোগ আন্দোলনের সম্ভাবনা, পরিণাম ইত্যাদি। তারপর ২৭শে মার্চ কার্ফিউ বিরতির সময় মোটরসাইকেলে তাঁকে ছুটে যেতে দেখেছিলাম। আমি ছিলাম সপরিবারের সশঙ্ক, আশ্রয়সন্ধানী। কথা হয়নি, পরে আর দেখাও হয়নি।

স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফিরে জানলাম, যে সমস্ত প্রিয় পরিচিত ঘনিষ্ঠ মুখ চিরতরে হারিয়ে গেছে, তিনি আছেন তাঁদের মধ্যে।

কেননা মোহাম্মদ মোর্তজা শুধু ডাক্তার ছিলেন না, ছিলেন সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি, ছিলেন লেখক।

মোহাম্মদ মোর্তজা চব্বিশ পরগনার বাদুরিয়া থানার চন্ডীপুর গ্রামে ১৯৩১ সালেন ১লা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন কলকাতা বালিগঞ্জ সরকারী হাই স্কুল থেকে। তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৪৮ সালে আই,এস,সি,পাশ করে ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম,বি,বি,এস ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা ১৯৫৫ সালের ১৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিক্যাল অফিসার পদে যোগদান করেন এবং নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুনেছি, ডাঃ মোর্তজা কিছুকাল যাবৎ ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কিছুটা পরিচয় মেলে 'কপোত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর রাজনীতির পরিচয় প্রবন্ধে। এছাড়া অধুনালুপ্ত 'গণশক্তি' পত্রিকায় তিনি বেনামে প্রবন্ধ লিখতেন বলে শুনেছি। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেনঃ সমাজতন্ত্র নামে একটা বই লিখবেন। সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ১৯৭১ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর সকাল ৮-৩০ মিনিটে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবন থেকে আল-বদর বাহিনীর লোকেরা তাঁকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। অন্যান্য শহীদ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মীরপুর মাজারের কাছে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে। ৫ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে
বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

ডঃ ফয়জুল মহী

পাক হানাদার বাহিনী ও বদর বাহিনীর হাতে শাহাদাতবরণ করেছেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ ফয়জুল মহী।

আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর সেবার ও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন যখন দেশের সবচেয়ে বেশী- তখনই আমরা তাকে হারালাম। পাক হানাদার সেনারা নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে স্থানীয় নরপশুদের সাহায্যে আরো অসংখ্য বুদ্ধিজীবীর মত ডঃ ফয়জুল মহী সাহেবকে হত্যা করে স্বাধীনতা লাভের দুই দিন পূর্বে।

১৯৬৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম,এ পাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার কলরেডো ষ্টেট কলেজে অধ্যয়ন করার জন্য একটি বৃত্তি লাভ করেন। সাফল্যের সাথে ১৯৬৭ ও ৬৮ সনে সেখান থেকে যথাক্রমে এম,এ ও ডক্টর অব এডুকেশন ডিগ্রী লাভ করেন এবং দেশে ফিরে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ আই,ই,আর-এ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল আর্টস বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন।

তিনি ন্যাশনাল এডুকেশন এসোসিয়েশন, আমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল আর্টস এসোসিয়েশন, আমেরিকান ভোকেশনাল এসোসিয়েশন এবং আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর হায়ার এডুকেশন এই চারটি সংস্থার প্রফেশনাল মেম্বার ছিলেন।

সেদিন ছিল ১৪ই ডিসেম্বর। বদর বাহিনীর ৬টি খুনী সকাল ৮-৩০ মিনিটে ৩৫/জি বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে আসে এবং মহী সাহেবকে ডাকে। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরের দরজা খুলে বের হন এবং অতি বিনয়ের সাথে বলেন আপনারা বসুন। বসতে তারা রাজী না হয়ে তাকে সাথে করে নিয়ে যায় এক অজানা জায়গায় চোখ বাঁধা অবস্থায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখবার সাধ ছিল ডঃ মহীর। মুক্তি সংগ্রামে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। পেয়েছেন কেবল স্বাধীন সোনার বাংলার স্বাধীন মাটি। আজ স্বাধীন বাংলার মাটিকে জড়িয়ে ধরেই তিনি চিরকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে ঘুমিয়ে আছেন।

মোঃ আমিনুল ইসলাম
পূর্বদেশ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

এ, কে, এম, সিদ্দিক

যে সব বুদ্ধিজীবী একাত্তুরের ডিসেম্বরে শহীদ ও নিখোঁজ হয়েছেন জনাব এ, কে, এম, সিদ্দিক (হেনা মিয়া) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ঢাকার হাইকোর্ট ও জজকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনবিদ এবং প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়নীতির প্রতীক।

১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল কতিপয় অবাঙ্গালী তাঁর ওয়ারীস্থ বাসভবনের সামনে একজন বাঙ্গালী যুবককে ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যার আয়োজন করলে জনাব সিদ্দিক তার প্রতিবাদ জানান এবং যুবকটিকে সেদিন অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এতে করে পাকবাহিনীর সহযোগিতায় সেই দালালেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে ৭০/৮০ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। পরে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে লুটতরাজ করে এবং বাড়ির ছোট থেকে শুরু করে সকলকে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করায়। ভাগ্যক্রমে সে যাত্রা জনাব সিদ্দিক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা রক্ষা পান।

এ ঘটনার পর থেকেই তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কিন্তু উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সমস্ত বাঙ্গালী যেখানে দুর্ভাগ্যের কবলে পতিত সেখানে আমি বৃথা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবো কিভাবে?'

আত্মরক্ষা তিনি করেননি। নিয়তি তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। আমরা সবাই যখন জল্লাদবাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম ঠিক এমনি সময়ে, ১৪ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো আল-বদরের একটি মাইক্রোবাস। যাবার সময় তিনি বললেন, 'এপ্রিলের দুই তারিখে যখন ফিরে এসেছি ইনশাআল্লাহ্ এবারও ফিরে আসবো।' জনাব সিদ্দিকের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজন এখনো তাঁর ফিরে আসার পথের দিকে অধীর আগ্রহে চেয়ে আছেন।

সদালাপী, মিষ্টিভাষী ও পরোপকারী জনাব সিদ্দিকের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৬ বৎসর। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে।

নার্গিস মজিদ
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে
বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বেগম মুজিব কিভাবে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	দৈনিক বাংলা	৪ জানুয়ারী, ১৯৭২

বেগম মুজিবের বিষাদঘন
দিনগুলোর কয়েকটি কথা

নববর্ষের দিন সূর্যের আলোয় পথ চিনে এগিয়ে গেলাম, আঠার নং রোডের দুর্গসদৃশ সেই বাড়ীটার দিকে। বাইরের ঘরেই বসেছিলেন বেগম শেখ মুজিব। হাসিমুখেই আহবান জানালেন আমাকে। বাড়ীটার উল্লেখ করতেই হেসে বললেন- এটাতো তবুও একটা মাথা গুজবার ঠাঁই, কিন্তু ২৫শে মার্চের পর পুরো দেড় মাস তাও কোথাও পাইনি। আজ এখানে কাল সেখানে, এমনি করে সেই মাসে কম করে হলেও চৌদ্দ পনেরটা বাসা বদল করেছি।

হাসছিলেন বেগম মুজিব, কিন্তু দেখলাম হাসি মাঝে কেমন জানি অস্পষ্ট এক বিষণ্ণতার ছোঁয়ায় করুণ হয়ে উঠেছে তাঁর চোখের দৃষ্টি।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাত। অন্ধকার শোবার ঘরটাতে বিছানায় শুয়ে শেখ সাহেব শুনছিলেন বাইরে বোমায় বিধ্বস্ত ঢাকার আর্তনাদ। উত্তেজনায় এক এক সময় উঠে বসছিলেন তিনি।

ঠিক এমনি এক মুহূর্তে গুলির একটি টুকরো জানালা ভেদ করে ছোট ছেলে রাসেলের পায়ে আস্তে করে লাগে। অন্ধকারে হাতড়ে গুলিটা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন শেখ সাহেব। আর সেই দুঃসহ রাতেই নরপিশাচরা তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে তখন ছিলেন বেগম মুজিব, আর তার দু'ছেলে।

২৬শে মার্চ- সমস্ত দিন ছিল কারফিউ। গোলাগুলির শব্দ তখনও থামেনি। নিস্তব্ধ বাড়ীটা জুড়ে যেনো এক ভৌতিক বিভীষিকা মাথা খাড়া করে উঠেছে। সামনে ধানমণ্ডি বালিকা বিদ্যালয়ে তাক করে রাখা বড় বড় কামানের মুখগুলো আমার বাসার দিকে। ভয়ে জানালাগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারিনি। দুপুরে কারফিউর মধ্যেই এ বাসা ও বাসা করে বড় ছেলে কামাল এসে পৌঁছালো।

রাত এলো। সেই আঁধার কাল রাত। ইয়াহিয়া খানের হিংস্রভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বলা বিবৃতি শুনেই নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারলেন বেগম মুজিব। তাই কালবিলম্ব না করে ছোট ছেলে আর মেঝ ছেলেকে নিয়ে পাঁচিল টপকে প্রতিবেশী ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। অন্যদিকে বড় ছেলে কামাল এবং মহিউদ্দীন সাহেব পালালেন অন্যদিকের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে। রাত ১১টা থেকেই তোপদাগার শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। কতকটা চেতন কতকটা অচেতন অবস্থায় বেগম মুজিব ২৬শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাতে শুনলেন তাঁর আদরের বাড়ীতে গোলাগুলির শব্দ। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। সে রাতে এভাবে না পালালে তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের ভাগ্যে কি যে ঘটতো আজও তিনি তা ভাবতে পারেন না।

২৭শে তারিখ সকালে বাচ্চা দু'টো সাথে নিয়ে তিনি আবার পালালেন। পুরো দেড় মাস এ বাসা ও বাসা করেন। শেষে মগবাজারের এক বাসা থেকে পাক বাহিনী তাঁকে আঠারো নং রোডের এই বাসায় নিয়ে আসে।

১৮নং রোডে আসবার পূর্বকার মুহূর্তটি স্মরণ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন বেগম মুজিব। বললেন- 'আমি তখন মগবাজারে একটা বাসায় থাকি। আমার বড় মেয়ে হাসিনা তখন অন্তঃসত্ত্বা। সে, জামাই, আমার দেওর, জা, মেয়ে রেহানা, পুত্র রাসেলসহ বেশ কয়েকজন একসাথে ছিলাম মগবাজারের বাসাটাতে। হঠাৎ একদিন

পাকবাহিনী ঘেরাও করে ফেললো বাসাটা। একজন অফিসার আমাকে জানালো যে আমাকে তাদের তত্ত্বাবধানে অন্যত্র যেতে হবে। জানি না কি হবে। ঠিক সেই মুহূর্তটাতে ভীষণ সাহসী হয়েছিলাম আমি। কড়াভাবেই সেই অফিসারকে বললাম, লিখিত কোন আদেশপত্র না দেখালো আমি এক পা-ও বাড়াব না। উত্তরে সে উদ্ধতভাবে জানালো যে ভালোভাবে তাদের সাথে না গেলে তারা অন্য পন্থা গ্রহণ করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমি বললাম যে, আমার মগবাজার বাসায় যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার সাথে থাকতে দিতে হবে। আমার কথায় তারা নিজেরা কি যেনো আলোচনা করলো, পরে তারা রাজী হয়ে নিয়ে এলো আমাদেরকে ১৮ নং রোডের এই বাসাটাতে।

১৮ নং রোডে আসার প্রথম দিনের কথা বলতে গিয়ে আবার হেসে ফেললেন বেগম মুজিব। ময়লা আবর্জনা পূণ এই বাড়ীটাতে তখন বসবার মতো কোন আসবাবপত্র দূরে থাক, একটা মাদুর পর্যন্ত ছিল না। জানালার পাশ ঘেঁষা ৩/৪ ইঞ্চি প্রশস্ত একফালি জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিলেন তিনি এবং পরিবারের সমস্ত সদস্যরা।

অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে এইভাবে কষ্ট করে বসে থাকতে দেখে সেদিন বুক ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি, শুধু অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলেন চারিদিক। হয়তো অসহায়ের করুণ ডাক আল্লাহতায়ালা সেদিন শুনেছিলেন। প্রহরী পাক-বাহিনীর এক পাঠান অফিসার অনুভব করেছিল তাঁর অসহায় অবস্থাকে। সেই অফিসার একজন ঝাড়ুদার সংগ্রহ করে পরিস্কার করে দেয় ঘর দয়ার- সংগ্রহ করে দিয়েছিল কয়েকটি চেয়ার এবং একটি কম্বল।

বন্দী জীবনের নৃশংস পাক-পাহারাদার বাহিনীর মধ্যে এই অফিসারটিই ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম।

ধানমণ্ডির এই বাড়ীটার মাঝে অনেক দুঃখ দৈন্যের স্মৃতি চিরদিনের মতো বেগম মুজিবের বুকে আঁকা হয়ে গেছে তবুও এই বাসাতেই তিনি তার প্রথম আদরের নাতীকে বুকে নিতে পেরেছিলেন- এ স্মৃতি তাঁর কাছে কম উজ্জল নয়।

-দৈনিক বাংলা

বেগম মুজিবের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাতকার

ডিসেম্বরের দুপুর। বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং রোডের বাড়ীর দ্বিতলেন বসবার ঘরে বসে কথা বলছিলেন বেগম মুজিবের সাথে। গত বছরের বন্দী জীবনের দুর্বিষহ ও ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোর কথা। বর্ণনা করছিলেন তিনি...

২৬শে মার্চের পরপরই বড় ছেলে কামাল চলে গেছে ওপারে। হাসিনার শরীর খারাপ। তবুও অসুস্থ শরীরে সেই ছিল আমার সবচেয়ে ভরসা।

মে মাসের ১২ তারিখ। ১৮ নং রোডের সেই একতলা করা গৃহে আমাদের নেয়া হয়। হানাদারদের পাহারাতে জীবন কাটাচ্ছিলাম আমি। বাসার যে সব প্রহরী ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন সাদা পোষাকধারী সিভিল আর্মড ফোর্সের লোকও ছিল। এরা কার্যত আর্মির প্রহরীদের ঠিক রাখতো।

একদিনের ঘটনা। আমার শোবার ঘরে জামাল আর রেহানা ঝগড়া করছিল। বন্দী জীবন জামালের মত ছেলে সহ্য করতে পারছিল না। কেমন যেনো ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন তাই ওদের দু'ভাই বোনের ঝগড়াটা একটু বেশী রকমে শুরু হয়েছিল। ওদের ঝগড়ার মাঝেই হুট করে ঘরের মধ্যে সিভিল আর্মড ফোর্সের একজন অফিসার ঢুকলো। চোখ লাল করে হিংস্রভাবে সে জামালকে বললো, তুমি আজকাল বেশী বাড়াবাড়ী করছ। এভাবে গোলমাল করলে আমরা তোমাকে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে

যাব। পা দু'টো উল্টো করে বেঁধে তোমাকে চাবুক মারা হবে। জীবনে আর যাতে কারো মুখ দেখতে না পাও সে ব্যবস্থাও করা হবে। বেশ চিৎকার করেই অফিসারটি কথাগুলি বলেছিল। আমি প্রথমে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে বললাম ঘর থেকে। একটা হিংস্র দৃষ্টি সে আমাদের ওপর নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিসারটি চলে যাবার পর বেগম মুজিব তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করে নিলেন। সে দিনই তিনি অফিসারটির জঘন্য আচরণের সমস্ত ঘটনা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত উপর মহলেই লিখে জানালেন।

কিন্তু এ ঘটনার পর থেকেই জামাল যেনো আরও অশান্ত হয়ে উঠলো। পালাবার জন্য সমস্ত সময় সে সুযোগ খুঁজতো। ২৭শে জুলাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাসিনার সন্তান হলো। আমাদের জীবনে এলো প্রথম নাতী। অথচ তাঁকে দেখবার জন্য আমাদের কাউকেই অনুমতি দেয়া হল না। ঘরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলাম সেদিন। কেঁদেছিলাম পাক করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরগায়।

৫ই আগষ্ট জামাল পালিয়ে গেল বাসা থেকে। কয়েকদিন আগে থেকেই পালিয়ে যাবার জন্য সে চেষ্টা চালাচ্ছিল। আমাকে বলছিল আমি যদি পালাতে পারি তাহলে ৩/৪ ঘন্টা ওদেরকে কোন খবর দিও না। জামাল পালাবার পর বুঝতে পারলাম যে ও পালিয়েছে। মন আবার অশান্ত হলো। যদি ধরা পড়ে শেষ হয়ে যায়, আবার সান্ত্বনা পেলাম বাঁচলে এবার ও বাঁচার মতো বাঁচবে। বেলা দু'টায় খাবারের সময় ওর খোঁজ পড়লো। খোঁজ খোঁজ, চারিদকে খোঁজ। কিন্তু জামাল কোথায়? সন্তানের খোঁজে আমি তখন দিশেহারা হবার ভান করলাম।

সরাসরি চিঠি পাঠালাম ওপর মহলে। আমার ছেলেকে তোমরা ধরেছ। এবার ফিরিয়ে দাও। হানাদারদের তরফ থেকে কিছুই বলার ছিল না। কেননা আগেই আমি এ সম্পর্কে সজাগ হবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম সর্বত্র। তদন্তের জন্য যে কর্নেলকে পাঠানো হয় সে মনে মনে শংকিত হলো। হয়তো সত্যিই ওদের বাহিনীর কেউ জামালকে গুম করেছে। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কর্নেল ফিরে গেলেন। কিন্তু আমাদের ওপর কড়াকড়ির মাত্রা আরেক দফা বাড়লো।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে জামালের চিঠি পেলাম। এ সময় আমার শাশুড়ীর শরীর বেশী খারাপ থাকায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। প্রতিদিন দু'ঘন্টার জন্য আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। রোগী দেখার ভান করে ওপার থেকেও অনেকেই আসতো। ওদের মাথায় হাত রেখে হানাদার প্রহরীদের দেখিয়ে উপদেশ দিতাম ঠিকমতো ঘরে থেকে লেখাপড়া করার জন্য। এক ফাঁকে চিঠিটা হস্তগত করে নিজে সাথে করে নীচ পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম ওদেরকে। ভীষণ ভয় লাগতো ওদের জন্য। কিন্তু আল্লাহকে ডাকা ছাড়া কিইবা আমি করতে পারতাম তখন।

ঠিক এভাবেই কেটে গেছে আমার দিন। সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা দিয়েই চলতো আমার ছোট সংসার। দুঃখ-দৈন্য যন্ত্রণা দেহমনে সব কিছুই যেনো আটকে গিয়েছিল। প্রতি মুহূর্তে একটি সন্দেহ দিয়ে ঘেরা মৃত্যুর রাজত্বে ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটতো আমাদের।

প্রিয়জনরা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। জানতাম না কেমন আছে ওরা। স্বামীর জন্য আর চিন্তা করতাম না। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাঁকে বাঁচাবার সাধ্য যে আর কারো নেই।

একথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। তবু মাঝে মাঝে শিরা উপশিরাগুলো অবশ হয়ে আসতো। কোথায় আমার বুকের সন্তানেরা আর এই কারাগৃহে আবদ্ধ আমাদের জীবনের স্থায়ীত্বই বা কোথায়?

নভেম্বরের শেষের দিকেই বুঝতে পেরেছিলাম ডিসেম্বরে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমার বন্দী জীবনে বাইরের সংবাদ আসার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ট্রানজিস্টার সেটটা ছিল। আমরা শুনেছিলাম ভারত

বাংলাদেশকে যেদিন স্বীকৃতি দেবে সেই দিনই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে। দিন তারিখের কলকাতার ঐতিহাসিক জনসভা শোনার জন্য তাই আমাদের প্রতীক্ষা ছিল একটা ভিন্নতর। ইন্দিরাজীর ভাষণ শেষ হলো। খুবই বিস্ময় লেগেছিল। কেন জানি ট্রানজিস্টারের সামনে থেকে নড়তে ইচ্ছা করছিল না। রাত বাড়ল আকাশ বাণীর সংবাদ শেষ হলো। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো শীঘ্রই বিশেষ ঘোষণা প্রচার করা হবে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহমন। পরিবারের সকলেই ঘিরে বসলাম ট্রানজিস্টারের চারিদিক। কিন্তু কোথায় সে ঘোষণা। সময় কেটে যাচ্ছিল। একে একে বাচ্চারা ঘুমুতে চলে গেল। মাথার কাছে ট্রানজিস্টারটা খোলা রেখে প্রতীক্ষা করতে করতে কখন যেনো ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙ্গলো বিমানবিধ্বংসী কামানের কটকট শব্দে। বুঝলাম যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

৬ই ডিসেম্বর ভারত স্বীকৃতি দিল স্বাধীন বাংলাদেশকে। সে এক অনন্য অনুভূতি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির সংবাদ এলোমেলো করে দিচ্ছিল আমার দেহ মনকে। বাচ্চারা কাঁদছিল ওদের আব্বার জন্য। আমি চেষ্টা করছিলাম ওদেরকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু স্বাধীনতার স্বীকৃতি আর অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর আশঙ্কা আমার আত্মাকে যেনো অসার করে তুলেছিল।

ডিসেম্বরের দিন গুলো প্রতিদিন যেনো নতুন নতুন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াতো। ১৭ তারিখ সকালে যখন পাক আর্মিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল তখন শেখ মুজিবের বাসা থেকে শুধু মাত্র সিভিল আর্মড অফিসার দুজনকে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রধানতঃ আর্মিকে শৃঙ্খলায় রাখার জন্য সিভিল আর্মড অফিসার নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে সিভিল আর্মড অফিসার দু'জনকে ফিরিয়ে নেয়ার সাথে সাথে আর্মি প্রহরীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে ওরা আশা করেছিল যে, ওদেরও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত যখন চারিদিক থেকে ''জয় বাংলা'' ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল তখন ভীষণ রকম ক্ষেপে গেল ওরা।

আমাদের ঘরের মধ্যে কাপড় শুকোবার জন্য তার বাঁধা ছিল। রাতে তারটা ঝনঝন করে বেজে উঠতেই সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। রক্তের মত লাল দু'টো চোখ। প্রহরী দলের অধিনায়ক সুবেদার রিয়াজ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। কঠোর ভাবে সে বললো খোকাকে ডাকো। ঠাণ্ডা হয়ে বললাম খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন কথা থাকলে আমাকে বলতে পার। আমার মুখের দিকে কঠোর ভাবে তাকিয়ে সে বলল সাবধানে থাকো।

মেজর তারা সিং এলেন বেলা ন'টার সময়। তারা সিং সাধারণ বেশে এসেছিলেন কিন্তু পেছনে তিনি একদল সৈন্যকে পজিশন নেয়া অবস্থাতে রেখে দিয়েছিলেন চারিদিকে। খালি হাতে শুধু ওয়ারলেস সেট সাথে নিয়ে তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওদেরকে বুঝাচ্ছিলেন। প্রথমে ওরা সারেনডার করতে চায়নি। শেষে দু'ঘন্টা সময় চেয়েছিল। গেটের সামনে থেকে ওদের কথা শুনে মেজর তারা সিং যেই পা বাড়ালেন অমনি ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠলো বাচ্চারা আপনি যাবেন না মেজর। যাবেন না। সময় পেলেই ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। সত্যিই সময় পেলে ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলতো। কিন্তু মেজর তারা সিং তাদের আর সে সময় দেননি। ঢুকে পড়েছিলেন গেটের মধ্যে।

পাশের বাঙ্কার থেকে কাঁপতে কাঁপতে হানাদাররা তখন বের হয়ে আসছে আত্মসমর্পণের জন্য।

দৈনিক বাংলা
১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ শামসুল হক ও নূরুল হক	স্বাধীনতা স্মারকসংখ্যা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা	১৯৭২

শহীদ শামসুল হক তালুকদার

জীবনের উজ্জ্বলতা নিয়ে কুমিল্লা জেলার ছোট সুন্দর গ্রাম থেকে এসেছিল সে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে।

শামসুল হককে সকল ছেলেই 'শামসু ভাই' বলে ডাকত। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা, ছাত্র সংসদের সাবেক সম্পাদক এবং ময়মনসিংহের ছাত্র নেতৃবৃন্দের অন্যতম।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলন মার্চের প্রথম দিন থেকেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য ২৫শে মার্চের (১৯৭১) পর শামসুল তাঁর নিজের গ্রাম ছোট সুন্দরে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য দিনরাত তিনি পরিশ্রম করে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং অনেক তরুণ ছেলেকে ভারতে পাঠাতে সাহায্য করেন।

প্রায় ৪ মাস তিনি এ ভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজাকার ও বর্বর পাকসেনাদের চোখ এড়িয়ে ভারতে যাওয়া যখন কঠিন হয়ে ওঠে তখন তিনি তার এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় তথাকথিত শান্তি কমিটির কার্ড প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার জন্য জোগাড় করতে সক্ষম হন এবং এভাবে পাক সামরিক এলাকার মধ্যে দিয়ে নিয়মিত তাঁর ভর্তি করা যুবকগণ ভারতে যেতে সক্ষম হতো। কিন্তু এক পর্যায়ে এ-বিষয়টি নিকটবর্তী স্থান হাজীগঞ্জের রাজাকার ও দালালগণ জানতে পারে। শামসুল হক নিজেও বিপদের কথা বুঝতে পেরে কুমিল্লা চলে যান।

অবস্থা যখন খুব অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে তখন তিনি নিজেই ভারতে চলে যাওয়ার মনস্থ করেন এবং যাবার সময় মাকে দেখতে বাড়ী আসেন। সেদিন ছিল আগষ্ট মাসের ১০ তারিখ। মার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন এমন সময় বাড়ীর চারদিক দুশমন রাজাকার ও শত্রুসৈন্য ঘিরে ফেলে। শামসু বের হতে পারেননি। তাঁকে দুশমনরা বাড়ীর সিঁড়ির আড়াল থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাঁর মত আরও ১৬ জনকে অন্যান্য বাড়ী থেকে ধরে নিকটবর্তী বাজারে এনে প্রত্যেককে খুঁটির সঙ্গে হাত-পা বেঁধে একে একে গুলি করে হত্যা করে। ছোট সুন্দর গ্রামের মাটি রঞ্জিত হয় দেশ-প্রেমিকদের রক্তে।

দেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন শামসুল হক শত কোটি শামসুল হক তাঁর ও স্বপ্ন সফল করবার জন্য এগিয়ে আসবে। শহীদের মৃত্যু নেই, নেই মৃত্যু তাঁর আদর্শের।

শহীদ নূরুল হক

ছাত্রদের অতি প্রিয় একটি নাম নুরু। মে মাসের ২০ তারিখে (১৯৭১) বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ডঃ আমির হুসেন তালুকদারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। ডঃ তালুকদারের পরামর্শ নিয়ে চলে যান তিনি নিজ গ্রাম ছোট সুন্দরে। শহীদ শামসুল হক তালুকদারের সঙ্গে ছায়ার মত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন নূরু।

জুন মাসে নূরু এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা (গেরিলা) নিয়ে। পাক সামরিক অবস্থান দেখে আবার চলে যান ছোট সুন্দর। জুলাই মাসের ২৪ তারিখে আবার তিনি আসেন গ্রেনেড ইত্যাদি নিয়ে ৩/৪ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ। ছাত্রাবাসের বাবুর্চিখানায় অবস্থান করেন দুই রাত। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ অবস্থানরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছোট আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে করেননি, তাই পরবর্তী বড় আক্রমণের সকল তথ্য যোগাড় করে আগষ্ট মাসের (১৯৭১) ২ তারিখে ছোট সুন্দর (কুমিল্লা) চলে যান। কিন্তু, তাঁদের সকল খবর পাকসেনা দালাল মারফত জানতে পারে। পাক হায়েনার দল আগষ্ট মাসের ১০ তারিখে তাঁকে এবং শামসুল হক তালুকদারসহ অনেক লোককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ছোট সুন্দর বাজারে হত্যা করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ চার ভাই	সচিত্র স্বদেশ বিজয় দিবস সংখ্যা	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২

শহীদ চার ভাই

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চার ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন মোজাম্মেল হোসেন বললেন, ''১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী পরিণত হলো ঘাতক বাহিনীতে। ওরা পশুশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র জনগণের উপর। আমাদের তখন বাসা ছিলো মগবাজারের মধুবাগে। রাজারবাগের পুলিশ বাহিনীর উপর খান সেনাদের আক্রমণ শুরু হলো। আমরা ক'ভাই আমাদের এম এল, রাইফেল, দোনালা বন্দুক এবং হাতে বানানো গ্রেনেড নিয়ে এগুলাম। পজিশন নিলাম মালিবাগ মোড়ে। প্রথম কাউন্টার হতেই দেখলাম দ্রুত বেগে ট্রুপ ছুটে আসছে রাজারবাগ থেকে। পিছু হটে আসা পুলিশ সদস্যদের ফেলে যাওয়া কয়েকটা রাইফেল নিয়ে আমরা মগবাজারে ফিরে এলাম।

পরবর্তী দিনগুলো কাটলো অবর্ণনীয় ভীতির মধ্য দিয়ে। ঢাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে আসছে। সবাই পালাচ্ছে। এমন এক সময় রেডিওতে মেজর জিয়ার ভাষণ শুনে ভরসা পেলাম। এদিকে পাবনা (আমাদের দেশের বাড়ী) থেকে খবর এলো, পাবনা তখনও মুক্ত। ২৬ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী পাবনা অপারেশনে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে আমার দুই ভাই এমনকি বৃদ্ধ বাবাও যোগ দিয়েছেন প্রতিরোধ যুদ্ধে।

ঢাকায়ও প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। মে মাসের প্রথম দিকে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বিস্ফোরণ এবং গুলী বিনিময় চলছে এখানে, ওখানে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রুপ ২ নং সেক্টর থেকে ঢাকায় এসে গেছে। এর মধ্যে জয়নালের গ্রুপের সঙ্গে বাড্ডায় গিয়ে দেখা হয়। এক বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পেলামঃ ওদের কিছু অস্ত্র আমাদের বাসায় নিয়ে আশা হলো । এবং তখন থেকেই সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু হলো। আমরা বেশ কয়েকটা অপারেশন চালিয়েছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রামপুরা পাওয়ার স্টেশন এবং খিলগাঁও জেনারেটরে গ্রেনেড নিক্ষেপ প্রভৃতি। ইতিমধ্যে নিউমার্কেট, দিলকুশা ও জিপিও'র সামনে বেশ কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটে। আশ্বস্ত হলাম যে, যাক আমরা শুধু একা নই। অন্যত্রও চলছে প্রতিরোধের তৎপরতা। এদিকে আমাদের কথা ততদিনে জানাজানি হয়ে গেছে। খবর পেলাম যে-কোনদিন বাসা 'রেইড' হতে পারে। ঐ রাতেই আমরা বাড়ী ছেড়ে চলে গেলাম। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের অন্যত্র রেখে এসে কুমিল্লা হয়ে সীমান্ত পেরোবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। খবর পেলাম পাবনার বাড়ীও লুট হয়ে গেছে। আবার ঢাকা হয়ে আরিচা-নগরবাড়ীর পথ ধরে পাবনা হয়ে সীমান্ত পেরোবার সিদ্ধান্ত নিলাম। নগরবাড়ী ঘাটে নামার সাথে সাথে খান সেনাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। নিয়ে যাওয়া হলো স্থানীয় ক্যাম্পে। সেখানে কয়েকটা দিন কাটলো প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকায়। ক্যাম্পের অনেককেই পালাক্রমে ফায়ারিং স্কোয়াডে তোলা হলো। চতুর্থ দিনে আমাদের বধ্যভূমির দিকে নিতে এসেছে। আমাদের তোলা হলো একটা ট্রাকে। এ সময় আমাদের সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। মরতে যখন হবেই তখন শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। সমস্ত শক্তি আর সাহস নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে Revolt করে বসলাম। সিগারেট ধরাবার নাম করে এক সেন্ট্রির থুতনিতে মারলাম ঘুষি। চারদিনের ক্ষুৎপিপাসা ও মৃত্যুর ভয়ে জর্জরিত দেহে জানি না অত শক্তি সেদিন কোত্থেকে পেলাম। ততক্ষণে আমার অন্যান্য সহযাত্রীরা অন্যান্য সেন্ট্রি ও চালককে ঘায়েল করে ফেলেছে। হাইওয়ে ফেলে গ্রামের রাস্তা ধরে আমরা প্রাণ নিয়ে পালালাম।

ওপারে গিয়ে দেখলাম স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক চিত্র। দেখা করলাম যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে। তাঁকে আগে থেকে চিনতাম। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকারের সাথে দেখা করে অকপটে জানালাম, ''এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি একা সৈনিক। আমি যুদ্ধ করতে এসেছি আরাম

করতে আসিনি। আমাকে যুদ্ধে পাঠান। আমার ক্ষোভের কারণ বুঝতে পারলেন এবং ৭নং সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার কর্নেল নুরুজ্জামানের অধীনে কাজ করার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলো কেটেছে আমার ঐ ৭নং সেক্টরেই।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলো দ্রুত এগিয়ে চলছে। প্রতিদিন চলছে সংঘর্ষ। প্রতিদিনই কিছু না কিছু এলাকা মুক্ত হচ্ছে। এরকম সময় (অক্টোবরের ২০ কি ২২ তারিখে) ছোট ভাই মোস্তাকের চিঠি পেলাম-ওরা গ্রুপ নিয়ে দেরাদূনে ট্রেনিং এ যাচ্ছে। শিয়ালদা রেল স্টেশনে ওর সাথে দেখা। মুখে খোচা খোচা দাড়ি, বিধ্বস্ত শরীর। ওই ওর সাথে শেষ দেখা।

আর এক ভাই (রঞ্জু) তখন লড়াই করছে ২ নং সেক্টরে। মঞ্জু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (পরে সে সাধারণ ক্ষমার সুযোগে মুক্তি পায়।) মুকুল লড়াই করছে পাবনার রণাঙ্গনে। একদিন যুদ্ধের শেষ হলো। থেমে এলো রণদামামা। সব পথ তখন এসে মিলেছে ঢাকায়। ঢাকার পতন তখন দিন কয়েকের ব্যবধানে। আমি কিন্তু ৭নং সেক্টরের দায়িত্ব তখনো শেষ করতে পারিনি। দেশে ফেরার পথে পাবনায় ভাইদের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা শুনলাম। দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার দিন কয়েক আগে রঞ্জুকে শেষ দেখা গেছে ঢাকার রূপগঞ্জে।

এদিকে ১০ই ডিসেম্বর অন্যান্য ভাইরা মগবাজারের বাসায় এসে পৌঁছেছে। তাদেরকে দেখতে এসেছে ভগ্নিপতি ইউসুফ। রাতে বাসা রেইড হলো। বাবা-মায়ের অনুরোধে ওরা ফায়ার এক্সচেঞ্জ করা থেকে বিরত থাকলো এবং আত্মসমর্পণ করলো খান সেনাদের কাছে। গাড়ীতে ওদের তোলার সময় সর্বকনিষ্ঠ ভাইটিকে (৭/৮ বছর যার বয়স) মাত্র ওরা ক্ষমা করে ছেড়ে দিলো। কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো ওদের কেউ জানে না, কোথায় ওদের কবর তাও কেউ জানে না। বহু লাশ ঘেটে দেখেছি, ওদের চিহ্ন খুঁজে পাইনি কোথাও। পারিনি আমার সহোদরদের লাশ সনাক্ত করতে। দুঃখ শুধু এই যে ওরা আমৃত্যু লড়াই করেও প্রাণে বেঁচেছিলো। কিন্তু বিজয়ের সূর্য ওঠার পূর্বক্ষণে ওরা হানাদারদের হাতে শহীদ হয়েছে।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

বিদেশী পত্র-পত্রিকা

THE TIMES

MARCH 30, 1971

‘At Dacca University the Burning Bodies of Students Still Lay in Their Dormitory Beds… A Mass Grave Had Been Hastily Covered…’

From Michel Laurent

(An Associated Press photographer who evaded the Army in Dacca and toured the devastated areas.)

Dacca, March 29. In two days and nights of shelling by the Pakistani Army perhaps 7,000 Pakistanis died in Dacca alone.

The Army, which attacked without warning on Thursday night with American supplied M24 tanks, artillery and infantry, destroyed large parts of the city.

Its attack was aimed at the university, the populous Old City where Sheikh Mujibur, the Awami League leader, has his strongest following and the industrial areas on the outskirts of this city of 1,500,000 people.

Touring the still-burning areas of fighting on Saturday and Sunday it was obvious that the city had been taken without warning. At the university burning bodies of some, students still lay in their dormitory beds. The dormitories had been hit by direct tank fire.

A mass grave had been hastily covered at the Jagannath Hall and 200 students were reported killed in Iqbal hall. About 20 bodies were still lying in the grounds and the dormitories. Troops are reported to have fired bazookas into the medical college hospital, but the casualty toll was not known.

Despite claims by the central Government in West Pakistan that life is returning to normal in Dacca, thousands are fleeing the city with only the belongings they could carry. Some pushed carts loaded with food and clothes. Only a few persons have returned to Government jobs, despite the order of the military regime.

Resistance to the Army has been negligible. Pakistanis are obeying military orders to turn in weapons.

The Pakistan national flag is again flying from most Government buildings. It had been replaced in the past 10 days by the green red and yellow “Bangladesh” (Bengal Nation) flag of independence.

In the old City, large parts of which were destroyed, elderly men and women poked among the smouldering ruins of their homes.

Army lorries and armoured cars patrolled the almost deserted streets. Cars were pasted with Pakistan flags to avoid drawing fire from Army patrols.

Bodies still lay sprawled in the streets where they had been caught in the Army cross-fire. Shanty towns by the railway had been burnt down.

The people still appeared stunned by the shooting and deaths.

The Government went to extreme lengths to prevent a large contingent of foreign journalists from witnessing the Army's intervention and the subsequent violence.

Thirty-five foreign correspondents were detained in the Dacca Intercontinental Hotel and only this reporter and a British correspondent evaded the Army cordon and subsequent deportation of newsmen to Bombay. Later the Army at Dacca airport frisked me and seized film and notes on Dacca.

At Karachi, the police forced me to strip, my luggage was searched again, and film was seized.-A.P.

THE TIMES (LONDON)
APRIL 2, 1971

Political and Intellectual Leaders Being Wiped Out in War of Genocide
By Louis Heren

The Pakistan Army is alleged to have waged a war of genocide in East Pakistan. The objective is said to be the elimination of the political and intellectual leadership, and it might well have been achieved.

Old religious enmities are also said to have been revived. Thousands of Hindus are alleged to have been slaughtered by Muslim troops.

This and other charges were made in London yesterday by a young man who left Dacca earlier this week after spending the past two years there. For many reasons his name cannot be revealed, but I know him to be a level-headed and responsible man.

He confirmed that Sheikh Mujibur Rahman, the East Bengal leader escaped the carnage, but 11 members of his bodyguard were killed.

The Sheikh was arrested by troops last Thursday, held in the Adamji school for two days, and then flown to West Pakistan. he is believed to be held in Multan.

According to this informant, a systematic pattern of physical and psychological destruction became apparent even during the first night of fighting of March 25. Soon after, if became clear that certain groups had been selected to be the victims of completely unrestrained brutality.

These included Awami League leaders, students (who are the most radical members of the League), professors and their families, and any Hindu who could be found.

The Army commanders had apparently concluded that the students were the nucleus of a future Bengali independence movement. The professor represented the East Pakistan intelligentsia, vital for the administration of a future independent Bengal.

The reason for killing the Awami League leaders was left-evident. As for the Hindus, my informant is convinced that the troops were led' to believe that they were the malign force behind the secessionist movement.

No single observer could possibly have observed all that went on during the five days of fighting, but what follows was actually seen.

At the University of Dacca, the residential dormitory Jagannath hall was reserved for Hindu students. Tank tracks led to the wall of the compound, which had been blasted down.

Outside the building there was a fresh mass grave. Inside blood streamed from every room which had also been looted. There were bodies of six savagely-killed men in the servants quarters nearby.

In the apartments of the faculty staff, children were seen shot dead in their beds. The dead bodies of what appeared to be the entire family of a senior professor, were found in another apartment.

Outside were seen the bodies of students still clutching lathis, or bamboo staves, in the other predominantly so, the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors walked about with cloths over their noses. At least seven or eight bodies were seen in the rubble of ruined buildings and on refuse dumps.

In tow of the old city's largest bazaars, one entirely Hindu and the other predominantly so, the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors walked about with cloths over their noses. At least seven or eight bodies were seen in the rubble of ruined buildings and on refuse dumps.

In one House, my informant saw the still warm corpse of a man who had been shot to death minutes before. It was surrounded by his wailing wives.

This is what was actually seen. What follows is an account of what happened during the five days of the fighting. Parts of it are reports received by the informant from friends before he left Dacca.

The Army moved in, in force, to occupy key points of the town shortly before midnight on March 25, President Yahya Khan had departed for Karachi only a few hours before, and the assumption was that the troops acted on his personal instructions.

According to official spokesmen, the Army had been warned of a plot to barricade all the approaches to the cantonment shortly after the president's departure. Barricades had certainly gone up throughout the city, and from midnight until noon the next day, Dacca echoed with the sounds of firing from heavy artillery, heavy machine-guns and other automatic weapons.

Throughout the night, there was the glare of large fires and tracer bullets.

By dawn, a large pall of smoke covered much of the city and drifted slowly northwards towards the wealthy suburb of Gulshan. Fire were also seen in the Bihari area, the scene of communal friction earlier in the month.

"Shoot to kill" curfew was imposed upon the city of March 26. Soldiers were seen firing with automatic weapons at the house of Colonel Osmani, a retired Bengal Army officer.

Shooting and fires continued through the night, but less violently and the curfew was relaxed for five hours on Saturday March 27.

During a walk through the newer part of the city, destroyed barricades and squatters, huts were seen every-where.

In the older part of the city, near the police lines, there was complete destruction everywhere. It was understood that the only strong resistance to the Army took place here, with the help of policemen and troops of the East Pakistan Rifles. They were said to have been massacred for their temerity.

Refugees were already beginning to leave the city. Most of them carried only a small bundle of clothes.

The curfew was again lifted on Sunday to allow families to buy food but the New Market was almost completely destroyed.

At the Ramna racecourse, the two small villages and shrines of 'Hindu herdsmen were burnt and utterly destroyed. Many bodies were seen in the rubble, and the few remaining villagers were dazed and terrified.

The conclusion drawn was the East Pakistan would be without political and intellectual leadership for at least a decade, and perhaps a generation.

THE NEW NATION
SINGAPORE. APRIL 6, 1971
Editorial
THE HOLOCAUST IN EAST PAKISTAN MUST BE ENDED

Eye-witness reports from foreign residents evacuated from East Pakistan paint a more horrible picture of the carnage that has been unleashed by President Yahya's troops than had been suspected.

What has been happening is nearer to genocide. An army suppressing a revolt is not in a picnic and a certain amount of unnecessary killing, however deplorable and misguided, was to have been expected.

The way the army has acted, it is now clear, surpasses anything that could pass for legitimate use of force. It has resorted to wanton murder of civilians including women and children, in a deliberate plan to achieve submission by stark terror.

And the army is not succeeding. The resistance of the East Pakistanis, thought unorganized and largely unaimed, gets more stubborn every day. The army's writ does not run beyond the major towns.

Given the normal difficulties of communications in East Pakistan, the army will have to be several times its present estimated size of 70,000 before an uprising which has the backing of practically the whole population can be put down. And when the monsoons arrive in six weeks from now, the army's mobility will be further impaired in a drastic manner.

Official Pakistani reports themselves cannot conceal any longer that the normalcy they have been anno9uncing is very far from being restored. "The factories are at a standstill and there is mass absenteeism from government offices.

If it was a misguided decision for President Yahya Khan to have ordered his armies out, to persist in it is an act of irresponsibility of such cruel magnitude that the world's conscience cannot continue to accept it as a matter that Pakistan only can decide.

The East Pakistan holocaust must stop. Appeals to see reason have been made to Rawalpindi by India, Russia and Britain. More countries must join in this effort to demonstrate that the voice of humanitarianism cannot be stilled by pedantic considerations of internal sovereignty.

THE TIMES, LONDON
MAY 19, 1971
Road of Death
Peter Hazelhurst

SABRUM, May 18

Thousands of terrified and impoverished Bengalis who have attempted to flee to India during the past fortnight have collapsed and died of exhaustion and starvation on the roadside.

Many others on the grim 75-mile march from the Chittagong district to the small Indian border state of Tripura are expected to meet with the same fate, refugees told me today.

As many as 500,000 Muslim and Hindu refugees have already poured into the state of Tripura, and most of them crossed here at Sabrum, where the river Feni demarcates the Indo-Pakistan border.

Permiless, exhausted and in a stupor many of the refugees described the tragic flight from their homes in the Chittagong district, about 60 miles to the south.

Shamsuddin Ahmad, a farmer, aged 40, who has lost his wife and five children, fled Chittagong with his youngest daughter three-year old Rohina, when West Pakistani troops fired on his village. He said his wife was killed by a bullet as the family fled.

Speaking through a Bengali interpreter, he said; "I was separated from the rest of my family as we fled. I don't know what has happened to them. After searching for them I started to walk to the Indian border with Rohina.

"We had no food and no money. She collapsed after six days of walking. I carried her for a long time but she died in my arms. I buried her on the way. I have no one now."

The bewildered farmer said he saw hundreds of other refugees dying on the road. The stronger members of the families would huddle next to the exhausted and dying men, women and children. When they died, they buried them in nearby fields and marched on to India.

The tragic stories of many other refugees are similar. Mr. A.Z.B. Raha, a 48-year old supervisor at Chittagong port, fled when Pakistani tanks moved in on his village, four miles from the centre of the city, last month.

"We started to walk north towards the Indian border. We saw people dying all along the way. Others were lying on the grounds exhausted. The first to die were the babies, then further along the road the old and children collapse, and then the women," he said.

We found Dr. Choudhury, a medical practitioner form shulteepur village near Chittagong, among the 200,000 homeless migrants who have flocked into the southern districts of Tripura. He was in stupor.

Dr. Choudhury claimed that he marched towards India in a daze after the army encircled his village and killed 19 members of his family last months. "There is nothing left," he said.

Dr. Rathin Datta, supervisor of the general hospital in the border town of Agartala, north of Sabrum, has so far treated 300 East Pakistanis who had bulled and shrapnel wounds.

"These people were lucky," he said. "Most of them live near the border and managed to get through to us for treatment. But I fear that thousands have died and are dying from their wounds, starvation and exhaustion on the road from Chittagong.

His 267 bed hospital is now overcrowded with an additional 300 wounded refugees. All the refugees claim they were deliberately shot by Pakistani troops.

Two sisters, Rohina Begum, aged 16, and Jinat Begum, aged five, have bullet wounds in their legs and arms. Rohina said her entire family was wiped out when Pakistani troops fired on their small boat as they attempted to cross the River Feni into India last week.

Dr. Datta asked: "What do I do with these children when I have to discharge them? They have no one."

A railway engineer from the nearby junction of Akhaura had a bullet wound on his head. He cannot believe what has happened.

"Why should they shoot me? I am an important government servant. I told them this when they were looting my office and house." But a soldier said, "Kill the bastard', and when they shot at me I fell to the ground and pretended to be dead.

"They burnt my house and all I have. What am I to do? I am 55-with a family of 10, and I have nothing now."

The road from Agartala is as tragic and sorrowful as the over crowded refugee camps. With fixed stares and utter hopelessness written on their faces the frail Bengalis march northwards in search of shelter and food. The stream is never ending.

Schools and Government offices have been turned into huge dormitories but space is limited and most families are in the open. A great number of women and children have constructed pathetic grass huts.

Sanitation is non-existent, the heat is stiffing, and the stench is unbearable. Pools of stagnant water are seen everywhere and an epidemic could break out at any moment.

THE SUNDAY TIMES
20th JUNE, 1971

POGROM IN PAKISTAN
Teachers, Writers, Journalists Eliminated
Magistrates shot, Doctors disappear
Gestapo-like raids, rape, extortion.

LAST WEEK the Sunday Times published a first-hand report by Anthony Mascarenhas about the excess of the Pakistan Army in East Pakistan. Now we have had news-more up to date and detailed and perhaps even more horrifying of what is happening in East Pakistan. This is not by Anthony Mascarenhas, but it comes to us from academic and professional sources we know to be unimpeachable.

A NEW campaign of terror has begun in East Pakistan. its aim is to eliminate any possibility of another secessionist uprising or political challenge to the unity of the state.

The Military government in Dacca has ordered a two-pronged follow-up to its defeat of the Bangla Desh forces in the field. First, all public servants, teachers, writers, journalists and industrialists are being screened.

Second, anyone considered potentially dangerous is being "eliminated". Army intelligence has already begun arresting and interrogating teachers, journalists and other influential Bengalis. A list of suspects, thought to- be either supporters or sympathizers of the secessionist Awami League has been prepared.

They are being classified in three categories-white, grey and black. The white will be given clearance. The grey will lose their jobs and may be imprisoned. The black will be shot.

Action against the Civil Service has already begun and 36 Bengali District Magistrates and sub-divisional officers have either been killed or have fled to the other side.

When army units entered the towns of Comilla, Rangpur, Kushtia, Noakhali, Faridpur and Serajganj, the local magistrates and the police superintendents were shot out of hand.

Civil servants on the grey list have been transferred to West Pakistan. They include Taslim Ahmed, Inspector-General of Police. When the army struck Dacca on the night of 25th March, the police revolted and fought for 18 hours.

A new element in the regime of terror is the Gestapostyle pick-up. Some of those wanted for questioning are arrested openly. Others are called to the army cantonment for interrogation. Most of them do not return. Those who do are often picked up again by secret agent known as RAZAKARS, a tern used by the volunteers of the Nizam of Hyder- abad who resisted the Indian takeover of the State in 1948. Razakars literally means duty to the king or State.

By night and day parts of Dacca are sealed off by troops searching for Hindus, Awami Leaguers and students. Everyone must carry an identity card. Cars are stopped and searched and the entrances to the city are blocked by checkposts.

If the jawan (infantryman) at the post finds anyone without an identity card and is in no mood to listen, a trip to the cantonment may follow.

Dacca is frequently shaken by bomb blasts after which security is tightened and areas searched for “miscreants” the army term for members of the MUKTI FOUJ (liberation army).

Whatever the army has completed, its task of clearing an area of “miscreants” it is replaced by the militia. These are tough frontier people who are considered more ruthless and less disciplined than the regular army. They are paid three rupees (about 18p) a day and are lured to East Pakistan by the promise of booty.

The persecution of East Pakistan’s Hindu minority and the surviving elements of its Bengali nationalism has a quality of casual horror about it.

Shanker, a college student of Jagannath College, escaped to a nearby village on 27th March. Two months later he returned alone to see what remained of his home at Thatari Bazar. Two non-Bengalis spotted him, shouted “Hindu”, “Hindu” and chase developed. The boy was caught and taken in procession to the mosque where his throat was cut.”

Abu Awal, the district magistrate at Bhola had the reputation of being a loyal government servant. He protected the non-Bengalis population when the Awami League rose in revolt and prevented the Police station armoury from falling into the hands of the Mukti Fouj.

When they attacked on 1st May, he went to receive them. The Brigadier in charge of the action asked him to resume his post. He had hardly turned his back on the officers, when a sepoy shot him with a rifle.

About a dozen Bengali army officers were transferred to West Pakistan. They laid goodbye to their families and reported at Dacca Airport to board a PIA flight to Karachi.

The families have not so far heard from them. When they inquired at Army headquarters they were told that they bad deserted. The mutilated body of a major was delivered to this family with a letter of regret that he had committed suicide.

The whereabouts of Brig. Majumdar, one of the best known Bengali officers, is unknown. He stayed with his Punjabi colleagues when his Bengali troops revolted in Chittagong. When his family asked about hi, they were told that any inquiry would invite trouble.

On the right of June 2, an army jeep entered the Dhanmondi residential area of Dacca. A Government officer called Huq was dragged out of his house and taken to Kurmitola army cantonment.

His wife telephoned Shafiul Azam, civilian head of the East Pakistan government who contacted army headquarters and was told no one called Huq had been brought in.

An industrialist, Ranada Saha, was told to arrange a gala evening for army officers at his village home in Mirzapur. He went to discuss the arrangements and did not return.

Troops surrounded the house of a civil servant called Amin. He was taken away in an army truck with his aged parents, his wife and three children. His brother was an officer in Bengal Regiment which revolted and is now leading the Bangla Desh resistance near Comilla. The Amin family returned two days later without Mr. Amin.

A captain entered Mitford Hospital in Dacca with two soldiers on 15th May, went to Ward Two and led away Dr. Rahman and another of his colleagues. They were told they were needed to work in Mymensingh. Their whereabouts are now unknown.

Other troops went to American-run Holy Family Hospital but there were no surgeons, there. The hospital is now considering Closing down because many of its doctors have fled including the renowned child specialist, Dr. M. N. Huq.

At Sylhet, all doctors except Surgeon-General Dr. Shamsuddin , fled across the border when the army entered the town. A major found Dr. Shamsuddin in the hospital theatre and shot him point blank.

Most of the senior Bengali officers of the PIA are missing after being picked up, including Mr. Fazlul Huq, Deputy Managing Director for East Pakistan and Captain Sekander Ali, chief sector pilot. Since the military takeover the airline has dismissed about 2,000 Bengalis.

Razakars have seized the two children of Major Khaled Mosharraf of the Bengal Regiment who deserted to the Mukti Fouj. The children aged six and four were first taken as hostages by the army. Their mother escaped to India. The children were released but then retaken.

Relatives of missing persons believe that the Razakars are junior army officers working independently in league with non-Bengalis. Some families have received ransom demands and one case is know of money being paid without success.

The Razakars have now extended their operations from murder and extortion to prostitution. In Agrabad in Chittagong, they run a camp of young girls who are allocated nightly to senior officials. They also kidnapped girls for their parties. Some have not returned. Ferdausi, the leading Bengali singer, narrowly escaped a similar fate when army officers entered her home. Her mother telephones a general whom she knew and military police were sent to her rescue.

A recent development is the return to duty, duress, of a number of Intelligence Department official who went absent in March in response to Sheikh Mujibur Rahman's call for non-cooperation with the federal government.

They are now obliged to submit the names of "undesirable persons" to the army, which is taking care not to pick up the wrong people as it did on the nights of 25th and 26th March.

On those two nights, the army killed more than 20 University professors. Of these, Dr. Moniruzzaman of the Physics department was shot dead instead of his namesake in the Bengali Department, Mr. Monaim of the English Department was similarly killed instead of Mr. Munir, also of the Bengali Department.

Some University teachers reported for duty on 1st June at the instigation of General Tikka Khan, the Martial Law Administrator, but some of them have since fallen into the hands of the RAZAKARS.

The activities of RAZAKARS are known, if not overtly approved, by the military administration. Occasionally, they are a source of concern. Recently the administration managed to induce a few hundred jute workers to resume production in Dacca. On 29th May three of their trade union leaders were taken away in an army jeep. By the following day the workers had fled.

The PROBLEMS of return for the 6 million refugees seem insuperable. In Dacca, Jessore, Rangpur, Ishurdi, Khulna and Chittagong their houses and shops have been taken over by non-Bengalis.

Backed by the army on 28th April, they cleared Mirpur and Mohammadpur, two residential districts covering 15 square miles in Dacca," of their entire Bengali population, killing everyone who had ignored an advance warning to leave.

In Jessore soldiers surrounded the house of Mr. Masihur Rahman, an Awami League member of the National Assembly, and non-Bengali civilians went in killing everyone. A 10 year old boy jumped from the first floor and was shot in mid-air by a sepoy.

Organizations caring for the refugees who came into East Pakistan at the time of-Partition and the Razakar backed 'Peace Committee; are publishing press notices inviting applications for "allotment" of shops and houses left by Bengalis.

In Chittagong locked shops and houses in Laldighi and Reazuddin Bazaar were broken open by the army and handed over to non-Bengalis. Nearly all sequestered property now has signboards and name-plates in Urdu, the lanauage of West Pakistan.

In the villages the houses have been distributed among members of the right wing Jamat-e-Islam and Muslim League which were humiliated in the last election by the Awamil League.

All Hindu bank accounts have also been frozen, together with those of suspected Awami League supporters. The manager of the British National & Grindlays Bank in Dacca was the only banker to have queried the directive.

Bengalis have also been forbidden to approach major rail way, port and dock installations. When 5,000 labourers returned to work in Chittagong docks on 1st May, they were driven away. The installations are now run by military, naval and non-Bengali personnel.

Senior railway officers in Chittagong were shot and the workers colony burnt down. In Dacca, Ishurdi and Syedpur no Bengali dares approach a railway junction.

At Dacca and Chittagong airports, 250 porters were flown in from West Pakistan to replace the Bengalis.

Three thousand Punjabi police now patrol Dacca while Khyber Rifles from the North-West Frontier and Rangers from the West Pakistan border, man police stations outside.

Most of the 10,000 militiamen in East Pakistan Rifles who revolted in March have either crossed the border or are hiding in the villages. Those who responded to an amnesty call surrendered in Dacca on 15th May, they were seen being driven away in open trucks blindfolded with their hands tied behind their backs.

A few days later hundreds of naked corpses were found in the river Buriganga and Sitalakhya.

The East Pakistan Rifles have now been renamed the Pakistan Defence Force and hundreds of Biharis have been recruited. They are now being trained with rifles and machine-guns at Peelkhana.

On 28th May, in the Khilgaon district of Dacca, 100 suspects were picked up after a bomb damaged a non-Bengali shop.

At Motijheel, a non-Bengali, demanded 10,000 rupees (about 600 Pounds) from his neighbour, threatening to hand him over to the army if the money was not paid within 24 hours.

A radio and camera retailer in Stadium market, Dacca found his stock missing on the 12th May, and reported the incident to the Martial Law Headquarters. That night during curfew, the shop was set on fire.

Begum Majeda, a housewife, was fetching water from a street tap. Two Punjabi policemen tried to lift her on to a truck. She screamed and the Punjabis were beaten off with sticks and stones. That night whole of the Bashabo area was set on fire.

It is now considered unsafe to wear wristwatches on the streets in Dacca and transistor radios and television sets are kept hidden at home. Soldiers sell looted transistors, TV sets and wristwatches at between 3 and 6 pounds each on the streets.

One officer Colonel Abdul Bari has deposited on crore of rupees the equivalent of 833,000 pounds-At the State Bank of Pakistan.

Efforts are now being made to clean the cities up, just before the sponsored visit to Dacca of a small party of foreign journalists in May. The bodies of students were removed from Jagannath Hall and Iqbal Hall in the University Campus and debris was cleared away from the shelled areas of Shakharipatty, Tantibazar, Shantinagar and Rajarbagh.

Schools and colleges have reopened but there are few students. On school with 800 students before the fighting reopened with only ten.

Most young people between the ages of 16 and 26 have crossed the border to join the MUKTI FOUJ Training camps.

Their widespread fear is that to be young in East Pakistan is to be killed. They nurture the hopes also that they may one day live in a free BANGLADESH.

THE HONG KONG STANDARD
June 25, 1971
ANOTHER CENGHIS

For hundreds of years, the name of Cenghis Khan has echoed through history as a byword for cruelty and butchery.

In the 20th century, it seems a Pakistani namesake of the great killer is determined to out-do his grisly predecessor.

Pakistani General Tikka Khan-with modern nicety known as the “pacifier” of rebellious East Pakistan-is commanding fierce, Punjabi and Pathan troops who are running wild in a fearsome blood bath.

There is overwhelming evidence of murder, of senseless slaughter of children, of rape, or prostitution organized by and for senior army officers of wholesale, maddened, crazed, blood-thirsty determined massacre.

Cenghis Khan, for all his bloody faults, at least built up an empire in the course of his career.

Tikka Khan and his gang of uniformed cut throats will be remembered for trying to destroy the people of half a nation.

SUNDAY TELEGRAPH
London, August 1, 1971
PAKISTAN ARMY ON CHRISTIAN COMMUNITY
by Clare Hollingworth

President Yahya Khan is expected to visit East Pakistan today or next Tuesday. He will arrive in Dacca at the height of a psychological warfare campaign by Bangladesh guerrillas.

This is designed not against the West Pakistanis or the Army but rather to frighten the Bengali population from areas of future action.

The guerillas claim they will soon take "dramatic action". The Bengalis have been warned not to go near the airport.

There was a clash of Friday, night, at Farmgate, an industrial suburb between the city and the airport, between the guerrillas and the army.

The exchange of automatic fire and loud explosions could be heard throughout the city and six guerrillas are reported killed.

Far more serious was the destruction by the army" of three Christian villages of Loodaria, Nalchata and Laripara near Dacca, situated on the branch railway line which runs from Tongi to Arikhold on a high embankment.

This is the first time the Defence Forces have been involved in the burning down and flattening of houses of purely Christian communities. The guerrillas had derailed a train some miles away along the line-I saw the results of this action.

At the, moment these villages are completely surrounded by water and many of the men who live there work in offices and hotels in Dacca. They say that between 3,000 and 4,000 Christians have been rendered homeless and a few hundred were taken away by the army for questioning.

Although these4 events took place on Wednesday, I have been unable to obtain any comment from the military spokesman, who has not been available since then. The Catholic clergy in the area are deeply concerned by this first attack on remembers of their, community.

AL HAWADITH
Lebanon, August 20, 1971
WAR OF ANNIHILATION

The Pakistani officer stood in one of the small villages of East Pakistan Bengal and told the hungry public gathered around him: "My men are wounded and I want some blood. I want volunteers". Before waiting for a reply…the soldiers rushed forward, selected some young men, threw them on the ground, and pricked them in the arteries. Blood began to flow and continued flowing until the young men died.

This is one picture out of dozens of others which take place every day since the present regime in West Pakistan declared a war of annihilation against the opposing "people" in Pakistan.

The migration of millions to India, therefore, is not strange. They have fled from massacre and hunger.

EL COMMERCIO,
Ecuador-September 2, 1971
SLAUGHTER OF 200,000 BENGALIS
by Alfonso Rumazo Gonzales

The slaughter of 200,000 Bengalis in East Pakistan can only be described by its true name: Genocide. The crime has been perpetrated by the West Pakistan army under the orders of the tyrant who governs there: General Yahya Khan. This figure of 200,000 given by Leon F. Hesser, Director of (U.S. Aid Agency) A.I.D. rises to 300,000 in British calculations. "This has been like a Greek tragedy" expressed the British expert sent there with help.

What did East Pakistan, inhabited principally by Bengalis, ask for? Autonomy. The western sector of the country is separated from the eastern one by 1,600 kilometers of Indian territory. How can it exist in these conditions'? Is it fit that a country should have its territory in two parts at a great distance from each other? This request for autonomy last March was answered with guns and arms even to the extent of sending to the grave of such an incredibly large number of people. A U.S. commentator stated that only the Second World War had produced crimes of this magnitude.

And it is not only that so many have perished-this crime continues even though in-smaller numbers now-but that 8,000,000, plagued by hunger and terror, have crossed the frontier and fled into India. The Indian Prime Mi9nister Indira Gandhi received them and is now the intermediary for the distribution of the aid received from the U.S.A., U.K. and a few other countries. For the next six months, many millions of dollars will be essential if those unfortunate people are to be saved from dying of misery and hunger.

The tragedy has increased even more. The whole of East Pakistan appears menaced by famine. By November, the shortfall in the food requirements and the actual production will be 4,000,000 tons of rice and wheat. Even if this shortfall is obtained, how can it be transported in a country whose roads and bridges are completely destroyed by the war of liberation? The patriots have tried at every point to prevent communication by the soldiers of the tyrant Yahya Khan and continue obstructing the criminal repression by destroying roads and bridges, even though thereby the danger of starvation is coming to them as fatally as the destruction they have been experiencing.

This whole game with its devious and deceitful maneuverings is developing with the neglect of the main problem: the human being. Not one of the countries who have granted help to those unfortunate millions, have condemned the monstrous genocide

committed there with such fury and ruthlessness. The whole world should have risen up in arms to denounce the terrible slaughter. Nobody has spoken; not one has done their duty of defending the right to life which is clearly the focal and fundamental point in the Charter of Human Rights, fully observed in "theory" only. The man of the twentieth century-said Russell-is more ruthless and cynical than that of all the previous centuries.

THE AGE
Australia, September 11, 1971
THE LOST MILLIONS.
By Max Beattie

More than 160 days after the first East Pakistani massacres, ragged, sad-eyed Bengali peasants are still walking into what they believe is the haven of India carrying their naked babied with them.

Astonishingly, as many as 40,000 still come every day. This is a movement of people the like of which the world has rarely seen. Indian officials now say freely they expect the influx-more than eight million have arrived already-to rise above 10 million will before the end of the year.

The September refugees talk of shootings, and rape almost as commonly as did the forerunners five months ago…

SUMMA MAGAZINE
Caracas, October, 1971
A COUNTRY FULL OF CORPSES

The extermination of the Jewish people by the Nazi regime, the atomic crime of Hiroshima and Nagasaki, the massacres of Biafra, the napalm of Vietnam, all the great genocides of humanity have found a new equivalent: East Pakistan. Despite the world press having supplied a clear exposition of facts, the people do not appear to have realized that at this moment-and again in Asia-millions and millions of human beings face destruction of their life and motherland.

The fact can be briefly summed up: East Pakistan has been invaded 5 months ago by the army of West Pakistan, may be their own brothers. Its inhabitants have been murdered in thousands, its women have been raped; children and aged are dying of hunger and cholera, and more that eight million persons have carried out on of the most dramatic migrations in history, crossing the frontier and taking refuge in India, the country with which once Pakistan was untied.

A pathetic view of the tragedy is given to us by the fact that in a single night in the city of Dacca were killed 50,000 persons by the invading army. Between 26 March-the date of invasion-and this moment, the dead reach more than a million, and every day 30,000 persons leave East Pakistan and take refuge in Indian territory.

THE NEW YORK TIMES
November 17, 1971
EAST PAKISTAN TOWN AFTER RAID BY ARMY
Fire and Destruction

A task force of West Pakistani troops visited this town Shekharnagar, East Pakistan, of 8,000 on October 27 and destroyed it.

Apparently informed-mistakenly, according to residents-that a guerrilla group was here, the army attacked without warning in motor launches. Towards the end of the 20- mile trip from Dacca the launches' engines alerted Shekharnagar's population, most of which fled into nearby ponds, cannals and paddy fields.

Shooting into houses and huts as they advanced, the troops set fire to nearly every building. Surviving residents pointed to the fresh graves where 19 villagers were buried.

The concrete schoolhouse was stripped of its furniture and doors: which the troops burned to cook their evening meal, and a rice mill was destroyed. The village's stock of freshly harvested rice was burned for the most part, and some 300 cows and sheep were slaughtered.

A large quantity of wheat that villagers said had been sent under a United States aid program was reportedly loaded into the boats by the troops.

A warehouse filled with bags of phosphate fertilizer was burned and most of the bags were destroyed.

Several buildings belonging to the mosque were burned down and the Hindu temple-there are about 400 Hindus in the community-was burned and sacked, and its idols were smashed by gunfire.

Even the local post office was sacked, and the villagers say the troops took away its stock of stamps and money.

"Do you see this?" a villager said, "They even destroyed our fruit. Banana trees like these take a long time to grow, and the soldiers heaped up burning straw around them and destroyed them."

NEWSWEEK MAGAZINE (U.S.A)
November 22, 1971
BENGAL : THE TIEM OF REVENGE

The ghostly remains of recently burned villages scarred the semitropical countryside. Bloated corpses, entangled among white and purple water hyacinths, floated in the canals as reminders that the verdant landscape was a scene of tragedy. Along with Clare Hollingworth of London's Daily Telegraph, I had traveled 45 miles outside the capital of Dacca-and into the heart of one of the "liberated" zones held by the Mukti Bahini guerrillas. The evidence-living as well as dead-of civil war was everywhere. Hundreds

of peasants watched our small dugout during the three-hour trip through the swampland canals, but none of them-not the children tending cattle, nor the fishermen repairing their nets nor the women carrying mounds of mud to repair their flimsy palm leaf houses-returned our waves. "The reason for their seeming sullenness," Mukti Bahini fighter told me later, "is their sufferings.

There is hardly a Bengali family left that has not lost one or several of its relatives"…

…In ramshackle towns and tiny villages, people were quick to tell me of daily executions carried out by the army, of wanton destruction and brutalities. In one small village, everyone seemed to know the story of a 14 year-old girl who was raped by twelve soldiers and then killed-together with her day-old baby. Inhabitants of another village recounted how two soldiers had been captured and taken to the martial-law administrator when they demanded two virgins; the next day the village was burned and 38 people were killed by the army. Several times during my trip into the rebel area, I saw Pakistani soldiers loot stores and help themselves to anything they wanted. To the Bengalis, such barbarism is a stimulant to their hopes of a free state. Everywhere I went, Mukti Bahini rebels and sympathizers were talking about the coming hours of judgment. At one river crossing, I came upon an army sergeant beating a Bengali with a huge stick. He stopped when he saw me, and later the Bengali told me, "it's like that every day. But the day of revenge is coming and it will be terrible."

THE INDIAN EXPRESS
December 20, 1971
BODIES OF DOCTORS, JOURNALISTS, WRITERS
AND PROFESSORS DUMPED IN PITS

(Despatch from C. S. Pandit, datelined Dacca, December 19, 1971)

In the last week before the surrender of the Pakistani occupation army, about 120 intellectuals, including top doctors, professors, journalists, both men and women, were spirited away from their houses during curfew hours under military escort. Nothing was hears of them until about 36 bodies, with hands tied behind, were found dumped in the pits of some brick kilns.

The shock of the tragedy spread, like wild fire among the people who started thronging the place. Among the dead were the bodies of Dr. Fazle Rabbi, a top cardiologist of Dacca Medical College: Dr. Alim Choudhury, an eye specialist, Mr. Nizamuddin, a journalist representating the BBC and one of Pakistan's two news agencies, Pakistan Press International: Mr. Shahidullah Kaiser, a well-known author and joint editor of a magazine: Mrs. Akhtar Imam, provost of women's hostel of Dacca University; Dr. Santosh Bhattacharya, Professor of History; Mr. Sirajuddin Hussain, news editor of Ittefaq and many others.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA
December 20, 1971
CALCULATED LIQUIDATION OF INTELLECTUALS
BEFORE SURRENDER

(Despatch by Arun Bhattacharjee from Dacca Secretariat, December 19, 1971)

The Secretary-General, Ruhul Quddus, of the Bangladesh Government, harshly accused the Pakistani army generals of calculated liquidation and mass murder of the intellectuals of Dacca before surrender.

Mr. Quddus was in tears when he said that the best doctors, professors, administrators and intellectuals of Bangladesh were killed to cripple Bangladesh. When I pointed out that Pakistani Army General Farman Ali and his staff were saying that these were done by the para-military forces and the Razakars, he said, "I know with certainty that the plan to liquidate them was hatched by these Generals in Dacca cantonment, and on their specific orders, the para-military forces arrested them and killed them inside the cantonment".

THE TIMES
London, December 30, 1971
INTELLECTUALS BUTCHERED BEFORE SURRENDER
Peter Hazelhurst

No one will ever know haw many intellectuals, doctors, journalists and young men, most of whom were not involved in politics, were rounded up and herded off to disappear for ever.

Mrs. Moshina Pasha, the wife of Prof. Anwar Pasha, Assistant Professor of Bengali at Dacca University, if at present visiting the big pits in which the mutilated bodies of Bengali intellectuals were discovered to identify the body of her husband.

Like many others, Prof. Pasha was taken away two days before the Pakistanis surrendered to the Indian army and driven to a razakar-execution camp.

Two colleagues, Mr. Rashidul Hasan, Lecturer in the Department of English, and Professor Santosh Bhattacharya, Professor of History, were rounded up on the same morning by the same group of armed razakars.

The Pakistani prisoners-of-war maintain that they know nothing about the atrocities, but evidence has been produced alleging that the razakars were acting under the direct orders of a senior officer.

A memorandum discovered on his desk is said to have contained the name of one victim, Mr. Nizamuddin, with the comment "motivated stories"; Mr. Niamuddin's name was ticked off.

The solo survivor of this pogrom, Mr. Dalwar Hussain, the Chief Accountant of the Greenland Mercantile Company of Dacca, said that on the morning of December 14, several razakars pulled him out of his house. After placing a blindfold around his eyes, they drove him by bus to a camp on the outskirts of Dacca.

He was forced into a room. A little later, the cloth around his eyes slackened and he discovered that he was in a room with a score or so of other prisoners. Some of them had been tortured. Toe nails had been ripped off and toes amputated.

After an hour they were interrogated. The prisoners identified themselves as doctors, lawyers, professors and journalists. They were forced into a bus and driven out to marshlands on the outskirts of Dacca.

The Razakars led their victims to a big tree where about another 130 prisoner were huddled. Several prisoners asked the Razakars why they were killing fellow Bengalis. “One of them told us to shut up and gave an order”, “finish the bastards off”, Mr. Hussain said, “they started to shoot prisoners with rifles, and others are simply bayoneted to death. I managed to slip the rope off my wrists and made a dash towards the river. By a miracle I escaped”.

বাংলাদেশের শরণার্থী

\বাংলাদেশের শরণার্থী, গণহত্যা ও নির্যাতন প্রসঙ্গে
ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ \

যুগান্তর

৩ এপ্রিল, ১৯৭১

এখান থেকে এরা কোন ভবিষ্যতে পাড়ি দেবে?

ইছামতীর তীরে সারি সারি নৌকা নোঙ্গর করেছে অনেক দিন হল। কিন্তু ঐ সব নৌকোর মধ্যে যারা রয়েছে তারা যে এরপর কোথায় পাড়ি দেবে তা তারা জানে না। অন্য কেউই কি জানে?

ঐ নৌকোগুলি করেই তারা পূর্ব বাংলা ছেড়ে এসেছে। ভিটে-মাটি, যা সামান্য সম্পত্তি ছিল তা ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে ওরা জন্মভূমি ছেড়েছে। পেছনে খান সেনা আর তাদের সাগরেদদের অত্যাচারের স্মৃতি, সামনে অজানা ভবিষ্যৎ। ভারতের তীরে এসে যখন নৌকো ভীড়ল তখন নিশ্চয়ই পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়ার আশায় ওদের বুকটা দুলে উঠেছিল। কিন্তু শক্ত মাটি জুটল কই? এখনও বেশ কিছু বৃদ্ধ প্রৌঢ়, যুবক, নারী ও শিশুর জীবন দিনরাত ইছামতীর দোলায় দুলছে। নৌকোর মধ্যেই তাদের সংসার রান্না-খাওয়া-শোয়া। নদীর জলে স্নান। আর নদীর ধারেই স্বাস্থ্যরক্ষার সব নিয়ম-কানুন তুচ্ছ করে মলমূত্র ত্যাগ।

হাসনাবাদের মাটিতে তারা নামছে, কিন্তু সেখানে বা অদূরে টাকীর শিবিরে ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই। নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না।

আমরা সবে হাসনাবাদে নেমেছি, দেখি নদীর তীর থেকে বোঝা-মাথায় মানুষের সারি এগিয়ে আসছে। ওরা শুনেছে, বারাসতে নাকি নতুন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। সেখানে যাবে।

-হাঁটবে অতদূর?

-আর কী করা বাবু? নৌকোয় আর কদ্দিন কাটে? ছিল সের পাঁচেক চাল। তাই এক বেলা করে খেয়ে পাঁচ সাত দিন চলছে। শুনছি ক্যাম্পে নাকি চাল-ডাল দিতে আছে।

-ঠিক জানো তো যে বারাসতে গেলে জায়গা পাবে?

-তা ঠিক জানি না। যাই, দেখি ঘুরে গদি না-পাই তবে না খেয়েই মরব। মরণ যদি কপালে থাকে এ পারেই মরব।

সবাই যে হাঁটা পথ নিয়েছে তা নয়। যারা খোঁজখবর রাখে তারা কাছের রেল স্টেশন থেকে হাসনাবাদ-বারাকত ট্রেনে চেপে বসছে। ফলে ট্রেনে ভীড় খুব। স্থানীয় লোকের যাতায়াতে অসুবিধে। কিন্তু সেও তো অজানার উদ্দেশ্যেই পাড়ি। কারণ এতদিন পায়ের নীচে মাটি না-থাকা মাথার ওপরে নৌকোর ছই ছিল। যাওয়ার আগে নৌকোগুলো ওরা জলের দরে স্থানীয় লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছে। ইংরিজি জানলে ওরা বলতে পারত, উই হ্যাভ বারন্ট আওয়ার বোটস। বারাসাতে বা অন্য কোথাও ঠাঁই না পেলে ফিরে আসার জায়গা সত্যিই ওদের নেই।

তবু এক হিসেবে ওদের ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারা যাবে বৈকি? দারুণ দুর্যোগের সময় ওরা একটা আড়ালে থাকতে পেরেছিল। ছইয়ের ওপর মাদুর, চাদর, কোথাও বা রঙ্গিন লেপ দিয়ে ছিদ্র ঢাকার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু আরো এগিয়ে এসে টাকী বাস স্টাণ্ডের কাছে যাদের দেখা পেলাম তাদের মাথার ওপর ঢাকা বলতে গাছের ডাল।

ওখানে কতকগুলি পরিবার গাছতলায় দিন আষ্টেক ধরে রয়েছে। বর্ষার মধ্যেও ঐ ভাবেই কেটেছে। জলে গা ভিজছে, যা সামান্য জামা-কাপড় আছে তাও ভিজছে, মাদুর-চাদরও ভিজেছে। কাপড় আবার গায়েই

শুকোচ্ছে। চাদর বা তোষক এই ক' দিনের মধ্যে আর শুকোয় নি। তার ওপরেই শুতে হচ্ছে, কারণ মাটি তো আরো ভিজে কাদা-কাদা। সবচেয়ে কষ্ট তো বাচ্চাগুলোর। ওখানেই তিনটের খুব জ্বর।

আমরা এগোতেই পরিবৃত হয়ে গেলাম। আমরা কি সরকার থেকে আসছি? ওদের যে এখনও টিকেট হয়নি। টিকেট না-হলে তো ডোলও পাবে না। অথচ ম্যাডিকেল হয়ে গেছে। কলেরার ইনজেকশন আর বসন্তের টীকা, দুই-ই। সঙ্গে রয়েছে সেই কাগজ। কিন্তু টাকীর কোন ক্যাম্পেই তো আর নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে না।

-আমাদের একটা টিকিট করায়ে দ্যান বাবু। অন্ততঃ কয়েক দিন চালডাল দ্যান। তারপর যেখানে পাঠেইবেন সেখানেই যাব।

টিকিট করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তখুনিই দিতাম বৈকি। ওরা ক'দিন চাল-ডাল পেলে তার পরেই যদি অন্য কোথাও চালান হতে চায়, সেও তো খুব ভালো কথা। গাছতলা ছেড়ে, পশ্চিম বাংলার বাইরে যে-কোন মাথা গোজবার ঠাঁইই ওদের কাছে প্রিয়তর। যখন পূর্ব বাংলার ভিটে ছাড়তে পেরেছে, তখন পশ্চিম বাংলার গাছতলাটার জন্যেই বা মায়া কিসের?

কিন্তু দেশে ফিরবে না?

না, দেশে আর ফিরবে না। কোথায় ফিরবে? যা কিছু ছিল লুটে নিয়েছে। যখন লুটে নিলো তার পরেও তো ছিল কিছু দিন। লুটপাটে বাধা দিতে গিয়ে মার খেয়েছে। হারাধন মণ্ডলের হাঁটুতে আর কোমরের কাছে এখনও বল্লমের খোঁচার দাগ। তবুও ছিল। কিন্তু যখন ঘরে আগুন দিলে, মেয়েদের ধরে টানতে লাগল, ছেলেদের ধরে কাটতে লাগল, তখনও কি আর থাকা চলে?

কিন্তু যদি আওয়ামী লীগ সরকার করে তা হলেও ফিরবে না? তা হলে ফেরা যায়, কিন্তু এখন কোথায় আওয়ামী লীগ বাবু? এখন তো সবাই মুসলিম লীগ।

আরো খানিক এগিয়ে বাঁ দিকে সৈন্যের বাগান ক্যাম্প। সামনে মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির নিশান।

এই ক্যাম্পে প্রায় সাতাশ হাজার নারী-পুরুষ-শিশু। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান। খৃষ্টান পরিবার গোটা চারেক। মুসলমান পরিবার আটশর বেশী। ওরা থাকে ওধারে। এদিকে হিন্দুর। বর্ণ হিন্দু নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ খুলনা জেলার। বেশির ভাগই চাষবাষ করত। একজন বললে, তার জমি ছিল ৬২ বিঘে। এখন সঙ্গে আছে শুধু খাজনার রসিদ। দলিলটা সঙ্গে করে আনতে পারেনি। তবে রসিদটা রেখেছে। যদি কখনও ফেরে তবে দাবি করতে পারবে জমিটা-এই রকম আশা এখনও বুকের ভেতরে।

এখানে মাথাপিছু বরাদ্দ ৪০০ গ্রাম চাল, ১০০ গ্রাম ডাল আর ১০০ গ্রাম আলু-পেঁয়াজ। ছ'দিনের রেশন এক সঙ্গে বিতরণ করে মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি।

মাঝে একটা বড় পুকুর। আর গোটা নয়েক নলকূপ। সরকারী কর্মচারীদের ওপর চাপ খুব, কিন্তু এখনও ঐ শিবিরে কোন বড় রকমের রোগ দেখা দেয়নি, এই যা রক্ষা। এই ক্যাম্পের জমিটাও একটু উঁচু। ফলে জল দাঁড়াতে পায় না। তবে স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত এমন নয় যে খুব নিশ্চিন্তে থাকা যায়। বিশেষতঃ বর্ষা বাড়লে।

যারা শিবিরে ঠাঁই পায়নি তাদের দেখে আসার পর মনে হতে পারে এখানে এরা যেন সুখে আছে। মাথার ওপর ত্রিপল, রোদ, খাবারের বাঁধা বরাদ্দ। তবে জ্বালানির অভাব। তাই খিচুড়ি ফুটিয়ে নেওয়াই রেওয়াজ। শিবিরে প্রথম দিনটি অবশ্য অনেকের কাছে বিপদের। অনেকটা পথ অর্ধাহারে-অনাহারে হেঁটে এসে অনেকেই প্রথমে লোভের বশে অনেকটা খেয়ে ফেলে। পেট এই অনিয়ম সহ্য করতে পারে না।

সরকারী কর্মীরা যথেষ্ট করেছেন, তবু সমস্যা থেকেই যায়। পরাণ মণ্ডলের রেশন কার্ড হারিয়ে গেছে। মাথা খুঁড়লেও কি আর খুঁজে পাবে? সরকারী কেরাণী বাবুর পা ধরে পড়েছে, বাবু আমায় আর একটা কার্ড করায়ে দ্যান।

পরাণের কান্নার সঙ্গে অফিসের ঠিক বাইরে এক বুড়ির কান্নার অবশ্য অনেক তফাৎ। তার বিশেষ জ্ঞান আছে বলে মনে হল না। একবার করে বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আর ডুকরে কেঁদে উঠছে। চোখ দুটো প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসে আর কি। বুড়িকে ঘিরে ক্যাম্পেরই কতো লোক ভীড় করেছে। বুড়ি পূর্ব বাংলা থেকে এসেছে ওরা ওকে ক্যাম্পে দিয়ে চলে গেছে। আরো কাছে কাছাকাছি কোথায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে। বুড়িকে দেখার কেউ নেই। ওখানেই শুচ্ছে, ওখানেই যা পারে খাচ্ছে এবং মলমূত্র ত্যাগ করছে। ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার একটা হতাশা সূচক আওয়াজ করে বললেন, একে নিয়ে কী করি বলুন তো?

বুড়ির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখি ওদিকে কিছু ছেলে পান বেচছে। স্থানীয় ছেলে নাকি? না, ক্যাম্পেরই ছেলে। বাজার থেকে কিছু পান, চুন, সুপারি কিনে ঝুড়ি নিয়ে বসে গেছে। কত বিক্রি হয়? সামান্য। আজ তো মাত্র পনের পয়সা ব্যাচলাম।

পানওয়ালা ছেলেটা হেসে উঠেছিল- কেমন যেন নিরুদ্বেগের হাসি। ক্যাম্পের সকলের মুখে অবশ্য সেই নিরুদ্বেগ নেই। প্রধান প্রশ্ন, এরপর কী? প্রায় সকলেই ঠিক করে ফেলেছে, দেশে ফেরা আর নয়। জানি না, সরকার এদের কী করে দেশে ফেরাবেন। সেটাও তো বোধহয় পরের প্রশ্ন। ক্যাম্পে অনেকেরই ভাবনা, এরপর সরকার কোথায় পাঠাবেন? কিছু কিছু লোক যে বাংলার বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা ওরা শুনেছে। 'তবে যেখানেই পাঠান বাবু ভারতের মধ্যে যেখানেই পাঠান যাব। সরকার আমাদের জন্য এত করছেন, খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন, আমরা কথা শুনব বৈকি।'

ক্যাম্পের বাইরে ছোটোখাটো জটলা। ক্যাম্পে জায়গার খোঁজে অনেকে এসেছে। কিছু লোক বারাসতের পথে থেমেছে। শুনছি, এই ক্যাম্পে থেকে নাকি কাল আরো টিকিট দেবে? আরে না, না, ওসব বাজে কথা। এখানে নতুন লোক নেওয়া বন্ধ। চল, চল, বারাসতেই শেষ চেষ্টা।

ওরা যাবে অবশ্যই, ক'জন বারাসত পৌঁছবে জানি না। পৌঁছলেও হয়ত শিবিরে জায়গা পাবে না। অনেকে তার আগেই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়বে। কোন পরিত্যক্ত বাড়িতে, অথবা কোনো বাড়ির দাওয়ায় আশ্রয়। কিম্বা হয়ত গাছতলায়। তারপর পথশ্রম বা রোগে মৃত্যু। অথবা কোন অসৎসঙ্গে পড়তেই বা বাধা কোথায়?

ফেরার পথে বারাসতে রাস্তার দু'ধারে এমন অনেককেই দেখলাম। দু'একটা স্কুল-বাড়িও এখন বেসরকারী শিবির। অসংখ্য লোক, হৈ চৈ। নোংরা হয়ে উঠছে চার দিক। এদের জন্যে কোথায় কী ব্যবস্থা?

হাসনাবাদ থেকে যারা শেষ আশায় বুক বেঁধে হাঁটতে শুরু করেছে তাদের গন্তব্যের শেষ হবে কোথায়?

-দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড
১২ এপ্রিল, ১৯৭১

EVACUEES NARRATE ARMY ATROCITIES
BY NARAYAN DASS
HARIDASPUR BORDER
(Check-post), April.

The Pakistani troops advanced further from Jhikargacha on Sunday morning, uprooting as they went hundreds of panic-stricken villagers of either side of the Jessore Road. The refugees took shelter in Petrapol reception centre recently opened by the State Government for them. The Pakistani troops who faced a stiff resistance from the freedom fighters, set fire to many villages and killed many people. In some places they forced the people to open their shops at gun point and hoist the Pakistani Flag.

Walking along the Jessore Road with some of the member so the Mukti Fouj. I saw many people with their belongings coming towards the Haridaspur border. In some houses, people were seen packing up to leave their homes for safer places. While crossing over to Haridaspur side, a middleaged man Torab Ali of Benapol said, "Can you imagine how sad it is to leave the ancestral home?" Despite this, Torab Ali has a firm belief that Bangladesh would be completely liberated and they would be able to return their homes.

Over five thousand people from village including Navaran, Jhikargacha, Sarsha, Benapol and Jessore town have been given shelter in Petrapol camp and in another camp in Mama Bhagne village near the Bogra border. Most of these villages have been deserted. More than 350 families crossed the border on Sunday alone.

Narrating the atrocities committed by the Pakistani troops on the unarmed village people Mrs. Hosne Ara of an adjoining village of Jessore told this reporter that the Pakistani troops entered every house of their area and asked them to raise slogan "Pakistan, zindabad". If anybody hesitated to raise the slogan, he was immediately shot dead. They looted the belongings of the people, snatched ornaments from the women and later they were killed. In reply to my question as to how she could save herself, she said "As the army men were rushing to our village I started running desperately carrying my three-year-old child and took shelter in a bush, I spent the whole night there and next day I came to the house of my relative in Benapol in a vehicle provided by Mukti Fouz. After four days I crossed the border. I do not know what has happened to my husband who went to a local hat in the evening". Saying this she burst into tears.

A 60-year-old man Harmat Ali Mandal of Jessore town who lost three of his sons, could not talk to me as he was weeping all the time. some people were seen consoling him.

RELIEF STEPS

Meanwhile, the State Government have made elaborate arrangements to provide succour to the distressed people in the Boyra camp. The Bharat Sevashram Sangha is doing laudable service by providing food and other relief materials to the evacuees. A swamiji of the Sangha told this reporter that they had opened a medical unit in the camp with two doctors to nurse the sick. Over two dozen volunteers of their Sangha were working day and night organizing the relief works in the camp. The Sangha was also receiving donations from different social organizations.

Most of the people in the camp have already been vaccinated. Proper sanitary arrangements have also been made.

According to official sources there has been a steady exodus of panic stricken villagers during the last two days across Rajshahi border. Although, the actual number of evacuees who have crossed over to West Bengal could not be properly assessed, according to local people, at least 6,000 crossed over to Raninagar, Bhagabangola and Jalangi thana areas of Murshidabad district on Sunday.

অমৃত বাজার পত্রিকা
৩০ এপ্রিল, ১৯৭১

900 REFUGEES KILLED ON WAY TO INDIA

Coochbehar, April 28, About 900 men who were trekking towards the Indian side were just butchered by the Pakistani Army men according to eyewitness reports, says PTI.

Six refugees, who with multiple bullet injuries arrived at Haldibari from Domar Police Station area of Bangladesh today and now in hospital said they were also among the victims of the Pakistani Army firing but somehow managed to escape.

They said about 8000 people, belonging to a community while coming towards India were intercepted by the armymen who persuaded them to stay in the army camp. The armymen then picked up all the ablebodied male members of the group, forced them to line up and machinegunned them. The rest of the exodus ran helter skelter in panic they added,-

Our Dinhata correspondent adds, reports now available regarding ransacking of Banspachai-the Indian enclave within Dinhata PS in Coochbehar district-reveal that during two days infiltration of Pak Army into the enclave and indiscriminate firing has caused loss of about 150 lives and almost all the houses gutted. This enclave had a population of about 300 persons rest of which have crossed over to India through Dinhata borders.

Pakistan Army also entered at 10 A.M. today into Dhirkhata and Shiberkuthi the adjacent villages of Indian enclave and killed many civilians by firing. Some with bullet injuries were being treated at Dinhata hospital.

যুগান্তর
৯ মে, ১৯৭১
শরণার্থী আগমন অব্যাহতঃ সমস্যা বাড়ছে
(বিশেষ প্রতিনিধি)

কলকাতা, ৬ই মে- হলদিবাড়ী শহরে বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য শরণার্থী আসতে থাকায় এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোচবিহার জেলা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, দৈনিক গড়ে বারো হাজার মানুষ হলদিবাড়ী আসছেন। জেলা কর্তৃপক্ষ আরো বলেছেন, শহর ও সীমান্ত পরিদর্শন করে দেখা গিয়েছে বুধবার প্রায় বারো হাজার শরণার্থী এসেছেন এবং সীমান্তের ওপারে আরো বাইশ হাজার মানুষ এপারে আসার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কোচবিহার জেলার ছোটো শহর হলদিবাড়ীতে এ পর্যন্ত দেড় লক্ষেরও বেশী শরণার্থী এসেছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয় ভবন কিংবা খালি বাড়ীতে প্রথম দিকে এঁদের স্থান দেওয়া হয়েছিল, এখন তাও পাওয়া যাচ্ছে না। বহু শরণার্থীকে আকাশের তলায় রাত কাটাতে হচ্ছে। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতীকারের জন্যে জেলা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে তাবু এবং ওষুধপত্র চেয়েছেন।

কোচবিহারে সোয়া লক্ষ শরণার্থী

কোচবিহার থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি হরিপদ মুখার্জি জানাচ্ছেন, বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা প্রতিদিনই কোচবিহার জেলাতে যথেষ্ট সংখ্যায় আসছে। এ পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে সওয়া লক্ষ শরণার্থী এই জেলায় আশ্রয় নিয়েছে। এই জেলার কয়েকটি শিবির ঘুরে দেখলাম, এখনও অনেক সরকারী শিবির দরকার।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইতিমধ্যে ৩৫টি শিবিরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শরণার্থীকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামাঞ্চলের স্কুলবাড়ীগুলোই অস্থায়ী শিবিরে পরিণত হয়েছে, তৎসত্ত্বেও আরও বহু মানুষ রাস্তার পার্শ্বে অথবা খোলা মাঠে নিজেদের সতরঞ্চি, চাদর দিয়ে 'ছাউনি' করে কোন মতে মাথা গুজবার ঠাঁই করে নিয়েছে। সরকারী শিবিরে নাম উঠেনি বলে তাদের বাইরের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর খয়রাতী সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে।

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী ও দিনহাটা সীমান্ত দিয়েই বেশী পরিবার আসছে।

এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য

শরণার্থীরা যাঁরা এ পারের আশ্রয় শিবিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাঁদের মধ্যে এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কোন পার্থক্য নেই- এক পরিচয় ওরা সবাই বাঙ্গালী। পাশাপাশি একই শিবিরে দুই সম্প্রদায়ের লোক একত্রে রান্নাবাড়া করে খাচ্ছে। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ওপারের আত্মীয়স্বজনের খবর বিনিময় করছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা লড়াই করছেন, ওদের প্রাত্যহিক খবর নেবার জন্য ওরা ব্যাগ্র-কবে ঘরে ফিরে যাবে তারই প্রতীক্ষা করছে। তাই এই বাংলার আতিথেয়তায় তারা মুগ্ধ, সামান্য ত্রুটিগুলি তারা ধরছেন না।

মন্টুর কথা

শিলিগুড়ির নিজস্ব প্রতিনিধি লিখছেনঃ আট বছরের তয়েব বাবা-মাকে হারিয়ে আজ ইসলামপুর স্কুল ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। পাক দস্যুরা গুলীতে তার বাবা ও মাকে হত্যা করেছে।

তয়েবের বাবা রফিক ঠাকুরগাঁ শহরে রিকসা চালাতো। সম্প্রতি পাক সৈন্য ঠাকুরগাঁ শহরে প্রবেশ করে এবং সামনে যাকে পায় তাকেই নির্বিচারে গুলী করে হত্যা করে। পাক সৈন্য আসার পূর্বে বেশীর ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে যায়। যারা নিঃস্ব দরিদ্র-একমাত্র তারাই শহরে ছিল। মনে করেছিল পাক সৈন্য তাদের কিছু ক্ষতি করবে না। কিন্তু বর্বর পাক সৈন্যের নিকট ধনী-দরিদ্রের বিচার নেই।

রফিককে গুলী করে বর্বররা তয়েবের মার দিকে বন্দুক তাক করে। তাই দেখে তয়েব কেঁদে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলীতে তার মা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এই দেখে তয়েব দৌড়িয়ে নদীর ঘাটের দিকে পালায়। সেখানে অনেক লোক নদী পার হয়ে ভারত সীমান্তের দিকে পালাচ্ছে। তয়েব তাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ে। তার জীবনের মর্মান্তিক ঘটনা সকলকে স্পর্শ করে। তারা তয়েবকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ নানা গ্রাম ঘুরে ইসলামপুরে আসেন এবং জয় বাংলা সংগ্রাম সংহতি কমিটি পরিচালিত ক্যাম্পে আশ্রয় পান। এখানে ছেলেরা তয়েবের নাম দিয়েছেন মন্টু। মন্টুর হৃদয়বিদারক কাহিনী এখন ক্যাম্পের সকলের মুখে। মন্টুও ক্যাম্পবাসী ও কর্মীদের বড় প্রিয়, বড় আপনজন হয়ে উঠেছে।

দেড় লক্ষ শরণার্থী

বাংলাদেশ থেকে ইসলামপুর মহকুমায় দেড় লক্ষের উপর উদ্বাস্তুর আগমন হয়েছে। জয়বাংলা সংগ্রাম সংহতি কমিটি অনেক উদ্বাস্তুকে বিনামূল্যে রান্না করা খাদ্য সরবরাহ করছেন।

এই ক্যাম্পের বেশীর ভাগ লোক এসেছেন বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও অঞ্চল থেকে। এদের নিকট পাক বাহিনীর বহু অকথ্য অত্যাচারের ঘটনা জানা গেল।

ত্রিপুরাতেই ৪ লক্ষ উদ্বাস্তু

আগরতলা, ৬ই মে- বাংলাদেশ থেকে প্রায় চার লক্ষ উদ্বাস্তু সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরায় এসে হাজির হয়েছে। ত্রিপুরার নিজস্ব লোকসংখ্যা হোল ১৫ লক্ষ। সাব্রুম মহকুমায় এসেছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার উদ্বাস্তু। এই মহকুমার নিজস্ব লোকসংখ্যা হোল মাত্র ৬০ হাজার। সরকারী সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে।

একটি বিবৃতিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তুদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও সাহায্য পাওয়া যায় নি।

করিমগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে প্রকাশ, প্রায় ৫০ হাজার উদ্বাস্তু গত এক মাসে সীমান্ত পেরিয়ে করিমগঞ্জে এসে হাজির হয়েছে। এদের মধ্যে ১৬ হাজার উদ্বাস্তুকে করিমগঞ্জ মহকুমার মোট ২৭টি শিবিরে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার উদ্বাস্তু করিমগঞ্জ সীমান্তে এসে হাজির হচ্ছে।

করিমগঞ্জে বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে বলা হয়েছে যে, সীমান্তের ওপার থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে উপযুক্ত খোঁজখবর করার পর ভারতে বসবাসের অধিকার যেন দেওয়া হয়। অন্যথায় সমাজবিরোধীরা এই সুযোগে ভারতে এসে হাজির হতে পারে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড
২২ মে, ১৯৭১

PROFF OF GENOCIDE AT AGARTALA HOSPITAL

New Delhi, May 20-The general hospital in Agartala presented a picture of the inhuman atrocities of the Pakistan Army on the innocent East Bengalis, writes a UNI correspondent after a visit to the border areas in the eastern region.

Hardly three kilometers from the East Bengal border, the 260 bed hospital was overflowing with patients mostly victims of the trigger-happy Pakistan Army.

All its wards were crammed within-patients when a party of Indian and foreign journalists visited the hospital on Wednesday. It has 530 patients, more than double its capacity. All available space was occupied by patients. The crowding was more conspicuous in the surgical ward where the patients were those riddled with bullets or bit by shells.

Among the pathetic cases were a boy of 13 and a girl of nine. Both of whom had lost their eyesight because of Pakistani shelling. The doctor treating them said that despite all that he could possibly do, restoration of eyesight was almost impossible.

Mr. Shamsuddin Ahmed, a railway engineer, had a heavy bandage on his bead. Ho was shot by Pakistani soldiers who entered his office. About to retire from service, Mr. Ahmed said be was railroad engineer in the Akhaura Junction across the Tripura border. One afternoon last month several army personnel entered his office and threw away the files. Later they started spraying bullets. He and his colleagues ran away. But before he could escape he was hit by a bullet. His relations brought him to the hospital on April 18.

Mr. Ahmed said that he never participated in any political activity. In a voice choked with emotion he wondered what he would do to support a family of 10 members. He had all on a sudden become penniless with his house and belongings with the same compound of his office burnt down by Pakistani soldiers. The only consolation was that his family was safe. They were in the village at the time of the incident. Later they crossed the border to be housed in the camps of evacuees.

MASS KILLING

Mr. Halid Hussain (27) was undergoing treatment for shock and exhaustion. He left Chittagong on April 27, when the Army after taking control of the town started indiscriminate killing of Bengalis. He was not at all interested in politics. But after witnessing the massacre of his people he has decided to join the Mukti Fouj (Liberation Army).

Asked whether the Mukti Fouj would be able to win independence from a well-equipped occupation force Mr. Hussain recalled the fight of Algerians and Tunisians against the mighty French and said that if these countries could win freedom, Mukti Fouj could also liberate Bangladesh from the Pakistan Army.

He said that the Pakistan Army’s aim at present was to kill Bengalis, whether they were Muslims or Hindus.

A Muslim girl of 13 said the Army asked her family of twelve including father and mother to get into the house. They later set fire to it and went away. The girl miraculously escaped while all the other members of the family died. An old lady in the neighborhood rescued her and bro9ught her to Agartala.

BULLETS SPRAYED

Mr. Narayan Paul (11) was standing at the gate of his house when he was hit by a bullet on the knee. He was taken to Comilla Hospital by his brother. Later he was brought to the Agartala Hospital when the whole family evacuated to India. Asked whether he would go back to his school in Comilla Paul said he would not go back. He is studying to class four.

Another student Subal Kanta Nath 917) has a fractured arm as a bullet breaking the bone of his hand. He was running away from his house after the Army had entered the house and started firing in all direction. He does not know what happened to the others members of the family. His father owned a grocery shop in Chittagong.

Safiullah (30) lay on his back with bullet injuries on his chest and abdomen. He was shot while, escaping his house which was set on fire by the soldiers. Hailing from Feni town in Noakhali District, he did not know about the fate of the rest of the family including his wife and two children. Some volunteers carried him to the Tripura border.

INTELLECTUALS

A member of Pakistani intellectuals were housed in the Narsingarh refugee camp in Tripura town.

A Muslim Professor of Chittagong University who did not want to be named said that the aim of the Pakistan Army was to liquidate all intellectuals, technicians, businessmen and artists. It wanted only some ‘salves’ to survive.

Bhikku Mahadev Jyoti Pal, head of the Buddhist community of Pakistan, said that the Pakistan Army had burned down the monastery in which he lived and the village surrounding it last month. Six young bhikkus were killed.

Miss Nomita Ghose, an artist of Dacca Radio, said soldiers took away young girls before setting fire to the houses.

The correspondents who visited the hospital and the evacuee camps also drove to Sabroom in southern Tripura, one of the important points of entry for the victims of Pakistani persecution. From Sabroom the correspondents saw across the Feni river the town of Ramgarh in Shambles. All the huts on the banks of the river have been burnt and razed. A lone Pakistani flag flew over the Government building which was the only structure which was not damaged. The flag was the symbol of the Pakistani occupation of the area early in May after a bitter fight with the Mukti Fouj-UNI.

স্টেটসম্যান

২৩ মে, ১৯৭১

FLIGHT FROM TERROR & BUTCHERY

To The Majority of Bangladesh Refugees the Memory of the, Ravages Wrought by a Ruthless Enemy is Fresh and the Future Void

BY MANOJIT MITRA

BETWEEN Tripura's border town, Sabroom, and the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh flows the narrow and grimy Feni river. One morning in the last week of April, while crossing the river by a country boat, I could see thousands of Bangladesh refugees behind me at Sabroom, thousands more waiting on the other bank to cross over and countless others fording the river at shallow points, their meagre belongings on their shoulders. Guns were blazing about 15 miles away and the exodus was on.

This was one of those scenes which revealed so much in one instant. One would only have to see the milling thousands, the stamp of terror on their faces, their eagerness to cross over to safer territory and the fatalism with which they had accepted the ordeal of sleeping on the streets to know what they had been through. Ramgarh, the border town of the Hill Tracts, was still occupied by the Mukti Fauj, but the Pakistani Army was pushing ahead. They had ruthlessly shelled and burnt villages along their route, from where these thousands had fled.

Sabroom was the most crowded border of Tripura in the third and fourth weeks of April when nearly 200,000 refugees arrived within a few days. In other border area, refugees have started coming earlier. Tens of thousands had arrived from Sylhet, Comilla and Noakhali districts of Bangladesh through the Sonamura, Kamalasagar, Debipur and other borders. Travelling from Agartala to these different borders for days together, everywhere I found refugees-in roadside camps, schools and colleges, private houses, fields and the streets.

The worst scenes I was were, however, at Sabroom. Thousands of people were living on the streets and on the premises of the thana. There were interminable queues for chits being issued to bona fide refugees. When I entered the thana, several old women approached me to help them get their chits. While one member of each family stood; in the queue, others looked for food. The old people slept under improvised tents. The children evidently unable to comprehend what had befallen them, played hide-and-seek. Many people looked for food, but not all of them had the money to buy it. Some families squatted near the river, offering their utensils for sale. These were their last belongings.

There was an acute shortage of drinking water. District officials had grown panicky; some of them said one or two cases of cholera had already been reported and if the congestion was not relieved, this would turn into an epidemic. Trucks arrived occasionally to take groups of refugees to camps. Cycles, brought along by some across the border, were tied on the side of the trucks. Women, children and fatigued old men scrambled aboard, guided by energetic young men who kept up their spirits despite

everything. Some were too tired to speak; occasionally, I saw one or two people craning out their necks from a speeding truck and vomiting.

Camps were being set up in different areas, but the authorities found it difficult to cope with the rush till the first week of May. Some of them said the population of Tripura was about to double.

Most refugees belonged to the poor peasantry but here were middle class and some rich families as well. Most of them came to Agartala town from where some proceeded to Calcutta while others put up with relatives and acquaintances. There were affluent lawyers and doctors and engineers who had trekked for days on end along devious routes to dodge the marrauding West Pakistani soldiers. A lawyer left behind his two houses and tree cars and entered Agartala with his wife and son. A field actress, who had been signed for more than 3 dozen films, walked through rain and mud for 48 hours and came to Agartala. An architect came from Dacca with his wife and child, expecting to get killed any moment on the way.

No every one of them was, depressed. It was an inspiring experience for me to meet a group of teachers and writers from Bangladesh at the Polytechnic Institute at Agartala. Some of them were from Chittagong University where they had helped Mukti Fauj fighters and seen action. Each family was cooped up within a single room of the institute, where the food was cooked and all members slept. Evidently, they were used to good living in Bangladesh, but this catastrophe did not appear to affect their spirits much.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের ওপর আই, আর, সি-র একটি রিপোর্ট	বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস	২৮ জুলাই, ১৯৭১

ESCAPE FROM TERROR

A report of the International Rescue Committee Emergency Mission to India
For Pakistan Refugees, submitted on July 28, 1971, by its Chairman,
Mr. Angier Biddle Duke, to Mr. F.I. Kellog, Special Assistant
to the Secretary of State for Refugee Affairs, Government of U.S.A.

Introduction.

On March 25, 1971 began one of the largest mass movements in our time of people fleeing in terror to a neighboring country. Six million Bengalis, Moslems and Hindus, have streamed out of East Pakistan, their homeland, to West Bengal, Assam, Tripura and Meghalaya. Thousands on thousands of new refugees arrive every day, and the pressures on India generated by this West multitude of destitute refugees are mounting dangerously.

On July 5th , Chester Bowles, a former U.S. Ambassador to India, wrote in The New York Times:

"Unless two rather unlikely developments occur, South Asia is in imminent danger of erupting into a tragic, needless war.

"These developments are: First, that the ruling West Pakistan Government turns away from the path of terror against its own subjects in East Pakistan and agrees to a settlement that will stem the flow of frightened, homeless refugees into India and second, that the world community soon mounts a massive campaign to relieve India of the burned of supporting nearly six million refugees who have already crossed the border."

Political solutions for the return of the Bengali refugees must be found; and it is imperative that other nations and other peoples to create time for such a settlement share India's shattering burden of caring for the refugees. It is incumbent on American voluntary agencies to assume a reasonable share of this responsibility. Humanitarianism and enlightened self-interest are twin motivations for strong and immediate action toward alleviating one of the most tragic and potentially explosives refugee crises of our time.

The State of Pakistan consists of the East and West provinces, which are separated by a thousand miles of Indian territory. The population of the East is 75 million, outnumbering the West, the seat of the national government, by 25 million. Both areas are predominantly Moslem, though eight million Hindus live in the East.

In elections held in December 1970, the Awami League of East Pakistan won a majority in the National Assembly for all Pakistan. Negotiations to form a new government resulted in a stalemate. On March 25th the Pakistani

Army and police poured into the East and undertook a campaign of unparalleled fury against the Bengali people. it appears that some 200,000 people were killed.

As the extent and gravity of the refugee crisis emerged, the International Rescue Committee sent a mission of five volunteer leaders to India, headed by IRC's former President, Angier Biddle Duke. Its other members were I. Morton Hamburg, an IRC Vive President. IRC Board members, Mrs. Lawrence Copley Thaw and Thomas W. Phipps, and Dr. Daniel L. Weiner of the Einstein Medical School. The mandate of the mission was to obtain a first-hand picture of the refugee situation, and to initiate an emergency programme for East Bengali refugees, the professionals in particular. The IRC Board of Directors felt that it should focus on a segment of the overall problem not exceeding the capabilities of a voluntary agency. Moreover, the survival of Bengali teachers, doctors, writers, artists, scientists, academicians, and cultural leaders is essential for the – survival of their nation.

The following pages describe the Mission's findings, recommendations and the outline of a programme the International Rescue Committee has undertaken to implement.

1. The Scope of the Problem

The near-apathy with which the world has reacted to a refugee emergency, the magnitude of which beggars anything we have witnessed since World War II and its aftermath, can perhaps be explained-though not excused-by the helplessness with which most of us react to what appears as an elemental disaster of unmanageable scope.

The mass terror unleashed by the West Pakistan Army and police had a selective thrust. As the New York Times put it.

"People have killed each other because of animosities of race, politics, and religion; no community is entirely free of guilt. But the principal agent of death and hatred has been the Pakistan Army. And its killings have been selective. According to reliable report from inside East Pakistan, the Army's particular targets have been intellectuals and leaders of opinion-doctors, professors, students, writers". (Anthony Lewis, 'Measuring the Tragedy'. The New York Times, June 7, 1971).

IRC's Mission to India was able to verify through interviews with refugees that this was actually what happened. People were taken out of their houses and machine-gunned in the streets. Men, women and children were bayonetted to death. Women were raped. About 200,000 people were reported to have been killed. Millions of people began their escape into India. At that stage, they consisted mostly of Muslims identified with the Awami League and the political opposition to the West Pakistan regime.

Later the terror of the Pakistani Army was turned against the Hindu minority who constituted about one-tenth of East Pakistan's population. To quote The New York Times report from Faridpur, East Pakistan;

"Although thousands of "antistate" Bengali Moslems have been killed by the army, the Hindus became particular scapegoats as the martial-law regime tried to blame Hindu India and her agents in East Pakistan for the autonomy movement….. The army also forced Moslems friendly to Hindus to loot and burn Hindu houses; the Moslems were told that if they did not attack Hindus, they themselves would be killed." (The New York Times, July 4, 1971.)

The Indian authorities have established a quite reliable registration procedure. By June, 3, the refugee population had reached 4.8 million, of whom close to two-thirds were housed in camps of all descriptions in Assam, Tripura and Meghalaya, east and north-east of East Pakistan, but mainly in West Bengal:

State of District	In Reception Centers	With friends or Relatives
Assam - - -	81,800	65,677
Tripura - - -	381,373	363,464
Meghalaya - - -	186,052	49,332
West Bengal.		
Nadia - - -	214,788	170,951
24-Parganas - - -	503,467	179,250
Maurshidabad - - -	134,507	15,953
West Dinajpur - - -	763,664	511,555
Jalpaiguri - - -	140,402	165,000
Coach-Behar - - -	189,755	210,875
Malda - - -	92,139	254,513
	2,707,947	2,022,570

(Figures prepared by the West Bengal Government)

By June 15, the number of refugees had gone up to 5.8 million, of whom 3.7 million were living in camps. With the outbreak of cholera in early June, news of which spread into East Pakistan, the border crossings did slow down. Yet once the cholera threat subsided, thousands again began to pour over every night, despite the desperate air of tension the Pakistani Army has tried to maintain along the border by mortar fire to which the Mission can bear personal witness. There is no indication that the exodus has been halted. If the present trend continues, the figure is likely to go to seven million before July is out. Seven million people is the total population of Cuba.

When will this situation explode who knows? The voluntary agencies are performing a humanitarian service. But they are just as importantly trying to help India endure the severe internal pressures and thus buy time in the search for the solution that must come. In that sense they are making a contribution to World Peace.

II. The Refugees

The refugees, many of whom have walked distances of up to 150 miles; appear to have travelled from cities and villages relatively near the Indian border. There are unquestionably large numbers of Pakistanis who are unable to escape because of their more central location within East Pakistan. They have come to India initially by way of the usual border crossings and along roads normally travelled. With the closure of the borders by the Pakistani military, large numbers are continuing to infiltrate through the 1,300 mile border with India through forests and swamps. These groups, with numbers sometimes up to 50,000 in a 24 hour period have for the most part settled along the major routes in India. They are found wherever there is a combination of available ground and minimal water supply. Many of them have avoided camp communities and have "melted" into the countryside. The refugee camps may vary in size from small groups to upwards of 50,000. There has been an extraordinary effort on the part of the West Bengal and Indian Government to organise these camps and supply them with at least minimal amounts of food and water. The camps are frequently located adjacent to existing Indian villages. Attempts have been made to set up camps on higher terrain but this is frequently impossible. It is obvious that much of the refugee areas will be under water during the monsoon season.

The shelter, when it does exist, is of three main types- small that-ched huts made of locally available material, small low tent made from wood frames covered with tarpaulins supplied by the relief authorities, and, where available, cement casement and drainage pipes are used for shelter. At present, all tarpaulin material within India has been exhausted, and attempts are being made to use plastic material. Water is usually supplied by one or two pumps within the refugee area. These are hand-drilled wells which are equipped with standard single lever pump. Sanitary facilities are almost not-existent. Initially small slit trench latrines were located within close proximity to the area of the refugee villages, but attempts are now being made by authorities to place larger, better designed facilities at least some distance from the camps. The inadequate drainage system, the shallow wells and inadequate sanitation make cross contamination an obvious sequence. There is a critical need in these camps for some type of adequate sanitary facilities-even more acutely a need for power-drills so as to facilitate the speed with which they can be constructed and improve the depth of the wells. Adequate facilities in both these areas with adequate separation are probably the single most important need for maintaining some type of minimal health conditions.

The refugee diet is dependent upon food supplied by the relief authorities and those small amounts which they can supplement by local purchase. This consists of rice boiled in open clay pots, some powdered mild which is occasionally available, and dall, which is a lentil type of bean used for a thin soup. In a few isolated cases some green vegetables had been distributed, but this is the exception rather than the rule. At this point, the diet would be classified as barely adequate.

III. Health Conditions

The physical appearance of most of the refugees shows the signs of hardship, low caloric intake" and inadequate clothing. The children see to be doing reasonably well

under the circumstances, but in both adults and children there are seen large numbers of skin infections, gastrointestinal disturbances with vomiting and diarrhoea, and chronic cough with upper respiratory infections. In the camp hospitals there are the ever present cases of cholera and other gastrointestinal diseases. The cholera problem seems now to be under control. However, with the combination of increased rain from the monsoons, deficient health facilities plus the influx of new refugees, it is quite clear that there will be again an upswing in the incidence of cholera.

Health care among the refugee population is rudimentary. Mobile units for mass inoculation programs and the distribution of a few simple medications are active within some of the camps. Fixed facilities in the terms of field-type tent hospitals have been opened up in or near other camps, but here again these units carry only about 20 to 30 inpatient beds (stretchers). All that can to offer some intravenous or oral fluid therapy for the gastrointestinal problems and cholera. Medical supplies are being received and distributed to these fixed facilities. However, due to the lack of co-ordination of the medical effort, many supplies are arriving which are not needed while others are in short supply.

At the present time in terms of the general refugee population, the acute need in for material for shelter, particularly with the advent of the monsoon season. There is a need for better water supply, particularly wells with a deeper water table and with less chance of contamination. Properly designed sanitary facilities are mandatory. The diet at present would appear to be just about able to sustain the adults and children, but food is going into short supply again.

A major problem is in the infant refugee population. There is no food or food supplement available to bottle-feed these children. Mother's milk is, of course, inadequate. A severe and critical shortage is therefore present in the powdered milk-glucose supplement powders used for infant formulas. Without this being placed in immediate supply, there will conceivably be many more-neo-natal deaths due to malnutrition.

The next few months will bring increased numbers of refugees and additional strain on the meagre existing supplies and facilities. Malnutrition and disease will become more prevalent. Relations between the refugees and the local villagers must deteriorate. The financial burden for the West Bengal and Central Indian government will be impossible to bear. Morale will sink to even lower levels as the situation becomes desperate.

Food and medical supplies must come from outside sources. Distribution of these materials is possible but there must be more medical and paramedical personnel made available and mobilized.

IV. The Refugee Physicians

The refugee physicians who left East Pakistan maintained some liaison with other professionals and physicians within India. Very few of them are in the refugee camps, most being in and around Calcutta, living with families, friends and relatives. The East Pakistani medical establishment is the product of seven medical schools offering two

different degrees. The M.B.B.S. physicians are from five-year school and the RFP are from four-year schools. There are also some paramedical. The general faculty of the medical schools was for the most part senior physicians, and many of these were killed or are unaccounted for. Approximately 1,500 East Pakistani physicians have left the country, the majority of these being younger men. The medical degree does not accredit them to practice in West Bengal and so far only 150 of them have been employed by the West Bengal Government. Most of the refugee physicians have registered with the Bangal Desh Red Cross which is under the direction of Dr. A. Hoque. In this group are mostly what we would classify as general practitioners with relatively few specialists. They retain only their own clothes, a few personal belongings, and virtually none of their medical equipment. They possess no medical supplies and are consequently unable to practice medicine. Nor have they any means of support or means of supporting their families. They exist by living with other families.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য	'বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস', বহির্বিশ্ব বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত কর্তৃক প্রকাশিত	১৯৭২

INFLUX OF REFUGEES FROM MARCH 25 TO DECEMBER 15, 1971

Serial Number	Name of State.	Total Influx.
(1)	(2)	(3)
1	West Bengal	7,793,474
2	Tripura	1,416,491
3	Meghalaya	667,986
4	Assam	312,713
5	Bihar	8,641
	Total-	9,899,305

DISTRIBUTION OF REFUGEES IN VARIOUS STATES IN INDIA

Refugee Population as on December 15, 1771

Serial Number	Name of State	Number of Camps	In camps	Outside Camps	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	West Bengal	492	4,849,786	2,386,130	7,235,916
2	Tripura	276	834,098	547.551	1.381.649
3	Meghalaya	17	591,520	76,466	667,986
4	Assam	28	255,642	91,913	347,555
5	Bihar	8	36,732		36,732
6	Madhya Pradesh	3	219,298		219,298
7	Uttar Pradesh	1	10,169		10,166
	Total-	825	6,797,245	3,102,060	9,899,305

TREND OF INFLUX

Month	Average daily.	Monthly arrivals.
(1)	(2)	(3) (PERSONS IN THOUSAND)
1 April 1971 (10th to 30th)	57,000	1,921,00
2 May 1971	102,00	3,158,00
3 June 1971	68,00	2,056,00
4 July 1971	26,00	797,00
5 August 1971	34,00	1,055,00

6 September 1971	57,00	804,00
7 October 1971	14,00	425,00
8 November 1971	8,00	217,00
9 Backlog		166,00
	Total-	9,899,00

LIST OF REFUGEE CAMPS

(EASTABLISHED DURING THE PERIOD FROM APRIL TO NOV. 1971)

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
D4	North District	Ambasa	1
D3		Kamalpur	2
E3		Kumarghat	3
D3		Miles	4
D3		85 Miles	5
E3		Padmabil	6
E3		Shrinathpur	7
E3		Uptakhali	8
D4	South District	Bagata	9
D4		Chandrapur	10
D4		Dhajanagar	11
D4		Harina	12
D4		Rishyamukh	13
D4		Kakraba	14
D4		Kalachara	15
D4		Kawamara	16
D4		Maichera	17
D4		Phulkumari	18
D4		Rajnagar	19
D4		Shrinagar	20
D4	West District	Amtali	21
D4		Barjala	22
D4		Brajapur	23
D4		Chechuria	24
D4		Dhanpur	25
D4		Gandhigram	26
D4		Hapania	27
D4		Ishanpur	28
D4		Khowai	29

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
D4		Madhupur	30
D4		Matinagar	31
D4		Melagarh	32
D4		Mohanpur	33
D3		Simna	---
D4		Teliamura	33
		ASSAM	
E3	Cachar	Chandranathpur	34
E3		Chargola	35
E3		Dasgram	---
E3		Harincherra	36
E3		Kathal	---
E3		Lakshminagar	37
E3		Silkuri	38
E3		Sonakhira	39
B2	Goalpara	Borkona	40
C1		Fakirgram	41
B2		Mankachar	---
C2		Nidanpur	42
C1		Sarfanguri	43
E5	Mizo	Demagiri	---
E5		Pachang	---
E5		Rotlang	---
E2	North Cachar Hills	Haflong	44
E1	Nowgong	Hojai	45
E1		Nilbagan	46
E1		Sidabari	47
		WEST BENGAL	
A5	24 Paraganas	Hasnabad	---
A5		Taki (2 Camps)	48
A5		Basirhat (5 Camps)	---
A5		Swarupnagar (7 Camps)	49
A5		Baduria (5 Camps)	50
A5		Gobardanga	51
A5		Maslandapur	51
A5		Kalupur (4 Camps)	51
A5		Media	51
A5		Ichapur	51

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A5		Sunita	51
A5		Banipur	51
A5		Pairagachi	51
A5		Lakshmipur	51
A5		Sadhanpur	52
A5		Sahara	52
A5		Barakur	---
A5		Digberia	53
A5		Dattapukur	53
A5		Manapukur	53
A5		Barasat (3 Camps)	---
A5		Mamabhagina (2 Camps)	54
A5		Marighata	54
A4		Bagdaha	55
A4		Helencha	55
A4		Ganrapota	55
A5		Salt Lake	56
A5		Nilganj	56
A5		New Barakpur	56
A5		Dogachia	57
A4	Nadia	Karimpur	58
A4		Palashipara	58
A4		Betai	58
A4		Nazirpur	58
A4		Banpur	59
A4		Chapra	59
A4		Dompukuria	59
A4		Purnaganj	59
A4		Java	60
A4		Bhaluka	60
A4		Bhadurpur	60
A4		Muragachha	60
A4		Dakshinpara	60
A5		Kalyani (7 Camps)	61
A4		Shikarpur	62
A4		Majdia	63
A4		Bhajan Ghat	63
A4		Asannagar	63

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A4		Badkulla	63
A4		Ulashi	63
A4		Ranaghat (2 Camps)	---
A4		Shantipur	---
A3	Murshidabad	Daulatabad	64
A3		Kaladanga	64
A3		Baruipara	65
A3		Choa	65
A3		Hariharpara	65
A3		Karimnagar	65
A3		Nischintapur	65
A3		Rukunpur	65
A3		Sahajadpur	66
A4		Amtala	66
A4		Jhowbona	66
A4		Madhupur	66
A4		Nowda	66
A4		Patikabari	66
A4		Maganpara	67
A3		Bhagirathpur	68
A3		Bhatsala	68
A3		Domkal	68
A3		Katakobra	68
A3		Sadikhandiar	68
A3		Sahebrampur	68
A3		Choapara	69
A3		Hukahara	69
A3		Jalangi	69
A3		Kazipara	69
A3		Natial	69
A3		Sagarpara	69
A3		Sahebnagar	69
A3		Ashoke Kunja, Lalbag	70
A3		College Commerce Hostel, Jiaganj	70
A3		Darapnagar Primary School	70
A3		Nawab Bahadur Institution's	79
A3		Lal Boarding, Lalbag	70
A3		Muslim Hostel, Lalbag	70
A3		Mission Hospital, Jiaganj	70

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A3	Murshidabad	College Commerce Hostel, Jiaganj	70
A3		Govt. Sponsored Free Primary School No. 1. Jiaganj	70
A3		Do No. 2. Jiaganj	70
A3		Maharaj Bahadur Hall Jiaganj	70
A3		Darapnagar Primary School	70
A3		Dilfarbad Ganja Farm	70
A3		Nashipur Rajbati	70
A3		Nishadbag Pry. School, Lalbag	70
A3		Mukundabag Jr. Basic School, Lalbag	70
A3		Shripat Kumarpara, Jiaganj	70
A3		Mahanta Ramdas Aulia Primary School, Jiaganj	70
A3		Kurmitala Camp	70
A3		Ashoke Kunja, Lalbag	70
A3		Mackenji Hall, Azimganj	70
A3		Puratan Dharmasala, Azimganj	71
A3		Nutan Dharmasala, Azimganj	71
A3		Nowlakshya Garden, Azimganj	71
A3		Don Bosco Institute, Azimganj	71
A3		M. Strimal's Godown, Jiaganj	71
A3		Raja Bijoy Singh Stable, Azimganj	71
A3		Dehipur G.S.F.P. School	71
A3		Raja Bijoy Sing Bidyamandir Hostel, Azimganj	71
A3		M. N. Academy, Lalgola	72
A3		Lahore Shed, Lalgola	72
A3		School Boarding, Lalgola	72
A3		Guest House, Lalgola	72
A3		Basic School, Lalgola	72
A3		Madrasa, Lalgola	72
A3		Girls School, Lalgola	72
A3		Manick Chak	72
A3		Youth Reception Centre, Lalgola	72
A3		Raninagr, Goas	73
A3		Raninagar	73
A3		Nabipur	73
A3		Katlamari	73

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A3	Murshidabad	Rakhaldaspur	73
A3		Sheikhpara	73
A3		Rambag	74
A3		Habaspur Primary School	74
A3		Bagdanga Primary School	74
A3		Patamari Hanumantanagar	74
A3		Akheriganj	74
A3		Kharibona	74
A3		Nashipur	74
A3		Bhagwangola High School	75
A3		Kalukhali Madrasa & Primary School	75
A3		Bhagwangola Primary School	75
A3		Asanpur Primary School	75
A3		DArar Kandi Primary School	75
A3		Ram Chandramati Pry. School	75
A3		Bhagwangola	75
A3		Bhurkunda	76
A3		Sahapur	76
A3		Manigram	76
A2	Maldah	Bamangola	77
A2		Pakuahat	77
A2		Maheshur	77
A2		Gouljoi	77
A2		Paul Transit	77
A2		Pakshaghat Open Air	77
A2		Gajol	78
A2		Dohil	78
A2		Hatimari	78
A2		Kutubsahar & Adina	78
A2		kanchuadanga	78
A2		Eklakshi	78
A2		Rahutara Mission	79
A2		Kendpukhur	79
A2		Bulbulchandi (2 Camps)	79
A2		Rishipur	79
A2		Singabad (2 Camps)	79
A2		Aiho	79
A2		Bahutera Mission	79
A2	Maldah	Harishchandrapur	80
A2		Bishapur	80
A2		Kushidah	80
A2		Tulshihatta	80

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A2		Masaldaha	80
A2		Bringol	80
A2		Borai	80
A2		Konua	80
A2		Chandipur	80
A3		Golapganj	81
A3		Kaliachak	81
A3		Mothabari	81
A3		Baisnabnagar	81
A3		Pagla Bridge	81
A3		Bangatola	81
A3		Gayeshbari	81
A3		Sajaopur	81
A2		Cabindapara	82
A2		Malatipur	82
A2		Kharba	82
A2		Kaligram	82
A2		Ashapur	82
A2		Paharpur	82
A2		Nalahar Chatremohani	82
A2		D.E.B. Dak Bungalow	83
A2		Mahadipur	83
A2		Nagharia	83
A2		Raigram	83
A2		Milki	83
A2		Kalindri	84
A2		Mathurapur	84
A2		Nazirpur	84
A2		Bechutala or Manikchak Diara	84
A2		Araidanga	84
A2		Ekborna	84
A2		Haripur	84
A2		Paranpur	84
A2		Ratua School	84
A2		Debipur	84
A2		Samshi	84
A2		Baharal	84
A2		Bhaluka	84
A2		Bahado	84
A2		Bhagabanpur	84
A2		Khapur	84
A2	West Dinajpur	Kaldighi Godown	85
A2		Gangarampur High School	85

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A2		Naya Bazar High School	85
A2		Shibbati Station Junior High School	85
A2		Chaloon High School	85
A2		Sarbamangla	85
A2		Sukdebpur High School	85
A2		Thengapara High School	85
A2		Nehamba Jr. High School	85
A2		Bulbari Centre	85
A2		Jahangirpur Jr. High School	85
A2		Ratanpur Free Primary School	85
A2		Tapan High School	85
A2		Rampur High School	85
A2		Chakbaligram Basic School	85
A2		Kardaha High School	85
A2		Daralhat High School	85
A2		Rampur High School	85
A2		Chakbaligram Basic School	85
A2		Kardaha High School	85
A2		Vior Jalalia High School	85
A2		Tilom Jr. High School	85
A2		Laskarhat Panchayat Office	85
A2		Patiram High School	85
A2		Nazirpur Anchal Office at Jhorna	85
A2		Barkali Jr. High School	85
A2		Amritakhanda Anchal Office at Kamarpara	85
A2		Malancha High School	85
A2		J.L.P. Bidyachakra	85
A2		Khadimpur Girls High School	85
A2	West Dinajpur	Nadipar N.C. High School	85
A2		Chingishpur High School	85
A2		Beltala Park High School	85
A2		Khashpur High School	85
A2		Hilli High School	86
A2		Trimohini Rural Library	86
A2		Teor Bharat Sebasram Sangha	86
A2		Muralipur Jr. Basic School	86
A2		Panjul Anchal Panchayat Office at Ramkrishnapur	86
A2		Dhalpara Free Primary School	86
A2		Muralipur Free Primary School	86
A1		Daspara	87

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A1		Lakhimpur	87
A1		Chopra	87
A1		Patagora	87
A1		Matikunda	87
A1		Thakurbari	87
A1		Ramganj	88
A1		Goalpokhar	88
A1		Darivir	88
A1		Rashakhowa	88
A1		Atiakhori	88
A1		Sujali	88
A2		Fakirganj Reception camp	83
A2		Jaidevpur Madrasa Reception camp	89
A2		Safanagar Reception camp	89
A2		Kumarganj Reception camp	89
A2		Gopalganj Reception camp	89
A2		Radhanagar Reception camp	89
A2		Botun Reception camp	89
A2		Dharmapur Reception camp	89
A2		Malone	90
A2		Naoda	90
A2		Dalimgaon	90
A2		Maharajahat	90
A2		Rampura	90
A2		Banshihari	90
A1	Darjiling	Kantivila	91
A1	Jalpaiguri	Sannyashikata	92
A1	Jalpaiguri	Amaidighi	92
A1		Jatiakali	92
A1		Manuagach	92
A1		Sakati (2 Camps)	92
A1		Berubari (2 Camps)	92
A1		Patkata	92
A1		Drangi	93
A1		Panijehati	93
A1		Rangdhamali	93
A1		Gumirapara	93
A1		Manikganj	93
A1		Sarulla Camp	93
A1		Polytechnic	93
A1		Blaramhat	93
A1		Panbari	93

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A1		Bandhunagar	93
A1		Jalpesh (2 camps)	93
A1		Mauagach	93
A1		Dabgrach	93
A1		Dankimari (2 camps)	93
B1		Haldibari	94
B1		Dewanganj	94
A1		Duars Co-operative Rice mill camp	95
A1		Bashilarganga Bagjan	95
A1		Dangi	96
B1		Lakshmikanta	97
B1		Rangati	97
B1		Agrabhasa	97
A1		Matiali	98
A1		Barodighi	98
B1	Koch Bihar	Dewanhat Railway Station (2 camps)	99
B1		Makkati Pushnabanga	99
B1		Dhunpur	99
B1		Natuarpar	99
B1		Rajarhar	99
B1		Madhupur	99
B1		Pundibari Girsl School (6 camps)	99
B1		Patlakhawa Complete Basic School	99
B1		Karalirdanga Camp Nos. 1 & 2	99
B1	Koch Bihar	Dineswari Jr. High School	99
B1		Kharijakakribari	99
A1		Dewangaj Transit Camp (Girimath)	100
A1		Sweedish Mission Camp	100
A1		Huraerdanga Camp	100
A1		Haldibari Jute Godown (2 Camps)	100
A1		Changrabandha High School (5 Camps)	100
A1		Jamaldah Somi Permanent (3 Camps)	100
A1		Hanirhat School	100
A1		Dhaprahat School	100
A1		Dangerbat School	100
B1		Jaldhowa	101
B1		Jorai	101
B1		Buxirhat	101
B1		Deocharai	101
B1		Balarampur	101
B1		Balabhut	101

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
B1		Jhowkuthi	101
B1		Paglarhat	102
B1		Ratherdanga (2 Camps)	102
B1		Nagarlalbazar (2 Camps)	102
B1		Baramaricha (2 Camps)	102
B1		Gosairhat	102
B1		Dakalirhat	102
B1		Dakghara	102
B1		Khalisamari	102
B1		Chhotosalbari	102
B1		Baraunidanga	102
B1		Karjirdighi	102
B1		Ranirdigni	102
B1		Ghogrardanga	102
B1		Krishnana Colony	102
B1		Basantababurdanga	102
B1		Suanghat	102
B1		Changhat	102
B1		Nakati	102
B1		Kaliganjerdanga	102
B1		Baghmarardighi	102
B1		Bamandanga	102
B1		Golenwhati (3 Camps)	102
B1		Nagarlalbazar Sukandighi	102
B1		Dewantskot Joyduar (2 Camps)	102
B1		Jatamari	102
B1		Chhatlabazar	102
B1		Baramashia	102
B1		Bhogramguri	102
B1		Ashokebari	102
B1		Angardata Parodubi	102
B1		Patakamari	102
B1		Ghoksardanga	102
B1		Burihat (2 Camps)	103
B1		Khalisagosanimari	103
B1		Kaliganj	103
B1		Basantirhat (2 Camps)	103
B1		Bnetaguri	103

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
B1		Kisamatda SAvam (3 Camps)	103
B1		Boradanga	103
B1		Nigamnagar (3 Camps)	103
B1		Kharkharia	103
B1		Balika	103
B1		Putimari	103
B1		Chrabari	103
B1		Petla	103
B1		Rashbarir Math 'A'	103
B1		Baranachina	103
B1		Chhotofalimari	103
B1		Jamadarerbosh (5 Camps)	103
B1		Sitai School (2 Camps)	103
B1		Kayterbari	103
B1		Chamla	103
B1		Adabari	103
B1		Balapukuri	103
B1		Brahmatarohhatra	103
B1		Bijalichhatka	103
		MEGHALAYA	
C2	Garo Hills	Baghmara	104
C2		Dalu	105
12		Chandabhui	106
C2		Chichengpara hat	106
C2		Haljati Hat	107
C2		Machangpani	108
C2		Ampati	108
C2		Chebenang	108
C2		Myneng	108
C2		Sibbari	109
C2		Bikona	110
B2		Porakasua Hat	111
B2		Kalaipara	112
B2		Dimapara	112
E2	Khasi & Jaintia Hills	Pongtung	113
E2		Madan Lynetd	114
E2		Madan Baitah	115

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
E2		Sowlong	116
E2		Amtrong	117
E2		Diengrai	118
E2		Amlarem	129
E2		Amsohmaleng	120
C2		Dalot	121
C2		Lalpani	121
D2		Mowasora	122
D9		Pancharing	123
D2		Munai	124
E2		Syndai	125
D2		Shella	126
D2		Ishamati	126
D2		Mylliem	127
D2		Wahrengka	128

পরিশিষ্ট-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-বাহিনী ও তাদের দোসবদের দ্বারা নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের নামের একটি তালিকা	হিস্টরী অব দি ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা -এম, এ, রহীম	১৯৮১

PARTYRS IN THE LIBERATION WAR

Professor: Dr. G. C. Dev (Phil), Munier Choudhury (Beng): Asso. Prof.: Mufazzal Haider Choudhury (Eng.), Dr. Abul Khair (Hist.), Dr. Jyotirmoy Guhathakurta (Eng), A. N. M. Moniruzzaman (Statistics): Asst. Prof.: Dr. M. A. Muktadir (Geol), Dr. Fazlur Rahman Khan (Soil Sc.), S. C. Bhattacharya (Hist.), Ghiyasuddin Ahmed (Hist.), Dr. Sadat Ali (I. E. R.), Lecturer: Ataur Rahman Khan Khadim (Phys.), Sharafat Ali (Maths.), Anupadhyayan Bhattacharya (Appl. Phys), Rashidul Hasan (Eng.).

Medical Officer: Dr. M. Murtaza; Teacher Laboratory School: Md. Sadeq.

Other Employees: 1. Abdullah Bhuyan, U. D. Asst., I. E. R.; 2. Khagendra Chandra De, bearer, Philosophy Dept.; 3. Abdus Samad, Guard, T. S. C.; 4. Dajjulal, Sweeper, T. S. C.; 5. Abdus Shahid, OLabour, T. S. C.; 6. Pir Muhammad, Peon, Registar's Office; 7. Sulaiman, Guard, Rokeya Hall; 8. Chunnu Mian, Gardener, Rokeya Hall; 9. Abdul Khaliq, Gardener, Rokeya Hall; 10. Ahmad Ali, Liftman, Rokeya Hall; 11. Nurul Isla, Bearer, Rokeya Hall; 12. Hafizuddin, Bearer, Rokeya Hall; 13. Priyanath Ray, Guard, J. N. Hall; 14. Sunil Chandra Das, Guard, J. N. Hall; 15. Dukhiram Mondol, J. N. Hall; 16. Shamsuddin, Dightguard, J. N. Hall; 17. Jawharlal, Gardener, Botany Dept; 18. Dasuram, Gardener, Botany Dept; 19. Sirajul Haq, bearer, D. U. Club; 20. Ali Husain, bearer, D. U. Club. 21. Suhrab Ali Ghazi, bearer, D.U. Club; 22. Shivapada Kapuri, guard, J. N. Hall; 23. Sri Mistry, Electric worker; 24. Abdul Majed Ghazi, guard, Engineering office; 25. Sunil Chandra De. Guard, J. H. Hall; 26. Nami, Guard, Rokeya Hall.

Students : Fazlul Haq Hall :

1. Sikandar Ali (II M. Sc.); 2. Abdus Salam (1 Hons, Statistics); 3. Nazrul Islam (III Hons. Beng); 4. Ghulam Mahbub (1 Hons., B. Sc., Bio-Chem.), 5. Mustafa Husein (III B. Sc. Hons., Sol Sc); 6. Abul Fazl (I M. Sc., Bio-Chem; 7. Abul Qasim (II Hons.).

Students : Zahurul Hall :

1. Zafar Alam (II M. Sc.); 2. Helanur Rahman (III Hons;); 3. Jahangir Munir (III Hons.); Abul Kalam (I M. Com.); 5. Abul Taher Pathan (II Law); 6. Saleh Ahmed (II Law); 7. Ashraf Ali (I M. A.).

Students : Surjya Sen Hall :

1. Zillur Murshed Mithu; 2. Badiul Alam; 3. Shamsuzzaman; 4. Abdur Rahim; 5. Ataur Rahman; 6. Amirul Salam; 7. Atiqur Rahman.

Students: Haji M. Mohsin Hall :

1. A. K. M. Mirajuddin; 2. Lt. Samad; 3. Nazamuddin Bhuyan; 4. Anwar Husain; 5. Syed Nurul Amin; 6. Khondkar Abu Taher; 7. Jahangir Haidar Khan; 8. Zahirul Islam; 9. Musharraf Hussain; 10. Manzur Rahman Chaudhury.

Students: Salimullah Hall:

1. Wahidur Rahman (III B. A. Hons.); 2. Samad; 3. Nizamuddin Bhuyan; 4. Anwar Husain; 5. Syed Nurul Amin; 6. Khondkar Abu Taher; 7. Jahangir Haidar Khan; 8. Azhirul Islam; 9. Musharraf Hussain; 10. Manzur Rahman Chaudhury.

Shahidullah Hall:

1. Jalaluddin Haidar (1 M. Sc., Applied Physics).

Jagannath Hall:

1. Swapan Chaudhury; 2. Ganapati halder; 3. Mrinal kanti Bose; 4. Monoranjan Biswas; 5. Ramani Mohan Bhattacharya; 6. Kishori Mohan ?Sarkar; 7. Ranadaprasad Ray; 8. Subal Chandra Chakravarti; 9. Satyaranjan Das; 13. Kesaba Chandra haldar; 14. Nirmal Kumar Ray; 15. Bidhan Chandra Ghosh; 16. Sibu Kumar Das; 17. Shishutosh Datta Chaudhury; 18. Rakhal Chandra Ray; 19. Upendranath Ray; 20. Santosh Kumar Ray. 21. Jiban Krishna Sarkar; 22. Satyaranjan Nag; 23. Rupendranath Sen; 24. Murari Mohan Biswas; 25. Bimal Chandra Ray; 26. Prabir Pal; 27. Niranjan Haldar; 28. Kartik Seal; 29. Paltan Das; 30. Sujit Datta; 31. Niranjan Saha; 32. Harinarayan Das; 33. Dines Chandra Sikdar; 34. Niranjan Chanda; 35. Subrata Saha; 36. Susil Chandra Das; 40. Subhash Chakravarti; 41. Ajit Ray Chaudhury.

'Basuntika,' Diamond jubilee mention following names, but has not identified in they are students or employees:

Sibu Modak, Matilal De, Budhiram, Deguram, Bhiruram, Manbharanram, Monilal.

Guest student martyrs: Latifur Rahman (Haji Asmat College), 7 Badruddoza (J. N. College). Mahtabuddin (Bajitpur College).

-History of the University of Dacca,
Published by the University of Dacca, 1981

পরিশিষ্ট-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের আরেকটি তালিকা	'বাংলাদেশ' বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

NAMES OF UNIVERSITY TEACHERS
RAJSHAHI UNIVERSITY

Prof. Qayyum, Habibur Rahman, Sree Sukha Ranjan Samadder,
NAMES OF M.C.A.s

Mashiur Rahman, Amjad Hossain, Aminuddin , Nazmul Haque Sarker, Abdul Haque, Dr. Zikrul Haque, Syed Anwar Ali, A. K. Sarder.

NAMES OF JOURNALISTS

Sirajuddin Hossai, Shahidullah Kaiser, Khondakar Abu Taleb, Nizamuddin Ahmed, A. N. M. Ghulam Mustafa, Shahid Saber, Sk. Abdul Mannan (Ladu), Nazmul Haque, M. Akhter, Abul Bashar, Chisty Helalur Rahman, Shibsadan Chokravarty, Selina Akhter.

NAMES OF PHYSICIANS

Md. Fazle Rabbi, Abdul Alim Chowdhury, Shamsuddin Ahmed, Azharul Haque, Humayun Kabir, Sulaiman Khan, Kaiser Uddin, Mansur Ali, Ghulam Murtaza, Hafez Uddin Khan, Jahangir, Abdul Jabbar, S. K. Lal, Hem Chandra Basak, Kazi Obaidul Haq, Mrs. Ayesaha Bedoura Chowdhury, Al-Haj Mamtazuddin, Hashimoy Hazra, Naren Ghosh, Zikrul Haq, Shamsul Haq, A. Gafur, Mansur Ali, S. K. Sen. Mafizuddin, Amulya Kumar Chakravarty, Atiqur Rahman, Ghulam Sarwar, R. C. Das, Mihir Kumar Sen, Saleh Ahmed, Enamul Haque, Mansur (Kanu), Ashraf Ali Talukdar, Lt. Ziaur Rahman, Lt. Col. Jahangir, Badiul Alam, Lt. Col. Hai, Maj. Rezaur Rahman, Maj. Nazmul Islam, Asadul Haq, Nazir Uddin, Lt. Nurul Islam, Kazal Bhadra, Mansur Uddin.**

---

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নাম পরিশিষ্ট-১-এ উল্লেখিত হয়েছে বলে এখানে তাঁদের নামগুলো উল্লেখ করা হল না।

** ঢাকা পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউটের সূত্রে অতিরিক্ত আরো কয়েকজন ডাক্তারের নাম পাওয়া যায়। সেগুলি এই পরিশিষ্টের শেষে মুদ্রিত হয়েছে।

OTHERS

Zahir Raihan (Litterateur), Purnendu Dastidar (Litterateur), Ferd us Dowla (Litterateur), Meherunnessa (Litterateur), Altaf Mahamud (Artist), Danbir Ranada Prasad Saha (R. P Saha), Jogesh Chandra Ghosh (Ayurved Shastri), Dhirendra Nath Dutta (Political Leader), Shamsuzzaman (Chief Engineer), Mahbub Ahmed (Govt. Officer), Khurshid Alam (Engineer), Nazrul Islam (Engineer), Muzammel Haq Chowdhury (Engineer), Mohsin Ali (Engineer), Mujibul Haq (Govt. Officer).

Districtwise List of Martyr Educationsts
(except University Teachers) and Lawyers

Districts and Divisions	Primary	Educationists Secondary	College	Lawyers
1	2	3	4	5
Dacca	37	8	10	6
Faridpur	27	12	4	2
Tangail	20	7	2	-
Mymensingh	46	23	1	2
Dacca Division	130	55	17	10
Chittagong	39	16	7	1
Chittagong Hill Tracts	9	4	1	1
Sylhet	19	7	-	2
Comilla	45	33	1	4
Noakhali	26	13	4	2
Chittagong Division	138	73	13	10
Khulna	48	15	2	2
Jessore	55	31	5	4
Barisal	50	21	4	-
Patuakhali	3	1	-	-
Kushtia	28	13	4	-
Khulna Division	184	81	15	6
Rajshahi	39	8	3	5
Rangpur	41	22	9	4
Dinajpur	50	10	1	2
Bogra	14	12	-	2
Pabna	43	9	1	2
Rajshahi Division	187	61	14	15
Bangladesh	639	270	59	41

(1) Total No. of Educationists (other than Universities)	968
(2) Total No. of University teachers	21
Grand total	989

Onslaught on Intellect and Intelligentsia by Nurul Islam Patwari

(শহীদ ডাক্তারদের আরো কয়েকটি নাম)

লেঃ এ, এফ, এম ফারুক

মুজিবুদ্দিন আহমেদ

লেঃ এনামুল হক

ডাঃ মুনসুর রহমান

ডাঃ গোপাল চন্দ্র সাহা

ডাঃ এ নরেন্দ্র নাথ দত্ত

ডাঃ এ, বি, এম, নুরুল আলম

ডাঃ এ, মুকতাদির

ডাঃ রেবতী কান্ত সান্যাল

ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র দে

ডাঃ এ, রহমান

ডাঃ এ, নওশের আলী

ডাঃ সাইদ মোহিদ ইমাম

ডাঃ মোঃ বজলুল হক

ডাঃ মেজর আমিনুল ইসলাম, এ, এম, সি

লেঃ কঃ বি, এ, চৌধুরী এ, এম, সি

লেঃ মোঃ আমিনুল হক

লেঃ খোন্দকার নুরুল ইমাম, এ, এম, সি

ডাঃ রফিক আহমদে

INDEX

A
Agartala, 2, 3, 9, 11, 526, 549, 551-52
Ahmed, Choudhury, A. B. Kaiser, 3
Ahmed, Ghiyasuddin, 573
Ahmed, Iqbal, 5
Ahmed, Nizamuddin, 574
Ahmed, Shamsuddin (Engineer), 510
Ahmed, Shamsuddin (Physician), 575
Alam, Khurshed (prof.), 4,
Ali Farman (General), 538
Ali, Sadat (Dr.), 573
Ali, Sharafat, 573
Ali, Sekander (Captain), 530
Ali, Syed Anwar, 575
Ali, Yousuf, prof. (of Jamat), 7
Amin, Md. Nurul, 6
Amrita Bazar Patrika, 538
Assa, 553, 555
Awal, Abu, 528
Awami League, 9, 521, 523, 527-28, 531, 554-55
Azam, Golam, 7-8
B
Baganbari 5
Bangladesh, 3, 5, 6, 7-8, 521, 527, 529, 532, 538, 545, 546, 551, 552, 575
Bangladesh Flag of Independence, 521,
Bangladesh People of 3
Bangladesh Red Cross, 558
Bazidpur, 91
Benapol, 545-46
bengali, 1, 3, 537, 539
Bhattacharya, Anupadhyayan, 573
Bhattacharya, Santosh (Dr.), 537-38, 573
Bibi, Amina, 3
Bihar, 559
Biharis, 7
Bombay, 522
Britain, 525
C
Calcutta, 558
Central Shahid Minar, 6
Charshindur, 6
Chittagong, 525-26, 530-32, 550, 575
Chittagong Hill Tracts, 551, 575
Choudhury, Mufazzal Haider, 575
Choudhury, Munir (prof.), 537, 573
Comilla, 2, 3, 5, 527, 529, 550-51, 575
Coochbehar, 546
D
Dacca, 1, 2, 5-7, 7-8, 9-11, 521-22, 444, 528-533, 534-35, 537-39, 552, 575
Dacca Airport, 538
Dacca Cantonment, 538
Dacca College, 7
Dacca International Hotel, 522
Dacca Medical College, 537
Dacca University, 4, 6, 539, 523, 537-38, 574
Dastidar, Purnendu, 574
Daukhandi, 2, 3,
Day, Ranendra chandra, 7-8
Demra, 10
Dhaleswari River, 9
Dinajpur, 575
Ducsu, 5,
Duke, Angier Biddle, 553-54
E
East Bengal border, 549
East Pakistan, 522-23, 525, 528, 530-33, 534-35, 553-56
East Pakistan Rifles, 532
Esso Company (at narayangonj), 2
Europe, 3, 4, 7
G
Gandhi, Indira, 533
Gazaria, 1, 5
Geneva, 1, 2, 4-11
Genocide, 522, 525, 533, 549
Ghorasal, 7
Ghosh, Jogesh Chandra, 577
Ghosh, Nometa, 550
Gope Bag, 5
Guha, Sree, Gopal Krisana, 10
Gulshan, 524
H
Haque, A.F.M. Fazlul, 4
Haque, Zikrul, 575
Hasan, Rashidul, 538, 573
Hindu, 1, 5, 7-9, 523, 528, 553
Hollingworth Clare, 532
Hongkong Standard, The, 532
Haque, Abdur, 575
Hoque, Doctor, 558
Hossain, Amjad. (M.C.A), 575
Huma Rights Commission, 1,2, 4-6, 7-11
Hussain, Delwar, 538
Hussain, Sirajuddin, 537
I
Imam, Mrs Aktar, 537
India, 2, 3, 9, 525-25, 554, 556
Indian Express, the, 537
Inhuman killings, 29
International Rescue Committee
Emergency Mission, 553-54
Iqbal Hall, 6, 521, 532
IRC, 554
Islam, Mian, Tajul, 5
Ittefaq, 537
J
Jagannath College, 528, 574
Jagannath Hall, 6, 532, 574
Jalpaiguri, 569
Jamat-e-Islam, 7, 531

Jatra Bari, 5
Jessore, 530-31, 545-46, 575
Jhikargacha, 545
Jinjira, 378
Jinjira Massacre, 378
Jogesh, Doctor, 10
K
Kabir, Mafijullah, 378
Kaiser, Shahidulla, 575
Karachi, 522, 527
Kari, Abdul, 1
Kari, Reazul, 1
Kellog, F.I, 553
Khadim, Ataur Rahman Khan, 573
Khair, Abul, (Dr.) 573
Khan, Fazlur Rahman (Dr.) 573
Khan, Sirajul Huq, 575
Khan, Tikka, 3, 530, 532-33
Khan, Yahya, 2, 524-25
Khulna, 530, 575
Koch Bihar, 569-70
Kumargat, 560
Kurmitola Army Cantonment, 529
Kustia, 575
L
Lakshipur, 7
Laldighi, 531
Lalmai, 4
Laurent, Michel, Associated press photographer, 521
Liberation force, 2
London, 522, 525, 532, 538
M
Mahmud, Altaf, 577
Mahe, Faizul, 573
Mahtabuddin, of Muslium League, 7,
Maijdee, 7
Malda, 565-66
Malibagh, 1, 6
Meghalaya, 553, 555, 559
Military Courts, 3
Mirzapur, 529
Mitra, Manojit, 551
Mogbazar, 5
Monaim, Mr. 530
Mosharraf, Khaled, Majar, 530
Mujib, Sheikh, 3, 521
Muktadir, M.A. 573,
Mukti Bahini, 537
Mukti Fouj, 7-8, 528, 530, 532, 545, 550-52
Murshidabad, 563-65
Murtaza, M. (Dr.) 575
Mustafa Ghulam, 575
Muslim Legaue 7
Mymensingh, 575
N
Nadia, 562
Narayanganj, 2, 9, 10
Narshingdi, 7, 11 (Bazar, 6, 11, College 11,)
Navaran, 549
Nayamati, 9, 10
New Market, 6, 524
New Yourk times, 534, 553-55
News Week Magazine (U.S.A) 540
Nizamuddin, (Journalist), 537-38
Non-Bengalees, 5, 6
Noakhali, 7, 550-51, 575
O
Osmani, Colonel, 524
P
Pak Forces, 7-8, 11
Pak Soldiers, 10
Pak Troops, 2-11
pakistan Army, 521-22, 549, 550, 554-56
Pakistan National Flag, 521-22
Pakistan National Oil Company, 2
Pakistan Troops, 7-8, 11
Pakistan Zindabad, 549
Pakistani Armed Killers, 4
Pakistani Troops, 1, 3, 4-5, 6-10, 545
Pasha, Anwar (Prof.) 538, 573
Peace Committee, 8, 531
P.I.A., 529
P.N.O. 2
Q
Qayyum, Prof., 575
Quaid-e-Azam High School at
Bijoypur, 3
Quddus, Ruhul, Secretary-General, 538
R
Rabbi, Dr. Fazle, 537, 575
Rahman, Habibur, 575
Rahman, Masihur (M.N.A.) 531, 575
Rahman, Shaikh Mujibur, 522, 530
Raihan, Zahir, 577
Raipura, 7
Rajshahi, 546, 575
Rajshahi, University, 575
Ramna, Racecourse, 524
Rangpur, 527, 530
Rawalpindi, 525
Razakars, 530-32, 538-39, 549
Razarbag, 5, 6
Razarbag Police Line, 6
Refugees, 524, 525, 528, 531, 545-46, 552-558
Russia, 525
S
Saber, Shahid, 575
Sabrum, 525, 551
Saha, Ranada Prasad, 577
Sahjahanpur, 10
Salimullah Hall (attack by the Pakistan Troops), 4-5
Samadder, Sree Sukha Ranjan, 575
Sarder, A.K. 575
Sarker, Nazrul Haque, 575

Serajgonj, 531
Shadullah, Abu Mohammad, 7
Shahid Minar, 6, 7
Samsuddin, (Dr.) 529
Sirajdhiga, 2
State Bank of Pakistan, 532
Syedpur, 531
Sylhet, 529, 551, 575
T
Talebm, Khandakar Abu, 575
Taltala, 2
TAngail, 577
Times, The (OLondon), 522, 538
Traitors, 3
Traitors, beharis, 3
Tripura, 10, 518, 550, 51, 552, 555, 559
Tularam College, 9
U
U.K. 533
U.S.A., 553
Ullah, M. Ahmed, (Advocate), 7-8
U.N.I., 549-50
United States, 540
Urdu, 1
U.S.A., 533
Uttar Pradesh, 559
W
West Bengal, 553, 556, 558-59
West Bengal Government, 558
West Pakistani Policement, 6
West Pakistani Raiders, 3
West Pakistani Soldiers, 552
West Pakistani Troops, 49, 525

নির্ঘন্ট

অ
অকথ্য অত্যাচার, ২০১-২০২, ৩৮০, ৪৬৭-৬৮
অগ্নিসংযোগ, ১৭, ১৯, ৩৭৭, ৩৯৪-৯৫, ৪০২, ৪২০, ৪৩৩, ৪৫২
অবাঙ্গালী দালাল, ১৫০
অমানুষিক অত্যাচার, ১৯৩, ২২৪, ৩১৫, ৩৯১, ৪২৮, ৪৬০
অসহযোগ আন্দোলন, ১৪৮, ৪৭২, ৪৭৯
অমৃতবাজার পত্রিকা, ৫৪৬
আ
আইউব, ৩৯০
আইনুদ্দিন (এম, এন, এ), ৭১
আইয়ুব আলী, (ক্যাপ্টেন), ৩৬৮
আউয়াল, আবদুল (এম, এন, এ), ৪১৩, ৪১৪
আওয়ামী লীগ, ১৭, ৬০, ৬৬, ৬৭, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮৫, ৯১, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১১৪, ১২৯, ১২৮, ১৩০, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৮, ১৬৮, ১৭৭, ১৮৪, ১৯৮, ২১১, ২১৪, ২৪২, ২৪৮, ২৬৪, ২৬৯, ২৮০, ২৮৮, ২৯৬, ৩০২, ৩০৬, ৩০৯, ৪০৫, ৪০৯, ৪১৫, ৪১৯, ৪৩৫, ৪৪৩, ৪৫১, ৪৫৮, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৯২, ৫৪৩
আকাশবাণী, ৩৫৩
আক্কাস, আজিজুর রহমান (পরিষদ সদস্য), ৩৯৮
আক্কেলপুর মিলিটারী ক্যাম্প, ১২৬
আখাউড়া, ৪০৭, ৪৬৩
আগরতলা, ৯৩, ৫৪৯,
আগরতলা মামলা, ৩৫৬,
আগরওয়ালা রামরিক, ১২৯
আচার্য্য, চিত্ত, ২৭৮-৭৯
আজাদ, আবুল কালাম ৫৪-৫৫
আজাদ, আবুল কালাম, (ডঃ) ৫১০-১১
আজাদ গোলাম রসুল ৫১১
আজিম, আনোয়ারুল ৪৫৬-৫৭
আতাহার লেফটেন্যান্ট ৩১৮, ৩২০
আতিক, কর্নেল, ২৪৯
আতিক, লেফটেন্যান্ট, ১২০
আনিছ, মেজর ২১৪
আনিস, অধ্যাপক, ১৪
আনিসুজ্জামান ডাঃ, ১৯০, ৪৬৫
আনোয়ার, খুরশীদ (মেজর), ২০১
আফজাল, মেজর, ১২৪
আবদুল লতিফ হল, ৪১৭
আমজান, আবুল (শহীদ), ৪৭৫
আরিচা-নগরবাড়ী, ৫২০
আলতাফ, লেফটেন্যান্ট, ১২৪
আল-বদর ৫৭, ৬০, ৭১, ১৯৬, ৩১০, ৪০৪, ৪১৬, ৪৩৩, ৪৫৩, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৭, ৫০৮, ৫১০, ৫১২
আলম-শামস ৩১২, ৪১৬
আলম, নুরুল, ২৭৭
আলম, ফখরুল (কর্নেল), ৩২০
আলম, বদরুল (ক্যাপ্টেন), ৩৬৮
আল্লাহ, ২৮৫, ২৯১, ৩১৬, ৩২০, ৩২১, ৩৩০, ৩৫১
আলী, আনছার, (মাওলানা), ৬০
আলী, জিনাত, ৩৩১-৩৩৪
আলী, ফরমান, ৩২৬
আলী, বেলায়েত (মেজর), ২০২

আলী, মসলন্দ, ৬৬
আলী, মোহাম্মদ আজহার, (ডঃ), ১৫
আশরাফ, আলী, ২৪২, ২৪৪
আশু, মোঃ আরশাদুজ্জামান, ৬৭, ৬৮
আশুগঞ্জ, ৩৯৮, ৪৫১
আহমদ, আবদুল করিম, ১৪১
আহমদ, কাজী সালেহ (ডঃ), ১২৪
আহমদ, গিয়াসউদ্দিন, ৫০৯-১০
আহমদ, জালাল (ডি, সি), ৫৪
আহমদ, নিজামুদ্দিন (সাংবাদিক), ৪৮২
আহমদ, বদরুন্নোসা, ৩২৫
আহমদ, শফি (মেজর), ৮০
আহমদ, সামসুদ্দিন (ডাঃ), ৪৭৯
আহমদ, সালেহ (অধ্যাপক), ৭৪
আহসান, সৈয়দ আলী, ৪৬৫
আয়ুব (রাজাকার), ১১৭-১১৮
আয়ুবী আমল, ২৬৫

ই

ইউ, ও, টি, সি, ৩৪৮, ৪৮০
ইউছুফ আ, ন, ম (জেলা প্রশাসক), ৫০
ইউনুস, মেজর, ৯৫
ইউ, পি, আই ২০৬, ৪৮২
ইকবাল হল, ১২, ৩২, ৩৩১-৩৩৪, ৩৫৫, ৪৮৬
ইখতেখার, মেজর, ৪০৩, ৪০৪
ইদ্রিস, (প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ঢাকা পৌরসভা, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪০)
ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮
ইণ্ডিয়া, ৭২, ১৪৬-১৪৭
ইন্দিরা রোড, ৩২
ইব্রাহিম, ডাঃ, ২৭৭
ইমাম, লেঃ, ৩৬৭-৩৬৮
ইমামুজ্জামান সেঃ লেঃ, ৩৬৬
ইলিকট্রিক শক, ২০২
ইলিয়াস, ক্যাপ্টেন, ৬৭
ইসমাইল, অধ্যাপক, ৫০৩
ইসলাম, আনোয়ারুল (মেজর), ৩৬৭-৩৬৮
ইসলাম, নুরুল (ক্যাপ্টেন), ৩৬৮
ইসলাম, নুরুল (রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি), ৮৪
ইসলাম, মেজর, ৪৯৮
ইসলাম, মোঃ শহিদুল (এডভোকেট), ১৯৭, ১৯৯
ইসলাম, রফিকুল, ১৫০-১৫১
ইয়াকুব, লে. কর্নেল, ৩৬৭
ইয়াহিয়া, ৩৬৩, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯৬, ৪৪৫-৪৪৬, ৪৫১, ৪৫৮, ৪৬৩, ৪৬৮, ৪৭৪, ৪৮৯,
ইয়াহিয়া বাহিনী, ৩৬২, ৩৬৫, ৩৬৬, ৪০৭, ৪৭৫
ইয়াহিয়া, মেজর, ২৬৪

ঈ

ঈদু, ৩৮৪
ঈশ্বরদী, ১৭৮-১৮২, ৪৫৮
ঈশ্বরদী বিমান বন্দর, ১৭২

উ

উর্দু, ২৪২-২৪৩, ২৮৫, ৩০৬, ৩১৬, ৩২৬-৩২৭, ৩৩০, ৩৫৪, ৫০৫, ৫০৯
উল্লা, নূরুল (ডঃ). ৩৩৯-৪৩
উল্লাপাড়া, ১৬৪-১৭৭
উল্লাপাড়া ক্যান্টনমেন্ট, ১৭৭
উল্লাহ, আমান, ৩০৩
উল্লাহ, শাহ মুহম্মদ জাফর, ৮৪
উজির, ২৩৯
উদ্দিন, সাহাব, (ক্যাপ্টেন) ১৭৭

এ

এজাজ, ক্যাপ্টেন, ২৪২-২৪৬, ২৬৮
এ, পি, এ, ৪৮২
এমরান, মোঃ আল, ৯৮
এলিফ্যান্ট রোড, ৩২৯
এসবাহাতুন, মোছাম্মৎ, ১৬১
এসেম্বলী, বিল্ডিং, ৩৩৯

ও

ওসমানী, কর্ণেল, ১৭২
ওয়াইজ ঘাট, ৩৫
ওয়াদুদ, আঃ, ২২
ওয়ারী, ৩৫, ৩৯
ওয়াহিদ, আবদুল (রাজশাহী), ৬৭, ৭৩-৭৪

ক

কর্ণফুলি নদী, ২৭৯
কণক, ২৬৮, ২৬৯
কমলাপুর, ২৬
করিম, অধ্যাপক, ২৬৮
করিমুল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার, ৪৭০
কলকাতা, ৩৫৩, ৪৪৩, ৫০৫, ৫১২, ৫৪৭
কলাবাগান, ৩২
কল্যাণপুর, ২৩১
কাইয়ুম, মীর আব্দুল, ৪০৮
কাউখালী রেল স্টেশন, ২৫১
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ১৭
কাটাবন বস্তি, ৩৩৫
কাঁঠাল বাগান, ৩২

কাঁঠালিয়া থানা, ২৫০
কামরুজ্জামান, ৪২২
কামরুজ্জামান, মেজর, ১৪৩
কামাল, আবু হেনা মোস্তফা, (ডঃ) ৪০৮, ৪১৭, ৪১৮
কারফিউ, কার্ফু, ১৪, ১৫, ২৯, ৩৩, ৭৮, ৯১, ১৩৬, ৩৮১, ৪১৬, ৪৩১, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৯, ৫১১, ৫১২
কায়সার, শহীদুল্লাহ, ৫০৭-৫০৮
কালিগঞ্জ থানা, ১৫২
কালিঘাট, ৯৩
কালীবাড়ী, (রমনা), ৩৬, ৩৯, ৪১, ৪২২
কালুরঘাট, ২৮১
কাশেম, ডাঃ, ৫৪, ৫৫, ১২৬
কিশোরগঞ্জ, ৫৭, ৩৪৮, ৪০৩-৪০৪
কুঠিবাড়ী ক্যান্টনমেন্ট, ১৫১
কুণ্ডু শ্রী তারাপদ, ১৬৯
কুমারখালী থানা কাউন্সিল, ২৩১, ২৩৩-২৩৫
কুমারখালী থানা ডাক বাংলো, ২৩১, ২৩৩, ২৩২
কুমারখালী মুজাহিদ ক্যাম্প, ২৩৩
কুমারখালী রাজাকার ক্যাম্প, ২৩২
কুলাউড়া পুল, ৩১৭
কুলাউড়া বাগান, ৩১৭
কুমিল্লা, ৯৩, ৩২১, ৩৭০, ৪০৭,৪১৩, ৪১৫, ৪৩৩, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯
কুমিল্লা জেল, ২২৭, ২৩৬
কুমিল্লা জেলা বোর্ড, ২২৬
কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল, ২২৬, ২৩০
কুড়িগ্রাম, ১৩৯
কুড়িয়ানা আটঘর পেয়ারা বাগান, ২৫০
কেরানীগঞ্জ, ৩৭৬, ৩৭৭
কেলুগড়া, ২২৭
কেশবপুর, ২২০
''ক্যাপটেন জিয়া'', ২৪৫-২৪৬
কোচবিহার, ৫৪৮
কোর্টহাউজ স্ট্রিট, ৩১
কোতোয়ালী থানা, ২২, ২৪, ১৪৩
কোরআন, ৩০৭, ৩৩০, ৩৪৮
কোরাইশী, ডঃ, ৪৬৫

খ

খন্দকার, এ, কে, (গ্রুপ ক্যাপ্টেন), ৫২০
খাঁ, টিক্কা, ৫৫, ২১০
খাঁ, বোস্তাম, ২০, ২৪
খান, আবুল হোসেন (সুবেদার), ২১
খান, আরবীর (ব্রিগেডিয়ার), ৩৫৫
খান, ইয়াহিয়া, ১২৩, ২৩৯, ২৪১, ৩২৬, ৩৩০, ৩৫৯
খান, পশু, ১১৪
খান, শাহ মনসুর আলী, ১০৮
খান, সদর উদ্দিন আগা (মেজর), ২০১
খান, সিরাজুল হক, (ডঃ), ৫০৩, ৫০৪
খান সেনা, ১৮, ৮৩, ৮৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮-১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১২৮, ১৬৫, ১৩৪, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩-১৪৭, ১৫০, ১৫৫-১৫৬, ১৭০-১৭১, ১৮৪-৮৫, ১১২-১১৪, ২৩৮, ২৪৪, ২৬৪, ২৬৫-২৬৭, ২৬৯, ৩৩০, ৩৪৩, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৯১, ৪১১, ৪২১, ৪২৪, ৪৩২, ৪৪২, ৪৪৮, ৪৮৩-৪৮৪, ৪৯৪, ৫১২, ৫২০
খান, হালিম (অধ্যাপক), ৪৮৯, ৪৯১
খালিশপুর, ১৯৩
খালেক (ও,সি), ৪৭২-৪৭৩
খালেক (ক্যাপ্টেন), ১৬৫
খালেক (মেজর), ৩৬৮
খায়ের, আবুল (ডঃ), ৫০৪
খুরশীদ, ওমর (মেজর), ২০৩
খুলনা, ১৮৪, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২৪৩, ৩২৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৯, ৫৪৪
খোরশেদ, মেজর, ১৮৯, ১৯৪

গ

গণভবন, ৪৮৫
গণসমাধি, ৪৬৬
গণহত্যা, ৩০, ১১১, ২১৫, ২২১, ৩৬২, ৩৮৬, ৩৯৭, ৪০৩, ৪০৭, ৪৩২, ৪৩৪, ৫৫২, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭৪, ৪৭৯, ৫৪১
গাইবান্ধা, ১৪০, ৩৯১, ৪২৪, ৪৩৭, ৪৪৯
গাজীপুর, ৪৭০
গাজীপুর অস্ত্রাগার, ৩১১
গাবতলী, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১২০
গাড়াদহ খেয়াঘাট ১৬৩
গুনাগরী ক্যাম্প, ২৮৫, ২৮৬
গুলজার, কর্নেল, ১৮৫, ১৮৬
গুলশান, ২৯৩
গুহ, পরিমল, ৩৩৫, ৩৩৬-৩৩৯
গেণ্ডারিয়া, ১২
গেরিলা, ২৮১
গোপন বেতার, ৩২৯
গোমদন্ডী রেলওয়ে স্টেশন, ২৮০, ২৮১
গোয়াল নগর, ১৯, ৩১, ৩৮
গোয়ালন্দ ঘাট, ৫০
গৌরনদী, ২৩৯
গৌরনদী থানা, ২৫১

ঘ
ঘাসখালী অপারেশন, ২৩৩
ঘাটিনা ব্রীজ, ১৬৩
ঘোড়ামারা, ৬৭, ৭০, ৭৩
ঘোড়াশাল, ৪৭, ৪৮, ৪৯

চ
চট্টগ্রাম, ৯৩, ২২১, ২২২, ২৭৯, ৩৮১, ৩৯৬, ৪৩২, ৪৬৫, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৯৮
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট, ৩০৭, ৪৩২
চট্টলা, ২৭০
চন্দ্রগঞ্জ ২৯৮
চন্দ্রগঞ্জ বাজার, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০
চন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুল, ২৯৭-৩০০
চরফ্যাশন ২৬৭
চরভবানীপুর, ২৩৫
চাঁদপুর, ২৬৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৬৭, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮
চাম্বল ক্যাম্প, ২৮৫
চিরিরবন্দর ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮
চৌধুরী, আলীম (ডাঃ) ৫০৫-৫০৭
চৌধুরী, ইমাদ আহমেদ (পুলিশ সুপার), ২২, ২৭, ২৯
চৌধুরী মিজানুর রহমান, ৪৩৩
চৌধুরী মুনীর (অধ্যাপক), ৫০০, ৫০১
চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার, ৫০১
চৌধুরী মোহাম্মদ নূর, ৪৭
চৌধুরী, যতীন্দ্র মোহন, ২৭১
চৌধুরী লুৎফুল হায়দার ৫০১-৫০২
চৌমুহনী বাজার, ২৯১, ২৯৩, ২৯৮

ছ
ছয় দফা, ৪৬৯
ছাত্র ইউনিয়ন, ২৬৫
ছাত্রলীগ, ১৯৮, ২১৪

জ
জগন্নাথ কলেজ, ১৭, ২৪, ৫১০
জগন্নাথপুর, ৩১৪
জগন্নাথ হল, ১৪, ১৮, ৩২
জবাই, ১৯৬, ২১৪, ৩৮০, ৩৯৪, ৪২৯, ৪৪৯
জল্লাদ বাহিনী, ৪১৭, ৪১৯
জলাবাড়ী ক্যাম্প, ২৫৪
জয়দেব, ১৭৭
জয়দেবপুর, ৫০
জয় পাকিস্তান, ২৫৪
জয়বাংলা, ২৪, ২৬, ২৮, ৬০, ৬৭, ১৩০, ১৪৬, ১৯৮, ২৫৪, ২৫৬, ৩৪৭, ৪৩৫, ৫১৬
জয়পুর ক্যাম্প, ১২৬
জয়পুর রেলস্টেশন, ১১১
জয়পুরহাট, ১০৬, ১২৫
জাকি, মেজর, ১০০
জাতীয় মিলিসিয়া, ২২৬, ২২৯, ৩১২
জাফর, ক্যাপ্টেন, ৬৭
জাভেদ, মেজর, ১৩৭
জামাতে ইসলামী, ৫৭, ৭১, ৮৪, ২১৪, ২৩২, ২৮৭, ২৯৪, ৪৫০, ৫১২
জামাল, মুহিদুল (মেজর), ৪৯৮
জামালপুর, ৬০, ৬৪
জামুর্কী, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯
জাহাঙ্গীর, ডাঃ নুরুল আবসার (লেঃ কর্নেল), ৪৯৭-৪৯৮
জাহাঙ্গীর, লেঃ কর্ণেল, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭১, ৪৯৮
জিকরুল হক, (এম, এন, এ) ৪৬৬,
জিঞ্জিরা, ৩৫৫, ৩৫৮
জিন্দাবাহার, ১৯
জিন্নাহ হল, ৪১৭
জিয়া, বেগম খালেদা ৩৮১, ৩৮৩
জিয়া, মেজর, ৩৮১, ৩৮২, ৫১৯
জুলুঘাট স্কুল ক্যাম্প, ২৫২
জোহা হল, ৬৭, ৭২, ৭২, ৭৮, ৪০৮, ৪১৭, ৪১৮

ঝ
ঝালকাঠি ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ৩৫৫, ২৫৮, ২৬০, ২৬২, ৩৯৭
ঝালকাঠি মিলিটারী ক্যাম্প, ২৫৯
ঝালকাঠি থানা ২৬১
ঝিকরগাছা ২০৭, ২২৪
ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ৪৮৯, ৪৯১

ট
টয়েনবী সার্কুলার রোড, ৩২৫
টাঙ্গাইল, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬০
টিক্কা খান, ৩২৭, ৩৩০, ৪১৯
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, (অধ্যাপক), ১৮
ঠাকুরগাঁ ৪৮, ৪১১, ৪১২, ৪২১
ঠাকুরতা, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ, ১২, ১৪, ১৮, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১
ঠাকুরতা, বাসন্তীরাণী গুহ, ১২, ১৪, ১৬
ঠাটারীবাজার, ২৪

ড
ডবলমুরিং থানা, ২৮৭
ডি, আই, টি, ৩২৫

ডোম, চুন্নু, ৩৬, ৩৭
ডোম, ছোটন, ৩৮, ৪০
ডোম, পরদেশী, ৩১, ৩৪, ৪০, ৪১
ডোম, বাদলু, ৩৫, ৩৬, ৩৯

ঢ

ঢাকা, ১২, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৮, ৫৪, ২৪২, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩০, ৩৩২, ৩৪৪, ৩৫৩, ৩৬৩, ৩৮০, ৩৮১, ৪২২, ৪৩৬, ৪৪৩, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৮৭, ৪৯৯, ৫১০, ৫১২, ৫১৯, ৫২০
ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ৩২৬
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ৫০, ৫২০
ঢাকা জজকোর্ট, ২৪, ৩০
ঢাকা টাইমস, ৪৮৮
ঢাকা নিউ মার্কেট, ৩২৬
ঢাকা পুলিশ কন্ট্রোল রুম, ৩৩
ঢাকা প্রেসিডেন্ট হাউজ, ৩২৬, ৩৫৫
ঢাকা পৌরসভা, ২৩, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১
ঢাকা বিমান বন্দর, ৩২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩২, ৪১, ১২৯, ২৩৯, ২৪৯, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪৩-৪৪, ৩৫৫, ৩৫৮, ৪৯৫, ৫০২, ৫১০, ৫১২
ঢাকা বেতার, ৩২৬-২৭
ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতাল, ৩০-৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৪, ১৮, ১৯, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৫২, ৫১২
ঢাকা রেডিও, ১২, ৪৮৮
ঢাকা সেনানিবাস, ২১, ২৪, ২৬, ৩০, ৩৩, ৫০, ১৭২
ঢাকা স্টেডিয়াম, ৩২, ৩৭
ঢাকা হল, ৩২, ৩৬, ৩৭

ত

তাজউদ্দিন (প্রধানমন্ত্রী), ৫২০
তাজ, কর্নেল, ৩৫৫
তাঁতীবাজার, ১৭, ১৯, ৩১
তাণ্ডবলীলা, ৪৪৯
তালুকদার ফজলুল করিম, ১৬৭
তালুকদার, শামসুদ্দিন, ২৪৬
তালুকদার, শামসুল হক, ৫১৭
তালেব, আবু, ৪৭, ৪৮
তুর্কে, লেফটেন্যান্ট, ৩৬৮
তেজগাঁও, ২৯, ৩২
তোফায়েল, লেঃ কর্নেল, ১৮৯

দ

দত্ত, শ্রীবিনয় কৃষ্ণ, ২১২, ২১৩
দত্ত, শ্রী মনোরঞ্জন, ৬৪, ৬৫
দাস, কামিনী কুমার (সি, ও), ৫২
দাস, নীলিমা রাণী, ১৮৩
দাস, সুরেশ, ৩৩৭, ৩৩৮
দিনাজপুর ৪৮, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৮, ১৫৯, ৩৯৯, ৪২০, ৪২১, ৪৭৭
দিপালী, তাহমীনা বেগম, ১৯৫, ১৯৬
দীনেশ বাবু, ৩৯৩, ৪০১
দে, মধুসূদন ৪৯৫
দেব, গোবিন্দ্র চন্দ্র, ৩৪৩, ৩৪৮
দেবনাথ মতিলাল, ২৫৩
দেবনাথ, হিরালাল, ২৫৩
দেবী, শ্রীমতি সাবিতা, ১৫৭
দুর্গাপুর, ৮৯, ৯০, ২৩৩
দুর্গাপুর মুজাহিদ ক্যাম্প, ২৩৩
দুররানী, ব্রিগেডিয়ার, ৪৯০
দৈনিক আজাদ, ৩৯৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫০৮, ৫০৯
দৈনিক পাকিস্তান, ৩২৫
দৈনিক বাংলা, ৯৫, ৯৬, ৩৭০, ৪০৩, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৬
দৈনিক মিল্লাত, ৪৮২
দৈনিক সংগ্রাম, ৩৩৩
দৈহিক পীড়ন, ১৯২, ২১৫
দৌলতপুর থানা, ১৮৪
ধলেশ্বরী নদী, ৩৫২
ধর্ষণ, ১৬, ২০, ২৫, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০-৪১, ৪২, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৭১, ৭৬, ৭৮, ৮৩, ৮৫, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০৮, ১১৫, ১২৯, ১৩১, ১৫৬, ১১৭, ২০২, ২২০, ৩৯৪, ৪০২, ৪২০, ৪২১, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৭৪, ৪৯৩
ধর্ষিতা, ২০২, ২৩১, ২৪৮, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৮, ২৭৪, ২৭১, ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯, ৩১২, ৩১৪, ৩১৭, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩৩০, ৩৭৭, ৪১৫
ধানমণ্ডি, ১৪, ৩২, ৩৩৯-৪০, ৩৮১, ৩৮২, ৪৯৯
ধামরাই, ৪০০

ন
নওগাঁ, ৬৯, ৯১, ৯২, ৪৪১
নওয়াপাড়া, ২১৬
নওয়াবগঞ্জ, ৩৯
নওয়াবপুর, ১৭, ২৩
নক্সাল, ২৫৬
নজরুল, ২৩৯
নরমেধযজ্ঞ, ৪০৩, ৪১৫, ৪৩০, ৪৩৯
নরহত্যা, ৩৬৮, ৩৭৯, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪২০, ৪৪৬, ৪৫২, ৪৬০
নড়াইল, ২১০
নয়াবাজার, ৩০
নাটোর, ৭০, ৭৪, ৮১, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৪০৯, ৪৫৬, ৪৫৭
নাটোর সামরিক জেল, ১২৩, ১২৪
নাথ জি, কে (অধ্যাপক), ১৮
নাথ, রেবারাণী, ১৯২, ১১২
নারকীয় হত্যালীলা, ৩৬৬
নারায়ণগঞ্জ, ৩৭৩, ৩৭৪, ৪৮৭
নারিন্দা, ৩৪
নারী নির্যাতন, ১১৯, ৩৭৯, ৩৯৪, ৪০২, ৪১০, ৪৩৪
নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র, ১৯২
নাসিম, ডি, এস, পি ৬৭, ৭২
নিধনযজ্ঞ, ৪৩২, ৪৪৮
নিলফামারী, ১৩৭
নিয়াজী, ৩৭০
নিজামে ইসলাম, ৫৭
নূর, মোহাম্মদ আবু, ৪৫, ৪৬
নুরুজ্জামান কর্নেল, (৬ নং সেক্টর কমাণ্ডার), ৫২০
নুরুজ্জামান এম, পি, ৫৪
নুরুন্নবী কাজী (ছাত্রনেতা), ৪৭৫
নোয়াখালী, ৩২৪
প
পটিয়া, ২৭৬, ২৮০, ২৮১
পটুয়াখালী, ২৪৫, ২৬৮, ২৬৯, ৩৯৮, ৪৪৭
পদ্মানদী, ২২৯
পঞ্চম (সুইপার সুপারভাইজার), ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯
পল্টন, ৩৫৬
পশ্চিমা জল্লাদ, ৬৪
পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী, ১৮০
পাকজল্লাদ, ৯৬, ২৪৮
পাক দালাল, ১২০, ৩৬৬, ৩৯৮
পাক পশু, ১৯, ৯৪, ১৪৩, ৪০২
পাক ফৌজ, ৫৭, ৬৪, ১১০, ১১১,
পাক বর্বর, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৯১, ৯২, ৯৯, ১১৫, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৬০ ১৬৭, ১৬৯, ১৭৫, ৩৭৬
পাক বাহিনী, ৪৭, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭১, ৮৮, ৯৮, ১০১, ১২১, ১২২, ১২৪, ১৪৯, ১৫৬, ১৬১, ১৬৩, ১৭৩ ১৭৫, ২০১, ২০৯, ২১৭, ২২০, ২২১ ২৩১, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০ ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৫১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬-৩০০, ৩০৩-৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩১১-৩১৫, ৩১৭-৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩১-৩৩৩, ৩৩৪, ৩৮৭, ৪০৭, ৪০৯, ৪৩৩, ৪৩৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৬৫, ৪৮৯, ৫১৪
পাক সেনা, ১২, ১৩-১৪, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৭০, ৭১, ৭৯, ৮৪, ৯০, ৯১, ১০০, ১১১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২০২, ২১০, ২১২, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২১৯-২১, ২২৪, ৪০০, ৪১৮, ৫০৭, ৪২৭, ৪৭৭, ৫১৭
পাক হানাদার বাহিনী ২৮, ৫২, ৫৭, ১১৬, ১৫৩, ১৩৯, ১৬৬
পাকিস্তান জাতীয় সঙ্গীত ১০৯
পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ১৪৬, ১৫৬, ১৬৭, ২০০
পাকিস্তানী দালাল, ১২০, ৩৬৬, ৩৯৮
পাকস্তানী পতাকা, ১৭, ৯৯, ১২০, ১৪১, ৪৭৫
পাকিস্তানী বাহিনী, ১২০, ৩৬৬
পাকিস্তানী সৈন্য, ৮৬, ১০৯, ১১৫
পাঁচবিবি, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৫
পাঞ্জাবী পুলিশ, ৪৫, ৯৫, ১১৮
পাঞ্জাবী বাহিনী, ৯৫, ২৫৫
পাঞ্জাবী সেনা, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ৩৬, ৪২-৪৪, ১০৯, ১২১
পাবনা, ১০৩, ১৫২, ১৫৩-১৫৬, ১৬০-১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ৪৫৮, ৪৬৮, ৫১৯, ৫২০
পাবনা জেলা, ১৮০
পার্বতীপুর, ১৫০, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯
পাশবিক অত্যাচার, ২১, ২৪, ২৮-২৯, ৩২, ৪২-৪৪, ৪৫-৪৬, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩-৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৭-৮৮, ৯০-৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৭-৯৮,

১০০, ১০৫, ১৪৪, ১৫৬, ১৬১, ১৬২, ১৭৬-৭৭, ১৭৯-৮১, ১৮৪-১৮৬, ১৮৭-১৯০, ১৯১-১৯২, ১৯৩-১৯৭, ২০১-২০২, ২১০-২১১, ২১২-২১৪, ২১৫, ২১৮-২২৪, ২২৫, ২৮০, ২৮১, ২৮৪, ২৮৬, ২৯০-২৯১, ২৯৩, ২৯৫-২৯৬, ২৯৮-৩০২, ৩০৫-৩০৬, ৩০৯-৩১২, ৩১৬-৩১৭, ৩১৯-৩২০, ৩২৩, ৩৩০, ৩৭৭, ৩৮৫, ৪০২, ৪১৩, ৪১৭-৪১৮, ৪৫১, ৪৬০, ৪৭২
পাশা, আনোয়ার অধ্যাপক, ৫০২, ৫০৩
পিটিয়ে হত্যা, ১৯৯, ২২১
পি, ডি, পি, ৫৭
পিরোজপুর, ২৪০, ২৪৪-২৪৯, ৩৯৮
পিলখানা, ৩২, ৩৪, ৩৬২, ৩৬৫
পুরানা পল্টন, ৩২৮, ৩৬২
পুড়িয়ে হত্যা, ১৯৫, ২১৯
পূর্বদেশ, ৩২৫, ৩২৭, ৩৯৮
প্রেসক্লাব, ৩২৮, ৩৫৯-৩৬৫

ফ

ফকির রজব আলী (শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান), ১৯৫
ফরিদপুর, ৫০, ৩৫৮
ফরিদ, শাহ মোহাম্মদ (ডি, সি), ৫০
ফাদার অনিল, ৮৭-৮৮
ফারুক, লেফটেন্যান্ট, ৩৬৮, ৪৯৮
ফুলবাড়িয়া, ৩২৩
ফুলবাড়িয়া পাক সৈন্যশিবির, ৩২২
ফেণী, ২৯০, ৩০৪
ফেরদৌস, আঃ হক, ৬০

ব

বক্স, এলাহী, ৯৯, ১০০
বকসিবাজার, ৩৪৮
বগুড়া, ৯৯-১২১, ১২৪, ১২৭, ১৬৩, ৪২৬-৪২৮, ৪৩৮, ৪৫৩
বগুড়া সেন্ট্রাল জেল, ১১৮, ১২৩
বগুড়া পুলিশ লাইন, ১০৩
বদর বাহিনী, ৩৩৩, ৪৩৩, ৫১১
বনগ্রাম, ৩৪
বনপাড়া মিশন, ৮৭
বধ্যভূমি, ৯৯, ২৫৫, ২৫৯, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯১-৩৯৪, ৩৯৬, ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৫৪-৫৫, ৪৬৩, ৪৯৮, ৫১১, ৫২০
বর্বর পাক সেনা, ১২, ৩৯৯, ৪১৭, ৪৩১
বরিশাল, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৫-৪৬, ২৬৫-২৬৭, ৩৪৮
বরিশাল, আওয়ামী লীগ, ২৩৮
বরিশাল, জেলা শান্তি কমিটি, ২৬৬
বলেশ্বর নদী, ২৪১, ২৪৬
বশীর, ব্রিগেডিয়ার, ৩৭৭
বশীর, মেজর, ১২৯
বসাক, শ্রী পুর্নচন্দ্র, ১৭, ১৯
বড়গুনা, ২৪৫, ২৬৮, ২৬৯
বড়গুনা, শান্তি কমিটি, ২৬৯
বঙ্গবন্ধু, ৯৩, ২২৪, ৩২০, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৯-৩৪০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৪০৯, ৪২৮, ৪৬৭
বক্ষ পুত্র, ৬৫
বাগমারা, ৮৪, ৮৫
বাগুয়ান, ২৩৯
বাগেরহাট, ২৫৬,
বাঘাবাড়ী, ১৬৩
‘বাঙ্গালী চোষা, ১০১
বাঙ্গালী জোয়ান, ৩৯
বাঙ্গালী দালাল, ৭৮
বাঙ্গালী রাজাকার, ২৯
বাদামতলী ঘাট, ২৩, ৩৪, ৪১
বান্দরবান, ২৭২
বাবর, মেজর, ১৯৩
বাবু, ধীরেন, ৬৪, ৬৫
বাবুপুরা ফাঁড়ি, ১৮
বাবু, যোগেশচন্দ্র (প্রফেসর), ৩২
বারী, ডঃ (অধ্যাপক), ৪৬৮
বালুরঘাট, ২৮১
বাঁশখালী, ২৭৭, ২৭৯, ২৮৫, ২৮৬
বাসস, ৪০৭
বাসাবো, ৩১, ৩৭
বাসার, হাবিবুর, ৫১১
বায়তুল মোকাররম, ৩২৮
বাংলা, ২৮২, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৬, ৩৫১, ৩৫৬
বাংলাবাজার, ৩৪, ৪০
বাংলার মুক্তি সংগ্রাম, ২৯
বাংলাদেশ, ২১, ৩৯, ৬৭, ৭২, ১০০, ২২৬, ২১৩, ২১৪, ২২৮, ২৬০, ২৬৭, ২৬৮, ৩১০, ৩১১, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৫৯, ৩৯৩, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৭, ৪০৯, ৪১৭, ৪১৯, ৪২০, ৪৫১, ৪৬৯, ৪৯৮, ৫১১, ৫১৬, ৫৪৭, ৫৪৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩৫৩
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৩৯-৩৪০
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ২৭
বাংলাদেশের পতাকা, ৬৭, ৯১, ৩৫৪
বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ৪৮২

বাহরামপুর, ২৩৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৯৩, ৩১৮, ৩২৪, ৩৯২
বি, আর, পি, হেড কোয়ার্টার, ২০, ২১, ২২
বি, এস, এস, ৪০৭, ৪১৮
বি, পি, আই, ৪৮২
বি, বি, সি, ৩২৯, ৪৮২
বিমান আক্রমণ, ১১২
বিমান মহড়া, ৭৮
বিয়ানী বাজার, ৩১৫
বিজ্ঞান গবেষণাগার, ৩২৯
বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি, ২৬৪
বিহারী, ১৯, ২৪, ২৫, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৬, ৯১, ৯৪, ১০১, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৪৩, ১৪৯, ১৫০, ১৬৮, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৯০, ১৯৩, ১৯৪, ২০০, ২১৭, ২৩১, ২২৫, ২২৬, ২৩০
বিহারী রাজাকার, ২৯
বীর শহীদ, ১৮, ১৯
বীভৎস পৈশাচিকতা, ৪২, ৪১৭
বুলবুল, মোঃ নজরুল ইসলাম, ১৬৩
বুড়িগঙ্গা নদী, ১৯, ২২, ২৩, ৩২, ৩৪, ৩৯
বেগম, আছিয়া (আঃ লীগ কর্মী), ২৭৭
বেগম, হাসিনা, ১৫২
বেগমগঞ্জ শিবির, ৩০১
বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৯৩, ১২৮, ১২৯, ১৩৭
বোয়ানেট চার্জ, ২৩, ১৭৭, ২০৮, ২০৯, ২১৩, ২১৪, ২১৯, ২৪১, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০, ২৫৩, ৪৪৫, ৪৫০, ৪৯৩
বৃটিশ আমল, ২৩৫
বৃটিশ সাংবাদিক, ৩৩০-৩১
বৃটিশ হাই কমিশন, ঢাকা, ৩৩১
ভট্টাচার্য, অনুদ্বেপায়ন, (অধ্যাপক), ৩৩৯
ভট্টাচার্য, সন্তোষ, (প্রফেসর), ৩৩৬, ৫০৪, ৫০৫
ভদ্র কাজল কুমার (ছাত্র), ৪৬৭
ভয়েস অব আমেরিকা, ১২
ভারত, ২০৮, ২২৮, ২৩০, ২৩৭, ২৬৭, ২৭২, ২৭৯, ২৮৩, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৮, ৩১০, ৩১২, ৩১৮, ৩২৩, ৩৯০, ৫১৬, ৫৪৪
ভারতের দালাল, ১০৯, ১১০
ভারতীয় সৈন্য, ১৪৬
ভারতেশ্বরী হোমস, ৪০৫
ভোলা, ২৬৪-২৬৫, ৪৪৫
ভোলা, ওয়াপদা কলোনী সেনানিবাস, ২৬৪, ২৬৫
ভোলা, খেয়াঘাট, ২৬৪, ২৬৭
ভোলা, শান্তি কমিটি, ২৬৪, ২৬৫
ভুট্টো, ৩২৬, ৩৩০
ভুরুঙ্গামারী, ১৩৪, ১৩৫
ভৈরব, ৫৭, ৬৫, ৪৫১
ভৈরব থানা, ৬৬
ভৈরব ব্রীজ, ৩২০

ম

মইনুদ্দীন চৌধুরী, ৫১২
মকবুল, ক্যাপ্টেন, ৩৬৮, ৩৭১
মজিদ, আব্দুল, ১৮৭
মতিগঞ্জ শিবির, ৩১২
মতিন, এ, টি, এম (প্রাক্তন স্পীকার), ৫০৫
মধুদা, ৪৯৫, ৪৯৬
মধুপুর, ৬০
মনরঞ্জন ঘোষ পরিবার, ৩১৫
মনিরামপুর, ২২১, ২২৩, ২২৪
মনিরুজ্জামান, মিসেস, ১৩, ১৪
মনিরুজ্জামান ডঃ, ১৩, ৫১২
মণ্ডল, অনিল কুমার, ২১৮, ২১৯
মণ্ডল, গোলাম মোস্তফা, ১২৫, ১২৬
মণ্ডল, ছমির উদ্দিন, ১১৭, ১১৮
মণ্ডল, ফকির মাসুদ, ১১৭, ১১৮
মণ্ডল, মোঃ আজাদুর, ১০৯, ১১০
মণ্ডল, শ্রী পরেশ চন্দ্র (অধ্যাপক), ১৮
মণ্ডল, ক্ষিতিশ (ডাঃ), ২৪২
মল্লিক, এ, আর, (ডঃ) ৪৬৫
মহসিন হল, ৩২৯
মহী ডঃ ফয়জুল, ৫১২
মহেশপুর, ২১৫
ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট, ৩৩৬, ৩৭১
ময়মনসিংহ, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৪৪৮
মাইজদি, ২৯১, ২৯৩, ২৯৬, ৩০১, ৩০২
মাইন, ১১৭, ১১৮
মান্নান, আবদুল, ৪৫৩
মান্নান, আব্দুল (মাওলানা), ৫০৫, ৫০৬
মানিকগঞ্জ, ৪৪৪
!মাপানি জনপথ, ১১৭
মালতীনগর, ১০১, ১০৪
মালাউন, ২৬, ২৮, ৫৮, ১২৫, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৭, ২৩৪, ১৭৬, ২৩৫, ২৩৭
মালিক, লেঃ কর্নেল, ৩৬৭
মালিক, ডাক্তার, ২৩৬
মালিবাগ, ৩০, ৩১

মালেক, ডঃ (পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর), ১৪
মার্শাল ল কোর্ট, ১৯৪
মাষ্টার, ইলিয়াস, ২৬৬
মিত্র বাহিনী, ২১, ২৯, ৪৪, ১০০, ১১১, ১১৪, ১৩২, ২৬৪, ৩৯২, ৪১৩, ৪৬২
মিন্টু রোড, ৩৭
মিটফোর্ড হাসপাতাল, ৩৪৮, ৫০৬
মিঠা, জেনারেল, ৩৫৯
মির্জাপুর, ৫৮, ৫৯, ১৯৬, ৪১৯
মিলব্যারাক, ৪০, ৪১
মিলব্যারাক পুলিশ লাইন, ২২, ২৭
মিলিটারী, অপারেশন, ১৫৩
মিলিটারী ক্যাম্প, ৪৯, ৬৪, ১৬৬, ২১৫
মিয়া, আব্দুল কুদ্দুস (ইন্সপেক্টর অব পুলিশ), ২০, ২১
মিয়া, আব্দুস সাত্তার, ২৪১
মিয়া, মানিক, ২২১
মিয়া, মোহাম্মদ ইসমাইল, ৪৯২-৪৯৪
মিয়া, সালু (রাজশাহী), ৭২
মিয়া, হাফিজউদ্দিন (আঃ লীগ নেতা), ৬৬
মীরপুর, ৩৩, ২২৭, ৩২৯
মীরপুর থানা শান্তি কমিটি, ২২৭
মুক্তিফৌজ, ৫৬, ৬০, ৭০, ৯৫, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১৩৪, ১৫০, ১৫৫, ২০৪, ২১৮, ২২৪, ২৩৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৯, ২৬২, ২৯৪, ৩৯১, ৪৫০
মুক্তিবাহিনী, ২১, ২৪, ২৯, ৪৪, ৪৭, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৬৬, ৭৫, ৯২, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১১৪, ১১৯, ১২০-১২১, ১৩২, ১৩৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৭৭, ১৮১, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৫, ২০৩, ২১০, ২১১, ২১২, ২২১, ২৩১, ২৩৩, ২৩৯, ২৪২, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫১, ২৬০, ২৬৪-২৬৬, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৪, ২৮০-২৮১, ২৮৪-২৮৫, ২৮৮-২৮৯, ২৯১, ২৯৩, ২৯৫-২৯৬, ২৯৮-৩০০, ২৯২, ৩০২-৩০৩, ৩০৬, ৩০৭-৩০৮, ৩১১, ৩২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩৩০, ৩৮৫-৩৮৬, ৩৯১-৩৯৩, ৪১৫, ৪৩০, ৪৪০, ৪৪৫, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৭, ৪৮০, ৪৯০, ৫১১, ৫১৭
মুক্তি সংগ্রামী, ৫৭
মুক্তিযুদ্ধ, ৫৫, ১৪৪, ১৫২
মুক্তিযোদ্ধা, ৬৮, ৭০, ৭৭, ৮৫, ৯৫, ১০৮, ১১৭, ১১৮, ১২০-১২১, ১৩১, ১৪২, ১৬৫, ১৬৮, ১৭১, ১৮৬, ২৩১, ২৪৮, ২৭২, ২৯০, ৩০৪, ৩০৭-৩০৮, ৩১১, ৩২৩, ৩২০, ৩৩০, ৪৫০, ৪৫৭, ৫১৮
মুখার্জী, শ্রী শিবন, ৩৯১
মুজাহীদ, ২৩৩, ২৩৬, ২৭২
মুজিবনগর, ৪৮৯
মুজিব, বেগম, ৫১৩
মুতালিব, ক্যাপ্টেন, ৩১৭
মুন্সীগঞ্জ, ৩৮৮
মুন্সী, মোঃ আছির উদ্দিন, ১৪৫, ১৪৭
মুর্তূজা ডাঃ (মেডিকেল অফিসার), ১৫, ৩৩৪
মুসলিম লীগ, ৫৭, ২৩১, ২৬০, ২৬১, ২৯০, ২৮৭, ২৯৪, ৪৫০
মুসলিম হল, ৩৬-৩৭
মুৎযদ্দিন, প্রভা, ৪০৬, ৪১৯
মেঘনা, ৫২, ২৬৪
মেঘনা (ডাঃ জ্যোতির্ময় ঠাকুরতার কন্যা), ১২, ১৫
মোকতাদির, ডঃ (অধ্যাপক), ১৫
মোর্তজা, মোহাম্মদ (ডাঃ), ৫১২
মোরশেদ, আলম নজরে (অধ্যাপক), ৪৮৯
মোরশেধ, গোলাম (এম, পি), ৭১
মোল্লাম, কুদ্দুস, ২৫১
মোহাম্মদ নুর, ১৪৩, ১৮১
মৌলভী বাজার, ৪৫৪-৪৫৫, ৪৮০

য

যশোর, ১৫২, ১৯৪, ১৯৭-১৯৮, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৭, ২১০, ২১২, ২১৪, ২১৫-২১৬, ২১৮, ২২০-২২১, ২২২-২২৩, ২২৪, ৪৯০
যশোর, ক্যান্টনমেন্ট, ১৮৪, ১৮৯, ১৯৩-১৯৪, ২৮৬, ২০৯-২১০, ২২২
যশোর সেন্ট্রাল জেল, ১৯৪, ২১০-২১১, ২২২
যুগান্তর, ৫৪২, ৫৪৭
যোগেশচন্দ্র, (মালিক, সাধনা ঔষধালয়), ৪৮৩-৪৮৪

র

রউফ, আব্দুর, ৩৩১-৩৩৪
রব, আব্দুর (ডাকসু সহ সভাপতি), ৩৩২
রমনা, ৩৬, ৪২২-৪২৩
রমনা থানা, ২৬, ২৮-২৯, ৩৩
রমনা পার্ক, ৩২৮, ৪৭০
রমনী শীল, ৩৬৮-৩৭০, ৩৭০-৩৭২
রশিদ, এম, এ (সার্কেল অফিসার), ৬৬, ৬৭
রশিদ, মেজর, ২৮১
রশিদ, হারুনুর (সেঃ লেঃ) ৩৬৮
রহমান, আতিকুর, (সেঃ লেঃ), ৩৬৮
রহমান, আনিসুর (আঃ লীগ নেতা রাজশাহী), ৮৫-৮৬

রহমান, খোন্দকার জিল্লুর, ১৭১
রহমান, মজিবর, (রাজাকার কমাণ্ডার), ১৬৪
রমহান, মজিবুর, ৪১৭
রহমান, মতিয়ুর (ইন্সপেক্টর), ২২, ২৬, ২৭
রহমান, মঞ্জুরুল (লেঃ কর্ণেল), ৪৮৯-৪৯১
রহমান, মুশিহুর, ৪৪৩
রহমান, মজিবুর (অধ্যাপক), ৪৬৭-৪৬৯
রহমান, মোঃ হাবিবুর (ডাঃ), ৪১৮
রহমান, শেখ মুজিবুর, ২৬-২৭, ২৮, ১৩৭, ১৩৮, ১৬৬, ১৭৩, ১৯৮, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪৭, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬৮, ৪১৯, ৪২৭, ৪৯৯, ৫১৬
রহমান, সালমা, ৪০৬, ৪১৯
রাজশাহী, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ৩৯৯, ৪০৭, ৪১৭, ৪৫৮, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৪, ৪৭৫
রাজশাহী জেল, ৭০
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৭, ৮০, ১০০, ১২৪, ১২৯, ৩৯৯, ৪০৭, ৪৬৭, ৪৭৪
রাজশাহী হাসপাতাল, ২৩০
রাজাকার, ২৯, ৪২, ৫২, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৬, ৭১, ৮৫, ৮৬, ৯০ , ৯৫, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১৩৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৭, ১৮২, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ২১১, ২২২, ২২৪, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬-২৩৮, ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৫১-২৫৫, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪-২৬৭, ২৭০-২৭২, ২৭৫, ২৭৭, ২৮০-৮১, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৮-২৯০, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৯-৩০২, ৩০৬, ৩০৯-৩১২, ৩১৪, ৩২২, ৩২৩, ৩৮৬, ৫০১
রাজারবাগ, ২০, ২৯, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৬৫, ৫১৯
রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ২০-২২, ২৪, ২৭, ৩০, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৩৫৪-৩৫৫, ৩৬২, ৫১৯
রাজনগর, শিবির, ৩০৩, ৩০৪
রানীনগর, ৬৮, ৭৬
রাবিব, ডঃ ৫১১
রায়, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ, ৭০, ৭১
রায়, শ্যামল, ১০১, ১০৩
রায়ের বাজার, ৩২, ৩২৭, ৩৩০, ৪৩১, ৫১১
রেজভী, কর্নেল, ৮০
রেসকোর্স ময়দান, ৩২৮-৩২৯, ৩৪৭
রোকেয়া হল, ১২, ২৯, ৩২, ৩৭, ৪১

ল

লক্ষ্মীপুর, ২৯৫
লক্ষীপুর বা জার, ৩৩৫
লাকসাম, ৪১৩, ৪১৪
লালবাজার মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প, ৩২৪

শ

শরণার্থী, ৫৪১, ৫৪৭
শফি, ব্রিগেডিয়ার ৩৭২
''শহীদ আলমগীর ছাত্রাবাস'' ৪৪৪
''শহীদ কাজী নুরুন্নবী ছাত্রাবাস,'' ৪৭৫
শহীদ চার ভাই ৫১৯
শহীদ মিনার, ১৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫, ৪০৮, ৪১৭
শহীদ সিপাহী, ২৪, ২৭
শহীদুজ্জামান, মেজর, ৩৬৮
শাকিরিয়া, মেজর, ১০০
শাখারী বাজার, ১৯, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫-৩৭, ৪১
শান্তি কমিটি, ৫৭, ৭০, ৭১, ৮০, ৮৩-৮৫, ৯০, ৯৪, ১০৩, ১১৩, ১২৪, ১২৬, ১৪৮, ১৫৪, ১৬৮, ১৭১, ১৭৬, ১৮০, ১৮২, ১৯৫, ২০২, ২৩২-২৩৪, ২৩৭, ২৪১, ২৪৪, ২৪৫, ২৫১, ২৬৬, ২৭০, ২৭৭, ৩১০, ৩১৪, ৪০৩-৪০৪, ৪৩৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৩৯, ৪৫০, ৫১৭
শান্তি কমিটির দালাল, ২৩০, ২৫৮, ২৬৯, ২৮৫, ২৯৮
শান্তিনগর, ৪৬
শান্তিবাগ, ২৪
শামস, কর্নেল, ২০২
শামসুদ্দিন আহমদ (ডাঃ), ৪৮০-৪৮১
শামসুন্নাহার হল, ১৮
শামশাদ, ক্যাপ্টেন, ৬০-৬১
শারীরিক অত্যাচার, ২২৫
শাহজী সুঃ মেজর, ১৯৯
শাহবাগ, ৩২৯
শিকদার, মোঃ মানিক, ২১১
শিববাটী (রাজশাহী), ৯৯, ১০০
শিববাড়ী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ৩২, ৩৬, ৩৭, ৪৯৫
শিলিগুড়ি, ৫৪৮
শ্রীমঙ্গল, ৩১৬-৩১৮, ৩২০
শেরওয়ানী মেজর, ৯৭-৯৮
শুর, সালামাত আলী খান, (মেজর), ৩১, ৩৪, ৪০

স

সদরঘাট, ২৪, ৩৪, ৩৫, ৪১
সদরঘাট টার্মিনাল, ১৬-১৭, ২৩
সন্ত্রাসের রাজত্ব, ১৯৬, ৪০২
সফিউল্লাহ, ক্যাপ্টেন, ২২৪

সমাদ্দার, সুখরঞ্জন (এসোসিয়েট প্রফেসর), ৪০৮, ৪১৭, ৪৬৭
সরকার, নজমুল হক গণপরিষদ সদস্য, ৪৬৪
সরদার, মেজর, ১৯৪
সরিষাবাড়ী, ৫৬, ৬০, ৬৪, ৬৫
সাঈদ, মোহাম্মদ আবু (সাংবাদিক), ৩৯৯
সাত্তার, মোঃ আবদুস, ২২৫
সাজ্জাদ, ক্যাপ্টেন, ৩৮২-৩৮৪
সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ৩২৬
সাতকানিয়া, ২৭০-২৭১
সাধনা ঔষধালয়, ৪৮৩-৪৮৪
সান্ধ্য আইন, ১৪১৮৩, ৪৩৪, ৪৮৮, ৪৮৪, ৫১১
সামরিক আইন, ৭০
সামরিক কোর্ট, ৭০
সামরিক নির্যাতন, ৪৬৭
সামরিক বাহিনী, ৭৮, ১২০, ১৫৮
সারদা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী, ৮৩
সারিয়াকান্দি, ১০৭, ১০৮, ১১৯-১২০
সালাউদ্দিন, লেফটেন্যান্ট, ৩৬৭, ৩৬৮
সালিক, মোহাম্মদ সিদ্দিক, ৩২৬, ৩২৭
সালেহ, কাজী (অধ্যাপক) ৪১৮, ৪৬৮
সালেহুজ্জামান, মোহাম্মদ, ৩৩-৩৪
সাহা, ভবানী প্রসাদ, ৪০৫
সাহা, রনদা প্রসাদ (ভারতেশ্বরী হোমসের প্রতিষ্ঠাতা), ৪০৫
সাহা, শ্রী রথিকৃষ্ণ, ১৭৬, ১৭৭
স্বাধীন বাংলা, ২৪, ২৫১, ৩৪৮, ৩৫৫, ৪৪৩, ৫১২
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ১২৯, ৩৩০
স্বাধীন বাংলার পতাকা, ১৭
স্বাধীন বাংলাদেশ, ৫১৬
স্বাধীন বাংলাদেশ ফরেন অফিস, ৩৫৯
স্বাধীনতা আন্দোলন, ২৯০, ৪৪৯, ৪৫৩, ৫১৭, ৫২০
স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২৭২, ৩০৮, ৩২৩, ৩২৯
স্বাধীনতার পতাকা, ১১২
স্বাধীবাগ আউট কল, ৩২
সিদ্দিক, এ, কে, এম, (আইনজীবী), ৫১২
সিদ্দিক, ক্যাপ্টেন, ৩৬৮
সিদ্দিকী, এম, আর, ৪৬৫
সিন্ধুর খান ক্যাম্প, ৩১৬
সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট, ৪৮২
সিরাজগঞ্জ, ১০১, ১০৩, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৩
সিরাজী, আতিকুর রহমান, লেফটেণ্যান্ট
সিলেট, ৪৮২
সিলেট ন্যাশনাল পার্ক, ৩১৩
সিলেট মেডিকেল কলেজ, ৪৭৯
সিংহ, নূতন চন্দ্র, ৪৬৫
সিংহ, বনবিহারী. ২১৬, ২১৭
সুনামগঞ্জ, ৪৮০
সুন্দরবন, ২৬৮
সুলতান গ্রুপ, ২৭২
সূত্রাপুর, ৩৪, ৪৮৩
সেকেণ্ড ক্যাপিটাল, ৫০, ১৭৩
সেরপুর ৯৯
সেলিম, লেফটেন্যান্ট, ৩০৭, ৩০৮
সেলিম, সুবেদার, ২৬৮
সোনাগাজী থানা শিবির, ৩০৬, ৩০৯, ৩১০, ৩৮৩, ৩১২
সোনার বাংলা, ২৭২, ৩২৭

হ

হক, আমিনুল (সি, ও), ৬৬
হক, এনামুল লেফটেন্যান্ট, ৩৬৮
হক, খাজা কামরুল, ৫৭
হক, জসিমুল, ৩৭৪
হক, জহুরুল, ৫৩, ৩৪১
হক, জুহুরুল (এম, সি, এ) ১৩৮
হক, নুরুল হক (শহীদ), ৫১৮
হক, ফজলুল, ২২
হক, মাহবুবুল, ৩২৬-৩২৭
হক, মোনামুল, (সহ অধ্যক্ষ), ৬৭
হক, শামসুল, ১৩৮
হক, সানাউল, (ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট), ১৯০
হক, সামসুল, ডাঃ ২৫১
হক, হামিদুল, ৩২৬
হত্যা, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯-২১, ২৩-২৪, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪০-৪১, ৪২-৪৪, ৪৭-৫৩, ৫৪-৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৪-৬৫, ৬৬, ৮৩-৮৫, ৮৭-৮৮, ৮৯-৯৪, ১০৪, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৮-১২০, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮-১২৯, ১৩১-১৩২, ১৩৩, ১৩৮-১৩৯, ১৩৯-১৪০, ১৪১, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬-১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮২, ১৮৫, ১৯০, ১৯৩, ১৯৫-১৯৬, ২০০, ২০২, ২০৩, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২২১, ২২২, ২২৩, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮-২৫১, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭-২৬০, ২৬১, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১, ২৭৪-২৭৬, ২৭৮, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৭, ৩০৫, ৩১৪, ৩১৫, ৩২২, ৩২৪, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৬-৩৩৮,

৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৯, ৩৮০, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪৭৪, ৪৭৯, ৪৯৫, ৩৩৮, ৫০৯
হত্যাপুরী, ৪১৩, ৪১৪
হত্যাযজ্ঞ, ১৯, ১৩৮, ১৫৩, ২২১, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০-৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৮৫, ৩৯২, ৪০২, ৪০৩, ৪১৪, ৪১৯, ৪২৯, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫৯, ৪৮৯, ৪৯১, ৪৯৯
হত্যালীলা, ৩৮০, ৪৩৩
হবিগঞ্জ, ৪৮১
হলদিবাড়ী, ৫৪৭, ৫৪৮
হাই, আব্দুল (ডাঃ), ২৪২
হাই, আব্দুল (সাব-রেজিস্ট্রার), ৬৪
হাওলাদার, আব্দুল মান্নান (হাকিম) ২৬৮
হাই কোর্ট ভবন, ৩২৮
হাজীগঞ্জ, ৪০২
হানাদার বাহিনী, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৭, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৯৮, ৪৫২, ৪৯৯
হাবিব ব্যাংক, ৪৬
হাশেম, ৩৫২
হাশেম (দারোগা), ৭০
হাসান, ফজলে, (ডাঃ), ২৬৫
হাসান, রাশেদুল (অধ্যাপক), ৫০২, ৫০৩
হাসেম, আবুল (ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার) ৩৩
হাসিনা, শেখ, ৫১৪, ৫১৫
হাসিব মেজর, ৩৬৮, ৩৬৯
হায়াত, খিজির (কর্ণেল) ৩৭২
হায়াত, সৈয়দ রেজাউল (মহকুমা প্রশাসক), ৫০
হায়দার, ইফতেখার (ক্যাপ্টেন) ৩৬৭
হুদা, ক্যাপ্টেন, ৩৬৮, ৪৯৮
হুলারহাট, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৯
হোসেন, আলতাফ, ১৩১, ১৩২
হোসেন, আবজল, ১০৭
হোসেন, গোলজার, ১৬৬
হোসেন ছরোয়ার, ১২৪
হোসেন ছানোয়ার, ১২১, ১২২, ১২৪
হোসেন, ডঃ (অধ্যাপক), ৪০৮, ৪১৭
হোসেন মকবুল (ডঃ), ৪৬৮
হোসেন, মনোয়ার, ১৩৯, ১৪০
হোসেন মুর্তজা, ২১
হোসেন, মোজাম্মেল (ক্যাপ্টেন) ৫১৯
হোসেন, মোশারফ, ৪০৮, ৪১৭
হোসেন, মোশারফ, (ছাত্রলীগ নেতা), ৩৭৩
হোসেন, মোহাম্মদ (সিপাহী), ২৮, ২৯
হোসেন, মোয়াজ্জেম, (লেঃ কর্নেল), ৩৩১-৩৩৪, ৩৫৬-৩৫৮
হোসেন, সরদার আমজাদ, (এম, পি), ৮৫
হোসেন, সাজ্জাদ, ৯১, ৯২
হোসেন, সাজ্জাদ (প্রাক্তন উপাচার্য), ৪০৮
হোসেন, সিরাজউদ্দিন, ৫০৮-৫০৯, ৫১২
হোসেন, সৈয়দ আকবর, ৩৯২